NOTES ON

H. S. Bengali Selections

পাঠ-সংকলন

GENERAL EDITOR :

Prof. S. BANERJEE, M.A

INDIAN ASSOCIATED PUBLISHING CO., PRIVATE LTD.

93, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-7

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৬৭

Printed : Formats Nos. 1-12 at Tapasi Press : 13-20 at A. G. Press
21-30 at Mahavidya Press : 31-36 at Ruby Printing House .
36-39 at Annapurna Press · 40-43 K. P. Basu Ptg. Works :
Formats no. A, B, C at Sree Varati Press and D, E at
Lakshmisree Mudran Silpa : Calcutta.

সূচীপত্র

FOR CLASS IX

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ

সূচীপত্র

FOR CLASS X

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ

NOTES ON

পাঠ-সংকলন

পদ্যাংশ

কবিগুরু-বন্দনা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচয়—'কাশীরাম দাস' কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উৎস—আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদনের বিখ্যাত 'মেঘনাদবধ কাব্য' চতুর্থ সর্গ হইতে উৎকলিত। চতুর্থ সর্গের প্রথম ২০টি ছত্রে কবি কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন।

নামকরণ—মেঘনাদবধ কাব্যে পাঠ্যাংশটির এই নাম নাই। মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ পাঠ-সংকলনে কবিতাটির এইরূপ শিরোনাম দিয়াছেন। বাল্মীকির প্রশস্তিই এই কবিতার বিষয়বস্তু। বাল্মীকি আদিকবি বলিয়া কথিত হন এবং সকল কবির গুরুস্থানীয় বলিয়া সম্মানিত হন। মধুকবি এই কবিতায় তাঁহাকে তাই কবিগুরু বলিয়া সম্ভাষণ জানাইয়াছেন এবং তাঁহার বন্দনাতেই কবিতাটি আদ্যন্ত উচ্ছ্বসিত। সুতরাং শিরোনাম যুক্তিযুক্ত ও বিষয়-সঙ্গত।

সমালোচনা—আলোচ্যমান কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গের প্রথমাংশ। এই অংশে মধুসূদন মহাকবি বাল্মীকির যে বন্দনা করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ইতিপূর্বে প্রথম সর্গে মহাকবি সরস্বতী, কল্পনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। এখন চতুর্থ সর্গে নূতন করিয়া আবার যে বাল্মীকির এই বন্দনা, ইহা নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন নহে। কবিতাটি বিশ্লেষণ করিলেই ইহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বুঝা যাইবে। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে মধুসূদন সীতাচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন; সর্গারম্ভে বন্দনাটি ইহারই ভূমিকা। মধুসূদন এই সীতাচরিত্রটি মুখ্যতঃ বাল্মীকির আদর্শেই চিত্রিত করিয়াছেন। 'মুখ্যতঃ' বলিলাম এই কারণে যে ইহাতে কবির নিজস্ব কল্পনা এবং ইউরোপীয় পুরাণের ভাবাদর্শও আংশিকভাবে যুক্ত হইয়াছে।

রাম, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রের বেলায় তিনি স্বীয় কল্পনার বিলক্ষণ স্বাধীনতা লইয়াছেন এবং অনেকাংশে বাল্মীকি হইতে ভিন্নরূপে তিনি এই চরিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। মধুসূদনের রামলক্ষ্মণ হীন; কিন্তু সীতা বাল্মীকির সীতার মতো অনবদ্য পবিত্রতার মধুরতম ছবি। এইখানেই মধুকবি বাল্মীকির একান্ত অনুগামী। সীতার রূপায়ণকালে তাই বাল্মীকির বন্দনা সঙ্গতভাবেই আসিয়াছে।

সীতাচরিত্রকে মধুকবি বাল্মীকির আদর্শে গড়িয়া অপূর্ব সঙ্গতিবোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রায় আদ্যন্ত কূটচক্রান্তময় যুদ্ধোন্মাদনার মধ্যে মাত্র এই চতুর্থ সর্গটিই প্রকৃতপক্ষে স্নিগ্ধ প্রশান্তি, পূর্ণ পবিত্রতা এবং সুকুমার সৌন্দর্যের নন্দনভূমি। বস্তুতঃ, ইহাই কাব্যটির উৎকর্ষের ভিত্তি। এই সর্গটি যুক্ত না হইলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িত। এমন একটি চরমবৈশিষ্ট্যময় সর্গকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলার প্রতি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন কবি মধুসূদনের স্বভাবতঃই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেইজন্যই এখানে কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে জাগিয়াছে।

বাল্মীকির প্রতি কবির বিপুল অনুরাগ সর্বজনবিদিত। তাহা ছাড়া পূর্ববর্তী সকল বিশিষ্ট কবির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। বস্তুতঃ, ইহাই মধুকবির একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।' মধুসূদনের নিকট কৃত্তিবাস, বাল্মীকির ছায়ারূপে নহে, স্বতন্ত্র মহিমাতেই পূজ্য। কালিদাসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। এই কবিতায় মধুসূদনের এই শ্রদ্ধাপূরিত অন্তরের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

কবিতাটির অপর আকর্ষণ ছন্দোমাধুর্য। বাঙলাভাষায় এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়াই মধুসূদন অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন। ইহার গাম্ভীর্য ও ভাবপ্রবাহ বিচিত্রতরঙ্গভঙ্গময় জলদমন্দ্রে আমাদের মোহিত করে। আলোচ্য কবিতায় ইহা আরও উপভোগ্য হইয়াছে এই কারণে যে ভাষার দুরূহতা এখানে নাই। বাঙলাভাষায় সুপ্রচলিত বাক্‌সম্ভারেই এই কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস অমিত্রচ্ছন্দে অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার—কবি মধুসূদন ভারতের কবিকুলগুরু বাল্মীকির পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। তিনি বাল্মীকিরই অনুগামী হইয়া কবিকুলের বাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্র যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক। কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু কবি অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন—মরিয়াও হইয়াছেন

মৃত্যুঞ্জয়। ভর্তৃহরি, সুকণ্ঠ ভবভূতি, বাণীর বরপুত্র কালিদাস, মুরারি মিশ্র—সকলেই কবিগুরুর আদর্শে অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণকেই উপজীব্য করিয়া বঙ্গের কবিকুলাবতংস কৃত্তিবাস হইয়াছেন কীর্তিবাস অর্থাৎ কীর্তির বাসভূমি। কবিগুরুর নিকট শিক্ষা না পাইলে মধুসূদনের পক্ষে মহাকবিখ্যাতি লাভ করা অসম্ভব, কারণ তাঁহার নিজের প্রতিভা অত্যন্ত দুর্বল। তিনি রামায়ণেরই বিষয়বস্তু অবলম্বনে এক নূতন কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্গভাষা জননীকে অভিনব সজ্জায় সজ্জিত করিবেন এইরূপই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু রত্নের আকর বাল্মীকির নিকট হইতে রত্নরাজি না পাইলে তাঁহার নিজের এমন শক্তি নাই যে দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন করেন। তাই তিনি কবিগুরু বাল্মীকির নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

মর্মার্থ—বাল্মীকির রামায়ণ যুগে যুগে বহু ভারতীয় কবির অন্তরে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। ইহারই কাহিনী লইয়া কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, কৃত্তিবাস প্রভৃতি মহাকবিগণ অমর কাব্য রচনা করিয়া অক্ষয় কবিখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাই বাল্মীকি কেবল মহাকবিই নন—তিনি কবিকুলের গুরুস্বরূপও। কবি মধুসূদনও বাল্মীকি-রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য রচনা করিতে ও বঙ্গভাষার সৌন্দর্য তথা গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার আশা, কবিগুরুর কৃপাদৃষ্টি পাইলে তিনিও সাফল্য লাভ করিবেন এবং মহাকবি বলিয়া গণ্য হইবেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

পঙ্‌ক্তি ১-৪। নমি—নমস্কার করি, প্রণাম করি। 'নম্' (সংস্কৃত ধাতু) হইতে এই বাঙলা ক্রিয়াপদটি গঠিত হইয়াছে। **কবিগুরু**—কথাটি দুই অর্থে প্রযুক্ত: (ক) শ্রেষ্ঠ কবি এবং (খ) কবিকুলের গুরু। দুই অর্থেই কথাটি সার্থক। বাল্মীকির কবিত্ব এবং কাব্য যে খুবই উঁচুদরের, এ-কথা সর্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রামায়ণ হইতে বিষয়বস্তু লইয়া যুগে যুগে বহু কবি কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন—বাল্মীকি-রামায়ণই তাঁহাদের প্রেরণা যোগাইয়াছে। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পরবর্তী যুগের কবিগণ প্রত্যক্ষভাবে বাল্মীকির শিষ্য না হইলেও পরোক্ষভাবে শিষ্য অর্থাৎ ভাবশিষ্য। এইভাবে বাল্মীকি কবিদিগের গুরু। পদাম্বুজে—চরণকমলে; পাদপদ্মে। অম্বুজ = পদ্ম। ভারতের শিরশ্চূড়ামণি—ভারতজননীর মুকুটের মধ্যমণি অর্থাৎ ভারতের শ্রেষ্ঠ

কবি তথা মহাপুরুষ। **দাস**—দীন আমি (কবি স্বয়ং)। উত্তমপুরুষের সর্বনামের পরিবর্তে কখনও কখনও বিনয় এবং দীনতা বুঝাইবার জন্য 'দাস', 'অধম', 'বান্দা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়। **তব অনুগামী দাস**—মধুসূদন কবিগুরু বাল্মীকির অনুগমন করিয়া যশোমন্দিরে পৌঁছিতে ইচ্ছুক। একাকী যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। **রাজেন্দ্রসঙ্গমে**—শ্রেষ্ঠ রাজার সহিত। **দূর-তীর্থ-দরশনে**—বহুদূরবর্তী তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে। **রাজেন্দ্রসঙ্গমে.........দূর-তীর্থ-দরশনে**—দরিদ্র ব্যক্তির দূর তীর্থক্ষেত্রে একাকী যাইবার সঙ্গতি নাই; কিন্তু কোনো প্রতাপশালী রাজার সঙ্গে যাইতে পারিলে বিনা অর্থব্যয়েই সে তীর্থদর্শনের পুণ্য লাভ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই নাই। সেইরূপ মধুসূদন মনে করেন যে, কবিখ্যাতিরূপ তীর্থে পৌঁছিবার মতো প্রতিভা তাঁহার নাই, কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকির অনুচর হইতে পারিলে তাঁহার মতো অভাজন কবিও যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সহজ কথায়, বাল্মীকি-রামায়ণের বিষয়বস্তু লইয়াই মধুসূদন কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার আশা, বাল্মীকির মাহাত্ম্যে তিনিও যশের অধিকারী হইতে পারিবেন। 'দূর-তীর্থে'র কথা বলিয়া মধুসূদন অক্ষয় কবিখ্যাতি যে সহজে লাভ করা যায় না এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন।

প. ৫-১৩। **ধ্যান করি**—নিরীক্ষণ করিয়া; মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া। **যাত্রী**—এখানে, কবি। **যশের মন্দিরে**—খ্যাতি বা কীর্তির নিকেতনে। **দমনিয়া**—দমন করিয়া (নামধাতু)। **ভবদম**—ভব অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে যিনি দমন বা ধ্বংস করেন। **শমন**—মৃত্যু; যমরাজ। **তব পদচিহ্ন...অমর**—অনেক কবি রামায়ণ অবলম্বনে নানা কাব্য রচনা করিয়া অমর কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। সর্বসংহারক মৃত্যু তাঁহাদের দেহের মৃত্যু ঘটাইলেও কবিখ্যাতির বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তাই তাঁহাদের কাব্যের সহিত তাঁহারাও মৃত্যুঞ্জয়। **শ্রীভর্তৃহরি**—'ভট্টিকাব্যম্'-এর কবি। ইনি ছিলেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একজন সুপণ্ডিত কবি। 'ভট্টিকাব্যম্' রামচরিত-অবলম্বনে রচিত একখানি মহাকাব্য। যদিও ব্যাকরণ-বিধি শিখাইবার জন্যই কাব্যখানি লিখিত হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে উচ্চাঙ্গের কাব্যকলার নিদর্শনও দুর্লভ নয়। 'নীতিশতক', 'শৃঙ্গারশতক', 'বৈরাগ্যশতক' এবং পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের তাৎপর্যবোধক 'বাক্যপ্রদীপ'ও ইহারই রচনা। **সূরি**—পণ্ডিত, বিদ্বান্। **ভবভূতি**—দাক্ষিণাত্যের একজন সুনামখ্যাত সংস্কৃতকবি।

ইহার প্রাদুর্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত ইহার উত্তররামচরিত ও বীরচরিত নাটক কাব্যরসিকদের দ্বারা সমাদৃত। **শ্রীকণ্ঠ**—সুকণ্ঠ, মধুরভাষী। ভবভূতির কাব্যের মাধুর্যের প্রতি ইঙ্গিত। প্রকৃতপক্ষে 'শ্রীকণ্ঠ' ছিল ভবভূতির উপাধি। 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রস্তাবনায় আত্মপরিচয়সূত্রে কবি লিখিয়াছেন—'**শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ** পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতূকর্ণীপুত্রঃ'। বরপুত্র—শ্রেষ্ঠ সন্তান। ভারতীর—দেবী সরস্বতীর। **ভারতে খ্যাত** ইত্যাদি—যিনি ভূভারতে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। বস্তুতঃ, বাল্মীকির পরবর্তী যুগের সংস্কৃতকবিগণের মধ্যে নিঃসংশয়ে কালিদাসই শ্রেষ্ঠ এবং এই কারণেই তিনি বাণীর বরপুত্র বলিয়া খ্যাত। **কালিদাস**—ভারতের স্বনামধন্য সংস্কৃতকবি। ইনি কোন্ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ ছিল। আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত এই যে মহাকবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগের কবি। কালিদাসের রচিত এই কয়খানা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়: অভিজ্ঞানশকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, নলোদয় ও ঋতুসংহার। **মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ**—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ন্যায় (মধুর)। **মুরারি**—শ্রীকৃষ্ণ; মুরলী—বাঁশী। **মুরারি**—'অনর্ঘরাঘব' কাব্যের কবি। ইহার পূর্ণ নাম মুরারি মিশ্র। অনর্ঘরাঘবের উপজীব্যও বাল্মীকি-রামায়ণ। ইহার ভাষা উদারতা-গুণে ও অলঙ্কারসমাবেশে মধুর ও সুন্দর। এই কারণেই কবি 'মুরারি-মুরলীধ্বনিসদৃশ' বিশেষণটির প্রয়োগ করিয়াছেন। **কৃত্তিবাস**—বাঙলাভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা কবি। 'কৃত্তিবাস ওঝা' পূর্ণ নাম। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। গৌড়েশ্বর ইহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে সভাকবি করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও বাল্মীকি-রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া রচিত, তবে অনেক স্থলে তিনি মূল ত্যাগ করিয়া নানা পুরাণ-উপপুরাণের এবং কল্পনারও আশ্রয় লইয়াছেন। ইনিই বাঙলার আদি মহাকবি। অনেকে ইহাকে 'কীর্তিবাস'ও বলিয়া থাকেন। **কীর্তিবাস কবি**—যে কবি কীর্তির বা যশের বাসভূমি; যাঁহাতে কীর্তি সর্বদা বসতি করে অর্থাৎ যিনি অক্ষয় যশের অধিকারী। **এ বঙ্গের অলঙ্কার**—কবি কীর্তিবাস তাঁহার অপূর্ব কাব্যে বঙ্গদেশের গৌরববর্ধন করিয়াছেন, তাই তিনি বঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ।

পং. ১৩-২০। হে পিতঃ—হে কবিকুলের জনক! কবিতারসের সরে—কাব্যরসের সরোবরে। রাজহংসকুলে—রাজহংসগুলির সহিত। কেলি—জল

ক্রীড়া। **কবিতারসের……করি কেলি আমি**—নির্মল সরোবরে যেমন রাজহংসকুল সানন্দে ক্রীড়া করে, তেমনি মধুসূদনের ইচ্ছা তিনি পৃথিবীর মহাকবিদিগের সহিত মিলিত হইয়া কাব্যরসের সরোবরে সানন্দে বিহার করিবেন অর্থাৎ জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া কাব্যলোকের নির্মল আনন্দে মগ্ন থাকিবেন। এখানে মহাকবি রাজহংসের সহিত এবং কাব্যলোক সরোবরের সহিত উপমিত। **গাঁথিব নূতন মালা**—আমি অভিনব কাব্য রচনা করিব। **তব কাব্যোদ্যানে**—তোমার অর্থাৎ কবিগুরু বাল্মীকির পুষ্পোদ্যান হইতে; রামায়ণ মহাকাব্য হইতে। ফুলের বাগানে যেমন নানা রঙের ফুল ফুটিয়া থাকে, বাল্মীকির রামায়ণেও তেমনি নানা কাহিনী অপরূপ সৌন্দর্যে রূপায়িত হইয়া আছে। এগুলি ফুলেরই মতো মনোরম ও মধুর। **গাঁথিব নতন………ফুল**—মালাকার সযত্নে বাগানের বাছা বাছা ফুল তুলিয়া তাহা দিয়া সুন্দর মালা গাঁথে। কবিরও তেমনি ইচ্ছা তিনি রামায়ণের কাহিনীকেই উপজীব্য করিয়া এক নূতন কাব্য রচনা করিবেন। **তুলি সযতনে**—যত্নের সহিত বাছিয়া। এই কথা দুইটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যময়। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ'-এর প্রথম সর্গেই সরস্বতী, কল্পনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে আবার বিশেষ করিয়া বাল্মীকির বন্দনা করিবার তবে উদ্দেশ্য কি? মনে রাখিতে হইবে, মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণে লিখিলেও রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে নূতন রূপ দান করিয়াছেন। কিন্তু চতুর্থ সর্গের সীতা-চরিত্রকে তিনি সম্পূর্ণ বাল্মীকির আদর্শেই গড়িয়াছেন। রাম এবং বিশেষ করিয়া লক্ষ্মণকে হীন করিলেও সীতা চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্য তিনি কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ তো করেনই নাই, বরং বাল্মীকির সীতার মধ্যে যে ত্রুটি ও খুঁত তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও সযত্নে পরিহার করিয়া সীতাকে এক অনিন্দ্যসুন্দর পবিত্রতার প্রতিমূর্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি লিখিয়াছেন 'তুলি সযতনে তব কাব্যোদ্যানে ফুল'। সীতা-চরিত্রকে এইরূপ রাখিবার কারণও আছে। 'মেঘনাদবধ'-এর যুদ্ধোন্মাদনার মধ্যে একমাত্র চতুর্থ সর্গটিই পবিত্রতা, শান্তি ও সৌকুমার্যের অনাবিল উৎস। ইহাকে বাদ দিলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নানাকারণে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিত। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্গের চরম-গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিবার পূর্বে মধুসূদন তাই কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন। **বিবিধ ভূষণে**—ভাষার পক্ষে ভূষণ বা অলঙ্কার হইল তাহার

অর্থগৌরব ও ধ্বনিমাধুর্য। মধুকবি এমন কাব্য রচনা করিতে অভিলাষী যাহার ভাষা হইবে অর্থগৌরব ও ধ্বনিমাধুর্যে অপরূপ। **রত্নাকর**—কথাটি এখানে দ্ব্যর্থক : বাল্মীকি প্রথম জীবনে দুর্দান্ত দস্যু ছিলেন, তখন **তাঁহার নাম ছিল রত্নাকর**। দ্বিতীয় অর্থে, রত্নাকর = সমুদ্র। 'রত্নাকর' সম্বোধনপদ, বাল্মীকিকে মধুকবি সম্বোধন করিয়াছেন। 'রামায়ণ' অনুপম ও অমূল্য রত্নস্বরূপ এবং এই মহারত্নের আকর (এখানে, সমুদ্র) স্বয়ং বাল্মীকি। এই কারণে মধুকবি বাল্মীকিকে 'রত্নাকর' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। **অকিঞ্চন**—নিঃস্ব; দরিদ্র; যাহার কিছুই নাই। এই কথাটিতে মধুসূদন কবিগুরুর নিকট নিজ প্রতিভার দৈন্য স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য ইহা সৌজন্য বা বিনয়প্রসূত। প্রকৃতপক্ষে মধুকবি নিজের অলৌকিক প্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

ব্যাখ্যা

(১) **নমি আমি কবিগুরু……দূর-তীর্থ-দরশনে।** (পঙক্তি ১-৪)

এই অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কবিগুরু-বন্দনা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। মধুকবি তাঁহার সুবিখ্যাত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে সীতা-চরিত্র অঙ্কনের পূর্বে মহাকবি বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। আলোচ্য অংশটি তাহারই সূচনা।

মহাকবি বাল্মীকি কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকল কবির গুরুস্থানীয়। যুগে যুগে বহু কবি তাঁহার কাব্য হইতে বস্তু, প্রেরণা ও পথনির্দেশ পাইয়াছেন। গুরুর নিকট হইতে শিষ্যবৃন্দ যাহা পায়, এইসকলও তাহারই তুল্য। বাল্মীকি তাই কবিদিগের গুরু। বিশেষ করিয়া মধুকবির গুরু। আবাল্য এই বাল্মীকিরই প্রভাব তাঁহার কবিত্বের পুষ্টি ও বিকাশ ঘটাইয়াছে। আজ পরিণতির দ্বারে আসিয়া কবি সেইজন্য তো বটেই, তাহা ছাড়া বাল্মীকির রচনায় সীতাচরিত্রের একটি প্রকৃষ্ট ও মনোমতো আদর্শ পাইয়াও কবি শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই চরিত্রটির ভাবচিত্র কল্পনা করিয়াই যেন কবি বলিয়াছেন যে তিনি বাল্মীকির 'অনুগামী দাস'। কারণ, মধুকবি বাল্মীকির অঙ্কিত সীতার আদর্শেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতাকে আঁকিয়াছেন। এইখানেই তিনি বাল্মীকির বিশেষভাবে অনুগামী এবং সম্ভবতঃ এইখানেই মধুকবির কবিকৃতির চরম উৎকর্ষ। এত বড় কৃতিত্বের সাধনায় কবি স্বভাবতঃ বিনয় বোধ করিয়াছেন। সত্যকার যশ দুষ্প্রাপ্য, সুদূর তীর্থদর্শনের সুযোগ-লাভেরই মতো। অজস্র ব্যয়

করিয়া দীনের পক্ষে দূর-তীর্থদর্শন সম্ভব নয়। ক্ষীণপ্রতিভ যাহারা, তাহাদের পক্ষেও তেমনি প্রচুর কবিত্বসৃষ্টির দ্বারা যশোলাভ দুঃসাধ্য। তবে রাজার সহিত অনুচরটিও দূরদেশে যাইয়া তীর্থদর্শনের সুযোগ লাভ করে। তেমনি বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া ক্ষীণশক্তি হইলেও মধুসূদন হয়তো দুর্গম যশের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এই আশা, এই ভরসাই এখানে কবির উক্তি উচ্ছ্বসিত করিয়াছে।

[পদাম্বুজ, শিরশ্চূড়ামণি ও রাজেন্দ্র-সঙ্গমে—ইহাদের শব্দার্থ ও টীকা লেখ।]

(২) তব পদচিহ্ন ধ্যান……দুরন্ত শমনে—অমর। (পঙ্‌ক্তি ৫-৮)

কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা-প্রসঙ্গে মধুকবি এই অংশটির অবতারণা করিয়াছেন। পাঠ-সংকলনের 'কবিগুরু-বন্দনা'-শীর্ষক কবিতা হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকি যে মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা যুগ যুগ ধরিয়া কবিকুলের ধ্যানের বস্তু হইয়া আছে। বাল্মীকি কাব্যলোকের যে পথে বিচরণ করিতেন—যে পথে তিনি স্বীয় পদাঙ্ক অক্ষয় করিয়া মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন—সে পথে অন্য কাহারও পদার্পণ সম্ভব নয়। সেই পদচিহ্নে নির্দিষ্ট পথখানি অর্থাৎ সেই কাব্যরচনার আদর্শ তাই পরবর্তী কোনো কবির পক্ষে অনুসরণযোগ্য হয় নাই। উহাকে শুধু আদর্শরূপে সবদা একনিষ্ঠভাবে ধ্যান করিয়া যুগে যুগে বহু কবি নিজ নিজ যাত্রাপথ অর্থাৎ কাব্যাদর্শ নির্ধারণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই তাঁহারা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন ও জগতে অপূর্ব কীর্তি স্থাপন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। মৃত্যু এই নশ্বর জগতের দুর্নিবার কঠোর শাসক। সকল মানুষকেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিগণ সেই দুর্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হন। কীর্তির মধ্যে তাঁহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন। বাল্মীকির কাব্যাদর্শ ধ্যান করিয়া যাঁহারা নিজেদের প্রকৃষ্ট কাব্যাদর্শ নিরূপণ করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহারা অমর, সেই দিক্ দিয়াই তাঁহারা মৃত্যুকেও পরাভূত করিয়াছেন। মধুকবি এই প্রসঙ্গের বিবরণদ্বারা বাল্মীকির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

['যশের মন্দির' ও 'দমনিয়া'—এই দুইটির উপর টীকা এবং 'ভবদম' শব্দের অর্থ লেখ।]

(৩) **গাঁথিব নূতন........ করো অকিঞ্চনে।** (পঙ্‌ক্তি ১৬-২০)

'কবিগুরু-বন্দনা' কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবি বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গেই উল্লিখিত কবিতায় এই অংশটির অবতারণা হইয়াছে।

মধুকবি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে সীতা-চরিত্র-রূপায়ণকালে এইরূপভাবে কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন এবং এই প্রয়াসে সার্থকতা লাভের জন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। কারণ, মধুকবি বাল্মীকির আদর্শেই সীতাকে আঁকিবেন। এই দিকেই এখন তাঁহার লক্ষ্য। বাল্মীকির কাব্য যেন একটি রম্য পুষ্পোদ্যান,—তাহাতে নানারূপ সৌরভের নানা কবিতা-কুসুম বিকশিত হইয়া আছে। মধুসূদন সেইসব কবিতা-কুসুম আহরণ করিয়া নূতন একটি কাব্যের মালা রচনা করিতে অভিলাষী। সীতা-চরিত্রই কবির আপাততঃ অব্যবহিত লক্ষ্য। অন্য চরিত্রের বেলায় মধুসূদন বাল্মীকি হইতে অনেক দূরে সরিয়াছেন, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীতও দেখাইয়াছেন। কিন্তু সীতার বেলায় তিনি একান্তভাবে বাল্মীকির অনুগামী। বাল্মীকির এই অপূর্ব চরিত্রটি আরও শোধন করিয়া,আরও সুন্দর করিয়া আঁকা-ই যেন কবির বাসনা, তাই তিনি বাল্মীকি হইতে সীতা-চরিত্র সযত্নে নির্বাচন করিবেন। দোষটুকু বাদ দিয়া শুধু উৎকৃষ্ট বস্তু লইয়াই বাল্মীকির সীতাকে আরও সুন্দর করা-ই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। এইরূপে বাল্মীকির কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নূতন ছন্দে নবরূপে অভিনব কাব্যরচনাই তাঁহার কাম্য। সেই কাব্যের ভাষাকে তথা বাঙলাসাহিত্যের ভাষাকে কবি অলঙ্কারে সৌন্দর্যে সাজাইয়া সমৃদ্ধ করিতে চান! কিন্তু কবি নিজেকে অত্যন্ত নিঃস্ব বলিয়া অনুভব করেন। ভাষার আভরণ হইল কল্পনা ও আলঙ্কারিক প্রয়োগের উৎকৃষ্ট সম্পদ্। এদিক্ দিয়া বাল্মীকির কাব্য সুসমৃদ্ধ। বস্তুতঃ, উহা যেন এইসকল মূল্যবান্ সম্পদ্ বা রত্নের খনি। দস্যু অবস্থায় বাল্মীকি রত্নাকর নামে আখ্যাত হইতেন। কবি হিসাবেও তিনি ভাবকল্পনার উৎকৃষ্ট উপকরণে পরিপূর্ণ খনি অর্থাৎ রত্নের আকরস্বরূপ। সেই অর্থেই মধুকবি এখানে বাল্মীকিকে রত্নাকর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিবেচনা করিয়া কবিগুরু বাল্মীকির কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন]

[**'কাব্যোদ্যান' ও 'অকিঞ্চন'—এই দুইটির অর্থ বিশদভাবে লেখ। 'রত্নাকর' কথাটির উপর টীকা লেখ।**]

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। "হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস,..... ।"

—(ক) 'ভারতের শিরশ্চূড়ামণি' বলিতে কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে? কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? (খ) কি অর্থে তিনি ভারতের 'শিরশ্চূড়ামণি'? (গ) কে তাঁহার 'অনুগামী দাস' এবং কি অর্থে তিনি তাঁহার অনুগামী দাস?

উ.। (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে মহর্ষি বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন। পাঠ-সংকলনে 'কবিগুরু-বন্দনা' নামে তাহাই সংগৃহীত এবং এই কবিতার প্রারম্ভেই মহাকবি বাল্মীককে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

(খ) বাল্মীকি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। ভারতবর্ষের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের মধ্যে তিনি মণিস্বরূপ বা শ্রেষ্ঠ। ভারতকে মূর্তিমান্ ভাবিয়া তাহার মস্তকে একটি মুকুট কল্পনা করিলে, সেই মুকুটের ভূষণ হন ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবৃন্দ। তাঁহারা যেন এক-একটি রত্ন বা মণি। বাল্মীকি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন বা মধ্যমণি। এই অর্থে তিনি 'ভারতের শিরশ্চূড়ামণি'।

(গ) স্পষ্টতঃই মাইকেল মধুসূদন দত্তই মহাকবি বাল্মীকির 'অনুগামী দাস'। মধুসূদন বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে প্রভূত ভাষা ও ভাবের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে তিনি বহুপরিমাণে কাব্য-প্রেরণা পাইয়াছেন। মহাকবিদিগের মধ্যে তিনিই ছিলেন মাইকেলের আদর্শ। এই দিক্ দিয়া মধুকবি বাল্মীকির ভাবশিষ্য বা 'অনুগামী দাস'। দ্বিতীয়তঃ সীতা-চরিত্র-অঙ্কনে মধুসূদন একান্তভাবে বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছেন। অন্য চরিত্রে বাল্মীকির সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে, কিন্তু সীতা তাঁহার বাল্মীকির আদর্শেই গড়া। এই অংশটি সীতা-চরিত্র অঙ্কন-প্রসঙ্গেই প্রযুক্ত এবং সেইজন্য বাল্মীকির অনুগামিতার কথা এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ, মধুসূদন সীতা-চরিত্রের রূপায়ণে যে বাল্মীকির 'অনুগামী দাস' এই অর্থই এখানে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট।

প্র. ২। "তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে।"

—কাহার 'পদচিহ্নের' কথা বলা হইয়াছে? এই পদচিহ্ন-ধ্যানের অর্থ কি? 'কত যাত্রী' বলিতেই বা কাহাদের বুঝায় এবং তাঁহাদের 'যশের মন্দিরে' প্রবেশের অর্থ কি?

উ.। এখানে মহাকবি বাল্মীকির পদচিহ্নের কথা বলা হইয়াছে। বাল্মীকির 'পদচিহ্ন ধ্যান' করার অর্থ তাঁহার কাব্যাদর্শ-সম্বন্ধেই গভীর চিন্তা। কাব্যের একটি স্বতন্ত্র ভাবজগৎ আছে। সে জগতে এক-একজন কবি এক-একটি পথ ধরিয়া অর্থাৎ আদর্শ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু বাল্মীকি যে পথে (বা আদর্শে) সাফল্যের গন্তব্যে পৌছিয়াছিলেন, সেই পথে অন্য কাহারও যাওয়া সাধ্য নহে। তাঁহার পদচিহ্ন একটি পথ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছে। তাহাতে পদার্পণ কাহারও সাধ্য নয়, তাহা কেবল মনে মনে আলোচনা করা চলে; অর্থাৎ, তাঁহার কাব্যাদর্শ কেবল ধ্যান করা যায়। ইহাই 'পদচিহ্ন ধ্যান' করার অর্থ।

'কত যাত্রী' বলিতে মধুকবি পরবর্তী যে-সকল কবি বাল্মীকির নিকট হইতে ভাব ও উপকরণ পাইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের বুঝাইতেছেন।

'যশের মন্দিরে' প্রবেশের অর্থ কীর্তি লাভ করা। যে মন্দিরে প্রবেশ করিলে যশ হয় সেই মন্দিরই যশের মন্দির; সুতরাং বাল্মীকির কাব্যশিষ্য যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের কবিকীর্তিলাভই 'যশের মন্দিরে' প্রবেশ।

প্র. ৩। 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি'—'কৃত্তিবাস' ও 'কীর্তিবাস'—এই দুইটি কথার অর্থের পার্থক্য কি? কৃত্তিবাস যাঁহার নাম, কি অর্থে তিনি কীর্তিবাস?

উ.। 'কৃত্তিবাস' অর্থ মহাদেব। কৃত্তি অর্থাৎ বাঘছাল যাঁহার বাস (বস্ত্র) তিনি;—তিনিই মহাদেব। কীর্তির অর্থ যশ। কীর্তি যাঁহার বাস (বস্ত্র) তিনি কীর্তিবাস। অর্থ—অতিশয় যশস্বী ব্যক্তি।

বাঙলা রামায়ণের বিখ্যাত রচয়িতার নাম কৃত্তিবাস। কবিহিসাবে তিনি অত্যন্ত কীর্তিমান। সর্বাঙ্গে কীর্তি ধারণ করিয়া তিনি অমর হইয়া আছেন। কীর্তিই তাঁহার বসন। এইজন্য, এই অর্থে তিনি কীর্তিবাস।

প্র. ৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কবিগুরু-বন্দনা' নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কবিগুরু-বন্দনা' কবিতাটির সারমর্ম লেখ এবং কবিতাটির সম্বন্ধে মন্তব্য কর।

উ.। **মর্মার্থ ও সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ পদাম্বুজে = পদ + অম্বুজে। কাব্যোদ্যান = কাব্য + উদ্যান। রত্নাকর = রত্ন + আকর। মনোহর = মনঃ + হর।

সমাস ঃ কবিগুরু—কবিদের মধ্যে গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (পঞ্চমীতৎপুরুষ)। পদাম্বুজে—অম্বুতে জন্মে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ) তাহা অম্বুজ ; পদ অম্বুজের ন্যায় (উপমিত-কর্মধারয়), তাহাতে। শিরশ্চূড়ামণি—চূড়াস্থিত মণি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; শিরের চূড়ামণি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। রাজেন্দ্রসঙ্গমে—রাজাদের মধ্যে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (সপ্তমীতৎপুরুষ) ; তাঁহার সহিত সঙ্গম (তৃতীয়াতৎপুরুষ), তাহাতে। দূর-তীর্থ-দর্শনে—দূর যে তীর্থ (কর্মধারয়) ; তাহার দরশন অর্থাৎ দর্শন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। ভবদম—ভবকে দমন করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। সুমধুরভাষী—সু (= অতিশয়) মধুর (সুপ্ সুপা), সেরূপভাবে ভাষণ করেন অর্থাৎ কথা বলেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ) ; মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ—মুরারির মুরলী (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার ধ্বনি ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার সদৃশ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কীর্তিবাস—কীর্তি বাস অর্থাৎ কাপড় যাঁহার তিনি, অথবা কীর্তিতে বাস (= অবস্থান) যাঁহার তিনি (বহুব্রীহি)। কবিতা-রসের—কবিতার রস (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার। রাজহংসকুলে—হংসের রাজা রাজহংস (ষষ্ঠীতৎপুরুষ—পরনিপাত) ; তাহাদের কুল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। কাব্যোদ্যানে—কাব্যরূপ উদ্যান (রূপক-কর্মধারয়), তাহাতে (তাহা হইতে)। অকিঞ্চনে—নাই কিঞ্চন অর্থাৎ কিছুই যাহার নাই (বহুব্রীহি—বাঙলামতে), তাহাকে।

সমস্তপদ গঠন ঃ যশের মন্দিরে = যশোমন্দিরে। ভারতে খ্যাত = ভারতখ্যাত।

সাধু শব্দ-রূপ ঃ নমি—নমস্কার (বা, প্রণাম) করি। তব—তোমার। যথা—যেরূপ, যেমন। করি—করিয়া। পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। দমনিয়া—দমন করিয়া। শমনে—শমনকে। কেমনে—কেমন করিয়া। সরে—সরোবরে। রাজহংসকুলে—রাজহংসকুলের সহিত। মিলি—মিলিয়া (বা, মিলিত হইয়া)। শিখালে—শিখাইলে। যতনে—যত্নে। ভাষা—ভাষাকে। কোথা—কোথায়। পাব—পাইব। নাহি—না।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ দমনিয়া—দমন (বিশেষ্য—বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইয়া।

কারক ও বিভক্তি ঃ পদাম্বুজে—অধিকরণে-এ। শমনে—কর্মে-এ। ভূষণে—করণে-এ।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ দাস—'আমি, (উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম)-স্থলে বিনয় বুঝাইতে দাস, বান্দা, অধীন, দীন প্রভৃতি প্রথম পুরুষ শব্দের প্রয়োগ হয়।

দরশনে—দর্শনে>দরশনে (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ)।

দমনিয়া—'প্রকৃতি-প্রত্যয়' দ্রষ্টব্য।

যতনে—যত্নে>যতনে (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি)।

অর্থগত পার্থক্য ঃ সুরি—পণ্ডিত; সুরী—সুরের মানবী স্ত্রী অর্থাৎ কুন্তী। অকিঞ্চন—নিঃস্ব; আকিঞ্চন—আকাঙ্ক্ষা।

বাক্যরচনার জন্য শব্দ ঃ পদচিহ্ন, সুরি, বরপুত্র, অকিঞ্চন।

কাশীরাম দাস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচয় ঃ—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

"মধুসূদন অপেক্ষা বড় কবি বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছেন"—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু মধুসূদনের মতো প্রচণ্ড potential প্রতিভা আমাদিগের দেশে কেন, যে-কোনো দেশের ইতিহাসে সুদুর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার সম্ভাবনা যেমন বিরাট্ ছিল,

পরিণতি তেমন ফলবান্ হয় নাই, তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই প্রতিভার তুলনায় তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি পর্যাপ্ত ও সুষম হয় নাই। যে মহাকাব্য লিখিবার জন্য তিনি pucca fist-এর অপেক্ষায় ছিলেন, তাহা আভাসেই রহিয়া গিয়াছে। মধুসূদন সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি।" —সুকুমার সেন।

মাইকেল মধুসূদন উল্কার ন্যায় বাঙলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকল প্রতিকূলতা হেলায় দলিয়া তিনি সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল অমিত্রাক্ষরের ন্যায় বিশিষ্ট ছন্দের, সনেটের (চতুর্দশপদী কবিতা) এবং পত্রকাব্যের (বীরাঙ্গনা) প্রবর্তকই নহেন, বাঙলাভাষায় পৌরুষ ও ওজোগুণের সঞ্চার—ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

মধুসূদনের সাহিত্য—"প্রতিভা ছাড়াও মধুসূদনের এমন এক অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল যাহা তাঁহাকে বাঙলা কাব্যে যুগ-পরিবর্তনের আদি এবং প্রধান নেতা করিয়াছিল। গ্রীক্, লাতিন, সংস্কৃত, ইতালীয় প্রভৃতি বহু classical ও আধুনিক উন্নত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার যেমন ছিল, এমন আর কোন বাঙালী সাহিত্যিকের কখনও ছিল না বা নাই। মধুসূদনের কাব্যে এইসব সাহিত্যের যে প্রভাব-চিহ্ন দেখা যায়, তাহা অজ্ঞান অনুকরণ নয়। হোমর-ভর্জিল-দান্তের সঙ্গে না হউক, ওবিদ-পেত্রার্ক-তাস্সো-মিলটনের সঙ্গে যে মধুসূদনের কবি-প্রতিভার স্বাজাত্য ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।" —সুকুমার সেন।

মধুসূদনের সাহিত্যে প্রধান রস বীররস; ভাব ও ছন্দোগাম্ভীর্য তাঁহার কাব্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব ওজোগুণ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে যে গীতিকাব্যের প্রসাদগুণ একেবারেই নাই তাহা নহে। গীতিকাব্য-রচনায়ও যে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য তাহার প্রমাণ।

মধুসূদনের ছন্দ ও ভাষা—মধুসূদনই সর্বপ্রথম পয়ারের শাসনকে অস্বীকার করিয়া বাঙলা ছন্দে স্বাধীনতার অপূর্ব রসাস্বাদের সঞ্চার করেন। তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিলেন তাহা অবশ্য পয়ারের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তবে পয়ারে যে সকল সময়ে অষ্টম অক্ষরের পর এবং দুই চরণের শেষে যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত। বিশেষতঃ পয়ারের মিলযুক্ত দুই চরণে একটা ছেদ আসে, ভাব সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু

অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে যতি পড়ে। "আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, মিলের অভাবপূরণ নয়—যেন সে ভাবনাই নয়—মিলকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ অনাবশ্যক করিয়া তোলাই যেন এই ছন্দের গৌরব" (মোহিতলাল)। কিন্তু বাঙলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইবার যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। এই ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার তদ্‌ভব শব্দে যুক্ত-ব্যঞ্জনের বাহুল্য নাই; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ যুক্ত-ব্যঞ্জন-ধ্বনির দোল ব্যতীত পয়ারের ন্যায় বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। এজন্য মধুসূদনকে আভিধানিক শব্দের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলার ক্রিয়াপদ অধিকাংশ যৌগিক হওয়ায় ইহা যেমন নমনীয় হইয়াছে, তেমনই ইহা শ্লথবন্ধও হইয়াছে। এই শ্লথবন্ধতা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মধুসূদন প্রভৃত নামধাতুর গঠন ও প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইটি প্রধান নূতনত্ব-বিধান ছাড়া তাঁহাকে আরো অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া বাঙলাভাষাকে একেবারে ভাঙিয়া গড়িয়া লইতে হইয়াছিল।

কাব্যে নানাপ্রকার অলংকার-সংযোজনাও মধুসূদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনন্বয় উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক প্রভৃতি অলংকারের বহুল প্রয়োগে তাঁহার ভাষা অনন্যসাধারণ।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—চতুর্দশপদী কবিতাবলী বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদনের অমূল্য দান। ইহাদের গঠনপ্রকৃতি, ভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং কবির জীবনের দর্পণহিসাবে ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(ক) **গঠন-প্রকৃতি ও ভাববৈশিষ্ট্য**—এগুলি চৌদ্দটি চরণ বা পঙ্‌ক্তিতে রচিত কবিতা। ফ্রান্সে অবস্থানকালে ইতালীয় কবি পেত্রার্কের Sonnet-এর অনুসরণে মধুসূদন এইজাতীয় কবিতা লিখিয়াছেন। ইহাতে চৌদ্দটি পদ বা পঙ্‌ক্তি থাকে এবং পাশাপাশি দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে পয়ারের মতো মিলবিন্যাস হয় না। ইহার আট পঙ্‌ক্তি বা অষ্টক এবং অবশিষ্ট ছয় পঙ্‌ক্তি বা ষট্‌কের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ছেদ থাকে এবং সমগ্র কবিতায় একটিমাত্র ভাববস্তু সুনির্দিষ্ট আবর্তন-নিবর্তনের ধারায় প্রবাহিত হয়। এইপ্রকার ছন্দোবন্ধের কৃত্রিম-কাঠামোর উপর অকৃত্রিম ভাবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠাতেই সনেটের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য। 'চতুর্দশপদী' নামটি মধুসূদনকৃত। কিন্তু এই নামের মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে। চৌদ্দটি পদযুক্ত অথচ সনেটের বৈশিষ্ট্যহীন অনেক বাঙলা কবিতাই

সনেট নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। সনেটের সহিত চতুর্দশপদী মিশিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে।

(খ) **কবি-জীবনের দর্পণহিসাবে ইহাদের মূল্য**—"মেঘনাদবধের কোলাহলমুখরিত রণোন্মাদনার পাশে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের নিভৃত আপন মনের গান। এই নিভৃত মনের গানই মানুষের অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা সাধারণতঃ কোনো বড লোককে জানিতে এবং বুঝিতে চাই তাঁহার জীবনের বড বড কাজের ভিতর দিয়া। ওটা আমাদের ভুল; মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় সবসময় বড বড কাজের ভিতর দিয়াই নহে, সে পরিচয় ছড়াইয়া থাকে অনেকসময় জীবনের ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাজ ও কথার ভিতর দিয়া—পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মতো। অনেক কথা অনেকক্ষণ বসিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে হইলে আমাদিগকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়। এই বহুভাষণ এবং কলা-কৌশলের আড়ালে আমাদের সহজ মনের পরিচয় অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া যায়। 'মেঘনাদবধে'র ভিতরে ভিতরে মধুসূদনের মনের পরিচয় রহিয়াছে বটে,—কিন্তু মহাকাব্যজাতীয় কাব্যের একটা স্বধর্মও রহিয়াছে,—কবিমনকে সেখানে এই কাব্যের স্বধর্মের আড়ালে খানিকটা চাপা পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু সেই কবিমনের সহজতম এবং সুন্দরতম প্রকাশ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভিতরে।" —শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

উৎস ও রচনাকাল—কবিতাটি মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত। কবি যখন ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্সাই নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে (১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই কবিতাগুলি রচিত হয়।

নামকরণ—কবিতাটিতে একটি উপমার সাহায্যে কাশীরাম দাসকে সাধকশ্রেষ্ঠ ভগীরথের গৌরব ও মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং বাঙালী যে তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী তাহাও বলা হইয়াছে। এইজন্য কবিতাটির নাম হইয়াছে 'কাশীরাম দাস'।

সমালোচনা—আলোচ্যমান কবিতাটি মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'সনেট্'। এইরূপ কবিতার উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রধানতঃ ভাবের সহিত ছন্দোবন্ধের একাত্মতায়। এখানেও দেখি একটিমাত্র ভাব সনেটের সুনির্দিষ্ট

ছাঁচে নিয়মিত আরোহ ও অবরোহের ক্রম বাহিয়া একটা স্থিরসিদ্ধান্তে আসিয়া সংহত হইয়া গিয়াছে। কাশীরামের প্রতি মধুসূদনের গভীর শ্রদ্ধাটুকু সকল উচ্ছ্বাস ও সকল তরল চঞ্চলতা বর্জন করিয়া ছন্দের ছাঁচে ঘনীভূত নিটোল রূপে কেমন এক হইয়া গিয়াছে। ভগীরথ মহাদেবের জটাশ্রয়ী সুরধুনীকে মর্ত্যে অবতরণ করাইয়াছিলেন যেরূপ তপস্যাবলে এবং তাহা দ্বারা স্ববংশের উদ্ধার-সাধন করিয়া তিনি যেরূপ ধন্য হইয়া গিয়াছেন, কাশীরামও সেইরূপ তপস্যা এবং মহিমাবলে বাঙলাভাষায় মহাভারতের সঞ্জীবনী সুধা বহাইয়া দিয়াছেন। বাঙালীজীবনে কাশীদাসী মহাভারতের বিপুল প্রভাব ও উহার অসীম প্রেরণা সত্যই সঞ্জীবনী ভাগীরথীর মতো। অতএব কাশীদাসের অলোকসামান্য মাহাত্ম্য বাঙালী কখনো গাহিয়া শেষ করিতে পারিবে না। এই মূল ভাব-বস্তুটিকেই মধুসূদন আলোচ্যমান কবিতায় রসরূপ দান করিয়াছেন। একটি উপমাকে আশ্রয় করিয়া এখানে ভাবটি অষ্টকে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে আরোহণ করিয়াছে এবং ষট্‌কে অবরোহণ করিয়া তাহাই অবিসর্পিত গতিতে স্থির সিদ্ধান্তে পিনদ্ধ রসরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অষ্টকে শেষ হইয়াছে ভগীরথের উপমাটি, উহার সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে ষট্‌কে। এই হিসাবে অষ্টকে ষট্‌কে ছেদটিও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এই গঠনবৈশিষ্ট্যে ও ভাবসৌষ্ঠবে আলোচ্যমান সনেট্‌টি অপূর্ব।

কবিতাটিতে শুধু ধন্য কাশীরামকেই আমরা দেখি না, কবি মধুসূদনের একটা মহনীয় দিক্‌ও দেখিতে পাই। পূর্বসূরি-বর্ণনায় তাঁহার এই উদারতা সত্যই প্রশংসনীয়। মধুসূদন যে আবাল্য রামায়ণ-মহাভারতের ভক্ত তাহা আমরা জানি, তাঁহার উক্তি যে এত উদার ইহাই এই কবিতায় প্রত্যক্ষ করি। আরো দেখিতে পাই মহাকবি মাইকেলের অপর একটি বিশেষত্ব। তাঁহার প্রতিভা যে মূলতঃ মহাকাব্য-রচনারই বিশেষ অনুকূল ছিল তাহার আভাস মিলে পূর্ণোপমা (Homeric Simile)-র প্রয়োগ।

[ভগীরথের উপমাটি Homeric বা Epic Simile.]

সংক্ষিপ্তসার—পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন একদিন মহাদেবের জটা-জালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার মহাভারত মহাকাব্যকেও তেমান সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার দুরধিগম্যতার জন্য তাই বঙ্গবাসী মহাভারতের রসাস্বাদে বঞ্চিত ছিল—সে রসের তীব্র পিপাসা থাকিলেও তাহা মিটাইবার সম্ভাবনা না থাকায়

তাহারা যেন আকুলভাবে কাঁদিত। মর্ত্যবাসীর চিরনমস্য সাধকশ্রেষ্ঠ ভগীরথ যেমন উগ্র তপস্যায় তুষ্ট করিয়া গঙ্গার পবিত্র ধারাকে মর্ত্যে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পুণ্য সলিলস্পর্শে শাপদগ্ধ পূর্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ কাশীরাম দাস নিজপ্রতিভার শক্তিতে বাঙলা ভাষার পথ প্রস্তুত করিয়া সে-পথে মহাভারতের অপূর্ব রসের ধারা বহাইয়াছিলেন বাঙালীর রসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য। বাঙালী তাই কাশীরামের নিকট এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। কবিশ্রেষ্ঠ কাশীরাম মহাভারতের সঞ্জীবনী সুধা বাঙালীর পক্ষে সুলভ করিয়া দিয়া নিজেও অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

পঙ্‌ক্তি ১-৪। চন্দ্রচূড়-জটাজালে—মহাদেবের জটারাশির মধ্যে। **চন্দ্রচূড়**—শিব। চন্দ্র চূড়ায় (=মস্তকে) যাহার (বহুব্রীহি সমাস)। মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রের অধিষ্ঠানের কাহিনীটি এইরূপ: সমুদ্রমন্থনের সময়ে অমৃতের সহিত চন্দ্রও উঠিয়াছিল। অমৃতের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিয়া অসুরগণ তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে বিপন্ন চন্দ্র সকল দেবতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বিফল হয়। অবশেষে মহাদেব স্বেচ্ছায় তাহাকে নিজমস্তকে স্থান দেন। **জাহ্নবী**—ভাগীরথী, গঙ্গা। ভগীরথের পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে গঙ্গা পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া চলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিবর সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথ ও দেবগন্ধর্বাদির স্তবে তুষ্ট হইয়া জানু বিদীর্ণ করিয়া (মতান্তরে কর্ণপথে) ইহাকে মুক্তি দেন। **চন্দ্রচূড়-জটাজালে…জাহ্নবী**—গঙ্গা যেমন মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। বিষ্ণুপদ-বিগলিত গঙ্গা প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে ছিলেন। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি গঙ্গাকে মুক্তি দিলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহাকে নিজমস্তকে ধারণ করেন। যেমতি—যেরূপ। **ভারত-রস**—মহাভারতের রস বা মাধুর্য। ভারতবর্ষের জীবনাদর্শের যাহা-কিছু বৈশিষ্ট্য সবই পাওয়া যায় মহাভারতে। এইদিক্ দিয়াও মহাভারতকে ভারতের রস বা নিষ্কর্ষ বলা সার্থক। **ঋষি দ্বৈপায়ন**—সংস্কৃত মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসমুনি। ইনি মহর্ষি পরাশরের পুত্র। একটি দ্বীপের উপর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার এক নাম দ্বৈপায়ন। আবার কৃষ্ণবর্ণ

ছিলেন বলিয়া ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও পরিচিত। মহাভারত-রচনা ছাড়া ইনি বেদের বিভাগও করিয়াছিলেন; অষ্টাদশ পুরাণও ইঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার ন্যায় মনীষী এদেশে খুব কমই জন্মিয়াছিলেন। **ঢালি সংস্কৃতহ্রদে**—সংস্কৃত-ভাষারূপ হ্রদে ঢালিয়া অর্থাৎ সংস্কৃতভাষায় রচনা করিয়া। সংস্কৃত ভাষাকে হ্রদরূপে কল্পনা করিবার সার্থকতা ইহাই যে, হ্রদ যেমন গভীর বলিয়া সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য, সংস্কৃতও তেমন সাধারণের অধিকারের বাহিরে। তেমতি—সেইরূপ। **তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ** ইত্যাদি—জাহ্নবীর পবিত্র সলিল পান করিবার জন্য মর্ত্যবাসী যেমন তৃষিত হইয়াছিলেন, তেমনি তৃষাতুর বঙ্গবাসী হইয়াছিল মহাভারতের অপূর্ব রস আস্বাদনের জন্য। অথচ সংস্কৃতভাষার দুরূহতার জন্য সে তৃষ্ণা মিটাইবার কোনো উপায় তাহাদের ছিল না। কবির মতে তাহারা আকুলভাবে ক্রন্দন করিত।

পঙ্‌ক্তি ৫-১২। কঠোরে—কঠোরভাবে, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা (ক্রিয়ার বিশেষণ)। **গঙ্গায় পূজি**—গঙ্গাকে পূজা করিয়া, স্তবস্তুতির দ্বারা গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করিয়া। **ভগীরথ**—সূর্যবংশীয় রাজা সগরের প্রপৌত্র, রাজা দিলীপের পুত্র। ইনিই ব্রহ্মার কমণ্ডলু-আশ্রিত গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম-অনুসারে গঙ্গার আর এক নাম হইয়াছে ভাগীরথী। **ব্রতী**—তপশ্চরণশীল, তপস্যারত। অষ্টাবক্রমুনির শাপে উত্তমাঙ্গ হইয়া (অবশ্য এখানে শাপে বর, কারণ ভগীরথ আজন্ম বিকলাঙ্গই ছিলেন) ভগীরথ মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য গোকর্ণ তীর্থে বহুবৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। **সুধন্য তাপস**—অতিশয় ধন্য তপস্বী, নমস্য তপস্বী। ভবে—পৃথিবীতে। **নরকুলধন**—মনুষ্যকুলশ্রেষ্ঠ। ভগীরথ কঠোর সাধনায় অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্যে আনিয়া মর্ত্যবাসীর যে পরম উপকার করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই কবি তাঁহাকে মনুষ্যকুলশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। **সুধন্য তাপস ভবে, নরকুলধন**—লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই অংশটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে কারণ ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে ভগীরথের প্রশংসা রহিয়াছে; কিন্তু কবিতাটির লক্ষ্য ভগীরথ নহেন—কাশীরাম দাস। **সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি**—যেমন সগরবংশের মুক্তি আনয়ন করিলেন। সগররাজ শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃতরাজ্য হইবার ভয়ে যজ্ঞের অশ্বটিকে চুরি করিয়া পাতালে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। সাগরের ষাট হাজার পুত্র অশ্বের অন্বেষণ

করিতে করিতে মুনির আশ্রমে আসিয়া অশ্বটিকে দেখিল এবং তাঁহাকেই চোর মনে করিয়া শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। তখন মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ষাট হাজার রাজকুমারকেই শাপাগ্নিতে ভস্মীভূত করিলেন। পরে ভগীরথ গঙ্গা-দেবীকে মর্ত্যে আনিলে সেই অপরিমেয়-মাহাত্ম্য বারিধারার স্পর্শে ভস্মীভূত কুমারগণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া সশরীরে স্বর্গলাভ করিল। **পবিত্রিলা**—পবিত্র করিলেন (নামধাতু)। আনি মায়ে—মাতা অর্থাৎ গঙ্গাদেবীকে অবতরণ করাইয়া। **তিন ভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। এই তিনলোকে গঙ্গার তিনটি নাম: স্বর্গে সুরধুনী (মন্দাকিনী), মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী। **ভাষা-পথ খননি স্ববলে**—নিজ শক্তি ও প্রতিভার দ্বারা ভাষারূপ প্রবাহের খাত প্রস্তুত করিয়া।

লক্ষণীয়ঃ কাশীরাম দাসের সমসাময়িক বাঙলা ভাষা, তাহার শব্দসম্ভার ও প্রবণতা সংস্কৃত মহাভারতের মতো সুবিশাল ও উন্নত মহাকাব্যকে ধারণ করিবার পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইহাকে উপযোগী করিয়া লইতে তাঁহাকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাকে খাল কাটিবার পরিশ্রমের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনিই বাঙলা ভাষাকে গড়িয়া-পিটিয়া, নূতন শব্দসম্ভার আনিয়া তাহার প্রকাশ ও ধারণ-ক্ষমতার বিপুল বিস্তার করেন। এইজন্য কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিষয়বস্তু বেদব্যাসের অনুরূপ হইলেও, প্রথমটি দ্বিতীয়টির অনুবাদ নহে, মূলানুগ তো নহেই। খননি—খুঁড়িয়া, কাটিয়া। মহাভারত ছিল সংস্কৃতের হ্রদে আবদ্ধ। সেই হ্রদ হইতেই খাল কাটিয়া আনিয়া বাঙলায় বহাইয়াছেন কাশীরাম। **ভারত-রসের স্রোতঃ**—মহাভারত মহাকাব্যের অপূর্ব মাধুর্যপ্রবাহ। **জুড়াতে গৌড়ের তৃষা**—বঙ্গবাসীর রসপিপাসা মিটাইবার জন্য। **গৌড়**—বাঙলা-দেশের প্রাচীন নাম। এখানে বাঙলাদেশের অধিবাসী। 'গৌড়' কথাটি মধুসূদন বাঙলাদেশ অর্থে তাঁহার কাব্যে অন্যত্রও ব্যবহার করিয়াছেন: "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—মেঘনাদবধ। **সে বিমল জলে**—মহাভারতের রসরূপ নির্মল ও সুশীতল সলিলে। নারিবে—পারিবে না। **নারিবে শোধিতে ধার** ইত্যাদি—কাশীরামের নিকট বাঙালী এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

পঙ্‌ক্তি ১৩-১৪। মহাভারতের কথা অমৃত-সমান—এই ছত্রটি কাশীরাম ভণিতার অংশহিসাবে তাঁহার কাব্যের বহুস্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

মধুকবি মহাকবির গৌরবের জন্যই তাঁহার লিখিত অংশটি অবিকল নিজের কবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। ভণিতার সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।"

মধুসূদনের সনেটের মধ্যে উল্লিখিত অংশটির অর্থ একটু বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে ভগীরথের সহিত কাশীরামের তুলনার ফলে। ভগীরথের আনীত জাহ্নবীর পবিত্র বারিধারার যেমন একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, কাশীরাম-রচিত মহাভারতের অপূর্ব রসেরও সেইরূপ প্রভাব। তাই ইহা 'অমৃত-সমান'। কবীশ-দলে—শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে। **তুমি পুণ্যবান**—মহাভারতের কথা যে শুনে সে তো পুণ্যলাভ করেই, যে কবি তাহা শুনান তিনিও সকলকে পুণ্য-বিতরণরূপ মহৎ কর্মের ফলে পুণ্যশীল, চিরনমস্য।

ব্যাখ্যা

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা……বঙ্গ করিতে রোদন।

আলোচ্যমান পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কাশীরাম দাস'-শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতার অন্তর্গত। কবি কাশীরাম দাসের প্রশস্তিপ্রসঙ্গে মধুসূদন এখানে মহাদেবের জটাশ্রিত সুরধুনীর সহিত কাশীদাসী মহাভারতের তুলনা করিতেছেন।

একদা শশাঙ্কশেখর শিবের জটায় গঙ্গা যেমন আবদ্ধ ছিলেন, মহাভারত কাব্যও তেমনি একসময় সংস্কৃত ভাষায় আধৃত থাকায় বাঙালীর নিকট দুরধিগম্য ছিল। জটিল জটার শুষ্ক গ্রন্থির অভ্যন্তর হইতে কত তপস্যায় ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতারিত করেন। তাহার পূর্বে এ পুণ্যসলিলের স্পর্শলাভ মর্ত্যবাসীর ভাগ্যে ঘটিত না। কাশীরামের পূর্বেও সেইরূপ ভারত-কাব্যের রসাভিষেক বাঙালীজীবনকে স্নিগ্ধ করে নাই। সত্য বটে সংস্কৃত ভাষা জটার মত নীরস নহে, ইহাও সত্য যে তাহা সাহিত্যরসের প্রাচুর্যে নির্মল হ্রদের তুল্য, কিন্তু বাঙালী সাধারণের নিকট তাহা চিরকাল দুরধিগম্য—সে ভাষায় মহাভারত উপভোগ করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেন সংস্কৃতভাষারূপ হ্রদে তাঁহার অমর কাব্যের রস ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধারণ বাঙালীর তাহা অনধিগম্য ছিল বলিয়া সে রস পান করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ পানতৃষা ছিল অসাধারণ। তাই সে আকুল হইয়া

কাঁদিত। কাশীরাম বাঙালীর সে তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন—সংস্কৃতের জটিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া রচনা করিলেন বাঙলা মহাভারত। কাশীরাম দাস তাই বাঙলার ভগীরথ। তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য গাহিয়া শেষ করা অসম্ভব।

[চন্দ্রচূড-জটাজাল, জাহ্নবী, ভারত-রস, ঋষি দ্বৈপায়ন—ইহাদের টীকা লেখ।].

(২) সেইরূপে ভাষাপথ খননি…কভু গৌড়ভূমি। (ম. প ১৯৫৫)

আলোচ্যমান পঙ্‌ক্তি কয়টি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কাশীরাম দাস’-শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতার অংশ। মধুসূদন কাশীরাম দাসের বন্দনা গাহিবার প্রসঙ্গে এই অংশটির অবতারণা করিয়াছেন।

তাপসশ্রেষ্ঠ ভগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া ধরাধামে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। তাঁহারই পূতস্পর্শে সগররাজার ষাট হাজার ভস্মীভূত পুত্র পুনর্জীবন লাভ করে। ভগীরথ মর্ত্যে ভাগীরথীকে আনয়ন করিয়া এইরূপে শুধু সগর-বংশেরই উদ্ধারসাধন করেন নাই, পরন্তু স্বর্গ মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিভুবনেরও পবিত্রতা সাধন করেন; কারণ গঙ্গা যতদিন শিবের জটাশ্রিত ছিলেন ততদিন তাঁহার পবিত্র স্পর্শ এই ত্রিলোকের কেহই পাইত না। সেইরূপ কাশীরাম দাসও ভগীরথের ন্যায় কঠোর সাধনায় বাঙলার কাব্য-সুরধুনী মহাভারতকে লইয়া আসেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃতভাষারূপ হ্রদে এই মহাকাব্যরস আবদ্ধ ছিল। কাশীরাম সেই হ্রদ হইতে বাঙলা ভাষার খাতে ভারতকাব্যের প্রবাহ বহাইয়া দিলেন। ভগীরথ শুধু গঙ্গাকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, কাশীরাম কাব্য-গঙ্গাকে আনিলেন পথ গড়িয়া। এই কৃতিত্ব ভগীরথের গৌরব হইতেও বেশী। কাশীরামের সাধনায় বাঙালী অমর কাব্যের সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে—ইহার মধ্য হইতে নূতন প্রেরণা, নূতন আদর্শ পাইয়া নবজীবনের মহত্তর আস্বাদ লাভ করিয়াছে। তাই কাশীরামের নিকট বাঙালী চিরঋণী। এই ঋণ শোধ করা তাহার অসাধ্য।

মন্তব্য : আপাতভাবে কাশীরাম মহাভারতের অনুবাদক। ভগীরথ যেমন গঙ্গার স্রষ্টা নহেন, কাশীরামও তেমনি আদি মহাভারতের রচয়িতা নহেন। তাঁহার কাজ ভাবান্তরীকরণ—সংস্কৃত হইতে বাঙলায় মহাভারতকে খাল কাটিয়া আনার তাৎপর্য ইহাই। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মধুসূদন কাব্যরসকে বুঝাইয়াছেন। নিছক অনুবাদ কখনো মূলের রস বহন করে না।

কাশীরাম বাঙলা ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া মহাভারতের রসটুকু তাঁহার স্বরচিত কাব্যে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার রচনা রসানুগ, ভাষানুগ, অনুবাদ নহে। এই হিসাবে উহা মৌলিক এবং উহার রস মূল হইতে একটু ভিন্ন আস্বাদের।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। 'কাশীরাম দাস'-শীর্ষক কবিতায় ভগীরথের সহিত কাশীরামের উপমাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া উহার সংগতি প্রতিপন্ন কর।

উ.। কপিল মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংস হইলে ভগীরথ কঠোর তপস্যাদ্বারা স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণ করেন। মহাদেবের জটাশ্রয়ে জাহ্নবী তখন ধৃত ছিলেন। ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বিন্দুসরোবরে মুক্তি-দান করেন। তারপর ভগীরথ সম্মুখে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হন, গঙ্গাধারা তাঁহার অনুসরণ করে। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে সগররাজার ষাট হাজার ভস্মীভূত পুত্র আবার প্রাণ ফিরিয়া পায়; পৃথিবী হয় ধন্য। এই অপূর্ব সাধনা এবং মহতী সিদ্ধির জন্য ভগীরথ তাই চিরনমস্য।

বঙ্গের কবি কাশীরাম দাসও ভগীরথের ন্যায় মাহাত্ম্যের অধিকারী। তাঁহার পূর্বে অমৃতসলিলা গঙ্গার ন্যায় সেই রসসমৃদ্ধ মহাভারত কাব্য সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ ছিল। সংস্কৃত ভাষা অবশ্য শিবের জটার মতো শুষ্ক, জটিল ও গ্রন্থিময় নহে—বরং উহা সাহিত্যরসের আধাররূপে নির্মল হ্রদেরই তুল্য। কিন্তু জটাশ্রিতা জাহ্নবী যেমন একদা মানুষের আয়ত্তের অতীত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত কাব্যও তেমনি এককালে বাঙালী-সাধারণের ভোগাতীত ছিল। কাশীরাম সেই সংস্কৃত ভাষা হইতে ঢালিয়া বাঙলা ভাষায় রচনা করিলেন ভারত-কাব্য—বাঙালীর বহুকালের তৃষ্ণা মিটিল, জীবনে বহিল নূতন রসস্রোত, সমাজের সম্মুখে ফুটিল পবিত্রতার নূতন আদর্শ। বাঙালী এইরূপে মহাভারতের পূত প্রভাব অনুভব করিল। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে পথ দেখাইয়া আনিলেন, কাশীরাম ভারত-কাব্যের রসধারাকে আনিলেন পথ প্রস্তুত করিয়া। ভাষার খাত তাঁহাকে নিজের হাতে গড়িতে হইয়াছিল। মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যকে ধারণ করিবার উপযুক্ত শব্দসম্ভার ও প্রবণতা তখনও বাঙলায় ছিল না। কাশীরামই প্রথম বাঙলা ভাষাকে গড়িয়া-পিটিয়া তৈয়ারি করিয়া

উপযুক্ত করিয়া লইলেন। সুতরাং ভগীরথের নিকট মর্ত্যবাসীর যে ঋণ, কাশীরামের নিকট বাঙালীরও সেই ঋণ, বরঞ্চ আরও বেশী। ভগীরথ মনুষ্যকুলে ধন্য, কাশীরামও বাঙালীর চিরনমস্য।

এইরূপে ভগীরথের সহিত কাশীরামের উপমাটি সর্বতোভাবে সংগত ও সার্থক।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ কবীশ = কবি + ঈশ।

সমাস ঃ (ক) চন্দ্র-চূড়-জটাজালে—চন্দ্র চূড়ায় যাঁহার (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি); তাঁহার জটা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার জাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ভারতরস—ভারতের অর্থাৎ মহাভারতের রস (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। সংস্কৃতহ্রদে—সংস্কৃত-রূপ হ্রদ (রূপক-কর্মধারয়), তাহাতে। নরকুলধন—নরদিগের কুল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার ধন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ভাষাপথ—ভাষারূপ পথ (রূপক-কর্মধারয়)। অমৃতসমান—নয় মৃত অর্থাৎ মৃত্যু যাহা দ্বারা (নঞ্‌ বহুব্রীহি); অমৃতের সমান (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কবীশদলে—কবিদের ঈশ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাঁহাদের দল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। গৌড়ভূমি—গৌড়-নামক ভূমি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

(খ) তৃষ্ণায় আকুল = তৃষ্ণাকুল। তিন ভুবন = ত্রিভুবন (বা, তিনভুবন)।

সাধু শব্দ-রূপ ঃ আছিলা—ছিল (বা, ছিলেন)। যেমতি—যেরূপ, যেমন। রাখিলা—রাখিলেন। তেমতি—সেইরূপ। কঠোরে—কঠোরভাবে। গঙ্গায়—গঙ্গাকে। পূজি—পূজা করিয়া। যথা—যেরূপে। সাধিলা—সাধন করিলেন। মুকতি—মুক্তি। খননি—খনন করিয়া। নারিবে—পারিবে না। শোধিতে—শোধ করিতে। কভু কখনও।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ জাহ্নবী—জহ্নু – অণ্ + ঈ স্ত্রীলিঙ্গে। দ্বৈপায়ন—দ্বীপ + ফক্ (আয়ন)। পূজি—পূজ্ (সংস্কৃত ধাতু) + ইয়া। তাপস—তপঃ + ণ। পবিত্রিলা—পবিত্র (বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) + ইলা। খননি—খনন (বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) + ইয়া। নারিবে—নার্ (নঞর্থক ধাতু) + ইবে।

বাক্য-রচনা ঃ আকুল : করুণ বংশীধ্বনি শ্রোতাদের মন আকুল করিল। ব্রতী : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ চন্দ্রচূড় (উ. মা. ক. ১৯১৯)—সমাস দ্রষ্টব্য। আছিলা (উ. মা. ক. ১৯১৯)—আছ্ + ইলা = আছিলা। 'আছ্' ধাতুর সামান্ত অতীতের রূপ প্রাচীন এবং আধুনিক কাব্যে পাওয়া গেলেও গদ্যে 'আ'-টি বাদ গিয়াছে ('ছিল')। ভবিষ্যৎ কালে 'আছ্' ধাতুর রূপ নাই, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে 'থাক্' ধাতু।

জাহ্নবী (উ. মা. ক. ১৯১৯)—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। অপত্যার্থক সংস্কৃত তদ্ধিতের উদাহরণ।

দ্বৈপায়ন (উ. মা. ক. ১৯১৯)—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। 'ভব' বা 'জাত' অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিতের উদাহরণ।

মুকতি—মুক্তি > মুকতি : বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

পবিত্রিলা—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ।

খননি—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ।

নারিবে—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নঞর্থক ক্রিয়ার উদাহরণ (না + 'পার্' ধাতুর ভাব লইয়া গঠিত 'নার্' ধাতু)।

আত্মবিলাপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচয়—'কাশীরাম দাস' কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উৎস ও রচনাকাল—এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ বৎসরই তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আশ্বিন সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়।

"এই কবিতাটি রচনাকালে মধুসূদনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং অর্থের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার জীবনের উপর দিয়া যে বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল তাহা তো ভুলিবার নয়; তাহার বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মধুসূদনের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত।·········সেই মানসিক অশান্তি ও বেদনার প্রকাশ এই কবিতাটি।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নামকরণ—আলোচ্যমান কবিতাটিতে মধুকবি তাঁহার জীবনের ভুল-ভ্রান্তি ও দুঃখবেদনার কথা বলিয়াছেন। কবির জীবনে অধিকাংশ দুঃখ তাঁহার স্বকৃত অপরাধের ফল। দুর্বার মোহে পড়িয়া তিনি ইংরেজী সাহিত্য-রচনায় বহুকাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পুরাপুরি সাহেব বনিবার ভ্রান্ত আবেগে জীবনের বহু অমূল্য সময় তিনি অপচয় করিয়াছিলেন। দাম্পত্য-জীবনেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। পিতৃধর্ম ত্যাগ করিয়া, পিতৃবিত্তে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া তিনি যে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহা যখন অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তখন তাঁহার মর্মে মর্মে খেদের অন্ত রহিল না। তাঁহার বড় সাধের লোকোত্তীর্ণ যশ আর অর্থ কিছুই জীবৎকালে করায়ত্ত হয় নাই। এই খেদ কবির চিত্ত এক এক সময় মথিত করিয়া তুলিত। এমনই এক বেদনাগভীর মুহূর্তে কবি আত্মসম্বন্ধীয় বিলাপ গাহিয়াছেন এবং তাহা গাহিয়াছেন আত্মগতভাবেই। তাই এই কবিতার নাম 'আত্মবিলাপ'।

সমালোচনা—আলোচ্যমান কবিতাটির প্রেরণা রহিয়াছে কবির গভীর দুঃখানুভূতির মর্মমূলে। কবির জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ব্যর্থতা হইতে যে বেদনা তাহা তো ছিলই—তাহার চেয়েও বেশি ছিল যাহা, সে দুঃখটি হইল এই যে তিনি স্বখাত সলিলে ডুবিয়াছিলেন। তাই তাঁহার 'আত্ম-বিলাপের' মধ্যে আত্মধিক্কারের সুরটি বিশেষভাবে স্পষ্ট। যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা লইয়া মধুকবি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আত্মসচেতন ছিলেন বলিয়াই অপচয়ের বোধটা তাঁহাকে বড় পীড়া দিয়াছে। সাহিত্যাকাশে উল্কার মতো দুর্মদ আবেগে বৃথা ছুটাছুটির পর যখন তিনি আপনার কক্ষটিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন সে দীপ্তি হয়তো ক্ষীয়মাণ। তাই সে সীমাহীন আক্ষেপ কবিকে থাকিয়া থাকিয়া তুষের আগুনে দহিয়াছে। আলোচ্যমান কবিতাটি তাহারই আন্তরিক অভিব্যক্তি।

এই আন্তরিকতাই কবিতাটির অন্যতম প্রধান আবেদন। শূন্যচারী ভাবস্বপ্ন নহে, বেদনার হলাহলমথিত ইহার সুধারস। তাই ইহার উপভোগ্যতা এত নিগূঢ়।

তারপর স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া আছে অনুপম উপমা। যথাযোগ্যতাগুণে এবং বর্ণনায় ও রূপবৈশিষ্ট্যে প্রতিটি স্তবক কবির অন্তর্গূঢ় বেদনাকে রসে রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই মধুকবির তীব্রতা আর

কল্পনার প্রাচুর্য। পার্বত্য নদীর মতো ভাবপ্রবাহ এখানে স্তবক হইতে স্তবকান্তরে খরবেগে অবিসর্পিত গতিতে ধাইয়া চলিয়াছে। কবির বেগবান প্রকৃতি ছন্দের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে যেন প্রতিফলিত। সেই শক্তি, বিদ্যুদ্‌গর্ভ প্রতিভার সেই প্রদীপ্ত স্ফুরণ হাহাকারের কালোমেঘ দীর্ণ করিয়া খেলিয়া গিয়াছে। সত্যই কবিতাটি যেন মধুকবির অন্তরের একটি অতিশয় বিশ্বস্ত আলেখ্য।

সংক্ষিপ্তসার—মিথ্যা আশার মোহে পড়িয়া কবি কোনো ফল তো লাভ করিতে পারেনই নাই, বরং বিফল সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া অমূল্য জীবনেরই অপচয় করিয়াছেন। দুর্বার গতিতে জীবন তাঁহার ছুটিয়া চলিয়াছে অনন্ত কালসমুদ্রের দিকে। দিনে দিনে আয়ু কমিয়া আসিতেছে, দেহমনের শক্তিরও হইতেছে হ্রাস। তবুও কবির মনে আশার মোহঘোর কাটিতে চাহে না। কবে ভাঙিবে তাঁহার এই মোহনিদ্রা? এদিকে জীবন উদ্যানে কুসুমের মতো, দূর্বাদলে শিশিরবিন্দু বা জলের উপর বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী যৌবনেরও অবসান হইয়া আসিতেছে। ইংরেজীতে কাব্যসাধনায় যে সামান্য খ্যাতি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অলীক স্বপ্নসুখের মতো, বিদ্যুতের চকিত চমক বা মরুভূমিতে মরীচিকার মতো কবিকে কেবল বিভ্রান্ত করিয়াছে, অতৃপ্তির আগুনে অহরহঃ দগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার অপরিসীম পিপাসা কিছুতেই মিটে নাই। দাম্পত্যজীবনের সুখলাভের আশায় তিনি যে প্রেমের বাঁধনে নিজেকে ধরা দিয়াছেন, তাহাই শেষে ভীষণ ফাঁদ হইয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে প্রেমের আকর্ষণে অন্ধ পতঙ্গের মতো অগ্নিশিখার মধ্যেই ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হইতেছে দুর্বিষহ অশান্তির স্মৃতিভার বহন করিয়া। যে প্রেমকে পূর্ণ ও পরিণত করিতে গিয়া তিনি অর্থোপার্জনের জন্য অমানুষিক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারই শতদল তুলিতে গিয়া তাঁহার হাত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, মণির বদলে পাইয়াছেন ফণীর বিষাক্ত দংশন। সে বিষজ্বালা তিনি কেমন করিয়া ভুলিবেন? মহাকবি-খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া কী অপরিসীম পরিশ্রম না স্বীকার করিয়াছেন! বঙ্গবাণীর সেবা করিতে গিয়া যশও যেমন তাঁহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে, তেমনি সহিতে হইয়াছে পরশ্রীকাতর বিরুদ্ধ সমালোচকের বিদ্রূপ-দংশন। ইহাই কি তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রমের পুরস্কার? ইংরেজী ভাষায় মহাকবি হইবার যে সু-উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি

কালসমুদ্রের গভীরে নামিয়াছিলেন যশের মুক্তা তুলিবার জন্য, তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হইয়া বরং হইয়াছে জীবনের বিপুল অপচয়। অসাধ্যসাধন করিতে গিয়া তিনি নির্বোধের মতো তিলে তিলে অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়াছেন, এবং হয়তো ইহারই জন্য অকালে জীবনের অবসান ডাকিয়া আনিলেন। তাই কবির মনে অনুশোচনার অবধি নাই।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

আশার ছলনে ভুলি—মিথ্যা আশার মোহে পড়িয়া, মায়াবিনী আশার কুহকে পড়িয়া। **কী ফল লভিনু**—ফলরূপে কি-ই বা লাভ করিয়াছি? **আশার ছলনে ভুলি……মনে**—কবির জীবনে ছিল সহস্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই আশার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি স্বধর্ম, সমাজ, স্বদেশ, মাতৃভাষা—সবকিছুই ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবু তাঁহার আশার শতাংশের একাংশও সফল হয় নাই। জীবনের এক বেদনাতুর ক্ষণে এইসকল অতৃপ্ত আশার কথা মনে উদিত হওয়ায় কবির মনে খেদের আর অন্ত নাই। এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে মধুসূদনের আবাল্য স্বপ্ন ছিল ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম হইয়া অমরত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁহার সফল হয় নাই। এই অলীক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে তিনি বৃথাই জীবনের অমূল্য সময় অপচয় করিয়াছেন। **জীবন-প্রবাহ**—জীবনরূপ নদীর ধারা। **কালসিন্ধু-পানে**—কালরূপ মহাসমুদ্রের দিকে। **জীবন-প্রবাহ …ফিরাব কেমনে?**—কবির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনবচ্ছিন্ন গতিতে অনন্ত অতীতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে তো তিনি বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না, অতীতকে ফিরাইতে তো পারেন না। **দিন দিন আয়ুহীন**—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন আয়ু কমিয়া আসিতেছে। **হীনবল দিন দিন**—বয়স যতই বাড়িতে থাকে, দেহমনের শক্তিও আসে তত কমিয়া। **তবু এ আশার নেশা ইত্যাদি**—মিথ্যা আশার প্রবঞ্চনায় বার বার প্রতারিত হইয়াও কবির মনে তাহার মোহঘোর লাগিয়া থাকে; যৌবনের স্বপ্ন ভাঙিলেও তাহার আবেশ কাটাইয়া উঠিতে কবি যেন কিছুতেই পারেন না। আশার দুর্বার মোহের কাছে, ইচ্ছা না থাকিলেও, তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া বসেন।

দ্বিতীয় স্তবব

রে প্রমত্ত মন মম ইত্যাদি—কবির মন ভুলের পর ভুল করিয়াই চলিয়াছে। মিথ্যা আশার মোহান্ধকার সেখান হইতে এখনো ঘুচে নাই। রাত্রির অন্ধকারে মানুষ যেমন গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকে, কবিচিত্তও যেন তেমনই মোহঘোরে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। জীবন-উদ্যানে—জীবনরূপ ফুলের বাগানে। যৌবন-কুসুমভাতি—যৌবনরূপ ফুলের বর্ণচ্ছটা। **জীবন উদ্যানে… কতদিন রবে?**—যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই জীবনকে বাগান কল্পনা করিলে যৌবনকে রূপে গন্ধে অল্পক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত ফুলের সঙ্গেই তুলনা করিতে হয়। সহজ কথায়, মানুষের যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হইলেও ফুলের মতো ক্ষণস্থায়ী। যৌবনের অবসান যখন প্রায় হইয়া আসিয়াছে, তখনো কবির অশান্ত মন এই সহজ সত্যটি বুঝিতে পারিতেছে না। মনে রাখিতে হইবে 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির রচনাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ, যখন কবির বয়স ৩৮ বৎসর। ইহার পর তিনি আর ১২ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। মধুকবির জন্মতারিখ ১৮২৩ (ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো)। **নীরবিন্দু**—জলকণা অথবা শিশিরকণা। নিত্য কি রে ঝলমলে—সবসময়েই কি মুক্তার দীপ্তি লইয়া বিরাজ করে? **নীরবিন্দু…ঝলমলে**—দূর্বাদলের উপর নৈশ শিশিরবিন্দু মুক্তার শোভা লইয়া বিরাজ করে বটে, কিন্তু সে শোভাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না—সূর্যের আতপ্ত কিরণস্পর্শে তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না। **অম্বুবিম্ব**—জলবুদ্বুদ। অম্বুমুখে—জলের উপর। সদ্যঃপাতি—উঠিবামাত্র যাহা ফাটিয়া পড়ে। **কে না জানে** ইত্যাদি—বুদ্বুদ দেখিতে সুন্দর হইলেও, জলের উপর ফুটিয়াই যে আবার ফাটিয়া যায়, একথা কে না জানে? মানুষের যৌবনের সঙ্গে এই জলবুদ্বুদের সাদৃশ্য আছে। **লক্ষণীয়ঃ** এখানে প্রশ্ন করা কবির উদ্দেশ্য নয়—প্রশ্নের যে উত্তরটি সকলেই জানে তাহার উপর জোর দেওয়াই অভিপ্রেত। এইরূপ প্রয়োগকে ইংরেজী অলংকারশাস্ত্রে বলে Rhetorical Question।

তৃতায় স্তবক

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে—যে ব্যক্তি রাত্রিতে নিদ্রার মধ্যে মধুর স্বপ্ন দেখিয়া ক্ষণিকের সুখভোগ করে। কী সুখ তার?—সে কি সত্যই সুখী? তাহার সুখ কি স্থায়ী? **জাগে সে কাঁদিতে**—নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহার

সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, রূঢ় বাস্তবের নির্মম আঘাত সাময়িক সুখস্বপ্নের তুলনায় বাস্তব দুঃখকে দ্বিগুণ করিয়া দেয়। তাই তাহার জাগরণ পরম দুঃখের। **ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। প্রভাদানে—চমকিত হইয়া, অত্যুজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিয়া। **ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে……পথিকে ধাঁধিতে**—অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে পথিক চক্ষুকে মানাইয়া লইতে পারে। সেই সময় বিদ্যুতের চকিত চমক মুহূর্তের জন্য পথটিকে আলোকিত ও স্পষ্ট করিয়া দেয় বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ অন্ধকারে দিগ্ দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আর সেই অন্ধকারে তাহার পীড়িত দৃষ্টি দিশাহারা হইয়া পড়ে। মধুসূদন মাদ্রাজে অবস্থানকালে তাঁহার প্রথম ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ 'Captive Ladie' রচনা করেন। ইহার প্রথমাংশ পাঠ করিয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জর্জ নর্টন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাতে যে যুবক মধুসূদনের মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে। আলোচ্যমান অংশটি খুব সম্ভবতঃ মধুজীবনের এই ঘটনাটির ইঙ্গিত বহন করে। মরীচিকা—জলহীন স্থানে জলবিভ্রম। তৃষাক্লেশে—পিপাসার কষ্টে। **মরীচিকা……তৃষাক্লেশে**—মরুভূমিতে তৃষিত পথিক মরীচিকার পিছনে বৃথা ছুটাছুটি করিয়া শেষে মৃত্যুবরণ করে। মরীচিকা পথিকের পিপাসা মিটানো দূরে থাকুক, তাহা বাড়াইয়া দেয়। ইংরেজীতে সাহিত্যসাধনা করিয়া মধুসূদন যে সাময়িক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অন্তরের মহাকবি-খ্যাতির পিপাসাকে তীব্রতর করিয়াছিল, কিন্তু এই পিপাসা তাহার মিটে নাই। **এ তিনের ছল-সম** ইত্যাদি—স্বপ্ন, বিদ্যুৎ এবং মরীচিকা মানুষকে যেভাবে প্রতারিত করে, মিথ্যা আশাও কবিকে সেইভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

চতুর্থ স্তবক

নিগড়—শৃঙ্খল। সাধে—স্বেচ্ছায়। **প্রেমের নিগড়…চরণে সাধে**—কবি স্বেচ্ছায় প্রেমের শৃঙ্খলে নিজেকে বাঁধা দিয়াছিলেন। **কী ফল লভিলি?**—সে প্রেমবন্ধনের পরিণতি কি হইল? দাম্পত্যপ্রেমের চির-আকাঙ্ক্ষিত সুখ আকাশকুসুমের মতো মিলাইয়া গেল। কবি মাদ্রাজে থাকিবার সময় এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সাত বৎসরকাল সুখে-দুঃখে কাটিবার পর পারিবারিক অশান্তির ফলে এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। এখানে এই ইঙ্গিত আছে বলিয়াই মনে হয়। **জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে**—জ্বলন্ত

আগুনের শিখার লোভে। পতঙ্গ হয়তো মনে করে আগুনের মধ্যেই তাহার ঈপ্সিতকে পাইবে। তাই আগুন দেখিলেই তাহার লোভ হয়। কাল-ফাঁদে—ভীষণ ফাঁদে। রঙ্গে—আনন্দে, মত্ততায়। **পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়** ইত্যাদি—আগুনের শিখা দেখিলে পতঙ্গ দুর্বার আকর্ষণে মহানন্দে তাহার দিকে ছুটিয়া যায়, কিন্তু সে বুঝিতে পারে না যে সেই আগুনেই তাহাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। সেইরূপ প্রেমের উন্মাদনায় অন্ধ কবি সুখের আশায় যাহার নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সে-ই শেষপর্যন্ত তাঁহার জীবনে নিদারুণ অশান্তির কারণ হইয়াছিল। এই অপরিণামদর্শিতার ফলেই আজ কবিকে কাঁদিতে হইতেছে। এই ভুলের জন্য তাঁহার অনুশোচনার আর অবধি নাই।

পঞ্চম স্তবক

বৃথা অর্থ অন্বেষণে—অর্থোপার্জনের বৃথা চেষ্টা করিয়া। সে সাধ সাধিতে—প্রেমের দ্বারা সুখী হইবার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে। **বাকি কী রাখিলি……সে সাধ সাধিতে?**—দাম্পত্যজীবনে সুখী হইবার জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টায় মধুসূদন বিভিন্ন কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। শিক্ষকতা, সংবাদপত্র-সম্পাদন, কাব্যসাধনা—কিছুই তিনি বাকি রাখেন নাই। কিন্তু শেষপর্যন্ত সকল প্রচেষ্টাই তাঁহার নিষ্ফল হইয়াছে—তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে ব্যর্থ। মাদ্রাজে থাকিবার সময় মধুসূদনের আর্থিক অবস্থা সত্যই খুব সচ্ছল ছিল না, এমনকি পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াও অর্থাভাবে তিনি কলিকাতা ফিরিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। **মৃণালকণ্টকগণে**—পদ্মের ডাঁটার কাঁটা-গুলিতে। মৃণাল কিন্তু পদ্মের ডাঁটা নহে; পঙ্কমধ্যে পদ্মমূলে ইহার অবস্থান। **ক্ষত মাত্র…কমল তুলিতে**—পদ্মফুল তুলিতে গিয়া তিনি ফুল আর তুলিতে পারেন নাই, কেবল ডাঁটার কাঁটাতেই তাঁহার হাত ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। **কমল**—পদ্ম, এখানে দাম্পত্যপ্রেমের সুখ। **নারিলি হরিতে……ফণী**—সাপের মাথার মণি তুলিতে গিয়া কবি মণি আর তুলিতে পারেন নাই, কেবল সাপের কামড়ই খাইয়াছেন। রূপক বর্জন করিলে, দাম্পত্য প্রেমের সুখলাভ করিতে গিয়া সুখের পরিবর্তে কেবল অশান্তিই কবি ভোগ করিয়াছেন। এ বিষম বিষজ্বালা ইত্যাদি—সেই নিদারুণ অশান্তির স্মৃতি কবির অন্তরে অহরহঃ পীড়া দেয়—শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না।

ষষ্ঠ স্তবক

যশোলাভ-লোভে—কবিখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রলোভনে। আয়ু কত যে ব্যয়িলি—অমূল্য জীবনের কত সময়ই না বৃথা অপচয় করিয়াছিস্। কবি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইংরেজাতে কাব্যসাধনায় যে সময় তিনি ব্যয় করিয়াছেন তাহা নিছক অপব্যয়ই হইয়াছে। **সুগন্ধ কুসুমগন্ধে** ইত্যাদি—ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কীট যেমন তাহার মধ্যে প্রবেশ করে কেবল তাহাকে কাটিবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি সমালোচক ইহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল কেবল তীক্ষ্ণধার বিরুদ্ধ সমালোচনার দ্বারা ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে—ইহাই এই অংশের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। এ ব্যাখ্যায় 'মাৎসর্য-বিষদশন' ঐ বিরুদ্ধ সমালোচকদের। মাৎসর্য-বিষদশন—ঈর্ষারূপী কীটের বিষদন্ত। দশন=দন্ত। কামড়ে রে অনুক্ষণ—সর্বদাই কামড়ায়। **মাৎসর্য-বিষদশন...অনুক্ষণ**—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয়। গুণগ্রাহী সহৃদয় পাঠকসমাজ যেমন একদিকে এই কাব্যের প্রভূত প্রশংসা করেন, অন্যদিকে তেমন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা ইহার কঠোর বিরুদ্ধ-সমালোচনাও করেন। এইসকল আক্রমণ যে কবিচিত্তে গভীর বেদনা দিয়া থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। এস্থলে বিরুদ্ধ-সমালোচকদের কঠোর মন্তব্যকেই মধুসূদন মাৎসর্যের বিষদন্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা সকলেই যে ঈর্ষার দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না। (পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরমায়ু বড়জোর পঞ্চাশ বৎসর বলিয়াছিলেন। পরে অবশ্য এ মত তিনি পরিবর্তন করিয়াছিলেন।) এই কি লভিলি ইত্যাদি—প্রাণপাত পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ কি তুই কেবল লোকের অবজ্ঞা আর ঈর্ষা কুড়াইয়া ফিরিলি?

সপ্তম স্তবক

মুক্তাফলের লোভে—মুক্তাফল সংগ্রহ করিবার আশায়। **ধীবর**—ডুবুরী। সাধারণতঃ কথাটি জেলে বা মৎস্যজীবী অর্থেই ব্যবহার হয়। যে-সব ডুবুরী মুক্তা তোলে, ইংরেজীতে তাহাদিগকে বলে pearl *fishers*। এই fisher-এরই বাঙলা করা হইয়াছে 'ধীবর'। **শতমুক্তাধিক আয়ু**—শত শত মুক্তার চেয়েও যাহার মূল্য বেশি সেই অমূল্য জীবন। কালসিন্ধু-জলতলে—কালরূপ মহা-সমুদ্রের জলের তলে। অনন্ত বিস্তার আর অপরিমেয় গভীরতার দিক্ দিয়া

কাল মহাসমুদ্রের সহিত তুলনীয়। **পামর**—রে নরাধম। চরম অনুশোচনার মুহূর্তে কবি নিজেকে এইভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। **মুকুতাফলের লোভে… ফেলিস পামর!**—বহুমূল্য মুক্তা তুলিবার আশায় ডুবুরী সাবধানে সমুদ্রের অতল গর্ভে নামে। ইহাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকিলেও, মুক্তা তুলিতে পারে বলিয়া তাহাদের এই বিপজ্জনক প্রচেষ্টা সার্থক। মধুসূদন সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় পরম নিষ্ঠার সহিত কালের গভীরে নামিয়াছিলেন যশোরূপ মুক্তা তুলিবার জন্য; কিন্তু যশোলাভ দূরে থাকুক, তাহার চেয়েও মূল্যবান্ জীবনকেই যে বিপন্ন করিতে হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। জীবনের নিরর্থক অপচয় তাই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপস্থিত কবির মনে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। **ফিরি দিবে হারাধন** ইত্যাদি—জীবনের যে মূল্যবান্ অংশ খ্যাতিপ্রতিপত্তির বৃথা অন্বেষণে নষ্ট হইয়াছে, তাহা কে ফিরাইয়া দিতে পারে? সময় একবার চলিয়া গেলে তো আর ফিরে না। **আশার কুহকছলে**—আশার প্রবঞ্চনাময় কৌশলে।

ব্যাখ্যা

(১) আশার ছলনে ভুলি'……এ কি দায়? (স্তবক ১)

এই অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতার প্রথম স্তবক। মধুকবি ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিখ্যাতি লাভের আশায় যে ভুল ও সময়ের যে বিপুল অপচয় করিয়াছিলেন, এই অংশে তাহারই জন্য গভীর খেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের স্বপ্ন ছিল ইংরেজী-সাহিত্যে অমর কবির খ্যাতি লাভ করিবেন। পাঠ্যাবস্থায় ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া তিনি কিছু সুযশও লাভ করিয়াছিলেন। তাই অধিকতর আশায় তিনি খাঁটি ইংরেজ সাজিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পিতার ধর্ম, সমাজ, আচার, এমনকি মাতৃভাষা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি বহুকাল বিদেশী সাহিত্যসাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদা বিটন সাহেবের উপদেশ লাভ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মতোই তিনি এতকাল ভুল করিয়া আসিয়াছেন—মাতৃভাষাই তাঁহার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই ভুল ও সময়ের অপচয় পরবর্তী কালে কবিকে বড়ই পীড়া দিত। সময়ের মূল্য তখন তাঁহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। জীবন নদীর প্রবাহের মতো অনবচ্ছিন্ন

ধারায় কালরূপ মহাসাগরের মধ্যে লীন হইয়া ছুটিয়া যায়। একটি ক্ষণও স্থির নহে। একবার যাহা চলিয়া যায় তাহাকে আর ফিরাইয়া আনা যায় না। এইরূপে আয়ু দিনে দিনে কমিয়া আসে, বয়স যায় বাড়িয়া। বয়সের সঙ্গে শক্তিও ক্রমে শেষ হইয়া আসে। এই প্রকাণ্ড সত্যটি কবির মন বুঝিয়াও বুঝে না। এখন তাঁহার মনে যৌবনের সেই মিথ্যা আশার মোহঘোর একটু লাগিয়া আছে। প্রবল প্রয়াসসত্ত্বেও মনকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষার সেবায় একাগ্র করিয়া উঠিতে পারেন না। এইজন্য তাঁহার বড খেদ।

(২) রে প্রমত্ত মন মম……অম্বুমুখে সন্তঃপাতি ? (স্তবক ২)

এই অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতাটির অন্তর্গত। মিথ্যা আশার প্রবঞ্চনা কবির অমূল্য যৌবনকালটির অপচয় সাধন করিতেছে—এই বোধটা কবিকে কিরূপ পীড়া দিতেছে তাহারই অভিব্যক্তি আলোচ্যমান অংশটি।

ইংরেজীতে বড কবি হইবেন, এই ছিল কবির আবাল্য স্বপ্ন। কিন্তু সে আশা মোহ মাত্র। রাত্রির অন্ধকারে মানুষ যেমন নিদ্রিত থাকে, এই মোহের ঘোরে কবির মনও তেমনি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এদিকে অনবচ্ছিন্ন বেগে কবির যৌবন কাটিয়া যায়। জীবন যদি একটি ফুলের বাগান হয়, যৌবন তাহারই তো আলোকময় ফুল। কিন্তু ফুল বেলাশেষে ঝরিয়া পড়ে, দু'দিনেই যায় শুকাইয়া। যৌবন তেমনি ক্ষণস্থায়ী। তৃণদলে শিশিরকণা মুক্তার মতো ক্ষণিকের তরেই ঝলমল করে, জলমধ্যে বুদ্বুদ ফুটিয়াই ফাটিয়া যায়। যৌবনও তো সেইরূপ—এই আছে, এই নাই। অথচ উহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। মিথ্যা মোহের কুহকে পড়িয়া কবি উহার যোগ্য ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। তাই অশান্ত মনকে তিনি বিলাপের সুরে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছেন যেন তাহা মাতৃভাষায় স্বজাতির কর্মক্ষেত্রে আত্মস্থ হয়।

(৩) নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে……এ কু-আশার। (স্তবক ৩)

এই অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি জীবনে মিথ্যা আশার প্রলোভনে যে বঞ্চনাভাগী হইয়াছিলেন, এই অংশে তাহারই খেদ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

রাত্রিতে ঘুমঘোরে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া মানুষ ক্ষণিকের সুখ পায়। কিন্তু জাগিয়াই কঠোর বাস্তবের সম্মুখে তাহার সকল স্বপ্নসুখ ভাঙিয়া যায়—তুলনায়

বাস্তব দুঃখটা তাহার বাড়িয়াই যায়। অন্ধকার পথে চক্ষু যখন দৃষ্টিকে মানাইয়া লইয়াছে তখন আকস্মিক-বিদ্যুৎচমক ক্ষণতরে পথটিকে স্পষ্টতর করিয়া দেয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আঁধারে পথ দ্বিগুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের সম্মুখে মরীচিকাও পিপাসাকে তীব্রতর করে মাত্র —তৃপ্তি দেয় না। মধুসূদনের জীবনের মোহাবেশও ঠিক সেইরূপ কুফল উৎপাদন করিয়াছিল। ইংরাজীভাষায় তিনি কখনও কখনও যেটুকু কবি-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু তাঁহাকে বিভ্রান্তই করিয়াছিল। সেই সুখ্যাতির মধ্যে যে আলোটুকু ঝলসিয়া উঠিত, তাহা তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহারই প্রবঞ্চনায় তিনি মিথ্যা মরীচিকার পশ্চাতে কেবলই বৃথা ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। অন্তরের পিপাসা তাঁহার মিটে নাই, স্বপ্ন তাঁহার স্থায়ী বাস্তব সত্যে পরিণত হয় নাই। তাই ব্যথাহত কবিচিত্ত সেই বিদেশী সাহিত্যের মোহপাশ হইতে মুক্তি চায়। নিজের দেশের ভাষায়, জাতীয় জীবনে কর্মে চাহেন তিনি স্ফূর্তি। এই অংশে কবির সেই বেদনাময় আকুতিটুকু অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(৪) প্রেমের নিগড়······পরাণ কাঁদে। (স্তবক ৪)

আলোচ্যমান অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুময় দাম্পত্যসুখের আশায় কবি প্রেমবন্ধন বরণ করিয়া অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি তাঁহার মনে যে তীব্র ধিক্কারপূর্ণ অনুশোচনার সৃষ্টি করে, এই অংশে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

মধুকবি মধুর দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন দেখিলেন ; তাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য তিনি প্রণয়িনীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সে সুখ সহিল না। পারিবারিক অশান্তি আসিয়া সেই দাম্পত্যসুখে বিচ্ছেদ টানিয়া দিল। মধুময় বন্ধন শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হইল। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে লুব্ধ করে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সে যেমন সেই অগ্নিশিখায় ঝাপাইয়া পড়ে, মধুসূদনও তেমনই তাঁহার জীবনের প্রথম প্রিয়ার প্রেম-আকর্ষণে লুব্ধ হন এবং তাহারই ফলস্বরূপ এক ঘোর অশান্তি আসিয়া তাঁহার মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। পতঙ্গ ভাবে অগ্নিশিখার মধ্যে পাইবে তাহার ঈপ্সিতাকে। মধুসূদনও ভাবিয়াছিলেন প্রিয়ার মধ্যে লাভ করিবেন পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের মধুরস। পতঙ্গের মতো পরিণামের প্রতি মধুসূদনও

লক্ষ্য রাখেন নাই। এই অনুশোচনার দিনে তাই তিনি পূর্বের সেই দুর্বুদ্ধিতার জন্য বিলাপ করিতেছেন। তখন যদি এই নিষ্ঠুর পরিণামের প্রতি সচেতন হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে আজ তাহাকে কাঁদিতে হইত না।

নিজেকে পতঙ্গের সহিত উপমিত করিয়া কবি তাঁহার এই আত্মবিলাপকে মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন।

[প্রেমের নিগড়, সাধে, জলন্ত পাবকশিখা, কাল-ফাঁদে—ইহাদের টীকা লেখ।]

(৫) বাকী কী রাখিলি ·····মন কেমনে? (স্তবক ৫)

আলোচ্যমান অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক সুবিখ্যাত কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বহু-আকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্যসুখের পরিপূর্ণতার জন্য কবি অর্থ-উপার্জনের বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও সে সুখের পরিবর্তে পাইয়াছিলেন পারিবারিক অশান্তি। তাহারই জন্য অনুশোচনা এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে অর্থ না হইলে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকে না। সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে তাঁহাকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। মধুর দাম্পত্যপ্রেমে যে সুখ লাভ করিয়া মানুষ ধন্য হয়, সেই সুখের জন্য তিনি কী না করিয়াছেন? কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া তাঁহার মানসিক অশান্তি বাড়াইয়া দিয়াছে। কবি তাঁহার একান্ত সাধটি সাধিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। আশাহত কবির এই অবস্থা একটা উপমার মধ্য দিয়া করুণতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার পদ্মফুল চয়ন করা, কিন্তু মৃণালকণ্টকে তাঁহার হাত ক্ষতবিক্ষত মাত্র হইয়া গেল, পুষ্পচয়ন আর হইল না। কবি সর্পের মস্তকস্থিত মণি আহরণ করিতে অগ্রসর হইলেন; সর্পদংশনে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, কেবল বিষের জ্বালায় হৃদয়-মন জ্বলিয়া গেল। পদ্মফুল এবং মণি বলিতে কবি তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্যসুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি এখন অপ্রাপণীয়কে না পাওয়ার ব্যথা এবং বেদনার অনুশোচনায় জর্জরিত। এই জ্বালা হইতে কিভাবে মুক্তি পাইবেন তাহাই তাঁহার মথিত চিত্তের প্রশ্ন; কারণ, এই বেদনার দুর্বহ স্মৃতি তিনি কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন না—থাকিয়া থাকিয়া উহা তাঁহাকে কেবলই পীড়া দেয়।

[বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, মৃণাল-কণ্টকগণে, নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(৬) যশোলাভ-লোভে……অনাহারে অনিদ্রায় ? (স্তবক ৬)

আলোচ্যমান পঙ্‌ক্তি কয়টি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। আবাল্য যে ঐকান্তিক কামনা তিনি পোষণ করিয়াছিলেন তাহার ব্যর্থতা এবং পরশ্রীকাতর সমালোচকের বিদ্রূপবাণে কবি কিরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন তাহারই অভিব্যক্তি এই অংশটি।

ইংরেজীভাষায় শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের অন্যতম হইবেন—ইহাই ছিল মধুসূদনের একান্ত আশা। কবিখ্যাতির প্রলোভনে তাই তিনি যে কত অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব নাই। তবু তাঁহার অলীক আশা অপূর্ণই থাকিয়া গিয়াছে--হইয়াছে কেবল অমূল্য জীবনেরই অপচয়। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য-সাধনা বর্জন করিয়া মধুসূদন যখন বাঙলাভাষাতেই তাঁহার সকল প্রচেষ্টা, সকল নিষ্ঠা কেন্দ্রস্থ করিলেন, তখনই রচিত হইল নূতন ছন্দে তাঁহার অমর কাব্যগুলি। গুণগ্রাহী সহৃদয় পাঠকগণ একদিকে যেমন ইহাদের প্রভূত প্রশংসা করিলেন, অন্যদিকে তেমনই প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ও ঈর্ষ্যাপরায়ণের রূঢ় বিরুদ্ধ সমালোচনাও কবিকে সহিতে হইল। কীট কুসুমের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আসে ফুলের মধ্যে, কিন্তু ফুলকে কাটিয়া নষ্ট করাই তাহার কাজ— ফুলের অনুপম গুণের পরিচয় সে জানেও না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করে না। তেমনই মধুকবির সমালোচকগণ মেঘনাদবধ কাব্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন—তাহার কাব্যরস পান করিবার জন্য নহে, বিরুদ্ধ সমালোচনার দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে। ইহাতে কবিচিত্ত যে বেদনা অনুভব করিয়াছে তাহা কীটের বিষদন্তের দংশনের মতোই জ্বালাকর। কবি মধুসূদন তাঁহাদের বিষদন্তের জ্বালায় জর্জরিত হইয়াছেন এইজাতীয় বিরুদ্ধ সমালোচনার মূলে অনেকটা সমালোচকদের আত্মম্ভরিতা বর্তমান ছিল। তাই কবি উহাকে 'মাৎসর্য-বিষদশন' বলিয়াছেন। যে প্রাণপাত পরিশ্রম তিনি তাঁহার কাব্যগুলির জন্য করিয়াছেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে কিনা কেবল লোকের অপযশ আর বিদ্রূপই কুড়াইতে হইল। ইহাই তাঁহার তীব্র ক্ষোভের কারণ।

(৭) মুকুতাফলের লোভে ……কুহক-ছলে ? (স্তবক ৭)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতার শেষাংশ। কবি কাব্যযশের মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়া জীবনের অমূল্য সময় অপব্যয়

করিয়াছেন। কিন্তু সেই যশ লাভ করিতে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহার অন্তরে অনুশোচনা জাগিয়াছে। এই অংশে কবির সেই হৃদয়-বেদনাই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

ডুবুরীরা সমুদ্রের তলদেশে অবতরণ করে মুক্তার সন্ধানে। তাহাদের এই দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কার্যের পুরস্কারস্বরূপ মিলে মুক্তা। কবি শত শত মুক্তার চেয়েও মূল্যবান্ আয়ু নষ্ট করিয়াছিলেন যশোমৌক্তিকের ব্যর্থ সন্ধানে। এইজন্য তাঁহার যে সুদীর্ঘ সময়ের অপচয় হয় তাহা যেন সময়-সাগরের গভীরতা-স্বরূপ, এবং যে শ্রম তিনি ইহার জন্য স্বীকার করেন তাহা ডুবুরীর বিপজ্জনক প্রয়াসের তুল্য। এত-সত্ত্বেও কিন্তু মধুসূদনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি শুধু জীবনেরই অপচয় করিয়াছেন। কে জানে সেই অপচয়ই তাঁহার জীবনকে দ্রুত পরিসমাপ্তির দিকে টানিয়া আনিবে কিনা। এই নৈরাশ্য কবির হৃদয়ে গভীর খেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

[মুকুতাফল, কালসিন্ধু-জলতলে, পামর, আশার কুহক-ছলে—এইগুলির উপর টীকা লেখ।]

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতার উপমাসমূহ মধুজীবনে যে আলোকসম্পাত করে তাহা নিজের ভাষায় আলোচনা কর।

উ.। মধুসূদন তাঁহার 'আত্মবিলাপে' জীবনের অজস্র ভুল ও তাহার নিষ্ঠুর শাস্তির জন্য গভীর খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। আবাল্য স্বপ্ন ছিল তাঁহার খাঁটি ইংরেজ বনিবার। সেই কামনার বশবর্তী হইয়া তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার, এমনকি মাতৃভাষা পর্যন্ত বর্জন করিয়াছিলেন। একদিন অবশ্য এ ভুল তাঁহার ভাঙিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জীবন তাঁহার দুর্বার গতিতে বহু-দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণটি হারাইয়া তাই তাঁহার মনে গভীর একটা আত্মধিক্কার জাগিয়া উঠিয়াছে। বয়সের সঙ্গে শক্তিরও হইয়াছে হ্রাস। ফুলের মতো আলোকোজ্জ্বল যৌবনটুকু তো চিরস্থায়ী নহে—তৃণদলে জলবিন্দুর ন্যায় বা জলমধ্যে বুদ্‌বুদের মতো অচিরেই হয় তাহার লয়। এই ধ্রুব সত্য সম্মুখে থাকিলেও কবির মোহঘোর কাটে নাই। যৌবনটা কাটিল তাঁহার

ইংরেজী সাহিত্যে কবিখ্যাতি লাভ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে। অবশ্য সময় সময় কিঞ্চিৎ খ্যাতি যে তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই এমন নহে। মান্দ্রাজের এডভোকেট জেনারেল জর্জ নর্টনের মতো গুণী ব্যক্তিও মধুসূদনের 'মহতী শক্তি ও সম্ভাবনা'র ('great power and promise') ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রশংসা, এই আশা আঁধার রাতে ক্ষণিকে বিদ্যুৎচমক বা অলীক স্বপ্নসুখের মতো অথবা মরুর বুকে মরীচিকার মতো কবিকে কেবল কুহকাচ্ছন্ন করিয়াছিল—সত্যপথের সন্ধান দেয় নাই। কবি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পান নাই, অদম্য তৃষ্ণার সে পথে নিবৃত্তি ঘটে নাই।

সাহিত্য-সাধনায় যেমন, দাম্পত্যজীবনেও তেমনি কবি কেবল ভুলের ধাঁধায় ঘুরপাক খাইয়াছেন। সৌন্দর্যের ভাস্বর দীপ্তি বলিয়া যাহাকে তিনি বরণ করিয়াছিলেন, তাহা যে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তাহা তিনি বুঝেন নাই। বুঝেন নাই প্রেমের মণি-চয়নে আছে ফণীর দংশন। দাম্পত্যসুখের শান্তি-শতদল তোলা হইল না, জুটিল কেবল বিচ্ছেদের কণ্টকজ্বালা। রেবেকা-নাম্নী নীলকর-দুহিতার সহিত পরিণয় কবির জীবনে এইরূপে ভীষণ বেদনার স্মৃতিটুকুই রাখিয়া যায়, অথচ এই পরিণয়কে সুখের করিতে কবি অর্থের জন্য কতই না উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া কবি মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহাতে শক্তিমান্ কবি হিসাবে একদিকে যেমন তাঁহার যশ প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি ঈর্ষ্যাপরায়ণ বিরুদ্ধ সমালোচকের বিদ্রূপদংশনও তাঁহাকে সহিতে হয় প্রচুর। সাহিত্য-সাধনায় জীবনব্যাপী অকুণ্ঠ অনবচ্ছিন্ন শ্রমের পরিবর্তে এই তিক্ত পুরস্কার কবিকে বড পীড়া দিত। যে অভ্রংলেহী উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার একান্ত লক্ষ্য ছিল অবিনশ্বর ও অনাবিল যশ। কিন্তু সে দুষ্কর সাধনায় জীবনের শুধু ঘটিল অপচয়—অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। অনন্ত কাল-সাগরে ডুব দিয়া মুক্তা তুলিবার সাধ তাঁহার পরিপূর্ণ হয় নাই। যে কাব্য, যে সাহিত্য রচনা করিয়া তিনি লোকোত্তীর্ণ মহিমা অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই অমূল্য সাহিত্য-মৌক্তিক তিনি লাভ করিলেন না। করিলেন শুধু তাহার প্রয়াসে জীবনেরই অপচয়। হয়তো বা এই চেষ্টাতেই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিবে। এ কথা স্মরণ করিয়া কবিচিত্ত গভীর ধিক্কারে মর্মরিয়া উঠে। আলোচ্যমান কবিতায় ছত্রে ছত্রে তাহারই অভিব্যক্তি নিষ্করুণ হইয়া আছে।

প্র. ২। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' এবং নবীনচন্দ্রের 'আশা' কবিতায় অভিব্যক্ত আশা-সম্বন্ধে মনোভঙ্গী দুইটির আলোচনা কর।

উ.। কবিতা জীবনের মর্মমূল হইতে উৎসারিত বাণী। সেইজন্যে মধুকবি ও নবীন সেনের কবিতায় দুইটি বিভিন্ন সুর শুনিতে পাই। মধুসূদনের 'আত্ম-বিলাপ' আশাহত ব্যথার জন্য, আর নবীন সেনের 'আশা' ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতার ভরসায়। একের পক্ষে তাই আশা কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়াছে, অপরের পক্ষে আশা-নৈরাশ্যের প্রশ্ন কখনই গুরুতর হইয়া উঠে নাই।

মধুকবির আশা ছিল অভ্রভেদী, নৈরাশ্যও সেইজন্য তাঁহার বিপুলই হইয়াছিল, এবং সেই খেদেই তিনি যে 'আত্মবিলাপ' করিয়াছেন তাহাতে আশার রূপ বড়ই সসীমময় হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি আর বিপুল অপচয় স্মরণ করিয়া মধুসূদন মোহগ্রস্ত মনের আশাকেই দায়ী করিয়াছেন। তাই আশা তাঁহার নিকট শুধু নেশাই নহে, কু-আশা। আশার মধ্যে ছলনা নবীন সেনও দেখিয়াছেন—তিনিও বলিয়াছেন 'আশা কুহকিনী'। কিন্তু মধুসূদনের মতো মর্ম দিয়া তিনি তাহা অনুভব করেন নাই। তাই আশার প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা অনাসক্ত ভাবুকের ; কিন্তু মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গী গভীর অনুভূতির।

আশা যে পৃথিবীকে কর্মচক্রে চিরচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে, ইহা উভয় কবি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন আশার মধ্যে কোনো শুভদা শক্তি দেখিতে পান নাই। তাঁহার নিকট আশা কেবল মরীচিকা। উহা মানুষকে কেবল ভুলের ধাঁধাতেই ঘুরপাক খাওয়ায়। এখানে কবি দুঃখবাদী। আত্মজীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি আশার মধ্যে কেবল নৈরাশ্যই দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে নবীনচন্দ্র মধুসূদনের ন্যায় এত বড় আশা করিতে জানিতেন না বলিয়াই বোধ হয় আশাকে দূর হইতে এমনভাবে কল্পনায় রাঙাইয়া চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন। আশা মানুষের পরম সম্বল। আশার অভাবে এ জগৎ জ্ঞানকর্মরহিত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত—ইহাই তাঁহার ধারণা। এ ধারণা কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত হইতে পায় নাই বলিয়াই বোধ হয় মায়াময় হইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই কবি নবীন সেন আশাকে শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেন নাই—উহাকে নিয়তির মর্যাদাও দিয়াছেন। 'পলাশীর যুদ্ধ'-রচনায় তাই তিনি আশার ধাতৃশক্তির

রূপার্থী হইয়াছেন এবং সমগ্রতঃ আশাকে তিনি প্রেরণাদাত্রী জগদ্ধাত্রীরূপেই কল্পনা করিয়াছেন।

স্পষ্টতঃই তাহা হইলে আশার প্রতি মধুকবির মনোভঙ্গী গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত, কিন্তু নবীন সেনের মনোভঙ্গী অনাসক্ত অভিজ্ঞতাহীন দ্রষ্টার। সেইজন্যই আশার প্রতি মধুকবির নৈরাশ্য এবং নবীন সেনের উচ্ছ্বাস।

প্র ৩। 'আত্মবিলাপ' কবিতার ভাববস্তু সংক্ষেপে নিজের ভাষার লিপিবদ্ধ কর।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ যশোলাভ = যশঃ + লাভ। পাবক = পৌ + অক।

সমাস ঃ জীবনপ্রবাহ—জীবনরূপ প্রবাহ (রূপক-কর্মধারয়)। কালসিন্ধু-পানে—কালরূপ সিন্ধু (রূপক-কর্মধারয়), তাহার পানে (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। আয়ুহীন—আয়ুর দ্বারা হীন (৩য়াতৎপুরুষ)। হীনবল—হীন হইয়াছে বল যাহার (বহুব্রীহি), সে। জীবন-উদ্যানে—জীবনরূপ উদ্যান (রূপক-কর্মধারয়), তাহাতে [এখানে সমস্তপদে সন্ধি করা হয় নাই, করিলে পদটি হইত 'জীবনোদ্যানে']। যৌবন-কুসুমভাতি—যৌবনরূপ কুসুম (রূপক-কর্মধারয়); তাহার ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। সদ্যঃপাতি—সদ্যঃপতিত হয় যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ; বানানে দীর্ঘ ঈ-কার অর্থাৎ 'সদ্যঃপাতী'ই আধুনিক রীতি)। ক্ষণপ্রভা—ক্ষণ ব্যাপিয়া প্রভা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা (স্ত্রীলিঙ্গ)। তৃষাক্লেশে—তৃষা অর্থাৎ তৃষাজনিত ক্লেশ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে পাবকশিখা-লোভে—পাবকের শিখা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার জন্য লোভ (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। মৃণালকণ্টকগণে—মৃণালস্থ কণ্টক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহাদের গণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। যশোলাভ লোভে—যশের লাভ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার জন্য লোভ (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। মাৎসর্য-বিষদশন—বিষযুক্ত দশন অর্থাৎ দন্ত (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); মাৎসর্যরূপ বিষদশন (রূপক-কর্মধারয়)। শতমুক্তাধিক—শত মুক্তা (দ্বিগু); তাহা অপেক্ষা অধিক (৫মীতৎপুরুষ)। কালসিন্ধুজলতলে—কালরূপ সিন্ধু (রূপক-কর্মধারয়); তাহার জল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার তল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। কাল-ফাঁদে—কাল অর্থাৎ ভয়ঙ্কর যে ফাঁদ (কর্মধারয়), তাহাতে।

সাধু গদ্য-রূপ : লভিনু—লাভ করিলাম। ধাঁধিতে (উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০)—ধাঁধাইতে। নাশে—নষ্ট (বা, নাশ) করে। পরান—প্রাণ। সাধিতে—সাধন করিতে। নারিলি (উ. মা. ১৯৬০)—পারিলি না। হরিতে—হরণ করিতে। দংশিল—দংশন করিল। ব্যয়িলি ব্যয় করিলি। কামড়ে (উ. মা. ১৯৬০)—কামড়ায়। লভিলি—লাভ করিলি।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : প্রমত্ত—প্র – মদ্ + ক্ত। জলন্ত—জল্ (সংস্কৃত ধাতু) + অন্ত (বাঙলা কৃৎ)। ব্যয়িলি—বি – অয়্ (সংস্কৃত ধাতু) + ইলি, অথবা, ব্যয় (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) + ইলি।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি (জটিল)—অম্বুবিম্বের অম্বুমুখে সদ্যঃপাতিত্বের কথা কে না জানে (সরল) ?—অম্বুবিম্বের অম্বুমুখে সদ্যঃপাতিত্বের কথা সকলেই জানে (নঞর্থ পরিহার করিয়া ; সরল)।

নিশার স্বপনসুখে সুখী যে, কী সুখ তার (জটিল) ?—নিশার স্বপনসুখে সুখীর কোনো সুখই নাই (নাস্ত্যর্থক ; সরল)।

ব্যাকরণগত টীকা : পোহাইবে—সংস্কৃত 'প্র – ভা' ধাতু (উপসর্গ-সমেত) হইতে উৎপন্ন বাঙলা 'পোহা' ধাতু ; পোহা + ইবে = পোহাইবে। সংস্কৃতমূল হইলেও বাঙলা ধাতুটি কিন্তু সাধিত নয়, মৌলিক বা সিদ্ধ।

ঝলমলে—'ঝলমল' বা 'ঝল্‌মল্' ধ্বন্যাত্মক শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট অধ্বনিবাচক শব্দ ; 'ঝলমল'-ই আ-প্রত্যয়যোগে ('ঝলমলা') ধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে : ঝলমলা + এ = ঝলমলায়, পদ্যে, 'ঝলমলে'।

সদ্যঃপাতি—'সমাস' দ্রষ্টব্য।

স্বপন, পরান, মুকুতা, যতনে—প্রত্যেকটিই স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ।

ব্যয়িলি—'প্রকৃতি-প্রত্যয়' দ্রষ্টব্য।

ধাঁধিতে—'ধাঁধা নামশব্দ ; এই 'ধাঁধা'-ই বিনা প্রত্যয়ে অথবা আ-প্রত্যয়যোগে ধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদ (ধাঁধাইতে > ধাঁধিতে) সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এটি নামধাতুর উদাহরণ।

নারিলি—নঞর্থক 'নার্' ধাতু (অর্থ—না পারা) + ইলি ; এটি নঞর্থ ক্রিয়ার উদাহরণ।

হরিতে—সংস্কৃত 'হৃ' ধাতু + ইতে। কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত ক্রিয়া।

দংশিল—সংস্কৃত 'দন্‌শ্‌' ধাতু+ইল। এইরূপ ক্রিয়াপদ বাঙলায় কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।

লভিলি—সংস্কৃত 'লভ্‌' ধাতু+ইলি : কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত ক্রিয়া।

লাভ—বাক্যের ক্রিয়া 'লভিলি' এবং কর্ম 'লাভ' একই 'লভ্‌' ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া এটি সমধাতুজ কর্ম। এইরূপ—'সাধ' (সাধিতে)।

বাক্য-রচনা : হীনবল : নীতিনিষ্ঠা হারাইয়া জাতি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে।

নিগড় : তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নিগড়ে ভারতবাসীর মন এবং রুচিকে বাঁধিয়া ফেলাই ছিল ইংরেজের আসল উদ্দেশ্য।

পামর : ইংরেজ আসিবার পূর্বে ভারতের আপামর জনসাধারণ কি অশিক্ষিত ছিল?

কারক ও বিভক্তি : নিশার 'স্বপনসুখে' সুখী (করণে-এ)। বাড়ায় মাত্র আঁধার 'পথিকে' ধাঁধিতে (কর্মে-এ)। ক্ষত মাত্র হাত তোর 'মৃণালকণ্টকগণে' (করণে-এ)। 'মুকুতাফলের' লোভে ডুবে রে অতল 'জলে' (প্রথমটিতে কারক নাই, নিমিত্তার্থে-এর দ্বিতীয়টিতে অধিকরণে-এ)।

দধীচির তনুত্যাগ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-পরিচয়—পাঠ্য-পুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর কবিদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। বস্তুতঃ জীবৎকালে তিনি মধুসূদন অপেক্ষাও অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, সেকালের রুচির সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছিল হেমচন্দ্রের কাব্য। পুরাতন রীতি তখন লোকের কাছে বিস্বাদ হইয়া আসিয়াছে। নূতনকে সর্বতোভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করিবার ক্ষমতা তখনও সুলভ হয় নাই। এমন দিনে হেমচন্দ্রের কাব্য কৃত্রিম ধারায় বাঁধা খাতে প্রবাহিত হইয়াও একটু নূতনত্বের স্বাদ বহন করিত। তাঁহার বাক্‌সম্ভার

ছিল সেকালের প্রচলিত লিখিতভাষার রীতি হইতে গৃহীত। এই হিসাবে তাঁহার কাব্য কিছুটা আধুনিকতার সমাদর পাইত। দ্বিতীয়তঃ, সেই তৎকালীন ভাষার মধ্যে যেসকল সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রচার হইয়াছিল সেইগুলি ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যে একটা গাম্ভীর্য আনয়ন করেন। ফলে প্রাঞ্জলতা ও গাম্ভীর্য এই দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার কাব্য বক্তৃতার সুর ফুটাইয়া তোলে। এইজন্য সেকালের লোক হেমচন্দ্রের কাব্যকে সহজেই সমাদর করিত। হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব কিন্তু স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা। ইহা ঠিক বীররসে অভিষিক্ত নহে, বরং একটু হতাশ কাঁদুনির সুরেই উহা একটু আর্দ্র। তবু সে কাব্যের আবেগে একটা আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল।

হেমচন্দ্রের কাব্যে পদলালিত্যের অভাব আছে একথা ঠিক বলা যায় না। ছন্দেও তাঁহার কিছু কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য অমিত্রাক্ষর পয়ারে তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার দক্ষতা ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার ছন্দে পরবর্তীকালের ছন্দযাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের 'নৈপুণ্যের পূর্বাভাস' আছে।

উৎস—আলোচ্যমান অংশটি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গ হইতে আংশিকভাবে উৎকলিত। মূলে ত্রয়োদশ সর্গের শেষাংশে দধীচির তনুত্যাগের বর্ণনা আছে। তাহারই মধ্যে মধ্যে কয়েকটি ছত্র পর্ষৎ-এর সংকলয়িত্রী বাদ দিয়াছেন।

নামকরণ—পাঠ্য কবিতাংশের বিষয়বস্তু অনুসারে সঙ্গতভাবেই শিরোনাম হইয়াছে। মূলে এই অংশের এই নাম নাই। ইহা 'পাঠ-সংকলন'-সংকলয়িতার প্রদত্ত। এই কবিতায় ইন্দ্রের উপস্থিতিতে দধীচির দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। প্রারম্ভে পরার্থপরতাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট নীতিকথা আছে। কিন্তু দধীচির আত্মত্যাগের প্রসঙ্গেই এসকল কথার অবতারণা। সেই প্রসঙ্গেই দধীচিকে ইন্দ্রের বরপ্রদান, সর্বশেষে দধীচির দেহরক্ষা। এইরূপে দেবকুলের উপকারার্থে দধীচি দেহত্যাগ করেন এবং সেই বিবরণই এই কবিতার বিষয় বলিয়া কবিতাটির শীর্ষনাম সার্থক, সঙ্গত।

সমালোচনা—দধীচি পরার্থে আত্মত্যাগের চিরন্তন আদর্শ। তাঁহার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীটি ভারতবাসীর সংস্কারে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত সঞ্চিত

আছে। সেইজন্য এই কবিতার বিষয়বস্তু একটি সহজ আবেদন বহন করে। পরার্থে আত্মবিসর্জনের মাহমা কবি এখানে বেশ আবেগের সহিত কীর্তন করিয়াছেন। তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দটি কিঞ্চিৎ দুর্বল। বস্তুতঃ উহা যুগ-প্রাচীন পয়ারেরই যেন মিলনবন্ধনমুক্ত গম্ভীর রূপ। ভাষায় ইহার প্রাঞ্জলতা আছে, ভাবেও ইহা স্বচ্ছ।

'বৃত্রসংহার'কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—মহাবীর বৃত্রাসুর মহাদেবের বরে এবং শিবের ত্রিশূল লাভ করিয়া দেবগণকে স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন এবং স্বয়ং স্বর্গের অধীশ্বর হইয়া বসেন। দেবরাজ ইন্দ্র সুমেরুপর্বতে গিয়া নিয়তির আরাধনা করিতে থাকেন, শচীদেবী নৈমিষারণ্যে অবস্থান করেন এবং দেবগণ পাতালে লুকাইয়া থাকেন। দানবরাজের পত্নী ঐন্দ্রিলা শচীর রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিজ দাসীত্বে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে অনুরোধ করিলে, দৈত্যরাজ পুত্র রুদ্রপীড়কে পাঠান শচীকে হরণ করিয়া আনিতে। রুদ্রপীড় নৈমিষারণ্যে গিয়া শচীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তাহাকে বাধা দেন। শেষে জয়ন্তকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রুদ্রপীড় শচীকে হরণ করিয়া আনে। এই সময় দেবতারা আর একবার বৃত্রকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এদিকে ইন্দ্র বহুদিন পরে নিয়তির আদেশে মহাদেবের নিকট গমন করেন। সেখানে তিনি শচীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হন। মহাদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া, দধীচি মুনির অস্থির সাহায্যে বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিয়া বৃত্রকে সংহার করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র দধীচির নিকট গেলে, ঋষিবর পরার্থে আত্মজীবন দান করেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করেন। এদিকে শচী দৈত্যভবনে বন্দিনীরূপে অবস্থান করেন। রুদ্রপীড়ের পত্নী ইন্দুবালা তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন ও সান্ত্বনা দান করিতেন। তাহা দেখিয়া ঐন্দ্রিলা পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও শচীকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি ও জয়ন্ত আসিয়া শচী ও ইন্দুবালাকে সুমেরুপর্বতে লইয়া যান। রমণীর উপর অত্যাচার করায় মহাদেব বৃত্রের উপর ক্রুদ্ধ হন। তারপর ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণ বৃত্রকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রুদ্রপীড় নিহত হয়। বৃত্রও নিজের উপর শিবের কোপ বুঝিতে পারেন। শেষে যুদ্ধে বজ্রাস্ত্রের প্রহারে বৃত্র নিহত হন এবং দেবগণ পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন।

সংক্ষিপ্তসার—দেবরাজ ইন্দ্র সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নিজকরে তাপস-শ্রেষ্ঠ দধীচির মস্তক স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন—হে ঋষিবর, তুমি সাধুশ্রেষ্ঠ, সাত্ত্বিক। সংসারে মানুষের যাহা কর্তব্য, তাহা একমাত্র তুমিই বুঝিয়াছ; তুমিই জীবের মোক্ষফলদায়ী কল্যাণপ্রদ জীবনব্রত সাধন করিয়াছ। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অপরের কল্যাণকর্মে সর্বদা আত্মনিয়োগ করাই মানুষের কর্তব্য। এই সত্য তুমিই বুঝিয়াছ এবং বুঝিয়া আজ তাহা পালন করিতেছ। নিষ্কাম তপস্বী তুমি, কোনো বরই তুমি প্রার্থনা কর নাই। তোমাকে কি বরই বা দিব। তোমার এই মহান্ আত্মত্যাগ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তোমার বংশেই একদিন মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্ম হইবে। তোমার এই পবিত্র বদরিকা-শ্রমের নাম তাঁহার সুকৃতির ফলে জগদ্বিখ্যাত হইয়া থাকিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্র মুনিবরের মুখে অপূর্ব শোভা লক্ষ্য করিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। দধীচির শিষ্যগণ সাশ্রুনেত্রে উচ্চকণ্ঠে চতুর্বেদগান এবং মধুর হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঋষি যোগাসনে বসিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন। ক্রমে চক্ষু দুইটি স্থির হইল, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইল, নাড়ীর স্পন্দনও থামিয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া ব্রহ্মতেজ এক অনুপম জ্যোতির আকারে বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইল। পাঞ্চজন্য-শঙ্খের গুরুগম্ভীর ধ্বনি আকাশ মুখরিত করিল, অবিরল পুষ্পবৃষ্টির ফলে ঋষির দেহ ফুলে ফুলে ঢাকিয়া গেল। দধীচি দেবকুলের কল্যাণের জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া; সম্মুখে গিয়া। **শচীপতি**—শচীর স্বামী দেবরাজ ইন্দ্র। শচী দানবরাজ পুলোমার কন্যা। **সহস্রলোচন**—ইন্দ্র। **তপোধন-শিরঃ**—তপস্বী দধীচির মস্তক। তপঃ (= তপস্যা) ধন যাহার সে তপোধন = ঋষি। স্পর্শি—স্পর্শ করিয়া। **সুকরকমলে**—পদ্মের ন্যায় সুন্দর হাতখানি দিয়া। হাত দিয়া মস্তক স্পর্শ করা হয় আশীর্বাদ করিবার সময়ে। **আকুলস্বরে**—আবেগমথিত কণ্ঠে। দেবকুলের কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগে সম্মতি দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। তাই তাঁহার কণ্ঠ 'আকুল'। **হরষ-বিষাদে**—হর্ষ এই কারণে যে, দধীচি নিজ দেহ দান করিয়া দেবগণের মহা উপকার সাধন করিতে যাইতেছেন; আর বিষাদ তাঁহার আসন্ন

বিয়োগ-সম্ভাবনায়। বাসব—ইন্দ্রের একটি নাম। সাধুশিরোরত্ন—সজ্জনদিগের মুকুটমণিস্বরূপ; সাধুদিগের অগ্রগণ্য। **সাত্ত্বিক**—সত্ত্বগুণময়। সত্ত্বগুণই প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) প্রথম ও প্রধান। জীবের সাধন—প্রাণীর অর্থাৎ মানুষের সাধনা বা কর্তব্য। **তুমিই……সাধন**—মানুষের সাধনা যে কি হওয়া উচিত, তাহা তুমিই সম্যক্ বুঝিয়াছ। জগতী-তলে—পৃথিবীতে। 'জগৎ' ও 'জগতী' দুইটি শব্দই সমার্থক। চিরমোক্ষফল-প্রদ—চিরকালের জন্য মুক্তির ফলদানকারী। নিত্যহিতকর—চিরন্তন মঙ্গল-বিধায়ক। **দ্রষ্টব্য ঃ** মূলের কয়েকটি ছত্র এখানে বর্জিত হইয়াছে। স্বার্থপরিহার—স্বার্থত্যাগ। অনুদিন—প্রতিদিন। পরহিতব্রত—পরের কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করা। ধর্ম—কর্তব্য। উদ্‌যাপিলে—পালন করিলে। নিষ্কাম তাপস—হে কামনাহীন তপস্বী। প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃকালে স্মরণের যোগ্য। **মহর্ষি দ্বৈপায়ন**—মহাভারত-রচয়িতা মহামুনি বেদব্যাস। যমুনাদ্বীপে জন্ম হওয়ায় ইনি দ্বৈপায়ন নাম প্রাপ্ত হন। **বদরিকাশ্রম**—ব্যাসদেবের আশ্রম। ইহা হিন্দুদের নিকট পুণ্যতীর্থ। **তব বংশে জনমি……পুণ্যভূমি-মাঝে**—তোমার বংশেই মহর্ষি ব্যাসের জন্ম হইবে এবং তিনি তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় তোমার পুণ্য আশ্রম বদরিকাশ্রমের নাম জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া যাইবেন। রোমাঞ্চতনু—রোমাঞ্চিতদেহ। নিরখি—দেখিয়া। বাষ্পাকুল—সাশ্রুনেত্র। **নিস্পন্দ ধমনী**—নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হইল। ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি। ব্রহ্মরন্ধ্র—ব্রহ্মতালু; মস্তকস্থিত ব্রহ্মের স্থিতির স্থানরূপ ছিদ্র। নিরুপম—তুলনাহীন। **পাঞ্চজন্য**—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র সমুদ্রস্থিত পঞ্চজন-নামক অসুরকে সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার অস্থি দিয়া এই শঙ্খ নির্মাণ করেন। এই কারণে ইহার নাম পাঞ্চজন্য। হরিশঙ্খ—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি। আসার = বৃষ্টি। মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি—মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে ঢাকিয়া দিয়া।

ব্যাখ্যা

(১) সাধুশিরোরত্ন ঋষি……নিত্য হিতকর! (পঙ্‌ক্তি ৫—৮)

এই অংশটি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য হইতে সংকলিত 'দধীচির তনুত্যাগ'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। ইহা দধীচির প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের সম্ভাষণ।

মহর্ষি দধীচি ছিলেন সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তিনি যেন সাধুগণের মস্তকের মুকুটখানির রত্নস্বরূপ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার মধ্যে সত্ত্বগুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পরার্থে উৎসর্গীকৃত ছিল তাঁহার প্রাণ। ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহাই জীবের চিরতরে মুক্তি প্রদান করে। জন্মমৃত্যু তথা ভবযন্ত্রণা হইতে জীবের মোক্ষ আসে এই সাধনার বলেই। পরার্থে আত্মত্যাগ এইভাবে ত্যাগীর পক্ষে যেমন, অপরের পক্ষেও তেমনি মঙ্গলপ্রদ। দধীচি এই সাধনার শুধু মর্মই উপলব্ধি করেন নাই, দেবগণের কল্যাণে দেহ বিসর্জন দিয়া সেই উপলব্ধিকে, সেই সাধনাকে সিদ্ধও করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দধীচিকে সেইজন্যই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

(২) কী বর অর্পিব আমি,……নরকূলে! (পঙ্‌ক্তি ১৩—১৫)

এই অংশটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দধীচির তনুত্যাগ'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। মহর্ষি দধীচি দেবগণের জন্য মৃত্যুবরণ করিতে উদ্যত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র আলোচ্য উক্তি করেন।

দধীচি স্বীয় অস্থি দান করিয়া ইন্দ্রের বজ্রের উপকরণ সরবরাহ করেন এবং সেই বজ্রে ইন্দ্র দেবকুলকে সমূহ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। এই মহৎ আত্মত্যাগের পশ্চাতে মহর্ষির কোনো কামনা ছিল না। পরার্থে আত্মবিসর্জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইহাই তিনি জানিতেন। সেই ধর্ম পালন করিলে তাঁহার কি লাভ, কি শুভ হইবে—সেকথা তাঁহার চিন্তায় কখনো স্থান পায় নাই; তিনি ছিলেন সর্বৈব কামনাহীন। তাই তিনি ইন্দ্রের নিকট কোনো বর প্রার্থনা করেন নাই। নিষ্কাম সাধনার ইহাই পরাকাষ্ঠা। দধীচির আত্মত্যাগ তাই জগতের অবিস্মরণীয় কীর্তি। দেবরাজ ইন্দ্র এখানে দধীচির সেই মহিমাই কীর্তন করিতেছেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। "শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ।"

—কোন্ ঋষিকুল কি শুনিলেন? কেন তাঁহারা 'হরষে', কেনই বা আবার 'বিষাদে' মুগ্ধ হইলেন?

উ.। এখানে মহর্ষি দধীচির আশ্রমবাসী ঋষিগণের কথাই হইতেছে।

ঋষিগণ মহর্ষি দধীচির আসন্ন আত্মবিসর্জনের মহিমা দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহাদের পরম বিষাদ উপস্থিত হইল—মুনিপ্রবরের সহিত চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আনন্দ হইল। কারণ, দধীচির আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয় কীর্তি। স্বয়ং দেবরাজ তাঁহার মহিমা উচ্ছ্বসিতভাবে কীর্তন করিতেছিলেন। ইহাতে দধীচির শিষ্যস্থানীয় ঋষিকুল আনন্দ ও গৌরব বোধ করিলেন।

এইরূপ হর্ষ-বিষাদের বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় চিত্তে সাম্য স্থাপিত হইল। ঋষিকুল অবর্ণনীয় এক উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাই তাঁহাদের মুগ্ধ অবস্থা।

প্র. ২। "তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী-তলে
চিরমোক্ষফলপ্রদ—নিত্যহিতকর !"

—এ-কথা কে কাহাকে কখন বলেন ? উল্লিখিত 'ব্রত'টি কি ? কেনই বা তাহাকে 'চিরমোক্ষফলপ্রদ', 'নিত্যহিতকর' বলা হইয়াছে ?

উ.। এ-কথা দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দধীচিকে বলিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবকুলের জন্য যখন দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তখনই দেবরাজ এইরূপ সম্ভাষণ করেন।

উল্লিখিত ব্রতটি হইল পরার্থে আত্মোৎসর্জনের ব্রত। মহর্ষি দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিলেন যাহাতে তাঁহার অস্থি দ্বারা ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হইতে পারে এবং যাহাতে তাহা দ্বারা অসুরপতি দুর্জয় বৃত্রের সংহার সম্ভব হয়। মহর্ষির এই আত্মত্যাগের মূলে নিজের কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা ছিল না। সুতরাং পরার্থে নিষ্কাম আত্মবিসর্জনই এই ব্রত।

এইরূপ নিষ্কাম সাধনা মানুষকে চিরতরে জীবনযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দেয় অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা উপকৃত ব্যক্তি যেমন, উপকারীও তেমনি হিত লাভ করে। কেন-না উপকারী চিরকালের জন্য জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে মুক্তি লাভ করে।

প্র. ৩। মহর্ষি দধীচির দেহত্যাগ ও তাহার মহিমা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ৪। মহর্ষি দধীচির দেহত্যাগের বিবরণটি সংক্ষেপে লিখিয়া কবিতাটির সম্বন্ধে মন্তব্য লেখ।

উ. **সংক্ষিপ্তসার ও সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ মহর্ষি=মহা+ঋষি। নিস্পন্দ=নিঃ+স্পন্দ। পুষ্পাসার=পুষ্প+আসার। তপোধন=তপঃ+ধন।

সমাস ঃ সহস্রলোচন—সহস্র লোচন যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। তপোধন-শিরঃ—তপঃ অর্থাৎ তপস্যা ধন যাঁহার (বহুব্রীহি) তিনি তপোধন; তাঁহার শিরঃ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। সুকরকমলে—কর কমলের ন্যায় (উপমিত-কর্মধারয়); সু (=শোভন) যে করকমল (প্রাদিতৎপুরুষ), তাহাতে। সাধুশিরোরত্ন—শিরের রত্ন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) বা শিরঃস্থিত রত্ন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); সাধুদের শিরোরত্ন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। চিরমোক্ষফলপ্রদ—মোক্ষরূপ ফল (রূপক-কর্মধারয়); তাহা প্রদান করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ); চির (-কাল ব্যাপিয়া) মোক্ষফলপ্রদ (২য়াতৎপুরুষ)। নিত্যহিতকর—হিত করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ); নিত্য হিতকর (সুপ্ সুপা)। স্বার্থপরিহার—স্ব অর্থাৎ নিজ অর্থ (কর্মধারয়); তাহার পরিহার (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। জীবকুল-কল্যাণসাধন—জীবদের কুল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার কল্যাণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার সাধন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। অনুদিন—দিনে দিনে (অব্যয়ীভাব)। পরহিতব্রত—পরের হিত (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহাই ব্রত (কর্মধারয়)। প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃ (=প্রাতঃকালে) স্মরণীয় (সুপ্ সুপা, বাঙলামতে ৭মীতৎপুরুষ)। রোমাঞ্চতনু—রোমের অর্থাৎ লোমের অঞ্চ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); রোমাঞ্চ তনুতে যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। মুনীন্দ্রমুখে—মুনিদের ইন্দ্র (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাঁহার মুখ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। তারস্বরে—তার অর্থাৎ উচ্চ স্বর (কর্মধারয়), তাহাতে। চতুর্বেদগান—চতুঃ অর্থাৎ চারিটি বেদ (কর্মধারয়—সংজ্ঞাবাচক); তাহার গান (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। নিরুপম—নিঃ (=নাই) উপমা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা।

সমস্তপদ-গঠন ঃ ধ্যানে মগ্ন=ধ্যানমগ্ন। দেবের মঙ্গলে=দেব-মঙ্গলে। আকুল স্বরে=আকুলস্বরে। মধুর গম্ভীর=মধুরগম্ভীর।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ সাত্ত্বিক—তামসিক। জীব—জড়। স্বার্থ—পরার্থ। নিষ্কাম—সকাম। সুকীর্তি—কুকীর্তি। নিরমল (নির্মল)—সমল (অপ্রচলিত), মলিন। নিশ্চল—সচল। শূন্য—পূর্ণ।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দঃ সাত্ত্বিক, স্বার্থপরিহার, অনুদিন, পরহিতব্রত, নিষ্কাম, প্রাতঃস্মরণীয়, বাষ্পাকুল, নিস্পন্দ, ব্রহ্মতেজ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ সাত্ত্বিক—সত্ত্ব+ঠক্ (ইক)। তাপস—তপঃ (তপস্)+ণ। দ্বৈপায়ন—'দ্বীপে জাত' এই অর্থে দ্বীপ+ফক্ (আয়ন)। পাঞ্চজন্য—পঞ্চজন (অসুরবিশেষ)+ষঞ্। উদ্‌যাপিলে—উদ্—যা+ণিচ্ (=যাপি)+ইলে (সামান্য অতীত, মধ্যমপুরুষ)।

সাধুগদ্য-রূপঃ অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া। স্পর্শি—স্পর্শ করিয়া। কহিলা—কহিলেন। হরষবিষাদে—হর্ষবিষাদে। বুঝিলা—বুঝিলে। সাধিলা—সাধন করিলে। উদ্‌যাপিলে—উদ্‌যাপন করিলে। অর্পিব—অর্পণ করিব। চাহিলা—চাহিলে। তব—তোমার। হবে—হইবে। জনমি—জন্মিয়া। জগতখ্যাত—জগৎখ্যাত। পুণ্যভূমি-মাঝে—পুণ্যভূমির মাঝে (বা, মধ্যে)। হইলা—হইলেন। নিরখি—নিরীক্ষণ করিয়া। নিরমল—নির্মল। আরম্ভিলা—আরম্ভ করিলেন। উচ্চে—উচ্চস্বরে বা উচ্চকণ্ঠে। মুদিলা—মুদিলেন। বাহিরিল—বাহির হইল। ফুটি—ফুটিয়া। ক্ষণে—ক্ষণেকের মধ্যে। উঠি—উঠিয়া। মিশাইল—মিশিল ('মিশাইল' প্রেরণার্থক, এখানে অপ্রেরণার্থক-রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে)। যুড়ি—যুড়িয়া। বরষিল—বর্ষণ করিল। আচ্ছাদি—আচ্ছাদন করিয়া। ত্যজিলা—ত্যাগ করিলেন।

অর্থগত পার্থক্যঃ বাসব—ইন্দ্র; বাসর—দিন। যুড়ি—ব্যাপ্ত করিয়া (যুড়িয়া); জুড়ি—দুই ঘোড়ার গাড়ি।

ব্যাকরণগত টীকাঃ হরষ (< হর্ষ), জনমি (< জন্মি), নিরমল (< নির্মল), বরষিল (<বর্ষিল)—সবগুলিই বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।

অগ্রসরি (< অগ্রসর—বিশেষণ), স্পর্শি (< স্পর্শ—বিশেষ্য), জনমি (< জন্ম—বিশেষ্য), আরম্ভিলা (< আরম্ভ—বিশেষ্য), বাহিরিল (< বাহির—বিশেষ্য)—সবগুলিই নামধাতুর উদাহরণ।

উদ্‌যাপিলে (উৎ—যাপি ধাতু), অর্পিব (অর্পি ধাতু), বরষিল (বৃষ ধাতু), আচ্ছাদি (ণিজন্ত আ-ছদ্ ধাতু), ত্যজিলা (ত্যজ্ ধাতু)—এগুলি সরাসরি সংস্কৃত ধাতু হইতে সৃষ্ট বাঙলা ক্রিয়া (নামধাতুজ ক্রিয়া নয়)। এইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র মাত্র পদ্য, গদ্যে এগুলি অচল।

বাজিল গম্ভীর পাঞ্চজন্য হরিশঙ্খ—কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ : 'হরিশঙ্খ'-কেই 'বাজিল' ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে হইতেছে, যদিও ইহা আসলে কর্ম—কেহ উহাকে বাজাইল। তুলনীয় : **"পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ"**—গীতা।

নিরখি—বাঙলা 'নিরখ্' (< সংস্কৃত নির্—ঈক্ষ্) ধাতু হইতে সৃষ্ট ক্রিয়া, কেবলমাত্র পদ্যে ব্যবহৃত।

কারক ও বিভক্তি : 'তপোধনশিরঃ' স্পর্শি 'সুকরকমলে' (প্রথমটিতে কর্মে শূন্য বিভক্তি, দ্বিতীয়ে করণে-এ)। প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে 'নরকুলে' (অধিকরণে-এ)। পুষ্পাসার বরষিল 'মুনীন্দ্রে' আচ্ছাদি (কর্মে-এ)। দধীচি ত্যজিলা 'তনু' দেবের মঙ্গলে (কর্মে শূন্য বিভক্তি)।

আশা

নবীনচন্দ্র সেন

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

নবীনচন্দ্র সেন মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব ও তাঁহার স্বকীয় ভাবোচ্ছ্বাস এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক অভিনব সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার কাব্য প্রকৃত গীতকবিতার রসমাধুর্যে অভিষিক্ত, তবে কখনো কখনো সংযমের অভাবে গীতি-কাব্যের বিশুদ্ধতা "নিরর্থ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে"। তথাপি বাঙলা সাহিত্যে তিনি যে অন্যতম প্রধান শক্তিশালী লেখক তাহাতে সন্দেহ নাই। নিছক সাহিত্যের বিচারে তাঁহার স্থান অতিশয় উচ্চে না হইলেও বাঙালী পাঠক-সাধারণের নিকট তিনি যে অতিশয় প্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে'র ন্যায় কাব্য বাঙালীর হৃদয় যেমন করিয়া আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল তেমন খুব অল্প কাব্যের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, স্বদেশের দুর্দশায় তীব্র বেদনাবোধ তাঁহার কাব্যে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্য আবেগপ্রধান। সময়ে সময়ে এই কারণে তাঁহার রচনায় শিল্পসংযমের অভাব ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীন-চন্দ্রও নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তিরসাতুর আবেগের আশ্রয় লইয়াছে। সম্ভবতঃ, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির প্রভাব ইহার মূলে রহিয়াছে।

উৎস ও রচনাকাল—আলোচ্যমান কবিতাটি কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'-নামক বিখ্যাত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে সংকলিত। 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর পাঠ্যরূপে এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ স্তবক নির্বাচিত হইয়াছে।

নামকরণ—এই কবিতায় আশার যাদুপ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। আশা মানুষকে কর্মে প্রেরণা দেয়। সকল সময়েই যে তাহা সার্থক হয় তাহা নহে। কখনো উহা মায়া-মরীচিকার মতো আমাদিগকে ব্যর্থতার মুখে ধাবিত করে, কখনো বা অবিনশ্বর কীর্তি-সঞ্চয়ে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। আশার এই ছলনাময়ী এবং প্রেরণাদায়িনী মূর্তিই এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। তাই মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর সংকলয়িতা ইহার শিরোনাম দিয়াছেন 'আশা'। বলা বাহুল্য, মূলে এই কবিতার স্তবকগুলি একটি বৃহৎ সর্গের অন্তর্গত এবং সেইজন্য উহাদের কোনো শিরোনাম নাই।

সমালোচনা—'আশা'-শিরোনামযুক্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের দীর্ঘ দ্বিতীয় সর্গের স্বল্পপরিসর বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ভাবের দিক্ হইতে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত—আশার স্বরূপবর্ণন, আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত "দীনতার প্রতিমূর্তি" "কাঙাল"-এর বর্ণনা, কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস। সর্গের প্রথমে আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় কাটোয়ার বৃটিশ-শিবিরের তথা বৃটিশের বীর্য-অহঙ্কারের সংক্ষিপ্ত অথচ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়া, আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন বৃটিশ সৈনিকের বেদনাময়ী স্মৃতির চিত্র আঁকিয়া কবি শেষে কোনো কোনো সৈনিকের কল্পনায় নবাব-বধ এবং নবাবের ঐশ্বর্যলুণ্ঠনের কথা বলিয়াছেন। পরেই আসিয়া গিয়াছে "ধন্য, আশা কুহকিনী!" ইহার সহিত পূর্বপ্রসঙ্গের বিশেষ সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। আশা কুহকিনী, আবার প্রেরণাময়ী—আশা মরীচিকালুব্ধ মৃগের মতো মানুষের সর্বনাশও যেমন করে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার প্রেরণাও তেমন দান করে। কিন্তু—

"..... তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি॥"

ইত্যাদি বলিয়া কবি যেভাবে আশার স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,

তাহাতে আশা ও নিয়তি যেন একাকার হইয়া গিয়াছে, হয়তো বা ভগবানেরও সমপর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে। নবীনচন্দ্রের

"নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে"

গীতার "ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" বা ভক্ত কবির "তোমার হাতের পুতুল আমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি" মনে করাইয়া দেয়।

"কঙ্কালশরীর", "অভাগা", "কাঙাল", বিশ্বের আলো যাহার কাছে নিভিয়া গিয়াছে, যাহার "চলে না চরণ", সেও আশার মন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া "পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে" বাহির হয়। এ চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসে কবি বহু অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি "দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ……মূঢ়মতি"—যে কাজ করিবার শক্তি তাঁহার নাই, তিনি তাহাই করিতে যাইতেছেন। "বঙ্গ-ইতিহাস……মণিপূর্ণ খনি"; কিন্তু কোনো পূর্বতন মহাকবির কল্পনায় সে খনি আলোকিত হয় নাই—নবীনচন্দ্র সেখান হইতে মণি সংগ্রহ করিবেন কেমন করিয়া, "অবিদ্ধ রতনে" মালা-ই বা রচনা করিবেন কেমন করিয়া? মহাকবি কালিদাস রঘুরাজগণের সুকঠিন বংশ-কথা লইয়া 'রঘুবংশ' মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন এই কারণে যে, পূর্বসূরিগণ তাঁহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা মণিতে ছিদ্র করিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই ছিদ্রপথে কল্পনার সূত্র পরাইয়া মহাকাব্যের মালা গাঁথিয়া কালিদাস সংস্কৃত-ভারতীর কণ্ঠে পরাইয়াছিলেন:

"অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥" (কালিদাস)

কিন্তু নবীনচন্দ্রের মণি যে 'অবিদ্ধ'! তবু মালা-গাঁথা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত, যদি তাঁহার থাকিত অলোকসামান্য কল্পনা। মাত্র 'দুরাশা' মানুষকে কবি করিতে পারে না। অথচ নবীনচন্দ্র দুরাশারই শরণাপন্ন হইয়াছেন—

"অতএব দয়া করি কহ, দয়াবতি!
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি?"

শ্রেষ্ঠ কবির সম্পদ্ লোকোত্তর প্রতিভা, সুদূরপ্রসারিণী কল্পনা এবং সর্বোপরি, বাগ্‌দেবীর কৃপা। উদ্ধৃত অংশটি মধুকবির অনুসরণে রচিত; কিন্তু মধুসূদন প্রার্থনা করিয়াছেন সরস্বতীর কাছে:

"কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবর বরি সেনাপতি-পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি ?.........
বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে
ভারতি !"

মধুসূদন কল্পনারও শরণাপন্ন হইয়াছেন—"তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা !"

নবীনচন্দ্র Byron-এর মতো উদ্দাম হৃদয়াবেগের কবি। এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার জয় এবং পরাজয় দুই-ই। কূটবিচারের পথে না গিয়া পাঠক যদি কবিচিত্তের তরঙ্গময় প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেন, তরঙ্গের আবর্তনে আবর্তনে, একপ্রকার অপূর্ব আনন্দই তিনি লাভ করিবেন। 'আশা'তেও এ লক্ষণ বর্তমান।

পরিশেষে আর একটি ত্রুটির কথা বলিতেছি—এ ত্রুটি কাব্যর নহে, মধ্য-শিক্ষাপর্ষৎ-এর। মূল কাব্যে আশাপ্রভাবিত রাজপথে কাঙালের, ধর্মাধিকরণে কেরানীর, পদাতিক সৈন্যের—দূরবর্তী বহু চিত্র আঁকিবার পর কবি "অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?" বলিয়াছেন ; সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে কিন্তু 'আশা' কবিতায় রাজপথে কাঙালের কথার পরেই "অথবা সুদূরে কেন......" কিছু খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার—আশার কুহকে মানুষের মন মুগ্ধ, ত্রিভুবন মুগ্ধ, বিধাতা যদি এই আশা সৃষ্টি না করিতেন, তবে মানুষের দুর্বল মন শোক, দুঃখ, ভয়, ব্যর্থ প্রণয় প্রভৃতির দুর্বিষহ চাপে ভাঙিয়া পড়িত। এরূপ উদ্বিগ্ন ও সদাচঞ্চল মানবমনটি তখন সমশাস্ত্র জ্ঞানের আধার হইতে পারিত না—উহা তখন উন্মত্ততায় ছন্নছাড়া হইয়া যাইত। আশা আছে তাই রক্ষা। আশার মায়ায় সংসার-চক্র প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে, আশা না থাকিলে এই গতি স্তব্ধ হইয়া যাইত। সাংসারিক মানুষ ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অন্ধ, তবু আশার ছলনায় কর্মক্ষেত্রে সে ঘুরিয়া মরিতেছে। দক্ষ বাজিকর যেমন পুতুল নাচায়, আশাও মূর্খ মানুষকে তেমনই নাচাইয়া থাকে।

রাজপথের ধারে জীর্ণবাস কঙ্কালসার ভিক্ষুক বসিয়া আছে, তিন প্রহর ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহার ক্ষুধা মিটিবে না। অসুস্থ সে, চলিবার শক্তি প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, তবু সে আবার বাহির হইল ক্ষুধার অন্ন মিলিবে এই ভরসায়! এমনই আশার কুহক!

কবি নিজেও আশার মন্ত্রে মুগ্ধ। তাই রত্নপরিপূর্ণ বঙ্গ-ইতিহাসের যে কাহিনী কোনো কবি-কল্পনায় রূপান্তরিত হয় নাই, তাহা লইয়া কাব্য রচনা করিতে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বঙ্গের ইতিহাসে যে কাহিনীটি আজিও তমসাচ্ছন্ন, তাহাকে আলোকিত করিতে পারে একমাত্র শক্তিমতী প্রতিভা। কিন্তু কবি তাঁহার ক্ষুদ্র কল্পনাবলেই সে কার্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাও আশার ছলনা। সুকবি-রচিত কাব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বাঙলা ভাষা। কি ভাবে তিনি উহার সৌন্দর্যবর্ধন করিবেন তাহাই তাঁহার সমস্যা। তিনি জানেন কত ক্ষুদ্র মানব আশার বলেই অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তাই তাঁহার আশা তিনিও হয়তো বা পূর্ণমনস্কাম হইতে পারিবেন।

মর্মার্থ—আশা মানবের একটি চিরন্তন অবলম্বন। সকলেই এই আশার অমোঘ মন্ত্রে বশীভূত। আশা না থাকিলে বাস্তব জগতের ব্যথা-বেদনা ও তাহার জন্য দুশ্চিন্তা মানুষকে পাগল করিয়া ফেলিত, তাহার অন্তর হইতে জ্ঞানের হইত তিরোভাব। আশার ইন্দ্রজাল আছে বলিয়াই এই অসার সংসারেও মানুষ নিয়ত কর্মচঞ্চল হইয়া আছে। ইহা একদিকে যেমন মানুষকে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অন্ধতা আনিয়া দিয়া বিভ্রান্ত করে, অন্যদিকে তেমন দুর্বলের মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে কর্মে নিয়োজিত করে। আশাকে অবলম্বন করিয়াই অনেক অল্পশক্তি মানব নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

কুহকিনি—('কুহকিনী' শব্দের সম্বোধনে 'কুহকিনি' হইয়াছে)—হে মায়াবিনী! আশা মানুষের নিকট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তোলে। সে সম্ভাবনা সকল সময় পূর্ণ হয় না; না হইলেও মানুষ কর্মপ্রেরণা লাভ করে। তাই আশাকে কুহকিনী বলা হইয়াছে। আশা যেন মানুষকে

ভুলাইয়া কর্মে তৎপর করে। তোমার মায়ায়—আশার ছলনায়।**মুগ্ধমানবের মন**—আশায় মানুষের মন ভুলিয়া থাকে। মুগ্ধ—মোহপ্রাপ্ত। **মুগ্ধ ত্রিভুবন**—ত্রিজগতের অধিবাসীরা আশা লইয়াই বাঁচিয়া আছে। জগতের দুঃখবেদনা, শোক-তাপ ও অসাফল্যের মধ্যে মানুষ এই আশার অবলম্বনেই জীবনধারণ করে। এ আশা মিথ্যাও হয়, তবু ইহার প্রভাবে মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া হাসে, খেলে, কর্মে লিপ্ত হয়। **দুর্বল মানব-মনোমন্দিরে**—মানুষের মনটি যেন একটি মন্দির (উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—জ্ঞান। কবি একথা পরেই বলিয়াছেন)। মানুষ দুর্বল, তার মনটি ততোধিক ভঙ্গুর। তাই শোক-তাপ-ভয় ও দুঃখের চাপে তাহা সহজে নুইয়া পড়ে। সৃজিত—সৃষ্টি করিত। বিধি—ভগবান্, বিধাতা। অনুক্ষণ—সর্বদা। বিরাজিতে—বর্তমান থাকিতে। **নিরাশ-প্রণয়**—হতাশাপূর্ণ প্রণয়, ব্যর্থ ভালোবাসা, যে প্রণয় মিলনে সার্থক হয় না। **চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র**—দুর্ভাবনারূপ অভাবনীয় অস্ত্র। ভাবিতে ভাবিতে মানুষের মনে যে সকল অচিন্তিতপূর্ব এবং অভাবনীয় দুশ্চিন্তা উদিত হয়, উহারা যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। **চিন্তার অচিন্ত্য…মনমন্দির-শোভা**—দুশ্চিন্তা হইতে যে সকল তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো মানসিক পীড়া উদ্ভুত হয়, তাহারা মনরূপ মন্দিরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত যদি সেই মনে আশা না থাকিত। মনরূপ মন্দিরকে শক্তি দিয়া আশাই যেন টিকাইয়া রাখিয়াছে। মনের সৌন্দর্য আশারই কৃপায় অব্যাহত আছে। **অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী**—মনরূপ মন্দিরের বিগ্রহ জ্ঞানরূপিণী দেবী। **পলাত নিশ্চয় আবাস**—আশা না থাকিলে মন শোক-দুঃখ-ভয় প্রভৃতির প্রভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিত। সেই অবস্থায় মানুষের মনে জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।..আশা না থাকিলে মনোমন্দির হইতে এই জ্ঞানের বিগ্রহ বিদায়গ্রহণ করিত। **উন্মত্ততা ব্যাঘ্র-রূপে করিত নিবাস**—আশার অভাবে মানুষের মন শোক-দুঃখ-ভয়ে পাগল হইয়া যাইত। মত্ততা বাঘেরই মতো চঞ্চল ও উগ্র। মনরূপ মন্দিরে আশার অভাবে জ্ঞানের অধিষ্ঠান সম্ভব নহে—আশাহীন মন গহন অরণ্যের মতো; উহা বাঘেরই সমধর্মী মত্ততার আবাসযোগ্য।

দ্বিতীয় স্তবক

তোমার মায়ায়—তোমার (আশার) যাদুপ্রভাবে। **অসার সংসারচক্র**—কর্মচঞ্চল এই পৃথিবী যেন একটি নিয়ত ঘূর্ণমান চাকা। চাকা যেমন আপন

অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়, সংসারও তেমন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে সর্বদা ঘুরিতেছে। কিন্তু এ গতি নিরর্থক। তবু যে তাহা চলে সেইটাই আশার যাদু। অংশটি যেভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাকে 'অসার'কে 'সংসার'-এর বিশেষণ বলা কঠিন। অবশ্য সংসাররূপ চক্রকে অসার বলিলে সংসারই যে অসার তাহা বুঝা যায়। নিরবধি—সর্বদা। **মন্ত্রবলে…যদি**—আশা যদি তাহার যাদুবলে সংসাররূপ চক্র না ঘুরাইত। 'মন্ত্র' কথাটির একটি অর্থ (তন্ত্রোক্ত) বশীকরণ-বাক্য ; এখানে বশীকরণ-প্রভাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। **ভবিষ্যৎ-অন্ধ**—ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অন্ধ ; যে ভবিষ্যতে কি হইবে না-হইবে দেখিতে পায় না। মূঢ়—মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞান। বর্তুল-আকার—বৃত্তাকারে, গোলকের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া। **ভবিষ্যৎ-অন্ধ বর্তুল-আকার**—অজ্ঞান মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ জানে না; আশার প্রেরণায় সে কেবল গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায়। **ইন্দ্রজাল**—মায়া, কুহক। তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ—তোমার যাদুপ্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া। যুঝিতেছে—যুদ্ধ করিতেছে। **পেয়ে তব বল** ইত্যাদি—জীবন-সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক হইবার উপযুক্ত নিজস্ব শক্তি তাহাদের নাই, তবু আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে; আশাই দুর্বলকে বল দিয়া দ্বন্দ্বসংঘাতময় পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে। অনিবার—নিরন্তর, সর্বদা। দক্ষ—নিপুণ, কৌশলী। বাজিকর—পুতুল-নাচওয়ালা। **অর্বাচীন**—নির্বোধ, অপরিণতবুদ্ধি। **নাচায় পুতুল…অর্বাচীন নরে**—নিপুণ বাজিকর আড়াল হইতে সুতা টানিয়া নিষ্প্রাণ পুতুলকে দিয়াও এমন অঙ্গভঙ্গী করায় যাহা প্রাণবানের পক্ষেই সম্ভব। তেমনি আশা মনের গোপনে থাকিয়া নির্বোধ মানুষকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লয়—আশার ছলনায় ভুলিয়া মানুষ উল্লাসে যেন কলের পুতুলের মতোই নাচিতে থাকে। পুতুলনাচের পুতুল দর্শকের মন মুগ্ধ করিতে পারিলেও তাহার নিজস্ব কৃতিত্ব বলিতে কিছুই নাই, তেমনি দুঃখজর্জরিত মানুষ যে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় জীবনযুদ্ধে রত হয় তাহাতেও তাহার কৃতিত্ব নাই—সে কেবল অভিনেতামাত্র। মানুষ মূর্খ বলিয়াই আশার নিকট আত্মসমর্পণ করে।

তৃতীয় স্তবক

কাঙাল—দরিদ্র ভিখারী। **দীনতার প্রতিমূর্তি**—মূর্তিমান্ দৈন্য ; দৈন্য যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছে। কঙ্কাল-শরীর—অস্থিচর্মসার দেহ। জীর্ণ

পরিধেয় বস্ত্র—পরনের কাপড়খানি শতচ্ছিন্ন। **দুর্গন্ধ-আধার**—দুর্গন্ধের উৎস। এই দুর্গন্ধের উৎস ভিখারী স্বয়ং বা তাহার পরিধেয় ছিন্ন, মলিন ও দুর্গন্ধময় বস্ত্র। তাহার দেহ অপরিচ্ছন্ন, তাই তাহা হইতেও দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। অতএব সে দুর্গন্ধের আধার। **দু নয়নে অভাগার** ইত্যাদি—হতভাগ্যের দুই চক্ষু বাহিয়া নামিতেছে অশ্রুধারা। **এ তিন প্রহর**—সকাল হইতে বেলা প্রায় তিনটা পর্যন্ত। এক প্রহর প্রায় তিন ঘণ্টার সমান। **জঠর-অনল**—পেটের ক্ষুধা। প্রচণ্ড ক্ষুধাকে প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। **তাহে জঠর-অনল** ইত্যাদি—তাহা এতই অল্প যে, তাহা দিয়া তাহার ক্ষুধাশান্তি হইতে পারে না। **রুগ্‌ণ কলেবর**—দেহ রোগগ্রস্ত। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে নানারূপ রোগ আসিয়া ভিখারীর দেহে বাসা বাঁধিয়াছে। **চলে না চরণ**—দুর্বল পা দুইটি আর চলিতে চাহে না। **চক্ষে ঘোরে ধরাতল**—চলিতে গেলে দুর্বলতার ফলে ভির্মি লাগিয়া যায়, মনে করে সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুরিতেছে। **কী মন্ত্র কহিলে তুমি** ইত্যাদি—তুমি (আশা) যেন এমন এক গোপন মন্ত্র তাহার কানে কানে বলিয়া দিলে যাহার ফলে হতভাগ্য দুর্বল অবসন্ন ভিখারী নূতন শক্তি লাভ করিয়া আবার ভিক্ষার সন্ধানে চলিল। তোমার এই গোপন ইঙ্গিত না পাইলে সে উঠিতেই পারিত না।

চতুর্থ স্তবক

অথবা সুদূরে কেন ইত্যাদি—আশার মোহিনী শক্তি মানুষকে নূতন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বেশীদূর গিয়া লাভ কি? কবি নিজেই ইহার প্রকৃত প্রমাণ। **লক্ষণীয়ঃ** ইহার পূর্বে তিনটি স্তবক মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর সংকলয়িতা বাদ দিয়াছেন। কাজেই এই অংশটি সঙ্গতি হারাইয়া যেন কতকটা খাপছাড়া (abrupt) হইয়া পড়িয়াছে। **দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ** ইত্যাদি—নির্বোধ কবি নিজেই আশার বশীকরণ-মন্ত্রে বশীভূত। **নতুবা যে পথে…মম গতি?**—তাহা না হইলে ইতিহাসের যে কাহিনীকে উপজীব্য করিয়া কোনো কবির কাব্য রূপায়িত হইয়া উঠে নাই, তাহাই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু হইবে কেন? সম্পূর্ণ নূতন পথে তাঁহার কল্পনা ধাবিত হইবে কেন? **বঙ্গ-ইতিহাস** ইত্যাদি—খনির গর্ভে থাকে মহামূল্য রত্ন, কিন্তু রত্নের আধার হইয়াও খনি চিরান্ধকারে আবৃত—চন্দ্র-সূর্যের আলোক সেখানে

প্রবেশ করিতে পারে না। তেমনি বাঙলার ইতিহাসের তিমির গহ্বরে এমন অপূর্ব কাহিনী আছে, শৌর্য-বীর্য ও আত্মত্যাগের এমন জলন্ত নিদর্শন আছে যাহা মণির মতো অমূল্য হইয়াও সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে। **কবির কল্পনালোকে…নহে যা**—বাঙলার যে বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস কোনো কবির কল্পনার সন্ধানী আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। ইংরেজ কবি Wordsworth কবির কার্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন : "to add the light that never was on sea or land"—পুরাতন চিরকালদৃষ্ট বস্তুকে নূতন আলোকে মণ্ডিত করিয়া দেখানোই কবির কাজ এবং এ কাজ তিনি কল্পনার সাহায্যেই করিয়া থাকেন। **কেমনে আমি…করি প্রকাশিত ?**—আমি ক্ষুদ্র কবি, তাই কল্পনাও আমার ক্ষীণ। তাহারই দুর্বল অস্পষ্ট আলোকে বাঙলার ইতিহাসের অন্ধকার ভেদ করিয়া আমি আদর্শ বীরদিগকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিব কেমন করিয়া? আলোকে—আলোকিত করে। তিমিরা রজনী—অন্ধকারময়ী রাত্রি। উজলে ধরণী—(নৈশ অন্ধকারে , আচ্ছন্ন) পৃথিবীকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করে। **না আলোকে যদি…উজলে ধরণী**—নৈশ আকাশে চাঁদ না থাকিলে লক্ষকোটি তারকার ক্ষুদ্র আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয় না ; সেইরূপ বাঙলার বিখ্যাত কবিগণের কল্পনার উজ্জ্বল ছটায় যে কাহিনী আলোকিত হইয়া উঠে নাই—যাহাকে লইয়া পূর্বের কোনো কবিই কাব্য রচনা করেন নাই—তাহাকে আলোকিত করা ক্ষুদ্র কবি নবীনচন্দ্রের সাধ্যাতীত। সে লোকোত্তর প্রতিভা তাঁহার নাই। কিন্তু চন্দ্রবিহীন রাত্রিতে নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকেরও একটা সার্থকতা আছে। কবিরও তাই আশা—ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে নিষ্ফল হইবে না। পূর্ব পূর্ব মহাকবিগণের তুলনায় নিজের প্রতিভার দৈন্য স্বীকার করিয়া কবি এখানে বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম স্তবক

কোন্ পুণ্যবলে—কোন্ সুকৃতের প্রভাবে। **সেই খনির ভিতরে প্রবেশি'**—বঙ্গ-ইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়া। **অবিদ্ধ রতনে**—বিদ্ধ করা হয় নাই এরূপ রত্নে, আচ্ছাদিত রত্নে। বিদ্ধ না করিলে তাহা দিয়া মালা গাঁথা যায় না। এক্ষেত্রে যে অপূর্ব কাহিনীকে কোনো কবি কাব্যরূপে প্রকাশ করেন নাই 'অবিদ্ধ রতন'। তুলনীয় :

"অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥
—কালিদাস ('রঘুবংশ')

পূর্বসূরিগণ এই বংশের (রঘুরাজগণের বংশের) বাক্যরূপ দ্বার রচনা করিয়া গিয়াছেন। বজ্রের দ্বারা বিদ্ধ মণির মধ্যে সূত্র যেমন (অনায়াসে) প্রবেশ করে, (এই বংশে) আমার প্রবেশও সেইরূপ। 'সমালোচনা' দেখ। **মাতৃভাষা-কম-কলেবরে**—মাতৃভাষারূপিণী দেবীর কমনীয় দেহে (কণ্ঠে)। **গাঁথিয়া মালা···কম-কলেবরে**—তমসাচ্ছন্ন বঙ্গ-ইতিহাসের যে অপূর্ব কাহিনী লইয়া কোনো কবি কাব্য সৃষ্টি করেন নাই, তাহাকেই কাব্যে রূপায়িত করিয়া মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষার সৌন্দর্যবর্ধন করিব। রত্নহার যেমন নারীর কণ্ঠের তথা দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কাব্যও তেমনি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। **সুকবি-সুকরে**—লোকোত্তর প্রতিভাশালী কবির নিপুণ হস্তে। 'সুকবি' বলিতে নবীনচন্দ্র এখানে তাঁহার গুরু মধুসূদনকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। **মহাকাব্য-ধনে**—মহাকাব্যরূপ অলঙ্কার। এখানে সম্ভবতঃ 'মেঘনাদবধ'ই-লক্ষ্য। বরবপুঃ—দিব্য অঙ্গ, অপূর্ব দেহ। **সুকবি-সুকরে······বরবপুঃ**—অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিমান্ কবি নিপুণ হস্তে মহাকাব্যরূপ মালা গাঁথিয়া যে বরতনু (মাতৃভাষার) মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র নর—অল্পশক্তি কবি। ধরি পদছায়া তব—তোমার চরণ আশ্রয় করিয়া। এ মর ধরায়—এই নশ্বর পৃথিবীতে। **কত ক্ষুদ্র নর···মর ধরায়**—আশাকে অবলম্বন করিয়া আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই নশ্বর পৃথিবীতে কত ক্ষুদ্রশক্তি কবি অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। কবিরও তাই আশা—প্রতিভার দৈন্য সত্ত্বেও তিনি অমর খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন। প্রতিভা না থাকিলেও লোকে কেবলমাত্র আশাকে অবলম্বন করিয়া জগতে অমর কবিখ্যাতির অধিকারী হইয়াছে—একথা সত্য নয়। দয়াবতি—হে দয়াশীল আশা। **কী চিত্রে রঞ্জিছ**—কি রঙে রাঙাইতেছ, কোন্ রূপে আমার চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছ। শ্বেত-সেনাপতি—ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইবকে। কী চিত্রে···শ্বেত-সেনাপতি?—ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইবকে আজ তুমি কি বেশে আমার তথা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছ? **লক্ষণীয়ঃ** নবীনচন্দ্র সম্বোধন করিয়াছেন আশাকে, কিন্তু যে কাজ তাহাকে দিয়া করাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কল্পনার—

আশার নয়। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে এখানে আশা ও কল্পনা এক হইয়া গিয়াছে। 'সমালোচনা' দেখ।

ব্যাখ্যা

(১) শোক, দুঃখ……মনোমন্দির-শোভা। (স্তবক ১)

আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। আশার কুহকে মানুষের মন মুগ্ধ, আশা না থাকিলে মানুষের মনের কি অবস্থা ঘটিত তাহারই কথা কবি এখানে বলিতেছেন।

মানুষের মন স্বভাবতঃই দুর্বল, সামান্য আঘাতেই তাহা ভাঙিয়া পড়ে। প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোক, না পাওয়া এবং পাইয়া হারানোর দুঃখ, ঐহিক এবং পারত্রিক ভীতি, ব্যর্থ-প্রণয়ের বেদনা প্রভৃতি চিন্তনীয় বা অচিন্তনীয় ব্যথা প্রতিনিয়ত মনকে আঘাত দিতেছে। মন যেন একটি মন্দির। মন্দির কুসুমে অলঙ্কৃত, চন্দনে চর্চিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত ; মনও তেমনি সুকুমার ভাবরাশিতে পূর্ণ, সুরে তানে সঙ্গীতময়। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে মন্দিরের পাষাণ-প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়ে। দুশ্চিন্তারূপ অস্ত্রের আঘাতেও তেমনি মনরূপ মন্দিরটি ভাঙিয়া পড়িত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ব্যথা-বেদনা-সংঘাতের মধ্যেও মনের স্বাভাবিকত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, আশাই তাহাকে পুরাতন দুঃখবেদনা ভুলাইয়া নূতন সুখের সন্ধান করিবার শক্তি প্রদান করে। যতই দুঃখবেদনা আসিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলুক না কেন, তাহা পুনরায় নূতন সুখের সন্ধান করে ; ইহাই আশার কুহক। মনের মধ্যে সুখপ্রাপ্তির এই আশা যদি না থাকিত তবে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিত এবং স্রষ্টার সৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া যাইত। বিধাতাপুরুষ যেন এই উদ্দেশ্যেই মনের মধ্যে আশার স্থান করিয়া দিয়াছেন।

(২) পলাত নিশ্চয়……করিত নিবাস। (স্তবক ১)

এই অংশটি কবি নবীনচন্দ্রের 'আশা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। আশার অভাবে মানবমনের কি শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে তাহাই আলোচ্যমান অংশের বর্ণনীয়।

মানবমন একটি মন্দিরস্বরূপ। কুসুমকোমল নানাপ্রকার ভাবরাশিতে তাহা পূর্ণ। জ্ঞান-রূপিণী দেবমূর্তি তাহার বিগ্রহ। আশা না থাকিলে দুঃখ-দুশ্চিন্তা

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় এই মন্দিরের ধৈর্যরূপ প্রাচীর ভাঙিয়া দিত। জ্ঞানদেবীর অন্তর্ধান হইত অনিবার্য। জ্ঞানবুদ্ধিহীন মানবমনের অবস্থা তখন গহন অরণ্যের বিভীষিকা পরিগ্রহ করিত। পরিত্যক্ত ভাঙা দেউলে যেমন বনের পশু বাসা বাঁধে, মনের বিধ্বস্ত মন্দিরেও তেমনি তখন পশুবৃত্তিগুলির প্রাদুর্ভাব ঘটিত। হিংস্র বাঘের মতো যে মত্ততার আধি, তাহা তখন মনে জুড়িয়া বসিত। মানুষ মতিচ্ছন্ন উন্মাদ হইয়া যাইত।

(৩) দাঁড়াইতে স্থিরভাবে……না ঘুরাতে যদি ! (স্তবক ২)

আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংসার যে আশার বশেই চলিয়া থাকে, কবি এখানে সেই কথাই বলিতে চান।

চালকের ইঙ্গিতেই যেন সংসারচক্র সচলতা লাভ করে, আবার চালকের অভাবে চক্রঘূর্ণনও স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সংসার চক্রবিশেষ, আশা-ই যেন মন্ত্রবলে তাহা চালনা করে। মনের মধ্যে আশা না থাকিলে এই অসার সংসারের গতিও থামিয়া যাইত। সংসারে নিত্য শোকদুঃখের আসা-যাওয়া। সেই ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত চিত্ত যদি ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন না দেখে তাহা হইলে তাহার সক্রিয় থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার এই মহান্ সৃষ্টিকে অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করে আশা। যতই দুঃখবেদনা আসুক না কেন, আশা নিত্যনূতন সুখের সম্ভাবনা সূচিত করে—ইহাই যেন আশার মন্ত্রের প্রভাব। সেইজন্য এখানে আশাকে সংসারচক্রের পরিচালকরূপে কল্পনা করা সার্থক হইয়াছে।

(৪) ভবিষ্যৎ-অন্ধ……হায় ! অনিবার। (স্তবক ২)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা'-শীর্ষক কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি এখানে মানবমনে আশার প্রভাবের কথা বলিতেছেন।

আশা কুহকিনী, তাহার সৃষ্ট মায়াজালে মানুষের মন আবদ্ধ। এ-সংসার গোলকধাঁধার মতো, মানুষ ইহার মধ্যে বৃথাই ঘুরপাক খায়। নূতন সুখের আশায় ভাবে সে আগাইয়া গেল, কিন্তু পরেই দেখে ঘুরিয়া-ফিরিয়া যে দুঃখ সেই দুঃখেই আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসারের কর্মক্ষেত্রে কলুর বলদের মতো শুধু তার বৃথা আবর্তনই সার। মানুষ অতীতে কত শোকদুঃখ ভোগ করিয়াছে, বর্তমানেও করিতেছে, তবু সে ভবিষ্যতে সুখের আশা করে। ভবিষ্যৎ মানুষের

অজ্ঞাত, সে আকাঙ্ক্ষিত সুখ লাভ করিয়া ধন্য হইবে, না বৃহত্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। তথাপি মানুষ ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকে। এমনই মানুষের মূর্খতা। মানুষের মনের এই ব্যবহারের মূলে রহিয়াছে আশার কুহক। সংসার-যাত্রায় তাহাকে কত বাধাবিপত্তি বিপদ্-আপদের মধ্য দিয়া চলিতে হয়। বস্তুতঃ জীবন যুদ্ধস্বরূপ; বিপদ্রূপ শত্রুর সহিত মানুষকে অনিবার যুদ্ধ করিতে হয় এবং আশা-ই তাহাকে সেই যুদ্ধে শক্তি প্রদান করে। মানুষ ভবিষ্যতে সুখ পাইবে এই আশা করে বলিয়াই বর্তমানের দুঃখ জয় করিতে সমর্থ হয়।

(৫) **নাচায় পুতুল যথা……অর্বাচীন নরে।** (স্তবক ২)

এই পঙ্ক্তি দুইটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা'-শীর্ষক কবিতা হইতে গৃহীত। আশার প্রভাবে পড়িয়া মানুষ যে কত অসহায়, কবি এখানে তাহাই একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে প্রকাশ করিতেছেন।

পুতুলনাচে ছোট ছোট পুতুল মানবসংসারের সকল ঘটনা এবং কার্য এত সুন্দরভাবে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে অনুকরণ করে যে, তাহাতে দর্শকমাত্রেই চমৎকৃত হয়। পুতুল নির্জীব পদার্থ, তাহার মনোমোহকর অভিনয়ের মূলে আছে কৌশলী বাজিকরের পরিচালনা। পুতুলের নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। সংসারক্ষেত্রে মানুষও এই পুতুলনাচের পুতুলের মতো অভিনেতামাত্র, আশা তাহার পরিচালক। শোকতাপদগ্ধ মানুষ নূতন করিয়া সুখের সন্ধান করে। ভবিষ্যৎ সুখের এই আশা-ই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার প্রেরণা ও শক্তি দেয়। আশা প্রভূত শক্তিসম্পন্না কুহকিনী, মানুষ মূর্খ বলিয়াই তাহার মায়ায় মুগ্ধ হয়।

(৬) **কী মন্ত্র কহিলে……মন্ত্রের সন্ধানে।** (স্তবক ৩)

আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি এখানে কুহকিনী আশার সর্বব্যাপক শক্তির কথা প্রকাশ করিতেছেন।

জীর্ণবাস কঙ্কালসার ভিক্ষুক প্রাণধারণের জন্য রুগ্ণ শরীরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার পর চলিতে অসমর্থ হইয়া পথিপার্শ্বে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়। দৈন্যের জীবন্ত কুৎসিত বিগ্রহ এই ভিখারীর দেহ ও পরিধেয় দুর্গন্ধের উৎস। চক্ষু বাহিয়া নামে তাহার অশ্রু, দৃষ্টি ঘোলাইয়া যায়, পা-দুটি হইয়া পড়ে অবশ। ভিক্ষালব্ধ অন্নে তাহার উদরপূরণ হইবে না—তাহা এতই অল্প। এদিকে

চলিবার শক্তিও তাহার নাই, মনে হয় সেখানেই তাহার জীবনের ছেদ নামিয়া আসিবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় দুর্ভাগা ভিক্ষুক আবার ভিক্ষার সন্ধানে বাহির হইতেছে। বাঁচিয়া থাকিবার আশা-ই তাহাকে শক্তি প্রদান করে, চলচ্ছক্তিহীন মানুষও ভবিষ্যতের আশাতেই কর্মক্ষমতা ফিরিয়া পায়। আশা যেন তাহার কানে মন্ত্র পড়িয়া দেয়—বাঁচিয়া থাকিবার, ভবিষ্যতে সুখ লাভ করিবার আশা। অমনি সে আবার ভিক্ষায় বাহির হয়। মনে করে এইবার তাহার উদরপূরণের উপযুক্ত ভিক্ষা মিলিবে।

(৭) না আলোকে যদি ……উজলে ধরণী। (স্তবক ৪)

আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি তাঁহার ক্ষুদ্র কল্পনায় পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী যথাযথ রূপায়িত করিতে পারিবেন কিনা এই আশঙ্কা এখানে বিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছেন।

অন্ধকার রজনী চন্দ্রকিরণে আলোকিত হইয়া উঠে, নক্ষত্ররাশিও তাহাদের সাধ্যমতো কিরণ বিকিরণ করিয়া পৃথিবীতে আলো দান করে। চন্দ্র যদি আলোক দান না করিত, তাহা হইলে নক্ষত্রকিরণে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হইত না। সেইরূপ, যদি কোনো অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি ইতিহাসের এই বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতেন, তবে তাহা বঙ্গ-ইতিহাসের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়টি উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে আলোকিত করিয়া তুলিত। কিন্তু কবি নবীনচন্দ্রের ক্ষমতা সামান্য। তাঁহার রচিত কাব্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই কবির শঙ্কিত বিনয়—যেমন চন্দ্রবিহীন রাত্রিতে নক্ষত্রের আলোক অন্ধকার ঘুচাইতে পারে না, পলাশীর যুদ্ধের কাহিনীর বিস্মৃত আঁধারে তাঁহার কল্পনাও হয়তো তেমনি অসার্থক হইবে। কবি নিজেকে নক্ষত্রের সহিত উপমিত করিয়া নিজের প্রতিভার দীনতা প্রকাশ করিতেছেন।

(৮) কোন্ পুণ্যবলে সেই……যে বরবপুঃ? (স্তবক ৫)

আলোচ্যমান পঙ্‌ক্তি কয়টি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের 'আশা'-নামক পাঠ্যাংশ হইতে উদ্ধৃত। এস্থলে কবি পূর্বসূরীদিগের তুলনায় তাঁহার নিজ প্রতিভার দৈন্যের কথা বলিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অতীত কাহিনী অবলম্বন

করিয়া কাব্য রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজের প্রতিভার দৈন্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তাঁহার আশঙ্কা হয়, কোনো প্রতিভাবান্ কবি যে কাহিনীকে কাব্যরূপে বিকশিত করিয়া তোলেন নাই, তাহাকে উপজীব্য করিয়া তাঁহার কাব্যরচনার প্রয়াস হয়তো নিষ্ফল হইবে। বাঙালীর বিস্মৃত ইতিহাস মূল্যবান্ মণিরত্নের খনিস্বরূপ। ভাস্বর প্রতিভার আলোকেই সেই অন্ধকার খনিতে প্রবেশ তথা রত্ন-উদ্ধার সম্ভব। কিন্তু কবির সে প্রতিভা নাই। যদি বা কোনো পুণ্যবলে সেসকল মণিরত্ন অর্থাৎ গৌরবময় ঐতিহাসিক তথ্য তাঁহার করায়ত্ত হয়, তথাপি সেগুলিকে কাব্যে গ্রথিত করা সুদুষ্কর। বহুমূল্য রত্নে ছিদ্র করা থাকিলে লোকে অনায়াসে সেই ছিদ্রপথে সুতা পরাইয়া মালা গাঁথিতে পারে; কিন্তু ছিদ্র না থাকিলে ছিদ্র করিয়া লওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সেরূপ যে কাহিনী সম্পূর্ণ অভিনব, কল্পনার সূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহার দ্বারা কাব্যসৃষ্টি শক্তিমান্ কবির পক্ষেই সম্ভব। মাতৃভাষারূপিণী মাতৃমূর্তির কণ্ঠে তাঁহার পূর্ববর্তী অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি মহাকাব্যের অপূর্ব মালা পরাইয়া তাহার সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের তুলনায় নবীনচন্দ্র নিতান্তই ক্ষীণশক্তি। এমন কোনো সুকৃতির অধিকারী তিনি নন যাহার প্রভাবে বঙ্গ-ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়া কবিকল্পনার আলোকবঞ্চিত কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন।

[অবিদ্ধ রতন, মাতৃভাষা-কম-কলেবর—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি নবীনচন্দ্রের 'আশা' কবিতায় আশার অভাব ও প্রভাব-সম্বন্ধে কবির বক্তব্য পরিস্ফুট কর।

উ.। আশা না থাকিলে এ বিশ্বের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিত। মানুষ আশায় ভর করিয়াই বাঁচিয়া আছে। আশার অভাবে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িত। নৈরাশ্য, ভয়, শোকতাপ, দুঃখ আর দুশ্চিন্তার কল্পনাতীত প্রাদুর্ভাব মানুষের মনটিকে তখন উন্মত্ত করিয়া দিত। মানবমন মন্দিরের মতো সুন্দর। জ্ঞানরূপী জাগ্রত বিগ্রহের সেখানে অধিষ্ঠান। কুসুমকোমল সুকুমার ভাবচয় তাহাতে প্রচুর। আশা আছে বলিয়াই মনের এই মন্দিরশোভা

রহিয়াছে। আশা না থাকিলে মনের প্রাচীরস্বরূপ যে ধৈর্য, তাহা ধ্বসিয়া পড়িত। তখন সেই মনরূপ ভাঙা মন্দির অধিকার করিত বনের পশুরই মতো হিংস্র বাঘেরই তুল্য বদ্ধ পাগলামি। জ্ঞানবুদ্ধিহীন মত্ত মানুষ সেদিন পশুর চেয়েও অধম হইয়া পড়িত।

আশা আছে, তাই সংসারও সচল রহিয়াছে। নচেৎ এ জগতে কর্মচক্র মুহূর্তে থামিয়া যাইত। ভুলের ধাঁধায় সুখের আশায় ঘুরিয়া মরে মানুষ। চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো দুঃখের খাতে বার বার সে ফিরিয়া আসে, তবু আশার নেশা টুটে না। দুঃখের পর দুঃখ ভাঙিয়া মানুষ ক্রমাগত চলিতে থাকে। আশা সত্যই কুহকিনী। তাহার প্রভাব ঐন্দ্রজালিক। নিপুণ বাজিকর যেমন ইচ্ছাশক্তিহীন নিষ্প্রাণ পুতুলকে নাচায়, আশাও মানুষকে তেমনি কর্মাবর্তে ঘুরপাক খাওয়ায়। এ জগতে মানবের লীলাখেলা ও হাসিকান্নার যে বিরাট্ অভিনয়টি ঘটিয়া যায়, তাহা এই অদৃশ্য আশারই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে। মানুষ অসহায়, আশার মায়ামৃগছলনার সে একান্ত বশীভূত। তাই দীনহীন বুভুক্ষু কাঙাল দিনের পর দিন প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগে, মরণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াও বাঁচিবার মিথ্যা সম্ভাবনা দেখে।

কবি তাঁহার নিজের জীবনেও এই আশার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। তাই পলাশীর যুদ্ধের যে কাহিনী কেহ কখনো উদ্‌ঘাটিত করেন নাই, যাহা কোনো প্রতিভাবান্ কবির কাব্যে স্থান পায় নাই, তাহাকে উপজীব্য করিয়াই তিনি কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ক্ষীণশক্তি হইলেও তাঁহার আশা, তিনি এই সুদুষ্কর কার্যে কিছুটা সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

প্র. ২। "দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।"—**কাহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হইয়াছে? কেনই বা করা হইতেছে?**

উ। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ৩। নবীনচন্দ্রের 'আশা' কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। **মর্মার্থ** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ মনোমন্দির = মনঃ + মন্দির। নিরবধি = নিঃ + অবধি। চক্ষে—চক্ষু + এ (বাঙলা সন্ধি)। অতএব = অতঃ + এব। অন্বেষণ = অনু + এষণ।

সমাস ঃ ত্রিভুবন—ত্রি অর্থাৎ তিন ভুবনের সমাহার (সমাহার-দ্বিগু)। মানবমনোমন্দিরে—মনোরূপ মন্দির (রূপক-কর্মধারয়); মানবের মনোমন্দির (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। অনুক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে (বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব)। নিরাশপ্রণয়—নাই আশা যাহার তাহা নিরাশ (নঞ-বহুব্রীহি); নিরাশপ্রণয় (কর্মধারয়)। মনোমন্দিরশোভা—মনোরূপ মন্দির (রূপক-কর্মধারয়); তাহার শোভা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। সংসারচক্র—সংসাররূপ চক্র (রূপক-কর্মধারয়)। রাজপথধারে—পথের রাজা রাজপথ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার ধার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। কঙ্কালশরীর—কঙ্কাল (বিশেষণবৎ প্রয়োগ) শরীর (কর্মধারয়)। মূঢ়মতি—মূঢ় বা মূঢ়া মতি যাহার (বহুব্রীহি), সে। মাতৃভাষা-কম-কলেবর—মাতার ভাষা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); কম অর্থাৎ কোমল বা কমনীয় কলেবর (কর্মধারয়); মাতৃভাষার কম-কলেবর (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মহাকাব্যধনে—মহৎ কাব্য (কর্মধারয়), তাহা ধন (কর্মধারয়), তাহাতে। বরবপুঃ—বর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বপুঃ (কর্মধারয়)।

সাধুগদ্য-রূপ ঃ সৃজিত—সৃষ্টি করিত ('সৃজন করিতে'-ও চলে, যদিও 'সৃজন' কথাটি সংস্কৃতমতে ভুল)। বিরাজিতে—বিরাজ করিতে। নাশিত—নাশ বা নষ্ট করিত। যুঝিছে—যুঝিতেছে। তেমতি—তেমন, সেইরূপ। আলোকে—আলোকিত করে। উজলে—উজ্জ্বল করে। প্রবেশি—প্রবেশ করিয়া। লভিয়াছে—লাভ করিয়াছে। রঞ্জিছ—রঞ্জিত করিতেছ। তাহে—তাহাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ সৃজিত—সৃজ্ (সংস্কৃত ধাতু) + ইত। বিরাজিতে—বি – রাজ্ (সংস্কৃত ধাতু) + ইতে। নাশিত—নাশ্ (বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) + ইত। বাজিকর—বাজি + কর (বিদেশী 'গর' প্রত্যয় হইতে)। পরিধেয়—পরি – ধা + যৎ। রুগ্ণ—রুজ্ + ক্ত। আলোকিত—আলোক + ইতচ্। প্রবেশি—প্র – বিশ্ + ঘঞ্ = প্রবেশ (বিশেষ্য); প্রবেশ (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) + ইয়া = প্রবেশিয়া, পদ্যে 'প্রবেশি'। দোলাইব—দুল্ + আ (প্রেরণার্থে) + ইব। গাঁথা—গাঁথ্ + আ (নিষ্ঠা বিশেষণ)। নির্বাপিত—

নির্—বা+ণিচ্+ক্ত। আলোকে—আলোক (বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+এ।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ সৃজিত, বিরাজিত, নাশিত—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। এইরূপ ক্রিয়া কেবল পদ্যেই চলে।

ঘুরাতে—ঘুর্+আ+ইতে : বাঙলা প্রেরণার্থক ক্রিয়ার উদাহরণ।

প্রবেশি—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

কিম্বা—সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে কিম্+বা='কিংবা' রূপই শুদ্ধ (ম্+অন্তঃস্থ বর্ণ=ম্-স্থানে অনুস্বার); কিন্তু প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যে 'কিম্বা' এই ভুল সন্ধিটির প্রচুর প্রয়োগ আছে।

পদছায়া—পদ+ছায়া=(সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে) পদচ্ছায়া। কিন্তু বাঙলায় এই নিয়মটি প্রায়ই মানা হয় না।

রতনে—রত্নে > রতনে—বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

রঞ্জিছ—রঞ্জ্+ণিচ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইতেছ। সংস্কৃতধাতুজাত বাঙলা ক্রিয়া, প্রয়োগ কেবল পদ্যে।

লভিয়াছে—লভ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়াছে; পূর্ববৎ।

দোলাইব—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ দুর্বল—সবল। নিরবধি—সাবধি (অপ্রচলিত)। অর্বাচীন—প্রাচীন। অসম্ভব—সম্ভব।

ণত্ব-বিধান ঃ প্রশ্ন : রুগ্‌ণ' পদটিতে ণত্বের কারণ নির্ণয় কঁর।

উত্তর : র্-এর পর স্বরবর্ণ ও ক-বর্গ ব্যবধান থাকায় একপদস্থিত 'ন' 'ণ' হইয়াছে।

বাক্য-রচনা ঃ অনুক্ষণ : দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে শকুন্তলা অনুক্ষণ পতিচিন্তায় নিমগ্ন থাকিত।

অধিষ্ঠাত্রী : সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অর্বাচীন : প্রাচীন ও অর্বাচীন রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই।

অবিদ্ধ : অবিদ্ধ অবস্থায় মুক্তার মূল্য তেমন বেশী নয়।

মধ্যাহ্নে

অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ বিহারীলালের কাব্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতেন। তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হইল ভাবসংযম, বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা ও ভগবদ্‌ভক্তি; নিপুণ শব্দচয়ন ও পদলালিত্যও তাঁহার রচনার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। অক্ষয়কুমার অনেকাংশে বিহারীলালের অনুগামী হইলেও আনন্দতন্ময়তা তাঁহার মধ্যে নাই। তাঁহার "কাব্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, হৃদয়াবেগের প্রাবল্য কবিকে বাহ্যত চঞ্চল করিয়া তোলে নাই কিন্তু অন্তরকে গভীরভাবে ভাবাবিষ্ট ও তন্দ্রাতুর করিয়াছে।"

উৎস ও নামকরণ—'মধ্যাহ্নে' কবিতাটি কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শঙ্খ'-নামক কবিতা-গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে।

এই কবিতাটির বিষয়বস্তু নদীতীরে একটি স্তব্ধ মধ্যাহ্নের সুন্দর বর্ণনা এবং সেই প্রসঙ্গে কবির আত্মগত ভাবকল্পনা। বাঙলার গ্রামপ্রকৃতির দ্বিপ্রাহরিক ছবিটি অবশ্যই এখানে হুবহু ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাই কবিতাটির সমগ্র বস্তু নহে। মধ্যাহ্নের এক নিঝুম উদাস পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি অন্তরের মধ্যে একটি অলস আবেশ, একটা অর্ধজাগ্রত ও বস্বপ্নের অনবদ্য অনুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কবিতাটির আরম্ভই কবির নিজের কথা লইয়া। সুতরাং ইহা ঠিক মধ্যাহ্নের বস্তুলীন বর্ণনা নহে। যদি তাহা হইত তবে কবিতাটির সঙ্গত শীর্ষনাম হইত শুধু 'মধ্যাহ্ন'। মধ্যাহ্নের ছবির মধ্যে কবির নিজস্ব ভাবকল্পনার বিকাশও এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই ইহার নাম 'মধ্যাহ্নে'। ইহার মধ্যে সাঙ্কেতিকতা আছে, ব্যঞ্জনাও সাথক। এইরূপে কবিতাটির শীর্ষনাম সঙ্গত, সুষ্ঠু।

সমালোচনা—আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে বড়ালকবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল বর্ণনায় মধ্যাহ্নের একটি স্বচ্ছ সুন্দর ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রামের পাশে নদীর তীরে একখানা মাঠ নিঝুম দুপুরের অলস আবেশে ঝিমাইয়া পড়িয়া আছে। একটি বটগাছ ভাঙা তীরে হেলিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া

তাহার পাতাগুলি হাওয়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাঁপিতেছে। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ইহা গ্রীষ্মকাল। তাই আকাশে চাতক উড়িয়াছে। ঊর্ধ্বে চাতকের 'ফটিক জল', নিম্নে কুবোপাখীর অদ্ভুত কুব্ কুব্ ডাক দুপুরের নিঝুম পরিবেশকে কি যেন এক অলস আবেশে ভরিয়া তোলে। মাঠপ্রান্তর জনশূন্য, কদাচিৎ দুই-একটি পথিক মেঠো পথে গুটিগুটি চলিয়া যায়। প্রখর তাপে জেলেরাও ডিঙা ফেলিয়া ঘরে গিয়াছে। বাহিরে শুধু দুই-একটা মুক্ত গাভী—গাছের তলায় শুইয়া হয়তো নিমীলিত নয়নে রোমন্থন করে। হাঁসগুলি জলে ডুবিয়া স্নিগ্ধ হয়। ইহা ছাড়া জলচর জীব সব যেন কোথায় আত্মগোপন করে। খাঁ খাঁ করে মাঠ। তাহার মধ্য দিয়া কখনও হঠাৎ কোনো গ্রামবধূ এক কলসী জল লইয়া লজ্জিত সঙ্কুচিত পদে দ্রুত চলিয়া যায়। দুপুরের দৃশ্য, এইভাবের দুই-একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন, সবটাই কেমন যেন তন্দ্রাবিভোর জড়িত-উদাস ভাবে ভরা। অক্ষয়কুমার বাঙলার দ্বিপ্রহরের এই বিশ্বস্ত বর্ণনাটিই সরল ভাষায় নিপুণ তুলিকায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবির বর্ণনার দক্ষতা ও পর্যবেক্ষণের নিবিড়তা তো আছেই, তাহার সহিত আছে দৃশ্যের অভ্যন্তরে একেবারে মর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া উহার যথাযথ সুরটি ধরিয়া দেওয়ার ক্ষমতা। 'মধ্যাহ্নে' কবিতারও সেইটাই শ্রেষ্ঠ রস। এই কবিতাটি পাঠকালে আমরাও তাই হৃদয়ের একটা এলাইয়া-পড়া, অর্ধস্ফুট ভাবস্বপ্নের আবেশ অনুভব করি। মধ্যাহ্নে কবি যে অনির্দিষ্ট, অসংলগ্ন সুখদুঃখের অনুভূতি ও অস্পষ্ট স্মৃতির প্রভাব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা শুধু সুন্দর নয়, সকল সংবেদনশীল মনেরই পক্ষে বাস্তব সত্য।

অক্ষয়কুমারের বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে এই অনুভূতির অন্তরঙ্গতা একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এই শক্তির বলেই তিনি মধ্যাহ্নের স্বপ্নবিহ্বল মধুর আবেশটি এখানে মর্মগ্রাহী করিতে পারিয়াছেন। শূন্য মনে শূন্য মাঠের রৌদ্রদীপ্ত রিক্ত ছবিটি দেখিয়া কবি যখন উহাকে আপন মনে স্বপ্নজালরচনায় লিপ্ত ভাবিয়াছেন, তখন তিনি রসলোকের এক বর্ণনাতীত মাধুর্যে মগ্ন। পাঠকের মনেও তাহার ছোঁয়াচ লাগে। দ্বিপ্রহরের মর্মগূঢ় সুরটির সহিত কবি-চিত্তের একাত্মতাই ইহার প্রকৃত কারণ। এইখানেই কাবতাটির সর্বাধিক আবেদন।

সংক্ষিপ্তসার—মধ্যাহ্নে কবি সংসারের সব-কিছু ভুলিয়া নদীতীরে পড়িয়া আছেন। ভগ্নতটের নশ্বর বটগাছটি হেলিয়া পড়িয়াছে; তাহার পাতাগুলি মন্থর পবনে ঝিরঝির করিয়া কাঁপিতেছে। চাতকের করুণ আর্তনাদ

শুনা যাইতেছে, নদীর বাঁকে বাঁকে বক মাছের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কুবোপাখী তাহার গোপন আশ্রয় হইতে কুব্ কুব্ করিয়া ডাকিতেছে। গাছের তলায় গোরু শুইয়া আছে। হাঁস নদীর জলে সাঁতার দিতে দিতে একবার ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে। জেলে তাহার ডিঙাখানি তীরে বাঁধিয়া ঘরে ফিরিতেছে। দূরে মাঠের পথ ধরিয়া দুইজন পথিক ধীরগতিতে চলিয়াছে। যে কুলবধূটি নদীতে জল ভরিয়াছে, সে পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাদের দেখিয়া লজ্জায় দ্রুতপদনিক্ষেপে ফিরিতেছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন কবির মনে মন্থর স্বপ্নের মোহ বিস্তার করিয়া চলে, আর তিনি দূরে মাঠের দিকে উদাস নিষ্পলক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পড়িয়া থাকেন।

একটা অবর্ণনীয় স্বপ্নাবেশে কবির মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, অনির্বচনীয় সুখানুভূতি চোখের পাতা দুইটিকে দেয় বুজাইয়া। অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া তাকাইয়া তিনি কত কি চিন্তা করেন, কত গান গাহিতে থাকেন। সেই গানের অবসরে আবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন। গাছ হইতে পাতা খসিয়া খসিয়া পড়ে। কবির মনে পড়িয়া যায় কত শত কবিতা। তিনি দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের সহস্র বেদনা যেন ছায়ার মতো অস্পষ্ট অনির্দেশ্য মূর্তিতে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

পঙ্‌ক্তি ১-১৫। জগৎ ভুলে—বিশ্বসংসারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া। 'মধ্যাহ্নের এমনি একটা উদাস প্রভাব আছে যাহা মানুষকে সংসারের কথা, পরিবেশের কথা সাময়িকভাবে ভুলাইয়া দেয়।' মধ্যাহ্নে প্রকৃতি যেমন আলস্যে ঝিমাইয়া পড়ে বলিয়া মনে হয়, মানুষের মনও তেমনি। নদীকূলে—নদীর তীরে। **নধর বট**—সতেজ, কোমল, কমনীয়, ছোট একটি বটগাছ। ভাঙা তীরে—নদীতট যেখানে ভাঙিয়া গিয়াছে সেখানে। **পড়েছে নধর··· তীরে**—নদীতটের কোনো স্থানে একটা ছোট বটগাছ জন্মিয়াছে। জলস্রোতে পাড় খানিকটা ভাঙিয়া পড়ায় গাছটির শিকড়গুলি আশ্রয়হীন হইয়াছে এবং তাহার ফলে গাছটিও কাত হইয়া পড়িয়াছে। ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি ইত্যাদি—মধ্যাহ্নের মন্থর বাতাসে বটগাছটির পাতাগুলি ঝিরঝির করিয়া কাঁপিতেছে। কাতরে—কাতরভাবে (ক্রিয়াবিশেষণ)। **চাতক কাতরে ডাকে**—পিপাসার্ত চাতকপাখী জলের জন্য কাতরভাবে ডাকিতেছে। কবিপ্রসিদ্ধি আছে যে বৃষ্টির

নির্মল জল ছাড়া চাতকের তৃষ্ণা মেটে না। তাই আকাশে মেঘ দেখিলে এই পাখী বহু উর্ধ্বে উঠিয়া 'ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। চাতক খুব ছোট পাখী। ইহাদের পা ও লেজ ছোট, ঠোঁট লম্বা ও বাঁকা। ডানা দুটি কালো কিন্তু উপরের দিকে দুটি করিয়া সাদা রেখা। বুক ও পেট ঈষৎ হলদে; অন্য অংশের রঙ জলপাইয়ের মতো ফিকে সবুজ। চরে বক নদী-বাঁকে—নদীটি যেখানে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানে বক মাছের সন্ধানে বেড়াইতেছে। কুবো—দ্বিপ্রহরে কুব্ কুব্ ধ্বনিকারী একরকমের পাখী। সাধারণতঃ গ্রীষ্মে ইহাদের কণ্ঠ শোনা যায়। কুব্ কুব্—'কুব্ কুব্' এইরূপ ধ্বনি করিয়া। লুকায়ে কোথায়—কুবোরা গাছপাতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ডাকিতে থাকে, সহসা তাহাদের দেখা যায় না। ইহারা সাধারণতঃ পুকুর বা নদীর ধারে ঝোপে থাকে এবং উহার ভিতর হইতেই শব্দ করে। ইহার অন্যনাম 'হুঁপো'। হংসী ডুবে উঠে জলে—হংসী নদীর জলে সাঁতার দিবার সময় একবার ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে এবং এইভাবে তপ্ত অঙ্গ শীতল করিতেছে। ডিঙা—ছোট নৌকা; মাছ ধরিবার নৌকা। জেলে—ধীবর; কৈবর্ত; জাল দিয়া অর্থাৎ মাছ ধরিয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। **গুটি গুটি**—ধীরে ধীরে; নিঃশব্দে; ধীর-পদবিক্ষেপে। মেঠো পথ—মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিবার রাস্তা। মানুষের যাতায়াতের ফলে এরূপ রাস্তার সৃষ্টি হয়। আঁখি দুটি ঢল ঢল—ভাসা-ভাসা ভাবময় দুটি চোখ অথবা চঞ্চল দুটি চোখ। **কুলবধূ দ্রুত গেল** ইত্যাদি—একা কুলবধূর পক্ষে অপরিচিত পথিকের সম্মুখে পড়া লজ্জার কথা। সে জল আনিতে একাই নদীতে আসিয়াছিল, ভাবে নাই এই নিঝুম মধ্যাহ্নে কোনো অপরিচিত পথিক তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে। তাই দুইজন পথিককে অথবা নদীতীরে শয়ান কবিকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া সে নারীসুলভ লজ্জায় চমকিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে বাড়ীর দিকে চলিল। নিঝুম—নিস্তব্ধ; নিস্পন্দ। মধ্যাহ্নকাল—দুপুরবেলা। অলস স্বপন-জাল—মন্থর স্বপ্নের মোহ। অন্যমনে—অন্য একজনের অর্থাৎ কবির মনে; অথবা অন্যমনস্কভাবে; অনাসক্তভাবে। হৃদয় ভরিয়া—ইচ্ছামতো; যত ইচ্ছা তত। **নিঝুম····· হৃদয় ভরিয়া**—মধ্যাহ্নকাল এখানে ব্যক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। সে যেন প্রাণ ভরিয়া কবির মনে স্বপ্ন বা অবাস্তবতার মন্থর মোহ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, স্বপ্নের শোভাযাত্রা সৃষ্টি করিতেছে। এইরূপে দেখা যায়, দেহের উপর মধ্যাহ্নের যেমন একটা প্রভাব আছে, মনের উপরও তেমনি। মধ্যাহ্নে

দেহ ঝিমাইয়া পড়িতে চায়, কিন্তু মন আলস্যের মধ্যেই নূতন ভাবনা-কল্পনার লীলাখেলায় মাতিয়া উঠে। এই অংশটির অন্য অর্থও সম্ভবপর ; মধ্যাহ্নকাল যেন স্বয়ং কবি হইয়া আনমনে আপন মনে হৃদয়ভরা আনন্দে স্বপ্নকল্পনার জাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। এভাবের ব্যাখ্যায় **অন্যমনে** = আনমনে, মধ্যাহ্নকাল তাহার আপন মনে। চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে—অপলক অর্থহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। এইরূপ দৃষ্টিতে চোখ দুইটি খোলা থাকিলেও প্রকৃত দর্শন হয় না। 'চেয়ে' কথাটির বার বার ব্যবহারে কবি কেমন একটি আলস্যভরা আবিষ্টতার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

প. ১৬-২১। হৃদয়ে এলায়ে পড়ে—দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটিও শিথিল হইয়া যায়, অন্য সময়ের মতো সক্রিয়তা ও সজীবতা তাহার থাকে না। স্বপন-ভরে—স্বপ্নের আবেশে। **মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে**——একটা অনির্বচনীয় সুখাবেশে চোখের পাতা দুটি তন্দ্রায় জড়াইয়া আসে। অন্যমনে—অন্যমনস্কভাবে। চাহি—তাকাইয়া থাকিয়া; দৃষ্টিপাত করিয়া। **পড়িছে গভীর শ্বাস** ইত্যাদি—একটি গান যখন শেষ হয়, তখন কবি কি যেন অব্যক্ত বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বিরাম—বিরতি ; অবকাশ ; ফাঁক। **গাথা**—ছন্দোময়ী বাণী ; পদ্য বা কবিতা। **ছায়া-ছায়া কত ব্যথা**—ছায়ার মতো অস্পষ্ট অব্যক্ত কত বেদনা। **ছায়া-ছায়া……ধরাধামে**—মধ্যাহ্নে কবির অন্তর এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া উঠে। তাঁহার মনে হয়, অনির্বচনীয় বেদনার রাশি ছায়ার মতো অস্পষ্ট মূর্তি ধরিয়া সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি মনশ্চক্ষে সেগুলিকে দেখিতে পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপ ধরিতে পারিতেছেন না। সহজ কথায়, মধ্যাহ্নে একটা অব্যক্ত বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত কবির কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই বেদনাময় বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু কী সে বেদনা, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। বেদনা, কিন্তু মধুর বেদনা।

ব্যাখ্যা

(১) চাতক কাতারে ডাকে…জেলে ঘরে যায়। (পঙ্‌ক্তি ৪—৭)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে' কবিতার অন্তর্গত। গ্রামপ্রকৃতির সরল পরিবেশে একটি নিঝুম দুপুরের বিশ্বস্ত বর্ণনাচ্ছলেই কবি এই অংশটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

নদীর তীরে এক বটের ছায়ায় শরীর এলাইয়া দিয়াছেন নিঃসঙ্গ কবি। দুপুরের অলস মুহূর্তে চারিদিকে ছুটি। মাঠে প্রান্তরে কোথাও প্রায় জনপ্রাণী নাই। আকাশে দুই-একটি চাতক 'ফটিক জল' চাহিয়া মেঘের কাছে কাতর মিনতি জানায়। গাছের আড়ালে কুবোপাখী কুব্ কুব্ শব্দ করে। নদীর বাঁকে বক চরিয়া বেড়ায়। ভাঙা তীরের একপাশে হেলিয়া-পড়া নধর বটগাছটির পাতাগুলি ঝিরঝির করিয়া অনবরত কাঁপে। বটগাছের পাতার কাঁপন আর চাতকের ডাক—এই দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝি এ গ্রীষ্মের রৌদ্রদীপ্ত প্রখর মধ্যাহ্ন। এই মধ্যাহ্নে সকলেই মাঠ ছাড়িয়া গিয়াছে। জেলেরা পর্যন্ত ঘাটে ডিঙা বাঁধিয়া ঘরে ফিরিতেছে। প্রাণীর মধ্যে কয়েকটি গাভী গাছের ছায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে হয়তো রোমন্থন করে। আর কয়েকটি হাঁস বা পানকৌড়ি জলে ঘন ঘন ডুবে ও ওঠে। মধ্যাহ্নের অলস বিবশ এই ছবিটিই এখানে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

(২) . নিঝুম মধ্যাহ্নকাল……রয়েছে পড়িয়া। (পঙ্‌ক্তি ১২-১৫)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের স্তব্ধ অলস চিত্রটির বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এখানে আপন মনের আবেশটুকু বিবৃত করিতেছেন।

গ্রীষ্মের রৌদ্রদীপ্ত প্রখর মধ্যাহ্নে চারিদিকে একটা অলসতার আবেশ ছড়াইয়া পড়ে। চাষীরা ক্ষেত ছাড়িয়া বাড়ী ফিরে। জেলেরা ঘাটে ডিঙা বাঁধিয়া বিদায় লয়। বিরাট মাঠখানা শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে।

তপ্ত বালুকায় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উপরে উঠে। সমগ্র দৃশ্যটি কেমন বিবশ মায়ায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কবির কল্পনায় এই মাঠ, এই স্তব্ধ প্রকৃতি—সবসুদ্ধ নিঝুম দ্বিপ্রহরটি তখন এক মায়াবীর রূপে মূর্ত হয়। যেন সে আনমনা হইয়া একটা অলস স্বপ্নের জাল বুনিয়া যায়। এই অখণ্ড অলস মুহূর্তে বিশ্বজনীন অবসর—অনবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। ইহার মধ্যে বসিয়া সেই মায়াবী প্রাণ ভরিয়া কেবলই স্বপ্ন রচনা করে। তাহারই প্রভাব অনুভব করেন কবি নিজের অন্তরে। দূরদূরান্তরে দিগ্‌বলয় পর্যন্ত মাঠের দিকে তিনি উদাসভাবে শুধু চাহিয়া থাকেন। কোথাও কেহ নাই, শুধু একখানি ঝিমাইয়া এলাইয়া-পড়া মাঠ—যেন স্বপ্নাতুর। কবি আবিষ্টভাবে তাহাই শুধু তাকাইয়া দেখেন উদাস অপলক দৃষ্টিতে আর অন্তরে অন্তরে কি-একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অস্ফুট আবেশে বিভোর হইয়া থাকেন।

(৩) **অন্যমনে.........ঘুরে ধরাধামে।** (পঙ্‌ক্তি ১৮—২১)

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে' কবিতা হইতে এই পঙ্‌ক্তি কয়টি উদ্ধৃত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি আপন হৃদয়ে যে অনির্বচনীয় প্রভাব অনুভব করেন—এই অংশে তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

গ্রামপ্রকৃতির নিস্তব্ধ পরিবেশে মধ্যাহ্নের ছবিটি মায়ামূর্তি ধারণ করে। নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় শুইয়া কবি সেই ছবি দেখিতে দেখিতে নিজেও একটা অলস আবেশে এলাইয়া পড়েন। বিবশ চেতনায় চিন্তাগুলি বিস্রস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অন্যমনস্কভাবে কবি উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। কত কি চিন্তা তাঁহার মনে আসা-যাওয়া করে ; আনমনাভাবে তিনি কত গান গাহিয়া গেলেন। গানের বিরামস্থলে তাঁহার ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই গ্রীষ্মের এলোমেলো বাতাসে গাছের পাতাগুলি দুই-একটা করিয়া ইতস্ততঃ খসিয়া পড়ে। মনের ভিতরেও তেমনি পুরানো দিনের বেদনার কথা আর গানগুলি এলোমেলোভাবে ভাসিয়া উঠে। খসিয়া-পড়া পাতাগুলি যেমন বিবর্ণ পাণ্ডুর, এই ব্যথা-বেদনার কথাগুলিও তেমনি আবছা অস্পষ্ট। স্মৃতির অন্ধকারে সঞ্চিত থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের যেন তীব্রতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ অলস মুহূর্তের বিবশ চেতনায় এগুলি যখন আবার ভাসিয়া উঠে, তখন কবি তাই কি-এক মরমী অনুভূতির তন্দ্রাতুর মূর্ছনায় কোন্ মায়ালোকে উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার মনে হয় যে তাঁহার বেদনাগুলি যেন ছায়ামূর্তি ধরিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে' কবিতাটির মধ্যে মধ্যাহ্নের যে চিত্রটি আছে তাহা এবং কবির উপর তাহার প্রভাব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। "একলা জগৎ ভুলে পড়ে আছি নদীকূলে"—(ক) কে কখন এরূপ ভাবে পড়িয়া ছিলেন ? (খ) কী কারণে তিনি কেমন-ভাবে জগৎ ভুলিয়া পড়িয়া ছিলেন ?

উ.। (ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রীষ্মের এক স্তব্ধ মধ্যাহ্নে এইভাবে নদীতীরে পড়িয়া ছিলেন। তখন জনপ্রাণী সব মাঠপ্রান্তর হইতে বিদায় লইয়াছে। নদীর ধারে চরিতেছে দুই-একটা বক। কুবোপাখী অলক্ষ্যে থাকিয়া ডাকিতেছে, আকাশে শুনা যাইতেছে চাতকের কাতর 'ফটিক জল'। কোথাও বা গাভী গাছের ছায়ায় চোখ বুজিয়া আছে। কোথাও আবার জন-দুই পথিক গুটিগুটি মাঠের পথ ভাঙিতেছে। দৈবাৎ একজন কুলবধূ জল লইয়া লজ্জিত দ্রুতপদে গৃহে ফিরিতেছে। জেলেরা কূলে ডিঙি বাঁধিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। চারিদিক্ শূন্য। মন্দ বাতাসে বটের পাতায় শুধু ঝিরঝির কাঁপন—আর সব নিঝুম নিথর। এমন সময়েই কবি একাকী নদীর তীরে পড়িয়া আছেন।

(খ) কবি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে একটা বিশ্বজনীন অলসতার আবেশ আপন হৃদয়েও অনুভব করিয়াছেন। তখন কাজ ছিল কি ছিল না, সে-কথা অবান্তর। তপ্ত প্রহরের নিঝুম নিরালায় একটা অলস মোহ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে নদীর নির্জন তটে। চারিদিকে দেখিতেছেন তিনি জগৎজোড়া একটা অবসর। দেখিতেছেন তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতির অলস মায়া, এলাইয়া-পড়া শূন্য মাঠের উদাস মায়ামূর্তি। ইহাতে কবি একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। কর্মচঞ্চল জাগ্রত জগৎটাকে তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নিদাঘ-মধ্যাহ্নের স্তব্ধ অলস প্রভাবেই কবি জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়া তিনি মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির নীরব ছবিটির মায়াপ্রভাবে আত্মগত ভাবকল্পনায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন। এই স্বপ্নাতুর মায়াভরা মধ্যাহ্ন-ছবির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কবি যেন কি-এক অলস আবেশে দেহভার এলাইয়া দিয়াছেন। অনির্বচনীয় এক সুখের অনুভূতি তাঁহার চোখের পাতা ভারী করিয়া আনিয়াছে। বিশ্বজগৎ আর তখন তাঁহার কাছে একেবারেই নাই। দৃষ্টি তাঁহার শূন্য, উদাস। থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়ের গভীর হইতে আনমনা কবির গান জাগে, গানের বিরামে বিরামে আবার দুঃখের দীর্ঘশ্বাসও পড়ে। সুখের নিবিড় মুহূর্তে অবচেতনার নিম্নস্তর হইতে, ইতস্ততঃ খসিয়া-পড়া জীর্ণ পাতাগুলির মতো, এলোমেলো কত দুঃখ বেদনার কথাও ভাসিয়া উঠে। কবির মনে হয় সেই হারানো দিনের বেদনাগুলি যেন ছায়া হইয়া বিশ্বময় বিচরণ করে। এইভাবে কবি নিজের মধ্যে নিজে ডুবিয়া যান, এইভাবেই তিনি জগৎ ভুলিয়া একাকী পড়িয়া থাকেন।

প্র. ৩। 'মধ্যাহ্নে' কবিতায় কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের যখন—"মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কী আরামে!"—ঠিক তাহার পরেই

আবার তাঁহার—"পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে।"—ইহার কারণ বুঝাইয়া দাও। অথবা,

'মধ্যাহ্নে' কবিতায় কবি অক্ষয়কুমারের আরামের স্বপ্নাবেশের মধ্যেই কেন দুঃখের অনুভূতি জাগে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা কর।

উ। 'মধ্যাহ্নে' কবিতায় দ্বিপ্রহরের যে চিত্রটি আছে তাহার অলস আবেশে কবি নিজেও আবিষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিপ্রহরের ঝিমাইয়া-পড়া পরিবেশটি কবিকে কিরূপভাবে প্রভাবিত করে তাহাই কবিতাটির মূল কথা।

প্রথমটায় কবি নদীতীরে একাকী পড়িয়া পড়িয়া নিঝুম প্রকৃতির শূন্য উদাস মূর্তিটি ভালো করিয়া দেখিয়া লন। নদীর তীরে হেলিয়া-পড়া নধর বটগাছটার পাতায় ঝিরঝির কাঁপন, বকের চরিয়া বেড়ানো, কুবোপাখীর থাকিয়া থাকিয়া ডাক, চাতকের 'ফটিক জল'—দুপুরের স্তব্ধতায় মিলাইয়া যায়। জনপ্রাণিহীন মাঠে দুইজন পথিক গুটিগুটি পথ চলে, গ্রামবধূ লজ্জিত পদে জল লইয়া ঘরে ফিরে। কোথাও বা গাছের তলায় একটা গাভী শুইয়া থাকে। আর কোথাও কেহ নাই। জেলে ডিঙি বাঁধিয়া ঘরে গিয়াছে, চাষীরাও মাঠে নাই। মাঠখানি রৌদ্রে পড়িয়া যেন ঝিমায়, যেন কি-এক স্বপ্নের জাল বুনিয়া যায়। কবি তাহাই শুধু চাহিয়া দেখেন। এই চাহিয়া দেখিতে-দেখিতেই তাঁহার চোখে নেশা লাগে। জগৎজোড়া একটা অলসতার মোহ অনুভব করিয়া তিনিও দেহভার এলাইয়া দেন। চোখের পাতা তখন বুজিয়া আসে। আত্মগত অনুভূতির এই প্রথম অবস্থাটা পরম আরামপ্রদ। মুক্ত প্রকৃতির নিঝুম পরিবেশে কবির দেহমন তখন একটা অনির্বচনীয় সুখের আমেজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসে। ক্রমে, তাঁহার জাগ্রত চেতনা যেন স্তিমিত হইয়া যায়। কবি আনমনা হইয়া উঠেন। অজানিতে আপনা হইতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে কত গান উৎসারিত হয়। এই অবস্থাটা গভীরতর মগ্নচিন্তার অবস্থা, অনেকটা স্বপ্নের অবস্থার মতো। মানুষের অবচেতনায় পুরানো দিনের দুঃখসুখের সব কথাই সঞ্চিত থাকে। কিন্তু জাগ্রত চেতনার সময় মনের গভীরে অতলে তলাইয়া থাকে। স্বপ্নের সময় তাহারা আবার এলোমেলোভাবে ভাসিয়া উঠে। কবির এখন ঠিক সেই অবস্থা। তাঁহার মনের তলা হইতে যে গান উৎসারিত হইতেছে, সেই গানের ফাঁকে ফাঁকে তাই বেদনার দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া বাহির হয়। ইহাই মনের অপূর্ব লীলা। সুখের অনুভূতিটা ঘনীভূত হইয়া যখনই মানুষকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া দেয় তখন দুঃখের অনুভূতিগুলিও আলোড়িত

হইয়া উঠে। উত্তাপের বিশেষ একটা মাত্রা-অনুসারে জলের মধ্যে উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে একটা স্রোতের সৃষ্টি হয়। অনুভূতির গাঢ়তায় চেতনার উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে তেমনি একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কবির মনে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সেইজন্যই সুখের অনুভূতি ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হারানো-দিনের ব্যথা-বেদনার কথা ও অনুভূতিগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে।

প্র. ৪। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া একটি সমালোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস ঃ কুলবধূ—কুলের বধূ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মধ্যাহ্নকাল—অহ্নের অর্থাৎ দিনের মধ্য মধ্যাহ্ন (একদেশী—বাঙলামতে ষষ্ঠীতৎপুরুষ); মধ্যাহ্নই কাল (কর্মধারয়)। অলস-স্বপন-জাল—অলস যে স্বপন (স্বপ্ন)—কর্মধারয়; তাহার জাল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ধরাধামে—ধরা-নামক ধাম (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে।

সাধুগদ্য-রূপ ঃ একেলা—একা বা একলা। ভুলে—ভুলিয়া। পড়ে—পড়িয়া। পড়েছে—পড়িয়াছে। হেলে—হেলিয়া। কাঁপিছে—কাঁপিতেছে। কাতরে—কাতরভাবে। লুকায়ে—লুকাইয়া। শুয়ে—শুইয়া। বেঁধে—বাঁধিয়া। চ'লে—চলিয়া। দিয়ে—দিয়া। নিয়ে—লইয়া। চমকিয়া—চমকিত হইয়া। রচিতেছে—রচনা করিতেছে। মাঠ-পানে—মাঠের দিকে। চেয়ে—চাহিয়া। রয়েছি—রহিয়াছি। এলায়ে—এলাইয়া। মুদে—মুদিয়া। পড়িছে—পড়িতেছে। খ'সে—খসিয়া।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ একেলা—এক+লা (স্বার্থে)। জেলে—জাল+ইয়া=জালিয়া>জেলে। মেঠো—মাঠ+উয়া=মাঠুয়া>মেঠো।

ব্যাকরণগত টীকা : স্বপন—স্বপ্ন>স্বপন : প্‌ ও ন্‌-এর মধ্যে অ আসিয়াছে বলিয়া এটি বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।

অর্থগত পার্থক্য ঃ গাথা—ছন্দোবদ্ধ রচনা; গাঁথা—গ্রন্থন করা ('মালা গাঁথা')। গুটিগুটি—আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে; গুটি—গুলি, বড়ি।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ ঃ নধর, মেঠো, নিঝুম।

ভারত-তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য—"রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু বাংলাদেশের কেন, তিনি সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। ...রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া কালিদাসের প্রভাব আছে; ভারতবর্ষীয় দর্শন ও চিন্তার ধারাকে তিনি নূতন নূতন পথে অগ্রসর করিয়াছেন; বৈষ্ণব পদাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের ছাপ তাঁহার রচনায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু তবুও তিনি ভারতবর্ষের নহেন, তিনি সর্বদেশের ও সর্বকালের। শেক্‌স্‌পীয়র ও গ্যেটে ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্যেও এমন অন্য কোনো কবির নাম করা দুরূহ যিনি তাঁহার দেশ ও কালের গণ্ডী এমন করিয়া অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন।"

"রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীনতার প্রধান কারণ এই যে তাঁহার কাব্যে বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী ধারার সমন্বয় হইয়াছে।......রবীন্দ্রনাথের যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবিতা আলোচনা করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে তাহার মূলে আছে দুইপ্রকারের অনুভূতি। কবি মানব-মনের কোন বিশেষ অনুভূতির রস তিল তিল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহাও বুঝিতেছেন যে কোন অনুভূতিই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে অনন্ত ও অসীম। আবার সেই সুদূরের জন্য তিনি উন্মনা হইয়াছেন, তাহাকেও তিনি দেখিয়াছেন জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রকাশে, পৃথিবীর প্রতি অণুপরমাণুতে।" —সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

উৎস ও রচনাকাল—কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলন 'গীতাঞ্জলি'র অন্তর্ভুক্ত। ইহার রচনাকাল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯০৬ সাল হইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে স্বদেশপ্রেম যে উগ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, কবির তাহাতে আন্তরিক সমর্থন ছিল না। সেজন্য তিনি দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠিয়া এবং বিশ্বমানবতার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই কবিতাটি রচনা করেন।

নামকরণ—গীতাঞ্জলির অন্যান্য কবিতার ন্যায় এই কবিতাটিরও কোনো নাম ছিল না। পরে রবীন্দ্রনাথ ইহার 'ভারত-তীর্থ' নাম দিয়াছেন।

কবি ভারতবর্ষকে একটি মহামিলনক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তীর্থক্ষেত্রে যেরূপ অগণিত নরনারীর সমাগম হয়, ভারতবর্ষেও সেইরূপ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এইজন্যই ভারতবর্ষকে তীর্থরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে যেমন একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন, এই ভারত-তীর্থেও সেইরূপ একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন—তিনি হইলেন বিশ্ব মানবতা। অতএব কবিতাটির নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

সমালোচনা—আলোচ্যমান কবিতাটিতে বিশ্বকবির একটি অমর বাণী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কবি দেশকে ভালোবাসিতেন, তবে সে ভালোবাসা অন্ধ মমতার টান নহে। উহার মূলে রহিয়াছে একটি গভীর অনুভূতি, একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি। "বহুর মধ্যে একের অনুভূতি" এবং ভারতীয় ঐক্যসাধনা কবির প্রেরণা জুটাইয়াছে। দূরত্বের সহিত নৈকট্যের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব রোমান্সের সৃষ্টি হয়, তাহাই যোগাইয়াছে কবিতাটির রস।

ইহার মর্মবাণীটুকু অলীক স্বপ্ন তো নহেই, নিছক তত্ত্বও নহে। কারণ ভারতের সত্যকার ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তিতে উহা প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগরতীর' কল্পনা করিয়া কবি তত্ত্বকে রসমণ্ডিত করিয়া কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবিতাটিতে তেমন সজীব চিত্র সন্নিবেশিত হয় নাই বলিয়াই যে ইহার মর্মকথা জীবন্ত হয় নাই (শ্রীযুক্ত সুবোধ সেনগুপ্তের মতে)—একথা যুক্তিসহ নহে।

আলোচ্যমান কবিতাটি সম্বন্ধে সুবোধবাবুর আর একটি জিজ্ঞাসা হইল—'এই যে ঐক্যের কথা...... ইহাকে কবি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথায়, কি আকারে দেখিয়াছেন?' দার্শনিকপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত কথোপকথনের একস্থলে কবি নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনই ভারতের বিশেষ ধর্ম।......ভারতের উঁচু-নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায়নি। এইটি আর কোথাও কি দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে।

ভারতে কিন্তু সেটি কখনোই ঘটেনি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতি (harmony) সাধনাই হ'ল ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই ভারতের ব্রত।······বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় ভারত-পন্থ।"

সুতরাং এইবার নিশ্চিতভাবে স্বীকার করা চলে যে 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেশ নিজের খণ্ডতাকে ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে দেবলোকে উঠিতে চাহিয়াছে'। সত্যের সহিত মহত্ত্ব মিশিয়া ভারতের মহিমা তাই কবিতায় বর্ণে বর্ণে ব্যঞ্জিত, স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাই কবি যে 'শুধু দূরদেশের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন তাহাই নহে, সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গেও বর্তমানের নৈকট্য দেখিতে পাইয়াছেন।'

ভাব-বিশ্লেষণ—১। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মহামানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। কবি তাহাকে তাঁহার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর একটি সংক্ষিপ্ত পবিত্র রূপ।

২। কোন্ এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এই দেশে আসিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমের নব সভ্যতা তাহার উপচার লইয়া ভারতের দ্বারপ্রান্তে আজ উপস্থিত। ভারতবর্ষ তাহাকেও গ্রহণ করিবে।

৩। জয়িষ্ণু বা লুণ্ঠনকামিরূপে যাহারা শত্রুভাবে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাও শেষপর্যন্ত এই মহাজাতির মধ্যে লীন হইয়াছে। এখনো যাহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহাদিগকে একদিন এখানে আসিয়া মিলিত হইতে হইবে।

৪। একদা ভারতবর্ষ তাহার ঐক্যের মন্ত্রে বহুত্ব ও বিভেদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই লুপ্ত সাধনা পুনরুজ্জীবিত হইয়া ভারতবর্ষকে আবার ঐক্যবদ্ধ করিবে।

৫। এই সাধনাকে ভুলিয়াছিল বলিয়াই ভারতের বর্তমান দুরবস্থা। কিন্তু এই অনিবার্য দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, এবং ইহার মধ্য দিয়াই নূতন ভারত জন্মলাভ করিবে।

৬। কবি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল বিশ্ববাসীকে এই মহামিলন সম্পূর্ণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন।

মর্মার্থ—রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে মানবজাতির তীর্থক্ষেত্ররূপে দেখিতে পাইয়াছেন। তীর্থক্ষেত্রে যেমন পুণ্যকামী জনগণের সমাবেশ হয়, এই ভারত ভূমিতেও তেমনি শক-হূন-দ্রাবিড়-চীন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি যুগে যুগে আসিয়া ভিড় করিয়াছে এবং অবশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া একেবারে এক হইয়া গিয়াছে। ফলে এই দেশে এক মহামানবতার আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ মহামানবের মিলনক্ষেত্র—ইহাই কবিতাটির মর্মকথা।

কিন্তু এই মহামানবতা কেবল বিরাট্ একটি যৌগিক লোকসমষ্টি নহে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন বিভিন্ন উপাদানদ্বারা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ গঠিত হয়, ভারতবর্ষেও তেমনি বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা লইয়া এক অভিনব মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার যুগপৎ বৈচিত্র্য এবং ঐক্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতভূমি এক অতি পবিত্র স্থান। ইহা একটি তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সাধনা হইল ঐক্যের এবং সেইজন্যই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবাসী সেই সাধনাকে ভুলিয়াছে বলিয়াই তাহার বর্তমান দুর্দশা। কিন্তু কবির বিশ্বাস, দুঃখের এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই ভারতবাসীর অন্তরের সেই চিরন্তন ঐক্যের মন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতের মহামিলন সম্পূর্ণ হইবে। যে সকল পাশ্চাত্ত্য জাতি এখনো তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দূরে সরিয়া আছে, তাহারাও সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া অবশেষে এই মহামিলন যজ্ঞে যোগদান করিবে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

পুণ্যতীর্থে—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। **জাগো রে ধীরে**—ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠ; নানারূপ সংস্কার ও সংকীর্ণতার মোহনিদ্রা ত্যাগ কর। ভারতীয় মহামানবতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে এইরূপ সংস্কার ও সংকীর্ণতাবিমুক্ত চিত্তের প্রয়োজন। **মহামানবের**—মহাজাতির। বিভিন্ন জাতি ও দেশবাসীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলিয়া এই জাতি সাধারণ জাতি নহে, মহাজাতি। **এই ভারতের......সাগরতীরে**—ভারতীয় মহাজাতিরূপ সমুদ্রের তটভূমিতে।

বহু নদী যেরূপ নানা দিক্ ও দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিশিয়াছে। এজন্য ভারতের এই মহাজাতিকে কবি মহাসমুদ্রের সহিত এবং ভারতবর্ষকে এই মহাসমুদ্রের তীরভূমির সহিত তুলনা করিয়াছেন। নমি—প্রণাম করি। পদ্যে ব্যবহৃত। **নরদেবতারে**—বিশ্বমানবতার আদর্শ রূপকে। ভারতবর্ষ চিরকাল যে মহাজাতীয়তার অর্থাৎ কৃষ্টিধর্মনির্বিশেষে সমন্বয়ব্রতের সাধনা করিয়া আসিয়াছে—ইহা তাহারই আদর্শ। উদার ছন্দে—স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রকাশভঙ্গীতে। **ধ্যানগম্ভীর……ভূধর**—ভারতের উত্তরে ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর ন্যায় বিরাজমান বিশাল হিমালয় পর্বত। **নদীজপমালাধৃত প্রান্তর**—ভারতের সমভূমি দিয়া বহু নদনদী প্রবাহিত। এই নদীগুলিকে কবি জপমালার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রান্তরগুলি যেন এই জপমালা-হস্তে ভক্ত সাধকের ন্যায় জপ-নিরত। অথবা ধ্যানরত সাধকের (হিমালয়ের) হস্তে নদীরূপ জপমালা এবং এই জপমালার বেষ্টনে প্রান্তরসমূহ ধৃত। মালার মধ্যে যেরূপ খানিকটা শূন্য স্থান ধৃত হয়, নদীগুলির মধ্যেও সেইরূপ প্রান্তরগুলি শোভা পাইতেছে। হেথায়……ধরিত্রীরে—পৃথিবী পবিত্র মূর্তি এই ভারতবর্ষেই প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কবি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষই পৃথিবীর পবিত্র রূপ। হেরো—দেখ। পদ্যে ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় স্তবক

কেহ নাহি জানে—এই রহস্য সকলের নিকট অজ্ঞাত। কার আহ্বানে—কাহার আকর্ষণে, কাহার ডাকে। **কত মানুষের ধারা**—নদীপ্রবাহের ন্যায় অগণিত মানুষের দল। দুর্বার স্রোতে—দুর্দম বেগে। সমুদ্রে হল হারা—ভারতের এই জনসমুদ্রে আসিয়া নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিল। এখানে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত জাতিকে নদীপ্রবাহের সহিত এবং তাহাদের মিলনক্ষেত্র এই ভারতের জনসমূহকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কেহ নাহি…হল হারা—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি নদীস্রোতের মতো আসিয়া এই ভারতবর্ষের মানবজাতির সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে এবং তাহাতে লীন হইয়া আপন বৈশিষ্ট্য ও সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তুলনীয়: "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়"—উপনিষৎ।

কে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানে না; কিন্তু তাহাদের গতিবেগ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

দ্রষ্টব্য ঃ ইতিহাসে অবশ্য এইসকল প্রশ্নের উত্তর আছে। বিভিন্ন জাতিগুলিকে ভারতে ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহাদের নিজ প্রয়োজন অথবা ভারতের অপরিমিত ধনরত্নের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ অথবা তাহাদের রাজ্য-লিপ্সা অথবা ধর্মপ্রচারের প্রেরণা। তাহাদের মধ্যে কেহ আসিয়াছিল পশ্চিম-এশিয়া হইতে, কেহ বা মধ্য-এশিয়া হইতে, আবার কেহ পূর্ব-এশিয়া হইতে। সুতরাং প্রশ্নগুলির উত্তর কেহ জানে না এমন নহে। তবে কবির বক্তব্য—বিধাতা তাঁহার কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতিকে এই ভারত-ভূমিতে ডাকিয়া আনিয়াছেন। এইজন্যই তাহাদের আগমনে বাধা দিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

দ্রাবিড়—আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্বেই এদেশে এক সুসভ্য জাতি বাস করিতেন। ইঁহারা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। **শক-হুন-দল**—ভারতের উত্তরস্থ দুর্ধর্ষ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। শকদের আদি বাসস্থান মধ্য এশিয়া। ইহাদের প্রথম শাসক ময়েস বা মোগ (Moga) খ্রীঃ পূঃ ১৩৫ হইতে ২৫৪ পর্যন্ত ভারতে রাজত্ব করেন। হূনরা জাতিতে মঙ্গোলীয়। হূনরাজ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি ভারতে রাজত্ব করেন। **এক দেহে হল লীন**—ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার সহিত নিজেদের সভ্যতা ও ভাবধারা মিশাইয়া দিয়া একটি নূতন বিরাট সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এখানে একটি নৃতাত্ত্বিক সত্যের প্রতিও কবির ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে ভারতে যে জাতি বাস করিতেছে তাহা বহু জাতির রক্তের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি সংকর জাতি। ভারতবাসীরা খাঁটি আর্য-সন্তান নহে, এক কথায় খাঁটি কোনো জাতিই নহে। **পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার**—পাশ্চাত্য জাতিগুলি আজ তাঁহাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে অর্থাৎ তাহারা আজ নূতনতর দর্শন-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা বিশ্বময় বিলাইয়া দিতেছে। উপহার—প্রাচ্যকে দিবার মতো পাশ্চাত্য জাতীয় জীবনের বহুমূল্য উপাদানগুলি। **দিবে আর নিবে**—ভাব-বিনিময় করিবে। পাশ্চাত্যের ভারতবর্ষকে দিবারও কিছু আছে, আবার ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিবারও কিছু আছে। **মিলাবে মিলিবে**—ভাবের আদান-প্রদানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন সাধিত হইবে।

তৃতীয় স্তবক

রণধারা বাহি—যুদ্ধের স্রোত অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ ভারতবাসিগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া রাজ্য জয় করিবার জন্য। **জয়গান গাহি**—বিজয়সংগীত গাহিতে গাহিতে অর্থাৎ বিজয়ীর রূপে। উন্মাদ কলরবে—উন্মত্ত কোলাহলে, বিজয়োল্লাসে। ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত—মধ্য-এশিয়া ও পশ্চিম-ভারতের মরুভূমি ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবর্ত্ম—অতিক্রম করিয়া। ঐ অঞ্চলে খাইবার, গোমাল ও বোলান গিরিপথ অত্যন্ত পরিচিত। পূর্বকালে অভারতীয় যে সকল জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহারা এই পথেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। **তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে**—তাহারা মরিয়া গেলেও কবি তাহাদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন—বুঝিয়াছেন যে বর্তমান ভারতবাসীর রক্তে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে তাহাদের দান এখনো রহিয়াছে। কেহ নহে নহে দূর—কেহ কবির নিকট হইতে দূরে নহে, কেহই তাঁহার অনাত্মীয় নহে। তাহাদের রক্ত ও তাহাদের ভাবসম্পদ্ তাঁহার দেহ ও মনকে গঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। **আমার শোণিতে……সুর**—বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন রক্তস্রোত কবির অর্থাৎ ভারতবাসীর ধমনীতে প্রবাহিত, এই রক্তের সহিত মিশিয়া আছে বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি ও ভাবধারার এক অপূর্ব বৈচিত্র্যময় সম্মিলন। [এই চরণটির **paraphrase** এইরূপ: কবির রক্তপ্রবাহে বহুজাতির (=তারি) বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে। সমন্বয়=বিভিন্ন সুরের সংগতি বা ঐকতান।] কবি ভারতবাসীর সাংকর্যের কথাটি সুর-সংগতি তুলনায় ব্যক্ত করিতেছেন। **হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো**—কবি রুদ্রের বীণাকে আহ্বান করিয়া প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসকেই আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু ধ্বংসের মধ্য দিয়াই হয় সৃষ্টি, সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই হয় বৃহত্তর এবং উন্নততর মিলন। ভারতবর্ষের মহাজাতীয়তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে এখনো যেটুকু অবশিষ্ট আছে, কবি সেইটুকু সম্পাদনের জন্যই পুনরায় সংঘর্ষ ও ধ্বংসকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু রুদ্রের সহিত বীণার কল্পনা কোথাও নাই। রুদ্রের হস্তে প্রলয়-বিষাণই কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং কবি রুদ্রবীণার দ্বারা সম্ভবতঃ প্রলয়ের ন্যায় সর্বধ্বংসী কোনো এক মহাবিপ্লবের সুর কল্পনা করিয়াছেন। এই অর্থে, রবীন্দ্রনাথ বাহ্য কোনো বিপ্লবের আহ্বান করিতেছেন না। মানুষের অন্তর্লোকের কুসংস্কার, মিথ্যা লাজ-ভয় প্রভৃতি, যাহা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের বিনাশের জন্য প্রয়োজন কোনো

এক অন্তর্মুখী শক্তির প্রতিক্রিয়া। সুতরাং বীণাধ্বনির ন্যায় এমন একটি প্রভাবের কল্পনা করা হইয়াছে যাহা মানুষের অন্তর্লোকে এইরূপ বিপ্লব ঘটাইতে পারে। বন্ধ নাশিবে—বাধা দূর হইবে।

চতুর্থ স্তবক

বিরামবিহীন—অবিরত। ওঙ্কারধ্বনি— প্রণব। অ, উ, ম এই তিনটি ধ্বনির সমষ্টির নাম ওঙ্কার। ইহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বাচক বীজমন্ত্র বলা হয়। হৃদয়-তন্ত্রে—হৃদয়রূপ বীণার তারে। এই হৃদয় হইল ভারতীয় হৃদয়—বিশিষ্ট কৃষ্টির অধিকারী ভারতবর্ষেরই ইহা নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। কবি নিজেই বলিয়াছেন—"বীণাতে—সরু মোটা-চড়া-খাদ নানা সুরের বহু তার রয়েছে।··· কলারসিকের হাতে সব তারের সব সুর মিলিয়েই পরিপূর্ণ সংগীত বীণায় বাজে। ভারতও যেন একটি বহুতন্ত্রী বীণা। এখানে নানা সাধনার সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ সমবেত সংগীত জাগিয়ে তোলাই হ'ল ভারতের মহাপুরুষদের সাধনা।" **একের মন্ত্রে**—একত্বের মন্ত্রে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো ভেদ নাই। 'সোঽহম্' অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আমি'—ইহাই তাহাদের মূল মন্ত্র। পরমাত্মাই জীবাত্মায় বিরাজমান। অতএব সকল মানুষই এক—তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'একের মন্ত্র' দ্বারা সম্ভবতঃ ভারতীয় ঐক্যসাধনার মন্ত্র বা আদর্শকেই বুঝাইতেছেন। সাধকপ্রবর কবীর যেমন বলিয়াছিলেন, 'পংথ বীণা সত ধুন উচারৈ' (অর্থাৎ সর্বপথের সমন্বয়-বীণার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে), রবীন্দ্রনাথ এখানে তেমনি বলিয়াছেন যে ভারতে একদা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে সুর-সংগতি' ধ্বনিত হইয়াছিল। রনরনি—ঝংকৃত হইয়া। ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া। **একের অনলে**—একত্বরূপ মহাযজ্ঞের অগ্নিতে। **বহুরে**—জাতিগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত বৈষম্যকে। **আহুতি দিয়া**—অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, বিসর্জন দিয়া। **একটি বিরাট্ হিয়া**—বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার চেতনাসম্পন্ন এমন একটি হৃদয় যাহা সকল ভারতবাসীর বিচিত্র হৃদয়বৃত্তির সমন্বিত রূপ। হিয়া—হৃদয়। তুলনীয়: "বাঙালীর হিয়া-অমিয় মাথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"—সত্যেন্দ্রনাথ। **যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার**—প্রাচীন ভারতের সর্বজাতির মধ্যে ঐক্যস্থাপন ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মানসযজ্ঞের আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মহাজাতীয়তা পূর্ণাঙ্গ হয়

নাই। যজ্ঞাগারের রুদ্ধ দ্বার আজ আবার খুলিয়া অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হইবে এবং মহামানবতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আনত শিরে—সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে। হেথায়……শিরে—সকলকেই শ্রদ্ধানম্র চিত্তে ভারতের এই মহামিলন-যজ্ঞে আসিয়া যোগদান করিতে হইবে।

পঞ্চম স্তবক

সেই হোমানলে—মহামিলন-যজ্ঞের অগ্নিতে। **দুঃখের রক্তশিখা**—দুঃখরূপী অগ্নির লোহিত শিখা। যে পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে মিলনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতবাসী তাহাদের সম্প্রদায়গত ভেদ ও সংকীর্ণতার ফলে সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে নানারূপ দুঃখ, অশান্তি ও পাপ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। হবে তা সহিতে—তাহা অর্থাৎ সেই দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, কারণ ইহা স্বকৃত। এই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিলে সেই প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। **শোনো রে একের ডাক**—একত্বের আহ্বান শ্রবণ কর। দুঃখ অশান্তি ও নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সেই একত্বের, সেই মহাজাতীয়তার আহ্বানে সাড়া দাও। ভারতবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবির এই উক্তি। জন্ম……প্রাণ—একটি বিরাট্ হৃদয়ের জাগরণ হইবে। আদর্শভ্রষ্ট ভারতবাসী আবার নূতন প্রাণে নূতন অখণ্ড মহাজাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবে। পোহায় রজনী—রাত্রি প্রভাত হইতেছে, ভারতবাসীর দুঃখনিশার অবসান হইতেছে। জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে—পক্ষী যেরূপ তাহার কুলায়ে রাত্রি প্রভাত হইলে জাগিয়া উঠে, ভারতমাতাও সেইরূপ এই বিশাল ভারতবর্ষে ভারতবাসীর নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছেন।

ষষ্ঠ স্তবক

ধরো হাত সবাকার—ভ্রাতৃভাবে সকলের হস্ত ধারণ কর; সকলের সহিত তোমার বৈষম্য ভুলিয়া যাও। **পতিত**—ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত জাতিসমূহ। **মার অভিষেকে**—ভারতবাসীর হৃদয়ে ভারতীয় বিশ্ব-মানবতার মাতৃরূপিণী ধ্যানমূর্তির প্রতিষ্ঠা-উৎসবে। **মঙ্গলঘট**—শুভ উৎসবের মঙ্গল-কলস। **সবার……তীর্থনীরে**—ভারতের আপামর সাধারণের দ্বারা স্পৃষ্ট পুণ্য তীর্থোদকে। অভিষেকাদি শুভ অনুষ্ঠানের সময় নানাতীর্থ হইতে

আনীত পুণ্যোদক এদেশে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতে অভিষেকের সময় রাজাকে সপ্ততীর্থের জলে স্নান করানো হইত। অভিষেক—অভি—সিচ্+ ঘঞ্। সিচ্ ধাতুর অর্থ 'সেচন করা'।

ব্যাখ্যা

(১) পশ্চিম আজি…………সাগরতীরে। (স্তবক ২)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অন্তর্গত। অতীতকালে এই ভারতবর্ষে আর্য অনার্য, দ্রাবিড়-চীন, শক-হূন, পাঠান-মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি তাহাদের সকল স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এতদিন যাহারা এই মহামিলনে যোগদান করিতে পারে নাই সেই পাশ্চাত্ত্য ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহ বর্তমানে ভারতের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। সকলেই এখন অনায়াসে পাশ্চাত্ত্য দেশে যাইতে পারে এবং সেখান হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরাও ভারতবর্ষে আসিতেছে। ভারতীয়েরা যেমন প্রতীচ্য হইতে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, প্রতীচ্যও তেমনি ভারতবর্ষ হইতে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতেছে। এইরূপে ভাব, কৃষ্টি ও সভ্যতার আদান-প্রদানের দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন ঘটিবে—ইহাই কবির বিশ্বাস। বস্তুতঃ, এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মিলনে গঠিত বিরাট্ মানব-জাতি যেন একটি বিশাল সমুদ্র। সকলে আসিয়া ভারতের এই মহাজাতীয়তাকে সম্পূর্ণ করিবে।

(২) রণধারা…………বিচিত্র সুর। (স্তবক ৩)

আলোচ্যমান অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি ভারতবর্ষকে মানবজাতির মিলনক্ষেত্র তথা তীর্থক্ষেত্ররূপে দেখিতে পাইয়াছেন এবং ইহার মধ্যেই তিনি এক মহামানবতার আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছেন।

যুগ যুগ ধরিয়া রহস্যনিবিড় কোন্ দুর্বার এক আকর্ষণে জাতির পর জাতি আসিয়া ভারতের দ্বারে হানা দিয়াছে। তাহাদের কেহ বা জয়িষ্ণু, কেহ বা লুণ্ঠনকামী, কেহ বা আসিয়াছে অন্যতর উদ্দেশ্য লইয়া। কিন্তু শেষপর্যন্ত সকলকেই ভারতের জনগণের মধ্যে লীন হইয়া যাইতে হইয়াছে। এমনকি

রণমদোন্মত্ত যে সকল জাতি শত্রুরূপে দুস্তর মরু ও দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া বিজয়োল্লাসে কেবলমাত্র জয়লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্যই এদেশে আসিয়াছিল, তাহারাও ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। তাহারাও তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া কালক্রমে ভারতীয় মহাজাতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপে এইসকল বিজেতা জাতির রক্তধারাও ভারতের জনগণের রক্তস্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের সকলের সহিত কবির আত্মীয়তা-বোধ তাই সদাজাগ্রত। তাঁহার তথা সকল ভারতবাসীর শোণিতধারা যে বিভিন্নজাতির দানে পরিপুষ্ট, এই সত্য তিনি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছেন। তান, লয়, স্বর প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে যেরূপ সুরের বিকাশ, সূক্ষ্মস্থূল উচ্চনীচ বিভিন্ন সুরের সমন্বয়ে যেরূপ বীণাধ্বনি গঠিত, সেইরূপ বিচিত্র উপাদানে গঠিত সেই শোণিতধারায় যুগপৎ বৈচিত্র্য ও সমন্বয় কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে।

(৩) হে রুদ্রবীণা…………সাগরতীরে। (স্তবক ৩)

আলোচ্যমান অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতবর্ষ মানবজাতির একটি তীর্থক্ষেত্রস্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত মানুষ যুগে যুগে এখানে আসিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষে যে এক মহাজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কবি মহামানবতার আদর্শ দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু এই মিলন, এই মহামানবতার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল কিরূপে? ইহা সম্ভব হইয়াছিল ভারতবর্ষের চিরন্তন এক সাধনার ফলে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ ঐক্যের পূজারী। তাই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিভেদের মধ্যে ঐক্য আনিতে পারিয়াছিল। কালক্রমে কিন্তু এই সাধনা ভারতবাসী ভুলিয়া যায়। বিশেষতঃ, বিদেশী জাতিসমূহের অনেকেই ভারতের এ সুমহান্ আদর্শ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তাই স্বদেশী এবং বিদেশী অনেকেই ভারতবর্ষ ও তাহার সাধনাকে ঘৃণা করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছে। কবি তাই প্রলয়ের দেবতা রুদ্রকে আহ্বান করিতেছেন। ভারতের

আদর্শ ও সাধনা-সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত এই যে ঘৃণা, তাহা রুদ্রের প্রলয়সংগীতে ধ্বংস বিলুপ্ত হউক—ইহাই কবির প্রার্থনা। তাহা হইলে পুনরায় ভারতের সনাতন সাধনা উজ্জীবিত হইবে; সকলপ্রকার বিরোধ, বিচ্ছেদ এবং বিভেদ দূরীভূত হইয়া যাইবে। ভারত আবার মানবজাতির মিলনক্ষেত্ররূপে, বিশ্ববাসীর তীর্থক্ষেত্ররূপে সগৌরবে আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিবে।

['রুদ্রবীণা' কথাটির উপর টীকা লেখ।]

(৪) হেথা একদিন ·········বিরাট্ হিয়া। (স্তবক ৪)

এই ছত্রকয়টি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' কবিতার অংশ। অতীত যুগের ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জ্বল চিত্র কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাকে মানুষের এক মিলনক্ষেত্ররূপে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি—শক, হূন, মোগল, পাঠান, দ্রাবিড়, চীন, আর্য, অনার্য প্রভৃতি—এই দেশে আসিয়া এক মহামানবতার মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে ইহা সম্ভব হইয়াছে? ভারত এইসকল বিভিন্ন উপাদানকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল কেমন করিয়া? আলোচ্যমান অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ তাহারই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ভারতের এই আত্তীকরণের শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহার এক ঐক্যসাধনার মধ্যে। এই সাধনা একদিক্ দিয়া যেমন ঐক্যবিধান করিয়াছে, অন্যদিক্ দিয়া তেমনি অনৈক্যের বিনাশ করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে যজ্ঞের অনলের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। ঘৃতাহুতির ন্যায় বহুত্ববোধকেই সেই সাধনযজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, বহুত্ববোধ হইতেই অনৈক্যের সৃষ্টি। মানুষ মানুষ হইতে পৃথক্, এই কারণেই তাহারা বহু—এইপ্রকার বোধ ঐক্যের পরিপন্থী। এইজন্যই ভারতবর্ষ তাহা পরিহার করিয়াছিল।

বস্তুতঃ, ভারতের মুনিঋষিগণ পরব্রহ্ম এবং তাঁহার সৃষ্টিকে যেমন একদিক্ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভিন্নরূপে দেখিয়াছেন, তেমনি আবার সমগ্র বিভিন্নতার অন্তর্নিহিত শাশ্বত ঐক্যটিও উপলব্ধি করিয়াছেন। ভগবান্‌কে তাঁহারা যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তারূপে দেখিয়াছেন, আবার এই তিনটি রূপ মিলাইয়াই

যে পরব্রহ্ম ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। ফলে এই বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুর আপাতবৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের অন্তরালে একটি নিগূঢ় ঐক্যবোধ একদা ভারতবাসীর চেতনা ব্যাপিয়া থাকিত এবং সেজন্য তাহাদের মধ্যে হৃদয়গত এমন একটি ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের সহিত তুলনীয়। ভিন্ন সুরের বিভিন্ন তন্ত্রী-সমন্বিত এইপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের অন্তিম সুরটি যেমন একটি সুকুমার ঐক্যে সুসমঞ্জস হইয়া উঠে, সেইরূপ ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীর বিচিত্র হৃদয়বৃত্তির মধ্যেও একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে মানুষে মানুষে সকল আপাতবিরোধ তিরোহিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে যেন একটি বিরাট্ হৃদয় গঠিত হইয়াছিল।

[মহাওঙ্কারধ্বনি, একের মন্ত্র, একটি বিরাট্ হিয়া—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(৫) **তপস্যাবলে·········বিরাট্ হিয়া।** (স্তবক ৪; ক. বি. ১৯৪৮; ম. প. ১৯৫৫)

(৪) ব্যাখ্যা দেখ।

(৬) **সেই হোমানলে······দূরে যাক।** (স্তবক ৫)

আলোচ্যমান অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' কবিতার অন্তর্গত। এস্থলে কবি, ভারতবর্ষ তাহার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের তুলনায় বর্তমানে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের এই অধঃপতন ভারতবাসীর এই সব অপরাধের জন্যই হইয়াছে—ইহাই তাঁহার অভিমত।

সকলপ্রকার অনৈক্য এবং পার্থক্য বিসর্জন দিয়া এই দেশে একটি বিরাট ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে ভারতবাসী তাহাদের এই চিরন্তন সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার শাস্তিস্বরূপই বর্তমান লাঞ্ছনা অনিবার্য। কবির দৃষ্টিতে সেই ঐক্যের সাধনা হোম। তাহাতে যেন আমাদের পাপের স্পর্শ লাগিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে হানাহানি এবং তাহার জন্য যে রক্তস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই যেন প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হোমাগ্নির রক্তশিখায়। কবির দৃষ্টিতে ইহা অতিশয় অমঙ্গলদ্যোতক।

কিন্তু এই অনিবার্য দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে। এইসঙ্গে ভারতের অন্তরের সাধনাটিকে—সেই পরম ঐক্যবোধটিকে—হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে।

তাহা হইলেই আবার ভারত হইতে সমস্ত বিভেদ দূর হইয়া যাইবে, তাহার সকল লাঞ্ছনার হইবে অবসান। ভারতবাসী আবার ভারতবাসীকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে কোনো লজ্জা পাইবে না, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে ভয় পাইবে না এবং যে ভ্রান্ত অপমান-বোধ সমাজ-জীবনে একটি কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে তাহারও অবসান ঘটিবে।

['একের ডাক'—এই অংশটির উপর টীকা লেখ।]

(৭) মার অভিষেকে.........সাগরতীরে। (স্তবক ৬)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' কাবিতার শেষাংশ। অদূর-ভবিষ্যতে সকলপ্রকার ভেদাভেদ দূরীভূত হইয়া ভারতে পুনরায় তাহার সনাতন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কবি এস্থলে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ভারতমাতার অভিষেক-উৎসবে সম্মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

শতাব্দীর আরাধনালব্ধ বহুত্বের মধ্যে একত্ববোধ যেদিন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেইদিন হইতে মন্ত্রভ্রষ্ট ভেদবিড়ম্বিত এই ভারতে সহনাতীত এক দুঃখের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় জাগরণের দিনে কবি অনুভব করিয়াছেন, সেই দুঃখের অবসান আসন্ন। এই বিশ্বাসে কবি আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজ-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলকেই সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা ত্যাগ করিয়া পবিত্র উদার চিত্তে ভারতমাতার পূজাপ্রাঙ্গণে সমবেত হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

কবির দৃষ্টিতে ভারতমাতা আজ মহামানবতার বিশ্বোদার মাতৃরূপিণী ধ্যানমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই মাতৃমূর্তি প্রতিহৃদয়ে নিবিড় উপলব্ধির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেবতা-প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেরূপ তীর্থোদকে পরিপূর্ণ করিয়া মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ ভারতমাতার প্রতিষ্ঠার পূর্বেও আমাদের হৃদয়কে ঐক্যবোধের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সকল ভারতবাসীরই ইহাতে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা এই অভিষেক-ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

[অভিষেক, মঙ্গলঘট, তীর্থনীড়—এই কথাগুলির উপর টীকা লেখ।]

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে অনুভূতি ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তোমার কথায় লেখ।

(ক. বি. ১৯৪৩)

উ.। **মর্মার্থ** দেখ।

প্র.। 'ভারত-তীর্থ' কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া উহার ঐরূপ নামকরণের কারণ নিদেশ কর। (ক. বি. ১৯৪৭)

উ.। **মর্মার্থ ও নামকরণ** দেখ।

প্র. ৩। 'ভারত-তীর্থ' কবিতার বিষয়বস্তুর আলোচনা কর।

(ক. বি. ১৯৪৭)

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

প্র. ৪। 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় ভারতের সভ্যতায় বৈশিষ্ট্য কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তোমার মন্তব্যসহ তাহা ব্যক্ত কর।

উ.। 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যকেই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে ভারতবর্ষ মানবজাতির মিলনক্ষেত্র। ধ্যানমৌন হিমাচল যোগাসনে বসিয়া আছেন এই দেশের উত্তরে। নদ-নদীসমাকুল বিস্তীর্ণপ্রান্তর-সমন্বিত এই বিরাট্ দেশ, সেই শান্তসমাহিত ধ্যানের প্রশস্ত-ক্ষেত্ররূপে আশ্রমের মহিমা ধারণ করে। কবির চক্ষে তাই এই ভূভাগ নিত্যপবিত্র। এখানে আসিলে মানুষের জিঘাংসা লুপ্ত হয়, উগ্র চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়, একটা বিস্ময়পূরিত শ্রদ্ধায় অন্তর্লোকে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে ঐক্যের বোধ। কবি তাই ভারতের ভূপ্রকৃতির বর্ণনায় এই দেশকে একটা মহামানবতার তীর্থক্ষেত্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাহার পর কবি, ভারতের এই পটভূমিকায় দূর অতীত হইতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের অনিবার্য পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন। এত দেশের এত মানুষ এমনভাবে কেন যে ভারতবর্ষে আসিত তাহা ঐতিহাসিকেরা একভাবে ব্যাখ্যা করেন। কবি বলেন, এই সকল ব্যাখ্যাও ঠিক নহে। কেহই মানুষের এই ভারতমুখী অভিযানের কারণ সঠিক বলিতে পারে নাই, কেহই জানে না কিসের আকর্ষণে এত মানুষের এত শত ধারা ভারতের দিকে বহিয়া আসিত।

কবিও এ বিষয়ে নিশ্চয় অজ্ঞান, তবু তাঁহার কল্পনায় যেন এমনতর একটা ধারণা অনুস্যূত যে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতিই সেই আকর্ষণ। তাই কত ভাবে কত জাতির মানুষ যুগে যুগে এদেশে আসিল। কেহ আসিল মুক্ত তরবারি-হস্তে যুদ্ধের উন্মাদনায়, কেহ আসিল দুস্তর মরু আর দুর্লঙ্ঘ্য গিরি অতিক্রম করিয়া বিজয়-অভিযানে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সকলেই এই দেশবাসীর মধ্যে নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এইভাবে শক-হূন-দ্রাবিড়-চীন-মোগল-পাঠান—সকলেই ভারতের মানুষের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের মানুষ যেন একটা মনুষ্যসমুদ্র আর সবই মানুষের নদীধারা। সমুদ্রে আসিয়া নদীগুলির স্বাতন্ত্র্য তাই আজ অবলুপ্ত। কবি ইহার মধ্যে ভারতের ঐতিহ্যের একটি মূলসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। এককালে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধানই ছিল ভারতের সাধনা। ওঁ-মন্ত্র তো সেই সাধনারই বীজ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-রূপে যাঁহারা বিভিন্ন, ওঁ-মন্ত্রে তাঁহারাই এক ব্রহ্ম। আপাতবৈচিত্র্যের মধ্যে এই নিগূঢ় ঐক্যবোধই ভারতের সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য। ইহারই প্রভাবে ভারতে আগত সকল মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে এক হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় এই উপলব্ধির কথা কিছুটা আত্মমগ্ন-ভাবেই বলিয়াছেন। কোথাও যেন আবার অতিসচেতনভাবেই ইহার জল্পনা করিয়াছেন। ফলে ভারতের সভ্যতার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল রূপরেখায় সম্পূর্ণ পরিস্ফুট—একথা বলা দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপ মোগল-পাঠানের অংশ-বিশেষ ছাড়িয়া দিলে সমগ্রত কোথায় কিভাবে তাহারা ভারতীয় মানুষের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া লীন হইয়া গিয়াছিল তাহা স্পষ্ট নয়। নূতন যুগে ভারতীয় সভ্যতার সাধনাযজ্ঞের হোমানলে যে দুঃখের রক্তশিখা কবি মর্মান্তিক বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কি ঐ মোগল-পাঠানের ধর্মসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান হইতে উদ্ভূত নয়? অথবা তাহা কি 'অশুচিমন' ব্রাহ্মণের বর্ণধর্মের বিকারজাত? এখানে কবি সত্যই অতীব অস্পষ্ট। অথচ তিনি অন্ধযুগের অবসানে ভারতীয় সাধনার পুনরুদয়ের আশু সম্ভাবনাও দেখিয়াছেন। উহা কি বাহ্যঘটনানিরপেক্ষভাবে শুধু বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত কবির অন্তর্লোকের বাণী? এই কয়টি অস্পষ্ট ইঙ্গিত বাদ দিলে কবিতাটির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যটুকু সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে বলিতে পারি। ভারত মানুষের মিলনক্ষেত্র। ভারতীয় সভ্যতার যে-রসায়নে বিচিত্র মানুষের সকল আপাত-বৈষম্যের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই উহার

পরম বৈশিষ্ট্য এবং এই কবিতায় সেই বৈশিষ্ট্যটুকুই উল্লিখিতভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ আজো = আজ + ও (বাঙলা সন্ধি)।

সমাস ঃ নরদেবতারে—নররূপী দেবতা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাকে। পরমানন্দে—পরম আনন্দ (কর্মধারয়), তাহাতে। নদীজপমালা-ধৃত—জপের জন্য মালা (৪র্থীতৎপুরুষ) ; নদীরূপ জপমালা (রূপক-কর্মধারয়), ধৃত হইয়াছে নদীজপমালা যাহার দ্বারা (বহুব্রীহি), সে ('প্রান্তর' পদের বিশেষণ)। ধ্যানগম্ভীর—ধ্যানের দ্বারা গম্ভীর (৩য়াতৎপুরুষ) অথবা, ধ্যানহেতু গম্ভীর (৫মীতৎপুরুষ)। মহামানবের—মহান্ মানব অর্থাৎ বিপুল জনসমষ্টি (কর্মধারয়), তাহার। জয়গান—জয়সূচক গান (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। উন্মাদকলরবে—কল এই রব (সুপ্ সুপা) ; উন্মাদ (বিশেষণ) কলরব (কর্মধারয়), তাহাতে। মরুপথ—মরুমধ্যস্থ পথ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মহাওঙ্কারধ্বনি—ওম্ এই কার (সুপ্ সুপা), ওঙ্কারের ধ্বনি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); মহান্ ওঙ্কারধ্বনি (কর্মধারয়, সন্ধি করা হয় নাই)। হোমানলে—হোমের জন্য অনল (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। মঙ্গলঘট—মঙ্গলের জন্য ঘট (৪র্থীতৎপুরুষ)। সবার-পরশে-পবিত্র-করা—সবার পরশ (অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার দ্বারা পবিত্র-করা [অলুক্ ৩য়াতৎপুরুষ ('পবিত্র-করা' একসঙ্গে বিশেষণপদ)]।

সাধু শব্দ-রূপ ঃ হেরো—দেখো। বিরাজে—বিরাজ করে। ধ্বনিতে—ধ্বনিত হইতে। নাশিবে—নাশ পাইবে বা নষ্ট হইবে। রনরনি (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—রনরন করিয়া, রনিত হইয়া। সবারে—সকলকে। মিলিবারে—মিলিতে। দহিতে—দহন বা দগ্ধ করিতে। লভিবে—লাভ করিবে। সবাকার—সকলের। ত্বরা—সত্বর। হেথায়—এখানে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ দুর্বার—দুর্ – বৃ + ণিচ্ + খল্। লীন—লী + ক্ত। বন্ধ—বন্ধ্ + ঘঞ্ (বিশেষ্য)। আর্য—ঋ + ণ্যৎ। দুঃসহ—দুর্ – সহ্ খল্।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ নদীজপমালাধৃত (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) —সমাস দ্রষ্টব্য। বহুব্রীহি-সমাসে পদটি হওয়া উচিত 'ধৃতনদীজপমালা'

('প্রান্তর'-এর বিশেষণ)। রবীন্দ্রনাথের 'নদাজপমালাধৃত', কি বলিব ?— অশুদ্ধ, না, আর্ষপ্রয়োগ ? অবশ্য 'আহিতাগ্নি' পর্যায়ে ফেলিলে প্রয়োগটিকে শুদ্ধও বলা যায়।

গিরিপর্বত—কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে এটি সমার্থক দ্বন্দ্ব, কারণ 'গিরি' ও 'পর্বত'-এর একই অর্থ। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহা দ্বন্দ্বের উদাহরণ মোটেই নয়, সমার্থক যুগ্মশব্দের উদাহরণ।

ধ্বনিতে—সংস্কৃত 'ধ্বন্' ধাতু+ইতে। সংস্কৃত ধাতু হইতে সৃষ্ট বাঙলা ক্রিয়া, প্রয়োগ কেবল পদ্যে।

লভিবে—লভ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইবে। পূর্ববৎ।

পোহায়—'আত্মবিলাপ' কবিতায় 'পোহাইবে' পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

সবাকার—সব (সর্বনাম)+ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'কার'।

পরশে—স্পর্শে>পরশে : বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।

অর্থগত পার্থক্য : দুর্বার—যাহাকে কষ্টে নিবারণ করা যায়; দূর্বার—দূর্বা-ঘাসের। মিলাবে—মিশাইবে ; মিলিবে—নিজে মিশিবে। নীড় —পাখীর বাসা ; নীর—জল। আহুতি—হোম ; আহুতি—আহ্বান।

বাক্য-রচনা : নরদেবতা : আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস নরদেবতা।

ধ্যানগম্ভীর : ধবলগিরির শৃঙ্গকে দেখিলে ধ্যানগম্ভীর ধূর্জটী বলিয়া মনে হয়।

দুর্বার : বীর বাদল দুর্বার বিক্রমে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।

দুঃসহ : পরাধীনতার জ্বালা দেশপ্রেমিকের পক্ষে সত্যই দুঃসহ।

প্রতিনিধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' ও 'ভারত-তীর্থ' কবিতার ভূমিকা দেখ।

উৎস—রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-নামক কবিতাগ্রন্থ হইতে আলোচ্যমান কবিতাটি উদ্ধৃত। 'কথা'র কবিতাগুলি সকলেই এক একটি মহৎ আদর্শের কাহিনী। কবি ইহাদের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন অতীতদিনের বৌদ্ধ শিখ

মারাঠা রাজপুত প্রভৃতি জাতির ইতিহাস হইতে। আলোচ্যমান কবিতার ঘটনাটির জন্য কবি অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেবের নিকট ঋণী। অ্যাক্‌ওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠী গাথা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় 'প্রতিনিধি' কবিতার ঘটনাটি বিবৃত আছে। রবীন্দ্রনাথ উহাকেই অবলম্বন করিয়া অপূর্ব ভাষায় এই মহৎ আত্মত্যাগের কাহিনীটিকে ছন্দোরূপে মহিমান্বিত করিয়াছেন।

নামকরণ—ছত্রপতি শিবাজির একটি কাহিনী লইয়া আলোচ্যমান কবিতাটি রচিত। শিবাজির গুরু ছিলেন সন্ন্যাসী রামদাস। রাজা যাঁহার শিষ্য, তিনি নিজে একজন ভিক্ষুক—এ দৃশ্য একদিন শিবাজির পরম বিস্ময় উৎপাদন করিল। তিনি গুরুর সকল অভাব মোচন করিবার জন্য তাঁহাকে সমগ্র রাজ্যটি উপহার দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার দাসরূপে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। দিবাশেষে গুরুশিষ্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। রাজা শিবাজি নিবেদন করিলেন যে, তিনি ইহার চেয়েও গুরুতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। রামদাস তখন শিবাজিকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যেন তিনি রাজ্য শাসন ও পালন করেন। এইরূপে ভিখারী রামদাস রাজা, শিষ্য শিবাজি তাঁহার অনাসক্ত প্রতিনিধি মাত্র হইলেন। আলোচ্যমান কবিতার ইহাই বিষয়বস্তু। এইজন্য ইহার শীর্ষনাম 'প্রতিনিধি'।

ছন্দ—কবিতাটি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ইহার লক্ষণ: ৮+৮+১০।

সমালোচনা—'কথা'র অন্যান্য কবিতাগুলির ন্যায় 'প্রতিনিধি'ও একটি গাথা। ইহার মধ্যে দেখিতে পাই গীতি ও গল্পের যুগপৎ সমাবেশ—শুধু সমাবেশও নয়, সমন্বয়। কাহিনীটি হইল ত্যাগমণ্ডিত মহৎ আদর্শের; নায়কের ভূমিকায় রহিয়াছেন স্বয়ং ছত্রপতি শিবাজি। সুতরাং নিছক গল্পহিসাবেও ইহা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক। মহাবীর শিবাজির রাজমহিমার মধ্যে যে একটি মহান্‌ ত্যাগমন্ত্র নিগূঢ় রহিয়াছে, তাঁহার গৈরিক পতাকায় যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে একটি ঘটনার অনির্বচনীয় ইতিহাস—তাহার কথা চমৎকারিত্বে ও মহত্ত্বে আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

দ্বিতীয়তঃ, গল্প এখানে গীতের সাবলীল প্রবাহে যেন স্বতঃস্ফূর্ত। একটা কাহিনীকে ছন্দে বাঁধিয়া দেওয়া এক কথা, আর গীতিচ্ছন্দে কাহিনীর আপনাতে আপনি ফুটিয়া উঠা ভিন্ন কথা। প্রথম কাজ ছান্দসিকের, দ্বিতীয় কাজ কবির।

'প্রতিনিধি'র মধ্যে পাই কবির আবেগ-রসায়নে জারিত কাহিনীর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তাই ছন্দ ও ভাব এখানে একাত্ম। আবেগ অদ্বৈত। আপাতদৃষ্টিতে ইহার মধ্যে রামদাসের যে গানগুলি রহিয়াছে তাহাদের সহিত মূল কাহিনীটির অন্তরঙ্গ যোগসূত্র নাই বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই কবিতাটির আধ্যাত্মিক সুর প্রগাঢ় করিয়াছে এবং সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে ভাবসংহতি দৃঢ়তর করিয়াছে। শিবাজির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—রাজার গুরু হইয়াও রামদাস কেন ভিক্ষুক। রামদাসের সংগীতে তাহার উত্তর পাই—ইহার কারণ এই যে তিনি সন্ন্যাসী। "সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ।" অখিলপতি মহেশ্বর বিশ্বের অধীশ্বর। তথাপি তিনি ভিক্ষাজীবী ভোলানাথ। এই আদর্শের মূর্তপ্রতীক রামদাস এবং তাঁহার সংগীতগুলির মর্মকথাও তাহাই। রামদাসের নিকট শিবাজির যে রাজধর্মে নূতন দীক্ষা এই কবিতায় বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূলেও একই মর্মবাণী অনুরণিত দেখিতে পাই। সর্বেশ্বর হইয়াও সর্বস্বহীন হইতে হইবে—এইরূপ অনাসক্ত ত্যাগেই প্রতিষ্ঠিত শিবাজির রাজপ্রতিনিধিপদ। অতএব সহজ ভাষায় সরল ভাবাবেগ এখানে একটিমাত্র ধারায় প্রবাহিত এবং একটিমাত্র রসমাধুর্যে সংহত। এই হিসাবে কবিতাটি গীতিকবিতার গুণসম্পন্ন। কিন্তু গীতির মধ্যে অনুস্যূত হইলেও গল্প এখানে গৌণ নয় বলিয়া কবিতাটি সর্বাবয়বে একটি প্রকৃষ্ট গাথা-ই বটে।

ইংরেজী ব্যালাড বা গাথা কবিতার অপর একটি বৈশিষ্ট্যও আলোচ্যমান কবিতায় লক্ষণীয়। ইহা কাহিনীর নাটকীয় উপস্থাপন। সাঁতারা ('সেতারার') দুর্গশীর্ষে আসীন শিবাজি দেখিলেন ভিক্ষুক রামদাস প্রাণভোলা গান গাহিয়া চলিয়াছেন। পরম বিস্ময় উপস্থিত হইল; মুহূর্তে চিরকুটে লিখিয়া দান করিলেন রাজ্য। তারপর যখন জানিলেন রাজ্য-পরিচালনা ভিন্ন আর তাঁহার অন্য কোনো গুণ নাই, তখন গুরুর দাসত্বই হইল শিবাজির একমাত্র সম্বল। ভিক্ষার থলি উঠিল রাজার স্কন্ধে। ইহার পর শিবাজির কঠিন পণ, তাঁহাকে ভিক্ষুক-রাজার গুরুভার প্রতিনিধিত্ব অর্পণ এবং সর্বশেষে রামদাসের সংগীতে এই নূতন রাজধর্মের মর্মব্যাখ্যা। এইসকল বিবরণই পারম্পর্যের উপস্থাপনায় নাটকীয় গুণসম্পন্ন। তাই পাঠশেষেও কবিতাটির মহান্ প্রভাব মানসলোকে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

পরিশেষে আলোচ্যমান কবিতাটির বর্ণনা-নৈপুণ্য-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। পুরদ্বারে গুরুর সহিত শিবাজির ভিক্ষার চিত্রটি স্বল্প পরিসরে

কেমন সুস্পষ্ট। নদীতীরে নব রাজধর্মে দীক্ষার পর, চিন্তিত শিবাজির এবং সন্ধ্যাসমাগমের ছবিটি অপূর্ব। এমন অল্পকথায় নিপুণ পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কণ একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিল্পীরই সাধ্য।

সংক্ষিপ্তসার—একদিন প্রভাতে সেতারার দুর্গচূড়ায় বসিয়া শিবাজি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার গুরু রামদাস নিরন্ন ভিক্ষুকের ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন। এই দৃশ্যে শিবাজির মনে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইল। তিনি ভাবিলেন, এত ঐশ্বর্য বৈভব থাকিতেও গুরুর বুঝি বাসনার তৃপ্তি হয় নাই, তাই তিনি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। শিবাজি তাঁহার সমগ্র রাজ্য গুরুপদে সমর্পণ করিয়া দেখিতে চাহিলেন, কিসে তাঁহাকে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করা যায়, এবং এই মর্মে একখানি লিপি লিখিয়া রামদাসকে দিবার জন্য বালাজির হাতে দিলেন। রামদাস তখনও গান গাহিতে গাহিতে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সেই গানের মর্ম এই যে, তিনি সর্বত্যাগী শংকরের উপাসক হইয়া অন্নপূর্ণার কৃপাপুষ্ট ঘর ছাড়িয়া পথকেই বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুর্গদ্বারে আসিলে বালাজি তাঁহার পদমূলে শিবাজির পত্রখানি রাখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া গুরু, তাঁহাকে শিষ্যের রাজ্যদানের সংকল্প জানিতে পারিলেন। পরদিন রাজার নিকট গিয়া তিনি জানিতে চাহিলেন, রাজ্য ত্যাগ করিয়া শিবাজি কি করিবেন ; কি গুণ তাঁহার আছে। শিবাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি সানন্দে গুরুসেবায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। রামদাস তখন আপন ভিক্ষার ঝুলিটি শিষ্যের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে লইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা, বিমূঢ় বিস্ময়ে, সলজ্জ ভয়ে ভিক্ষা দেয় আর ভাবে—মহতের লীলারহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়। দ্বিপ্রহরে পুরবাসীরা যখন বিশ্রাম করিতেছে, তখন রামদাস একতারা বাজাইয়া ভক্তির কাঙাল ত্রিভুবনেশ্বর ভবানীপতির ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে গান গাহিতে লাগিলেন। দিনশেষে নগরপ্রান্তের নদীতে স্নান করিয়া দুটি অন্ন রাঁধিয়া গুরু-শিষ্য মুখে দিলেন। তখন শিবাজি সহাস্যে নিবেদন করিলেন যে, গুরুর আদেশে তিনি রাজা হইয়াও ভিক্ষুকের জীবন বরণ করিয়াছেন ; গুরুদত্ত ইহা অপেক্ষা কঠোরতর দুঃখ সহ্য করিতেও তিনি প্রস্তুত। তখন রামদাস তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিতে এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতিনিধিরূপে নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগমূলক রাজধর্ম পালন করিতে আদেশ করিলেন। গুরুর নির্দেশে রামদাসেরই গৈরিক উত্তরীয় হইল শিবাজির ধ্বজা। দিনান্তে সূর্য নদীপারে অস্ত গেল, সন্ধ্যা আসিল।

শিবাজি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। শিবাজির মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইবার জন্যই যেন রামদাস গান রচনা করিয়া পুরবী রাগিণীতে গাহিতে লাগিলেন। সে গানের মর্মকথা এই যে, বিশ্বের প্রকৃত রাজা দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান্, আর পার্থিব রাজা তাঁহার প্রতিনিধিমাত্র—নাটকের রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতামাত্র। ভগবান্ তাঁহার প্রদত্ত ভার স্বয়ং আসিয়া গ্রহণ করিলে রামদাস জীবনের সায়াহ্নে এই গুরুদায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

সেতারার দুর্গভালে—সেতারা দুর্গের চূড়ায়। ভাল=কপাল; এখানে —চূড়া। সেতারা বা সাঁতারা বর্তমানে বোম্বাই রাজ্যের একটি জেলা। হেরিলা—দেখিলেন। পদ্যে ব্যবহৃত। **রামদাস**—(১৬০৮-১৬৮১ খ্রীঃ) ইনি দাক্ষিণাত্যের এক বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক ও ধর্মপ্রচারক। শিবাজি ইঁহারই পরামর্শ অনুসারে সকল রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। যেন অন্নহীন—নিরন্ন বুভুক্ষু ভিক্ষুকের মতো। গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড—শিষ্য যাঁহার রাজা তাঁহার হাতে ভিক্ষাপাত্র! রাজ্যেশ্বর পদানত—রাজ্যের অধিপতি শিবাজি যাঁহার আজ্ঞানুবর্তী শিষ্য। **তাঁরো নাই বাসনার শেষ**—বাসনাপূরণের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ যাঁহার করায়ত্ত, যিনি চাহিলে সব-কিছুই পাইতে পারেন, তাঁহারও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না! সত্যই ভোগে মানুষের বাসনার তৃপ্তি বা শেষ নাই। সে যত পায় তত চায়। তুলনীয়ঃ "ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥" **লক্ষণীয়ঃ** শিবাজির মনে গুরু রামদাস-সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে তাঁহার বিষয়-বাসনা এখনও তৃপ্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় স্তবক

এ কেবল দিনে রাত্রে ইত্যাদি—যে পাত্রে জল পান করা হইবে তাহা যদি সচ্ছিদ্র হয়, তবে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা সে পাত্রের জলে কখনই মিটিবে না, কারণ ছিদ্র থাকায় পাত্রে জলই থাকিবে না। সেইরূপ ভোগে যাহার বিতৃষ্ণা আসে নাই, তাহার ভোগবাসনা, প্রচুর উপকরণ থাকিলেও, নিবৃত্ত হয় না।

কতখানি দিলে তবে ইত্যাদি—ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া গেলে ভিখারীর আর ভিক্ষাটনের প্রয়োজন হয় না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। শিবাজি দেখিতে চাহেন কতখানি দিলে গুরু রামদাসকে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করা যায়। লেখনী—কলম। **কী লিখি দিলা কি জানি**—কিছু একটা লিখিয়া দিলেন যাহার মর্ম পাঠক পরে জানিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে শিবাজি নিরক্ষর ছিলেন—লিখিতে বা পড়িতে কিছুই পারিতেন না। বালাজি—শিবাজির একজন বিশ্বস্ত অনুচর। ভিক্ষা-আশে—ভিক্ষার আশায়; ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। লিপি—চিঠি, লেখ।

তৃতীয় স্তবক

পান্থ—পথিক। ভবেশ—জগদীশ্বর। **সবারে দিয়েছ ঘর**—তুমি সকলকে গৃহকর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। **আমারে দিয়েছ শুধু পথ**—রামদাস সর্বস্ব-ত্যাগী যোগী মহেশ্বরের সাধক। মহাদেব নিজেও যেমন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, তাঁহার অনুচর রামদাসকেও সেইরূপ করিয়াছেন।' রামদাসও তাঁহার উপাস্য ভোলানাথের ন্যায় পথকেই আপন গৃহ করিয়া লইয়াছেন। **অন্নপূর্ণা মা আমার** ইত্যাদি—মহাদেবগৃহিণী পার্বতী অন্নপূর্ণারূপে বিশ্বের জনগণের অন্নাভাব পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া বিশ্বের গৃহীরা পরম সুখে আছে। বিশ্বের অন্নাভাব পূর্ণ করিবার উপযুক্ত অন্নের অধিকারিণী বলিয়া পার্বতীর নাম অন্নপূর্ণা। **মোরে তুমি হে ভিখারী** ইত্যাদি—রামদাস তাঁহার উপাস্য দেবতার প্রভাবে অন্নপূর্ণার কৃপাপ্রার্থী না হইয়া ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর জীবনই বরণ করিয়া লইয়াছেন।' শংকর তাঁহাকে গৃহস্থজীবন হইতে পথে বাহির করিয়াছেন।

চতুর্থ স্তবক

বন্দি তাঁর পাদপদ্ম—গুরুর চরণকমল (উদ্দেশে) প্রণাম করিয়া। **শিবাজি সঁপিছে অদ্য** ইত্যাদি—শিবাজি গুরুর হাতে তাঁহার সমস্ত রাজ্যসম্পদ্ সমর্পণ করিতেছেন। তিনি দেখিতে চান্ এইরূপে গুরুকে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করা যায় কিনা।

পঞ্চম স্তবক

রাজার পাশ—শিবাজির নিকটে। **কী কাজে লাগিবে এবে** ইত্যাদি—রামদাসের বক্তব্য সম্ভবতঃ ইহাই যে, শিবাজির জন্মই রাজত্ব করিবার জন্য।

এই এক যোগ্যতাই তাঁহার আছে। অতএব রাজ্য গুরুকে দান করিয়া ভিক্ষা ব্যতীত জীবিকার তাঁহার আর কোনো উপায়ই থাকিবে না। **তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান**—শিবাজি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সানন্দে গুরুর সেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইবেন।

ষষ্ঠ স্তবক

ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে—শক্তিমান রাজার সান্নিধ্যে অনভ্যস্ততার জন্যই শিশুদের এই ভয়। অবশ্য এই ভয়ের সহিত কৌতূহলও মিশিয়া গিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্যে রত—রাজা বলিয়া অতুল সম্পদের যিনি অধিকারী। **এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা**—গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের জলে ভাসিয়া থাকা যেমন অসম্ভব এবং আশ্চর্য ব্যাপার, রাজ্যের অধিপতির পক্ষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোও সেইরূপ। **ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে**—রাজা ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। প্রজাদের পক্ষে ইহা বিষম লজ্জার কথা। তথাপি তাহারা ভিক্ষা দেয়। **ভাবে ইহা মহতের লীলা**—মহান্ ব্যক্তি কেন যে তুচ্ছ কর্মে লিপ্ত হন, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা দুষ্কর। তাই তাহারা মনে করে ইহা তাঁহার লীলাখেলা; ইহার উদ্দেশ্য তাহাদের নিকট রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়।

সপ্তম স্তবক

দ্বিপ্রহর বাজে—সম্ভবতঃ দুর্গের ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা দিবা দ্বিপ্রহর শিবাজির আমলেও সূচিত হইত। **ক্ষান্ত দিয়া কর্মকাজে**—কাজকর্ম হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইয়া। একতারে—একটি তারবিশিষ্ট—বাদ্যযন্ত্রবিশেষে। ত্রিভুবন-পতি—ত্রিজগতের অধীশ্বর মহাদেব। **কিছুই অভাব তব নাহি**—ত্রিভুবনের যিনি অধিপতি, তাঁহার কোনো অভাবই থাকিবার কথা নয়। **হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ইত্যাদি**—তথাপি ভক্তির কাঙাল ভগবান্ সকল মানুষের হৃদয়ে এই শ্রেষ্ঠ হৃদয়বৃত্তি ভিক্ষা করিয়া বেড়ান।

অষ্টম স্তবক

ভিক্ষা-অন্ন—ভিক্ষালব্ধ অন্ন। **গুরু-কাছে লব গুরু দুখ**—শিবাজি গুরুর আদেশে রাজ্য ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা কঠিনতর দুঃখ বরণ করিতেও তিনি প্রস্তুত।

নবম স্তবক

মোর নামে মোর হয়ে ইত্যাদি—রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী আমিই থাকিলাম। তুমি রাজ্য পুনরায় গ্রহণ করিয়া আমারই প্রতিনিধিরূপে তাহা শাসন করিতে থাকে। **তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি**—আমি রাজা হইয়াও ভিক্ষুক, আর দৈবের বিধানে তোমাকে আমারই প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে। **রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন**—রাজ্যের যিনি প্রকৃত অধিকারী তিনি ভিক্ষাজীবী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। **রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন**—ভিক্ষুক রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজধর্মপালনে শিবাজিকে নিঃস্বার্থ ভিক্ষুকের আদর্শ ই অনুসরণ করিতে হইবে। রাজপ্রতিনিধি হইয়াও তাঁহাকে রিক্ত অনাসক্ত ভিক্ষুকের জীবন যাপন করিতে হইবে। নিঃস্বার্থভাবে প্রজার সেবাই হইবে তাঁহার ব্রত।

দশম স্তবক

গাত্রবাস—উত্তরীয়। নৃপশিষ্য—রাজার শিষ্য ও সেবক শিবাজি। **চিন্তা-রাশি ঘনায় ললাটে**—গুরু রামদাস শিবাজির উপর যে কর্তব্যভার ন্যস্ত করিলেন, তাহা যে কিরূপ দুর্বহ ও কঠিন তাহা বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ শিবাজি চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িলেন। বেণু—বাঁশি। গোঠে—গোষ্ঠে; গাভীগুলির থাকিবার জায়গায়। সূর্য গেল পাটে—সূর্য অস্ত গেল।

একাদশ স্তবক

পূরবী—সংগীতের রাগিণীবিশেষ। দিবাশেষে এই রাগিণীতে গান গাহিতে হয়। **রচি গান**—শিষ্য শিবাজীর হস্তে রাজ্য-শাসনভার অর্পণ করিয়া রামদাস তাঁহাকে যে সমস্যায় ফেলিয়াছেন, তাহার সমাধানের জন্যই যেন রামদাস এই সংগীতটি রচনা করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া তিনি গূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চান। **আমারে রাজার সাজে** ইত্যাদি—রামদাস শিবাজির রাজ্যের অধিকারী হইলেও আসলে ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি। পৃথিবীর আসল মালিক অন্তরালবর্তী ভুবনেশ্বর ভগবান্। পার্থিব রাজার নিজস্ব কোনো অধিকার নাই। তিনি নাটকের রাজার মতো অভিনেতা মাত্র। **হে রাজা রেখেছি আনি,** ইত্যাদি—রাজর্ষি ভরত যেমন অগ্রজের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাহারই প্রতিনিধিরূপে নিঃস্বার্থভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবানের

দেওয়া রাজ্যভার শিবাজির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রামদাসও ভগবানের দীন সেবকরূপে রহিয়াছেন। তিনি রাজপ্রতিনিধিমাত্র, রাজ্যে তাঁহার প্রকৃত কোনো অধিকার নাই। **তব রাজ্যে তুমি এসো চলে**—জীবনের সায়াহ্নে পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময় রামদাসের উপস্থিত হইয়াছে; এইজন্যই তিনি ভগবানের হাতে তাঁহারই দেওয়া ভার ফিরাইয়া দিয়া গুরুদায়িত্ব হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, স্বয়ং নিজরাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করুন ইহাই রামদাসের আন্তরিক আকুতি।

ব্যাখ্যা

(১) ভাবিলা, এ কী কাণ্ড……বাসনার শেষ! (স্তবক ১)

আলোচ্যমান অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি'-শীর্ষক কবিতা হইতে গৃহীত। একদিন গুরুর ভিক্ষাবৃত্তি দেখিয়া ছত্রপতি শিবাজির মনে যে ভাব জাগে এই অংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

শিবাজি সেতারার দুর্গশীর্ষে বসিয়া আছেন। দূরে সন্ন্যাসী রামদাস ভিক্ষা-পাত্র লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন দেখিয়া শিবাজির মনে বিস্ময় জাগিল। রামদাস তাঁহার গুরু, আর তিনি স্বয়ং রাজা। রাজার যিনি গুরু তাঁহার আবার দুঃখ কোথায়? বস্তুতঃ রামদাসের গৃহে দারিদ্র্যের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। গৃহীর ন্যায় দারাপুত্রপরিবারের জন্য অসংখ্য অনটন তাঁহার থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া স্বয়ং রাজা তাঁহার শিষ্য, একান্ত পদাশ্রিত ভক্ত। কাজেই তিনি যাহা-কিছু চাহেন তাহাই রাজার নিকট হইতে সহজে পাইতে পারেন। অথচ সামান্য ভিখারীর বেশে তিনি দ্বারে দ্বারে অন্ন মাগিয়া বেড়াইতেছেন। শিবাজির মনে ইহাতে বিস্ময়ের সহিত আর একটি কথাও উদিত হইল। মানুষের কামনার শেষ নাই। যাহার যত বেশি ঐশ্বর্য, তাহার তত বেশি অতৃপ্ত কামনা। কাজেই একটা সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বরকে শিষ্যরূপে পাইয়াও এবং তাঁহার সর্বস্বের উপর অধিকার লাভ করিয়াও রাম-দাসের কামনার নিবৃত্তি হয় নাই। গুরু রামদাস-সম্বন্ধে সেদিন শিবাজির এই ধারণাই জন্মিল।

(২) এ কেবল দিনে রাত্রে……ভরে একেবারে। (স্তবক ২)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিচয় রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি'-শীর্ষক কবিতার অংশ। এইস্থলে গুরু রামদাসের ভিক্ষাবৃত্তিদর্শনে শিবাজির মনোভাব বিবৃত হইয়াছে।

গুরুকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া শিষ্য শিবাজি ভাবিলেন এ বুঝি অশেষ কামনারই পরিচায়ক। রামদাস সন্ন্যাসী—গার্হস্থ্যজীবনের কোনো অভাব তাঁহার নাই। তাহা ছাড়া স্বয়ং রাজা ও রাজ্যের উপর তাঁহার একান্ত অধিকার। তথাপি তিনি যে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অতৃপ্ত কামনারই তাড়নায়। শিবাজির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গুরুর অভাব মোচনের জন্য তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত। কিন্তু তবু তাঁহার কামনার শেষ নাই। ফুটা পাত্রে দিনরাত জল ঢালিলেও তাহা পরিপূর্ণ হয় না। ঠিক সেইরূপ কামনার রন্ধ্রপথে মানুষের সকল পাওয়া মিথ্যা হইয়া যায়। আরও পাইবার আকাঙ্ক্ষা চিরকাল সমানভাবে তীব্র হইয়া থাকে। রামদাসের মধ্যেও অভাব ঘুচে নাই। ইহাই হইল শিবাজির সিদ্ধান্ত। তাই তিনি একবার গুরুকে শেষ পরীক্ষা করিবার জন্য সংকল্প করিলেন। স্থির করিলেন, যথাসর্বস্ব দিয়াও তিনি গুরুর ভিক্ষাবৃত্তি শেষ করিতে পারেন কিনা সেই চেষ্টা করিবেন। ভিক্ষার ঝুলিটি তাঁহার এমনিতেই ক্ষুদ্র, কিন্তু উহাতে রহিয়াছে বাসনার রন্ধ্র। তাই যতই দেওয়া যাক, তাহা আর ভরে না। এইবার সর্বস্ব দিয়া শিবাজি দেখিবেন. রামদাসের কামনা শেষ হয় কিনা, ভরে কিনা তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি।

(৩) হে ভবেশ, হে শংকর, ...আপন অনুচর।

(স্তবক ৩; স্কু. ফা. ১৯৫৫)

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি' কবিতা হইতে উদ্ধৃত এই অংশটি সন্ন্যাসী রামদাসের একটি সংগীত। রাজগুরু হইয়াও রামদাস কেন ভিখারী, শিবাজির মনের এই প্রশ্নের পরোক্ষ উত্তরটিই যেন এই সংগীতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

রামদাস গাহিতেছেন যে তিনি নিঃস্ব মহেশ্বরের সাধক। হরগৌরীর মাহাত্ম্য আমরা বুঝি না। অন্নপূর্ণারূপে পার্বতী সমগ্র বিশ্ববাসীর অভাব মোচন করিতেছেন। অথচ তাঁহারই পতি শ্মশানবাসী সর্বত্যাগী ভোলানাথ। সাধারণ গৃহস্থ অন্নপূর্ণারই নিকট কৃপাপ্রার্থী। তাঁহারই দয়ায় সংসারের অভাব মোচন করিয়া তাহারা সুখে দিনপাত করে। কিন্তু মহেশ্বরের উপাসক রামদাস বিত্তহীন। সর্বত্যাগীর অনুচর বলিয়া তাঁহারও অভাব ঘুচে না। বিষয়বিত্তহীন সন্ন্যাসী তিনি। কাজেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে অন্নসংস্থান করিতে হয়। এ যেন মহেশ্বরেরই ছন্নছাড়া প্রভাবে। নতুবা জগন্মাতা অন্নপূর্ণার কৃপাপুষ্ট গার্হস্থ্যজীবন তিনি ছাড়িবেন কেন?

সুতরাং রামদাসের এই সংগীতটির মর্মার্থ ইহাই যে গার্হস্থ্যজীবনের অধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণা এবং সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ মহেশ্বর। রামদাস মহেশ্বরের উপাসক। তাই তিনি সর্বত্যাগী, রিক্ত ভিক্ষুক।

(৪) অতুল ঐশ্বর্যে রত……ইহা মহতের লীলা। (স্তবক ৬)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি'-শীর্ষক কবিতার অংশ। গুরু রামদাসের সহিত শিবাজিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া পুরবাসীদিগের যে পরম বিস্ময় উপস্থিত হয়, আলোচ্যমান অংশ তাহারই বিবরণ।

রামদাসের সহিত শিবাজি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বালকবালিকাগণ ভয় পায় এবং কল্পনাতীত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখাইবার জন্য মাতাপিতাকে ডাকিয়া আনে। শিবাজি রাজা, বিপুল সম্পদের তিনি অধিকারী। অথচ তিনিই কিনা সামান্য ক্ষুদকণার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছেন! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হইতে পারে? পাথর কখনো জলে ভাসে না। কিন্তু দৈব বা যাদুবলে যদি পাষাণও জলে ভাসে তবে তাহা যেমন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হয়, ঠিক তেমনই ব্যাপার এই রাজার ভিক্ষাবৃত্তি। তথাপি ইহা সত্য যে শিবাজি আজ বাস্তবিকই দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছেন। পুরবাসিগণ ভয়ে সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া ভিক্ষা দেয়। তাহাদের হাত কাঁপে, লজ্জায় ভয়ে বুদ্ধি বিমূঢ় হইয়া যায়। তাহারা এই রহস্যের কূলকিনারা করিতে পারে না। ভাবে, মহান্ ব্যক্তির কাজ এইরূপ দুর্বোধ্যই হইয়া থাকে। কি উদ্দেশ্যে কেন আজ শিবাজি ভিক্ষা করিতেছেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। ইহা যেন তাঁহার লীলাখেলা!

(৫) ওহে ত্রিভুবনপতি……সবার সর্বস্ব-ধন চাহি। (স্তবক ৭)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি' কবিতার অন্তর্গত রামদাসের একটি সংগীত। এই অংশে শিবাজি গুরুর সহিত কেন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন এই রহস্যেরই উত্তর ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ভগবান্ ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তিনি জগতের সকল বৈভবের সার্বভৌম সম্রাট্। কাজেই তাঁহার তো কোনো অভাব থাকিতে পারে না। তবু তিনি মানুষের ভক্তির জন্য কাঙাল। মানুষ একাগ্র নিষ্ঠায় তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সর্বস্ব অর্পণ করুক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এইরূপে সর্বেশ্বর হইয়াও প্রত্যেক

মানুষের নিকট স্বয়ং ভগবান্ ভক্তির জন্য ভিক্ষুক। এই অপূর্ব লীলার মর্ম মানুষের নিকট সত্যই দুর্বোধ্য।

পুরবাসিগণ পার্থিব নরপতির ভিক্ষাবৃত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজারও যিনি রাজা, ত্রিভুবনের যিনি একচ্ছত্র সম্রাট্, তিনিও যে কাঙাল, তিনিও যে ভক্তির ভিখারী। এই সত্য নির্দেশ করে আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনার পথ। ইহাই যেন বিস্মিত পুরবাসিগণের প্রশ্নের উত্তর।

(৬) তোমারে করিল বিধি······রবে রাজ্যহীন। (স্তবক ৯)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি' কবিতার অন্তর্গত। শিবাজিকে রাজ্য প্রত্যর্পণের সময় গুরু রামদাস যে নির্দেশ দেন, আলোচ্যমান অংশ তাহারই বিবরণ।

গুরুর কামনা নিবৃত্ত করিবার জন্য শিবাজি আপন রাজ্য দান করিয়া স্বয়ং গুরুর সহিত ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন। সারাদিন ভিক্ষাশেষে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গুরুশিষ্য ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন শিবাজি বলিলেন, ইহার চেয়েও অধিক কষ্টের জন্য তিনি প্রস্তুত। রামদাস তখন শিবাজিকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন, বলিলেন—তাঁহার প্রতিনিধিরূপে শিবাজি যেন রাজ্য শাসন ও পালন করেন। রামদাস ভিক্ষুক, তিনিই আবার রাজা। কাজেই ভিক্ষুকরাজের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত দুষ্কর কাজ। রাজ্যের সর্বময় অধীশ্বর হইয়াও শিবাজিকে সর্বত্যাগীর অনাসক্ত জীবন যাপন করিতে হইবে। রাজ্য-পরিচালনায় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা-অনুসারে চলিতে পারিবেন না। গুরুর ত্যাগমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজধর্মই হইবে তাঁহার আচরণীয়। অতএব রাজাসনে বসিয়াও তিনি প্রকৃতপক্ষে গুরুর দাসত্বই করিবেন এবং এই দাসত্ব ও উহার কর্তব্যের গুরুভার ভক্ত শিষ্য হিসাবে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বহন করিতে হইবে। ইহাই রামদাসের নির্দেশ এবং এই নির্দেশ-অনুসারেই শিবাজি হইলেন ভিক্ষুকরাজের প্রতিনিধিমাত্র। অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় বিধানে এইভাবে রাজা হইয়াও শিবাজিকে বৈভবে উদাসীন দীন সেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল। রাজাসনে বসিয়াও রাজ্যহীন ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। ইহাই রামদাসের বাণীর মর্মার্থ।

(৭) আমারে রাজার সাজে······তুমি এসো চলে। (স্তবক ১০)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। ইহা শিবাজির গুরু রামদাসের একটি গান।

শিবাজির হস্তে রামদাস রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নব রাজধর্মে দীক্ষা দিলেন। শিবাজি গুরুকে স্বীয় রাজ্য দান করিয়াছিলেন। গুরু এইবার তাঁহার প্রতিনিধিরূপে শিষ্যকে পুনরায় রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভিক্ষুক সন্ন্যাসীই রহিলেন প্রকৃত রাজা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দীনদুনিয়ার সত্যকার মালিক অপর একজন। তিনি হইলেন স্বয়ং ভগবান্। আজ ঘটনাচক্রে শিষ্য শিবাজির দান গ্রহণ করিয়া রামদাস রাজা। কিন্তু নাটকে যেমন মানুষ রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, ঐহিক রাজগণও সেইরূপ ভুবনেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি-মাত্র। এই উপলব্ধিই রামদাসের মুখে আলোচ্যমান সংগীতে বাণী লাভ করিয়াছে। তিনি আজ রাজার সাজে ভগবানের প্রতিনিধি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজে প্রতিনিধিরূপে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ সেবকের মনোভাব লইয়াই রামদাস আজ শিবাজির রাজ্যে রাজার দায়িত্ব লইয়াছেন এবং উহার শাসনভার প্রিয় শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত রাজা যিনি, সেই ভগবান্ দৃষ্টির অন্তরালেই অবস্থান করিতেছেন। তাই ভক্ত রামদাসের প্রার্থনা—ভগবান্ নামিয়া আসুন ধরার ধুলায়, গ্রহণ করুন তিনি স্বয়ং রাজ্য শাসন ও পালনের গুরু দায়িত্ব। জীবন তাঁহার শেষ হইয়া আসিল। দিবাশেষে সন্ধ্যায় যেমন সকল কর্ম হইতে মুক্তি ঘটে, জীবনের এই অবসানমুহূর্তে রামদাসও তেমন চাহেন মুক্তি। কিন্তু কর্তব্যভার কাহাকে দিয়া যান? ভগবানের দেওয়া ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার জন্য তাই তাঁহার এই আকুতি। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক পৃথিবীতে, স্বয়ং ভগবান্ থাকুন তাহার একমাত্র অধীশ্বর। ইহাই এই আকুতির মর্ম।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি' কবিতায় রাজার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর এবং সেই প্রসঙ্গে কবিতাটির শীর্ষনামের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

উ.। 'প্রতিনিধি' কবিতাটি শিবাজির জীবন-সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী লইয়া রচিত। শিবাজির গুরু ছিলেন সন্ন্যাসী রামদাস। শিবাজির ন্যায় রাজা যাঁহার শিষ্য, তাঁহার কোনো জাগতিক অভাবই থাকিবার কথা নয়। গুরু-সেবায় যে শিবাজি মুক্তহস্ত ছিলেন সে ইঙ্গিত এই কবিতায় সুস্পষ্ট। তথাপি

রামদাস ভিক্ষা করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতেছেন এই দৃশ্য দেখিয়া শিবাজির ভ্রম হইল বুঝি-বা তৃপ্তিহীন কামনারই দাস তাঁহার গুরু। তাই এত পাইয়াও তাঁহার অভাব ঘুচে না। সুতরাং শিবাজি গুরুকে পরীক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন। লিখিয়া দিলেন তাঁহাকে তাঁহার সমগ্র রাজ্য। তারপর গুরুর সহিত বাহির হইলেন শিষ্য ভিক্ষায়। কারণ, রাজ্যশাসন ভিন্ন শিবাজির জীবিকা-অর্জনের অন্য কোনো কাজ জানা ছিল না। দিবসের শেষে গুরুশিষ্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। শিষ্য জানাইলেন ইহার চেয়েও কঠিনতর পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত। তখন রামদাস শিবাজিকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যভার গ্রহণের আদেশ দিলেন, দীক্ষা দিলেন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত অনাসক্ত রাজধর্মে।

এইখানেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে রাজার এক অপূর্ব আদর্শ। এই দুনিয়ার মালিক তো কেবল ভগবান্। মানুষ তো তাঁহার দাসমাত্র এবং এ সত্য রাজা প্রজা সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। পার্থিব রাজা ভগবানের প্রতিনিধি-মাত্র। ভরত যেমন নিজেকে রামচন্দ্রের প্রতিনিধি মনে করিতেন, তিনি যেমন সেবকের মনোভাব লইয়া অগ্রজের পাদুকাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, সেইভাবেই ভগবানের দাস ও প্রতিনিধিরূপে রাজগণের রাজ্যপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য। এ দায়িত্ব তাঁহাদের সত্যই অত্যন্ত গুরুভার। মানবজীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশের অন্যতম প্রয়োজন হইল সুশাসিত ধর্মরাজ্য, এবং সেই ধর্মরাজ্যের কর্তৃপদগ্রহণে ত্যাগী ভিন্ন অন্য কাহারও যোগ্যতা নাই। তাই এই কবিতায় রামদাসকে আমরা মারাঠা সাম্রাজ্যের যোগ্য নৃপতিরূপে মহীয়ান্ দেখিতে পাই; দেখিতে পাই রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি পথের কাঙাল। ইহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে রাজার এক সুমহান্ আদর্শ। রাজৈশ্বর্য রাজার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে, পরন্তু তাহা জনগণের মঙ্গলের জন্যই সঞ্চিত। এইজন্যই বিশ্বেশ্বর নিখিলের অধিপতি হইয়াও সর্বত্যাগী, এইজন্যই সকল বৈভবের কারণ হইয়াও তিনি নিঃস্ব। শিবাজি এই সর্বত্যাগী, রিক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শে প্রতিনিধিরূপে রাজ্যভার লইলেন। ইহাই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে বিভূষিত রাজমহিমা। আলোচ্যমান কবিতায় ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ রাজার আদর্শটি প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে শিবাজি কিরূপে রাজ্য দান করিয়া গুরুর প্রতিনিধিরূপে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা রাজ্যহীন হইয়া গুরুর নিকট হইতে পুনরায় রাজ্যভার লইলেন। এইরূপে

যিনি ছিলেন রাজা, তিনি হইলেন প্রতিনিধিমাত্র এবং ইহাই আলোচ্যমান কবিতার কাহিনী বলিয়া উহার শীর্ষনাম সার্থক। দ্বিতীয়তঃ, কবিতাটির মর্মমূলে রাজার যে আদর্শ রহিয়াছে তাহাও এই শীর্ষনামের সমর্থন করে। পূর্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে জগতের সত্যকার ও একমাত্র রাজা হইলেন ভগবান্। মানুষ-রাজা তাঁহার প্রতিনিধিমাত্র। সুতরাং রাজামাত্রেরই এই প্রতিনিধিস্বরূপতা-প্রতিপাদনের জন্যও কবিতাটির শীর্ষনাম সার্থক।

প্র. ২। 'প্রতিনিধি' কবিতায় সাধক রামদাসের যে গানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহাদের প্রাসঙ্গিকতা ও মূল কাহিনীর সহিত সঙ্গতি বিচার কর।

উ.। 'প্রতিনিধি' কবিতায় গুরু রামদাসের মোট তিনটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহার সহিত মূল গল্পটির যোগসূত্র ধরা পড়ে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে উহারা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ও মূল কাহিনীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুতঃ এইগুলি যেন দৈববাণীর মতো এই কাহিনীর সকল প্রশ্ন ও সমস্যা, রহস্য ও বিস্ময়ের সুন্দর উত্তর ও মীমাংসা।

উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রথম সংগীতটি লওয়া যাক। শিবাজির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে গুরু রামদাস কেন ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হন না। স্বয়ং রাজা যাঁহার শিষ্য, রাজৈশ্বর্য যাঁহার সেবায় নিত্য নিয়োজিত, তাঁহার তো কোনো অভাব থাকিতে পারে না। তবে কেন তিনি ভিক্ষা করেন? বুঝি-বা অতৃপ্ত কামনার তাড়নাই ইহার কারণ। কিন্তু তাহা ভুল। রামদাস গাহিয়াছেন— বিধাতা তাঁহাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়াছেন। সংসারী আর সকলকে তিনি গার্হস্থ্য-জীবনের অভাব-স্বাচ্ছন্দ্যময় শান্ত নীড় দিয়াছেন। কিন্তু রামদাসকে করিয়াছেন তিনি পথের কাঙাল। বিষয়বিত্তে তাঁহার আসক্তি নাই, মতি শুধু সর্বত্যাগী শংকর-পদে। কাজেই কামনা নাই বলিয়াই তো তিনি চিরকাঙাল। একজন অতুল বৈভবশালী নৃপতিকে শিষ্যরূপে পাইয়া এবং তাঁহার সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি ত্যাগী। তাই তিনি রিক্ত নিঃস্ব ভিখারী। এই কথাটাই ব্যক্ত হইয়াছে রামদাসের প্রথম সংগীতে এবং তাহাতে উত্তর রহিয়াছে শিবাজির সংশয়জড়িত প্রশ্নের।

দ্বিতীয় সংগীতটি, পুরবাসিগণের নিকট যাহা দুর্বোধ্য রহস্যরূপে প্রতীত হইয়াছিল তাহারই সমাধানস্বরূপ। রাজা শিবাজি গুরুর সহিত ভিক্ষায়

বাহির হইয়াছেন দুয়ারে দুয়ারে। পরম আশ্চর্য ঘটনা। রাজা—যাঁহার ভাণ্ডার অমেয় সম্পদে পূর্ণ—তাঁহার কেন এই ভিক্ষাবৃত্তি। রামদাস গাহিলেন—শুধু শিবাজিই বা কেন, স্বয়ং ভগবান্‌ও যে সর্বাপেক্ষা কাঙাল। তিনি বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট্, তাঁহার তো কোনো অভাব থাকিতে পারে না; তবু তিনি মানুষের হৃদয়ের কাছে চাহেন একাগ্র নিষ্ঠায় সর্বস্ব-সমর্পণ। ইহার মর্ম কি? ইহার মর্ম ইহাই যে, এই ভিক্ষা আসলে ত্যাগের স্বাভাবিক পরিণতি। রাজা যখন রাজ্যকে নিজের ব্যক্তিগত ভোগের সম্পদ্ মনে করেন না, তখন তাঁহার মতো নিঃস্ব আর কে? মানুষের দয়ার অন্নই তো তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। বিশ্বেশ্বর ভগবান্ মানুষকে সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া মানুষেরই নিকট ভিখারী হইয়া বসিয়াছেন। এই আদর্শ উপলব্ধি করিলে রাজা, যিনি ভগবানের প্রতিনিধি, তিনিও যে নিতান্ত দীন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ভিক্ষাবৃত্তিতেও তখন আর বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

তৃতীয় সংগীতটি যেন শিবাজির প্রতিই উদ্দিষ্ট। ভিক্ষুক গুরুকে রাজ্য দিয়া শিবাজি তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যভার পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন। এ ভার যে কত গুরুতর তাহার চিন্তায় যখন শিবাজি নিমগ্ন, তখনই রামদাস এই সংগীতটি গাহিলেন। মানুষ-রাজা যে যাত্রাদলের রাজারই ন্যায় মিথ্যা ভূমিকায় অবতীর্ণ, ইহাই গানের মর্মকথা। রাজার বেশ, রাজার অহঙ্কার তাই মিথ্যা; সত্য শুধু উহার কর্তব্যভার, উহার গুরুদায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করিতে হয় সর্বত্যাগী ভরতের মতো। অগ্রজের পাদুকা লক্ষ্য করিয়া সেবকের ভাবে রাজধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন ভরত। প্রত্যেক রাজার কর্তব্য অনাসক্তভাবে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজদায়িত্ব-পালন। ভিক্ষুকরাজ এই আদর্শের প্রতীক। জীবনের সায়াহ্নে তাই তিনি রাজদায়িত্ব সত্যকার রাজা ভগবানের করে প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় চাহেন। শিবাজির সম্মুখে রাজার আদর্শটি এইরূপে এই সংগীতের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

অতএব রামদাসের সংগীতগুলি এই কবিতার মূল কাহিনীর সহিত শুধু প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গতিপূর্ণই নহে, পরন্তু পরম আধ্যাত্মিক তাৎপর্যময়।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ রাজ্যেশ্বর=রাজ্য+ঈশ্বর। পদানত=পদ+আনত। তাঁরো=তাঁর+ও (বাঙলা সন্ধি)। তোমারি=তোমার+ই (ঐ)। দিবসান্তে=

দিবস+অন্তে। তাঁরি=তাঁর+ই (বাঙলা সন্ধি)। আরো=আর+ও (ঐ)। পুনর্বার=পুনঃ+বার। ভবেশ=ভব+ঈশ।

সমাসঃ প্রভাতকালে—প্রকৃষ্টরূপে ভাত, প্রভাত (প্রাদিতৎপুরুষ); প্রভাতই কাল (কর্মধারয়), তাহাতে। দুর্গভালে—দুর্গের ভাল অর্থাৎ কপাল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। ভিক্ষাভাণ্ড—ভিক্ষার জন্য ভাণ্ড (৪র্থীতৎপুরুষ)। দৈন্যলেশ—দৈন্যের লেশ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ। হস্তগত—হস্তকে গত (২য়াতৎপুরুষ)। পদানত—পদে আনত (৭মীতৎপুরুষ)। সর্বচরাচর—সর্ব চরাচর (কর্মধারয়)। মধ্যাহ্নস্নান—অহের অর্থাৎ দিনের মধ্য (একদেশী সমাস—বাঙলামতে ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); মধ্যাহ্নকালীন স্নান (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। পাদপদ্ম—পাদপদ্মের ন্যায় (উপমিত-কর্মধারয়)। রাজ্য-রাজধানী—রাজা স্থাপিত হন ('ধীয়তে') এখানে রাজধানী (উপপদ-তৎপুরুষ); রাজ্য এবং রাজধানী (দ্বন্দ্ব)। দ্বিপ্রহর—দ্বিতীয় প্রহর (কর্মধারয়)। পুরবাসী—পুরে বাস করে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। ত্রিভুবনপতি—ত্রি অর্থাৎ তিন ভুবনের সমাহার (সমাহারদ্বিগু); ত্রিভুবনের পতি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। সর্বস্বধন—সর্ব স্ব (কর্মধারয়); সর্বস্বই ধন (কর্মধারয়)। সন্ধ্যাস্নান—সন্ধ্যাকালীন স্নান (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অনুরূপ—রূপের যোগ্য (অব্যয়ীভাব—বাঙলায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত)। রাজ্যহীন—রাজ্যের দ্বারা হীন (৩য়াতৎপুরুষ)। গাত্রবাস—গাত্রাবরক বাস (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। পাদপীঠতলে—পাদের (পাদ-স্থাপনের) জন্য পীঠ (৪র্থীতৎপুরুষ); তাহার তল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। অতুল—নাই তুলনা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা।

সমস্তপদ-গঠনঃ বিশ্বের ভার=বিশ্বভার। ঐশ্বর্যে রত=ঐশ্বর্যরত। ভিখারীর ব্রত=ভিখারীব্রত। মহতের লীলা=মহল্লীলা। নৃপতির গর্ব=নৃপতিগর্ব। রাজার সাজে=রাজসাজে।

সাধু পদ-রূপঃ হেরিলা—দেখিলেন। তাঁর—তাঁহার। মাগি—মাগিয়া। দ্বার দ্বার—দ্বারে দ্বারে। ফিরিছেন—ফিরিতেছেন। যাঁর—যাঁহার। তাঁরো—তাঁহারও। ঢেলে—ঢালিয়া। মিটাবারে—মিটাইবার। কহিলা—কহিলেন। হবে—হইবে। আনি—আনিয়া। লিখি—লিখিয়া। দিলা—দিলেন। ডাকায়ে—ডাকাইয়া। যবে—যখন। ভিক্ষা-আশে—ভিক্ষার আশায়। চলেছেন—চলিয়াছেন। গেয়ে—গাহিয়া। চলেছে—চলিয়াছে।

ধেয়ে—ধাইয়া। সবারে—সকলকে। দিয়েছ—দিয়াছ। আমারে—আমাকে। লয়েছে—লইয়াছে। মোরে—আমাকে। হতে—হইতে। কাড়ি—কাড়িয়া। করেছ—করিয়াছ। করি—করিয়া। আসিলা—আসিলেন। নমিয়া—প্রণাম করিয়া। তাঁরে—তাঁহাকে। লইলা—লইলেন। দেখিলা—দেখিলেন। বন্দি—বন্দনা করিয়া। সঁপিছে—সঁপিতেছে (বা, সমর্পণ করিতেছে)। পাশ—পাশে। দেবে—দিবে। এবে—এখন। তোমারি—তোমারই। নমি—প্রণাম করিয়া। করিবারে—করিতে (বা, করিবার জন্য)। সাথে—সঙ্গে। লয়ে—লইয়া। নৃপে—নৃপকে। হেরি—দেখিয়া। ডেকে—ডাকিয়া। থরোথরে—থরথর (বা, থরথর করিয়া)। করিছে—করিতেছে। একতারে—একতারায়। দিয়ে—দিয়া। ভাসি—ভাসিয়া। তব—তোমার। নাহি—নাই (প্রাচীন গদ্যে 'নাহি' চলিত, বর্তমানে চলে না)। সবার—সকলের। চাহি—চাহিয়া। সারি—সারিয়া। বাঁধি—বাঁধিয়া। দিলা—দিলেন। তাঁরি—তাঁহারই। তবে—তখন। হাসি—হাসিয়া। নাশি—নাশ (বা, নষ্ট) করিয়া। রয়েছে—রহিয়াছে। আরো—আরও। গুরু কাছে—গুরুর কাছে। লব—লইব। নিতে হবে—লইতে হইবে। দিনু কয়ে—কহিয়া দিলাম। মোর—আমার। হয়ে—হইয়া। তোমারে—তোমাকে। পালিবে—পালন করিবে। জেনো—জানিও। লয়ে—লইয়া। রবে—রহিবে। বসি—বসিয়া। ফিরে—ফিরিয়া। ধরি—ধরিয়া। রচি—রচনা করিয়া। লাগিলা—লাগিলেন। আমারে—আমাকে। বসায়ে—বসাইয়া। সংসার-মাঝে—সংসারের মধ্যে (বা, মাঝে)। রেখেছি আনি—আনিয়া রাখিয়াছি। তোমারি—তোমারই। হয়ে এল—হইয়া আসিল। বসে রই—বসিয়া থাকি (বা রহি)। এসো চলে—চলিয়া আসো। লহো—লও।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ পান্থ—পথিন্+ণ। ভিখারী—ভিখ (< ভিক্ষা) +আরী (বৃত্তি বুঝাইতে)। সমাপন—সম্+আপ্+ল্যুট্ (অন্)। গেরুয়া—গিরি+উয়া। দৈন্য—দীন+ষ্যঞ। কৌতূহল—কুতূহল+অণ (স্বার্থে)।

কারক ও বিভক্তিঃ ভিক্ষা মাগি 'দ্বার দ্বার' (যথাক্রমে অপাদান এবং অধিকরণে শূন্য বিভক্তি)। জল ঢেলে ফুটা 'পাত্রে' (অধিকরণে-এ)। বৃথা চেষ্টা 'তৃষ্ণা' মিটাবারে (কর্মে শূন্য বিভক্তি)। এই লিপি দিয়ো তাঁর 'পায়ে' (সম্প্রদানে, মতান্তরে অধিকরণে-এ)। 'সবারে' দিয়েছ ঘর

(সম্প্রদানে-রে, কেবল পদ্যে !) 'মার কাছ হতে' কাড়ি (অপাদানে ৫মী)। বালাজি নমিয়া 'তাঁরে' (কর্মে-রে, কেবল পদ্যে)। শিবাজি সঁপিছে অদ্য 'তাঁরে' নিজ রাজ্য-রাজধানী (সম্প্রদানে-রে)। 'নৃপে' হেরি ছেলে মেয়ে (কর্মে-এ)। আমারে রাজার 'সাজে' বসায়ে সংসার-মাঝে (কারক নাই, উপলক্ষণে-এ)। ক্ষান্ত দিয়া 'কর্ম-কাজে' (অপাদানে-এ)।

অর্থগত পার্থক্য ঃ বন্দি—বন্দনা করি (বা, করিয়া); বন্দী—অবরুদ্ধ ব্যক্তি। প্রসাদ—অনুগ্রহ, ভুক্তাবশিষ্ট ; প্রাসাদ—অট্টালিকা। ধেনু—গাভী ; ধনু—ধনুক, কার্মুক।

পদ-পরিবর্তন ঃ দৈন্য—দীন। গুরু—গৌরব, গুরুত্ব, গরিমা। দাসত্ব—দাস। মহৎ—মহত্ত্ব। প্রসাদ—প্রসন্ন। গর্ব—গর্বিত। অভিলাষ—অভিলষিত। উদাসীন—ঔদাসীন্য, উদাসীনতা। সন্ধ্যা—সান্ধ্য।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ ডাকায়ে—ডাক্+আ+ইয়া = ডাকাইয়া, পদ্যে 'ডাকায়ে'। এটি আ-প্রত্যয়ান্ত বাঙলা প্রেরণার্থক ধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ।

দিয়ো—ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উদাহরণ। ইহার আরও একটি রূপ আছে : দিবে।

সঁপিছে—সংস্কৃতের 'সম্—অর্পি, ধাতু বাঙলায় 'সঁপ্' ধাতু হইয়া গিয়াছে। এই 'সঁপ্' ধাতু হইতে ক্রিয়াপদটি সৃষ্ট।

ঘনায়—ঘন (বিশেষণ শব্দ)+আ = ঘনা (নামধাতু)। এই 'ঘনা' ধাতু হইতে ক্রিয়াপদটি সৃষ্ট। ঘনা+এ = ঘনায়।

ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে—কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ। 'ভিক্ষা-ঝুলি' আসলে কর্ম, কিন্তু ইহাকেই 'ভরে' ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে হইতেছে।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে—তাঁর পায়ে যেন এই লিপি দেওয়া হয় (বাচ্যান্তর)।

দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে—দেখিব কতখানি দিলে তবে ভিক্ষা-ঝুলি একেবারে ভরে (বাচ্যান্তর)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ ঃ অনুচর, সমাপন, কৌতূহলভরে পাদপদ্ম, অতুল।

প্রাচীন ভারত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' ও 'ভারত-তীর্থ' কবিতার ভূমিকা দেখ।

উৎস ও নামকরণ—কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' হইতে সংকলিত।

প্রাচীন ভারতের একটি জীবনচিত্রই এই কবিতার বিষয়বস্তু। প্রাচীন-কালে এদেশে একদিকে যেমন বড় বড় নগরী ও রাজ্য সমৃদ্ধি ও পরাক্রমে উন্নতির উচ্চসীমায় উপনীত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি জনপদের অনতিদূরে প্রশান্ত বনাশ্রমে ব্রাহ্মণের তপস্যা শতদিকে সিদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম আর ব্রাহ্মণের তপস্যা এই দুই মিলিয়াই প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রটিকে বিশেষত্বমণ্ডিত করিয়াছিল। এই কবিতায় ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহার এইরূপ শীর্ষনাম।

সমালোচনা—আলোচ্য কবিতায় কবি প্রাচীন ভারতের জীবন-সম্বন্ধে একটি সুন্দর সত্যরূপ স্বল্প পরিসরের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কবি বিংশ শতাব্দীর মাত্রাতিরিক্ত বস্তুবাদিতার পরিবেশে বসিয়া এই যে অপূর্ব ছবিটির ধ্যান করিয়াছেন, তাহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিত্তি আজ মূলতঃ পরাক্রম অর্থাৎ ক্ষাত্রবীর্য। সে সভ্যতা স্বরূপে নাগরিক। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও একদা এইরূপ বিশাল ও সমৃদ্ধ নগরী, ক্ষাত্রবীর্যে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও রাজমহিমা, ললিতকলার প্রভূত পরিবেষণে সুলভ বিলাস-ব্যবস্থা, উপভোগের বিচিত্র সম্ভার প্রভৃতি কল্পনাতীত প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজ্য ও রাজধানী আকাশচুম্বী সৌধমালায় যেন উদ্ধতশিরে স্বর্গের প্রতি আস্ফালন করিত। চতুরঙ্গে সৈন্যবাহিনীসমূহ বীরদর্পে মেদিনী কাঁপাইয়া চলিত, বিজয়-অভিযান ঘোষিত হইত উন্মাদ কলরোলে, কম্বুনির্ঘোষে, আর রথচক্রের গম্ভীর ঘর্ঘরে। অপরদিকে সঙ্গীতে-নৃত্যে বাদ্যে ও যন্ত্রে—ললিতকলার লীলাবিলাসে মদির নেশা উপচাইয়া পড়িত প্রতি নগরে, প্রাসাদে প্রাসাদে। এই ভোগমদির

জীবনের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। অশান্ত অশ্রান্ত মানুষ ক্ষত্রিয়ের সেই বস্তুরাজ্যে কেবলই অধীর হইয়া ধাবিত হইত। কিন্তু ইহা ভারতের জীবনচিত্রের একটি দিক্ মাত্র। অপরদিকে ছিল আশ্রমজীবনের শুচি-সুন্দর প্রশান্ত ছবি। সেখানে সর্বত্যাগী ব্রাহ্মণ শাশ্বত কল্যাণের জন্য, অবিনশ্বর আত্মার পরা উন্নতির জন্য নীরব তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন। তাহারই পূতপ্রভাব ক্ষাত্র-সভ্যতার সকল উগ্রতাকে শাসন করিয়া নিয়ন্ত্রিত রাখিত। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রের স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ নবীন ভারতকে প্রাচীন ভারতের এই ছবিখানি তাঁহার ধ্যান-দৃষ্টির আলোকে দেখাইতেছেন। বিংশ শতাব্দীর এই সন্ধিক্ষণে সীমাতীত ভোগ-লালসার প্রলোভনসহ প্রতীচ্য-সভ্যতা যাহা লইয়া আসিয়াছে তাহা জীবনের খণ্ডপ্রয়োজনের দিক্‌টারই সেবা করে। অপর আরও একটা মহত্তর প্রয়োজনও জীবনের আছে। আর চিরদিনের জন্য সকল ভারতবাসীর মর্মমূলে সেই প্রয়োজনের দিকে একটা ক্ষুধাও রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের ছবিটি দেখিলে নূতন ভারত তাহার শাশ্বত সাধনা হইতে একেবারে বিচ্যুত হইবে না। কে জানে আগামী দিনে ভারতবর্ষ আবার আত্মস্থও হইতে পারে ; এই আশার উদ্দীপনাই কবিতাটির মূল আবেদন, এইখানেই ইহার সার্থকতা।

সংক্ষিপ্তসার—প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্বত্রই ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই মহাজাতির মহিমার দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পাশাপাশি দেখা যাইবে। একদিকে বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজ্যের মহাপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের শক্তিগর্ব যেন স্বর্গের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। সে গর্বের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটিয়াছে চতুরঙ্গ সেনাবলে, নৃত্যগীত ও প্রমোদ-বিলাসের সমারোহে, চারণের বন্দনাগানে, বিজয়োৎসবের মত্ত কোলাহলে। সেই ক্ষাত্র শক্তি ও ঐশ্বর্যের ধারক হইয়াছিল প্রাচীন সমৃদ্ধ জনবহুল নগরীগুলি, যাহাদের রাজপথ রথচক্রের নির্ঘোষে ও কর্মব্যস্ত নরনারীর কোলাহলে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত ও স্পন্দিত হইত। এই নগরীগুলির অদূরে ছিল ব্রাহ্মণের তপোবন, যেখানে বিরাজ করিত গম্ভীর নিস্তব্ধতা, অচঞ্চল প্রশান্তি ও উন্মুক্ত উদারতা। এইরূপে একদিকে ছিল বাহ্য আড়ম্বর ও মুখর চাঞ্চল্যে প্রকাশিত ক্ষত্রিয়ের মহিমা, অন্যদিকে বিপুল নীরবতা ও পবিত্র প্রশান্তির মধ্যে ব্রাহ্মণের অম্লান গৌরব।

মর্মার্থ—প্রাচীন ভারতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্ষত্রিয় রাজগণ দেশ শাসন

করিতেন। তাঁহাদের বীর্য-পরাক্রম ও ঐশ্বর্য-বৈভবের মহিমা সাড়ম্বরে সরবে বিঘোষিত হইত সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্রে, অগণিত উৎসবে, উচ্ছল প্রমোদ বিলাসে। সেকালের সমৃদ্ধ, কোলাহলমুখর ও জনবহুল নগরীগুলি হইয়া উঠিয়াছিল এই ক্ষাত্রমহিমা তথা ক্ষত্রিয়ভিত্তিক জীবনের কেন্দ্র। কিন্তু এই নগরীগুলিরই অদূরে থাকিত ব্রাহ্মণের তপোবন—যেখানে কোলাহল, চঞ্চলতা বা অতৃপ্তির পরিবর্তে বিরাজ করিত সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ও নিবিড় প্রশান্তি। ইহারই মধ্যে বিকশিত ছিল ব্রাহ্মণের প্রোজ্জল মহিমা। ক্ষত্রিয় সভ্যতা সেযুগে ভোগ ও বাহুবলের আদর্শকে লালন করিয়া যে মোহের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে মানুষ নিয়ত কর্মচঞ্চল হইয়াও তৃপ্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ এই ভোগবাদী সভ্যতার অনতিদূরে থাকিয়াও ত্যাগের পথে আত্মিক বলের, শাশ্বত কল্যাণের সাধনা করিয়াছেন এবং এইভাবে প্রবৃত্তিকে শাসন করিয়া, সকল কামনা-বাসনা ও অতৃপ্তির উর্ধ্বে উঠিয়া এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন। বর্তমান ভারতের এখন স্থিরমস্তিষ্কে ভাবিবার সময় আসিয়াছে—কোন্ পথে আমাদের কল্যাণ, কোন্ পথে মুক্তি—প্রবৃত্তির পথে, না নিবৃত্তির পথে? অথবা উভয়ের সমন্বয়পন্থায়?

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

পঙ্‌ক্তি ১-১০। **বিদর্ভ**—প্রাচীন যুগে ভারতের একটি রাজ্য। ইহার বর্তমান নাম বেরার। **বিরাট**—মহাভারতে কথিত একটি দেশ; মৎস্যদেশ। বর্তমান উত্তরবঙ্গই প্রাচীন বিরাটরাজ্য বলিয়া পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিরাটরাজ্যের গোশালা নাকি ছিল দিনাজপুর জেলায়। **অযোধ্যা**—রামায়ণে প্রসিদ্ধ একটি নগরী। ইহা কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। সূর্যবংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করিতেন। **পাঞ্চাল**—(বা পঞ্চাল) উত্তরভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য। মহাভারতের যুগে রাজা দ্রুপদ এই রাজ্য শাসন করিতেন। **কাঞ্চী**—দক্ষিণাপথের দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী; কাঞ্চীনগরী। উদ্ধতললাট—উন্নতশির; উচ্চশির। স্পর্ধিছে—স্পর্ধা করিতেছে; আস্ফালন করিতেছে। অম্বরতল—আকাশ অর্থাৎ স্বর্গকে। **অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে**—কটাক্ষের ইশারায়। **উদ্ধতললাট......অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে**—প্রাচীনকালে প্রবলপ্রতাপ ক্ষত্রিয় নরপতিগণ উদ্ধত শক্তিগর্বে যেন স্বর্গজয়ের কল্পনা করিতেন। বাহুবল ও অস্ত্রবলই ছিল সে শাসনের, ক্ষত্রিয়ের শক্তিমত্তার সাধন ও ভিত্তি।

হ্রেষায়—অশ্বের ধ্বনিতে। **বৃংহিতে**—হস্তীর গর্জনে। অশ্ব ও হস্তী সৈন্যবলের প্রতীক। ইহারা চতুরঙ্গের দুইটি; বাকী দুইটি রথ ও পদাতি। রথের উল্লেখ পরে রহিয়াছে। **অসির ঝঞ্ঝনা আর ধনুর টংকারে**—ক্ষত্রিয় রাজাদের সৈন্যদল সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত; তাঁহাদের শৌর্যবীর্যের কথা নিত্য ধ্বনিত হইত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও কোদণ্ডের টংকারে। **বীণার সংগীত** ইত্যাদি—ক্ষত্রিয় নরপতিগণ যে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহেই রত থাকিতেন এমন নয়, অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়া তাঁহারা অবসর সময় নৃত্যগীত, মৃগয়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে যাপন করিতেন। **বন্দী**—স্তুতিপাঠক। **বন্দীর বন্দনারবে**—স্তুতিপাঠকগণের স্তবগানে। প্রাচীন যুগের রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য ও পরাক্রমের খ্যাতি সর্বত্র প্রচার করিবার জন্য নিজ অর্থব্যয়ে চারণ কবি-দিগকে নিযুক্ত করিতেন। এই কবিগণ গান রচনা করিয়া রাজার কীর্তিকথা দিকে দিকে গাহিয়া বেড়াইত। **উৎসব-উচ্ছ্বাসে**—উৎসবের বাহুল্যে। সাধারণতঃ কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা রাজ্যে ফিরিলে সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য রাজ্যময় উৎসবের আয়োজন হইত। আরও নানাপ্রকার উৎসব ছিল সেকালের রাজাদের প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। গর্জে—গর্জনে; নির্ঘোষে। **উন্মাদ শঙ্খের গর্জে**—শঙ্খের সুগম্ভীর ও সু-উচ্চ ধ্বনিতে। 'উন্নাদ' কথাটি শঙ্খের বিশেষণ। উন্নাদ=উচ্চনাদযুক্ত। শঙ্খধ্বনি বিজয়োৎসবেরই অঙ্গ ছিল। রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে—রাজপথে চলমান রথচক্রের গম্ভীর ধ্বনিতে। সেকালে রাজা, রাজকর্মচারী, সৈন্যদল এবং বিত্তবান্ ব্যক্তিরা সাধারণ চলাফেরায় রথ ব্যবহার করিতেন। মন্দ্র=গম্ভীর শব্দ। **পথের কল্লোলে**—রাজপথে কর্মস্রোতে প্রবাহিত অগণিত নরনারীর কলকোলাহলে। সেকালের সমৃদ্ধ জনবহুল রাজধানীগুলির প্রতি ইঙ্গিত। **ধ্বাত**—নিনাদিত; শব্দিত। **কর্মকলরোলে**—কর্মব্যস্ত নরনারীর কোলাহলে অথবা বিভিন্ন কর্ম হইতে উত্থিত বিচিত্র শব্দে।

প. ১১-১৪। **অদূরে তাহার**—কলকোলাহলময় নিয়ত চঞ্চল জনবহুল নগরীরই অনতিদূরে। নির্বাক—নিস্তব্ধ, কোলাহলহীন। সংযত চাঞ্চল্য বা উচ্ছ্বাসহীন। উদার—প্রসন্ন; উন্মুক্ত। **হেথা**—এখানে অর্থাৎ রাজধানীর মধ্যে। স্ফীতস্ফূর্ত—ঐশ্বর্য তথা শক্তির আড়ম্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত। ক্ষত্রিয়গরিমা—ক্ষত্রিয়ের গর্ব; ক্ষত্রিয়ের গৌরব। **হোথা**—ওখানে; লোকালয়ের বাহিরের শান্ত তপোবনে। মহামৌন—বিপুল নীরবতা; সুগভীর প্রশান্তি।

ব্যাখ্যা

ব্রাহ্মণের তপোবনে…মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা। (পঙ্‌ক্তি ১১-১৪)

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিকয়টি রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারত'-শীর্ষক কবিতার শেষাংশ। প্রাচীন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়শাসিত সমাজের ভোগ-পরাক্রমময় ঐশ্বর্যস্ফীত ছবিটির পাশেই অবস্থিত ছিল যে ত্যাগবরিষ্ঠ প্রশান্ত আশ্রমজীবন—এখানে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সেকালে একদিকে বিশাল রাজ্য আর বিপুল ঐশ্বর্য লইয়া ক্ষত্রিয়ের গরিমা অতিশয় উদ্ধতরূপ ধারণ করিয়াছিল। চতুরঙ্গে অভিযান আর বীরবিক্রম ক্ষত্রিয়ের বাহুবলকে বিশ্বগ্রাসী করিয়া তুলিয়াছিল। এই পরাক্রমের সেবায় গীতবাদ্য ললিতকলা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ভোগের বিচিত্র সম্ভারে, মদির নেশায় মগ্ন থাকিত ক্ষত্রিয়ের জগৎ। অপরদিকে সমাজের কলরোল হইতে দূরে প্রশান্ত আশ্রমে সর্বত্যাগী ব্রাহ্মণ তপস্যায় সমাহিত থাকিতেন। তাঁহার নীরব অথচ গম্ভীর মূর্তি হইতে সংযম ও ঔদার্যের অনুপম প্রভাব বিচ্ছুরিত হইত। ভোগবিলাসে ফুলিয়া ফাঁপিয়া ক্ষত্রিয়ের জগৎ যে অতৃপ্ত কামনায় উন্মাদনা অনুভব করিত তাহাতে সুখ ছিল না। তাহারই পাশে ব্রাহ্মণের ত্যাগমাহাত্ম্য, সংযম ও শুচিসুন্দর তপস্যা শতগুণে মহৎ বলিয়া প্রতিভাত হইত। ইহার পাশে আসিয়া ভোগের সকল চপলতা স্তব্ধ হইয়া যাইত। ভোগের সরোবরে ত্যাগের শতদল এইভাবেই ভারতীয় জীবনে গরীয়ান্। উহারই পূতপ্রভাব যুগে যুগে ভারতের সমাজ-জীবনের শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

—(ক) 'হেথা' ও হোথা' বলিতে কবি কোন্ কোন্ স্থান বুঝাইতেছেন ?

(খ) এই 'মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা' ও 'স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা'র স্বরূপ বর্ণনা কর।

উ.। (ক) 'হেথা' বলিতে কবি প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়শাসিত রাজ্য ও সমাজকে বুঝাইতেছেন। 'হোথা'-দ্বারা কবি লোকালয় হইতে কিছুদূরে অবস্থিত ব্রাহ্মণের আশ্রমস্থান নির্দেশ করিতেছেন।

(খ) **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারত'-শীর্ষক কবিতাটির বিষয়-বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

উ. **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের'প্রাচীন ভারত'কবিতাটির সারমর্ম লেখ।

উ.। **মর্মার্থ** দেখ।

প্র. ৪। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারত'-শীর্ষক কবিতাটির মর্ম-কথা বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপর মন্তব্য কর।

উ. **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ (ক) সংগীত = সম্ + গীত। উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস। তপোবন = তপঃ + বন। উল্লাস = উৎ + লাস। সংযত = সম্ + যত। উন্নাদ = উৎ + নাদ।

(খ) **প্রশ্ন ঃ** সন্ধি কর—অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে, বিজয়-উল্লাসে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে।

উ.। অপাঙ্গেঙ্গিতে, বিজয়োল্লাসে, উৎসবোচ্ছ্বাসে (কবিতাটিতে ছন্দের অনুরোধে সমান সত্ত্বেও এই সন্ধিগুলি করা হয় নাই)।

সমাস ঃ উদ্ধতললাট—উদ্ধত ললাট (কর্মধারয়)। নিয়তধ্বনিত—নিয়ত ধ্বনিত (সুপ্ সুপা)। তপোবন—তপের অর্থাৎ তপস্যার জন্য বন (৪র্থী তৎপুরুষ)। নির্বাক—নিঃ (=নাই) বাক্ যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। স্ফীতস্ফূর্ত—যাহা স্ফীত তাহাই স্ফূর্ত (কর্মধারয়)। মহামৌন—মহৎ মৌন (কর্মধারয়)।

সাধু শব্দ-রূপ ঃ স্পর্ধিছে—স্পর্ধা করিতেছে। গর্জে—গর্জনে। হেথা—একানে। হোথা—ওখানে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ ধ্বনিত—ধ্বন + ক্ত। খ্যাত = খ্যা + ক্ত। মৌন—মুনি + অণ্। স্তব্ধ—স্তম্ভ্ + ক্ত।

কারক ও বিভক্তি ঃ দিকে দিকে—অধিকরণে -এ। ইঙ্গিতে, হ্রেষায়, বৃংহিতে, টংকারে, ঝংকারে, -রবে, -উচ্ছ্বাসে, -গর্জে, -উল্লাসে, -মন্দ্রে, -কল্লোলে, -কলরোলে—প্রত্যেকটিতে করণে -এ।

পদ-পরিবর্তন ঃ গম্ভীর—গাম্ভীর্য, গম্ভীরতা। শান্ত—শান্তি। সংযত—সংযম। উদার—উদারতা, ঔদার্য। গরিমা—গুরু। মহিমা—মহৎ।

অর্থগত পার্থক্য ঃ মন্দ্র—গম্ভীর ধ্বনি ; মন্ত্র—দেবোপাসনার অনুকূল বাক্য বা পদ। উন্নাদ—উচ্চধ্বনিবিশিষ্ট ; উন্মাদ—পাগল।

বাক্যরণগত টীকা ঃ স্পর্ধিছে—সংস্কৃতে 'স্পর্ধ্' ধাতু+ইতেছে =স্পর্ধিতেছে, গদ্যে 'স্পর্ধিছে'। এইরূপ ক্রিয়া কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।

মৌন—'মুনির ভাব' অর্থে শব্দটি বিশেষ্য, কিন্তু বিশেষণরূপে ইহার প্রয়োগ অনেকেই করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ ঃ উন্নাদ, মন্দ্র, স্ফীতস্ফূর্ত।

বিবিধ ঃ প্রশ্ন ঃ 'বন্দী' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ করিয়া দেখাও।

উত্তর ঃ বন্দী রাজার বন্দনা আরম্ভ করিল (স্তুতিপাঠক)। বন্দীর ওজন ষোল পাউণ্ড কমিয়াছে (অবরুদ্ধ ব্যক্তি)।

প্রার্থনা

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' ও 'ভারত তীর্থ' কবিতার ভূমিকা দেখ।

উৎস ও নামকরণ—রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'-নামক কবিতাগ্রন্থ হইতে আলোচ্য কবিতাটি সংকলিত।

এই কবিতায় কবি ভগবানের নিকট ভারতবর্ষের জন্য একটি প্রার্থনা করিয়াছেন। সকল সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরে ভক্তি অটল রাখিয়া ভারতবর্ষ আবার শতেক বিচিত্র কর্মে ধন্য হইয়া উঠুক, আবার তাহা স্বর্গের ন্যায় মহিমমণ্ডিত হউক—ইহাই কবির প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই কবিতাটির বিষয়বস্তু বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে শুধু 'প্রার্থনা'।

ছন্দ—তানপ্রধান ; বহমান পয়ার। একটিমাত্র বাক্যে কবিতাটি রচিত।

সমালোচনা—'প্রার্থনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের উন্নতি-কামনাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ আজ নরকে নামিয়া গিয়াছে কিনা সেকথা তিনি বলেন নাই; তবে উহা যে অধঃপতিত সেকথা ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। তাই তিনি ভারতকে আদর্শের এক স্বর্গে উন্নীত দেখিতে চান, তাই তাঁহার ভগবানের নিকট এই 'প্রার্থনা'।

একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে কবি ভারতবর্ষের সম্প্রতিক দোষ-গুলির সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। আজ ভারতবর্ষে সর্বত্র অন্ধ গোঁড়ামির প্রাদুর্ভাব। মানুষ তাই নিঃশঙ্কচিত্তে হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানী এখানে সত্য ঘোষণা করিতে ভয় পায়। বস্তুতঃ নৈতিক দুর্বলতা জাতির মেরুদণ্ড বক্র করিয়া দিয়াছে। কূপমণ্ডুকতা পাইয়া বসিয়াছে জাতিকে। আচার-বিচারের শত বাধা, সংকীর্ণ অন্ধ সহস্র জীর্ণ সংস্কার মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি হরণ করিয়াছে। ফলে সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাও এদেশে দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। কবি তাই এই অবস্থার পরিবর্তন চাহেন। তিনি চাহেন ভারতবর্ষ আবার তাহার সামাজিক ও নৈতিক স্বাধীনতা, শক্তি ও নিষ্ঠা ফিরিয়া পাক। আবার তাহা আদর্শের উচ্চস্তরে উন্নীত হউক। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত করে। সে স্বদেশপ্রেম অন্ধ আবেগ নহে, উহা সত্য সচেতন উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত দেশের প্রতি ভালোবাসা। দেশকে ভালোবাসেন বলিয়াই সমসাময়িক কালের জাতীয় দুর্বলতাগুলি তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে এবং সেইজন্যই সেগুলি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ যাহাতে আবার আদর্শস্থানীয় হয় তাহার জন্য কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষ আদর্শ-বাদীর দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ। উদারতা ও বলিষ্ঠতায় গরিমামণ্ডিত এদেশের ঐতিহ্য। এইরূপ একটা সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই যেন কবি ভারতকে তাহার পূর্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন।

কবিতাটির মধ্যে অবান্তর কল্পনা বা অনর্থক উচ্ছ্বাসের অবকাশ নাই। একটিমাত্র ভাবাবেগ প্রথম চরণে আরম্ভ করিয়া বহমান পায়ের ধারায় চলিয়া শেষ পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহার অবিসর্পিত গতি ও অনাবিল আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। সর্বশেষে কবিতাটির গম্ভীর সুর, সুনিপুণ শব্দনির্বাচন ও অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিও লক্ষণীয়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই নৈবেদ্যের এইরূপ অর্ঘ্যরচনায় সমর্থ।

সংক্ষিপ্তসার—কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন এমন এক আদর্শ দিব্যলোকে ভারতে জাগরণ ঘটাইতে, যেখানে মানুষ হইবে নির্ভীকচিত্ত উন্নতমস্তক, যেখানে জ্ঞানে থাকিবে সকলের সমান অধিকার, যেখানে মানুষ আপন গৃহের বাহিরে সমগ্র বিশ্বে আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবে। সেখানে মানুষের চিন্তায় ও কথায় কোনো বিরোধ থাকিবে না, সকলেই সর্বত্র সহস্র কল্যাণকর ও সার্থক কর্মে নিরত থাকিবে। এই আদর্শ-লোকে তুচ্ছ আচার ও সংস্কার স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া পৌরুষকে খর্ব-ক্ষুণ্ণ করিবে না; মানুষ ভগবানের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় সকল কর্মে, সকল চিন্তায় বিবেকের বাণীকে ভগবানেরই অভ্রান্ত নির্দেশ বলিয়া পালন করিবে। সেই আদর্শে পৌছিতে পারিলে ভারত এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গে পরিণত হইবে। কবির প্রার্থনা—ভগবান্ যেন, প্রয়োজন হইলে রূঢ় আঘাত হানিয়া, ভারতবাসীকে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য—মানুষের মন যেখানে নির্ভীক। মনে ভয় থাকিলে সবসময় সত্য কথা বলা বা সত্য পথ আশ্রয় করা সম্ভব হয় না। **উচ্চ যেথা শির**—সেখানে মানুষ প্রকৃত পৌরুষ ও তেজস্বিতার অধিকারী বলিয়া উন্নতমস্তক; যেখানে মানুষকে তোষামোদ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের কাছে মাথা নত করিতে হয় না। **জ্ঞান যেথা মুক্ত**—জ্ঞান যেখানে অবারিত অর্থাৎ জ্ঞানে যেখানে ধনি দরিদ্রনির্বিশেষে আদ্বিজচণ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) তখন ভারতবর্ষের জ্ঞানের দ্বার প্রকৃতপক্ষে অর্থবানের জন্যই খোলা ছিল, এখন যে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বলা চলে না। গৃহের প্রাচীর—ঘরের দেওয়াল। প্রাঙ্গণতলে—উঠানে; আঙিনায়। দিবসশর্বরী—দিনরাত্রি। • বসুধারে রাখে নাই ইত্যাদি—পৃথিবীকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখে নাই। **যেথা গৃহের প্রাচীর……ক্ষুদ্র করি**—পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে ভারতের মানুষও স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। সে কেবল নিজের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে লইয়া ঘর বাঁধিতে শিখিয়াছে। সেই ঘরের বাহিরেও যে আরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঘর আছে এবং সেগুলির মধ্যেও যে তাহারই মতো মানুষ বাস করে, তাহা সে জানিতে চায় না, প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের খবর রাখিবার

প্রয়োজন সে বোধ করে না। তাহার ঘরের দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্থানটুকুই তাহার জগৎ, তাহার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্র। এইভাবে দেখা যায় সমস্ত পৃথিবীটাকে কতকগুলি পরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে—তাহারা যেন কেহ কাহারও নয়। রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ ভারতবর্ষের প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইরূপ উগ্র ব্যক্তিস্বার্থ থাকিবে না। সেখানে প্রতিটি পরিবার স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়াও জানিবে যে তাহারা এক সুবৃহৎ মনুষ্য-সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই এক বিশ্বপিতার সন্তান। আত্মপর ভেদ সেখানে তিরোহিত। **হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে**—চিন্তার আশ্রয় মন হইতে আপনা-আপনি বাহির হয়। **যেথা বাক্য হৃদয়ের** ইত্যাদি—যেখানে মানুষ মনে যাহা ভাবে অসংকোচে তাহাই কথায় প্রকাশ করে; যেখানে মানুষের চিন্তায় ও কথায় কোনো বিরোধ নাই। **নির্বারিত স্রোতে**—বাধাহীনপ্রবাহে। দেশে দেশে—পৃথিবীর সকল স্থানে। দিশে দিশে—দিকে দিকে। কর্মধারা—বিভিন্ন বিচিত্র কর্মের স্রোত। **অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়**—সহস্র প্রকারের সার্থকতায়। কবি এমন এক আদর্শ জগতের স্বপ্ন দেখিতেছেন যেখানে মানুষ নানাপ্রকারের প্রয়োজনীয় কর্মে, সফলভাবে লিপ্ত রহিয়াছে; সেখানে মানুষ এমন কোন কর্মে লিপ্ত হয় না যাহা ফলপ্রদ নয়।

তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি—মরুভূমির বালুকার ন্যায় অন্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারসমূহ, যাহা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংস্কারের বশবর্তী হইয়া মানুষ অনেক সময় যাহা উচিত বলিয়া বুঝিতে পারে তাহা করে না বা করিতে পারে না। এইভাবে আচার ও সংস্কার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির পথে বাধা। **বিচারের স্রোতঃপথ**—স্বাধীন বিচারবুদ্ধি যেন নদী-প্রবাহের মতো, তাহা নিজের পথ নিজেই প্রস্তুত করিয়া লয়। **তুচ্ছ আচারের……ফেলে নাই গ্রাসি**—নদীর প্রবাহের পথে যদি মরুভূমি পড়ে, তবে মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশি জলধারাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া শুষিয়া লয়। সেইরূপ স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পথে যদি আচার অনুষ্ঠানের বাধা পড়ে, তবে তাহাও প্রতিহত হইয়া ক্রমে লোপ পায়। পৌরুষ—পুরুষোচিত শক্তি ও তেজস্বিতা। শতধা—শত খণ্ডে ভগ্ন। **পৌরুষেরে করেনি শতধা**—মানুষের শক্তিকে খণ্ডিত করিয়া নষ্ট করে নাই। তুমি—ভগবান্। সর্বকর্মচিন্তা আনন্দের নেতা—সকল কাজ, ভাবনা এবং আনন্দের অধিষ্ঠাতা। **নিত্য যেথা……**

নেতা—যেখানে মানুষ সর্বদা ভগবানে অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া কাজ, চিন্তা এবং আনন্দে রত হয় ; সহজ কথায়, যেখানে মানুষ তাহার কোনো ব্যাপারেই ভগবান্‌কে ভোলে না, সকল ব্যাপারেই বিবেকের নির্দেশ মানিয়া চলে। **নির্দয় আঘাত করি**—বর্তমান ভারত আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতনের গভীরে নামিয়া গিয়াছে। তাহার সুপ্ত জড়বৎ চেতনার জাগরণ ঘটাইতে যদি নিষ্ঠুর আঘাতের প্রয়োজন হয়, তবে কবি ভগবানের দেওয়া সেই আঘাতও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। **স্বর্গে**—আদর্শ জগতে। পৃথিবীতে যদি মানুষের ধ্যানের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে তাহাই তো স্বর্গ।

ব্যাখ্যা

যেথা তুচ্ছ আচারের…………স্বর্গে করো জাগরিত ॥

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতার শেষ ছয় পঙ্‌ক্তি। ভারতবর্ষকে আদর্শের উচ্চ সোপানে উন্নয়নের জন্য কবির ইহা প্রার্থনা।'

রবীন্দ্রনাথ জগৎপিতা ঈশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াছেন, ভারতবর্ষ যেন উৎকৃষ্ট আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গ এই বিশুদ্ধ আদর্শেরই নামান্তর। জরাজীর্ণ সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানের জঞ্জালস্তূপ মরুভূমির বালুকার সহিত তুলনীয়। মরুবালু নদীর প্রবাহ শুষিয়া লয়, নদীখাত বুজাইয়া দেয়। ফলে সেখানে গতিশীল স্রোত চলিতে পারে না। তেমনি কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার মানুষের স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করিয়া দেয় ; ফলে উহার সক্রিয়তা ব্যাহত হয়। তখন মানুষের সত্যকার পৌরুষ বা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কবির প্রার্থনা—ভারতবর্ষ সেই জীর্ণ সংস্কার হইতে যেন মুক্ত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে সুস্থ বিচার শক্তি, বলিষ্ঠ পৌরুষ আর ঈশ্বরে নিষ্ঠা ফিরিয়া আসুক। ভগবান্ কঠোর আঘাত করিয়া ভারতের মূঢ় জড় অবস্থা দূর করুন। আবার ভারতবর্ষ উজ্জ্বল আদর্শবাদিতায় গরীয়ান্ হইয়া উঠুক। তাহা হইলে এই মাটির পৃথিবীই স্বর্গ হইয়া উঠিবে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া প্রার্থনাটির মর্মকথা পরিস্ফুট কর

উ.। **সমালোচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।**

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতার সারসংক্ষেপ নিজের ভাষায় লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র ৩। রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতাটির বক্তব্যবিষয় পরিস্ফুট কর এবং সে-সম্বন্ধে মন্তব্য লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

প্র. ৪। "ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত"—কবি 'সেই স্বর্গ' বলিতে কোন স্বর্গ বুঝাইতে চাহিয়াছেন? কেনই বা তাহা স্বর্গ?

উ.। **সমালোচনা** ও **সংক্ষিপ্তসার** হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাসঃ ভয়শূন্য—ভয়ের দ্বারা শূন্য (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। সহস্রবিধ—সহস্র বিধা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। মরুবালুরাশি—মরুর বালু (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ); তাহার রাশি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। স্রোতঃপথ—স্রোতের পথ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ)। নির্দয়—নিঃ (=নাই) দয়া যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা।

সাধু শব্দ-রূপঃ যেথা—যেখানে। বসুধারে—বসুধাকে। করি—করিয়া। হতে—হইতে। উচ্ছ্বসিয়া—উচ্ছ্বসিত হইয়া। দিশে দিশে—দিকে দিকে। গ্রাসি—গ্রাস করিয়া। পৌরুষেরে=পৌরুষকে। নি—নাই। ভারতেরে—ভারতকে।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ উচ্ছ্বসিয়া—উৎ—শ্বস্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়া। নির্বারিত—নির্—বারি+ক্ত। গ্রাসি—গ্রাস (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) +ইয়া। পৌরুষ—পুরুষ+অণ্। জাগরিত—জাগৃ+ক্ত।

কারক ও বিভক্তিঃ নিজ 'হস্তে' নির্দয় আঘাত করি (করণে-এ)

সমস্তপদ-গঠনঃ 'ভয়শূন্য' কথাটির অনুকরণে 'শূন্য' উত্তরপদরূপেঃ মহাশূন্য, জনশূন্য, জলশূন্য, বায়ুশূন্য, অর্থশূন্য, লোভশূন্য।

ণত্ব-বিধানঃ **প্রশ্ন**ঃ 'প্রাঙ্গণতলে' কথাটিতে ণত্বের কারণ কি?

উত্তরঃ র্-এর পর স্বরবর্ণ ও কবর্গ ব্যবধান থাকায় দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ হইয়াছে।

বাক্য-বিশ্লেষণ ঃ কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা একটিমাত্র জটিল বাক্য ; ইহার প্রধান খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য 'নিজ হস্তে……জাগরিত', বিশেষণ-ভাবের ('স্বর্গে' পদের বিশেষণ) অপ্রধান খণ্ডবাক্য 'চিত্ত যেথা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা' পর্যন্ত মোট নয়টি—সর্বসাকল্যে দশটি খণ্ডবাক্যের সমবায়ে একটি বিরাট্ জটিল বাক্য।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ উচ্চ—নীচ। মুক্ত—বদ্ধ। আপন—পর। খণ্ড—অখণ্ড। আনন্দ—বিষাদ। নির্দয়—সদয়। জাগরিত—নিদ্রিত।

উপসর্গযোগে নূতন শব্দ-গঠন : 'আচার, বিচার'—প্রচার, সঞ্চার, উপচার, অতিচার (অত্যাচার)।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ উচ্ছসিয়া—দেখিতে নামধাতুর মতো হইলেও আসলে এটি নামধাতু নয়, উৎ—শ্বস্ ধাতু হইতে জাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

দিশে দিশে—সংস্কৃতে 'দিশ্' শব্দ বাঙলায় প্রথমান্ত 'দিক্'-রূপে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাই প্রাতিপদিকের রূপ। 'দিশা' প্রাতিপদিকরূপে চলে কিন্তু 'দিশ্' বা 'দিশ' চলে না। রবীন্দ্রনাথ চালাইয়াছেন 'দেশে দেশে'-র সহিত ধ্বনিসাম্যের প্রয়োজনে।

গ্রাসি—'গ্রাস' (বিশেষ্য) হইতে এই ক্রিয়াটি সৃষ্ট বলিয়া এটি নামধাতু।

অর্থগত পার্থক্য ঃ পৌরুষ=পুরুষের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শক্তি, তেজস্বিতা ইত্যাদি; পরুষ=কর্কশ, রূঢ়; পুরুষ=মানুষ (পুংলিঙ্গ)। মনে রাখিতে হইবে যে 'পৌরষ' বলিয়া কোনো শব্দ নাই।

ধুলামন্দির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' ও 'ভারত-তীর্থ' কবিতার ভূমিকা দেখ।

উৎস ও নামকরণ—এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'-নামক কবিতাগ্রন্থের ১১৯-সংখ্যক কবিতা। কবির 'গীতাঞ্জলি'তেও কবিতাটি মুদ্রিত।

মূলে কবিতাটির কোনো শিরোনাম নাই। ইহার বিষয়বস্তু হইল এই যে, ভগবান্ দীন পতিত কর্মক্লান্ত মানুষেরই মধ্যে বিরাজমান। মন্দিরে তিনি নাই। তিনি ধুলার মধ্যে কর্মরত মানুষের রূপে বিদ্যমান। সেই ধুলাই তাহা হইলে ভগবানের সত্যকার অধিষ্ঠানস্থল—সেইজন্যই তাহা 'মন্দির'। এই 'ধুলার মন্দির'-সম্বন্ধেই কবিতাটির বক্তব্য কেন্দ্রীভূত। মানুষ এই মন্দিরে আসিয়া কর্মরত হউক—ইহাই কবির মূল বক্তব্য। সুতরাং কবিতাটির শীর্ষনাম সঙ্গত ও সুন্দর।

সমালোচনা—'ধূলামন্দির' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বকীয় সাধনা-সংস্কার ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য হইল এই যে, ভগবান্ মঠমন্দিরে বিগ্রহরূপে থাকেন না, থাকেন নরনারায়ণরূপে। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর-উপাসনায় মুক্তি কখনও কাম্য হওয়া উচিত নহে, কারণ ভগবান্ কাহাকেও মুক্তি দেন না। তিনি নিজেও মুক্তি চাহেন না। তাই ইচ্ছা করিয়া তিনি তাঁহার সৃষ্ট জগতের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন। মানুষকেও তিনি কর্মের জন্যই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন—কর্ম হইতে মুক্তির জন্য নহে।

এই দুইটি মূলসূত্র কবির সাধনা-সংস্কারের গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম, শুধু ব্রাহ্মই নহেন—ব্রাহ্মণের উপর কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নও বটে। সেইজন্য 'ধুলামন্দিরে' তিনি ব্রাহ্মণের মন্দিরকে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়াছেন এবং ভারতীয় দর্শনের মুক্তিতত্ত্বকে একটু উপেক্ষাভরেই বাতিল করিয়াছেন। যুগধর্মে আজ কর্মযোগ শ্রেষ্ঠধর্ম—এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। ভগবান্ দীনরূপে বিরাজমান—এ-কথাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে মন্দির হইতে নির্বাসন দিতেই হইবে—এতটা ঠিক নয়। তাহা হইলে যুগাবতার রামকৃষ্ণ হইতে সকল ভক্ত নস্যাৎ হইয়া যান। আসল কথা, মানববাদিতার চক্ষু দিয়া দেখিলে মানুষের সেবাই পরমধর্ম—এ-যুগে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। মন্দিরে বসিয়া যাঁহারা উপাসনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বাণীও ঠিক তাহাই। সত্য কথা, অনুষ্ঠানকে বড করিয়া আর ফুলচন্দনের স্তূপ রচনা করিয়া অন্ধ আচারে ভগবান্-লাভ হয় না। কিন্তু সেইরূপ 'সখের মজ্‌দুরি'তেও ভগবান্ মিলে না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ-কথা সত্য। কিন্তু ভগবান্ কোথায়—এই প্রশ্নের এত সহজ মীমাংসা সহসা মানিয়া লওয়া দুষ্কর। কবির হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এতটা না গেলেও পারিতেন।

অথবা কবি বলিয়াই হয়তো এরূপ লেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে—ভাববাদী কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন স্বাভাবিক। 'পূরবী' (১৩৩০) কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—

"প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়"

ইত্যাদি বলিয়া উল্লাস করিয়াছেন; আবার 'সেঁজুতি' (১৩৪৫) কাব্যে বলিয়াছেন ইহার বিপরীত কথা—

"তব ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে—তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব ॥"

তবে, মানুষকে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবার ও মানুষকেই চরম মূল্য দিবার প্রেরণারূপে কবিতাটি সুন্দর।

সংক্ষিপ্তসার—মন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের পূজারীর উদ্দেশে কবি বলিতেছেন—পূজার্চনা সাধনা-আরাধনা সব পড়িয়া থাক। রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের অন্ধকার কোণে বসিয়া নিভৃতে নির্জনে পূজারী যাঁহার পূজায় রত, চোখ মেলিয়া দেখিলে তিনি সেই দেবতাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন না। দেবতা গিয়াছেন ধূলামাটির মধ্যে, যেখানে দরিদ্র চাষাভূষা ও কুলিমজুরেরা জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া সংবৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতেছে। ভগবান্ দীনবেশে তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিজদেহ ধূলিমলিন করিতেছেন। কবি তাই মানুষকে পূজার শুচিবাস ছাড়িয়া সেই ধুলারই মধ্যে আসিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। সংসারে মুক্তি পাওয়া যায় না; মুক্তি কোথাও নাই। স্বয়ং ভগবান্ই কি মুক্ত? তিনি স্বেচ্ছায় নিজসৃষ্টির সহিত সহস্র বন্ধনে বাঁধা। ধ্যান-ধারণা আর পূজার সকল আয়োজন পড়িয়া থাক। মহাকর্মী ভগবানের সঙ্গে একত্র হইয়া মানুষ শ্রমসাধ্য কর্মে আত্মনিয়োগ করুক। সেই পূজাই হইবে শ্রেষ্ঠ পূজা।

মর্মার্থ—রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ মঠ-মন্দিরে ভগবানের অধিষ্ঠান কল্পনা করিলেও ভগবান তাহার মধ্যে নাই। তিনি স্বয়ং মহাকর্মী; কর্ম যেখানে, তিনিও সেখানে। আর এ সংসারে প্রকৃত কর্মী তাহারাই যাহারা নিজেরা অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও মানুষের সেবায় বারো মাস দেহের রক্ত জল করিয়া খাটিতেছে। ভগবান্ নরনারায়ণরূপে এই দরিদ্র শ্রমজীবীদের সঙ্গে

সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেনও কর্মের জন্য—মুক্তি দান করিবার জন্য নয়। তিনি নিজেও মুক্তি না লইয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টিরূপ বন্ধনকে বরণ করিয়াছেন। তাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় পূজার্চনা ছাড়িয়া, মন্দির ছাড়িয়া কর্মক্ষেত্রের ধুলায় অবতরণ করা। কর্মের মধ্য দিয়াই ভগবানের দর্শনলাভ সম্ভব।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

সাধন—সাধনা; ভগবান্‌কে লাভ করিবার প্রচেষ্টা। **সমস্ত থাক্ পড়ে—** ও-সকল রাখিয়া দাও; ও সবের কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ ও-পথে ভগবান্‌কে লাভ করা যাইবে না। **রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে** ইত্যাদি—কবি পূজারী ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া তুমি নিভৃতে যে পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধারণা কর, তাহাতে লাভ কি? দেবতার দর্শন পাইবার জন্য তোমার এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল; কারণ যেখানে তুমি দেবতার সন্ধান কর, সেখানে দেবতা থাকেন না। অন্ধকারে—রুদ্ধদ্বার মন্দিরের আলোকহীন অভ্যন্তরে। **লুকিয়ে**—পাছে অনেক লোকের মধ্যে থাকিলে সাধনায় বিঘ্ন হয় এই ভয়ে আত্মগোপন করিয়া। **কাহারে…… সংগোপনে?**—লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নির্জন মন্দিরে কাহার পূজা করিস্? কবির বক্তব্য—দেবতার অধিষ্ঠান বলিয়া কল্পিত যে মন্দির, তাহার মধ্যে দেবতা বাস করেন না। তাই মন্দিরে বসিয়া তাঁহার পূজা করার কোনোই সার্থকতা নাই। মন্দিরের বিগ্রহ নিষ্প্রাণ পুতুল মাত্র। **মন্তব্য**ঃ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিকতা-বিরোধী। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সংস্কার হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। **নয়ন মেলে**—চক্ষু মেলিয়া। এ চক্ষু বহিশ্চক্ষু নয়,—অন্তশ্চক্ষু। **দেবতা নাই ঘরে**—তথাকথিত দেবমন্দিরে দেবতা নাই, যাহা আছে তাহা নিষ্প্রাণ বিগ্রহ। তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা মস্ত বড় ভুল।

দ্বিতীয় স্তবক

তিনি গেছেন—দেবতা চলিয়া গিয়াছেন। তবে কি দেবতা আগে মন্দিরে ছিলেন, এখন নাই? এইরূপ অর্থ না করিলে 'গেছেন'-এর সার্থকতা থাকে

কোথায় ? আগে আসা, তার পরে তো যাওয়া। মাটি ভেঙে—কঠিন মাটিকে লাঙলের মুখে কোমল করিয়া। **পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ** —যেখানে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ কঠিন পরিশ্রমে পাহাড়-পর্বত কাটিয়া মানুষের যাতায়াতে সুবিধার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছে। **খাটছে বার মাস** —সারা বৎসর অন্য নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য মানব-সেবার কর্মে লিপ্ত রহিয়াছে। **তিনি গেছেন......বারো মাস**—মন্দিরের বিগ্রহে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই। তিনি দরিদ্রের বন্ধুরূপে দীনদরিদ্র শ্রমজীবীদের মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি স্বয়ং কর্মযোগী বলিয়া কর্মীদের মধ্যেই তাঁহার অবস্থান। দরিদ্ররূপেই তিনি নারায়ণ। **রৌদ্রে জলে** ইত্যাদি—রৌদ্রে-পুড়িয়া জলে ভিজিয়া যাহারা সংবৎসর শারীরিক শ্রমে রত, ভগবান্ তাহাদেরই একজন হইয়া অবিরাম কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হতাশায় প্রেরণা ও দুঃখে সান্ত্বনা যোগাইতেছেন। তাই ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে মন্দিরে বসিয়া সাধনভজনে চলিবে না—সত্যকার কর্মীর বেশ ও সংকল্প লইয়া যাইতে হইবে কর্মীদের মধ্যে। **ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে**—শ্রমজীবীর কাজ করিতে করিতে তাঁহার হাতদুখানিও ধূলিমলিন হইয়াছে। **শুচি বসন ছাড়ি** —পূজা-অর্চনার পবিত্র পট্টবস্ত্র ছাড়িয়া; দরিদ্র শ্রমিকের শতচ্ছিন্ন ধূলিমলিন বসন পরিয়া।

তৃতীয় স্তবক

মুক্তি কোথায় পাবি—মানুষ চায় ভবযন্ত্রণা হইতে চিরতরে মুক্তি। কিন্তু কবির মতে, ভগবান্ ভক্তকে মুক্তি বিতরণ করেন না। মুক্তি দিবার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে পাঠানও নাই। তাই সংসারে মুক্তি কোথাও পাওয়া যাইবে না। **আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন** ইত্যাদি—ভগবান্ স্বয়ং সর্বশক্তিমান্ হইয়াও মুক্ত থাকিতে চাহেন নাই। তাই তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া স্বেচ্ছায় বিপুল বিশ্বের সব-কিছুর সহিত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। মুক্তি যখন তাঁহার নিজেরই কাম্য নয়, তখন মানুষই বা মুক্তি চাহিবে এবং পাইবে কেন? মানুষের মুক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। ফুলের ডালি—দেবপূজার জন্য সংগৃহীত সাজিভরা ফুল। ছিঁড়ুক বস্ত্র—কাজ করিতে করিতে ছিন্ন বসন আরও ছিন্ন হউক। ধুলাবালি লাগুক—কর্মরত মানুষের দেহ ধুলায় ধূসর হইয়া যাক। **কর্মযোগে তাঁর সাথে এক** ইত্যাদি—মানুষ যেন দরিদ্র শ্রমিকরূপী

নরনারায়ণের সঙ্গে একসাথে কর্মে আত্মনিয়োগ করে। ভগবান্ স্বয়ং কর্মিরূপে মানুষের মাঝে বিরাজ করিতেছেন। তাই কর্মের সাধনায় শ্রমে রত হইলেই মানুষ তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। কবির মতে কর্মই শ্রেষ্ঠ পূজা। তুলনীয়: "Work is worship".

মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একবার ভাবাবেগবশে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন স্বদেশী যুগে। কিন্তু অচিরাৎ তিনি কর্মজগৎ হইতে পলায়ন করিলেন:

"আবার মোরে ডাক দিয়ো না, ভাই,
কাজের পথে আর তো আমি নাই।
তোমরা সবাই যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলে গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই!"

এই 'খেয়া' কাব্যেই কবি মুক্তিও চাহিয়াছেন:

"দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষখেয়ায়।"

ব্যাখ্যা

(১) ভজন পূজন সাধন.........দেবতা নাই ঘরে। (স্তবক ১)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ধূলামন্দির'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি ভগবানের অধিষ্ঠান কোথায়, তাহা বলিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ সূচনা করিয়াছেন।

সাধারণ মানুষ সংস্কারবশে মন্দিরের বিগ্রহটিকেই ভগবান্-জ্ঞানে পূজা-অর্চনায় রত হয়। অনুষ্ঠানের সেখানে বাড়াবাড়ি। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে সে ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হয়—নেহাত যান্ত্রিক অনুষ্ঠান অনুসারে কিন্তু সেই অন্ধকার কক্ষে যেমন আলো নাই, তেমনি ভগবান্‌ও নাই। কবি বলেন, ভগবানের অধিষ্ঠান জীবন্ত মানুষেরই মধ্যে। ভগবান্ দীনতারণ, পরম-

কারুণিক। তিনি কখনও বদ্ধ ঘরে অন্ধকারে আবদ্ধ নহেন; দীনদরিদ্রের মধ্যে, তাহাদের অক্লান্ত শ্রমে আর দুঃখদুর্দশায় তিনি সর্বদাই একান্ত সহায় হইয়া বর্তমান আছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে বিগ্রহ দেবতা নহে, তথাকথিত মন্দিরও দেবতার অধিষ্ঠানস্থল নহে। নরের মধ্যে নারায়ণ, দীনের বেশেই তিনি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছেন। কাজেই ভগবানের প্রকৃত মন্দির ঐ ধুলা —যেখানে দরিদ্র মানুষ শ্রম করে। উহাই কবির কল্পনায় ধুলামন্দির। সেই ধুলামন্দিরে মানুষরূপী ভগবানের সেবাই শ্রেষ্ঠ পূজা।

(২) রৌদ্রে জলে আছেন……আয় রে ধুলার 'পরে। (স্তবক ২)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির' কবিতার অন্তর্গত। এই অংশে রবীন্দ্রনাথ ভগবানের সত্যকার অধিষ্ঠানস্থলে সকল মানুষকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভগবান্ মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যে নাই। তিনি আছেন কর্মক্লান্ত দীনহীনেরই মধ্যে—নরনারায়ণরূপে। ভগবান্ দীনতারণ,, করুণাময়। তাই দুঃখীর সঙ্গ তিনি ছাড়েন না। দুঃখীর শ্রমে তিনি চিরসঙ্গী। কাজেই ঐ যে ধুলামাটি, যেখানে দরিদ্র মানুষ কর্মব্যস্ত—সেইখানেই ভগবানের অধিষ্ঠান। উহাই তাঁহার সত্যকার মন্দির, ধুলার মন্দির। দরিদ্র শ্রমজীবী সংবৎসর রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া কাজ করে। বস্তুতঃ, ঐ দরিদ্র মানুষরূপেই তিনি আবির্ভূত। তাঁহার পরনে পূজার পবিত্র পট্টবস্ত্র নাই, ধূলিমলিন ছিন্নবস্ত্রে তিনি খাটিয়া চলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভক্তরাও যেন সেই সাধারণ বস্ত্র পরিয়াই সেই দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। সেই কাজই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা।

(৩) মুক্তি? ওরে মুক্তি……ঘর্ম পড়ুক ঝরে। (স্তবক ৩)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির' কবিতার শেষাংশ। ভগবৎ-সাধনার লক্ষ্য-সম্বন্ধে কবি এখানে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এদেশে ঈশ্বর-উপাসনার সাধারণ লক্ষ্য হইল সংসার হইতে মুক্তি। কবি বলেন মুক্তি মিথ্যা, অসম্ভব। মুক্তি স্বয়ং ভগবানেরও কাম্য নহে। তাই তিনি স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন নিজের সৃষ্টিরই মধ্যে। এই বিচিত্র জগতে সকল জিনিস ও জীবের মধ্যেই তিনি ধরা দিয়াছেন। বিশ্ব হইতে মুক্তি লইয়া তিনিও দূরে থাকিতে চাহেন না। তবে তাঁহার ভক্তেরা কেন মুক্তি চাহিবে? কবি বলেন, ভগবান্ সে মুক্তি দিতে পারেন না। তিনি মানুষকে কর্মের জন্যই

জগতে প্রেরণ করিয়াছেন—কর্ম হইতে পলাইয়া মুক্তিলাভের জন্য নহে। কবি ভক্তবৃন্দকে মন্দিরের অন্ধপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ধ্যান হইতে বিরত হইতে, ফুলচন্দনে আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। বলেন, তাঁহারা যেন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং দীনদরিদ্রের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ধূলিধূসর ক্ষেত্রে নামিয়া পড়েন। কারণ, ভগবান্ দীন কর্মীর বেশে, দরিদ্র-নারায়ণ-বেশেই রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ লইয়া কর্মসাধনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'ধূলামন্দির' কবিতাটির শিরোনামের সার্থকতা আলোচনা কর।

উ.। **নামকরণ** দেখ।

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'ধূলামন্দির' কবিতাটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের 'ধূলামন্দির' কবিতাটির মূল বক্তব্য উল্লেখ করিয়া উহার সম্বন্ধে মন্তব্য কর।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস ঃ অন্ধকারে—অন্ধ করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ), তাহাতে। সৃষ্টিবাঁধন—সৃষ্টিরূপ বাঁধন (রূপক-কর্মধারয়)। ধূলাবালি—ধূলা এবং বালি (দ্বন্দ্ব)। কর্মযোগে—কর্মমূলক যোগ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে।

সাধু শব্দ-রূপ ঃ কাহারে—কাহাকে। পূজিস্—পূজা করিস্। ছাড়ি—ছাড়িয়া। প'রে—পরিয়া। সবার—সকলের। ঝরে—ঝরিয়া। কাটছে—কাটিতেছে। যেথায়—যেখানে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ বাঁধন—বাঁধ্ + অন করণবাচ্যে। বাঁধা—বাঁধ + আ কর্মবাচ্যে।

বাক্য-রচনা ঃ শুচি : দেহ শুচি হইলেই মন শুচি হয় না।

কর্মযোগ : কর্মযোগে শুধু কর্মই হয় না, চিত্তশুদ্ধিও হয়।

নির্দেশানুসারে বাক্য-পরিবর্তন : মুক্তি কোথায় আছে ? (প্রশ্নবাচক)—মুক্তি কোথাও নাই (প্রশ্ন পরিহার, নঞর্থক)।

ব্যাকরণগত টীকা : সংগোপনে—বিশেষ্যের সহিত 'এ' বিভক্তি-যোগে ক্রিয়াবিশেষণ।

নাই—অব্যয়ধর্মী ক্রিয়া (না+'হ' ধাতু), কারণ সকল পুরুষেই ইহার একই রূপ।

সৃষ্টিবাঁধন—সমাস দ্রষ্টব্য।

ছিঁড়ুক, লাগুক, পড়ুক—প্রত্যেকটিই প্রথমপুরুষে বর্তমান অনুজ্ঞার ক্রিয়া।

শুচি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—'শুচি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর কবিতাটি রচিত হয়।

কবিতাটির রচনা-প্রেরণার উৎস সেই সময়কার কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এবং তাহার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষিত হইল। দেশময় ইহার প্রতিবাদ শুরু হইল, যারবেদা জেলে মহাত্মাজী অনশন আরম্ভ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ছুটিয়া গেলেন। এই সকল ঘটনার ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির কিছুটা শোধন হইল এবং তাহার চেয়ে একটা বড় কাজের সূত্রপাত হইল। মহাত্মাজী হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই, দক্ষিণভারতের কোচিন রাজ্যে কেলাপ্পন-নামক জননেতা বর্ণনির্বিশেষে সকল হিন্দুর নিকট সকল মন্দিরের দ্বার মুক্ত করিবার জন্য অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় বিচলিত হইলেন ; কোচিনের মহারাজকে কেলাপ্পনের দাবি মানিয়া লইবার জন্য দীর্ঘ এক পত্র লিখিলেন। দেশের মধ্যে যখন এইভাবে বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন জাগিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের

মধ্যেও তখন এই সমস্যাটির কথা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কবি ঠিক সেই সময়ে 'শুচি' কবিতাটি রচনা করিয়া জাতিকে বাণী দিয়াছেন।

নামকরণ—আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দজীর একটি ক্ষুদ্র বিবরণ দিয়াছেন। বর্ণধর্মের সংস্কার একসময় রামানন্দজীর হৃদয়ে অপবিত্র আবর্জনার মতো জমিয়াছিল। ঠাকুরের আবির্ভাবে রামানন্দজী এই বর্ণভেদ-জ্ঞান যে পাপ তাহা উপলব্ধি করিলেন এবং শ্মশানচারী চণ্ডাল ও অস্পৃশ্য মুসলমানকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহাদের শিষ্যত্ব বরণ করিয়া সেই পাপসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন। এইভাবে রামানন্দ শুচি হইলেন। এই কবিতাটির মধ্য দিয়া কবি কে শুচি, কে অশুচি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। জাতি, বর্ণ বা বৃত্তির বিচারে মানুষ অশুচি হয় না,—অন্তরের পাপই তাহাকে অশুচি করে। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে স্বয়ং রামানন্দজী একটা সম্প্রদায়ের গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও অশুচি ছিলেন। কেবল পাপসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াই তিনি শুচি হইলেন। রামানন্দজীর এই নির্মল সুন্দর পূত চরিত্রটিই কবিতাটির মুখ্যবস্তু—উহাকেই কবি শুচি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। সুতরাং 'শুচি'-নাম সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে।

সমালোচনা—ছন্দিত (rhythmic) গদ্যে রচিত 'শুচি' কবিতাটির মধ্যে মানবপ্রেমের বহুবিঘোষিত মন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়াছে। মানুষমাত্রেই ভগবানের সৃষ্ট, সকলেরই মধ্যে তিনি নিত্য বিরাজমান। এই সত্য ভুলিয়া মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ, শুচি-অশুচি বিচার করিলে অপবিত্র পাপসংস্কারই পুষ্ট হয়। জাতি-বর্ণ, বৃত্তি-ধর্ম, এককথায় সকলপ্রকার ভেদজ্ঞানই পাপের নামান্তর। ইহা অন্তরের পাপ, ইহার মধ্যে আছে অহংকারের বীজ, আছে মানববৈরিতার অভিশাপ। ভগবান্ তো শুধু ভক্তের নহেন, তিনি যে তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যেই মমতাবন্ধনে-বদ্ধ রহিয়াছেন। কাজেই যে-ভক্ত সর্বমানবকে সমান আদরে বুকে লইতে পারে না, ভগবান্ তাহাকে প্রসাদ দেন না। কারণ, অহংকার আর ভেদজ্ঞানের পাপপুঞ্জ তাহার চিত্ত অপবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। রামানন্দজীর মতো নিষ্ঠাবান্ সাধকও একদিন এই পাপেই ঠাকুরের অনুগ্রহে বঞ্চিত ছিলেন। যেদিন আচণ্ডাল মুসলমানকে তিনি কোল দিতে পারিলেন, সেদিন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইল। সেইদিন তিনি ভগবানের অনুগ্রহে পূর্ণ ও দীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

কবিতাটির এই আধ্যাত্মিক মর্মকথা, শুধু 'রামাইত' কেন, সকল বৈষ্ণববাদের মূলসূত্রটি ব্যক্ত করিয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইহা নিছক অস্পৃশ্যতাবর্জনের স্থলভ প্রচার নহে। কেবল জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজন আর মাখামাখিই অন্তরের অন্তস্তলস্পর্শী অগাধ মানবপ্রেম সঞ্চার করে না। 'সাহেব' লোকের অস্পৃশ্যতাবর্জনের মধ্যে তাই রামানন্দের মানবপ্রীতি নাই। সকল অহংকার বিসর্জন দিয়া মানুষ যখন নিজেকে তৃণাদপি দীন জ্ঞান করে এবং সেই দীনতাবোধ হইতে সকল মানুষকে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় অন্তরের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে, তখনই হয় তাহার চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধি। তাই রামানন্দজী বলিয়াছেন, "দেও আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।"

এই তত্ত্বের কথা কবিতাটির প্রাণ হইলেও তাহা কাব্যরসে সিক্ত হইয়াছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের স্থবিদিত শ্রেষ্ঠত্ব। বর্ণনার লালিত্য ও ভাব এখানে স্বচ্ছন্দ ছন্দের মুক্তপ্রবাহে যেন একাত্ম হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মানবপ্রেমের বিশুদ্ধ উপলব্ধি যেমন, ঠিক তেমনি যুগের ডাকও এই কবিতাটির মর্মমূলে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। যুগপ্রয়োজনে সমাজের অচলায়তনটির সংস্কার যে-কালে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, হরিজন-আন্দোলন যখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখনই এই কবিতাটির জন্ম। ইহার কিছুদিন পূর্বে মহাত্মাজী হিন্দুদের বর্ণভেদ এবং সেই ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। এই "অনশনের প্রভাবরূপে সর্বত্রই হরিজনেরা দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার আশা করিতেছিল। দেশে এই সমস্যার কথাই বোধ হয় কবি 'শুচি' কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ করেন। কবি ভালো করিয়াই জানেন ভারতের সমস্যা কেবল বর্ণহিন্দু ও হরিজনের মধ্যে সীমান্বিত নহে, বিরাট্ মুসলমান সমাজের সহিত মিলন একান্ত আবশ্যক: গুরু রামানন্দ কেবল অস্পৃশ্য নাভাকে বক্ষে স্থান দেন নাই, তিনি মুসলমান কবীরকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।" এইভাবে যুগের যে-ডাক রবীন্দ্রচিত্তকে এই কবিতায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা কিন্তু কবির আজন্ম অনুভবেরই নূতন ঘোষণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতায় বহুবার মানবপ্রেমের এই সঙ্গীত শুনাইয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার—মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদ লাভ করিয়া রামানন্দ

উপবাসী অবস্থায় সারাদিন জপতপ করেন, সন্ধ্যায় ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করেন। তারপর অন্তরে দেবতার অনুগ্রহ অনুভব করিলে উপবাস ভঙ্গ করেন।

একদিন মন্দিরে উৎসব। রাজা, রানী, দূরদেশের বড় বড় পণ্ডিত এবং বিচিত্র বেশ ও চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। সন্ধ্যায় স্নান সমাপন করিয়া রামানন্দ দেবতাকে ভোজ্য নিবেদন করিলেন, কিন্তু অন্তরে দেবতার প্রসাদ অনুভব করিলেন না। সেদিন তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হইল। এইভাবে দুই সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। রামানন্দ দেবতার সম্মুখে আভূমি প্রণত হইয়া জানিতে চাহিলেন তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে। দেবতা উত্তর করিলেন, তাঁহার বাস কেবল বৈকুণ্ঠেই নয়। উৎসবের দিনে তাঁহারই সৃষ্ট যে সকল মানুষকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাদের এই অপমানে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন—তাই রামানন্দের হাতের নৈবেদ্য অশুচি। রামানন্দ লোকস্থিতিরক্ষার কথা তুলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে দেবতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দেবতা ক্রোধদীপ্ত চক্ষে জানাইলেন যে, তাঁহারই সৃষ্ট বিপুল বিশ্বে যখন সকল মানুষ সমভাবে নিমন্ত্রিত, তখন লোকস্থিতির নামে তাহার মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ করা মানুষের পক্ষে স্পর্ধার কাজ হইয়াছে—ইহাতে তাঁহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। শুনিয়া রামানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রভাত হইবামাত্র তিনি আপন অহংকার বর্জন করিয়া, এই শ্রেণীর গণ্ডি ছাড়িয়া বাহির হইবেন বিশ্বলোকে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দেবতার কণ্ঠস্বরে রামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল—দেবতা তাঁহাকে উঠিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিতেছেন। রামানন্দ জানাইলেন যে তিনি প্রভাতের অপেক্ষায় আছেন, প্রভাত হইলেই বাহির হইয়া পড়িবেন। দেবতা বুঝাইলেন, প্রভাত কেবল রাত্রির অবসানেই হয় না, —সত্যের বাণী শুনিয়া অন্তর যখন জাগিয়া উঠে তখনই প্রকৃত প্রভাত। অতএব রামানন্দের ব্রতপালনে বাহির হইবার সময় হইয়াছে।

রামানন্দ একাকী পথে বাহির হইলেন। নগর পার হইয়া অবশেষে তিনি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত। সেখানে শবদাহে রত চণ্ডালকে দুই হাত দিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন। চণ্ডাল সভয়ে জানাইল—সে হীনবৃত্তি চণ্ডাল নাভা, রামানন্দ যেন এইভাবে তাহাকে অপরাধী না করেন। রামানন্দ জানাইলেন যে অন্তরে তিনি মৃত, সেই মৃতমনের সৎকারের জন্য আজ চণ্ডাল নাভার সাহায্যই তাঁহার প্রয়োজন।

গুরু আরো অগ্রসর হইলেন; তখন উষার আলোকে শুকতারা অদৃশ্য হইয়াছে। কবীর গৃহের প্রাঙ্গণে বসিয়া কাপড় বুনিতে বুনিতে গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছেন। রামানন্দ গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কবীর সংকোচে জানাইলেন—তিনি জাতিতে মুসলমান, হীন তাঁহার বৃত্তি। রামানন্দ বলিলেন—এতদিন তাঁহার সঙ্গ না পাইয়া তাঁহার অন্তর নগ্ন, ধুলায় মলিন; আজ কবীরেরই হাতে শুচিবস্ত্র পাইয়া তিনি নগ্ন অন্তরের লজ্জা দূর করিতে চান।

রামানন্দের শিষ্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরুর এই অনাচার দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে ধিক্কার দিল। গুরু জানাইলেন—এতদিন তাঁহার দেবতাকে তিনি যেখানে না খুঁজিয়া হারাইয়াছিলেন, সেইখানেই আজ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সূর্যোদয়ে গুরুর প্রসন্ন মুখ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

রামানন্দ—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপূজক, সাধক ও ধর্মপ্রচারক। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। ইঁহার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। ধর্মপ্রচারের জন্য ইনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্যটন করিয়াছেন। 'রামাইত' বা 'রামাত' নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইনি। দ্বাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রামানুজের মতবাদের দ্বারা ইনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে কবীর ইঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার রবিদাস, কবীর, সেনা, ধন্না, পীপা প্রভৃতি বারোজন বিভিন্নজাতীয় শিষ্য ছিলেন। **গুরুর পদ**—মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদ। **জপে-তপে**—ব্যক্তিগত সাধন-ভজনে। **ভোজ্য**—ভোগ; দেবতার উদ্দেশে যে আহার্য বস্তু নিবেদন করা হয়। 'ভোজ্য' এবং 'ভোগ্য' কথা দুইটির অর্থপার্থক্য লক্ষণীয়: ভোজ্য = খাইবার উপযুক্ত; ভোগ্য = ভোগ করিবার উপযুক্ত। **ভাঙে তাঁর উপবাস**—অর্থাৎ তিনি দেবতার ভোগেরই কিয়দংশ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া সারাদিনের উপবাস ভাঙেন। **যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ**—দেবতার বাহ্য প্রসাদ ভোগের অংশ; কিন্তু এই প্রসাদ গ্রহণ করেন রামানন্দ তখনই যখন ঠাকুরের পূজার্চনা করিয়া তিনি দেবতার অনুগ্রহরূপে মনে এক

বিমল প্রসন্নতা অনুভব করেন—আন্তর প্রসাদ পান। এই আন্তর প্রসাদ না পাইলে তাঁহাকে উপবাসীই থাকিতে হয়।

দ্বিতীয় স্তবক

নানাচিহ্নধারী—ফোঁটা-তিলক, মালা, বিচিত্র বেশবাস প্রভৃতি নানা প্রকারের চিহ্ন ধারণ করিয়া। বৈষ্ণবদের মধ্যে নানা সম্প্রদায় এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন ধারণ করিয়া পরস্পরের পার্থক্য প্রকাশ করেন। চিহ্ন এবং বেশবাস দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় কে কোন্ সম্প্রদায়ের। **রাজা এলেন**······ **ভক্তদল**—বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই তথাকথিত উচ্চশ্রেণী—স্পৃশ্য জাতি, এবং স্পৃশ্য বলিয়াই ইঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন। যাহারা পারিল না, তাহারা তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচজাতি। **প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে** —এবার রামানন্দ দেবতাব অনুগ্রহরূপ মানসিক প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত হইলেন। শুচিভাবে দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াও তাঁহার মনে হইল আজ তাঁহার পূজা সার্থক হয় নাই।

তৃতীয় স্তবক

এমনি—এমনভাবে অর্থাৎ দেবতার সূক্ষ্ম মানসিক অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া। **হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে**—দেবতার প্রসাদরূপ পুণ্যবারি হৃদয়কে অভিষিক্ত করিল না বলিয়া তাহা শুষ্ক হইয়া রহিল। মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা—ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া; আভূমি প্রণত হইয়া। কী অপরাধ করেছি?—রামানন্দ হয়তো অজ্ঞাতসারে এমন কোনো অপরাধ করিয়াছেন যাহার ফলে দেবতার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাই দেবতার নিকট তিনি সে অপরাধ কি তাহাই সবিনয়ে জানিতে চাহিতেছেন। **আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে?** —লৌকিক ধারণায় বিষ্ণুর বাস বৈকুণ্ঠে, এই মাটির পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে স্বর্গের উচ্চতম লোকে। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত ভুল। তিনি যে সর্বব্যাপী, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্যন্ত—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র তিনি বিরাজমান। উর্ধ্বলোক নিম্নলোক সর্বত্রই তাঁহার অধিষ্ঠান। যারা প্রবেশ পায়নি—তথাকথিত নীচজাতিরা যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। **আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে**—অস্পৃশ্য বলিয়া যাহাদের দেবতার মন্দির হইতে দূরে রাখা হইয়াছে, তাহারাও দেবতারই

সৃষ্টি। তাই স্পৃশ্যদের মধ্যে তিনি যেমন আছেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেও তেমনি। তাঁহার কাছে যে স্পৃশ্য, মানুষের বিচারে সে অস্পৃশ্য—এ বড় অদ্ভুত। ইহাতে মানুষের স্রষ্টা দেবতাকেই ঘৃণা করা হয়। **পাদোদক**—পা ধোওয়া জল; চরণামৃত, অর্থাৎ করুণা। প্রাণপ্রবাহিণী—প্রাণরূপ নদী; জীবনস্রোত। **আমারই পাদোদক……শিরায়**—তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচজাতিরা আমারই সৃষ্টি; তাহাদের ধমনীতে যে জীবনের ধারা বহিতেছে তাহার উৎস আমারই করুণা। প্রাণপ্রদায়িনী পুণ্যস্রোতা ভাগীরথীর উৎস যেমন বিগলিত বিষ্ণুপদ, তেমনি সকল প্রাণের উৎসও সেই স্রষ্টা। **তাদের অপমান**—দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে অপমান করা হইয়াছে। বেজেছে—আঘাত দিয়াছে। **আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি**—পবিত্র, অহংকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত মন লইয়া তুমি নৈবেদ্য নিবেদন করিতে পার নাই বলিয়া সে নৈবেদ্য অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

লোকস্থিতি রক্ষা করতে—সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে। প্রাচীন আর্যগণ সমাজের সুবিধার জন্য গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে জাতিভেদপ্রথা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইভাবেই সমাজে উচ্চ ও নীচশ্রেণীর এবং পরবর্তী কালে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের উদ্ভব, সামাজিক প্রয়োজনে আসিলেও এই ব্যবস্থা যে কৃত্রিম, মানুষেরই সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সবচেয়ে বড় দোষ যে ইহাতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, একের অধিকার হরণ করিয়া অন্যের অধিকার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। স্রষ্টা সকল মানুষকে সমান করিয়া গড়িয়াছেন, কিন্তু জাতিভেদপ্রথা মানবসমাজের সেই মৌলিক সাম্য নষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে কৃত্রিম বিধিনিষেধ ও অধিকারের অসাম্য আনিয়াছে। রামানন্দ আত্মকর্ম সমর্থনের জন্য লোকস্থিতির এই পুরাতন ব্যবস্থার দোহাই দিলেন। গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে—তাঁহার যুক্তির উত্তরে ঠাকুর কি বলেন তাহাই শুনিবার জন্য। **ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল**—ক্রোধে দেবতার চক্ষু জল্‌জল্‌ করিয়া উঠিল। **যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার**—যে বিশ্বজগৎ আমি নিজে সৃষ্টি করিয়াছি। **যার প্রাঙ্গণে** ইত্যাদি—পৃথিবীকে এখানে একটি বিশাল মন্দির বা গৃহ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই মন্দিরের বা গৃহের প্রাঙ্গণে (উঠানে) নিমন্ত্রিত হয় সকল মানুষ। যে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই এখানে প্রবেশের অধিকারী—তাহাদের মধ্যে ছোট-বড় বা উচ্চ-নীচ

ভেদ স্রষ্টার বিধানে নাই। **তার মধ্যে তুমি লোকস্থিতির বেড়া** ইত্যাদি—ভগবান্ সর্বজনীন সাম্যের ভিত্তিতে যে মানবসমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন, দুঃসাহসী মানুষ সমাজরক্ষার অজুহাতে তাহারই মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করিয়া 'খোদার উপর খোদকারী' করিয়াছে। সমগ্র সমাজকে বিভেদমূলক নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহারা যেন অধিকারের বেড়া তৈয়ারি করিয়াছে। পরের জমিতে বেড়া দিয়া নিজের জমির পরিমাণবৃদ্ধির চেষ্টা যেমন অন্যায়, ভগবানের সৃষ্ট মানুষের সমানাধিকার-ভিত্তিক সমাজে বিভেদের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের অধিকারবৃদ্ধির চেষ্টাও তেমন অন্যায়; ইহা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং তাঁহার একান্ত অনভিপ্রেত। **এই সীমা**—অর্থাৎ মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্যের বেড়া। **আমার অহংকার**—আমি উচ্চশ্রেণীর বলিয়া বিশেষ অধিকার দাবি করিতে পারি এই মনোভাব। তোমার বিশ্বলোকে—উন্মুক্ত স্বাধীন মানুষের মধ্যে, যেখানে কোনোরূপ বৈষম্য বা বিভেদ নাই।

চতুর্থ স্তবক

তিন-প্রহর—প্রায় তিনটা। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর। **যেন ধ্যানমগ্ন**—ধ্যানস্থ যোগী-ঋষি যেমন নিশ্চল নিস্তব্ধ থাকেন, তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ। **প্রতিজ্ঞা পালন করো**—ভগবানের বিশ্বলোকে বাহির হইবার, অহংকার দূর করিবার যে প্রতিজ্ঞা তুমি করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর। পাখিরা নীরব—পাখিরা এখনো জাগে নাই, প্রভাতের এখনো দেরি আছে। **প্রভাত কি রাত্রির অবসানে?**—প্রকৃতিতে প্রভাত আসে রাত্রি শেষ হইলে। কিন্তু ভগবান্ যে প্রভাতের কথা বলিতে চান তাহার সহিত বাহ্য প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক নাই—সে প্রভাত একান্তভাবে মনের ব্যাপার বলিয়া প্রাকৃতিক রাত্রির অবসানের অপেক্ষা করে না। **চিত্ত জেগেছে**—মনের জাগরণ ঘটিয়াছে; মনের ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয়ের মোহরূপ নিদ্রা টুটিয়াছে। **শুনেছ বাণী**—দেবতার সত্য বাণী শুনিতে পাইয়াছ অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছ। **তখনি এসেছে প্রভাত**—এ প্রভাত মানসিক বা আধ্যাত্মিক। ব্রতপালনে—প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে।

পঞ্চম স্তবক

মাথার উপর জাগে ধ্রুবতারা—আকাশের ধ্রুবতারা দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে দিক্ নির্ণয় করিতে সহায়তা করে। রামানন্দের মাথার উপরের এই ধ্রুবতারা

যেন তাঁহার মনের আকাশে উদিত হইয়াছে তাঁহাকে সত্যপথের অভ্রান্ত নির্দেশ দিতে। শবদাহে ব্যাপৃত—মড়া পোড়াইতে ব্যস্ত। **তাকে নিলেন বক্ষে**—তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। **ভীত হয়ে বললে**—অস্পৃশ্য চণ্ডাল চিরকাল দেখিয়াছে যে উচ্চতর জাতিকে স্পর্শ করা তাহাদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া মনে করা হয়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্রাহ্মণ রামানন্দ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন বটে, তবু সে নিজেকেই এই ব্যাপারে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হইয়াছে। **নাভা**—নামটি পরিচিত, কিন্তু ব্যক্তিটি কাল্পনিক। **নাভা** বা **নাভাজী** প্রসিদ্ধ হিন্দী **'ভক্তমাল'** গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি 'ভক্তমাল' রচনা করেন **ষোড়শ শতাব্দীতে**—১৪৮২ শকে অর্থাৎ **১৫৬০ খৃষ্টাব্দে**। **রামানন্দের** আবির্ভাবকাল **চতুর্দশ শতাব্দী**। এই নাভা এবং রামানন্দের মধ্যে কালব্যবধান প্রায় দুইশত বৎসর। এ অবস্থায় রামানন্দ "দুই হাত বাড়িয়ে তাকে বক্ষে" নিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের 'নাভা' কাল্পনিক; প্রসিদ্ধ নামটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কল্পনায় সত্যাভাসের সৃষ্টি।

হেয়—নীচ; ঘৃণ্য। বৃত্তি—উপজীবিকা; পেশা। হেয় আমার বৃত্তি—আমি অত্যন্ত ঘৃণিত ও হীন কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করি। অপরাধী করবেন না আমাকে—আমি অস্পৃশ্য চণ্ডাল; আমার স্পর্শে আপনার জাতি গেলে লোকে আমাকেই দোষ দিবে। দয়া করিয়া আমাকে এই দোষের ভাগী করিবেন না। **অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি**—আমার দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেলেও মনে আমি মৃত, জড়পদার্থের ন্যায় চেতনাহীন। যে শুদ্ধ জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি থাকিলে মন সজীব হয় আমার মধ্যে তাহার একান্তই অভাব। **তোমাকেই আমার প্রয়োজন**—তুমি মৃতদেহের সৎকার কর; কিন্তু আজ তোমাকে দিয়া আমি আমার মৃত অন্তরের সৎকার করাইতে চাই, তাই তোমাকে না হইলে আমার চলিবে না। **মৃতের সৎকার**—মৃতমনের সৎকার অর্থাৎ সংকীর্ণ অহংকারের এবং মানুষের প্রতি ঘৃণার বিষে দুষ্ট অশুচি মনের শুচিতাসাধন। চিতার আগুনে মৃতদেহ শুদ্ধ হয়; রামানন্দ তাঁহার অশুচি মনকে শুদ্ধ করিবেন সকল মানুষকে ভালোবাসিয়া। তাহারই প্রথম সোপান চণ্ডাল নাভাকে আলিঙ্গনদান।

ষষ্ঠ স্তবক

অরুণ-আলোয়—সূর্যের প্রথম রক্তিম আলোকে। শুকতারা—শুক্রগ্রহকেই এইরূপ বলা হয়। গ্রহগণের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইহাকে সন্ধ্যায়

পশ্চিমাকাশে এবং প্রত্যূষে পূর্বাকাশে দেখা যায়। **কবীর**—রামানন্দের বারো জন শিষ্যের মধ্যে ইনি সর্বপ্রধান। জাতিতে মুসলমান হইলেও রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি বিষ্ণুর উপাসক হন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলকেই ইনি ধর্মোপদেশ দিতেন এবং শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন। কবীরের মতে বিষ্ণু ও আল্লা, রাম ও রহিম একই; ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দমাত্র। তাঁহার রচিত দোঁহাবলী অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ-বাক্য। **কাপড় বুনছেন**—কবীর ছিলেন জোলা (তাঁতী)। গান গাইছেন, গুন্‌গুন্ স্বরে—নিজের কাজের মধ্যে থাকিয়াও ভক্ত কবীর আপন মনে মৃদুকণ্ঠে ভগবানের নাম গান করিতেছেন। ব্যস্ত হয়ে—কতকটা সন্ত্রস্ত হইয়া। জোলা—মুসলমান তাঁতী। **এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি**—আমার মন এতকাল ভ্রান্ত সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া আমার নিজেরই ভুলে তোমার মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সংসর্গ এবং স্পর্শ বাঁচাইয়া তোমাকে দূরে দূরে রাখিয়াছি। **অন্তরে আমি নগ্ন**—দেহের নগ্নতা লজ্জাকর বলিয়া দেহকে বসনে আবৃত করিতে হয়। রামানন্দের দেহ নগ্ন না হইলেও অন্তর নগ্ন—সত্য-জ্ঞানের ও সর্বমানবে প্রেমের বসনে তাহা আবৃত নয়। তাই তিনি লজ্জিত। **চিত্ত আমার ধুলায় মলিন**—উচ্চজাতির অহংকার ও কুসংস্কারে আমার মনের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে। **আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে**—কবীর কাপড় বুনিয়া মানুষের দেহের লজ্জা নিবারণ করেন; মনের নগ্নতার লজ্জা দূর করিবার জন্য রামানন্দ তাই তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। কবীরের নিকট সত্য-জ্ঞান ও সর্বমানবে প্রেমের শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি অন্তরের আধ্যাত্মিক দীনতা ঘুচাইতে চান। ইহাই হইবে তাঁহার নগ্ন মনকে আবৃত করিবার পবিত্র বসন। তুলনীয়:

"মলিনবস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।
দিনের কাজে ধুলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হ'য়ে আছে
সহ্য করাই ভার—
আমার এই মলিন অহংকার॥" —রবীন্দ্রনাথ।

সপ্তম স্তবক

ধিক্কার দিয়ে বললে—শিষ্যদের মনে এখনো অহংকার ও কুসংস্কার পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, তাই তাহারা অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করার জন্য গুরুকে ধিক্কার দিল। এ কী করলেন, প্রভু!—আপনি স্বয়ং গুরু হইয়া অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিয়াছেন। এমন আচারবিরোধী সমাজশৃঙ্খলা-বিরোধী কাজ আপনি কেমন করিয়া করিলেন! এত জপতপ সাধন-ভজন করিয়া শেষে মুসলমানের হাতে জাতি দিলেন! **এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম**—রামানন্দ এতদিন মনে করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর বিশ্বের সর্বমানবের মধ্যে নাই,—তিনি থাকেন ঊর্ধ্বলোকে বৈকুণ্ঠে, ধরার ধুলায় দীনহীন মানবের মধ্যে কখনো নামিয়ে আসেন না। তাই তিনি সর্বমানবে দেবতার সন্ধান করেন নাই, তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই। **আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে**—বিশ্বমানবের মধ্যে এই ধুলার ধরণীতেই আজ রামানন্দ দেবতার সন্ধান পাইয়াছেন। **সূর্য উঠল আকাশে** ইত্যাদি—বাহিরের আকাশে সূর্যোদয় হইলে তাহার আলোক আসিয়া পড়িল রামানন্দের মুখে ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের আকাশেও যে সত্য-জ্ঞানরূপ সূর্যের উদয় হইল তাহার আলোকে, সত্যোপলব্ধির অনির্বচনীয় প্রসন্নতার দীপ্তিতে, তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ব্যাখ্যা

(১) ঠাকুর বললেন, "আমার……নৈবেদ্য অশুচি।" (স্তবক ৩)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। ইহা সাধকপ্রবর রামানন্দজীর প্রতি তাঁহার ইষ্টদেবতার উক্তি।

গুরু রামানন্দের মন্দিরে একদিন উৎসব। নানাবর্ণের ধনী-দরিদ্র বহুলোকের সমাগম হইল। কিন্তু তথাকথিত নীচজাতির লোক মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইল না। ইহাতে দেবতা রুষ্ট হইলেন। রামানন্দজী অনুভব করিলেন তাঁহার দেওয়া ভোগ ভগবান্ আর গ্রহণ করিতেছেন না। দুইসন্ধ্যা তাঁহার অন্নজল রুচিল না। ঠাকুরের নিকট অবশেষে তিনি তাঁহার পাপের কথা জানিতে পারিলেন। ভগবান্ বলিলেন, তিনি কেবল বৈকুণ্ঠেই বাস করেন না—তিনি রহিয়াছেন সকল মানুষের মধ্যে। দীন পতিতের তিনি বিশেষ বন্ধু। বিগলিত বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাধারার সৃষ্টি। তেমনি ভগবানের পবিত্র পাদোদক

যেন প্রতি মানুষের শিরায়-শিরায় রক্তধারার মতো প্রবাহিত। অর্থাৎ সকল মানুষই ভগবান্ হইতে সৃষ্ট, সকলেই তাঁহার পবিত্র অংশ। সুতরাং সেই মানুষের একশ্রেণীকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা ভগবানের প্রতিই অপমান সূচনা করে। রামানন্দজীর মধ্যে তখনো অস্পৃশ্যতার সংস্কার জমিয়া ছিল। উহা উচ্চজাতির মিথ্যা অহংকারেরই ফল। রামানন্দ তাই সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার চিত্তের সেই জাত্যভিমান এবং তাহার ফলে মানুষের প্রতি ঘৃণা—এইগুলিই পাপ। সেই পাপসংস্কার বিশেষভাবে উৎসবের দিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইজন্যই ভগবান্ তাঁহার দেওয়া ভোগ গ্রহণ করেন নাই। মানুষকে যিনি অশুচিজ্ঞানে দূরে সরাইয়া রাখিলেন, ভগবান্ এইভাবে ঠিক তাঁহাকেই অশুচি জ্ঞান করিলেন। তাঁহার হাতের নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন না।

উল্লিখিত বিবরণের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। রামানন্দের কাহিনীটির মাধ্যমে তিনি মানবপ্রেমের মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়াছেন।

(২) যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার……এতবড়ো স্পর্ধা! (স্তবক ৩)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতার অন্তর্গত। সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা মানুষের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা মানুষের পরম ধৃষ্টতাই প্রকাশ করে। ঠাকুরের মুখ দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কথাটিই প্রচার করিতেছেন।

তথাকথিত নীচজাতির লোক রামানন্দের মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় নাই। তাহার কারণ বর্ণাশ্রমধর্মের নিষেধ। সমাজকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই একদা এই বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়। রামানন্দজী তাহারই দোহাই দিয়া আত্মকর্মের সমর্থন করেন। কিন্তু ভগবানের চক্ষে এই বর্ণাশ্রমধর্মের বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা চূড়ান্ত ধৃষ্টতা, মহাপাপ। কারণ, এই সৃষ্টি অর্থাৎ এই পৃথিবীটি ভগবানের মন্দির। ভগবান্ সেখানে নিত্য অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার উপাসনা-উপলক্ষেই যেন সকল মানুষের প্রতি ঠাকুরের নিমন্ত্রণ প্রচারিত হইয়াছে। তাই নূতন মানুষ প্রত্যহ সেখানে আসে, জন্মলাভ করে। পৃথিবীর প্রাঙ্গণে ভগবানের নিমন্ত্রণে সমাগত এই যে মানুষ, তাহারা সকলেই সমান আদরে আপ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। সকলকেই ভগবান্ তাঁহার পূজার সমান অধিকার দিয়াছেন। অথচ একশ্রেণীর লোক কিনা কৃত্রিম প্রথার প্রাচীর রচনা করিয়া অধিকাংশ মানুষকে বিশ্বদেবতার

পূজাপ্রাঙ্গণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। ইহা ভগবানের অধিকারে হস্তক্ষেপই বটে। কারণ, এই প্রথায় মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর নিকট হইতেই মাত্র ভগবানের নৈবেদ্য ও পূজা পাওয়ার বিধান রহিয়াছে। বৃহত্তর যে মানবগোষ্ঠীর পূজা করার বা অর্ঘ্য নিবেদন করার অধিকার নাই—প্রকারান্তরে ভগবানকে তাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহাতে একদিক্ দিয়া ভগবানের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ ও সীমাবদ্ধ করার জন্য অহংকারী মানুষের স্পর্ধাই প্রকট হয়। এই কারণেই ভগবানের ক্রোধ নামে রুদ্রলীলায়! আসল কথা—ভগবানের সৃষ্টি মানুষ, মানুষের সৃষ্টি কৃত্রিম সামাজিক বিধান। ভগবান্ সকলকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকলের মধ্যে আছে তাঁহার আসন পাতা। কাজেই মানুষের মধ্যে ভেদজ্ঞান অস্পৃশ্যতা বর্ণভেদ প্রভৃতি শুধু গর্হিত নয়, মহাপাপ। এই কথাটিই এই অংশের প্রকৃত বক্তব্য।

(৩) ঠাকুর বললেন, "প্রভাত কি……ব্রতপালনে।" (স্তবক ৪)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। ভক্তপ্রবর রামানন্দ-জীর প্রতি ঠাকুরের প্রত্যাদেশই এই অংশের বিবরণের বিষয়।

গুরু রামানন্দ বর্ণাশ্রমধর্মের সংস্কারবশে তথাকথিত অন্ত্যজ ব্যক্তিদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার স্বীকার করিতেন না। এই পাপসংস্কার অবশেষে তাঁহার দূর হইল, ঠাকুরের কৃপায়। উচ্চজাতির অহংকার আর ভেদজ্ঞানের পাপ—এই দুইয়ের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য রামানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন। ঠাকুর তাঁহার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। পরদিন প্রভাতেই, তিনি বাহির হইলেন চিত্তশুদ্ধির অভিযানে। সেদিন, গভীর তৃতীয়প্রহর রাত্রিতে সহসা রামানন্দ শুনিলেন বাহির হইয়া পড়ার জন্য ঠাকুরের নির্দেশ। রামানন্দ বলিলেন খানিক পরে রাত পোহাইলেই তিনি যাত্রা করিবেন। তখন ঠাকুর আবার বলিলেন, রাত্রি-শেষে সূর্যের প্রকাশই সত্যকার প্রভাত সূচনা করে না। সত্যকার প্রভাত হয় তখন যখন হৃদয়ের পাপের ঘোর কাটিয়া সত্যের পুণ্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠে। আত্মিক সাধনায় সেটাই প্রকৃত প্রভাত। রামানন্দ ইতিমধ্যে নূতন উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন জাতিবর্ণের ভেদজ্ঞান কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা-প্রথা মহাপাপ, উচ্চজাতির অহংকার মিথ্যা ও অপবিত্র। আজ তাই তিনি হৃদয় হইতে এইসব পুঞ্জীভূত পাপ ক্ষালন করিবার জন্য একটি ব্রতের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে উপলব্ধি, শুদ্ধির জন্য এই যে হৃদয়ের জাগরণ, ইহাই

সত্যকার আত্মিক প্রভাত। কাজেই কখন সূর্যোদয় হইয়া প্রাকৃতিক প্রভাত হইবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। হৃদয় যখন জাগিয়া উঠিয়াছে তখন আর বিলম্ব নয়। ব্রত-উদ্‌যাপনে বাহির হইয়া পড়ার জন্য তাই আসিল ডাক। রামানন্দজী তাহাতে সাড়া দিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকারে।

(৪) গুরু বলিলেন, "অন্তরে আমি···মৃতের সৎকার।" (স্তবক ৫)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতার অন্তর্গত। রামানন্দজীর শ্মশানচারী চণ্ডালকে বক্ষে ধারণবৃত্তান্ত-বর্ণনাই এই অংশটির প্রসঙ্গ।

'রামাইত'-সম্প্রদায়ের গুরু সাধকপ্রবর রামানন্দ। তিনি একদিন হৃদয়ের সকল অহংকার ও পাপসংস্কার ক্ষালনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে নদীতীরে এক শ্মশানে তিনি শবদাহরত এক চণ্ডালকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। নাভা তার-নাম। নাভা অস্পৃশ্য। রামানন্দের এই আচরণে সে অত্যন্ত ভীত ও সংকুচিত বোধ করিল। তাহার স্পর্শে রামানন্দজীর দেহ অশুচি হইল—এই ভয়ে সে আপনাকে অপরাধী বোধ করিল। রামানন্দ তাহাকে অভয় দিলেন। বলিলেন, মিথ্যা সংস্কারে এতদিন তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন। তাই তিনি এতদিন প্রতি মানুষের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে পান নাই, অস্পৃশ্য-জ্ঞানে অন্ত্যজকে তিনি কোল দিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার সে ভুল ভাঙিয়াছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিক্ দিয়া যেন তাঁহার নবজন্ম হইয়াছে। পূর্বের মোহগ্রস্ত হৃদয়টিকে তিনি তাই মৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৃতের সৎকার প্রয়োজন। চণ্ডালই সে কার্যে যোগ্যতম। রামানন্দজীর এই কথার অর্থ এই যে, সমাজের সর্বাপেক্ষা হেয় যে চণ্ডাল তাহাকে বুকে ধরিতে পারিলেই তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইবে। বর্ণাশ্রমধর্মের মিথ্যা সংস্কার আর উচ্চজাতির অহংকার বোধ তখনই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে তাঁহার হৃদয় হইতে। ইহাই চিত্তের সংস্কার, মৃতের তুল্য হৃদয়ের যেন তাহাই অগ্নিসংস্কার। সেইজন্যই রামানন্দজী আজ বাছিয়া বাছিয়া চণ্ডাল নাভাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ইহার মধ্য দিয়া তিনি হৃদয়কে পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন।

(৫) রামানন্দ বললেন, "এতদিন······দূর হয়ে।" (স্তবক ৬)

এই অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শুচি'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

গুরু রামানন্দ কর্তৃক মুসলমান জোলা কবীরের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরার কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই অংশটি বিবৃত করিয়াছেন।

কবীর আপন মনে তাঁত বোনেন আর গান গান, এমন সময় রামানন্দজী আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। মুসলমান জোলা ভয়ে সংকোচে বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু রামানন্দজী বলেন, কবীরকে এই যে জড়াইয়া ধরা, ইহার দ্বারা আজ তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইল। অতকাল অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া তিনি কবীরের মতো ধার্মিককে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন দিতে পারেন নাই। তাঁহার বোনা কাপড় পরিয়া দেহের লজ্জানিবারণ হয়। তাঁহার প্রেমের আলিঙ্গন যেন তেমনি রামানন্দের হৃদয়ের নগ্নতা দূর করিল। যতদিন তিনি এই আলিঙ্গন বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ততদিন হৃদয় ছিল তাঁহার লজ্জাকর মোহ-পাপে পূর্ণ। অনাবৃত বস্তু যেমন ধুলায় মলিন হয়, তেমনি রামানন্দের নগ্নহৃদয়ে প্রচুর পাপের মলিনতা আসিয়া জমিয়াছিল। সে হৃদয় এই অর্থে নগ্ন ছিল যে তাহার চারিদিকে প্রেমের শুচি আবরণ ছিল না। প্রতি মানুষের মধ্যেই ভগবানের আসন পাতা—এই সত্যজ্ঞান হইতে যে সর্বলোকে প্রেমের উৎসার হয় তাহাই যেন হৃদয়ের শুচিবস্ত্র। আজ বস্ত্রব্যবসায়ী কবীরের সঙ্গ ও আলিঙ্গনে সেই সর্বজীবে প্রেমের অশুচিবাস রচিত হইল: উচ্চজাতির অহংকার আর অস্পৃশ্যতাজ্ঞান দূর হইয়া হৃদয় তাঁহার মুক্ত হইয়াছে। কবীরের প্রেম যেন তাহাতে সকল কলুষ-কলঙ্কের ছোঁয়াচ আগলাইয়া একটি শুচিশুদ্ধ আবরণ সৃষ্টি করিল।

(৬) আমার ঠাকুরকে এতদিন……পেয়েছি খুঁজে। (স্তবক ৭)

রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। গুরু রামানন্দজী অস্পৃশ্য চণ্ডাল আর মুসলমান জোলাকে কোল দিয়াছেন। এই সংবাদে শিষ্যগণ যখন গুরুকে ধিক্কার দিতে লাগিল তখন রামানন্দজী উদ্ধৃত উত্তর দিলেন।

রামানন্দজীর মোহ কাটিয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন ভগবান্ সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। দীন পতিতেরই তিনি পরম বন্ধু। তাহাদের মধ্যেই তিনি দীনতারণ করুণাময় রূপে বর্তমান থাকেন। এই কথা না বুঝিয়া এতদিন রামানন্দজী অস্পৃশ্য অন্ত্যজজ্ঞানে ঐ দীন পতিতকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন। সেইসঙ্গে তিনি তাহাদের মধ্যে নিত্যবর্তমান যে ভগবান্ তাঁহাকেও হারাইয়া বসিয়াছিলেন। আজ সেই ভুল ভাঙিতেই তিনি চিত্তশুদ্ধিব্রতে আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন। চণ্ডাল নাভা আর মুসলমান কবীরকে তিনি বুক দিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যেন ভগবানের প্রসাদ পাইয়াছেন চিত্তে। এই অর্থে তিনি আবার তাঁহার হারানো ঠাকুরকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, খুঁজিয়া পাইয়াছেন তিনি দীনের মধ্যে দীনতারণকে। এই কথাটাই আজ তিনি শিষ্যবর্গকে জানাইলেন এবং মানবপ্রেমের নূতন মন্ত্রে তাহাদের দীক্ষা দিলেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতাটির উৎস ও রচনা-প্রেরণা-সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

উ.। **উৎস-রচনা-প্রেরণা** দেখ।

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতাটির মর্মকথা নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতার মূল সুরটির মধ্যে মানবপ্রেমের মন্ত্রবাণী অনুরণিত। মানুষমাত্রই ভগবানের সৃষ্টি, সকলেরই মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান। তবু নানা কারণে মানুষের মধ্যে মানুষেরই সৃষ্ট কৃত্রিম ভেদাভেদবোধের প্রাদুর্ভাব। এদেশে বর্ণাশ্রমধর্ম সেই ভেদবোধকেই পুষ্ট করিয়াছে। একমাত্র উচ্চবর্ণের মানুষের ছিল একদা মন্দিরে প্রবেশাধিকার, পূজা-অর্চনার যোগ্যতা। নীচবর্ণের মানুষের স্পর্শ পর্যন্ত এককালে অপবিত্র জ্ঞান করা হইত। কিন্তু ভগবান্ যদি সকল জীবের মধ্যেই বিরাজ করেন, তবে কোনো মানুষই তো অস্পৃশ্য হইতে পারে না। এই সহজ সত্যটি যুগসঞ্চিত মিথ্যা সংস্কারে চাপা পড়িয়াছিল। উচ্চজাতি নিজেদের মিথ্যা শ্রেয়োবোধে এতই আচ্ছন্ন ছিল যে মানুষের প্রতি অকারণ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় ছিল তাহারা পরিপূর্ণ। এই অহংকার একপ্রকার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার প্রভাবে বহুযুগ একশ্রেণীর মানুষ অপরশ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া ভগবান্‌কে পরোক্ষে অপমান করিয়াছে। ভগবান্ নাকি পতিতের সহায়, দীনের বন্ধু। যদি তাহাই হয়, তবে দীনের প্রতি ঘৃণা তো দীনবন্ধুর প্রতিও অবজ্ঞা। কিন্তু সংস্কার বড় কঠোর মোহ। ভক্তপ্রবর রামানন্দের মতো সাধকও দেখি ইহা হইতে মুক্ত ছিলেন না। একদা

অবশ্য এ ভুল তাঁহার ভাঙিল। তিনি সেইদিন উপলব্ধি করিলেন আচণ্ডাল মুসলমান সকলেরই মধ্যে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। কাজেই উৎসবে মন্দিরে তাহাদের অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ জ্ঞান করিয়া তিনি নিজে অপরাধী হইয়াছেন। যে সংস্কারের বশে তিনি এই অপরাধ করিয়াছেন তাহাই মহাপাপ। সেই পাপক্ষালনের জন্য রামানন্দজী তাই আরম্ভ করেন নূতন সাধনা। চণ্ডাল নাভা আর মুসলমান কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি হৃদয় হইতে ভিত্তিহীন পাপসংস্কার আর উচ্চজাতির অহংকার দূর করিলেন। শিষ্যবর্গকে বুঝাইলেন যে ভগবান্ আছেন সর্বজীবে। সকল মানুষকে দীনতার ভাব লইয়া ভালোবাসাই হইল সত্যধর্মের পরাকাষ্ঠা। এই মর্মসত্যটিই 'শুচি' কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্র. ৪। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতাটির কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া উহার মূলতত্ত্বটি বিচার কর।

উ.। **সমালোচনা**-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ৫। রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতাটির সম্বন্ধে একটি আলোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ অহংকার = অহম্ + কার। অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা। যখনি = যখন + ই (বাঙলা সন্ধি)।

সমাস ঃ নানাচিহ্নধারী—নানাচিহ্ন (সুপ্ সুপা) ; তাহা ধারণ করিয়াছে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। পাদোদক—পাদস্পৃষ্ট উদক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। প্রাণপ্রবাহিণী—প্রাণরূপ প্রবাহিণী (রূপক-কর্মধারয়)। বিশ্বলোকে —বিশ্বই লোক (কর্মধারয়), তাহাতে। হাতজোড—জোড অর্থাৎ যুক্ত হাত (কর্মধারয়, বিশেষণের পরনিপাত)। শুচিবস্ত্র—শুচি যে বস্ত্র (কর্মধারয়)। তিনপ্রহর—তৃতীয় প্রহর (কর্মধারয়)।

সমস্তপদ-গঠন ঃ গুরুর পদ = গুরুপদ। জপে তপে = জপতপে। মৃতের সংকার = মৃতসংকার। ধুলায় মলিন = ধুলামলিন।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ ভোজ্য—ভুজ্ + ণ্যৎ। ব্যাপৃত—বি + আ + পৃ + ক্ত। হেয়—হা + যৎ। অপরাধী—অপরাধ + ইন্।

সাধু গদ্য-রূপ ঃ ঠেকিয়ে—ঠেকাইয়া। বইছে—বহিতেছে।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে (প্রশ্নবোধক)?—আমার বাস কেবল বৈকুণ্ঠেই নয় (প্রশ্ন পরিহার)।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস—এখানে 'ভাঙা' ক্রিয়াটির অর্থ 'সমাপ্ত হওয়া', কাজেই বিশিষ্টার্থক।

প্রশ্ন : 'ভাঙা' ক্রিয়াটির আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : তাদের বিয়ে ভেঙেছে। তোমার টাকাটা, ভাই, ভেঙেছি—এ মাসে দিতে পারব না। ব্যাপারটা কি দেখতে পাড়া ভেঙে এল। অনেকটা জলকাদা ভেঙে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। বিয়ের পর এক বছর যেতে না যেতেই মেয়েটির কপাল ভাঙল।

কারক ও বিভক্তি ঃ সন্ধ্যাবেলায় 'ঠাকুরকে' ভোজ্য করেন নিবেদন (সম্প্রদানে-কে)। নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের 'পায়ে' (সম্প্রদানে অথবা অধিকরণে-এ)। তাদের অপমান 'আমাকে' বেজেছে (কর্মে কে, বেজেছে= আঘাত করেছে)। যাও তোমার 'ব্রতপালনে' (কারক নাই, নিমিত্তার্থে-এ)। 'জাতিতে' আমি মুসলমান (কারক নাই, প্রকৃতি প্রভৃতি-বাচক শব্দে-তে)।

বাক্য-রচনা ঃ পাদোদক : রুগ্ণ ছেলেটিকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য তাহার মাতা মন্দিরে মন্দিরে দেবতার পাদোদক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

লোকস্থিতি : লোকস্থিতি রক্ষার নামে মানুষের সমাজে অনেক অন্যায় আচরিত হইয়া থাকে।

হাতজোড : হাতজোড় ক'রে বলছি—এই দুর্যোগে বাড়ি থেকে বেরুবেন না।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ এগিয়ে—সংস্কৃত 'অগ্র' হইতে বাঙলা 'আগ'; এই বিশেষ্য 'আগ'ই আ-প্রত্যয়যোগে ধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এটি নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ (আগা+ইয়া= আগাইয়া, চলিত-রূপ 'আগিয়ে', কিন্তু বেশী প্রচলিত 'এগিয়ে')।

উঠল ডেকে (ডেকে উঠল)—একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া মিলিয়া যৌগিক ক্রিয়া।

অর্থগত পার্থক্য ঃ ভোজ্য—আহার্য; ভোগ্য—উপভোগের যোগ্য। জোলা—মুসলমান তাঁতী; জলা—জলময় স্থান। বৃত্তি—উপজীবিকা, পেশা; বৃদ্ধি—বাড়।

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যেরই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। ইহার অন্যতম কারণ এই যে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মসূত্রেই সঙ্গীতানুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সঙ্গীতের একজন একনিষ্ঠ সাধক ও সুগায়ক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার এই সঙ্গীতপ্রিয়তার যোগ্য উত্তরাধিকারী। দেশী গানের সহিত ইংরেজী গানেও ছিল তাঁহার প্রায় সমান অধিকার। দ্বিজেন্দ্রলালের এই গীতিপ্রতিভাই বাঙলাসাহিত্যে তাঁহার স্থায়ী আসন নির্দেশ করে। মধুসূদন বিদেশী সাহিত্য মন্থন করিয়া একটি দেশী-বিদেশী-সমন্বিত কাব্যাদর্শ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও সেইরূপ ইংরেজী ও বাঙলা গানের সমন্বয়ে নূতন সুরে নূতন ভাষায় অজস্র হাসির গান ও স্বদেশী গান রচনা করিয়া যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি বাঙলাসাহিত্যে ন্যায্যভাবে অক্ষয় সম্মানের অধিকারী। তাঁহার হাসির গানগুলির মর্মমূলে আছে একটি সুস্থ ঋজুতা। ভণ্ডামি, ভীরুতা ও কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিরক্তি তাহাতে অভিব্যক্ত। কিন্তু পরাধীন ও অক্ষম জাতির অনিবার্য দুর্ভাগ্য বলিয়া কবি ওগুলির প্রতি আক্রোশ পোষণ করিতেন না। বরং এইসকলের প্রতি একটা "বিচারশীল সহানুভূতি ও মুক্ত মনের রসপ্রবণতা হইতেই এমন নির্মল হাস্যাবেগ উৎসারিত হইয়াছিল।" ইংরেজ জাতির সবল সহজ যে প্রাণশক্তি ও পৌরুষ তাহাদের গানের মধ্যে বিকশিত, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতির পক্ষে তাহাই ছিল বিশেষ অনুকূল এবং সেই শক্তি ও পৌরুষ লইয়াই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে আছে তাই অকপট বলিষ্ঠ দরাজ হাসি। তাঁহার নাটকও বোধ হয় সেই পৌরুষমণ্ডিত বিশিষ্ট সুরেরই বাণীরূপ।

"দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ, সাহিত্যকেও মানব-সাধারণের ভাবভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে। যাহা সর্বজন-হৃদয়বেদ্য, যাহা সবল সুস্থ চিত্তের পথ্য, যাহা মনে মোহ সৃষ্টি না করিয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার

করে, যাহার রস রামায়ণ-মহাভারতের কাব্যরসের মতো লোকায়ত—দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন। এবং নিজের হৃদয়ের সেই দৃঢ় বিশ্বাসবশে তিনি সেকালে যেভাবে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার দুই দিকই তাঁহার পক্ষে অতিশয় যথার্থ হইয়াছিল। এদিকে তিনি সেই অত্যুচ্চ সাহিত্যিক অভিযানের বিরুদ্ধে নিজ মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—তজ্জন্য রবীন্দ্র-শিষ্যগণ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনা করিয়াছিলেন।......অপরদিকে, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোদ্যমমূলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটকরচনায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং তাহার দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাট্যাদর্শ সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যশিল্পের আদর্শ উন্নত ও রুচি মার্জিত করিয়া এবং নাটকরচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিরেককে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বসাধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি।" সেইজন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবেই অধিকতর বিখ্যাত।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' হইতে সংকলিত। 'নন্দলাল', 'হাসির গান'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসির গান।

কবিতাটির মধ্যে অকর্মণ্য, কাপুরুষ ও ভণ্ড দেশপ্রেমিকের একটি হাস্যকর চিত্র আছে। এই চিত্রটিরই নাম নন্দলাল। কবিতার পাত্রটির নাম বলিয়া তো বটেই, তা ছাড়া অন্য কারণেও কবিতাটির 'নন্দলাল' নাম। বাঙলায় অনেক সময় 'আলালের ঘরের দুলাল', 'গোবরগণেশ'-এর মতো 'অপদার্থ' অর্থে নন্দলাল কথাটি ব্যবহার করা হয়, যদিও কথাটির মূল অর্থ নন্দরাজার আদরের ধন শ্রীকৃষ্ণ। 'নন্দ' কথাটির আর একটি অর্থ 'আনন্দ'। কবিতার নন্দলাল অপদার্থ, তবু পাঠকের পক্ষে আনন্দদায়ক। তাই নামকরণটি সার্থক।

সমালোচনা—'নন্দলাল' দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উৎকৃষ্ট দান। ইহার মধ্যে তাঁহার রচনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি। অতিরিক্ত নমনীয়তা বা ন্যাকামি তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। কাপুরুষতার প্রতি ছিল তাঁহার প্রচণ্ড ঘৃণা।

'নন্দলাল' কবিতায় এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বাঙালী-চরিত্রের দুর্বলতা ও দোষকে কিন্তু তিনি শুধু ঘৃণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের উপর কঠোর কশাঘাত করিয়া মার্জিত করিবারও প্রয়াস করিতেন। সেইজন্য তাঁহার 'হাসির গান'-এর কবিতাগুলি শুধু হাসির খোরাকই জুটায় নাই, উহারা স্বচ্ছ দর্পণের মতো বাঙালীর বিকারকে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখাইত। নিজের চেহারাটার বিকৃতি যদি মুকুরেও দেখা যায়, তবে সেই বিকার সংশোধনের একটা প্রয়াস হইতে পারে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতার উপযোগিতা।

'নন্দলাল'-এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তথাকথিত এক স্বদেশসেবকের চিত্র আঁকিয়াছেন। ব্যক্তিটি অস্থিমজ্জায় কাপুরুষ, অলস, নির্লজ্জ ও স্বার্থপর। কিন্তু বাক্যে ও আত্মপ্রচারে সে বিশেষ পটু। দেশের জন্য জীবনটি তাহার উৎসর্গীকৃত; কিন্তু তাহা অপচয়ের জন্য নহে, দেশের অমূল্য সম্পদ্-হিসাবে সযত্নে তুলিয়া রাখিবার জন্য। শখের স্বদেশীওয়ালা অনেক বাবু মুখে মুখে দেশের জন্য প্রাণ বিলাইয়া দেন; নন্দলাল একান্ত দেশের কল্যাণার্থেই প্রাণটি যেন নিরাপদে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দেয়। উভয়ক্ষেত্রেই আদর্শ যেমন মহৎ, ভণ্ডামিটাও তেমনি স্পষ্ট। দেশের জন্য এইরূপ আত্মোৎসর্গের অনেক সুবিধা আছে। সমাজ ও পরিবারের অনেক দায়িত্ব এড়াইবার পক্ষে ইহা মোক্ষম অজুহাত। ওলাওঠাগ্রস্ত ভাইয়ের সেবার জন্য নন্দলালের যেন একান্ত ইচ্ছা, কেবল ব্যক্তিগত স্নেহমমতার চেয়ে দেশের দাবিকে বড় জ্ঞান করে বলিয়াই স্বদেশের জন্য গচ্ছিত প্রাণটি সে বিপন্ন করিতে পারে না। খলের যে ছলের অভাব হয় না ইহা তাহারই হাস্যকর উদাহরণ। নন্দলাল আসলে ভীরু। বোধ হয় সেকালে তথাকথিত স্বদেশসেবক সকল নন্দলালই এইরূপ কাপুরুষ ছিল। তাহারা খবরের কাগজে লম্বাচওড়া বুলি ঝাড়িয়া দেশের প্রতি কর্তব্য সমাধা করিত। তাহারা সমাজের অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্ শ্রেণী। তাহাদের আসল জীবনের ভোজন ও নিদ্রার বিলাসটা বাদ দিলে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকুকেও প্যাডিতে ভরিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষাতেই তাহারা 'কাগজী' দেশসেবা করিত। কিন্তু কঠোর পরীক্ষার সম্মুখে মুহূর্তে তাহাদের যারপরনাই নির্লজ্জ স্বরূপ ধরা পড়িয়া যাইত। বিপদ্ এড়াইবার জন্য গলাটেপা বা কানমলা খাওয়া আর নাকে খত দেওয়া—কোনটাই অম্লানবদনে স্বীকার করিতে তাহাদের বাধিত না। নন্দলাল এই ধরনের কেদারাশায়ী দেশসেবক বা রাজনীতি ব্যবসায়ীরই প্রতিনিধি। ঘরে লেজনাড়া তাহার অভ্যাস। প্রাণ রাখিবার

জন্য তাহার প্রাণান্ত অবস্থা। বাড়ীর বাহিরে গেলেই নানান দুর্ঘটনার ভয়; সুতরাং শয্যা আশ্রয় করিয়াই এই বীরপুঙ্গবকে বহু কষ্টে দেশের গচ্ছিত সম্পদ্ অর্থাৎ তাহার অমূল্য জীবনটি বাঁচাইয়া রাখিতে হইত। দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা নয় কি? এককালে এইরূপ নিন্দিত চরিত্রের লোকগুলি নিজেদিগকে দেশ-সেবক বলিয়া জাহির করিত। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের ঘৃণ্য স্বরূপকেই এখানে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

কবিতাটি সমসাময়িক ইতিহাসের সহিত জড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার স্থায়ী মূল্য আছে। কারণ, নন্দলালের মতো কাঠের সিংঘি প্রতিযুগেই থাকে। চূড়ান্ত কাপুরুষতার উদাহরণ-হিসাবে প্রতিযুগেই সে মানুষকে হাসাইবে। তাহা ছাড়া বর্ণনা-ভঙ্গীর স্বচ্ছন্দ বিস্তার আর ছন্দের সাবলীল নৃত্যপর প্রবাহ কবিতাটির বস্তুর সহিত ভাবের আশ্চর্য মিল ঘটাইয়াছে। এইসব কারণে কবিতাটি যে বহুকাল অন্ততঃ হাসির গান হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংক্ষিপ্তসার—একদিন নন্দলাল ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, যেমন করিয়াই হউক সে দেশের জন্য জীবন রক্ষা করিয়া চলিবে। সকলে এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিলে সে বলিল, আর নিষ্কর্মা হইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার নাই। তাহা ছাড়া সে না থাকিলে দেশোদ্ধারই বা করিবে কে? শুনিয়া সকলে বাহবা দিল। নন্দের ভাই একবার কলেরায় মরিতে বসিয়াছে, সেবাশুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। নন্দকে বলা হইল ভাইয়ের সেবা করিতে। কিন্তু তাহার অবর্তমানে দেশের দুর্গতির কথা চিন্তা করিয়া সে ভাইয়ের জন্য জীবনটা না দিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই সঙ্গত মনে করিল। সকলে তাহার কথায় সায় দিল। একবার নন্দ একটা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধে ও কবিতায় সকলকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। দেশের লোকে তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিল যে নন্দ দেশের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। তখন নন্দের কাজ হইল প্রচুর খাওয়া আর ঘুমানো। লোকে ব্যঙ্গভরে তাহাকে বাহবা দিল। একবার নন্দ তাহার পত্রিকায় এক ইংরেজকে গালি দিল। সাহেব আসিয়া সরাসরি তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। দেশের জীবনরক্ষার অজুহাতে নন্দ সকল অপমান ও শাস্তি সহ্য করিতে সম্মত হইয়া সাহেবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিল। শুনিয়া দেশের লোকে তাহাকে বিদ্রূপ করিল। ভীরু নন্দলাল বাড়ীর বাহির হইত না। দুর্ঘটনার ভয়ে সে

গাড়ী ঘোড়া বা নৌকায় চড়া ছাড়িয়া দিল, এমনকি পথে হাটাও বন্ধ করিল। বাড়ীতে শুইয়া শুইয়া সে কোনোরকমে প্রাণটিকে বাঁচাইয়া রাখিল। সকলে বিদ্রূপভরে তাহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করিল।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

নন্দলাল—কোনো কল্পিত ভণ্ড স্বদেশসেবক। সাধারণতঃ, অত্যন্ত আদরে মানুষ হইয়াছে বলিয়া কঠিন শ্রমে অসমর্থ ব্যক্তিকে উপহাস করিয়া 'নন্দলাল' বা 'নন্দদুলাল' বলা হইয়া থাকে। তাই এই ব্যক্তিটির নামের মধ্যেই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যে স্বদেশসেবার মতো কঠিন কাজ ইহার জন্য নয়। **করিল ভীষণ পণ**—এমন একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যাহা শুনিলে লোকের মনে ভয় জন্মে। আসলে প্রতিজ্ঞাটি শুনতেই 'ভীষণ'—প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্যটি কিন্তু এই ভীষণতার সমর্থন করে না। **স্বদেশের তরে**—স্বদেশের উপকারের জন্য; দেশ-সেবার জন্য। স্বদেশের একনিষ্ঠ সেবক বলিয়া নিজেকে জাহির করিয়া নন্দলাল চাহিয়াছিল শস্তায় বাজিমাত করিতে—কেবল অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলির দ্বারা লোকের বাহবা পাইতে। তাই জীবনধারণের এই 'মহৎ' উদ্দেশ্য তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। যা' ক'রেই হোক—যে-কোনো উপায়ে, 'যেন তেন প্রকারেণ'। **রাখিবেই সে জীবন**—সে নিজের জীবন বাঁচাইয়া চলিবে। **লক্ষণীয়ঃ** এইখানেই নন্দলালের ভীষণ প্রতিজ্ঞার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নিজের জীবন বাঁচাইতে সকলেই চায়। প্রকৃত দেশপ্রেমিক যিনি, তিনি বরং প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন যে দেশের জন্য প্রাণ দিবেন, কিন্তু নন্দলাল করিতেছে ইহার বিপরীত। সাধারণ স্বার্থপর মানুষের মতো সে-ও মৃত্যুকে এড়াইয়া চলিতে চায়। তবে আর তাহার বাহাদুরিটা কোথায়? **আ-হা-হা-কর কী** ইত্যাদি—আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তির মধ্যে নন্দলালের প্রতি লোকের একটা সপ্রশংস শঙ্কা ও বিস্ময়ের ভাব দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যঙ্গ। তাহারা স্পষ্টই বুঝিয়াছে যে নন্দলাল স্বার্থত্যাগের মিথ্যা আস্ফালন করিয়া স্বার্থসিদ্ধিই খুঁজিতেছে। বসিয়া বসিয়া—নিষ্কর্মা হইয়া; কোনোরকম কাজ না করিয়া। **আমি না করিলে** ইত্যাদি—ভণ্ড দেশসেবকগণেরও এমনই একটা মিথ্যা অহমিকা থাকে যে তাহারা না করিলে অন্য কাহারও দ্বারা দেশোদ্ধার সম্ভব

নয়। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক নিজেকে স্বদেশের দীন সেবক মনে করিয়া নীরবে যথাসাধ্য করিয়া যান। নন্দলালের প্রতিজ্ঞা যে অন্তঃসারশূন্য, তাহা এই দম্ভ হইতেই প্রমাণিত হয়। **বাহবা বাহবা** ইত্যাদি—এই সমর্থনসূচক প্রশংসার মধ্যেও বিদ্রূপের সুর আছে।

দ্বিতীয় স্তবক

দেখিবে তাহারে কেবা?—নন্দ ছাড়া তাহার দেখাশুনা সেবাশুশ্রূষা করিবার কে ই বা আছে? অর্থাৎ কেহই নাই। ভা'য়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—কলেরায় আক্রান্ত ভাইয়ের সেবাশুশ্রূষা করিতে গেলে নন্দেরও কলেরা হইয়া জীবননাশের ভয় আছে। না-হয় দিলাম—অর্থাৎ নিজের জীবন দেওয়া যেন তাহার পক্ষে এমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। **কিন্তু অভাগা…হইবে কী**—রোগে ভুগিয়া অকালে তাহার মৃত্যু হইলে যে দেশের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে; যে প্রাণ দেশসেবার মহৎ উদ্দেশ্যে সে বাঁচাইয়া রাখিতে চায় তাহা এমন তুচ্ছ ব্যাপারে বিসর্জন দিলে দেশোদ্ধার করিবে কে? আসলে নন্দের মৃত্যুভয় ষোলো আনার উপর আঠারো আনা; তাই যে-কোনো অছিলায় কলেরার ন্যায় মারাত্মক সংক্রামক রোগের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলাই তাহার উদ্দেশ্য। **বাঁচাটা আমার অতি দরকার**—নন্দ নিজের জীবনটাকে অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে। অতএব তুচ্ছ ব্যাপারে এমন অমূল্য জীবন নষ্ট করা তাহার বিবেচনায় মূর্খতা মাত্র। ভেবে দেখি চারিদিক—নানা দিক্ ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করার সিদ্ধান্তই তাহার কাছে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। **হাঁ হাঁ হাঁ** ইত্যাদি—সকলে একবাক্যে নন্দলালের কথা মানিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে। মুমূর্ষু ভাইকে যে দেখে না তাহার দ্বারা দেশোদ্ধার কতটুকু হইতে পারে তাহা সকলেই বোঝে।

তৃতীয় স্তবক

কাগজ—সাময়িক পত্র। **নন্দ একদা……বাহির**—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এমন তথাকথিত দেশসেবকের অভাব ছিল না যাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে প্রকাশ্য আন্দোলনে না নামিয়া খবরের কাগজে লিখিয়া দেশসেবা করিত। নন্দ বিপদ্ এড়াইয়া চলিবার জন্য এই সহজ পথ ধরিল—একটা সাময়িক পত্র বাহির করিল। সবে—সকলকে অর্থাৎ সরকার এবং দেশের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়

দেশবাসীকে। **গদ্যে পদ্যে**—প্রবন্ধ এবং কবিতা লিখিয়া। **বিদ্যা করিল জাহির**—রচনার ভাষা ও ভাবকে জোরালো করিবার জন্য যতটুকু বিদ্যা ছিল তাহা প্রকাশ করিল। বস্তুতঃ, দেশসেবার নামে এইভাবে বিদ্যা জাহির করিয়া দেশের লোককে তাক লাগাইয়া দেওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। **গালি দিয়া· ·জাহির**—এমন একদিন ছিল যখন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে, বিশেষতঃ ইংরেজকে যে যত জোরালো ভাষায় গালি দিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পারিত, তাহাকে তত বড় দেশপ্রেমিক মনে করা হইত। কিন্তু সত্যকারের কাজ কিছু না করিয়া কেবল গালাগালি করা, আর যাহাই হউক, দেশসেবা নয়। নন্দলালের দেশ-সেবা এইজাতীয়—শস্তায় নাম কিনিবার কৌশল মাত্র। **পড়িল ধন্য**—সকলে প্রভূত প্রশংসা করিল। **দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন**—দেশের জন্য নন্দ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। **লেখে যত তার দ্বিগুণ** ইত্যাদি—অর্থাৎ লেখার চেয়ে তাহার জীবনের বড় কাজ হইল খাওয়া ও ঘুমানো; লিখিতে তাহার যতটা সময় যাইত তাহার চেয়ে বেশী যাইত আত্মসুখ-সাধনায়। **ছোকা**—ছক্কা; সুস্বাদু ব্যঞ্জনবিশেষ। **থাল থাল**—থালা থালা অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে। **বাহবা, বাহবা নন্দলাল**—এখানে নন্দলালের প্রতি ব্যঙ্গ অত্যন্ত স্পষ্ট।

চতুর্থ স্তবক

সাহেবকে দেয় গালি—দেশবাসীকে গালি দিয়া নন্দ বিপন্ন হয় নাই, তাই তাহার সাহস বাড়িয়া গেল—সে আক্রমণ করিল একজন ইংরেজকে। ইংরেজের বিরুদ্ধে কথা বলা তখন বিপজ্জনক ছিল; তাই ইংরেজকে গালি দিতে পারিলে নির্ভীক দেশপ্রেমিক বলিয়া প্রশংসাও পাওয়া যাইত। **গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি**—গালাগালির প্রতিশোধ দিবার জন্য আইন-আদালতের আশ্রয় না লইয়া স্বয়ং আসিয়া নন্দলালের শুধু গলাটা টিপিয়া ধরিল। ইংরেজ ভারতবাসী নয়; নীরবে গালাগালি সহিয়া যাওয়া তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। **কী হবে দেশের** ইত্যাদি—সাহেবের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কাপুরুষ নন্দ এখানেও তাহার দেশসেবার অজুহাত দেখাইয়াছে। **বিঘৎ**—দৈর্ঘ্যের মাপ-বিশেষ। আধ হাতে এক বিঘৎ। **নাকে দিব খত**—নাক দিয়া মাটিতে লেখা অর্থাৎ দাগ কাটাকে 'নাকে খত দেওয়া' বলা হয়। ইহা অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি। খত=লেখা। নন্দলাল এরূপ চূড়ান্ত অপমান স্বীকার করিয়াও নিজের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল। আত্মসম্মানবোধের বালাই তাহার নাই। **যা বল**

করিব তাহা—নাকে খত দিলে যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তবে তোমার পছন্দ-মতো অন্য কোন শাস্তি লইতেও আমি প্রস্তুত। এই কথায় নন্দলালের চরম ভীরুতা ও হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে।

পঞ্চম স্তবক

কোথা কী ঘটে কী জানি—কোথায় কোন্ বিপদ্ ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে। চড়িত না গাড়ি ইত্যাদি—গাড়ী উল্টাইয়া গেলে গুরুতর আঘাতের ফলে প্রাণনাশের ভয়; তাই সে ঘোড়ার গাড়ীতে আর চড়িত না। **ফি-সন**—প্রতি বৎসর। রেলে কলিশন হয়—রেলগাড়ীতে চড়িলেও অন্য রেলগাড়ীর সহিত ধাক্কা (collision) লাগিয়া প্রাণ যাইতে পারে। অতএব নন্দের রেলগাড়ীতে চড়া বন্ধ। 'ফি-সন', 'ভীষণ', '(ক)লিশন' কথাগুলির ধ্বনি-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গাড়িচাপা-পড়া ভয়—ঘোড়ার গাড়ীর তলায় চাপা পড়িবার আশঙ্কা। কষ্টে—অনেক চেষ্টায়। **ভ্যালারে**—'ভালো রে' কথাটির বিকৃত রূপ। নন্দকে বিদ্রূপ করাই এই বিকৃতির উদ্দেশ্য। **বেঁচে থাক্ চিরকাল**—দেশসেবার ফাঁকা বুলি আওড়াইয়া কোনোরকমে বাঁচিয়া থাকাটাই যখন নন্দলালের একমাত্র ইচ্ছা, তখন সে বাঁচিয়াই থাকুক। দীর্ঘজীবী হওয়ার এই আশীর্বাদ আন্তরিক তো নয়ই, বরং তীব্র শ্লেষ ও ধিক্কারে পূর্ণ। নন্দলালের জীবন যে সর্বতোভাবে নিষ্ফল, এইটুকুই বক্তারা বুঝাইতে চায়।

ব্যাখ্যা

(১) **"নন্দর ভাই…………তা বটে, ঠিক!"** (স্তবক ২)

এই অংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান 'নন্দলাল' হইতে উদ্ধৃত। কবি এখানে ভণ্ড দেশসেবকের ঘৃণ্য আত্মপরতাই খুলিয়া ধরিয়াছেন।

নন্দলাল একজন ভণ্ড দেশপ্রেমিক। জীবনটা সে নাকি দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। কাজেই সে জীবন নষ্ট করিবার বস্তু নহে, দেশের কল্যাণের জন্য উহা সযত্নে রক্ষা করিবার বস্তু। নন্দলাল নিজের জীবন-সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা জাহির করিয়া সকল বিপদের ছোঁয়াচ হইতে নিজেকে দূরে রাখিত। এই জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয়তাটিকে সে সহজ অজুহাত-হিসাবে সর্বত্র ব্যবহার করিত এবং সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ করিয়া লইত।

একবার নন্দলালের ভাইয়ের কলেরা হইল। তাহার সেবা করিবার কেহ নাই। বন্ধুরা নন্দকে ভাইয়ের সেবা করিতে বলিল। নন্দ তখন এমন ভাব দেখাইল যেন ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র চিন্তার কথা নহে। কিন্তু চিন্তার কথাটা হইল এই যে, দশের জন্য যাহা নিবেদিত তাহা তো একের জন্য নষ্ট করা সঙ্গত নয়। নন্দ তো নিজের জীবনের উপর কোনো অধিকার রাখে নাই, উহা সে দেশকে দিয়া দিয়াছে এবং দেশের হিতেই সে উহাকে সযত্নে রক্ষা করা পবিত্র কর্তব্য জ্ঞান করে। এখন মায়ের পেটের ভাইয়ের জন্য সে-জীবন বিপন্ন করা তো ক্ষুদ্র স্বার্থের লক্ষণ। নন্দলাল মহৎ আদর্শের খাতিরে তাই বন্ধুদের কথায় সহসা সায় দিতে পারে না। বিষয়টা আরও তলাইয়া দেখিয়া তবে সে এ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইবে—এইরূপ বলে। আমরা নিশ্চিত জানি ভাইয়ের মৃত্যুর পূর্বে নন্দ সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় নাই। আসলে কলেরার মতো সংক্রামক রোগের ভয়ে ভাইয়ের কাছে ঘেঁষিতেও তাহার সাহস হয় নাই। ভাইয়ের সেবাতেই যাহার এত কুণ্ঠা, তাহার দ্বারা দেশের দশের সেবা যে একেবারেই অসম্ভব—তাহা বলাই বাহুল্য। খলের ছলের অভাব হয় না। স্বার্থপর নন্দেরও তাই গালভরা মহৎ অজুহাতের অভাব হইল না। অজুহাতটা এতই হাস্যকর যে তাহার বন্ধুরা শুধু তাহাকে বাহবা দিয়াই ক্ষান্ত হইল। নন্দ কাপুরুষ ও স্বার্থপর। মিথ্যা বড়াই আর বড় বড় আদর্শের কথা জাহির করিয়া নিজেকে সে স্বদেশভক্ত বলিয়া প্রচার করে। সেকালের অনেক শখের স্বদেশী বাবুর ইহাই ছিল স্বরূপ।

(২) নন্দ একদা কাগজেতে এক……বাহবা, বাহা!" (স্তবক ৪)

এই অংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল' কবিতার অন্তর্গত। দ্বিজেন্দ্রলাল ভণ্ড দেশপ্রেমিকের কাপুরুষতা ও লজ্জাহীনতা যে কত ঘৃণ্য, এখানে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

নন্দলাল ভণ্ড দেশপ্রেমিকের একটি আদর্শ। সংবাদপত্রের স্তম্ভে গরম গরম বিবৃতি ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াই ইহারা দেশসেবার কর্তব্য সমাধা করে। কলমের মুখে আগুনের ফুলকি উড়াইতে, বিশেষতঃ গালিসাহিত্যে, তাহারা খুবই পারদর্শী। কিন্তু এইসব ব্যাপারে সত্য ও মাত্রা সবসময় ঠিক থাকে না। তখন বিপদের শঙ্কা। নন্দ সত্যই একবার ঠিক এইরূপ এক ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিল। খবরের কাগজে সে একবার এক সাহেবকে গালি দেয়। সাহেব

রাগিয়া সরাসরি তাহার গলা টিপিয়া ধরে। তখন নন্দের বিড়ম্বনার একশেষ হয়। মুখে তবু তাহার তড়পানি যায় না। সাহেবকে তুষ্ট করিবার জন্য কয়েক বিঘত নাকে খত দিতেও তাহার আটকায় না। আত্মসম্মানের বালাই তো আর তাহার নাই। দেশের জন্য জীবনটা তাহার রাখিতেই হইবে—এইরকম একটা মহান্ ভাবে যেন সে তুচ্ছ মানমর্যাদার সংস্কার ত্যাগ করে। উপস্থিত গলা হইতে টিপুনির সাঁড়াশিটা মুক্ত করিয়া তো হাঁপ ছাড়া গেল। তারপর নাকে খত দেওয়া বা আরও কিছু করা—সেও তো দেশেরই হিতে জীবনরক্ষার জন্য। তাহাতে আর ব্যক্তিগত মানসম্মানের প্রশ্ন তুলিলে চলিবে কেন? নন্দ বোধ হয় বন্ধুদের কাছে এইরূপ দেশার্থে নিবেদিত-প্রাণ এক মহামহিম পুরুষের ভাব জাহির করে। করিয়া নিজের নির্লজ্জ কাপুরুষতা আর সেই চূড়ান্ত অপমান ঢাকা দেয়। বন্ধুরা যেন বুঝিয়াই তাহার এই দুই-কান-কাটা বেহায়াপনার বলিহারি না দিয়া পারে না। এইরূপ জঘন্য নন্দলাল সেকালে স্বদেশীয়ানা দেখাইত, একালেও তাহার উদাহরণ একেবারে লোপ পায় নাই।

(৩) নন্দ বাড়ির······বেঁচে থাক্ চিরকাল।" (স্তবক ৫)

এই অংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল' হইতে উদ্ধৃত। একশ্রেণীর ভণ্ড ও কাপুরুষ তথাকথিত দেশপ্রেমিকের ব্যাঙাচি-প্রাণই এই অংশে বর্ণনীয়।

নন্দলাল এই শ্রেণীর দেশপ্রেমিক। মুখে মুখে সে আগুন উদ্‌গিরণ করে, কাগজে লেখে গরম বক্তৃতা, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাহার ব্যাঙাচি-প্রাণ ভয়ডরে ধুকধুক করে। ধনীর দুলাল এইপ্রকার স্বদেশী নন্দলাল সবচেয়ে বেশী ব্যগ্র নিজের ক্ষীণ প্রাণটি বাঁচাইয়া রাখিতে। বাহিরে পা বাড়াইতে তাহার সর্বদা ভয়, কি জানি কি বিপদ্ ঘটে! গাড়ীতে চড়ে না, পাছে গাড়ী উল্টাইয়া দুর্ঘটনা ঘটে! নৌকায় চড়ে না, যদি নৌকা ডুবিয়া যায়। রেলে উঠে না, পাছে রেলসংঘর্ষ ঘটে! এমনকি রাস্তায় হাঁটিয়াও বাহির হয় না নন্দ, কেননা, রাস্তায় সাপ কুকুর গাড়ীচাপা—কখন কোন্‌টায় প্রাণ যায় কে বলিতে পারে? সুতরাং ঘরের ভিতর খাটে শুইয়া শুইয়াই সে দেশসেবা করে আর আত্মপ্রচার করিয়া নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। চারিদিকের বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করা কম কষ্টের কথা নয়। নন্দলাল তাই বহুকষ্টে তাহার অমূল্য জীবন রক্ষা করে। লোকে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলে, নন্দলাল এমনভাবে বাঁচিয়া থাকে তো থাকুক।

নন্দলাল ভণ্ড দেশপ্রেমিকের একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। ইহার মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সস্তায় নাম কেনার জন্য যে অলস স্বদেশীয়ানা, তাহাকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, দেশসেবা অত আরামের ব্যাপার নহে। ধনীর নন্দদুলালদের পক্ষে প্রকৃত দেশসেবায় প্রহসনমাত্র সম্ভব। অনলস পরিশ্রম আর সহস্র সংগ্রামে উন্নতশিরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি থাকিলেই মাত্র দেশের কাজ করা যায়। নন্দলালের ব্যঙ্গচিত্রে পরোক্ষভাবে এই সত্যটাই ফুটিয়া উঠে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। (ক) 'নন্দলাল' কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে মেকি দেশ-প্রেমিকের চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলি আলোচনা কর। (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল পরোক্ষভাবে দেশপ্রেমিকের মধ্যে কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন ?

উ.। (ক) 'নন্দলাল' চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ধনীর দুলাল আত্মসুখলিপ্সু একশ্রেণীর মেকি দেশপ্রেমিকের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা স্বার্থপরতা। কোনোপ্রকার ত্যাগস্বীকার তাহাদের সাধ্য নয়। তাহাদের বাহ্য দেশপ্রেমের প্রেরণা সস্তায় সম্মানলাভেরই কামনা। ইহাও একপ্রকার স্বার্থপরতা। একজন যথার্থ দেশপ্রেমিকের নিকট সাধারণতঃ আশা করা যায় যে দেশের জন্য সে সর্বস্ব, এমনকি প্রাণপর্যন্ত বিলাইয়া দিবে। কিন্তু এখানে দেখি নন্দলাল সর্বাগ্রে সেই প্রাণটা রক্ষার জন্যই বিশেষভাবে ব্যগ্র। ইহাই শুধু নয়, এই প্রাকৃত প্রচেষ্টার জন্য একটা মেকি ন্যায়প্রচারেও তাহার লজ্জাবোধ হয় না। নন্দলাল বলে, দেশহিতে যে জীবন উৎসর্গীকৃত তাহাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা যায় না। উহা যে দেশেরই সম্পদ; নন্দলালের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। উহা নন্দলালের নিকট গচ্ছিত জাতীয় সম্পদ্। সুতরাং যেভাবেই হউক তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্যই ভাইয়ের কলেরার সময় সেবা করার কথায় তাহার কুণ্ঠা। যে-জীবন দেশের জন্য শিকায় তোলা রহিয়াছে, তাহা তো আর ব্যক্তিবিশেষের সেবায় বিপন্ন করা যায় না! এই অজুহাতে নন্দলাল পারিবারিক তথা নৈতিক দায়িত্ব এড়াইয়া যায়। আত্মপরতার চমৎকার ন্যায়শাস্ত্র এই নন্দলালের।

দ্বিতীয়তঃ, নন্দলালের মতো দেশপ্রেমিক আসলে কেদারাশায়ী রাজনীতি-

ব্যবসায়ী। ঘরে বসিয়া তাহারা লেজ নাড়ে, কাগজে লিখিয়া দেশসেবার কাজ সারে। কাগজের মারফত লম্বাচওড়া বক্তৃতা আর গালিগালাজ ঘরে বসিয়াই চলে। তাহাতে খ্যাতিও ছড়ায় সহজে। নন্দলালগণ এইটুকুই চায়। আসল দেশসেবার কল্পনাও করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, এই ধরনের চরিত্রের আত্মসম্মানের বালাই নাই। ইহারা মজ্জায় মজ্জায় কাপুরুষ ও নির্লজ্জ। খবরের কাগজে লেখালেখির মধ্যে তাই তাহাদের মাত্রাতিরিক্ত বীরত্ব। নন্দলাল একবার জনৈক সাহেবকে খবরের কাগজের মাধ্যমে খুব গালি দেয়। ইহাতে লোকের কাছে নিশ্চয় বাহবা পাওয়া গেল, কিন্তু সাহেব আসিয়া নন্দের গলা টিপিয়া ধরিল। নন্দ ত্রাহি ত্রাহি রবে নাকে খত আর সর্বপ্রকারে ক্ষমা চাহিবার অপমান স্বীকার করিয়া পার পাইল। কিন্তু তখনও তাহার আস্ফালন যায় নাই। যাত্রার দলের এই ভীম এই ভাবে যে প্রাণ বাঁচায়, তাহা নাকি দেশেরই জন্য। তাহার প্রাণটা তো তাহার নাই, উহা যে দেশসেবায় নিবেদিত। সুতরাং নন্দ নিজে অপমান স্বীকার করিয়াও সেই প্রাণরক্ষার মহৎ কর্তব্য পালন করিয়াছে। এই ধরনের নির্লজ্জ ব্যাখ্যা দিয়া সে নিজের গ্লানিকর বিড়ম্বনাকে ঢাকিবার অপচেষ্টা করে। নন্দলালের জীবনের এই বিশেষ ঘটনা হয়তো সর্বত্র হুবহু ঘটে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যে কাপুরুষতা ও নির্লজ্জতা আছে তাহা ভণ্ড দেশপ্রেমিকের মধ্যে সর্বদাই দৃষ্ট হয়। ইহারা জাতগোলাম, শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

চতুর্থতঃ, নন্দলালের ন্যায় দেশপ্রেমিকের অন্তরেও একবিন্দু বল নাই। তাহাদের ব্যাঙাচি-প্রাণ জীবনের সামান্য সংঘাতেও যেন বুদ্‌বুদের মতো ভাঙিয়া পড়ে। তাই বাড়ীর বাহিরে নামিয়া পথ চলা তাহাদের সাধ্য নয়। গাড়ী, নৌকা বা রেলে চড়ার দুর্ঘটনার ভয়। পায়ে হাঁটিয়া সাপ কুকুর আর গাড়ীচাপা-পড়ার বিষম শঙ্কা। সুতরাং খাটে শুইয়া লুচি ছক্কার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কি-ই বা ইহারা করিতে পারে। দেশের কাজটা তাই তাহারা মুখে-মুখেই সারিয়া লয়।

মোটামুটিভাবে, নন্দলাল-চরিত্রের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মেকি দেশ-প্রেমিকের উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান দোষকেই চিত্রিত করিয়াছেন।

(খ) নন্দলাল-চরিত্রের রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলাল যথার্থ দেশপ্রেমিকের মধ্যে কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় তাহার পরোক্ষ ইঙ্গিত করিয়াছেন। দেশের কাজ করিতে হইলে সর্বপ্রথম চাই আত্মত্যাগ। পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের

সর্ববিষয়ে সেবার কাজে বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হওয়ার মনোবৃত্তি দেশপ্রেমিকের পক্ষে দ্বিতীয় গুণ। ভাইয়ের সেবা শিখিলে বৃহত্তর দেশের ভ্রাতৃকল্প স্বদেশ-বাসীর সেবা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের লোকের মধ্যে গিয়াই কাজ করে। ঘরে বসিয়া কাগজে লিখিয়া কাজ সারে না। সুতরাং দেশপ্রেমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেশসেবার মনোবৃত্তি থাকা চাই। উহা তাহার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। চতুর্থতঃ, দেশপ্রেমিকের মধ্যে থাকা চাই অনমনীয় চরিত্রবল, অটল সাহস, আর কঠোর আত্মসম্মানবোধ। নিজের অপমানকে যে অবলীলাক্রমে গিলিয়া হজম করিতে পারে, সে দেশের অপমানে বিক্ষুব্ধ বোধ করে না। দেশের শত্রুর সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হয় দেশভক্তকে। তাহার জন্য চাই বীরত্ব, চাই লৌহদৃঢ় চরিত্র। শত আঘাতেও যাহা ভাঙে না, শত বিপদেও যাহা টলে না, এমন বলিষ্ঠতাই দেশপ্রেমিকের পক্ষে অপরিহার্য গুণ।

নন্দলাল-চরিত্র আঁকিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বিপরীত ইঙ্গিতে দেশপ্রেমিকের মধ্যে এই কয়টি গুণই বাঞ্ছনীয় বলিয়া যেন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্র. ২। 'নন্দলাল' কবিতাটি সম্বন্ধে একটি আলোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

প্র. ৩। 'নন্দলাল' কবিতাটির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। **সমালোচনা** দেখ (শেষ অনুচ্ছেদ বাদ দাও)।

প্র. ৪। দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া নন্দলালের বিবরণটি সংক্ষেপে লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস ঃ স্বদেশের—স্ব অর্থাৎ নিজ দেশ (কর্মধারয়), তাহার। অভাগা—অবিদ্যমান অর্থাৎ নাই ভাগ বা ভাগ্য যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। গলা-টিপুনিতে—গলার টিপুনি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। ফি-সন—সনে সনে (বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব)। গাড়িচাপা-পড়া—গাড়ি দ্বারা চাপা (তৃতীয়াতৎপুরুষ) ;

তাহাতে পড়া (৭মীতৎপুরুষ) অথবা গাড়ি দ্বারা চাপা-পড়া (৩য়াতৎপুরুষ—'চাপা-পড়া' একসঙ্গে ক্রিয়া)। চিরকাল—চির দীর্ঘব্যাপী কাল (সুপ্ সুপা)।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ অভাগা—ভাগ্যবান্। বাঁচা—মরা।

সাধু গদ্য-রূপ ঃ তরে—জন্য। যা' করেই হোক—যাহা (যেমন) করিয়াই হউক। তাহারে—তাহাকে। ভা'য়ের—ভাইয়ের। ভেবে—ভাবিয়া। সবে—সকলকে। হবে—হইবে। ক'—কয়। হ'ত—হইত। শুয়ে শুয়ে—শুইয়া শুইয়া। বাঁচিয়ে—বাঁচিয়া। বেঁচে—বাঁচিয়া।

বাক্যরচনার জন্য শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ঃ বাহবা, অভাগা, জাহির, নাকে খত দেওয়া।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ বাঁচা—বাঁচ্ + আ ভাববাচ্যে। টিপুনি—টিপ্ + অনি = টিপনি > টিপুনি।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ? আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?"—নন্দ জানিতে চাহিল যে সে চিরকাল বসিয়া বসিয়া রহিবে কি না এবং সে না করিলে সেই দেশ আর কে উদ্ধার করিবে (পরোক্ষ উক্তি)।

আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ (প্রশ্নবোধক)—আমি না করিলে এই দেশ উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই (নেতিবাচক)।

বাঁচাটা আমার অতি দরকার (অস্তিবোধক)—আমার না বাঁচিলেই নয় (নেতিবাচক)।

ভেবে দেখি চারিদিক—চারি (চার) দিক ভেবে দেখা যাক (বাচ্যান্তর)।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ হঠাৎ—বাঙলায় এটি অব্যয়, কিন্তু মূলে এটি বিভক্ত্যন্ত সংস্কৃত শব্দ ঃ হঠ্+৫মী একবচন।

উল্টায়—'উল্টা' শব্দটি বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে ইহাই ধাতু হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এটি নামধাতুর উদাহরণ।

বাহবা—অনন্বয়ী অব্যয়।

মা আমার

কামিনী রায়

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

কবি কামিনী রায় বাঙলাদেশের মহিলা-কবিদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপর সামান্যই ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়-নির্বাচনে তিনি রবীন্দ্র-নাথেরও পূর্বগামী ছিলেন। কামিনী রায়ের এমন অনেক কবিতা আছে যাহার বিষয় পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে আরো সুন্দর ও পুষ্ট হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কামিনী রায় রবীন্দ্রসমকালীন হইয়াও পূর্বযুগের সহিত যোগ ছিন্ন করেন নাই। বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমারের মতো তাঁহারও কবিদৃষ্টি ছিল আত্মগত। কিন্তু বিহারীলালের ভাবোন্মাদনা বা অক্ষয়কুমারের ভাবঘনতা তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি ছিল বস্তুনিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, কামিনী রায়ের কবিতায় নীতিচিন্তা ও উপদেশমুখিতা তাঁহার কাব্যে ক্লাসিকাল কৃত্রিম সুরটি অব্যাহত রাখিয়াছে।

"কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা সরল, সংযত এবং পরিমিত। ভাবে ও ভাষায় সংযম ও শালীনতা ইঁহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়-দ্বন্দ্বের মধ্যে নৈতিক এবং বৃহত্তর আদর্শের আনুগত্য ইঁহার কাব্যের বিশিষ্ট সুর। ইহাই কবির নারী-হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয়।"

এই কাব্যে নারী-হৃদয়ের যে অকপট পরিচয় ফুটিয়াছে, ইতিপূর্বে আর কোনো মহিলা-কবির তেমনটি ফুটে নাই। নারীপ্রেমের কুণ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ আত্ম-বিলোপের ভাবে তাঁহার কাব্যে একপ্রকার অতিশয় ব্যক্তিগত সুর পাওয়া যায়। অবশ্য এই ভাব ও এই আদর্শ পূর্বে বৈষ্ণব-কবিতাতেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতার সুর নৈর্ব্যক্তিক, কামিনী রায়ের কবিতার সুর একান্ত আত্মগত, ব্যক্তিগত (personal)। ইহাই কামিনী রায়ের কবিস্বরূপের আংশিক পরিচিতি।

উৎস ও নামকরণ—কবির 'আলোছায়া'-নামক কবিতাগ্রন্থই আলোচ্যমান কবিতাটির উৎস।

এই কবিতায় দেশকে কবি মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের সেবায় ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র হাসিকান্নার অবসর নাই। তাই সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া একনিষ্ঠ সাধনায় কবি দেশসেবায় কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই দেশসেবার প্রেরণা হিসাবে দেশের জন্য দুঃখবোধ ও অতীত যুগের গৌরবকথাকে কবি সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে চাহেন। কিন্তু কল্পনায় নহে, প্রত্যক্ষ কর্মেই তিনি আত্মনিয়োগ করিতে অভিলাষী। কবিতাটির ভাববস্তু মোটামুটিভাবে ইহাই। শিরোনামের সহিত এই ভাববস্তুর প্রত্যক্ষ কোনো সঙ্গতি অবশ্যই নাই। তবে 'মা আমার' বলিতে কবি যাঁহাকে বুঝাইয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশে নিবেদিত হইয়াছে আলোচ্যমান কবিতার ভাববস্তু। দ্বিতীয়তঃ, গানের ধুয়ার মতো প্রতি স্তবকের শেষে অনুরণিত হইয়াছে 'মা আমার'। এই দুই কারণে কবিতাটির শিরোনাম রীতিসঙ্গত তো বটেই, ভাবসঙ্গতও বটে।

সমালোচনা—'মা আমার' কবিতাটি দেশাত্মবোধের কবিতা। ইহার মহান্ আবেগ স্বভাবতঃই পাঠকচিত্তকে স্পন্দিত করে। ইহার সরল গীতিমূর্ছনা বহন করে একটি সুকুমার আবেদন। কবিতাটি কবির আত্মলীন হৃদয়াবেগের ভাবোৎসার। দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে একপ্রকার স্বদেশী গান আছে, ইহা সে পর্যায়ে পড়ে না। বস্তুতঃ ইহা একটি সুষ্ঠু গীতিকবিতাই বটে। আন্তরিকতা ও ভাবাবেগের নিগূঢ়তা ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাবালুতার সুলভ উচ্ছ্বাস কবির চিত্তবৃত্তিকে এখানে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। প্রগাঢ় একটা বেদনাবোধের সুর কবিতাটির আদ্যন্ত বাজিয়া চলিয়াছে। দেশকে যে কবি ভালোবাসিতেন, দেশের দুঃখে সর্বদা যে তিনি একটা 'অনল পুষিয়া' রাখিয়াছেন, ইহা তাহারই ফল। এইজন্যই কবিতাটির মধ্যে আবেগের তীব্রতা-সত্ত্বেও ভাবালুতার ফেনোচ্ছ্বাস নাই। ইহার প্রতিটি কথা তাই সরল, সাবলীল ও ভাবগভীর।

এই কবিতার বস্তু-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাও অভ্রান্ত। দেশের কাজে প্রেরণা আসে দেশের জন্য প্রকৃত দুঃখবোধ আর দেশের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস হইতে। কবি তাই সেই দুঃখবোধকে এবং অতীত গৌরবকে আপন হৃদয়ে সদাজাগ্রত রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও যে অন্তরায় আছে, একথাও কবি ভুলেন নাই। পুরাতন স্মৃতির, অতীতের গৌরবের অবিরাম রোমন্থন কখনো কখনো মানুষকে কেবল বিলাপে

যা বাগাড়ম্বরেই প্রবৃত্ত করে, প্রকৃত কার্য তাহাতে ব্যাহত হয়। কবি এই সত্য ভালো করিয়া জানেন এবং জানেন বলিয়াই এ-বিষয়ে সংযত হইতে পারিয়াছেন। দেশকর্মে ছোট একটি কঠোর সংকল্পেই তাঁহার সকল সাধনা এখানে সমাহৃত দেখি। 'দেশের জন্য প্রাণ দিব'—ইহাই কবির সহজ ও একান্ত সংকল্প। কবি কল্পনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বড় কথা বলেন নাই, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক অনুভূতির বশবর্তী হইয়াই উপরোক্ত কথাকয়টি ব্যক্ত করিয়াছেন। এইখানেই কবিতাটির মাধুর্য ও আবেদন সর্বাধিক।

কবিতাটি কবির আত্মগত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা পরাধীন দেশের মানব-মাত্রেরই মর্মবাণী। এ কবিতায় কবি যেন তাঁহার দেশবাসীর প্রতিনিধি।

সংক্ষিপ্তসার—দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করা অবধি কবি ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে কেবল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা বন্দিনী দেশমাতৃকা। এই বেদনাটিকে কবি রাবণের চিতার মতো হৃদয়ে অনির্বাণ রাখিতে চাহেন, যেন দেশের কাজে শক্তি ও প্রেরণা তাঁহার কখনো ঝিমাইয়া না পড়ে, যেন সেই প্রেরণায় তিনি নিজেকে ও পরকে দেশের কাজে সর্বদা একনিষ্ঠ রাখিতে পারেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণ বোধে জলাঞ্জলি দিয়া, দেশের অতীত গৌরবস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কবি দেশের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছেন। অতীতের লুপ্ত গৌরবকথা লইয়া তিনি বৃথা বাগাড়ম্বর ও তাহাতে বর্তমানের কর্তব্যহানি করিতে চাহেন না। বলিতে চাহেন শুধু এই কথাটিই যে দেশের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন করিবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনেই কবি দুঃখভরা এ জীবনকে ধারণযোগ্য মনে করেন না। দেশকে পরাধীনতার অপমান হইতে মুক্ত করাই তাঁহার একমাত্র সংকল্প, ইহারই জন্য তাঁহার জীবনমরণ পণ।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

ও চরণে—দেশমাতৃকার পদতলে। ডালি দিনু—সমর্পণ করিলাম; উৎসর্গ করিলাম। **হাসি অশ্রু**—হাসি ও কান্না। এই হাসিকান্নার দ্বারা কবি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকেই বুঝাইতেছেন। **যেই দিন ও চরণে...... বিসর্জন**—যেদিন হইতে কবি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সেদিন হইতে তিনি ব্যক্তিগত সুখদুঃখ এবং তাহাকে লইয়া যে হাসি কান্না তাহা

ত্যাগ করিয়াছেন। **হাসিবার কাঁদিবার……নাহি আর**—দেশের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিবার পর ব্যক্তিগত জীবনের কথা আর ভাবিবার সময় নাই। অনন্যমনা হইয়া একনিষ্ঠ দেশসেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কাজেই নিজের তুচ্ছ সুখে হাসিবার বা তুচ্ছ দুঃখে কাঁদিবার আর তাঁহার অবসর নাই। দুখিনী জনমভূমি—পরাধীন ভারতভূমিই কবির জন্মভূমি। দেশের সর্বদিকে অবনতি ও দুঃখদুর্দশাকে কবি মাতৃসমা জন্মভূমির দীনহীন দুঃখময় রূপের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় স্তবক

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে—কবি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটি আগুনকে পুষিয়া রাখিতে চাহেন। এই আগুন দেশের জন্য দুঃখানুভূতির আগুন; মাতৃভূমি বিদেশীর পদানত—এই দুঃখময় অনুভূতি কবি তাঁহার হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরূক রাখিতে চাহেন। অনির্বাণ রাবণের চিতার ন্যায় ইহাই তাঁহার হৃদয়ের অনল। ইহাই তাঁহার হৃদয়কে দেশসেবার ব্রতে পবিত্র রাখিবে। অথবা 'অনল'-এর অর্থ এখানে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনাও করা চলে। তবে অনল কথাটির সাধারণ প্রচলন দুঃখেরই ভাবানুষঙ্গে। দেশের জন্য দুঃখের বোধটিই কবি আপন হৃদয়ে সবদা অনির্বাণ রাখিতে চাহেন। **আপনারে অপরের…………তব কাজে**—কবি আপন হৃদয়ে দেশের জন্য দুঃখানুভূতি অনির্বাণ আগুনের মতো কেন জ্বালাইয়া রাখিতে চাহেন তাহারই কারণ বলিতেছেন। এ তাঁহার দুঃখবিলাস নহে। হৃদয়ের মধ্যে সর্বদা দেশের জন্য দুঃখবোধ জাগ্রত থাকিলে কবির দেশসেবার প্রেরণা কখনো স্তিমিত হইবে না। ফলে নিজে তো বটেই, অপরকেও তিনি দেশের কাজে উদ্‌বুদ্ধ ও নিয়োজিত করিতে পারিবেন। **ছোটোখাটো সুখ দুঃখ**—ব্যক্তিজীবনে সুখদুঃখের কথাই বলা হইয়াছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের তুলনায় এগুলি নেহাত তুচ্ছ। দেশকর্মীর পক্ষে এগুলি নিতান্ত অবজ্ঞেয়। **তুমি যবে চাহ কাজ**—দেশমাতৃকা যখন সেবা দাবী করেন। দেশের অবস্থা যখন শোচনীয় তখন দেশমাতৃকা যেন সকলকে দেশসেবায় আহ্বান করেন।

তৃতীয় স্তবক

অতীতের কথা……সে কথাও কহিব না—দেশের অতীত ইতিহাস ও অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করা কর্তব্য, কারণ উহা কল্যাণপ্রদ। কিন্তু উহা

লইয়া বাড়াবাড়ি করাও সকল সময় ভালো নয়। দেশের অতীত গৌরবে গর্ববোধ করা ভালো, কিন্তু তাহা লইয়া লম্বাচওড়া বক্তৃতা করিলে ফল নাই, বরং কুফলই আছে। কারণ তাহাতে দৃষ্টি পশ্চাতে পড়িয়া যায়; বর্তমান কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়। কবি তাই পুরাতন কথা লইয়া বাগাড়ম্বর না করিবারই সংকল্প করিতেছেন। **হৃদয়ে জপিব** তায়—অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। প্রাচীন গৌরব ও গর্বের কথাকে অনুভূতির মধ্যে সদাজাগ্রত রাখিলেই মানুষ দেশসেবায় অধিকতর শক্তি ও উৎসাহ লাভ করে। তাই কবি অতীতকে মনে মনে স্মরণ করিবেন, অতীতের কীর্তির কথা নীরবে জপ করিবেন। অতীতের মহিমময় স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের মঙ্গলময় স্বপ্ন মিলিত হইয়াই বর্তমান গঠন করে। **গাহি যদি……তোমারি তরে**—কবি বলেন, অন্তরে অন্তরে তিনি দেশের অতীত গৌরব স্মরণ রাখিবেন। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করিবেন সংকল্পবাণীটি। এই সংকল্প হইবে 'দেশের জন্য প্রাণ দিব'--এই মন্ত্র। প্রাচীন গৌরবের বাগাড়ম্বর নহে, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের মন্ত্রটিই কবি সর্বদা গান করিবেন।

চতুর্থ স্তবক

মরিব তোমারি কাজে…তরে—কবি জীবনমরণ সংকল্প করিয়া দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। যতদিন তিনি বাঁচিবেন, ততদিন শুধু দেশকেই সেবা করিবেন এবং করিতে হইলে দেশেরই জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিবেন। সাধারণ মানুষ যেমন নিজের ও আপন পরিবারের স্বার্থরক্ষার জন্য জীবনধারণ করে, তেমন জীবন তিনি ধারণ করিবেন না। **নহিলে বিষাদময়………কে বা ধরে**—দেশের কাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে জীবনধারণের সার্থকতা নাই। পরাধীন দেশের শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে প্রত্যেকের জীবনে পুঞ্জীভূত দুঃখ। কবি এমন দুঃখভরা জীবন ব্যক্তিগত স্বার্থে একদিনের জন্যও বহন করিতে চাহেন না। দেশের কাজে সে জীবন ধন্য হইতে পারিবে, এই আশাতেই তিনি জীবনধারণ করেন। তাঁহার মতে ইহা ছাড়া জীবনের অন্য কোনো প্রয়োজন নাই। **কলঙ্কভার**—পরাধীনতার অপমান জাতির পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। **থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ**—কবির বক্তব্য এই যে, যতদিন না দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন হইবে, ততদিন দেশসেবাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইবে। এই ব্রত যদি তাঁহার জীবন থাকিতে

উদ্‌যাপিত হয়, উত্তম ; যদি তাহার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়। তাঁহার জীবন দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গীকৃত বলি, সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনমরণের প্রশ্ন তুচ্ছ।

ব্যাখ্যা

(১) অনল পুষিতে……মা আমার, মা আমার। (স্তবক ২)

এই স্তবকটি কবি কামিনী রায়ের 'মা আমার'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ-প্রসঙ্গেই আলোচ্যমান অংশের সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন।

দেশের পরাধীনতা, অপমান আর লাঞ্ছনার দুঃসহ ব্যথা কবির হৃদয়ে আগুনের মতো জ্বালা সৃষ্টি করিয়াছে। কবি এই আগুনের জ্বালাকেই আপন হৃদয়ে সযত্নে জীয়াইয়া রাখিতে চাহেন। কারণ, তাহাতে দেশের সেবায় তাঁহার প্রেরণা স্তিমিত হইয়া পড়িবে না ; পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কথনো আসিবে না শিথিলতা। এইভাবে দেশের জন্য দুঃখবোধ হইতে যে একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ জাগ্রত থাকিবে, কবি তাহারই উদ্দীপনা অপরের মধ্যেও সঞ্চার করিতে পারিবেন এবং তাহার দ্বারা নিজে ও পরে সকলে মিলিয়া দেশের কাজে সর্বান্তঃকরণে ব্রতী হইতে পারিবেন। তখন আর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সংকীর্ণ গণ্ডী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। দেশ যখন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত, তখন ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ। মাতৃসমা জন্মভূমি সন্তানের সেবায় যেন মুক্তি চাহিতেছেন, পায়ে তাঁহার পরাধীনতার শৃঙ্খল। দেশের এই দুঃখিনী বন্দিনীর বেশ কল্পনা করিয়াই কবি হৃদয়ের মধ্যে বিদ্রোহের আগুনটিকে রাবণের চিতার মতো জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন এবং এইদিকে দৃষ্টি একাগ্র রাখিয়াই তিনি ব্যক্তিগত সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া দেশের কাজে দেহমন সমর্পণ করিয়াছেন।

(২) অতীতের কথা কহি……মা আমার, মা আমার! (স্তবক ৩)

এই অংশটি কবি কামিনী রায়ের 'মা আমার'-শীর্ষক কবিতার তৃতীয় স্তবক। দেশের কাছে আত্মনিয়োগকালে কবির একটি সংকল্প এই অংশে বিবৃত হইয়াছে।

দেশাত্মবোধের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল দেশের অতীত স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু অতীত গৌরব ও গর্বের কাহিনী লইয়া কেবল বাগাড়ম্বরের কোনো সার্থকতা নাই। বস্তুতঃ, পুরাতন দিনের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশতঃ

শুধু নিরর্থক উচ্ছ্বাস ও বিলাপে বর্তমানের কর্তব্যে বাধাসৃষ্টিই হয়। কবি তাই শুধু অতীতের অলস বিজৃম্ভণেই কালাতিপাত করিবেন না, অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করিতেই বরং বর্তমানের কর্তব্যে সর্বান্তঃকরণে প্রয়াস করিবেন। তবে ইহার জন্য প্রেরণাও প্রয়োজন এবং সেইজন্য প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবটুকু কবি নীরবে সর্বক্ষণ জপ করিবেন—যেন সর্বদা তিনি মনে রাখিতে পারেন যে এক অতি মহান্ দেশের অধিবাসী তিনি। মুখে অবশ্য তিনি কেবল কর্তব্যের সংকল্পটিই উচ্চারণ করিবেন, হৃদয়ে পোষণ করিবেন অতীত স্মৃতির গর্ববোধ। দেশ চায় শুধু কাজ। বৃথা অহংকারের এখন সময় নাই। তাই একটিমাত্র প্রতিজ্ঞার কথা, একটিমাত্র সাধনার মন্ত্রকেই কবি সর্বক্ষণ গাহিয়াই বেড়াইবেন। 'দেশের জন্য প্রাণ দিব'—শুধু এই সরল সংক্ষিপ্ত সংকল্পই হইবে সেই গানের কথা ও একমাত্র ভাব।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি কামিনী রায়ের 'মা আমার' কবিতাটির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। কামিনী রায়ের 'মা আমার' কবিতাটির মর্মকথা উল্লেখ করিয়া উহার উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে মন্তব্য লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: অতীত = অতি + ইত। তোমারি = তোমার + ই (বাঙলা সন্ধি)।

সমাস: জনমভূমি—জন্মের (জনমের) ভূমি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ছোটোখাটো—যাহা ছোটো তাহাই খাটো (কর্মধারয়)। কলঙ্কভার—কলঙ্কের ভার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

সাধু শব্দ-রূপ: যেই দিন—যেদিন। দিনু—দিলাম। দুখিনী—দুঃখিনী। জনমভূমি—জন্মভূমি। হিয়া-মাঝে—হৃদয়-মাঝে। আপনারে—

আপনাকে। অপরেরে—অপরকে। নিয়োজিতে—নিযুক্ত করিতে। তব—তোমার। যবে—যখন। কহি—কহিয়া। জপিব—জপ করিব। তায়—তাহা। গাব—গাহিব। তোমারি তরে—তোমারি জন্য।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ হাসিবার—হাস্+ইবা+র (৬ষ্ঠী)। অতীত—অতি—ই+ক্ত। বর্তমান—বৃৎ+শানচ্।

কারক ও বিভক্তি: ও 'চরণে' ডালি দিনু এ জীবন (সম্প্রদানে-এ)।

পদ-পরিবর্তন: বিসর্জন—বিসৃষ্ট (অপ্রচলিত), বিসর্জিত (ভুল হইলেও প্রচলিত)। কলঙ্ক—কলঙ্কিত।

অর্থগত পার্থক্যঃ অনিবার—অবিরত; আনিবার—লইয়া আসার।

ব্যাকরণগত টীকা: জনমভূমি—জন্মভূমি>জনমভূমি: একটি অ আসিয়া ম-র ব্যঞ্জন দুটিকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে বলিয়া এটি বিপ্রকর্ষের উদাহরণ।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর—হাসিবার কাঁদিবার আর অবসর কোথায় (প্রশ্নবোধক)?

ছোটোখাটো সুখ দুঃখ কে হিসাব রাখে তার—ছোটোখাটো সুখ-দুঃখের হিসাব কেহ রাখে না (সরল; নেতিবাচক)।

বাঙালীর মা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কবি-পরিচয়—পাঠপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য কবিতাটি কবির 'পাষাণ'-নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত।

এই কবিতায় কবি বাঙলাদেশের একটি লেখা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। উত্তরে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, মধ্যে নদী-উপনদীর লীলা, ফলফুলের অফুরন্ত সম্ভার, জ্যোৎস্নার উৎসার,—এক কথায় প্রকৃতির অপূর্ব-

লক্ষ্মীশ্রী লইয়া বাঙলার মূর্তিখানি কবির চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কবি তাহারই কল্প-চিত্রটি এখানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইনি মাতৃরূপিণী। ইহাকে কবি বাঙালীর মাতৃ-জ্ঞানে এই কবিতায় বরণ করিয়াছেন। স্বদেশের রূপকল্পনা অনুরূপভাবে অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু এই কবিতার নামকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। আপাতদৃষ্টিতে শুধু 'বাঙলা মা'-ও কবিতার উপযুক্ত নাম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। কিন্তু 'বাঙালীর মা' বলার গূঢ়তর সার্থকতা আছে। বাঙলাদেশে সন্তানের নামেই মায়ের পরিচয়। সেই রীতিতে, এই যে দেশমাতৃকা তাঁহার সন্তান, বাঙালীর পরিচয়েই তাঁহার পরিচয়। 'বাঙলা মা' বলিলে বাঙলাদেশের পরিচয় প্রথমে, পরে তাহার পরিচয়ে দেশবাসীর পরিচয়। এখানে তাৎপর্য ঠিক উল্টা। এখানে সন্তান বাঙালীর পরিচয়ে দেশরূপিণী মায়ের পরিচয়। ইহাই বাঙালীর রীতি। এই হিসাবে কবিতাটির নামের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

সমালোচনা—'বাঙালীর মা' কবিতাটি চিত্রধর্মী। বাঙলাদেশের সত্যকার প্রকৃতিপরিচয় হইতে কবি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং একটি মাতৃমূর্তির ছবি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা এদেশে সাধারণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দেশমাতার পরিচয়দানকালে কবির অভিনবত্ব আছে। সন্তানের পরিচয়ে মাতার পরিচয়—ইহাই বাঙালীর রীতি। এই রীতি অনুসরণ করিয়া কবি বাঙালী বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহাদের জননী-স্বরূপা দেশকে 'বাঙালীর মা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনার মধ্যে চমকারিত্বও যথেষ্ট আছে। কবি যেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই দেশমাতৃকার মূর্তিকে ধ্যান করিয়াছেন। তাই একবার 'বাঙালীর মা'-কে দেখি রাজরাণী-রূপে, আর একবার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে। কিন্তু 'তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান'—এই চিন্তার মধ্যে মূর্তিকল্পনা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, কবির ভূগোলজ্ঞান যেন অতিমাত্রায় জাগ্রত। ব্রহ্মপুত্র দামোদর পদ্মা অজয় প্রভৃতি নদীর বিশিষ্ট প্রকৃতি কবির বিশেষভাবে জানা আছে। তাহাদের সত্যরূপ মূলকল্পনার সহিত তিনি সমন্বিতও করিয়াছেন। কিন্তু কল্পনার সহিত জাগ্রত চিন্তার প্রয়াস যেন ইহাতে মিশিয়া আছে। তৃতীয়তঃ, কয়েকটি স্থানের অর্থ কষ্ট-কল্পনার দ্বারাও উদ্ধার করা সম্ভব নয়। জ্যোৎস্নার ঝাঁপিতে লাল আলতার সন্ধান কবি কোথায় পাইলেন বোঝা শক্ত। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও কবিতাটি উপভোগ্য; ইহার মধ্যে কবির উচ্ছ্বাসের চেয়ে সত্যপরতা বেশী।

বাঙলার সমৃদ্ধি-সত্ত্বেও বাঙালীর দুর্দশার কথা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সত্যসন্ধ এই বর্ণনা আমাদের নিকট বিশেষ একটা আবেদন বহন করে।

সংক্ষিপ্তসার—বঙ্গজননীর মূর্তি সম্রাজ্ঞীর মতো মহীয়সী। হিমালয় তাঁহার মাথার উপর তুষারের শ্বেতছত্র ধরিয়া রহিয়াছে। তুষারশীর্ষের চারিদিকে ভাসমান মেঘগুলি যেন সেই ছাতার দোদুল্যমান ঝালর। উর্মিচঞ্চল গর্জনমুখর বঙ্গোপসাগর তাঁহার চরণযুগল শ্রদ্ধাভরে ধৌত করিতেছে। সর্বাঙ্গে তাঁহার ফুলের সৌরভের অঙ্গরাগ। স্নিগ্ধ বাতাস যেন চামর দোলাইয়া তাঁহাকে ব্যজন করে। সুনীল অরণ্যরাজির রূপে শোভা পায় তাঁহার মুক্ত কেশরাশি। সোনালী শস্যে ও শ্যামল বৃক্ষলতায় গড়া নদীবিধৌত তাঁহার গৃহখানি আনন্দ-কোলাহলে নিয়ত মুখর—এ যেন মাটির স্বর্গ। বাঙলার শ্যাম গোচারণক্ষেত্রে গাভীগুলি রাখালের বাঁশীর মধুর স্বর শুনিতে শুনিতে চরিয়া বেড়ায়, কুঞ্জবন ঝরা ফুলে দেয় মাতৃপদে অঞ্জলি; নিত্য প্রভাতে সূর্য তাঁহার হাতে কিরণপদ্ম উপহার আনিয়া দেয়, আর রাত্রির জ্যোৎস্না মৃদুপদে আসিয়া মাতার পা-দুখানি দেয় আলতায় রাঙাইয়া। ব্রহ্মপুত্র ও দামোদর নদ বৈতালিকের ন্যায় বঙ্গজননীর বন্দনা গান করে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পদ্মা তাঁহার নর্তকী। অজয় ও ভৈরব বাজায় তাঁহার জয়ভেরী। পর্যাপ্ত বর্ষণে এই দেশ শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। বিশাল সাগরের বুকে বঙ্গজননী যেন কমলে কামিনীর ন্যায় পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্না। ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দুইটি গজের মতো তাঁহার মস্তকে দেবতার চরণামৃত বর্ষণ করিতেছে আর জননী স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া জগতের ক্ষুধা মিটাইতেছেন। তাঁহার আঙিনায় উষা আসিয়া কিরণের ছড়া দেয়, সন্ধ্যা ধূপদীপ জ্বালাইয়া করে আরতি। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খধ্বনি যেন মাতাকেই আহ্বান করে। দেবতার আশীর্বাদী অজস্র ধানদূর্বাই যেন বঙ্গভূমিকে সমৃদ্ধ ও ধন্য করিয়াছে। তিনি দেবতারও নমস্য।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

হিমাদ্রি—হিমালয়; অদ্রি = পর্বত। তোমার শিরে—রাজরাণীরূপে-কল্পিত বঙ্গভূমির মাথার উপরে। **তুষারের শ্বেতছত্র**—সাদা বরফ দিয়া রচিত ছাতা। **হিমাদ্রি……ছত্র ধরে**—বঙ্গভূমির উত্তরে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত

শিখররাজি। কবি কল্পনা করিয়াছেন, হিমালয় যেন মহীয়সী রাণীর মতো বঙ্গ-জননীর মাথার উপর এই তুষারের ছাতা ধরিয়া রহিয়াছে। মেঘের ঝালর—মেঘ দিয়া রচিত কুঞ্চিত বস্ত্রপ্রান্তভাগ। **তায়**—তাহাতে অর্থাৎ ছাতায়। **মেঘের ঝালর·········শোভা করে**—হিমালয়ে তুষারশৃঙ্গগুলির চতুর্দিকে সাদা সাদা ঢেউখেলানো মেঘ উড়িয়া এক রমণীয় শোভা বিস্তার করে। কবির কল্পনায় এই মেঘগুলিই যেন তুষারের ছাতার অলঙ্কৃত প্রান্তভাগ বা ঝালর। নিম্নে—নীচে; পাতালে। **গর্‌গর্‌**—গরগর শব্দ করিয়া (ক্রিয়াবিশেষণ)। **লক্ষফণা অজগর**—অসংখ্য ফণাবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড সাপ। এই সাপ আর কেহই নয়—বঙ্গোপসাগর। তাহার অগণিত ঢেউ যেন এই মহাসর্পের উদ্যত লক্ষ লক্ষ ফণা। সমুদ্রে অজগর-কল্পনা রবীন্দ্রনাথেও আছে। "ও যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।" বঙ্গসিন্ধু—বঙ্গোপসাগর। পদযুগ—পা-দুখানি। **শিরে······যতনে ধোয়ায়**—পরম ভক্তিভরে মাথায় রাখিয়া সযত্নে ধোয়াইয়া দেয়। **বঙ্গসিন্ধু············ধোয়ায়**—বঙ্গদেশের দক্ষিণে উর্মিচঞ্চল গর্জনমুখর বঙ্গোপসাগর। লক্ষফণা সর্পের মতো এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র শ্রদ্ধাভরে রাণী বঙ্গভূমির সেবায় রত—তাঁহার চরণযুগল ধৌত করিতেছে। **অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ**—বাঙলার অজস্র ফুলের সুঘ্রাণে বঙ্গজননীর সর্বাঙ্গ আমোদিত। **মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়**—স্নিগ্ধ বাতাস যেন তাঁহার দেহে চামর দোলাইয়া ব্যজন করিতে থাকে। চামরী গাইয়ের লেজের লোম হইতে প্রস্তুত ব্যজনী (চামর) দেবতার অঙ্গে বাতাস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় স্তবক

মুক্তবেণীসম—খোলা চুলের মতো; আলুলায়িত কেশরাশির মতো। **সুনীল অটবী**—গাঢ় নীল অরণ্যরাজি। দূর হইতে দেখিলে গভীর অরণ্যকে গাঢ় নীল দেখায়। তুলনীয়: "একদিকে যায় দেখা অতি দূর তটপ্রান্তে **নীল** বনরেখা" —রবীন্দ্রনাথ; "তমালতালীবনরাজিনীলা" —কালিদাস। অটবী = বন; অরণ্য। **কাঞ্চীসম**—কটিভূষণ বা মেখলার ন্যায়। কটি—কোমর। **কাঞ্চীসম··············নাচিয়া জাহ্নবী**—বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগকে ঘিরিয়া কলনাদিনী গঙ্গা তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে। এই গঙ্গা যেন বঙ্গজননীর কটিভূষণের আর তাহার কলধ্বনি সেই কটিভূষণের ঘুঙুরের শব্দ। **হিরণ-হরিতে গড়া**—সোনালী এবং সবুজ রঙে তৈয়ারী। হিরণ—সোনা; হরিৎ—সবুজ।

বাঙলাদেশ অত্যন্ত উর্বর। তাহাতে ফসল যখন পাকে, তখন সোনার বর্ণ ধারণ করে; আর তাহার বৃক্ষলতা ও তৃণশষ্প সবুজ রঙের। বাঙলা মায়ের আনন্দময় সংসারটি তাই সোনালী ও সবুজে গড়া। তুলনীয়: "মধুর মহিমা হরিতে হিরণে"—রবীন্দ্রনাথ। সরিৎ—নদী। আনন্দ-ভুবন—আনন্দময় সংসার। **আমোদিত কলকলগীতে**—বাঙলার উপর দিয়া বহমান বহু নদীর অবিরাম ধ্বনিতে বঙ্গজননীর সংসারটি যেন উৎসব ও আনন্দের কোলাহলে সঙ্গীতমুখর। **স্বর্গ নামে তব দ্বারে** ইত্যাদি—দেবতার স্বর্গ যেন নির্বাক্ বিস্ময়ে এই পরমানন্দময় মাটির স্বর্গকে দেখিবার জন্য নামিয়া আসে এই ধূলায়। অথবা এই বঙ্গভূমিই পরম রমণীয় ও সদানন্দময় স্থান বলিয়া স্বর্গে পরিণত হয়—স্বর্গের সঙ্গে ইহার কোনো প্রভেদ থাকে না।

তৃতীয় স্তবক

শ্যাম—সবুজ; তৃণাচ্ছাদিত। গোঠে—গোষ্ঠে; গোচারণ-ক্ষেত্রে; মাঠে। **বেণুরবে**—বাঁশীর সুরের সঙ্গে। রাখাল গরুগুলিকে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে, আর গরুগুলি বাঁশীর সুরে তন্ময় হইয়া কাছে-কাছেই থাকে—দূরে চলিয়া যায় না। **ধবলী শ্যামলী**—সাদা এবং কালো রঙের গাই। কথা দুইটি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। **কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে** ইত্যাদি—নানা রঙের যে সুন্দর ফুলগুলি কুঞ্জবনে ফোটে, তাহারাই কুঞ্জের প্রাণস্বরূপ; এই প্রাণস্বরূপ ফুলগুলিকেই যেন সে (কুঞ্জ) বঙ্গজননীর চরণে ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে। সহজ কথায়, বাঙলার কুঞ্জে কুঞ্জে বিভিন্ন ঋতুতে সহস্র রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়ে। **রবি দেয় নিত্য প্রাতে** ইত্যাদি—প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য আসিয়া বঙ্গজননীর হাতে কিরণরূপ পদ্ম উপহার দেয়। **কিরণকমল**—কিরণরূপ কমল। কথাটির অন্য অর্থও করা যায়—কিরণসদৃশ কমল অর্থাৎ প্রভাত-সূর্যের রশ্মির মতো আরক্ত পদ্ম। সূর্যোদয়েই পদ্মের বিকাশ হয়। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য এই বিকশিত পদ্ম আনিয়া উপহার দেয় বঙ্গজননীর হাতে। **ঝাঁপি**—বেতের তৈয়ারী আচ্ছাদনযুক্ত ছোট পেটিকা। ইহার মধ্যে সিঁদুর, টাকাপয়সা, কড়ি প্রভৃতি রাখা হয়। লক্ষ্মীদেবীর হাতে এইরূপ একটি ঝাঁপি থাকে বলিয়া কল্পনা করা হয়। **জ্যোৎস্না নামে······মতন**—লক্ষ্মীর হাতে যেমন ঝাঁপি থাকে, তেমনি একটি ঝাঁপি লইয়া জ্যোৎস্না যেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে

বঙ্গভূমিতে নামিয়া আসে। কিন্তু জ্যোৎস্নার ঝাঁপি বলিতে কবির লক্ষ্য কি বুঝা যায় না। **রঞ্জিতে**—রাঙাইয়া দিতে। **অলক্তরাগে**—আলতার রঙে। জ্যোৎস্নার সঙ্গে এই (লাল) আলতার সম্পর্ক কি তাহাও বুঝা যায় না। আলতা-পরা বঙ্গনারীর সান্ধ্য প্রসাধনের অঙ্গ। **রাতুল**—লাল টুকটুকে। স্তবকটিতে অচেতন কুঞ্জ, রবি এবং জ্যোৎস্নায় চেতনের ধর্ম ও ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

চতুর্থ স্তবক

ব্রহ্মপুত্র—আসাম ও বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বৃহৎ নদ। **দামোদর**—পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ নদ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্রহ্মপুত্র ও দামোদর দুইটিই নদ—পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত। এই কারণেই পরে তাহাদিগকে 'সখী' না বলিয়া 'সখা' বলা হইয়াছে। **বৈতালিক**—বন্দী; স্তুতিপাঠক; প্রভাতে মঙ্গলগান গাহিয়া বা স্তুতি পাঠ করিয়া যাহারা রাজা ও রাণীদের নিদ্রাভঙ্গ করে। **দুটি জলসখা**—দুইটি জলপ্রবাহরূপ দুই বন্ধু। ইহারা বঙ্গজননীর সখা মনে করিলে ভুল করা হইবে। **ব্রহ্মপুত্র···জলসখা**—বাঙলার পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্র ও দামোদর এই দুই প্রবল নদ যেন দুই বন্ধুর মতো একসঙ্গে বাঙলা মায়ের স্তুতিগান করে। এই দুই নদের মধ্যে বন্ধুত্ব-কল্পনা সঙ্গত, কারণ দুইটিরই প্রকৃতি দুর্দম। **ঝঞ্ঝা সনে**—ঝড়ের সঙ্গে; ঝড়ের তালে। এখানে পদ্মায় নর্তকী-কল্পনা। পূর্ববঙ্গে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা হইয়া থাকে। **অশনিকরকা**—বজ্র ও শিলাবৃষ্টি। **অজয়, ভৈরব**—বাঙলাদেশের দুইটি নদ; প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গে, দ্বিতীয়টি পূর্ববঙ্গে। **ঘুরি**—ঘুরিয়া-ফিরিয়া; আঁকা-বাঁকা পথে চলিয়া। **বিজয়তুরী**—জয়সূচক তূর্য। তূরী বা তূর্য ফুঁ দিয়া বাজাইবার একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। **মেঘধারাযন্ত্রে**—মেঘরূপ ধারাযন্ত্র বা ফোয়ারা হইতে। **অমিয়**—অমৃত। বৃষ্টিকেই এখানে অমৃত বা সুধারূপে কল্পনা করা হইয়াছে, কারণ এই বৃষ্টির ফলেই বঙ্গদেশ হয় শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ।

পঞ্চম স্তবক

নিখিলসাগর-অঙ্কে—বিশ্বরূপ সমুদ্রের কোলে বা বুকে। **কমলে কামিনী**—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ভগবতীর রূপবিশেষ। ধনপতি সদাগর একবার বাণিজ্যযাত্রা করিয়া সিংহলের নিকটবর্তী কালীদহের সমুদ্রে দেখিতে পান যে, পদ্মবনে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসিয়া এক পরমাসুন্দরী রমণী এক হাতে

ধরিয়া একটি হাতীকে গিলিতেছেন এবং উগরাইয়া অন্য হাতে তাহাকে জলে ফেলিতেছেন। **পদ্মাসনে**—যোগসাধনায় বসিবার একটি বিশেষ ভঙ্গীর নাম পদ্মাসন, তাহাতে। অথবা, পদ্মফুলের আসনে, পদ্মফুলের উপর। বাঙলায় অজস্র পদ্মফুল ফোটে, তাই পদ্মফুলকে বঙ্গমাতার আসন বলা অসঙ্গত নয়। কমলে কামিনীর সহিত তুলনা সার্থক করিতে গেলে এই অর্থই বরং সঙ্গত। দিবসযামিনী—দিনরাত্রি; অবিরত। ঋদ্ধি—সম্পদ্; শ্রীবৃদ্ধি। সিদ্ধি—সাফল্য। দুই করী—দুইটি হাতীর রূপে। শান্তিঘট—শান্তিজলে পূর্ণ কলস। **পাদোদক-সুধা**—চরণামৃত; পা-ধোয়ানো জল যাহা অমৃতের মতো সঞ্জীবন। দেবতার আশীর্বাদে বঙ্গভূমি সুখশান্তির আগার। **ঋদ্ধি সিদ্ধি…পাদোদকসুধা**—এখানে লক্ষ্মীদেবীর একটি ছবি কবির মনে রহিয়াছে। দেবী অমৃতভাণ্ড হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর দুই পাশ হইতে দুইটি হাতী শুঁড়ের সাহায্যে একটি জলের কলস তুলিয়া তাঁহার মাথায় জল ঢালিতেছে। এই ছবির সহিত কমলে কামিনীর কোনো সম্পর্ক নাই। **নিজে রহি অনশনে** ইত্যাদি—বাঙলার অন্নে পৃথিবীর মানুষের ক্ষুধা দূর হইতেছে, কিন্তু বাঙালীর অন্ন জোটে না। বঙ্গজননী নিজে অভুক্ত থাকিয়া অপরের ক্ষুধা মিটাইতেছেন। জগৎ বাঙলার অতিথি; অতিথিকে না খাওয়াইয়া গৃহিণী নিজে খাইবেন কেমন করিয়া?

ষষ্ঠ স্তবক

ছড়া—প্রভাতে গোবরমিশ্রিত জল ছিটানো। এইরূপে গৃহকে পবিত্র করা হয়। **কিরণের ছড়া** ইত্যাদি—উষা বাঙালী গৃহলক্ষ্মীর মতো সূর্যকিরণের ছড়া দিয়া বঙ্গভূমিকে পবিত্র করে। **সন্ধ্যা ধূপদীপ জ্বালি** ইত্যাদি—সন্ধ্যা হইলে বাঙলার ঘরে ঘরে মেয়েরা ধূপদীপ জ্বালাইয়া গৃহদেবতার আরতি করে। কবি মনে করেন এই আরতি বঙ্গজননীরই পূজারতি এবং ইহা করে সন্ধ্যা স্বয়ং। **অমরার পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান**—ধান ও দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করা হইয়া থাকে। দেবগণ স্বর্গপুরী অমরাবতী হইতে এই বঙ্গভূমিকে নিয়ত আশীর্বাদ করিতেছেন, তাই স্বর্গের ধান ও দূর্বা যেন এই বাঙলাদেশেই আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। সহজ কথায়, দেবগণের আশীর্বাদেই বঙ্গভূমি সুফলা, শস্যশ্যামলা। **তোমারে আশিসি পুন** ইত্যাদি—ভগবান্ তোমাকে শুধু আশীর্বাদই করেন না, তোমার মহাতপস্যায় বিস্মিত হইয়া তোমাকে ভক্তিভরে প্রণামও করেন। তুমি শুধু মানুষের নও, দেবতারও নমস্যা।

ব্যাখ্যা

(১) হিমাদ্রি তোমার শিরে………চামর ঢুলায়। (স্তবক ১)

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা' কবিতা হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। বাঙলাদেশের বর্ণনাই এই অংশটির প্রসঙ্গ।

বাঙলাদেশ কবির কল্পনায় মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার উত্তরে হিমালয়, হিমালয়ের শীর্ষে শুভ্র তুষার। এই তুষার যেন রাজরাণীস্বরূপা বাঙলা মায়ের মাথায় শ্বেতছত্র। সেই শ্বেতছত্রের ঝালরের মতো শোভা পায় মেঘের তরঙ্গমালা। বাঙলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাঙলা মায়ের পদপ্রান্ত যেন সেই নিম্নে, দক্ষিণে। বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলি অহর্নিশ গর্জন করে—যেন তাহারা একটা অজগরের লক্ষ লক্ষ ফণা। কবির কল্পনায় সাগর এইভাবে একটি বিরাট্ অজগর আর তরঙ্গমালা তাহারই লক্ষ ফণা। বসুমতী নাকি সাপের মাথায় প্রতিষ্ঠিতা। বাঙলা মা-ও তেমনি এই অজগররূপী সাগরের মাথায় দণ্ডায়মানা। বঙ্গোপসাগর এইভাবে বাঙলা মায়ের পদযুগল মাথায় ধারণ করিয়া সযত্নে ধোয়াইয়া দিতেছে। ফুলের মধুর গন্ধ সেই দেশমাতৃকার সারা অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে, কেন-না বাঙলা যে ফুলের দেশ। মন্দ বায়ু যেন মায়ের দেহে চামর দোলায়। মা যে রাজরাণী! তাই তাঁহার তুষারের রাজছত্র, বাতাসের চামর।

(২) তব মুক্তবেণীসম ………ধুলায় লুটিতে। (স্তবক ২)

এই অংশটি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত। বাঙলাদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া কবি তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন। সেই রূপবর্ণনাই উদ্ধৃত অংশের প্রসঙ্গ।

বাঙলা মায়ের শির হিমালয়ের সমুচ্চ শিখর পর্যন্ত উন্নত রহিয়াছে। সেই শিখরমালার নিম্নে বহুদূর পর্যন্ত নীল বনানীর সুগভীর ছায়া। কবির কল্পনায় উহা বাঙলামাতার বিস্রস্ত বেণী—কৃষ্ণ কুন্তলদাম। আরও নিম্নে, সমতলে গঙ্গাধারা যেন মাতার কটিতটের মেখলা। গঙ্গার নৃত্যচপল তরঙ্গমালার কলনাদ যেন সেই মেখলারই গুঞ্জনধ্বনি। বাঙলার শোভার অন্ত নাই। মাঠে মাঠে তাহার সবুজ শস্যের শ্যামলিমা, কোথাও বা পক্ব শস্যের স্বর্ণকান্তি। নদনদীময় অপূর্ব সুন্দর এই দেশ যেন একটি আনন্দময় নন্দনকানন। পাখীর কাকলীতে তাহা নিত্য মুখরিত। সবে মিলিয়া বাঙলাকে এত সুন্দর এত আনন্দ-

ময় করিয়া তুলিয়াছে যে স্বর্গ যেন এখানে নামিয়া আসে। বাঙলাই ধরার স্বর্গ —আনন্দের আর সৌন্দর্যের লীলানিকেতন।

(৩) চরে তব শ্যাম গোঠে……ও রাতুল চরণ। (স্তবক ৩)

এই অংশটি কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা' কবিতার একটি স্তবক। বাঙলার রূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই স্তবকটি যোজনা করিয়াছেন।

বাঙলাদেশ যেন মর্ত্যের স্বর্গ। তাহার শস্যশ্যাম মাঠে-প্রান্তরে গাভীকুল স্বচ্ছন্দবিহার করে। উপবনগুলি হাসিয়া উঠে কুসুমে কুসুমে। ফুল যেন কুঞ্জের প্রাণ। মাতৃস্বরূপিণী বাঙলার চরণে কুঞ্জগুলি নিত্য ফুলের অর্ঘ্যে প্রণাম নিবেদন করে। মা আমাদের রাজরাণী। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যরশ্মি রক্ত-আভায় যেন পদ্ম হইয়া ফোটে। সূর্য যেন সেই আলোক-পদ্ম মাতার হাতে উপহার দেয়। সন্ধ্যার পর বিমল জ্যোৎস্না আবছা আলোর স্বপ্নময় মায়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। জ্যোৎস্নার অস্ফুট আলোক যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি। জ্যোৎস্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো সেই ঝাঁপি-হাতে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে, বাঙলা মায়ের রক্তবরণ চরণ-দুখানিতে আলতা পরাইয়া দিতে।

(৪) ব্রহ্মপুত্র দামোদর……শীতল পানীয়। (স্তবক ৪)

এই অংশটি কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। বাঙলাদেশের রূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই স্তবকে বাঙলার নদ-নদী ও প্রকৃতির বিচিত্র রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বাঙলার রূপ কবির কল্পনায় রাণীমূর্তিরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ও দামোদর এই দুইটি নদ যেন সেই রাণী মায়ের বৈতালিক। তাহারা মধুর কলতানে প্রতি প্রত্যূষে রাণীর ঘুম ভাঙায়। পদ্মা নদীটি যেন রাজনর্তকী। ঝড়ের সঙ্গে উহা নৃত্য করে। পদ্মার মাথায় যেন বজ্র আর শিলা—ইহা লইয়া ঝড় পদ্মায় বিপুল তরঙ্গ তোলে। কবিকল্পনায় ইহা যেন পদ্মার নাচ। অজয় আর ভৈরব—এই নদ দুইটি ঘোর গর্জন করিয়া প্রবাহিত হয়, যেন বাঙলা-রাণীর জয়বার্তা ঘোষণা করিয়া তাহারা তূরী বাজায়। আকাশে মেঘমালা যেন ধারা-যন্ত্রবিশেষ, তাহা হইতে নিরন্তর নির্ঝরিত হয় জলরাশি। সে জলধারা তো জলধারা নয়—স্বর্গের সুধা। সেই সুধার অভিষেকে বাঙলার মাঠে মাঠে শস্য জন্মে আর সেই শস্য ক্ষুধিতের অন্ন যোগায়। এই বৃষ্টিধারাই জলাশয়গুলি পূর্ণ করিয়া তোলে এবং তৃষাতুরের জন্য শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা করে।

(৫) **নিখিলসাগর-অঙ্কে……জগতের ক্ষুধা!** (স্তবক ৫)

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা' কবিতা হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। এই অংশে কবি বাঙলাদেশকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

সাগরসম্ভূতা এই বাঙলা অনন্তবিস্তার সাগরের কোলে যেন লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করে। সিংহলের পথে একস্থলে ধনপতি সদাগর পদ্মে আসীনা এক অপূর্ব দেবীমূর্তি দেখিয়াছিলেন। বাঙলা যেন সেইরূপ সমুদ্রের ক্রোড়ে কমলে অধিষ্ঠিতা লক্ষ্মীরূপিণী। বাঙলার অজস্র পদ্মের মধ্যে বসিয়া তিনি যেন দিবারাত্রি কি এক মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন। বাঙলার সমৃদ্ধি ও বাঙলার সাধনার সিদ্ধি—এই দুইটি হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া শুঁড়ের সাহায্যে একটি ঘট এই লক্ষ্মীমূর্তির মাথার উপর ধরিয়াছে। এই ঘট শান্তির ঘট, মঙ্গলঘট। ইহাতে সঞ্চিত আছে দেবতাদের চরণধোয়া জল। বাঙলা মায়ের মাথায় সেই পবিত্র জল আশীর্বাদের মতো নিয়ত ঝরিয়া পড়িতেছে। কবি বোধ হয় হস্তিরূপী মেঘকেই বাঙলার ঋদ্ধি ও সিদ্ধি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সেই মেঘের ধারাবর্ষণ বাঙলার সকল সমৃদ্ধি ও সাধনার পরিপোষক। তাহারই কৃপায় বাঙলা শস্যশ্যামলা। বাঙলার অন্ন দেশে দেশে মানুষের ক্ষুধা হরণ করে। কিন্তু দুঃখের কথা, বাঙালী তাহা ভোগ করিতে পারে না। বাঙলাদেশে অনাহার আর উপবাস লাগিয়াই আছে। এই সত্যটাকেই কবি এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন বাঙালীর মা, লক্ষ্মীরূপিণী মায়ের উপবাসের কথায়। মা যেন নিজে উপবাসী থাকিয়াও জগতের মানুষকে খাওয়াইতেছেন! ইহাতে বাঙলার আতিথ্যের তথা পরার্থপরতার গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে।

[কমলে কামিনী, পদ্মাসন, ঋদ্ধি সিদ্ধি—এই অংশগুলির উপর টীকা লেখ।]

(৬) **কিরণের ছড়া…………আপনি ভগবান।** (স্তবক ৬)

এই অংশটি কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা'-শীর্ষক কবিতার শেষ স্তবক। বাঙলার রূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি আলোচ্য বিবরণ দিয়াছেন।

বাঙলাদেশ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী, রাজরাজেশ্বরী। প্রতিদিন সূর্যোদয়মাত্র উষাদেবী যেন আলোর ছটা ছড়াইয়া লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানস্থল এই বাঙলার চারিদিকে ছড়া দেয়,—প্রতিদিন ভোরে বাঙালী ঘরনী যেমন করিয়া গোবরছড়া দেয় ঠিক সেইভাবেই। দিবাশেষে সন্ধ্যা আসে মায়ের আরতিরই জন্য। তখন সারা দেশ জুড়িয়া ধূপদীপ জলে আর অসংখ্য শঙ্খের উদাত্ত নির্ঘোষ আকাশে উঠে।

এ যেন সন্ধ্যাকর্তৃক বঙ্গদেবীর আরতি-উৎসব। বাঙলা মায়ের এইভাবেই আরতি হয়। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খের শব্দে যেন 'মা' স্বরটিই ঘোষিত হয়—যেন লক্ষ শঙ্খের বিপুল ধ্বনিতে মায়ের প্রতি একটা আহ্বান আকাশে উঠে। বাঙলাদেশ সত্যই অপূর্ব দেশ। স্বর্গলোকের অফুরন্ত আশীর্বাদ এই দেশের উপর। আর সেই আশীর্বাদের প্রতীক ধানদূর্বা অহর্নিশ এই দেশে ঝরিয়া পড়ে। বস্তুতঃ, বাঙলা যেন স্বর্গের সেই ধানদূর্বাতেই গড়া। তাই বাঙলা শস্যশ্যামলা, ধনধান্যে পূর্ণা। এই বাঙলা শুধু ভগবানের আশীর্বাদ-পুষ্টই নহে, ভগবানের শ্রদ্ধাভাজনও বটে। বাঙলার পুণ্য বাঙলাকে দেবতাদেরও নমস্য করিয়া রাখিয়াছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 'বাঙালীর মা'-র যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। 'বাঙালীর মা' কবিতাটির শিরোনামের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ.। উৎস ও নামকরণ দেখ।

প্র. ৩। "তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান,
তোমারে আশিসি পুন নমেন আপনি ভগবান।"

—যাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে তাঁহার রূপ বর্ণনা কর এবং এই অংশটির অর্থ স্পষ্ট কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসারের পরে ৬নং **ব্যাখ্যার** শেষাংশ যোগ কর।

প্র. ৪। কবি প্রমথনাথ চৌধুরীর রায় 'বাঙালীর মা' কবিতাটির বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ হিমাদ্রি = হিম + অদ্রি। পদ্মাসন = পদ্ম + আসন। পাদোদক = পাদ + উদক।

সমাস ঃ শ্বেতছত্র—শ্বেত যে ছত্র (কর্মধারয়)। লক্ষফণা—লক্ষ ফণা

যাহার (বহুব্রীহি), সে। বঙ্গসিন্ধু—বঙ্গ-নামক সিন্ধু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। পদযুগ—পদের যুগ অর্থাৎ যুগল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। মুক্তবেণীসম—মুক্ত যে বেণী (কর্মধারয়); তাহার সম (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। আনন্দ-ভুবন—আনন্দময় ভুবন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। পাদপদ্মে—পাদ পদ্মের ন্যায় (উপমিত-কর্মধারয়), তাহাতে। কিরণকমল—কিরণরূপ কমল (রূপক-কর্মধারয়)। অলক্তরাগে—অলক্তের রাগ অর্থাৎ রঙ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। বিজয়তূরী—বিজয়সূচক তূরী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মেঘধারাযন্ত্রে—ধারাক্ষেপক যন্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); মেঘরূপ ধারাযন্ত্র (রূপক-কর্মধারয়), তাহাতে। পদ্মাসনে—পদ্মই আসন (কর্মধারয়), তাহাতে। দিবসযামিনী—দিবস এবং যামিনী (দ্বন্দ্ব)। পাদোদকসুধা—পদ-স্পৃষ্ট উদক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহাই সুধা (কর্মধারয়)। অনশন—নয় অশন (নঞ্‌ তৎপুরুষ), তাহাতে। শান্তিঘট—শান্তিপূর্ণ ঘট (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

সাধু পদ্য-রূপ ঃ তায়—তাহাতে। খেলি—খেলিয়া। রাখি—রাখিয়া। যতনে—যত্নে। তব—তোমার। বেড়ি—বেড়িয়া। ধ্বনিতেছে—ধ্বনিত হইতেছে। পরান—প্রাণ। ল'য়ে—লইয়া। রঞ্জিতে—রঞ্জিত করিতে। ঝঞ্ঝা-সনে—ঝঞ্ঝার সহিত। ঝরিছে—ঝরিতেছে। অমিয়—অমৃত ('অমিয়'-ও গদ্যে না চলে এমন নয়, তবে কম)। ক্ষুধিতে—ক্ষুধিতকে। পিপাসিতে—পিপাসিতকে। বসে—বসিয়া। ধরে—ধরিয়া। রহি—রহিয়া। হরিতেছ—হরণ করিতেছ। দিয়ে—দিয়া। জ্বলি—জ্বলিয়া। আসি—আসিয়া। তোমারে—তোমাকে। আশিসি—আশিস্ দিয়া বা আশীর্বাদ করিয়া। নমেন—নমস্কার করেন।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : ক্ষুধিত—ক্ষুধা+ইতচ্। পিপাসিত—পিপাসা (পা+সন্+অ ভাববাচ্যে+স্ত্রীলিঙ্গে আ)+ইতচ্। পুঞ্জীভূত—পুঞ্জ+চ্বি (অভূত-তদ্ভাবে)+ভূ+ক্ত। আমোদিত—আ—মুদ্+ক্ত। ঝাঁপি—ঝাঁপ+ই। ঋদ্ধি—ঋধ্+ক্তিন্।

কারক ও বিভক্তি ঃ 'অঙ্গে অঙ্গে' পুষ্পগন্ধ (অধিকরণে-এ)। আনন্দভুবন তব আমোদিত 'কলকলগীতে' (করণে-এ)। কুঞ্জ দেয় 'ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে' পরান অঞ্জলি (প্রথমটিতে করণে-এ, দ্বিতীয়টিতে সম্প্রদানে-এ) রঞ্জিতে 'অলক্তরাগে' তোমার ও রাতুল 'চরণ' (প্রথমটিতে করণে-এ, দ্বিতীয়টিতে

কর্মে শূন্য বিভক্তি)। 'ক্ষুধিতে' জোগায় অন্ন (সম্প্রদানে-এ, কারণ 'জোগায়' ক্রিয়াটি দানার্থক)। 'মেঘধারাযন্ত্রে' ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয় (অপাদানে-এ)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ : আমোদিত, পাদপদ্ম, রাতুল, বৈতালিক, পুঞ্জীভূত।

সমস্তপদ-গঠন : জগতের ক্ষুধা = জগৎক্ষুধা। দূর্বা আর ধান = ধানদূর্বা ('দূর্বাধান' নয়)।

ব্যাকরণগত টীকা : লক্ষফণা—'লক্ষফণা' যাহার' এই ব্যাসবাক্যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদটি হওয়া উচিত 'লক্ষফণা' (যেমন 'কৃতবিদ্য'), কারণ ইহা পুংলিঙ্গ 'অজগর' শব্দের বিশেষণ।

যতনে—যত্নে > যতনে : বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।

ধ্বনিতেছে—সংস্কৃত 'ধ্বন্' ধাতু হইতে সৃষ্ট বাঙলা ক্রিয়া, কেবল পদ্যে চলে।

হিরণ=মূল কথাটি 'হিরণ্য'; ইহার ধ্বনিটিকে কোমল করিবার জন্য য-ফলাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

'ধবলী, 'শ্যামলী—গাভী (স্ত্রীলিঙ্গ)-র নাম বলিয়া শব্দদুটি স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু 'ধবল' এবং 'শ্যামল'-এর স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ যথাক্রমে 'ধবলা' এবং 'শ্যামলা'। বাংলায় অবশ্য শ্রুতিমধুরতার জন্য দীর্ঘ ঈ-কারই বহুকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ফুলপুঞ্জে—'ফুল' শব্দটি অতৎসম এবং 'পুঞ্জ' তৎসম। তৎসম এবং অতৎসম শব্দের সমাস করা উচিত না হইলেও অনেকেই করিয়াছেন। অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে 'পুষ্পপুঞ্জে' (দুটিই তৎসম) করিলে কিছু ক্ষতি তো ছিলই না, বরং লাভই হইত।

রঞ্জিতে—রঞ্জ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইতে। এইরূপ ক্রিয়াপদ কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।

অমরা—কথাটি 'অমরাবতী'র সংক্ষিপ্ত রূপ। সংক্ষেপ ছন্দের প্রয়োজনে।

আশিসি—'আশিস' নামশব্দটি বিনা প্রত্যয়েই ধাতু হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এটি নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ।

নমেন—নম্ (সংস্কৃত ধাতু)+এন—কেবলমাত্র পদ্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ।

জীবন-ভিক্ষা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

করুণানিধানের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ভাষা ও ছন্দের সৌষ্ঠব। বর্ণনায় তিনি রূপকার, ভাবাবেগের প্রাবল্য কখনও তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় না। প্রকৃতিকে তিনি ভাষার চিত্রে ও মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে পারেন। এই রূপায়ণ তাঁহার—"ফুলের ন্যায় কোমল ও নির্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোচ্ছল, এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান্।" এই সৌন্দর্যের সহিত একাত্ম হইয়া বিরাজ করে ছন্দোমাধুর্য। বস্তুতঃ "তাঁহার কাব্য পাঠকালে মনে হয়, শব্দের অক্ষরগুলি পর্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ভাষা-সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত সচেতনতায় তাঁহার কাব্যে ভাবের প্রাবল্য অপেক্ষা সৌকুমার্য ও কোমলতাই সমধিক সঞ্চারিত হইয়াছে।" কিন্তু করুণানিধানের কবিতা কেবল ভাষা ও ছন্দের কারিগরিমাত্র নহে। উহার পশ্চাতে একটা বিশেষ ধরনের অনুভূতি যে সক্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাব্যে ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারে গঠিত ভাবের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি সদাসচেতন কবিমানসের নিছক যন্ত্র-প্রসারিত সৃষ্টি নহে। উহা কবির সৌন্দর্যরসাবিষ্ট অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত রসোল্লাস।

উৎস ও নামকরণ—কবির 'ধান-দূর্বা'-নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে আলোচ্যমান কবিতাটি সংকলিত।

একটি বৌদ্ধকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কবিতাটি রচিত। কিসা গোতমী নামে জনৈকা রমণী মৃতপুত্রের পুনর্জীবনের জন্য গৌতম বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব সেই রমণীকে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই এমন কোনো বাড়ী হইতে একমুষ্টি সরিষা আনিতে বলেন এবং সেই সরিষায় উহার মৃতপুত্রের জীবন দান করিবেন বলিয়া জানান। কিসা গোতমী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হতাশ হইলেন। দেখিলেন মৃত্যুর অধিকার সর্বত্র। ফলে এই মরজগতে পুত্রের জীবন-ভিক্ষার বাসনা তাঁহার মন হইতে চলিয়া গেল। তিনি বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। জীবন-ভিক্ষার সূত্রে এইভাবে কিসা গোতমীর জীবনের গতি

ফিরিল। ইহাই কবিতাটির বিষয়বস্তু। জীবন-ভিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই কাহিনীটি রচিত বলিয়া কবিতাটির আলোচ্যমান শীর্ষনাম হইয়াছে। সুতরাং বিষয়বস্তুর সহিত উহা সম্পূর্ণ সুসংগত।

সমালোচনা—'জীবন-ভিক্ষা' কবিতাটি করুণানিধানের কবিকর্মের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গভীর আধ্যাত্মিকতা অন্যত্র কবির কাব্যে একটু বেসুরা বাজে; কিন্তু আলোচ্যমান কবিতায় ইহা ভাব ও বিষয়ের সহিত এক অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। পুত্রশোকাতুরা জননীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অশোক সত্যধর্মে দীক্ষা—ইহাই কবিতাটির নিষ্কর্ষ। কাজেই প্রথমাংশে শোক-বিধুর মাতার বিলাপে উদ্বেল উচ্ছ্বাস নাই। উহাতে স্থির ও শান্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; অস্থির অশ্রুপ্রবাহের অশান্ত আবেগ বহে নাই। এইজন্যই কবিতাটির প্রথম চারিটি স্তবক এই শোকবর্ণনায় নিয়োজিত হইলেও অবশিষ্ট দুইটি স্তবকের সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দীক্ষার বিবরণটি সুসমঞ্জসভাবে সম্পূর্ণ ও সমাহৃত হইতে পারিয়াছে।

করুণানিধান কবিহিসাবে প্রধানতঃ রূপকার। আলোচ্যমান কবিতার মধ্যেও আমরা তাঁহার এই পরিচয় সর্বত্রই পাই। প্রথম স্তবকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে মৃতপুত্র-বক্ষে শোকার্ত জননীর একটি অপূর্ব নিশ্চল মূর্তি। ইহাতে দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরিবার বিলাপ থাকিলেও এই মূর্তিটিতে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই; মাতার বক্ষে মৃতপুত্রের অসাড় দেহ, চক্ষে তাহার বিগলিত শোকাশ্রু, পুত্রের মুখ হইতে সদ্য চুম্বনমুক্ত তাঁহার স্ফুরিতাধর। আনত দৃষ্টি একাগ্র রহিয়াছে বক্ষাশ্রিত প্রাণের দুলালের উপর। প্রথম স্তবকে এই অবস্থাতেই মূর্ত জননীর রূপ। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে স্পষ্টতর হইয়াছে মৃতশিশুর নিথর ও বিবর্ণ রূপ। এই রূপসৃষ্টির জন্য কবি প্রত্যক্ষ বর্ণনা করেন নাই। মাতার বিলাপের মধ্য দিয়া ইহা আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিলাপে 'কোথা সে মাধুরী আধ আধ বোলে' ভিন্ন সর্বত্রই নয়নগ্রাহ্য বর্ণনা দেখিতে পাই।

কবিতাটির ছন্দোবৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ ভাবসংগত। ধীরগম্ভীর ভাবোদ্দীপক উহার ধ্বনি, গতি মন্থর।

সর্বশেষে একটি কথা অবশ্যস্বীকার্য যে কবিতাটির প্রথম ভাগে যেখানে শোকানুভূতির তীব্রতা বিশেষ ভাবে স্বাভাবিক, সেইখানেও কবির সুকুমার রূপসৃষ্টির প্রয়াস কবিতাটির মধ্যে আবেগের অভাব ঘটাইয়াছে; পুত্রহীনা মাতার এত কথার মধ্যে এত সজীব রূপ মূর্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তেমন

একটা বেদনা-গভীর সুর ব্যঞ্জিত হয় নাই। কাজেই কবিতাটি নয়নকে যতই তৃপ্তি দান করুক, হৃদয়কে সেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করে না। যেটুকু করে সেটুকু মূলতঃ কাহিনীর মাহাত্ম্যেই, কবির আবেগস্পর্শে নহে।

সংক্ষিপ্তসার—বুদ্ধদেবের নিকট মৃতপুত্র-বক্ষে কিসা গোতমী বলিতেছেন—আমার স্নেহের দুলাল পুত্রটিকে সাবধানে বুকে ধরিয়া সাশ্রুনেত্রে মন্দিরে মন্দিরে কাঁদিয়া ফিরিতেছি। পুত্র আমার শতচুম্বনেও চোখ মেলে না। মৃত্যু আসিয়া ভাগ্যহীনার অঞ্চলের নিধিটিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। পুত্র স্তন্যপান বন্ধ করিয়াছে—জানি না মাতৃদুগ্ধ আজ তাহার রসনায় তিক্ত লাগিতেছে কিনা, অথবা অন্য কোনো মধুরস তাহাকে সিক্ত করিয়াছে কিনা। মুখ তাহার বিবর্ণ, ওষ্ঠাধর শুষ্ক। জানি না কি পাপে তাহার মুখখানি কান্তিহীন হইয়াছে। তাহার অর্ধস্ফুট কথা থামিয়া গিয়াছে; দন্তপঙ্‌ক্তি আর বিমল হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না। চক্ষুও তাহার দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছে। তুমি যদি একবার আমার বাছার দেহ স্পর্শ কর, তবেই সে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে; তুমি এই ধরণীর ধূলির উপর পদ্মাসনে বসিয়া জীবের ত্রিবিধ দুঃখ দূর করিবার জন্য দুষ্কর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছ। তোমার তপস্যার বলে আমার পুত্রের প্রাণ ফিরাইয়া দাও—এইরূপ বলিতে বলিতে আলুলায়িতকেশা গোতমী বুদ্ধের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন।

বুদ্ধদেব তখন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার পুত্র চিরশান্তিময় মৃত্যুর কোলে আশ্রয়লাভ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তবে, যেখানে কেহ কোনোদিন শোক পায় নাই এমন গৃহ হইতে খানিকটা সরিষা আনিতে পারিলে, তাহার স্পর্শে গোতমীর মৃতপুত্র পুনর্জীবন লাভ করিবে।

গোতমী নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। অবশেষে বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার চরম জ্ঞানলাভ হইয়াছে। পুত্রের জীবনে আর তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি শুনিয়াছেন গৃহে গৃহে শোকের হাহাকার। বুদ্ধদেবকে মানুষের এই শোক-বেদনা দূর করিতে হইবে—তাহারই সাধনায় গোতমী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

অন্বয়মুখী অর্থঃ—আমি স্নেহের দুলালকে বুকে আগলাইয়া মন্দিরে মন্দিরে কাঁদিয়া ফিরিতেছি। চোখে আমার মৃত্যুজনিত অশ্রুধারা বেগে বহিতেছে। আমার অঞ্চলের নিধি চুরি গিয়াছে—সে শতচুমাতেও চোখ মেলে

না। মরণরূপ বাজপাখার পক্ষের আঘাতে ভাগ্যহীনা পক্ষিরূপিণী আমি আহত। (স্তবক ১)

আজ কি বাছার মুখে স্তনদুগ্ধ তিক্ত লাগিয়াছে? তাহার জিহ্বারূপ ফুলটি কোন্ প্রসাদ-মধুতে সিক্ত? চাঁপাফুলের মতো মুখখানিতে তাহার মরুভূমির বিবর্ণতা ওষ্ঠরূপ পদ্মফুলের পাপড়িগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। যে চন্দ্র আমার প্রাণতুল্য, তাহা কি পাপে জ্যোৎস্না-শূন্য হইয়াছে? (স্তবক ২)

সেই আধো আধো কথার মাধুর্য কই? বোঁটা হইতে ছিঁড়িয়া-লওয়া কুন্দফুলটির মতো শুভ্র তাহার দাঁতগুলিতে পবিত্র হাসির সেই ছটা কোথায়? প্রভু, জানি তোমার করস্পর্শে আমার ননীর পুতুল জাগিয়া উঠিবে। কোন্ নিষ্ঠুর বিষবাণ হানিয়া আমার বাছার চক্ষুতারকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে? (স্তবক ৩)

পৃথিবীতে পদ্মাসনে বসিয়া তুমি জীবের বিবিধ দুঃখ দূর করিয়াছ। যে পথে তুমি যাত্রা করিয়াছ, তাহা সংকীর্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম। তোমার কামনাবিজয় ও তপঃশক্তিতে আমার কুমারকে প্রাণ দাও।—এই বলিয়া যুবতী আলুলায়িত রুক্ষকেশে বুদ্ধদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। (স্তবক ৪)

বুদ্ধ বলিলেন—তোমার পুত্র চিরমৌন সমাধিতে মগ্ন হইয়া চিরসুন্দর মৃত্যুর মাহেন্দ্রক্ষণটিকে বরণ করিয়াছে। যদি কোথাও শোকহীন গৃহ থাকে, সেখান হইতে খানিকটা সরিষা ভিক্ষা করিয়া আন। তাহারই স্পর্শে মৃতপুত্রের ভগ্ন প্রাণরূপ মৃণালটি নূতন হইয়া দুলিয়া উঠিবে। (স্তবক ৫)

গোতমী বিশাল নগরীর দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন—কেহই ভিক্ষা দিল না। অবশেষে বুদ্ধের পদপ্রান্তে আসিয়া তিনি নিবেদন করিলেন—আমি শেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি। পুত্রকে বাঁচাইবার প্রয়োজন আর আমার নাই। গৃহে গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। পৃথিবীর শোকদুঃখ তুমি দূর কর, আমাকে মৃত্যুজয়ের সাধনায় দীক্ষিত কর। (স্তবক ৬)

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

দেউল—মন্দির। দুলালে আগলি বক্ষ—আমার স্নেহের দুলাল পুত্রটিকে সাবধানে বুকে চাপিয়া ধরিয়া। **বিয়োগ-উৎস-সরিৎ**—মৃত্যুরূপ উৎস হইতে বাহির হইয়াছে যে ধারা অর্থাৎ মৃত্যু যে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছে। দরবিগলিত

—সবেগে বহমান। **শতচুম্বনে মেলে না নয়ন**—আগে যে একটি চুমু দিতেই চোখে-মুখে হাসির ছটায় ফাটিয়া পড়িত, এখন সে শতচুম্বনেও নিথর নিস্তব্ধ। তাই এ দৃশ্য স্বভাবতঃই মাতার সহনাতীত। আঁচলের ধন—অঞ্চলের নিধি, পুত্ররূপ অমূল্য সম্পদ্। **অভাগী বিহগী আভিকে** ইত্যাদি—গোতমী এখানে নিজেকে পক্ষিণীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্যুরূপী বাজপাখী আসিয়া যেন তাঁহার শিশু-শাবকটিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার বিপুল পক্ষের আঘাতে তাঁহাকেও ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। তাঁহাকে যুগপৎ দুইটি আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া তিনি 'অভাগী', ভাগ্যহীনা।

দ্বিতীয় স্তবক

স্তনক্ষীরধার—মাতৃদুগ্ধের ধারা। **অধরে**—ঠোঁটে। প্রকৃতপক্ষে স্বাদগ্রহণের ইন্দ্রিয় অধর নয়—জিহ্বা। রসনা-প্রসূন—জিহ্বারূপ ফুল। কোন্ পরসাদ্-মধুরসে—কাহার অনুগ্রহরূপ মধুতে। **রসনা-প্রসূনা........পরিষিক্ত?**—শিশুর ফুলের মতো জিহ্বাটি মাতৃস্তন্যের মধুতে সিক্ত থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। গোতমীর প্রশ্ন: মাতৃস্তন্য পান না করিয়া সে কাহার প্রসাদের মধুর রসে নিজ জিহ্বা সিক্ত করিয়াছে? মুখ-চম্পক—মুখরূপ চাঁপাফুল। মরুর বর্ণ—মরুভূমির বিবর্ণতা অর্থাৎ শুষ্ক এবং ম্লান। অধরকমলপর্ণ—অধর (ঠোঁট)-রূপ পদ্মফুলের পাপড়ি। প্রাণের ইন্দু—প্রাণরূপ চন্দ্র। **পীযুষ-বিন্দুরিক্ত**—অমৃত জ্যোৎস্নাহীন ও ম্লান।

তৃতীয় স্তবক

মাধুরী—মধুরতা, মাধুর্য। আধো আধো বোলে—শিশুর অস্ফুট কথায়। কুন্দ—একপ্রকার সাদা ফুল। তুলনীয়: "যা কুন্দেন্দুতুষারধবলা" ইত্যাদি। **বৃন্ত-ছিন্ন**—বোঁটা হইতে ছেঁড়া। **দন্তরুচি**—দাঁতের সৌন্দর্য। **কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন?**—শিশুর পবিত্র হাসির দ্বারা উদ্ভাসিত সে দন্তশোভা আর কোথায়? **পাণি**—হাত। তুলনীয়: "আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার কমল-কোমল পাণি"—রবীন্দ্রনাথ। ননীর পুতলি—ননীর পুতুলের মতো কোমলদেহ পুত্রটি। **জাগিবে হরষে**—জীবন ফিরিয়া পাইয়া মৃত্যুনিদ্রা হইতে সানন্দে জাগিয়া উঠিবে। পাষাণ—নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। বিষবাণ—বিষাক্ত শর। **তার নয়নের মণি ভিন্ন**—তাহার চোখের তারা বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়াছে।

চতুর্থ স্তবক

অবনীর এই পদ্মবেদীতে—ধরণীর ধূলির উপর পদ্মাসনে বসিয়া। যোগ-সাধনায় বসিবার একপ্রকার ভঙ্গিকে পদ্মাসন বলে। **হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ**—মানুষের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দূর করিলে। **দুরগম পদ ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম**—জীবের দুঃখ দূর করিবার সাধনায় গৌতম বুদ্ধ যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা ক্ষুরের শাণিত ধারের ন্যায় সংকীর্ণ ও দুর্গম। তুলনীয়ঃ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"—উপনিষৎ। **লক্ষণীয়ঃ** করুণানিধান প্রধানতঃ রূপের কবি। তাই যেখানেই তিনি তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া তত্ত্বের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানেই একটা অসামঞ্জস্য ও গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। না হইলে নাস্তিক নির্বাণ-সাধক শূন্যবাদী গৌতম বুদ্ধকে দিয়া তিনি ঔপনিষদিক অমৃতসাধনা করাইতেন না। মহানির্বাণ—কামনাবিজয়ের ফলে জন্মান্তর-জয়।

পঞ্চম স্তবক

নীরব-সমাধি-মগ্ন—মৃত্যুর চিরমৌন মহানিদ্রায় অভিভূত। **বরণ করেছে চিরসুন্দর** ইত্যাদি—যে মৃত্যু চিরবাঞ্ছিত নির্বাণের দ্বার, সেই মহাসুন্দরকেই বরণ করিয়াছে; মৃত্যুর শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছে। **অশোকনিলয়**—যে গৃহে কেহ কোনদিন শোক পায় নাই অর্থাৎ যে গৃহে কেহ কোনদিন মরে নাই। সর্ষপচয়—কতকটা সরিষা। চয়=সমূহ। **পরান-মৃণাল ভগ্ন**—প্রাণরূপ পদ্মের ভাঙা-ডাঁটাটি। **পরশে তাহার···ভগ্ন**—শোকহীন গৃহ হইতে একমুষ্টি সরিষা আনিতে পারিলে তাহারই স্পর্শে গোতমীর মৃতপুত্র প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।

ষষ্ঠ স্তবক

শিখাইলে শেষ শিক্ষা—তোমার কাছেই আমি জীবনের পরমজ্ঞান লাভ করিলাম—বুঝিলাম যে, মৃত্যু ও শোক মানুষের অপরিহার্য দুর্ভাগ্য। **জীয়াতে**—পুনর্জীবিত করিতে। হরো—দূর কর। **বিরহ-আঁধার**—মৃত্যুজনিত শোকের অন্ধকার। **অমৃতদীক্ষা**—মৃত্যুকে জয় করার সাধনায় দীক্ষা, নির্বাণের সাধনায় দীক্ষা।

ব্যাখ্যা

(১) অবনীর এই পদ্মবেদীতে···আলুথালু কেশ রুক্ষ। (স্তবক ৪)

এই অংশটি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন-ভিক্ষা'-শীর্ষক কবিতার একটি স্তবক। কিসা-গোতমী নাম্নী জনৈকা রমণী মৃতপুত্রের প্রাণভিক্ষা-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রতি আলোচ্যমান অংশের প্রার্থনাটি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব জগতের যাবতীয় দুঃখ দূর করিবার জন্য কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘ ছয় বৎসরকালের সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। এই সিদ্ধির ফলে তিনি সুখ-দুঃখের মূল কারণ কামনাকে জয় করেন। ইহারই নাম মহানির্বাণলাভ। বুদ্ধদেব তাঁহার সাধনার ফলশ্রুতিটুকু সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিনপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। এই মরজগতেরই একস্থলে যোগাসনে বসিয়া তিনি এই অসাধ্যসাধন করিয়াছেন এবং তাহার পরও অতিশয় কষ্টসাধ্য দুরূহ সাধনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এমন যে সিদ্ধপুরুষ, তিনি নিশ্চয়ই তাহার তপোবলে কিসা-গোতমীর মৃতপুত্রের প্রাণ ফিরাইয়া দিতে পারেন। এই স্থির বিশ্বাস লইয়াই গোতমী বুদ্ধের চরণে লুটাইয়া পড়েন: শোকে দুঃখে আলুথালু তাঁহার চুল, আকুলতা-ভরা তাঁহার এই কাতর মিনতি।

[পদ্মবেদীতে, ত্রিতাপ, দুরগম.. সূক্ষ্ম, মহানির্বাণ—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(২) বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে··· দাও গো অমৃতদীক্ষা। (স্তবক ৬)

এই অংশটি কবি করুণানিধানের 'জীবন-ভিক্ষা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। এস্থলে পুত্রশোক ভুলিয়া কিসা-গোতমী নাম্নী রমণী বুদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

গোতমী পুত্রের পুনর্জীবনের জন্য বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই এমন গৃহ হইতে একমুষ্টি সরিষা আনিতে বলেন। কিন্তু সারা নগরীর গৃহে গৃহে ঘুরিয়াও গোতমী ব্যর্থকাম হইলেন। এমন গৃহ নাই যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তাই কেহ তাঁহাকে সরিষা ভিক্ষা দিল না। এই অভিজ্ঞতা গোতমীর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় উপলব্ধির সঞ্চার করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মৃত্যুশোক মানুষমাত্রেরই অনিবার্য দুর্ভাগ্য। ইহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুদ্ধদেবের

নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সরিষা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়া বুদ্ধদেব যে সুকৌশলে এই শিক্ষাই দিলেন তাহা গোতমী এইবার বুঝিলেন এবং বুঝিবামাত্র এই দুঃখতাপময় মরজগতে পুত্রকে পুনরায় বাঁচাইতে তাঁহার আর ইচ্ছা রহিল না। কারণ, দুঃখের সংসার হইতে মৃত্যুর পথে যে একবার মুক্তি পাইয়াছে, তাহাকে পুনর্জীবিত করার অর্থ আবার দুঃখভোগ করিতেই ফিরাইয়া আনা। তাই গোতমী পুত্রের মরণকে এতক্ষণে বাঞ্ছনীয়ই মনে করিতে লাগিলেন এবং এ জগতের দুঃখজ্বালা হইতে নিজের মুক্তি পাইবার জন্য বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা চাহিলেন। তিনি বুঝিলেন, দুঃখ দূর করিবার জন্য বুদ্ধদেব এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই তাঁহার ন্যায় বিয়োগব্যথায় যাহারা ব্যথী, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যও গোতমী জানাইলেন সশ্রদ্ধ প্রার্থনা।

[শেষ শিক্ষা, বিরহ-আঁধার ও অমৃতদীক্ষা—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জীবন-ভিক্ষা কবিতাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জীবন-ভিক্ষা কবিতার মধ্যে যে চিত্রটি ফুটিয়াছে তাহা নিজের ভাষায় প্রস্ফুটিত কর।

উ.। সমালোচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং **সংক্ষিপ্তসারের** প্রথমাংশ দেখিয়া উত্তর সংকলন কর।

প্র. ৩। কবি করুণানিধানের ‘জীবন-ভিক্ষা’ কবিতাটির প্রধান বিশেষত্বগুলি উল্লেখ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি : (ক) তপোবল = তপঃ + বল। নীরব = নিঃ + রব। **(খ)** বিয়োগ-উৎস-সরিৎ = বিয়োগোৎস-সরিৎ।

সমাস: বিয়োগ-উৎস-সরিৎ—বিয়োগ উৎস যাহার (বহুব্রীহি); সেইরূপ সরিৎ (কর্মধারয়)। মরণ-শ্যেনের—মরণরূপ শ্যেন (রূপক-কর্মধারয়) তাহার। রসনা-প্রসূন—রসনা-রূপ প্রসূন (রূপক-কর্মধারয়)। পরসাদ-মধুরসে—মধু অর্থাৎ মধুর যে রস (কর্মধারয়); পরসাদ অর্থাৎ প্রসাদের মধুরস (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। মুখচম্পকে—মুখরূপ চম্পক (রূপক-কর্মধারয়), তাহাতে। অধরকমলপর্ণ—অধররূপ কমল (রূপক-কর্মধারয়); তাহার পর্ণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। পীযূষবিন্দুরিক্ত—পীযূষের বিন্দু (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা রিক্ত (৩য়া তৎপুরুষ)। দন্তরুচিতে—দন্তের রুচি অর্থাৎ দীপ্তি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। বিষবাণে—বিষ-দগ্ধ বাণ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) তাহাতে। ত্রিতাপদুঃখ—ত্রি অর্থাৎ তিন তাপ (দ্বিগু); তজ্জনিত দুঃখ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। ক্ষুরধারসম—ক্ষুরের ধার অর্থাৎ ধারা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার সম (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। নীরব-সমাধি-মগ্ন—নিঃ অর্থাৎ নাই রব যাহার (বহুব্রীহি); নীরব যে সমাধি (কর্মধারয়); তাহাতে মগ্ন (৭মীতৎপুরুষ)। চিরসুন্দর—চির (-কাল) ব্যাপিয়া সুন্দর (২য়াতৎপুরুষ)। অশোকনিলয়—নাই শোক যাহাতে (নঞ্‌ বহুব্রীহি); অশোক যে নিলয় (কর্মধারয়)। সর্ষপচয়—সর্ষপের চয় (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। পরান-মৃণাল—পরান রূপ মৃণাল (রূপক-কর্মধারয়)। বিরহ-আঁধার—বিরহজনিত আঁধার (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

সাধু গদ্য-রূপ: আগলি'—আগলাইয়া। আজিকে—আজ। পরশে—স্পর্শে। হরষে—হর্ষে। দুরগম—দুর্গম। কোথা—কোথাও (কোথায়ও)। মাগি—মাগিয়া (বা, চাহিয়া)। নিবেদিল—নিবেদন করিল। জীয়াতে—জীয়াইতে (বা, জীবিত করিতে)।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: আগলি'—আগল (বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ের নাম-ধাতু)+ইয়া। পরিষিক্ত—পরি সিচ্‌+ক্ত কর্মবাচ্যে। মাধুরী—মধুর+অণ+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে। শুদ্ধ—শুধ্‌+ক্ত কর্তৃবাচ্যে। ভিন্ন—ভিদ্‌+ক্ত কর্মবাচ্যে। নিবেদিল—নি—বিদ্‌+ণিচ্‌ (সংস্কৃতধাতু)+ইল। জীয়াতে—জী+আ+ইতে।

বাক্য-রচনা: দরবিগলিত: তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

মাধুরী: রাজকন্যার রূপ-মাধুরী সকলকে মুগ্ধ করিল।

তপোবল : বিশ্বামিত্র তপোবলে নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।

চিরসুন্দর : মরণের স্বরূপ যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে মরণ চিরসুন্দর।

হাহাকার : বন্যাক্লিষ্ট নরনারীর হাহাকার সরকারকে বিচলিত করিয়াছে।

ব্যাকরণগত টীকা : দেউলে দেউলে, দ্বারে দ্বারে—বীপ্সার বিশেষ্যের দ্বিত্ব।

আগলি'—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজাত ক্রিয়া। পরসাদ (<প্রসাদ), পরশে (<স্পর্শে), হরষে (<হর্ষে), দুরগম (দুর্গম), পরান (<প্রাণ)—প্রত্যেকটিই বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।

বৃন্তছিন্ন—বৃন্ত+ছিন্ন=বৃন্তচ্ছিন্ন (সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে)। কিন্তু বাঙলায় এই নিয়ম সর্বত্র মানা হয় না।

দুলিয়া উঠিবে—একটি অসমাপিকা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া মিলিয়া একটিমাত্র ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করায় যৌগিক ক্রিয়া।

নিবেদিল—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। বাঙলা ণিজন্ত ক্রিয়ার উদাহরণ।

(শিখাইলে) শিক্ষা—ধাত্বর্থক কর্মের উদাহরণ এখানে ঠিক সমধাতুজ কর্ম নয়, কারণ বাঙলা 'শিখ্' (শিখা) এবং সংস্কৃত 'শিক্ষ্' ধাতু অর্থে এক হইলেও রূপে বিভিন্ন।

জীয়াতে—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। বাঙলা প্রেরণার্থক ক্রিয়ার উদাহরণ। জী+আ=জীয়া : য়-শ্রুতির উদাহরণ।

বিরহ-আঁধার—সমাস দ্রষ্টব্য। তৎসম এবং অতৎসম শব্দে সমাস করা উচিত না হইলেও এখানে করা হইয়াছে। কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

বাচ্যান্তর : চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন (কর্মবাচ্য)—আমার আঁচলের ধন কেউ চুরি করেছে (কর্তৃবাচ্য)।

জন্মভূমি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যে-সকল কবির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তাঁহাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান্ কবি যতীন্দ্রমোহন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপরে যথেষ্ট কিন্তু ভাব ও ভাষা, কল্পনা ও কথায় তাঁহার মৌলিকতাও সামান্য নয়।

মাধুর্যই যতীন্দ্রমোহনের কাব্যের প্রধান আকর্ষণ। সে কাব্যে গভীর তত্ত্ব বা অতল ভাবের স্থান নাই। নরনারীর, বিশেষ করিয়া নারীর, কতকগুলি সুকোমল ও সুকুমার বৃত্তিকে কল্পনার বর্ণবৈচিত্র্যে রাঙাইয়া সাবলীল ছন্দে রসরূপে বিকশিত করা-ই যতীন্দ্রমোহনের প্রধান কৃতিত্ব। কবির অন্যলক্ষণযুক্ত আরও নানান কবিতাও আছে। তবে এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই বোধ হয় যতীন্দ্রমোহন একক।

বাংলার পল্লীপ্রকৃতি এবং বাঙালী-জীবনের অতি সাধারণ সুখদুঃখও যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে মনোজ্ঞ হইয়া দেখা দিয়াছে। কবির বাস্তবপ্রীতি ও সহৃদয়তার পরিচয় যেমন, তেমনি সুকুমার কল্পনারও পরিচয়ও নিহিত আছে এই কাব্যে। তাহা ছাড়া, "যতীন্দ্রমোহনের কবিতার ভাষা ভাব যেমন পল্লীবাসী খাঁটি বাঙালীর ভাব-কল্পনায় সঞ্জীবিত, তেমনি উৎকৃষ্ট রুচি ও রসবোধের দ্বারা সংযত ও সুমার্জিত।"

উৎস ও নামকরণ—এই কবিতাটি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রেখা' কবিতা-গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

কবিতাটির বিষয়বস্তু কবির জন্মস্থান একটি গ্রামের বর্ণনা। গ্রামটি গ্রাম-হিসাবে যেটুকু বিশেষত্ব, যেটুকু সৌন্দর্যের অধিকারী, তাহার বর্ণনা তো এই কবিতায় আছেই, তাহা ছাড়া জন্মভূমি বলিয়াই কবির নিকট সেই গ্রামের মহিমা অনন্ত। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। জন্মভূমিই পৃথিবীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ। এইজন্যই উহার তুচ্ছ বস্তুও কবির এত প্রিয়। উহার দীনতা হীনতা আর শত ত্রুটি-সত্ত্বেও এত সুখের এত শান্তির স্থান আর জগতে নাই। কবি এইভাবেই এখানে তাঁহার জন্মভূমিকে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রাম-প্রকৃতির

সহজ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি নিবিড় প্রীতির সুধা মাখিয়া অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতাটির শীর্ষনাম তাই সঙ্গত।

সমালোচনা—'জন্মভূমি' কবিতা বাঙলার পল্লীগ্রামের একটি অতি-রঞ্জনহীন বিশ্বস্ত ছবি। আপাতদৃষ্টিতে গ্রামটির এমন কিছু শোভা নাই। অড়হর ক্ষেতের পাশে কেয়াঝাড়ে ঘেরা একখানি গ্রাম। পূবদিকে তার আম-কাঁঠালের বাগান, রাখাল বালকেরা সেখানে জটলা করে। বাঁশবাগানের পাশ ঘেঁষিয়া সজনেগাছের মধ্য দিয়া হয়তো একটা পথ। পথে গোরুর গাড়ীর চাকার দাগ, বৃষ্টি হইলে তাই কাদা শুকায় না। ঘুঁটে-ছাইয়ের গাদা তারি পাশে পাশে। গ্রামের পুকুরগুলি পানায় ভরা, চৈত্রমাসে তাহাদের জল থাকে না। ডোবা আর জঙ্গলে ভরা সেই গ্রাম। ইহার মধ্যে আর কি সৌন্দর্য থাকিতে পারে? পাঠশালা, চিকিৎসক বা ধনাঢ্য ব্যক্তির যথেষ্ট অভাব সেখানে। তবে রাজ্যের পাখীর সমাবেশ ও স্বচ্ছন্দ গীতি গ্রামখানিকে মুখরিত করিয়া রাখে। তবু গ্রামটি কবির নিকট স্বর্গস্বরূপ শুধু এই কারণে যে উহা তাঁহার জন্মভূমি। শিক্ষায় অনগ্রসর, রোগে দৈন্যে জর্জরিত বাঙালার গ্রামের ইহাই প্রকৃত ছবি। কবি ইহাকে মিথ্যা কল্পনার রঙে রঙীন করিয়া দেখান নাই। ইহা শুধু তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিরই প্রমাণ নহে, ইহার মধ্যে আছে তাঁহার গভীরতর কবিত্বের পরিচয়। সন্তানমাত্রই মাতাকে যে কারণে ভালোবাসে, কবিও সেই কারণে তাঁহার জন্মভূমির প্রতি এত অনুরাগী। উহার রূপের কথাটা তাঁহার নিকট তাই নিতান্ত নগণ্য। কবির নিকট উহা শুধু শান্তিসুখের পরম আশ্রয়। উহার একটি বস্তু অবশ্যই কবির গভীর রসানুভূতিকে পুষ্ট করিয়াছে। তাহা হইল গ্রামের সরল সুন্দর জীবন। সেখানে মানুষ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মধারায় একনিষ্ঠ। বিবাদ-বিসংবাদ নিন্দা-স্তুতি সবকিছুই সেখানে আছে। তবু প্রতি সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া তাহারা কীর্তন করে। দিবসের কলহবিসংবাদ ভুলিয়া সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ায় তাহারা যেন মিলনের মধুমাখা ঐকতান তোলে! বাধাবন্ধনহীন, অল্পে-তুষ্ট, অনাড়ম্বর, স্বাধীন ও সুখী এই গ্রামবাসীদের জীবনের গভীরে একটি অপূর্ব রসসঞ্চয় আছে। উহাই তাহাদের সকল দুঃখ-দৈন্য ছাপাইয়া মিলিতসঙ্গীতে অভিব্যক্তি লাভ করে। কবি গ্রাম-জীবনের সেই মর্মগীতির স্পন্দন আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া অনুরাগে বিভোর হইয়া উঠেন। এইরূপে বাঙলার পল্লীর বিশেষ ছবিটি নির্বিশেষ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে! পাঠক আমরাও ইহার মধ্যে জন্মভূমির আকর্ষণ অনুভব করি। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। অন্ততঃ উহাই আমাদের সাক্ষাৎ

স্বর্গ। এইখানেই আমাদের পারিবারিক জীবনের যাবতীয় বাৎসল্য—প্রেম প্রীতি ও সুখের লীলাখেলা। সৌন্দর্য তাহার আছে কি নাই, সে-কথা তুচ্ছ। জন্মভূমি জন্মভূমিরূপেই মানুষের হৃদয়ের উপর একটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করে। বিশেষ করিয়া কবিজনের মনে তাহার প্রভাব অপরিমেয়। অলক্ষ্য অনির্বচনীয় এক অপূর্ব আকর্ষণে তাহা কবিকে মুগ্ধ বিভোর করিয়া দেয়। এই কথাটিই কবিতাটির মর্মবাণী। 'জন্মভূমি' কবিতার সরল ভাষা ও বাস্তব বর্ণনা এক হিসাবে সহজ নহে। কারণ, ইহাদ্বারা কবি বস্তু হইতে ভাবে অতি সন্তর্পণে নিপুণ অভিযান করিয়াছেন। গ্রাম-প্রকৃতির অনাড়ম্বর ছবিটির মর্মমূল হইতে তিনি যে ভাবের প্রবাহ উৎসারিত করিয়াছেন তাহাই জন্মভূমির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ। উহা কবির আত্মলীন ভাবের সরণি বাহিয়া পাঠকের চিত্তেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কবিতাটির এইখানেই সর্বোত্তম আবেদন। এইখানেই কবির সত্যকার কবিত্বের পরিচয়।

সংক্ষিপ্তসার—আইরি-ক্ষেতের আড়ালে যে গ্রামখানি দেখা যাইতেছে তাহাই কবির জন্মভূমি, তাঁহার স্বর্গপুরী। ইহার সীমানায় সবুজ কেয়াঝাড়ের নিবিড় ছায়া, পূর্বদিকে আমকাঁঠালের বাগান—সেখানে রাখাল বালকেরা মিলিয়া গল্পগুজব করে। কবির হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে এই গ্রামে। গ্রামের রাস্তাটি বাঁশগাছের পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। পথের পাশে ঘনসন্নিবিষ্ট সজনেগাছের সারি। গোরুর গাড়ী চলার ফলে পথের জলকাদা শুকাইতে পায় না, কোথাও বা বেড়ার পাশে ঘুঁটে-ছাইয়ের স্তূপ। তবু কবির জন্মভূমি এই গ্রাম তাঁহার চোখে পরমসুন্দর। গ্রামের গাছে গাছে কত বিচিত্র পাখী বাসা বাঁধিয়াছে। পথে চলিতে গেলে নীচু ডালগুলি আসিয়া গায়ে লাগে আর প্রতি পদবিক্ষেপে শুকনো পাতা গুঁড়াইয়া যায়। তবু এই বনময় গ্রামই কবির মন হরণ করিয়াছে। গ্রামে বড় জলাশয় নাই, পদ্মদীঘি তো দূরের কথা। গ্রীষ্মের দিনে জলের বড় অভাব হয়। যে কয়েকটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহার জল পঙ্কিল ও পানায় আচ্ছন্ন। চারিদিকে ভাঙগাছ। ভাঁট-পিঠলির বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বাতাসের নিজেরই যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। এখানে না আছে একটি পাঠশালা, না আছে ডাকঘর। অসুখ-বিসুখ যথেষ্ট থাকিলেও চিকিৎসক পাওয়া যায় না। বড় অট্টালিকা বা দেবমন্দির কিছুই এখানে নাই। গ্রামবাসীরা পোশাক-আশাক না থাকিলেও লজ্জাবোধ করে

না, করে না দারিদ্র্যকে ভয়। সহস্র অভাব থাকিতেও তাহাদের অভাববোধ নাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুমোরপাড়ায় কদমতলার ধারে সকলে মিলিয়া সংকীর্তন করে। সকলেই এখানে স্বাধীন ও সুখী, সর্বপ্রকার বাধা ও বন্ধন হইতে মুক্ত। যে যাহার নিজের কাজ করে। তাহাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়, আবার মিটিয়াও যায়। শোভা স্বাস্থ্য না থাকুক, এই গ্রামের কাছে আসিলেই কবির মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। সকল প্রিয়জনের আবাস এই জন্মভূমি তাঁহার সকল সুখ-শান্তির আধার, তাঁহার স্বর্গপুরী। তাই তাঁহার মনটা সর্বদা এখানেই পড়িয়া থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

গাঁ—গ্রাম। **'আইরি' খেতের আড়ে**—অড়হরের ক্ষেতের পাশে বা অন্তরালে। 'আইরি' কথাটি গ্রাম্য বলিয়া উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হইয়াছে। **প্রান্তটি**—শেষসীমাটি। আঁধার-করা—অন্ধকারাবৃত, ছায়ায় ঘেরা। **কেয়াঝাড়ে**—কেয়াগাছের গুচ্ছে। কেয়া একজাতীয় উগ্র সুগন্ধি ফুল। ইহাকেই সংস্কৃতে কেতক বা কেতকী বলে। **পুবের**—শব্দটির বানান লক্ষণীয়! 'পূর্ব' শব্দটি তৎসম; কিন্তু 'পুব' তৎসম নয় বলিয়া উচ্চারণ-অনুসারে বানানে হ্রস্ব উ করা হইয়াছে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই বানান-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। পুবদিকে আম-কাঁঠালের বাগান থাকার অর্থ এই যে গ্রামখানিতে সূর্যের কিরণ অনেক দেরীতে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা প্রভাতেও প্রায় অন্ধকার। **জটলা করে**—একত্র মিলিত হইয়া গল্পগুজব করে। **আমার স্বর্গপুরী**—স্বর্গপুরী অমরাবতী যেমন মানুষের কল্পনায় পরম সুন্দর ও সুখময় স্থান, কবির পক্ষে গ্রামখানিও তেমনি। এখানে থাকিয়াই তিনি স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। **ঐখানেতে হৃদয় আমার** ইত্যাদি—ঐ গ্রামখানিই আমার মন হরণ করিয়াছে; আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার মনটি সব সময় পড়িয়া থাকে ঐ গ্রামে।

দ্বিতীয় স্তবক

পথটি বাঁকা—রাস্তাটি বাঁকিয়া গিয়াছে বা মোড় ঘুরিয়াছে। **গলাগলি সজনে গাছের শাখা**—ঘনসন্নিবিষ্ট সজনে গাছের ডালগুলি এমনভাবে একটি অন্যটির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে যে মনে হয় তাহারা যেন পরম বন্ধুভাবে পরস্পর

গলা-ধরাধরি করিয়া রহিয়াছে। গ্রামে মানুষে মানুষে সম্পর্কটিও যেন এমনি। **গোরুর গাড়ির চাকায়** ইত্যাদি—গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ী চলিলে চাকার চাপে দুইধারে গর্তের সৃষ্টি হয়, এবং এই গর্তে বৃষ্টির জল জমিলে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারে না বলিয়া পথের কাদাও শুকায় না। **তার**—সেই গ্রামের অথবা গ্রামের রাস্তার। ঘুঁটে-ছাইয়ের গাদা—ঘুঁটে এবং ছাই স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। **বিশ্বশোভা……গেছে চুরি**—পৃথিবীর সব সৌন্দর্য কে যেন চুরি করিয়া আনিয়া ঐ গ্রামে রাখিয়াছে। সহজ কথায়. কবির বিবেচনায় এমন সুন্দর স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

তৃতীয় স্তবক

যত দেশের যত পাখা ইত্যাদি—ঐ গ্রামে নানারকমের পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। তাই কবির মনে হয় পৃথিবীতে যত জাতির পাখী আছে তাহার কোনটিরই অভাব তাঁহার গ্রামে নাই। কবিতার এই চরণটির শেষে বিস্ময়-চিহ্ন এই ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। **বাসার কাছে কাছে**—ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি গাছগুলিতেই তাহারা বাসা বাঁধিয়াছে, উড়িয়া ফিরিবার সময় এই বাসার আকর্ষণেই তাহারা দূরে চলিয়া যায় না। গাছের ডগা—বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ। **নুইয়ে পড়ে গায়ে**—রাস্তায় মানুষের উপর নত হইয়া পড়ে, যেন গ্রামবাসীর সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ করিবার জন্য। গুঁড়োয়—গুঁড়া হইয়া যায়। পায়ে পায়ে—প্রতি পদক্ষেপে। **চলতে গেলেই……পায়ে পায়ে**—গ্রামের রাস্তার উপর রাস্তার পাশের গাছগুলি হইতে শুকনো পাতা পড়ে, ফলে সে পথ চলিতে গেলেই প্রতি পদক্ষেপে পাতাগুলি গুঁড়াইয়া যায়। **বনে-ভরা**—বন-জঙ্গলে ঢাকা। **তবু**—অর্থাৎ এত দোষ থাকিলেও, জলকাদা আর বনজঙ্গল থাকিলেও। আমার চিত্ত সেথায় ইত্যাদি—প্রথম স্তবকের 'ঐখানেতে, হৃদয় আমার গেছে চুরি'-র ভাবান্তবৃত্তি।

চতুর্থ স্তবক

পদ্মদিঘি—পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে এমন দীঘি। বিকশিত পদ্মফুল দীঘির শোভাবর্ধন করে। পদ্ম নাইকো মোটে—গ্রামে যে দীঘি বা জলাশয় আছে তাহাতে পদ্মের নামগন্ধও নাই। **চৈৎ-বোশেখে**—চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হয়। **জলটুকু না জোটে**—স্নান-পানের উপযুক্ত সামান্য জলও

পাওয়া যায় না। **পানায় মরা**—যাহার জলাশয়গুলি ভাসমান কচুরিপানায় এবং সাধারণ পানায় আচ্ছন্ন হইয়া মজিয়া গিয়াছে। এইরূপ জলাশয়ে যেটুকুও বা জল থাকে তাহা স্নান-পানের অযোগ্য। ডোবায় ভরা—পানীয় জলের ভালো পুকুর বা দীঘি নাই, আছে কেবল ময়লা জলের ক্ষুদ্র জলাশয়। **সিদ্ধি গাছে ছাওয়া**—সেখানে সিদ্ধি বা ভাঙের গাছ প্রচুর আছে। **ভাঁট পিঠিলির জঙ্গলেতে**—ঘেঁটুফুল এবং পিঠিলির অসংখ্য গাছ জন্মিয়া যে জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে। পিঠিলি বা পিটলি একপ্রকার বুনো গাছ। ইহার গোলাকার ফল হইতে পিটুলিগোলার মতো সাদা রস বাহির হয়। **হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া**—বাতাস যেন শ্রান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে-ফেলিতে বহিতে থাকে; বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া বহিতে গিয়া বাতাসের নিজেরই যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। **স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী**—কবির নিকট যাহা স্বর্গপুরী বলিয়া মনে হয়, তাহা এমন সৃষ্টিছাড়াই বটে; স্বর্গের 'স'-ও সেখানে নাই। **স্বর্গশোভা তবু** ইত্যাদি—এত দোষত্রুটিসত্ত্বেও কবির চোখে তাঁহার জন্মভূমি স্বর্গপুরীরই মতো পরম রমণীয় স্থান;—স্বর্গের সকল শোভা চুরি করিয়া কে যেন ঐ গ্রামে আনিয়া রাখিয়াছে। তুলনীয়: "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—বাল্মীকি রামায়ণ।

পঞ্চম স্তবক

নাইকো সে ডাকঘর—গ্রামটি এত ছোট, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা এত কম যে সেখানে সরকার কোন ডাকঘর বা পোস্ট অফিস স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। **'সে'** এখানে কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত অব্যয়স্থানীয়। বদ্দি—চিকিৎসক, বৈদ্য। কমতি নয়কো বড়ো জ্বর—চিকিৎসক না থাকিলে কি হইবে, জ্বরজালা অসুখ-বিসুখ সেখানে বড় একটা কম নয়। ধনীর দেবালয়—ধনবান্ মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দির। **লজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো**—দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র সংগ্রহ করাই কঠিন, পোশাক-আশাক তাহারা পাইবে কোথায়? পোশাক-আশাক না থাকিলেও কিন্তু শহরের মানুষের মতো তাহারা লজ্জাবোধ করে না। **দারিদ্র্যে নাই ভয়**—দারিদ্র্যকে তাহারা ভয় করে না, মানুষের মতো দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করে। **সৃষ্টিছাড়া**—অদ্ভুত; দুনিয়ার বার। তুলনীয়: "সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস"—রবীন্দ্রনাথ। **সকল অভাব……কিছু**—

দারিদ্র্যের সঙ্গে অভাবের নিত্যসম্পর্ক থাকিলেও এখান হইতে সকল অভাব দূর হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ প্রকৃত অভাব থাকিলেও গ্রামবাসীদের অভাববোধ নাই—তাহারা যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

ষষ্ঠ স্তবক

কুমোর-পাড়ায়—গ্রামে যে অংশে কুম্ভকারেরা বাস করে সেখানে। **সংকীর্তনে মিলন-গীতি**—অনেকে মিলিয়া সমস্বরে দেবতার নাম বা মাহাত্ম্য গান। এখানে নামকীর্তন অর্থাৎ হরিনাম-সংকীর্তনের এবং লীলাকীর্তনেরও কথা বলা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-গানের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে 'কদমতলা' কথাটির মধ্যে। **মিলন-গীতি**—বহু লোকের সমস্বরে গান (chorus song) অথবা যে গীতি সাময়িক বিবাদ-বিসংবাদ ভুলাইয়া সকলকে মিলিত করে। **সান্ধ্য অন্ধকারে**—সন্ধ্যার অন্ধকারে। সংকীর্তনের সময় গ্রামবাসীরা অপ্রয়োজনবোধে আলো জ্বালে না, জ্বালিবার পয়সাও হয়তো তাহাদের নাই। তাই অন্ধকারে গান চলিতে থাকে। **বাধা-বাঁধন-হারা**—দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের বাধা এবং তথাকথিত সভ্যতা ও বিলাসিতার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আবাদ—কৃষিকার্য। সুবাদ—মিষ্টালাপ। আবাদ, বিবাদ, সুবাদ—তিনটি শব্দেই বাদ ধ্বনির মিল রহিয়াছে। ইহার নাম অনুপ্রাস।

সপ্তম স্তবক

আছে বা না আছে—থাকুক বা না থাকুক। অপক্ষপাত বিচারে গ্রামে শোভা স্বাস্থ্য কিছুই নাই, কিন্তু কবির বিচার সে-সব নয়। **বুকটি তবু নেচে ওঠে** ইত্যাদি—প্রবাস হইতে জন্মভূমিতে ফিরিবার সময় গ্রামের কাছে আসিলেই কবির হৃদয় এক অননুভূতপূর্ব আনন্দ ও আশায় দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে।

ব্যাখ্যা

(১) বাঁশ-বাগানের পাশটি……ঐখানেতে গেছে চুরি! (স্তবক ২)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি' কবিতার অন্তর্গত। এই অংশে কবি তাঁহার জন্মভূমি গ্রামখানির রূপৈশ্বর্যহীন বাস্তব চিত্রটির কোথায় আকর্ষণ, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রামখানি আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু সুন্দর নয়। সেখানে বাঁশবনের পাশ ঘেঁষিয়া পাড়ার পথখানি বিছাইয়া আছে। উহার একপাশে সজ্‌নেগাছগুলি গলাগলি করিয়া যেন জড়াইয়া আছে। দুইপাশে এইরকম ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়া এই যে পথখানা গিয়াছে, উহাতে গরুর গাড়ীর চাকার গভীর দাগ কখনও মিলায় না; জলকাদা কখনও শুকায় না। কোথাও বা বাড়ীর বেড়াটির পাশে ছাই আর ঘুঁটের গাদা—পথের ধারেই রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দেখার মতো কিছু শোভা নাই। তবু কবি ইহার প্রতি অনুরাগী। কারণ এই গ্রাম, এই পথ নিবিড় পরিচয়ে আর গভীর অনুরাগে কবির চেতনায় পরম আনন্দময়, অনুপম সৌন্দর্যময়। এ সৌন্দর্য বস্তুর বাহ্য সৌন্দর্য নহে, ইহা অনুরাগরঞ্জিত অনুভূতির নিকট এক অনির্বচনীয় মর্মশোভা। সেই সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যই সেই গ্রাম্যপথ আর অনাড়ম্বর প্রকৃতিকে কবির নিকট স্বর্গতুল্য করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য যেন উহাতেই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।

(২) পদ্মদীঘি কোথায় পাব……সেথায় গেছে চুরি! (স্তবক ৪)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি' শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত। এই অংশে কবি তাঁহার গ্রামখানির দৈন্যই বর্ণনা করিয়াছেন। এই দৈন্যসত্ত্বেও জন্মভূমি হিসাবে গ্রামখানি তাঁহার প্রিয়—ইহাই উদ্ধৃত স্তবকের মর্মকথা।

গ্রামখানিতে পদ্মদীঘি তো দূরের কথা, ভালো একটি সাধারণ জলাশয়ও নাই। পানায় ভরা পুকুর আর ডোবাগুলিতে কোথাও পদ্মের নামগন্ধ নাই। চৈত্রমাসে সেগুলি শুকাইয়া কাঠ হয়। নানারকম জংলী গাছ আর ঝোপজঙ্গলে সব আচ্ছন্ন। একটু মুক্ত বাতাস বহিবারও উপায় নাই। বস্তুতঃ বাতাস যেন এই ঝোপজঙ্গলে আসিয়া শ্বাস ফেলিতেও পারে না—যেন তাহারও দম আটকাইয়া যায়। তাই পাতার মর্মরে বাতাস যেন হাঁপায়। এইভাবে গ্রামে জলকষ্ট ও বাতাস চলাচলের অসুবিধা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তবু এই গ্রামই কবির এত প্রিয়, কারণ ইহা যে তাঁহার জন্মভূমি। জন্মভূমি জননীর মতো। জননীর শত দৈন্য থাকিলেও সন্তানের নিকট চিরকাল তিনি অতি প্রিয়। ঠিক তেমনি জন্মভূমি কবির নিকট স্বর্গের মতো সুখসৌন্দর্যের আধার।

(৩) পাঠশালাটি নাইকো ……সেথায় গেছে চুরি। (স্তবক ৫)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি'-শীর্ষক কবিতার

অন্তর্গত। এই অংশে কবি তাঁহার গ্রামের নানান অভাব-অভিযোগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং এ-সকল সত্ত্বেও তিনি যে সেই গ্রামের প্রতি বিশেষ অনুরাগী সেই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রামটিতে একটি পাঠশালা নাই, নাই ডাকঘর। চিকিৎসকের অভাবও সেখানে তেমনি। অথচ গ্রামে জ্বরজ্বালার প্রকোপ বড় কম নয়। দীনহীন এই গ্রামে না আছে রাজা-জমিদারের প্রাসাদ, না আছে ধনী ব্যক্তির মঠমন্দির। এদিক্ দিয়া অনেক গ্রাম হইতেই উহা দীনতর। বস্তুতঃ দারিদ্র্য সে গ্রামে সবত্র। গ্রামের মানুষ সেখানে সাজগোজ জানে না, দারিদ্র্যকে সেখানে কেহই ভয় করে না। হাসিমুখে শক্ত বুকে মানুষ সেখানে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। এই তো কবির গ্রামখানির ছবি। আপাত দৃষ্টিতে ইহা সত্যই সৃষ্টিছাড়া, শ্রীহীন। তবু তাহা কবির নিকট সুখের স্বর্গ। এইখানে এত অভাব এত অনটনের মধ্যেও যেন অফুরন্ত সুখ। তাই এই সুখের মধ্যে অভাব যেন আর অভাব থাকে না। সুখের মতো এমন পরম ঐশ্বর্যের মধ্যে জাগতিক সব অভাব যেন দূর হইয়া যায়।

(৪) তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায়……গেছে চুরি! (স্তবক ৬)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি' কবিতার অন্তর্গত। কবি এইখানে গ্রাম্যজীবনের একটি মধুর দিক্ চিত্রিত করিয়া জন্মভূমির প্রতি নিজের গভীর অনুরাগের হেতু বর্ণনা করিয়াছেন।

কবির জন্মস্থান সাদাসিধা গ্রামখানিতে বাহ্য সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্য কোনোকিছুই নাই। রোগের প্রকোপ আর অভাবের তাড়নায় মানুষ সেখানে সর্বদা পীড়িত। তবু উহার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। কবি তাঁহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গ্রামের দৈন্য-লাঞ্ছিত অনাড়ম্বর জীবনখানির মর্মমূলে একটি মধুসঞ্চয় আছে। দিবসের কর্মকোলাহলে মানুষে মানুষে সেখানেও স্বার্থের সংঘাত—কলহ-বিবাদ যথেষ্টই আছে। পরস্পরের নিন্দা বা স্তুতি, ভালোমন্দ কত কিছুই চলে। কিন্তু সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় স্নিগ্ধ পরিবেশে গ্রামবাসীরা সে-সব ভুলিয়া যায়। ঐ কুমোরপাড়ায় কদমতলার কাছে একটা জায়গায় নিত্য সন্ধ্যায় তাহারা মিলিত হয়, মিলিত হইয়া তাহারা হরিনামকীর্তন, রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন গান করে। সংকীর্তনের মধুর সুরে তাহাদের মিলন, তাহাদের ঐক্যই যেন ব্যঞ্জিত হয়। তখন তাহারা স্বাধীন, সুখী। এইভাবে সন্ধ্যার

নিবিড় পরিবেশে গ্রাম্যজীবনের মিলন-মধুর অপূর্ব এক আন্তর মহিমা ফুটিয়া উঠে। কবি এই মাধুর্যে মোহিত হন। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অনুরাগের তাই সীমা নাই। উহা তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ স্বর্গ—সুখশান্তির একান্ত আশ্রয়।

(৫) শোভা বল, স্বাস্থ্য বল……গেছে চুরি! (স্তবক ৭)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি' কবিতার শেষ স্তবক। জন্মভূমির প্রতি কবি তাঁহার গভীর অনুরাগের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য উপসংহার টানিয়াছেন।

কবি তাঁহার জন্মস্থান গ্রামখানির দৈন্যপীড়িত রোগ-লাঞ্ছিত শোভাহীন সাদাসিধা ছবিখানি দেখাইয়াছেন। তবু কেন তাহা কবির নিকট সাক্ষাৎ স্বর্গ তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রামের সরল অনাড়ম্বর জীবনখানির মর্মমূলে আছে এক মিলন ঐকতান, আছে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য। তাই গ্রামটির কাছে যাইবামাত্র কবির হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। আশৈশব কবি এইখানেই মাতাপিতার অগাধ স্নেহে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, এই গ্রামই তাঁহার যাবতীয় প্রেমপ্রীতির লীলাভূমি। এই সকল কত মধুর ভাবানুষঙ্গ জড়াইয়া আছে গ্রামখানি ঘিরিয়া। তাহারই আলোকে কবির নিকট ইহা সাক্ষাৎ স্বর্গপুরী। ইহা তাঁহার সমগ্র চিত্তকে একান্তভাবে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র ১। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচা তাঁহার জন্মভূমির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। 'ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী'—(ক) এই গ্রামখানির একটি বর্ণনা লেখা। (খ) কবির নিকট ইহা কেন স্বর্গপুরী তাহা বুঝাইয়া দাও।

উ.। (ক) অড়হর-ক্ষেতের পাশে কেয়াঝাড়ের কালো রেখায় ঘেরা সাদাসিধা একটি গ্রাম। পূর্বদিকে তাহার আম-কাঁঠালের বাগান। রাখাল ছেলেদের লীলাভূমি এই ছায়াভরা বাগান। অন্যদিকে বাঁশবাগানের ধার ঘেঁষিয়া বাঁকা পথটি বিছাইয়া আছে গ্রামের মধ্য দিয়া। একপাশে তাহার সজিনাগাছগুলি ডালে ডালে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোরুর গাড়ীর

গভীর খাত আঁকা সে পথে, জলকাদা তাহাতে শুকায় না। পথের পাশে বেড়ার ধারে কোথাও কোথাও ঘুঁটে আর ছাইয়ের গাদা। ঝোপজঙ্গল আর গাছ-পালায় গ্রামখানি আচ্ছন্ন। তাহাতে যত রাজ্যের যত পাখী আছে সবই আসিয়া ভিড় করে। পথে চলিতে গাছের ডগা নুইয়া পড়ে। পায়ে পায়ে গুঁড়াইয়া যায় ঝরা পাতা। এ গ্রামে ভালো একটি জলাশয়ও নাই। পুকুর আর ডোবাগুলি পানায় পাঁকে ভরা। ঘন জঙ্গলে এখানে বাতাসও মুক্ত হইয়া বহিতে পারে না। গ্রামে না আছে পাঠশালা, না ডাকঘর। নাই সেখানে বৈদ্য কবিরাজ, রাজা জমিদারের প্রাসাদ বা ধনীর মঠমন্দির। গ্রামবাসীর সাজসজ্জা নাই, আছে শুধু চিরসঙ্গী দারিদ্র্য ও রোগ। দিবসে নানা কাজে তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ হয় আবার তাহা মিটিয়া যায়। নিন্দা স্তুতি সবই সেখানে আছে। কিন্তু সন্ধ্যায় তাহারা সব ভুলিয়া একত্রে কীর্তন করে। তখন স্বাধীন সুখী গ্রামবাসীর মর্মকেন্দ্র হইতে মিলনমধুর জীবনসঙ্গীতের অমিয়ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কবির জন্মভূমি গ্রামখানির এইটুকুই মাত্র বর্ণনা।

(খ) ৫নং ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ৩। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মভূমি কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষ করিয়া আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস: আঁধার-করা—করা হইয়াছে আঁধার যাহাকে (বহুব্রীহি), তাহা। স্বর্গপুরী—স্বর্গের পুরী (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ) অথবা স্বর্গস্থিত পুরী (মধ্য-পদলোপী কর্মধারয়)। গলাগলি—গলায় গলায় আকর্ষণ করিয়া যে মিল (ব্যতিহার-বহুব্রীহি)। বনে-ভরা—বনে (=বন দিয়া) ভরা (অলুক্ ৩য়া তৎপুরুষ)। পদ্মদীঘি—পদ্মসমন্বিত দীঘি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। স্বর্গছাড়া—স্বর্গ হইতে ছাড়া (৫মীতৎপুরুষ)। ডাকঘর—ডাকের জন্য ঘর (৪র্থী-তৎপুরুষ)। লজ্জাহীনের—লজ্জার দ্বারা হীন (৩য়াতৎপুরুষ) তাহার সৃষ্টিছাড়া—সৃষ্টি হইতে ছাড়া (৫মীতৎপুরুষ)। কুমোর-পাড়ায়—কুমোরদের পাড়া (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহাতে। মিলন গীতি—মিলনের গীতি ৬ষ্ঠীতৎ-পুরুষ)। স্বাধীন—স্ব-র অর্থাৎ নিজের অধীন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। বাধা-বাঁধন

হারা—বাধা এবং বাঁধন (দ্বন্দ্ব); তাহাদের দ্বারা হারা (৩য়াতৎপুরুষ)। হাসিমুখ—হাসিযুক্ত মুখ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ।

সমস্তপদ-গঠন : গোরুর গাড়ি=গোরুগাড়ি, গোরুর-গাড়ি (অলুক্-৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। রাজার প্রাসাদ=রাজপ্রাসাদ।

সাধু শব্দ-রূপ : যাচ্ছে—যাইতেছে। যার—যাহার। দিয়ে—দিয়া। গেছে—গিয়াছে। তার—তাহার। উড়ে—উড়িয়া। ছুঁইয়ে—ছুঁইয়া। চলতে—চলিতে। গুঁড়োয়—গুঁড়ায়। পাব—পাইব। শুকিয়ে—শুকাইয়া। হাঁপিয়ে—হাঁপাইয়া। সেথায়—সেখানে। নেচে—নাচিয়া। ওঠে—উঠে। এলে—আসিলে। যেথায়—যেখানে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : ঘেরা—ঘির+আ। কমতি—কম (নামধাতু)+তি। দারিদ্র্য—দরিদ্র+ষ্যঞ্। সান্ধ্য—সন্ধ্যা+অণ্। স্বাস্থ্য—স্বস্থ্য ('সুস্থ' নয়)+ষ্যঞ্।

কারক ও বিভক্তি : প্রান্তটি যার-আঁধার-করা সবুজ 'কেয়াঝাড়ে' (করণে বা অনুক্ত কর্তায়-এ)। পানায়, ডোবায়, গাছে—তিনটিতেই করণে—এ। 'দারিদ্র্যে' নাই ভয় (অপাদানে-এ)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি—ঐখানেতে আমার হৃদয় কেউ চুরি করেছে (বাচ্যান্তর)।

যত দেশের যত পাখি ঐ গাঁয়ে কি আছে (বিস্ময়বোধক)—এটা বিস্ময়ের কথা যে যত দেশের যত পাখি ঐ গাঁয়েই আছে (নির্দেশাত্মক)।

ব্যাকরণগত টীকা : গাঁটি—গ্রাম>গাঁ : অর্ধতৎসম শব্দ।

কাঁঠালের—কাঁটা+আল=কাঁটাল, প্রচলিত উচ্চারণে ট-কে ঠ করিয়া 'কাঁঠাল' : বর্ণবিকৃতির অন্তর্গত পীনায়নের অর্থাৎ অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণে পরিণতির উদাহরণ।

বদ্দি—'বৈদ্য' (তৎসম) শব্দের বিকৃত উচ্চারণ : অর্ধতৎসম শব্দ এবং দ্+য্=দ্+দ্ হইয়াছে বলিয়া সমীকরণেরও উদাহরণ।

চৈৎ, বোশেখ—অর্ধতৎসম শব্দ। তৎসম রূপ : চৈত্র, বৈশাখ।

নাইকো—'নাই' ক্রিয়াবাচক অব্যয় ; ইহার সহিত অবধারণ বা নিশ্চয়তা-বাচক অব্যয় 'কো' যুক্ত হইয়াছে।

কম্‌তি—কম্ (নামধাতু)+তি। শব্দটি সাধারণতঃ বিশেষ্যরূপেই প্রযুক্ত হয়, কিন্তু এখানে বিশেষণ।

গুঁড়োয়—'গুঁড়া' নাম-শব্দ; ইহাই বিনা প্রত্যয়ে ধাতু হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এটি নামধাতুর উদাহরণ।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ: জট্‌লা, গলাগাল, সৃষ্টিছাড়া, সুবাদ।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা'-নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে এই কবিতাটি আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে। মূল কবিতাটিতে ৬৪ পঙ্‌ক্তি, কিন্তু মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর সংকলনে শেষাংশের ৮ পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ স্থান পাইয়াছে। ইহাতে কবিতাটির কিছু অঙ্গহানি ঘটিয়াছে।

কবিতাটির নাম 'আমরা' হইয়াছে এইজন্য যে, ইহা দ্বারা কবি বাঙালী জাতিকেই বুঝাইতেছেন। বিগত দিনের বাঙালীর কীর্তিকাহিনী ইহার বিষয়বস্তু।

সমালোচনা—সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যে ছন্দযাদুকর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আলোচ্যমান অংশটি, তাঁহার এই আখ্যা যে কত সার্থক হইয়াছে তাহার প্রমাণ। ইহার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাঙালীর অতীত গৌরব, কীর্তি ও কৃতিত্বের একত্র সমাবেশ করিয়া কবি এখানে ছন্দের ইন্দ্রজালে বাঙালীহৃদয়ে একটা গর্ববোধ উদ্বোধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বজাত্যভিমান ও স্বদেশবাৎসল্যই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে মহাকালের বিচারে এইপ্রকার কবিতার আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ নহে।

বিষয়-বিশ্লেষণ—১। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। (স্তবক ১)

২। বাঙালীর শৌর্যবীর্যের পরিচয়। (স্তবক ২)

৩। জ্ঞানচর্চায় ও সুকুমার-শিল্পে বাঙালীর দান। (স্তবক ৩)

৪। বাঙালীর কষ্টসহিষ্ণুতা ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। (স্তবক ৪)

৫। বাঙালীর আধ্যাত্মিকতা। (স্তবক ৫)

৬। আধুনিক কালের বাঙালীর সাধনা। (স্তবক ৬)

৭। বিশ্বভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠায় বাঙালীর ভবিষ্যৎ সাধনা। (স্তবক ৭)

সংক্ষিপ্তসার—স্বচ্ছন্দগতি পুণ্যসলিলা গঙ্গা যেখানে হেলায় সকলকে মুক্তির বিতরণ করেন, আমরা বাঙালী সেই অতি পবিত্র বঙ্গভূমিতে বাস করি। এইদেশের বামে কমলালেবুর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে মহুয়াবৃক্ষ-পরিশোভিত সাঁওতাল পরগনা, শীর্ষদেশে হিমালয়ের তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ এবং পদপ্রান্তে তরঙ্গচঞ্চল বঙ্গোপসাগর বিরাজমান। এই সুজলা, সুফলা ও বিচিত্র পুষ্পালংকারে শোভিতা বঙ্গভূমি আমাদের প্রিয় বাসস্থান।

বাঙালী আমরা ভীরু অথবা কাপুরুষ নহি। আমাদের এই বাঙলাদেশ একদিকে যেমন বিচিত্র ফলশস্যে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমন ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি হিংস্রপ্রাণিসংকুল। এইসকল হিংস্র প্রাণীর সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়া আমরা বাস করিতেছি। সমরক্ষেত্রেও আমরা অসামান্য শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় দিয়াছি। বাঙালীর সুদূর অতীতে দিগ্বিজয়ী রঘুরাজার সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। বাঙালীর ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করিয়া উহার 'সিংহল' নামের মধ্যে নিজ বীরত্বের অক্ষয় পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙালী জাতি একদিকে মগ-দস্যুদিগের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছে, অন্যদিকে প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধিতা করিয়া দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙালী ভূস্বামী চাঁদ রায় ও প্রতাপাদিত্যের নিকট দিল্লীর মোগল সম্রাট্ আকবরকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জ্ঞানচর্চায় ও সুকুমারশিল্পে বাঙালী জাতির বিপুল দান আছে। সাংখ্য-দর্শনপ্রণেতা কপিলমুনি এই বাঙলাদেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাঙালী অতীশ দীপংকর হিমালয়ের কঠিন তুষারস্তর অতিক্রম করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙালী যুবক রঘুনাথ শিরোমণির নিকট মিথিলার

অপরাজেয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বাঙালী কবি জয়দেব সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যকে এক অভিনব সুকুমার মাধুর্যে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। যবদ্বীপের 'বরভূধর' ও কম্বোজের 'ওংকারধাম' মন্দির বাঙালী জাতির স্থাপত্য-গৌরবের উজ্জ্বল নিদর্শন। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ধীমান্ ও বিটপাল বাঙালী ছিলেন। অজন্তাগুহার অমর চিত্রাবলীর মধ্যে বাঙালী চিত্রকরগণের নিপুণ তুলিকার কোমল স্পর্শ আছে।

বাঙালী জাতির সহিষ্ণুতাও অপরিসীম। তাই ১১৭৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষেও এ জাতি লোপ পায় নাই এবং নানারূপ মহামারীর সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়াও ইহারা জীবিত আছে।

আধ্যাত্মিক সম্পদেও বাঙালী হীন নহে। বাঙালী জাতি তাহাদের আরাধ্য দেবতাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই—দেবতার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে, এবং মানুষের মধ্যেই দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রবর্তক চৈতন্যদেব শুধু বাঙালীই ছিলেন না, তিনি যেন বাঙালীর সুকুমার বৃত্তিগুলির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বীর সন্ন্যাসী বাঙালী বিবেকানন্দের নির্ভীক বাণী জগৎময় প্রচারিত হইয়াছে। তাই মনে হয়, অনাগত ভবিষ্যতে ইহারাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে।

বাঙালী বৈজ্ঞানিক সাধনার বলে অচেতনের মধ্যেও চেতনার আবিষ্কার করিয়াছেন, বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণে অভিনব পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙালার কবি সমগ্র মানবজাতির মিলনের গান গাহিয়াছেন। বাঙালী তুচ্ছ নহে—ভগবানের আশীর্বাদে তাহারাই একদিন পৃথিবীতে ভগবানের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে।

বাঙালী সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহারই ফলে বিশ্বের লক্ষকোটি নরনারী এক মহামিলনের ডোরে বাঁধা পড়িবে। অতীতে বাঙালী যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে, একদিন-না-একদিন তাহা সিদ্ধি-লাভ করিয়া বাঙালীর কীর্তিকথা জগৎময় প্রচার করিবেই। কিন্তু সে সিদ্ধি লাভ করিতে বাহুবলের প্রয়োজন হইবে না, সে সাধনা কাহারও মনে হিংসাদ্বেষ জাগাইবে না—ধীরে ধীরে বাঙালী বিশ্বমানবকে ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া বিধাতার ঋণমুক্ত হইবে।

মর্মার্থ—প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বাঙলাদেশ, সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশ। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য। অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙালী বাঁচিয়া আছে, সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙালী যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, সমুদ্র পার হইয়া দেশবিদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জ্ঞানবিতরণেও বাঙালী চিরকাল অগ্রণী। শিল্পে ও ললিতকলায় বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন শুধু ভারতে নয়, সমগ্র প্রাচ্যজগতের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে।

সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বাঙালীর দান অপরিসীম। ধর্মজগতে ও আধ্যাত্মিকতায় বাঙালীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন বহু ধর্মাচার্য। বাঙালীর সাধনায় মানুষ এখানে দেবতা হইয়াছে, দেবতা মানুষের মত আপন হইয়া গিয়াছেন। বাঙালী জড়ের মধ্যেও প্রাণধর্ম আবিষ্কার করিয়াছে, পরস্পর-বিরোধী বস্তু ও ভাবের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করিয়াছে। এইভাবে বাঙালীর প্রতিভা নানা দিকে নানা আকারে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে বাঙালী চিরদিন অসাধ্যসাধন করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যতেও অসাধ্যসাধন করিবার প্রতিভা একমাত্র বাঙালীরই আছে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

পঙ্‌ক্তি ১-৮। মুক্তবেণীর গঙ্গা—ইহার দুইটি অর্থ সম্ভব:—(১) প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী মিলিত হওয়ায় উহাকে যুক্তত্রিবেণী বলে এবং বাঙলার হুগলী জেলায় ত্রিবেণীনামক স্থানে তিনটি নদী পৃথক হইয়া যাওয়ায় উহাকে মুক্তত্রিবেণী বলে। কবি হুগলীর ত্রিবেণীর মুক্তধারা গঙ্গার কথাই হয়তো মনে করিয়াছেন। (২) গঙ্গার ধারা পথের নানা বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়া 'মুক্ত' অর্থাৎ বাধাহীন হইয়াছে। কাজেই গঙ্গাসাগরকে 'মুক্তবেণীর গঙ্গা' ভাবাও কবির পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। পুণ্যকামী নরনারীগণ ত্রিবেণী অপেক্ষা গঙ্গাসাগরকেই চিরকাল বহুগুণে অধিক পবিত্র বলিয়া মনে করে। এইস্থানে স্নানের জন্য তাহারা দলে দলে মৃত্যুবরণ করিতেও প্রস্তুত। এই কারণে দ্বিতীয় অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি; কিন্তু তাই বলিয়া প্রথম অর্থকেও ভুল বলিতে পারি না। মোটের উপর আমাদের

পক্ষপাতিত্ব দ্বিতীয়টির উপর। যেথায়—যে দেশে। **মুক্তি বিতরে রঙ্গে**—অনায়াসে, অবলীলাক্রমে মুক্তিদান করে। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, গঙ্গাসাগরে স্নান করিলে মানুষের মোক্ষলাভ হয়, পুনর্জন্মের ভয় আর থাকে না। যে মুক্তি বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার পর একাধিক জন্মে লাভ করিতে পারা যায়, বঙ্গদেশে তাহা এত সুলভ। **তীর্থে**—পুণ্যস্থানে। বঙ্গভূমি লক্ষ লক্ষ মানুষের পাপহারিণী ও মুক্তিদাত্রী বলিয়াই কবি ইহাকে তীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। **বরদ**—যিনি বর অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্তু দান করেন এবং সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন। বঙ্গ—বঙ্গদেশে। **বাম হাতে যার কমলার ফুল**—(এস্থলে বঙ্গদেশকে নারীমূর্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে) বঙ্গদেশের বামদিকে অর্থাৎ মানচিত্রের পূর্বদিকে আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চলে কমলালেবু জন্মে। এজন্য কবি কল্পনা করিয়াছেন—বঙ্গমাতার বামহাতে কমলার ফুল। ডাহিনে—ডান হাতে। **মধুক-মালা**—মহুয়াফুলের মালা। **ডাহিনে মধুক-মালা**—বঙ্গদেশের ডানদিকে অর্থাৎ মানচিত্রের পশ্চিমদিকে বিহারে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে প্রচুর মহুয়া জন্মে। এইজন্যই কবির এইরূপ কল্পনা। **বাম হাতে···মধুক-মালা**—শ্রীহট্ট এবং সাঁওতাল পরগণা বর্তমানে বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে না থাকিলেও একসময়ে ছিল। কবি তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গদেশেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। **ভালে**—কপালে, মস্তকে (অর্থাৎ উত্তরদিকে)। **কাঞ্চন-শৃঙ্গ মুকুট**—হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গরূপ শিরোভূষণ অথবা স্বর্ণময় অগ্রভাগযুক্ত শিরোভূষণ। উভয় অর্থই কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গকে বুঝায়, কারণ তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর সূর্যকিরণ পড়িলে তাহা স্বর্ণাভ দেখা যায়। কিরণে—ঔজ্জ্বল্যে, বিভায়। [এই কিরণ বঙ্গমাতার দেহদীপ্তি না তাঁহার মুকুটের ঔজ্জ্বল্য—তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না]—আলা—আলোকিত, দীপ্ত। **কোল-ভরা যার কনকধান্য**—বঙ্গদেশ শস্যশ্যামল। ইহার সর্বত্র ধানের ক্ষেত। এই ধান যখন পাকে তখন তাহার সোনার মতো রঙ হয়। আবার এই ধানই বাংলার সম্পদ্। সুতরাং কবি কল্পনা করিয়াছেন, বঙ্গমাতার কোল ভরিয়া সোনার ধান। **বুকভরা যার স্নেহ**—বঙ্গদেশ নদীবহুল। এই নদীগুলি যেন সন্তানের জন্য বঙ্গজননীর স্বতঃ-উৎসারিত স্নেহধারা। মাতৃস্নেহ যেমন সন্তানের পক্ষে পরম মঙ্গলকর এবং অমঙ্গলনাশক, এই নদীগুলিও তেমনই বঙ্গদেশকে উর্বর করিয়া আমাদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। **চরণে পদ্ম**—বঙ্গদেশে অজস্র পদ্মফুল ফোটে। এগুলি যেন বঙ্গমাতার চরণে বঙ্গবাসীর ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে শোভমান। **অতসী**-

অপরাজিতায় ভূষিত দেহ –বাঙলা নানাপ্রকার ফুলের দেশ। ইহার অতসী এবং অপরাজিতা ফুল দিয়া যেন বঙ্গজননীর দেহভূষণ রচিত হইয়াছে। **সাগর যাহার বন্দনা রচে শততরঙ্গভঙ্গে**—বঙ্গদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার শত শত ঊর্মির অবিরাম উত্থান-পতনে যে গম্ভীর গর্জন শুনা যায়, তাহা যেন বঙ্গমাতারই বন্দনাগীতি বা প্রশস্তি। **বাঞ্ছিত ভূমি** –প্রিয় স্থান, আকাঙ্ক্ষিত স্থান, যে দেশে সকলেই বাস করিতে ইচ্ছা করে। তুলনীয়' "আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।" দ্বিজেন্দ্রলাল।

পঙ্‌ক্তি ৯-১৬। বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইত্যাদি—বঙ্গদেশের অরণ্যরাজিতে, বিশেষ করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে, হিংস্র ব্যাঘ্রকুলের বাস বাঙালীর এমনই শক্তি যে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাহারা বাঁচিয়া আছে। **আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই**—বঙ্গে অনেক সাপুড়িয়া আছে। তাহারা অবলীলাক্রমে বিষধর সর্পকে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা খেলা দেখায়। **নাগেরই মাথায় নাচি**—ইহার দ্বারা বালক শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমনের চিত্রটিই মনে জাগে। বাঙালী তেমন কিছু করে নাই বটে, তবে তাহারা বালক শ্রীকৃষ্ণের মতো সর্পকুলকে বশীভূত করিয়াছে—ইহাই কবির বক্তব্য। বাঙালী বিষধর সর্পকে ভয় তো করেই না, বরং তাহাকে লইয়া খেলা করে। **চতুরঙ্গ** –হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চারিপ্রকার বাহিনীসজ্জিত সৈন্যদল। **দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে**—রাবণবিজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘুর সহিত। **আমাদের সেনা ··প্রপিতামহের সঙ্গে**—বাঙালী শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। দুর্ধর্ষ রাক্ষস লঙ্কারাজ রাবণকে যিনি নিহত করিয়াছিলেন সেই রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘুর সহিতও তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে। কবি এখানে কৌশলে বাঙালীর শৌর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ত্রিভুবনজয়ী রাবণকে যিনি জয় করিয়াছিলেন, তাহারই প্রপিতামহের শৌর্য যে কত বেশি ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাঙালী সৈন্যগণ সেই অমিতবল দিগ্বিজয়ী বীরের সহিতও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং বাঙালীর শৌর্যের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নাই। **প্রপিতামহ**—পিতামহের অর্থাৎ ঠাকুরদাদার পিতা। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ, তাঁহার পিতা অজ, অজের পিতা রঘু। অতএব রঘু রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ-কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনার মধ্যে বঙ্গ-বিজয়েরও উল্লেখ আছে। তুলনীয়: "বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু

ষঃ”—রঘুবংশম্, চতুর্থ সর্গ। **আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ**—বঙ্গের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ বাঙালী ছিলেন। তিনি পিতা-কর্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নৌবাহিনী লইয়া লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। **লঙ্কা করিয়া জয় সিংহল নামে……পরিচয়**—বিজয়সিংহ তাঁহার নৌবাহিনীর সাহায্যে লঙ্কা জয় করেন। তাঁহার নাম-অনুসারে লঙ্কার নাম হয় ‘সিংহল’। এই ‘সিংহল’ নামের মধ্যেই তাঁহার শৌর্যবীর্যের খ্যাতি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তুলনীয়ঃ “একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়”—দ্বিজেন্দ্রলাল। [বিজয়সিংহকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহার মতে বিজয়সিংহ গুজরাট-বাসী।] **মগ**—ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিরীহ নৌকাযাত্রীদের ধনপ্রাণ হরণ করিত। ইহাদের এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদিগের উপদ্রবে বাঙলার নদীপথ এক-সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। রুখেছি—বাধা দিয়াছি। **মোগলেরে**—মোগল, বিশেষ করিয়া সম্রাট্ আকবরের সৈন্যগণকে। **এক হাতে মোরা ……আর হাতে**—বাঙালীর পরাক্রম তুচ্ছ নহে। তাহারা যুগপৎ দুই দিক্ হইতে দুই প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছেন—ইহাদের একদল দুর্ধর্ষ জলদস্যু মগ, আর একদল দিল্লীর মোগল সম্রাট্ আকবরের সৈন্যগণ। বাঙলার বারভূঞার প্রবল প্রতিরোধ এক সময়ে মোগল-সম্রাট্‌কেও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। **চাঁদপ্রতাপের হুকুমে** চাঁদ রায় ও প্রতাপাদিত্যের আদেশে অর্থাৎ বিরোধিতায়। চাঁদ রায় ছিলেন বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম। বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। প্রতাপাদিত্য যশোহরের স্বনামধন্য স্বাধীন নরপতি। হঠিতে—পশ্চাদপসরণ করিতে। **দিল্লীনাথে**—দিল্লীর সম্রাট আকবরকে অর্থাৎ তাহার সৈন্যদলকে।

পংক্তি ১৭-২৪। **জ্ঞানের নিধান**—জ্ঞানের আকর। **আদি বিদ্বান্**—প্রথম অর্থাৎ বহুপ্রাচীন বিদ্বান্। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যকার কপিলকে আদি বিদ্বান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইঁহার আবির্ভাবের কাল সঠিক জানা যায় না। **কপিল সাংখ্যকার**—হিন্দু ষড়-দর্শনের অন্যতম সাংখ্য-দর্শনের রচয়িতা কপিলমুনি। ইনি বাঙালী ছিলেন। গঙ্গাসাগর-সংগমের নিকট ইঁহার আশ্রম ছিল। **গাঁথিল সূত্রে হীরকহার**—সূতার সাহায্যে যেমন হীরকখণ্ড গাঁথিয়া মালা প্রস্তুত করা যায়, কপিলও সেইরূপ

জ্ঞানগর্ভ সূত্রের (ব্যাকরণাদিতে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য) সাহায্যে অমূল্য সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন। হীরকহার যেরূপ মহামূল্য, এই সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ জ্ঞানগর্ভ। 'সূত্র' কথাটি এস্থলে দুইটি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। **অতীশ**—ইনি 'দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ' বলিয়া পরিচিত। ৯৮০ খৃস্টাব্দে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী-নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। অল্পবয়সেই ইনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত বহু শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ব্রহ্মদেশের চন্দ্রকীর্তি-নামক জনৈক বৌদ্ধযাজকের নিকট দ্বাদশ বৎসর থাকিয়া যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ওদন্তপুরীর মহাসাঙ্ঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর ইঁহার উপাধি হয় 'দীপংকর শ্রীজ্ঞান'। কালক্রমে ইঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তিব্বতে পৌঁছিলে সেখানকার তদানীন্তন রাজা লামা ইয়াসি হোড তাঁহাকে নিজদেশে লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল হন। অবশেষে এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের নিবন্ধাতিশয্যে অতীশ ৬০ বৎসর বয়সে বহুকষ্টে তুষারাবৃত হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে পৌঁছেন। সেখানে তিনি ১৫ বৎসর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া ১০৫৩ খৃঃ অব্দে বর্তমান লাসা নগরীর নিকটস্থ নিয়াথাং নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি আপন প্রতিভাবলে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। লঙ্ঘিল—লঙ্ঘন করিল, অতিক্রম করিল। **গিরি**—হিমালয় পর্বত। **জ্বালিল জ্ঞানের দীপ**—আপামর-সাধারণকে বৌদ্ধশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি শিখাইয়া জ্ঞানরূপ আলোক বিতরণ করিল। দীপ যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া বস্তুর স্বরূপকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে, জ্ঞানও সেইরূপ আমাদের অন্তরের অজ্ঞানতা দূর করিয়া সত্যদর্শনের শক্তি দেয়। এইজন্যই জ্ঞানকে দীপরূপে কল্পনা করা হয়। **দীপংকর**—'অতীশ' দেখ। **বি. দ্র.**—অতীশ এবং দীপংকর দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন—একই ব্যক্তি। কিশোর বয়সে—অল্প বয়সে। **পক্ষধর**—(১) মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র। ইনি রঘুনাথ শিরোমণির গুরু ছিলেন। (২) পক্ষ (অর্থাৎ পাখা) ধরে যে—পক্ষী। (৩) তর্কযুদ্ধে কোন বিশেষ পক্ষ বা সিদ্ধান্ত-অবলম্বী। **পক্ষশাতন করি**—(১) পাখা কাটিয়া দিয়া (শাতন = ছেদন)। (২) সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত করিয়া, যুক্তি খণ্ডন করিয়া, তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া। বাঙালী একচক্ষু নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার গুরু পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়ের বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। **বাঙালীর ছেলে**—রঘুনাথ শিরোমণিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক।

নব্যন্যায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র নবদ্বীপে ইঁহার জন্ম। **যশের মুকুট পরি**—খ্যাতি ও সম্মানে বিভূষিত হইয়া। **বাংলার রবি**—সূর্যের ন্যায় প্রতিভাচ্ছটায় বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী। **জয়দেব কবি**—ইনি বাংলাদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। **কান্ত কোমল পদে**—'গীতগোবিন্দে'র পদগুলি সুন্দর (কান্ত) এবং শ্রুতিমধুর (কোমল)। তাঁহার পদগুলি সম্বন্ধে এই বিশেষণ দুইটি জয়দেব নিজেই প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়ঃ "মধুরকোমলকান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্"। **সুরভি**—সুঘ্রাণযুক্ত, সুগন্ধ। **কাঞ্চন-কোকনদে**—স্বর্ণময় পদ্মকে। কোকনদ—রক্তপদ্ম। তুলনীয়ঃ "মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে"—মাইকেল মধুসূদন। **কান্ত কোমল পদে........ কাঞ্চন-কোকনদে**—সংস্কৃত সাহিত্যরূপ সোনার পদ্ম সুন্দর হইয়াও এপর্যন্ত গন্ধ অর্থাৎ মাধুর্যহীন ছিল। জয়দেব তাঁহার 'গীতগোবিন্দে'র সুললিত পদমাধুর্যে যেন ইহাতে সুঘ্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন অর্থাৎ ইহাকে যুগপৎ রমণীয় ও রসিকজনের উপভোগ্য কারয়া তুলিয়াছেন।

পঙ্‌ক্তি ২৫-৩২। **স্থপতি**—গৃহনির্মাণশিল্পী। **'বরভুধর'**—যবদ্বীপের বোরোবুদুর মন্দির। ইহা একটি বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ এবং ইহাতে হিন্দুর বহু দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। প্রাচীনকালে বহু বাঙালী পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কতকগুলি দ্বীপে এবং শ্যাম-কম্বোজ প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কবি অনুমান করিয়াছেন, এই মন্দির তাঁহাদেরই কীর্তি। 'বরভূধর' কথাটির অর্থ 'বৃহৎ পর্বত'। সম্ভবতঃ কবি মন্দিরটির বৃহৎ আকার হইতেই এই নাম কল্পনা করিয়াছেন। **শ্যাম কাম্বোজ**—শ্যামদেশ (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) ব্রহ্মদেশের পূর্বে। কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া) বর্তমান ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ। এইসকল দেশেও বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারলাভ করিয়াছিল। **'ওংকার ধাম'**—কাম্বোজে সুবৃহৎ অংকার-ভট মন্দির। ইহা কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী অঙ্কোর বা এঙ্কোরের বৃহত্তম বিষ্ণুমন্দির এবং একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। ইহা বাঙালীর কীর্তি। কবি অঙ্কোর বা এঙ্কোর কথার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া 'ওংকার' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। অনেকের মতে 'ওংকার মঠ' হইতে অপভ্রংশ হইয়া 'অঙ্কোর ভট' হইয়াছে। আর একমতে সংস্কৃত 'নগর' শব্দ কাম্বোজ ভাষায় 'অংগর' এবং 'ভট' অর্থে মন্দির। অতএব

অঙ্কোর-ভট অর্থে 'নগরমন্দির' বুঝাইতেছে। **ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে**—যাহা কেবল কল্পনাদ্বারাই উপলব্ধি করা যায়, অনুকরণের দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, সেই অমূল্য ভাবরূপ সম্পদ্কে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে—তাহাকেই প্রস্তরে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ভাস্কর—প্রস্তরাদি কাটিয়া যাহারা মূর্তি নির্মাণ করে (sculptor)। **বিটপাল আর ধীমান্**—ধীমান্ একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ভাস্কর ও চিত্রকর। ইনি রাজা ধর্মপালের (খৃস্টীয় নবম শতাব্দী) সমসাময়িক। বীতপাল (বিটপাল) ধীমানের পুত্র। ইনিও একজন ভাস্কর ছিলেন এবং বাঙালীর ভাস্কর্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। সুপটু—সুনিপুণ, সুদক্ষ। **পটুয়া**—চিত্রকর। **লীলায়িত তুলিকায়**—নিপুণ এবং সাবলীল তুলিকাস্পর্শে। অনুপ্রাস লক্ষণীয়। **অজন্তা**—হায়দ্রাবাদের (দাক্ষিণাত্যে) অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার গুহামন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্যগুলি পৃথিবীখ্যাত। পর্বত ক্ষোদিত করিয়া এই মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। মন্দির গাত্রে নানাবিধ চিত্র খৃস্টীয় পঞ্চম, নবম ও দশম শতাব্দীতে অঙ্কিত হইয়াছিল। এগুলি অতি উন্নত চিত্রকলার পরিচয় দেয়। পটচিত্রাঙ্কন বাঙালীর নিজস্ব বস্তু। এজন্য কবি অনুমান করিয়াছেন যে, অজন্তার গুহা মন্দিরের চিত্রগুলিও সম্ভবতঃ বাঙালীপটুয়ার কীর্তি। **কীর্তন**—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সংগীত। এই সংগীতও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ্; **বাউলের গানে**—বাউল-নামক বৈরাগী-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সুরের সংগীতে। ইহাদের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম। গান গাহিয়া ভিক্ষা করাই সাধারণতঃ ইহাদের উপজীবিকা। [রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাউল সুরে গীত হয়।] **আমরা দিয়েছি খুলি……যতগুলি**—কীর্তন এবং বাউল গানের মধ্য দিয়াই বাঙালী তাহার ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের ভাবরাজি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই গানগুলির মধ্যেই বাঙালীর ভক্তিরসাতুর হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

পঙ্‌ক্তি ৩৩-৪০। **মন্বন্তরে**—দুই মনুর শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়কে 'মন্বন্তর' বলা হয়। এস্থলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথাই বলা হইয়াছে। ইহা ইতিহাসের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ইহার একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে এবং ইহারই পটভূমিকায় আনন্দমঠ রচিত। **মন্বন্তরে……আমরা**—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ন্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াও বাঙালী বাঁচিয়া আছে। তাহার প্রাণশক্তি এতই প্রচুর। মারী—ব্যাপকভাবে ওলাউঠা, বসন্ত

প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ। **মারী নিয়ে ঘর করি**—মহামারী বাঙালীর জীবনে নিত্যসংচর। বিধির আশিসে—ভগবানের আশীর্বাদে। **অমৃতের টিকা পরি**—অমৃতের স্পর্শে বা তাহা পান করিলে নাকি মানুষ অমর হয়। ভগবান্ যেন তাহার অক্ষয় আশীর্বাদস্বরূপ বাঙালীর ললাটে অমৃতের টিকা পরাইয়া দিয়া তাহাকে দুর্ভিক্ষ-মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। **দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি**—বাঙলার বৈষ্ণব সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—জ্ঞানমার্গ তাঁহারা অবলম্বন করেন নাই। এই সকল ভাব নিবিড় আত্মীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই দেবতা বাঙালীর আত্মীয়। তুলনীয়: "এদেশ মানবের দেশ, বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে' নিয়েছে। বাংলার শিব-দুর্গায় বাঙালী-চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গা-গৌরীর কোন্দলে শিব-দুর্গার কলহে আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া। ভালমন্দ সব নিয়েই আমাদের শিব আমাদের আপন মানুষ!······দেবতাকে প্রেমের জন ব'লে দেখেছেন ব'লে বাংলাদেশের সাধকেরা তাঁদের রচনায় যে দরদ দেখিয়েছেন সে-দরদ আমরা শাস্ত্রপন্থীদের কাছে আশাই করতে পারি নে।"—রবীন্দ্রনাথ। **আকাশে প্রদীপ জ্বালি**—বঙ্গের হিন্দুরা লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কার্তিকমাসে প্রতিসন্ধ্যায় শূন্যদেশে প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়। **মানুষের ঠাকুরালি**—মানুষের মধ্যেও দেবত্ব। এই অংশটি ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার ন্যায় মহামানবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন 'দেবতায় মানুষে এখানে কোনো অনৈক্য নেই'। **আমাদেরি···ঠাকুরালি**—বঙ্গে অনেক গৃহে এমন অনেক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে যাঁহারা দেবতার সমকক্ষ হইয়াছেন এবং দেবতার ন্যায় সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছেন। **বিশ্বভূপের ছায়া**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবানের ঐশী শক্তির আভাস। **ঘরের ছেলের······ছায়া**—দেবতা বাঙালীর ঘরের ছেলে। তাহারই মধ্যে আমরা ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এস্থলে বালক শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে যশোদার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডদর্শনের কাহিনীটির কথা মনে পড়ে। **হিয়া অমিয় মথিয়া**—হৃদয়ের অমৃত মথিত করিয়া। **বাঙালীর হিয়া অমিয়······কায়া**—বাঙালীর ভক্তি প্রবণতা, তাহার অন্তরে যাহা কিছু সুকুমার, যাহা কিছু মধুর, তাহারই মূর্ত রূপ যেন নিমাই (শ্রীগৌরাঙ্গ)। **নিমাই**—শ্রীচৈতন্য; গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ। **বীর সন্ন্যাসী**—ধর্মবীর নির্ভীক সাধু। **বিবেকের বাণী**—স্বামী

বিবেকানন্দের বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সম্পদের বাণী সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করিয়া প্রতীচ্যে নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়াছেন। বিবেকের বাণী যেরূপ অভ্রান্ত, তাঁহার বাণীও সেইরূপ। 'বিবেকের বাণী' এখানে দ্ব্যর্থক। **ব্যাঘ্রে বৃষভে**—বাঘে গোরুতে। **বাঙালীর ছেলে……সমন্বয়**—গোরুর সহিত বাঘের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তাহাদের সমন্বয় যেরূপ অসম্ভব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবগত মিলনও সেইরূপ অসম্ভব। কিন্তু বিবেকানন্দ এই অসম্ভব কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং কবির বিশ্বাস, এই অসম্ভব একদিন এই বাঙালী ছেলের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই সম্ভব হইবে।

পংক্তি ৪১-৪৮। তপের প্রভাবে—সাধনার বলে। **বাঙালী সাধক**—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে। **জড়ের পেয়েছে সাড়া**—জড় পদার্থের মধ্যেও চেতনের ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে মানুষের মতো উদ্ভিদ, এমন-কি ধাতব পদার্থের প্রাণ আছে (অবশ্য ধাতব পদার্থ বা প্রস্তর প্রভৃতির যে প্রাণ নাই তাহা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন)। শব-সাধনা—মৃতদেহ লইয়া তান্ত্রিক সাধনা। শব-সাধনার বাড়া—শব-সাধনা অপেক্ষাও শ্রেয়। **আমাদের এই নবীন সাধনা** ইত্যাদি—বাঙালী বৈজ্ঞানিকের যে নূতনতর সাধনা, তাহা শব-সাধনা অপেক্ষা বড, কারণ শব-সাধনায় শব শবই থাকিয়া যায়—তাহার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সাধনা জড় পদার্থের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'শব-সাধনা' কথাটি কবি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেন নাই। 'শব-সাধনা' এখানে শবের সাধনা, শবের উপর বসিয়া সাধনা নহে। শব নিষ্প্রাণ হইলেও প্রাণের ভাবানুষঙ্গ তবু তাহাতে থাকিয়া যায়, কিন্তু জড় জড়ই—উহাতে ভাবের দিক্ দিয়াও চেতনা কল্পনাতীত। অতএব এই কল্পনাতীত বস্তুর আবিষ্কার শব-সাধনা হইতেও মহত্তর। বিষম ধাতু—বিপরীতধর্মী মৌলিক পদার্থ। মিলন ঘটায়ে—রাসায়নিক সংযোগ ঘটাইয়া। **বাঙালী**—এখানে প্রসিদ্ধ বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই লক্ষ্য। দিয়েছে বিয়া—বিবাহ দিয়াছে অর্থাৎ বিবাহের ফলে নরনারীর জীবন যেমন এক হইয়া যায়, সেইরূপ রাসায়নিক সংযোগের ফলে তাহাদের পৃথক্ সত্তার লোপ ঘটাইয়া তাহাদিগকে এক বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। **বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে** ইত্যাদি—বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিপরীতধর্মী মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ

ঘটাইয়া এক অভূতপূর্ব নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পারদ ও নাইট্রোজেন অম্ল লইয়া গবেষণা করিতে করিতে Mercurous Nitrite নামে একটি পদার্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার পূর্বে অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক ইহা প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। **নব্য রসায়ন**—নূতন রসায়নবিদ্যা। প্রচলিত রসায়নবিদ্যা কেবল বস্তুজগৎকে লইয়া, কিন্তু বাঙালার নূতন রসায়নবিদ্যা বস্তুজগতের সীমা অতিক্রম করিয়া ভাবলোকেও গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিভিন্ন ভাবের মধ্যেও তাহাদের প্রতিভা মিলন ঘটাইতে পারিয়াছে। **গরমিলে মিলাইয়া**—আপাতদৃষ্টিতে যাহাদের মধ্যে মিলন অসম্ভব তাহাদের মধ্যেও মিলন ঘটাইয়া। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ও কৃষ্টির মধ্যে বাঙালীই সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছে। **বাঙালার কবি গাহিছে জগতে** ইত্যাদি—বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় বিশ্বমানবকে মহামিলনযজ্ঞে আহুতি দিতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। বিশ্বমানবতার মিলনমন্ত্র এই কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত হইয়াছে। বিফল নহে এ বাঙালী জনম ইত্যাদি—পৃথিবীতে যে আমরা বাঙালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, বাঙালীজীবন যাপন করিতেছি, তাহা নিষ্ফল নহে। পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির মতো বাঙালীরও বৃহত্তর মহত্তর কোনো কর্তব্য সম্পন্ন করিবার আছে। ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই—বাঙালীর সাধনা ভবিষ্যতে যেদিন সিদ্ধিলাভ করিবে সেই দিনটির দিকে আমরা তাকাইয়া আছি—কবে সেই শুভদিন জগতে আসিবে। **বিধাতার কাজ**—ভগবান্ যে মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা সাধন করিবার জন্য বাঙালী জাতিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। ধাতা—পরমেশ্বর।

পংক্তি ৪৯-৫৬। শ্মশানের বুকে—দক্ষিণেশ্বরের নিকটে গঙ্গা-তীরস্থ শ্মশানের উপর। **পঞ্চবটী**—যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে ছায়া-শীতল স্থানটিতে বসিয়া সাধনা করিতেন, তাহার নাম পঞ্চবটী। ইহা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানে পাঁচটি না থাকিলেও একটি বটগাছ আছে। **শ্মশানের বুকে আমরা** ইত্যাদি—বাঙালীদের মধ্যেই এমন মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, যিনি শ্মশানকেও ছায়া-শীতল মহামিলনের পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছেন। শ্মশানের অদূরে পঞ্চবটীতে বসিয়াই যুগন্ধর মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিতেন। তাই সেই স্থান জগতের সকল জাতির, সকল ধর্মের লোকের পক্ষেই তীর্থক্ষেত্র-স্বরূপ।

তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব ইত্যাদি—যেদিন লক্ষকোটি জগদ্‌বাসী মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাস্থল পঞ্চবটীই হইয়া উঠিবে বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র, বিশ্ববাসীর তীর্থক্ষেত্র। আর এই অসাধ্যসাধন বাঙালীর সাধনার বলেই হইবে। অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা—যে মহৎ কর্মের আরম্ভ অতীতে হইয়াছে (কিন্তু এখনো সমাপ্তির অপেক্ষা রাখে)। সে ঘটনা হবে হবে—তাহা অর্থাৎ বিশ্বমানবের মিলন অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হইবে। দুইবার 'হবে'-র প্রয়োগ ভবিষ্যদ্‌বাণীকে শক্তিশালী করিতে। ভরিবে ভুবন—পৃথিবী পূর্ণ হইবে। অনুপ্রাস লক্ষণীয়। **লাগিবে না তার বেশি**—প্রতিভা ও সাধনা ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হইবে না। **লাগিবে না তাহে বাহুবল**—বাঙালী যে বিশ্বমানবের মহামিলন ঘটাইবে তাহা বিশ্ববাসীর চিত্তকে জয় করিয়া। কিন্তু এই জয়ের ব্যাপারে শারীরিক শক্তি বা অস্ত্রের প্রয়োগ তাহাকে কখনোই করিতে হইবে না। **জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি**—বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে যে বিদ্বেষভাব স্বভাবতঃই জাগে তাহা দেখা যাইবে না, কারণ বাঙালীর বিশ্বজয় হইবে প্রকৃতপক্ষে চিত্তজয়। **মিলনের মহামন্ত্রে**—যে অপূর্ব বাণী ও আদর্শ সমগ্র পৃথিবীর জনসমূহকে এক করিয়া দিবে তাহারই সাহায্যে। **মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা**—মহামিলন-সাধনের যে শক্তি ও প্রতিভা দিয়া ভগবান্ বাঙালীকে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই ঋণ পরিশোধ হইবে, আমরাও দেবতার ঋণমুক্ত হইতে পারিব। এই অংশটি Bible-এর The Parable of the Talents-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ব্যাখ্যা

(১) মুক্তবেণীর গঙ্গা ……কিরণে ভুবন আলা। (স্তবক ১)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতার প্রথমাংশ। কবি এস্থলে রূপকের মধ্য দিয়া বাঙলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী নামক স্থানে যমুনা সরস্বতী হইতে পৃথক হইয়া মুক্তবেণী গঙ্গাসাগরে গিয়া মিশিয়াছে। এই সাগরসঙ্গমে গঙ্গা আবার পথের সকল বাধা হইতে মুক্ত হইয়া অবারিত ও স্বচ্ছন্দগতি হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগরে মুক্তবেণী মুক্তহস্তে পুণ্য বিতরণ করেন। এখানে স্নান করিলেই মোক্ষলাভ হয় বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। এই পুণ্যসলিলা গঙ্গার স্পর্শে পবিত্র গঙ্গাতীর্থে আমরা বাস করি। এই দেশ আমাদিগকে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সকল বস্তুই দান করে। এই সুসমৃদ্ধ দেশে বাস করিয়া আমাদের কোনো-কিছুরই অভাব নাই। জীবনধারণের প্রতিটি উপকরণ এখানে এত অনায়াস-লভ্য যে আমরা যেন তাহা বঙ্গজননীর ঘরে বিনা শ্রমেই লাভ করিয়া থাকি। বাঙলাদেশের বামপার্শ্বে আসাম অঞ্চলে প্রচুর কমলালেবু জন্মে। তাই কবি কল্পনা করিয়াছেন, বঙ্গমাতার বামহাতে কমলার ফুল। দক্ষিণ পার্শ্বে বিহার প্রদেশের সীমায় প্রচুর মহুয়াগাছ, সুতরাং বঙ্গমাতার ডান হাতে মহুয়াফুলের মালা। বাঙলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতের তুষারধবল উচ্চশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেই শৃঙ্গের উপর সঞ্চিত তুষাররাশিতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় সোনালী বর্ণে চারিদিক্ আলোকিত হইয়া উঠে। দেখিয়া মনে হয়, বঙ্গজননী সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া দেবীরূপে বিরাজমান।

[মুক্তবেণীর গঙ্গা—ইহার উপর টীকা লেখ।

(২) বাঘের সঙ্গে····· প্রপিতামহের সঙ্গে। (স্তবক ২)

এই পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-নামক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের প্রথমার্ধ। কবি এস্থলে বাঙালীর শৌর্যবীর্যের কথা বলিয়াছেন।

বাঙলাদেশের দক্ষিণাংশে সুন্দরবন। সেখানে হিংস্র ব্যাঘ্র এবং বিষধর সর্পকুলের বাস। সেইসকল হিংস্র প্রাণীর সহিত সংগ্রাম করিয়া আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি, অর্থাৎ তাহাদের পরাক্রম অত্যধিক হইলেও বাঙালী তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছে। আমরা সাপ লইয়া খেলা করি, সাপের মস্তক পদদলিত করি। যুদ্ধবিদ্যাতেও বাঙালী কম নহে। রাবণকে জয় করিয়াছিলেন মহাবীর রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের প্রপিতামহ হইলেন দিগ্বিজয়ী রঘু। সেই রঘুর সঙ্গে বাঙালীরা যুদ্ধ করিয়াছিল; সেই যুদ্ধে বাঙালীর পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথী বাহিনী রঘুর সৈন্যদলকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাই বাঙালীর শক্তির পরিচয়। বহু হিংস্র জন্তুর সহিত সংগ্রামে বাঙালী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণকে বাধা দিতেও বাঙালী পশ্চাৎপদ হয় নাই।

[নাগ, দশানন, চতুরঙ্গ—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(৩) জ্ঞানের নিধান......দীপংকর। (স্তবক ৩)

এই পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' নামক কবিতার তৃতীয় স্তবকের প্রথমার্ধ। কবি এস্থলে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে বাঙালীর অবদানের কথা বলিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ভারতে যখন দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব হয়, তখন সর্বপ্রথম মহাজ্ঞানী মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের সূত্র রচনা করেন। কপিল ছিলেন বাঙালী। এখনো বাংলাদেশে কপিলাশ্রম রহিয়াছে। অতএব বাঙালীই যে ভারতে প্রথম দার্শনিক জ্ঞান প্রচার করেন ইহা অত্যুক্তি নহে। কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনে যে সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অথবা যে সকল সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হীরকখণ্ডের ন্যায় বহুমূল্য কঠিন ও উজ্জ্বল। হীরার টুকরা সূতায় গাঁথিয়া যেমন হার তৈয়ারী করা হয়, তেমনি মহর্ষি কপিল ঐ সকল তত্ত্ব ও সত্যকে সূত্রের দ্বারা পর পর সন্নিবিষ্ট ও গ্রথিত করিয়া হীরকহারের ন্যায় মহামূল্য ভাবসম্পদের সৃষ্টি করেন। জ্ঞানানুশীলনে বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় আরো আছে। বৌদ্ধযুগে বাঙালী অতীশ দীপংকর জ্ঞানপ্রচারের নিমিত্ত তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে হিমালয়ের তুষারাবৃত ভীষণ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রদীপ জ্বালিলে যেমন ঘোর অন্ধকার বিলুপ্ত হয়, তেমনি দীপংকর-প্রচারিত জ্ঞানের দ্বারা তিব্বতবাসীর অজ্ঞানরাশি দূরীভূত হইয়াছিল।

[কপিল সাংখ্যকার, সূত্র—ইহাদের উপর টীকা লেখ। 'সূত্র' কথাটির দুইটি অর্থ বুঝাও। অতীশ দীপংকরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।]

(৪) কিশোর বয়সে......কাঞ্চন-কোকনদে। (স্তবক ৩)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-নামক কবিতার তৃতীয় স্তবকের শেষার্ধ। কবি এস্থলে বাঙালীর পাণ্ডিত্য ও কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

বাঙালীর কৃতী সন্তান রঘুনাথ শিরোমণি অতি অল্প বয়সে অসাধারণ ধীশক্তি দেখাইয়াছিলেন। তিনি মিথিলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট গিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া অবশেষে তিনি পক্ষধর মিশ্রকেই শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করেন। পাখির পাখা কাটিয়া দিলে সে যেমন আর উড়িতে পারে না, তেমনি পক্ষধর মিশ্রও বাঙালী রঘুনাথের নিকট

পরাজিত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব হারাইলেন—তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল। রঘুনাথ বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সুযশ তাঁহার মাথায় মুকুটস্বরূপ হইল। মুকুটে যেমন রাজার মস্তক অলংকৃত হয়, সেইরূপ সুযশ রঘুনাথকে সুশোভিত করিল। তারপর বাঙালী কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের মধুর ললিত পদাবলী রচনা করিয়া সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। সংস্কৃত সাহিত্য যেন একটি সোনার পদ্ম—অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু দুর্বোধ্য হওয়ায় জনসাধারণ তাহার রসাস্বাদে বঞ্চিত ছিল। সূর্যের উদয়ে যেমন পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার সুগন্ধ ছড়াইয়া থাকে, তেমনি জয়দেবের লেখনীস্পর্শেসংস্কৃত সাহিত্য এক অপূর্ব মাধুর্য লাভ করিয়া জনসাধারণের নিকট পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

[পক্ষধর, পক্ষশাতন, কাঞ্চন-কোকনদ, এবং কান্ত কোমল পদ—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(৫) কীর্তনে আর বাউলের ·····যতগুলি। (স্তবক ৪)

এই দুইটি পঙ্‌ক্তি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতার চতুর্থ স্তবকের শেষাংশ। কবি এস্থলে বাঙালীর বিশিষ্ট সংগীত এবং তাহার মধ্যে বাঙালীর প্রাণের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার কথা বলিতেছেন।

বাঙালীর স্বকীয় সংগীত-শিল্প হইল কীর্তন ও বাউল। এই দুইপ্রকার গান বাঙলার বিশেষত্ব। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ প্রধানতঃ কৃষ্ণপ্রেম অবলম্বন করিয়া কীর্তনগানের সৃষ্টি করেন এবং বাউল নামে অন্য উপাসক-সম্প্রদায় দার্শনিক তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যাস্বরূপ বাউলগানের উদ্ভাবন করেন। প্রেমই সমাজ-বন্ধনের মূলসূত্র। প্রেমই মানুষের কাছে মানুষকে টানিয়া আনে এবং পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে। সেই প্রেম লইয়াই কীর্তনগান। তাই উহাতে মানুষের মনের নিভৃত ভাবগুলি প্রকাশ পায়। বাউলগানেও সেইরূপ। জন্ম-মৃত্যু, সংসার-মায়া, সুখ-দুঃখ, পরলোক, ভগবৎকৃপা—এইসকল লইয়াই বাউলের গান রচিত। এই গানের মধ্য দিয়াই বাঙালীর অন্তরের গোপন ভাবরাশির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। বাঙালী কি চায়, তাহার জীবনাদর্শ কি, অতি সহজ এবং সরলভাবে এই গানগুলির মধ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঘরের দরজা খুলিলে যেমন বাহিরের আলোক আসিয়া ঘরের মধ্যস্থিত সকল বস্তুকেই

স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করে, কীর্তন ও বাউলগানের মধ্য দিয়াও সেইরূপ বাঙালীর ভক্তিরসাতুর ও মানবপ্রেমিক অন্তর শ্রোতার নিকট স্বচ্ছ হইয়া উঠে।

[কীর্তন ও বাউলের গান—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(৬) দেবতারে মোরা আত্মীয়……ধরেছে কায়া। (স্তবক ৫)

এই পঙক্তিচতুষ্টয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-নামক কবিতার অন্তর্গত। কবি এস্থলে বাঙালীর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা বাঙালী। স্বর্গে মর্ত্যে যোগ রাখি ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব। বাঙালীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে ইহা প্রকাশিত। বাঙালীর ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আকাশে প্রদীপ জ্বালিবার একটি প্রথা আছে। ইহার অর্থ কি? ঊর্ধ্বে আকাশ—দেবতাদের স্থান। সেখানে প্রদীপ জ্বালিলে দেবতারা প্রীত হন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এইরূপে আমরা দেবতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করি। দেবতারা আমাদের অতি প্রিয় আপনার জন। বাঙলার বৈষ্ণব সাধকগণ সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া দেবতাকে তাঁহাদের নিকট-আত্মীয়রূপে লাভ করিবার চেষ্টা করেন। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে মানুষের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব, মানুষের কাছে দেবতার লীলা। রামকৃষ্ণ, নিমাই—ইঁহারা মানুষের ঘরে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জন্মিলেও দেবতার মতো কার্য করিয়াছেন—দেবতার পদবীতে উঠিয়াছেন।

ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য বাঙালী আমরা বাৎসল্য প্রেমের সাধনা করি। সন্তানকে ঈশ্বররূপে দর্শন করাই আমাদের এই সাধনার মূল-তত্ত্ব। সেইজন্য আমরা যখন আমাদের সন্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই তাহার চক্ষের স্বচ্ছ মণিতে ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিবিম্ব। এইরূপে বাঙালীর আধ্যাত্মিকতা স্বর্গে মর্ত্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। বাঙালীহৃদয়ে যাহা কিছু সুকুমার, মধুর ও পবিত্র তাহা মন্থন করিয়া যে সারবস্তু উঠে, তাহার দ্বারাই যেন নিমাইয়ের দেহ তৈয়ারী হইয়াছিল; তাই তিনি পবিত্র প্রেমধর্ম প্রচার করেন।

[আকাশে প্রদীপ, মানুষের ঠাকুরালি—ইহাদের উপর টীকা লেখ। 'ছিয়া অমিয়' শব্দটির অর্থ লেখ। 'নিমাই'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।]

(৭) দেবতারে মোরা……মানুষের ঠাকুরালি। (ক. বি. ১৯৪৮)

(৬)-নং ব্যাখ্যার প্রথম দুই অনুচ্ছেদই এই অংশটির ব্যাখ্যা।

(৮) বীর সন্ন্যাসী বিবেকের ……ঘটাবে সমন্বয়। (স্তবক ৫)

এই অংশটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-নামক কবিতাটির পঞ্চম স্তবকের অন্তর্গত। বাঙালীর অতীত গৌরবের পরিচয় দিয়া কবি বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলিতেছেন—আমাদের নিরাশ হইবার কোনো কারণ নাই। বাঙালী অধঃপতিত অবস্থা হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিতেছেন রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দকে।

বাঙলাদেশে অতীতকালে অনেক রণবীরের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অমিত পরাক্রম দেখাইয়াছেন। বর্তমান যুগে বাঙলায় এমন বীরপুরুষ আসিয়াছেন, যিনি কন্থা-কৌপীন-সম্বল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নানাস্থানে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তিনি জগদ্বাসী জনগণকে এক নূতন কথা শুনাইয়াছেন—তাহা ভারতীয় বেদান্তদর্শনের মূল তত্ত্ব। তড়িদ্বেগে এই সত্য পৃথিবীর সকল দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আশা হয়, ভবিষ্যতে বাঙালী যুবক বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে অসাধ্য সাধন করিবে—অসম্ভবকে সম্ভব করিবে। বাঘে গোরুতে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বলিয়া ইহাদের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ভবিষ্যতে বাঙালী যুবকেরা তাহাদের সাধনার বলে এই অসম্ভব ঘটনাকেও সম্ভব করিবে। বাঙালীর চেষ্টায় জগতের হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হইবে এবং সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইবে।

[বিবেকের বাণী—ইহার উপর টীকা লেখ। 'বৃষভ' ও সমন্বয়' শব্দ দুইটির অর্থ লেখ।]

(৯) তাপের প্রভাবে বাঙালী…গরমিলে মিলাইয়া। (স্তবক ৬)

এই অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। এস্থলে কবি বাঙালীর সাধনার শ্রেষ্ঠতা ও বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

বাঙালীর সাধনা শতমুখী। অতীতে ও বর্তমানে তাহার সাধনা জীবন ও জগতের প্রতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ফল অর্জন করিয়াছে। বিজ্ঞানে আজ পশ্চিমই অগ্রগামী, কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাঙালীর কৃতিত্ব সামান্য নহে। তাই আমাদের জগদীশচন্দ্র, আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিজ্ঞানীর দরবারে আজ সসম্মানে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছেন। পদার্থবিজ্ঞান ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রই একদা বিরাট

আলোড়ন সৃষ্টি করেন জড়ের চেতনা ঘোষণা করিয়া। উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় জড় ও পাষাণখণ্ডের চেতনা আছে, এ কথা পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণিত করিয়া জগদীশচন্দ্র জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দেন। তারপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন-বিদ্যায় অসাধ্যসাধন করেন পারদ ও নাইট্রোজেন অম্লের অভূতপূর্ব যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া। জড়ের মধ্যে চেতনার আবিষ্কার এক হিসাবে শব-সাধনা অপেক্ষা মহত্তর। তান্ত্রিক সাধক শবের উপর বসিয়া সাধনা করেন। শব শবই থাকিয়া যায়, সিদ্ধিলাভ করেন সাধক। জগদীশচন্দ্র শবের বুকে বসিয়া সাধন করেন নাই, করিয়াছেন শব অর্থাৎ তথাকথিত জড়পদার্থ লইয়া। এই হিসাবে তিনিও শবসাধক, যদিচ তান্ত্রিক-ভাবের নন। জগদীশচন্দ্রের সাধনায় জড় বিশ্বসমক্ষে প্রমাণ করিল যে, সে-ও প্রাণবান্, সে-ও চেতনাদীপ্ত। তাই জগদীশচন্দ্রের সাধনা শব-সাধনা হইতে উন্নততর। দ্বিতীয়তঃ, বিরুদ্ধ ধর্মের পদার্থকে যৌগিকভাবে একীভূত করাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। বস্তুতঃ বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয়েই যেন বাঙালীর প্রতিভা, বাঙালীর সাধনা শ্রেষ্ঠ। এ শুধু বস্তু-রসায়নের ক্ষেত্রেই সত্য নহে—কৃষ্টিগত রসায়নেও বাঙালী এই একই বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। তাই তো বিশ্বমানবতার উদাত্ত বাণী এই দেশেই, এই দেশের কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে উদ্গীত হইয়াছে।

(১০) শ্মশানের বুকে আমরা…জগতের শতকোটি। (স্তবক ৭)

এই অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত। কবি এখানে বাঙালীর সাধনার একটা দিকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বাঙলা মানবধর্মের দেশ। যুগে যুগে এদেশের মহাপুরুষগণ মানবপ্রেম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের সমন্বয়—এই মহান্ আদর্শ এদেশেরই রামকৃষ্ণ প্রচার করিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীচ্ছায়ে নিভৃত সাধনায় পরমহংসদেব যে পরম উপলব্ধিটুকু লাভ করেন, তাহাই আজ সর্বধর্মে ও সর্বমানুষে সমন্বয়সাধনে কার্যকরী হইতেছে। আজ তাই রামকৃষ্ণের সাধনাস্থল বিশ্বমানবের তীর্থস্বরূপ। এখানে আসিয়া জগদ্বাসী মিলিত হইবে। এ এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। যে শ্মশান মানুষের নিকট করুণতম বিচ্ছেদের স্থান সেই শ্মশানের অদূরেই ছিল রামকৃষ্ণের যোগাসন। আবার তাহাই কিনা হইয়া উঠিবে মিলনের পীঠস্থান। আগামী দিনের এই অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বাঙালীর সাধনারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করে।

[শ্মশানের বুকে, পঞ্চবটী—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(২১) **প্রতিভায় তপে সে ঘটনা…মুক্তবেণীর তীরে।** (স্তবক ৭)

এই অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। এই অংশে, বাঙালী যে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাইবে, ইহারই সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় কবির দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙালীর আছে অতুল প্রতিভা, আছে তেমনি অনবচ্ছিন্ন সাধনা। কাজেই বিশ্বমানবকে এক করিবার সামর্থ্য তাহারই আছে। জগতের সকল মানুষ একদা বাঙালীর পৌরোহিত্যে মিলিত হইবে—সে দিন দূরবর্তী নহে। এরূপে কৃষ্টির প্রভাবে জগৎ জয় করা হইবে। বাহুবল বা অস্ত্রবল ব্যতিরেকেও এই যে জয়, ইহা বিজিত-বিজেতার মধ্যে বিদ্বেষের সম্পর্ক স্থাপন করিবে না, স্থাপন করিব প্রেমমধুর মিলনসম্পর্ক। মিলনের মহামন্ত্রে বাঙালী বিশ্বচিত্ত জয় করিবার প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে। ভগবান্ এই ক্ষমতা দিয়া তাহাকে যে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ হইবে সেই দিন, যেদিন বিশ্ব-মানবের ঐক্যবিধান হইবে। সংস্কার-মুক্তির দেশ এই বাঙলা, গঙ্গাদেবী তাই ত্রিধারায় মুক্তচ্ছদে এখানেই অনন্ত সমুদ্রে মুক্তি পাইয়াছেন। মানুষও একদিন বাঙলার সাধনার মোহনাপথে সংস্কার ও সংকীর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহামানবতার মিলনসাগরে একীভূত হইয়া যাইবে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। 'আমরা' কবিতায় কবি বাঙালীর শৌর্যবীর্য ও কৃতিত্বের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা নিজ ভাষায় লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। "বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়"—বাঙালীর সামর্থ্যের কি পরিচয়ে এই মন্তব্য করা হইয়াছে? উত্তরের সমর্থনে পাঠাংশ হইতে উদাহরণগুলি সংগ্রহ কর। (ক. বি. ১৯৫৪)

উ.। সংক্ষিপ্তসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

প্র. ৩। 'আমরা' কবিতার বিষয়-বস্তুর আলোচনা কর।

(ক. বি. ১৯৪৭)

উ. সমালোচনা দেখ।

প্র. ৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটির একটি রসবিচার লেখ।

উ.। 'আমরা' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গ-প্রকৃতির সৌকুমার্য ও বাঙলার জ্ঞান কর্ম সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে একটি সঞ্চিত আবেশে রসমণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য বটে এই বর্ণনায় বাঙলার রূপ, বাঙলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একটিমাত্র সংবদ্ধ রূপ-কল্পনায় সংহতচিত্তে মূর্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে ইহার ভাববস্তুর মধ্যে একটা যে আনন্দঘন গৌরবোল্লাসের আবেগ আদ্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আছে তাহার মধ্যে একটি পরম উপভোগ্যতা আছে।

বাঙলার ভূ-প্রকৃতিকে কবি অংকিত করিয়াছেন মাতৃরূপে। বাম হাতে তাঁহার আসামপ্রান্তের কমলার ফুল, ডান হাতে সাঁওতাল পরগণার মহুয়ার মালা। কপাল বেষ্টন করিয়া মাথায় রহিয়াছে তাঁহার কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণমুকুট। নিম্নবঙ্গই তাঁহার ক্রোড়প্রদেশ। সেখানে স্বর্ণশীর্ষ অজস্র ধান্যশস্য। এই দেশের অসংখ্য নদনদী বঙ্গমাতার স্তন্যধারার মতো স্নেহরসে পুষ্ট। বঙ্গোপসাগরের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ এই মাতৃরূপা বঙ্গভূমির পদপ্রান্তে নিত্য লীলাচঞ্চল, যেন শতকণ্ঠে তাহারা কলকলরবে মাতার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। এই বাঙলারই প্রান্তরে পুণ্যসলিলা গঙ্গা স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত। বাঙালীর পাপক্ষালন তথা মুক্তির জন্য দেবী গঙ্গা যেন অকৃপণ হস্তে তাঁহার বারিধারা এখানে ঢালিয়া দিয়াছেন। বাঙলা তাই তীর্থক্ষেত্র। বাঙালী তাই পরমভাগ্যবান্। এই পর্যন্ত মোটামুটি একটা রূপকল্পনা। ইহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া কবি অচিরেই বাঙলার অতীত হইতে অনাগত ইতিহাসের জ্ঞান কর্ম সাধনা সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। প্রকৃতির ক্রুর পরিবেশে বাঙালীর বীরত্বময় জীবন সংগ্রামে, বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বাঙালীর আত্মরক্ষার শৌর্য, বাঙালীর অভিযান,—জ্ঞানের বা বিক্রমের জয়যাত্রা, বাঙালীর স্থাপত্য ভাস্কর্য ও বিচিত্র শিল্পকর্ম, বাঙালীর ধর্ম ও জ্ঞানসাধনা, বাঙালীর বিজ্ঞানচর্চা—এই বিচিত্র দিকে বাঙালীর অপূর্ব গৌরবে সমুজ্জ্বল ঐতিহ্যটুকু কবির চক্ষে ভাবস্বপ্নে যেন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। কবির উচ্ছ্বসিত আবেগ তখন যেন এক নিঃশ্বাসে বাঙালীর মহিমা সবটুকু বলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। দ্রুতচ্ছন্দে মন্দ্রিত হইয়া উঠে তাঁহার স্ফীতবক্ষের দেশপ্রেম।

এইভাবে দেখিলে কবিতাটির মধ্যে তথ্যঘটিত ত্রুটি নগণ্য হইয়া পড়ে। বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন কিনা অথবা অজন্তা গুহায় বাঙালী

শিল্পীর কীর্তি আছে কি নাই—এইসব প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক গবেষণায় একপ্রকার মূল্য বহন করে। কিন্তু কাব্যকল্পনায় এ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবাদ বা কিংবদন্তীকেও মিথ্যা বলা চলে না। কবিতাটি তাই শুধু অন্ধ দেশপ্রেমিকের আত্মস্তুতি নয়—ইহা এক হিসাবে বহুল ঐতিহাসিক সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর কীর্তিস্তম্ভের সজীব রূপায়ণ, আরেক হিসাবে ইহা বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আদর্শবাদী কবির আন্তরিক আশার একটা উজ্জ্বল বাণীরূপ। 'আমরা' কবিতাকে আমরা তাই উপভোগ করি—উপভোগের চেয়ে বেশী করি উহার সোল্লাস সগর্ব আবৃত্তি। এই আবৃত্তির আতিশয্যটুকু বাধা সৃষ্টি করে না।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ চতুরঙ্গ = চতুঃ + রঙ্গ। মন্বন্তর = মনু + অন্তর। সমন্বয় = সম + অনু + অয়। তাহারি = তাহার + ই (বাঙলা সন্ধি)। সন্ন্যাসী = সম্ + ন্যাসী।

সমাস ঃ বরদ—বর দান করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। কাঞ্চনশৃঙ্গ-মুকুট—কাঞ্চন অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা-নামক শৃঙ্গ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহাই মুকুট (কর্মধারয়)। কোল-ভরা—কোল ভরে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। কনকধান্য—কনকবর্ণ ধান্য (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। শত-তরঙ্গভঙ্গে—শত তরঙ্গ (দ্বিগু); তাহাদের ভঙ্গ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। দশাননজয়ী—দশ আনন যাহার (বহুব্রীহি); তাহাকে জয় করিয়াছেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। প্রপিতামহের—প্রগত পিতামহ (প্রাদি-তৎপুরুষ), তাঁহার। হীরকহার—হীরক নির্মিত হার (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কাঞ্চন-কোকনদে—কাঞ্চনময় কোকনদ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাকে। বাঙালীর-হিয়া-অমিয়—বাঙালীর হিয়া (অলুক ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার অমিয় (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। বিশ্বভূপের—ভূ অর্থাৎ পৃথিবীকে পালন করেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ); বিশ্বের ভূপ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাঁহার। আশা-ভরা—আশায় ভরা (তৃয়াতৎপুরুষ।) পঞ্চবটী—পঞ্চ বটের সমাহার (সমাহার-দ্বিগু)। ভয়ংকর—ভয় করে অর্থাৎ জন্মায় যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। দ্বেষাদ্বেষী—পরস্পর দ্বেষ যাহাতে (ব্যতিহার বহুব্রীহি)।

সমস্তপদ-গঠন: জ্ঞানের দীপ = জ্ঞানদীপ। যশের মুকুট = যশোমুকুট। তপের প্রভাবে = তপঃপ্রভাবে। মিলনের মহামন্ত্রে = মিলনমহামন্ত্রে

সাধু গদ্য-রূপ: বিতরে—বিতরণ করে। রচে—রচনা করে। লঙ্ঘিল—লঙ্ঘন করিল। সাধিবে—সাধন করিবে। (বাঙালীর) হিয়া-অমিয় (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৭)—হৃদয়ামৃত।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: শৌর্য—শূর+ষ্যঞ্। লঙ্ঘিল—লঙ্ঘ্ (সংস্কৃত ধাতু, নামধাতু নয়)+ইল। জ্বালিল—জ্বল্+ণিচ্ (সংস্কৃত ণিজন্ত ধাতু)+ইল। লীলায়িত—লীলা+ক্যঙ্ (নামধাতু)+ক্ত। ঠাকুরালি—ঠাকুর+আলি। কায়া—কায়+আ (স্বার্থে, বাঙলা তদ্ধিত)।

অর্থগত পার্থক্য: ভাস্কর—সূর্য, প্রস্তরশিল্পী; ভাস্বর—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় মারী—মারাত্মক সংক্রামক রোগের ব্যাপক আক্রমণ; মারি—প্রহার করি। টিকা—রোগের মৃদু জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো; টীকা—ব্যাখ্যা, ভাষ্য। সাড়া—শব্দ বা স্পন্দন; সারা—সম্পূর্ণ।

পদ-পরিবর্তন:—মুক্তি—মুক্ত। স্নেহ—স্নিগ্ধ। বন্দনা—বন্দিত, বন্দ্য, বন্দনীয়। নিধান—নিহিত। স্থাপনা—স্থাপিত। সুরভি—সৌরভ।

ব্যাকরণগত টীকা: বিতরে—বি—তৃ (সংস্কৃত ধাতু)+এ: সংস্কৃত ধাতু হইতে সৃষ্ট বাঙলা ক্রিয়া, কেবল পদ্যে ব্যবহৃত।

রচে—রচ্ (সংস্কৃত ধাতু)+এ। পূর্ববৎ।

লঙ্ঘিল—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। পূর্ববৎ

ধেয়ান—ধ্যান>ধেয়ান—বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

জনম—জন্ম>জনম—বিপ্রকর্ষ।

পঞ্চবটী (উ. মা, ১৯৬০)—সমাস দ্রষ্টব্য। সমাহার দ্বিগু সমাসে সমস্তপদটি সাধারণতঃ আকারন্ত ক্লীবলিঙ্গ হয়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গও হয়। এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

মিলাইয়া—মিল+আ (বাঙলা প্রেরণার্থক ধাতু)—ইয়া: প্রেরণার্থক বা তথাকথিত 'ণিজন্ত' ক্রিয়ার উদাহরণ, কিন্তু ণিজন্ত বলা ভুল।

বাক্য-রচনা: বুক-ভরা: মাতৃস্তন্যও যেমন, মাতার বুক-ভরা-স্নেহও তেমন সন্তানের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়।

বাঞ্ছিত: এই পথে গেলে বাঞ্ছিত স্থানে পৌছিতে পারিবে।

নিধান: বৌদ্ধমতে কামনা-বাসনাই সকল দুঃখের নিধান।

অবিনশ্বর : যাঁহারা পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তাঁহারাই ধন্য।

লীলায়িত : শঙ্কর-দম্পতির লীলায়িত দেহচ্ছন্দ দর্শকজনকে মুগ্ধ করিল।

গরমিল : আয়ুবিচারে হিসাবের সামান্য গরমিল হইলেই সর্বনাশ।

এক কথায় প্রকাশ : কিশোর বয়স—কৈশোরে।

ছোটোর দাবি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস—আলোচ্য কবিতাটি কবির 'অজয়' নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত।

নামকরণ—এই কবিতায়, ক্ষুদ্র বস্তু বা ঘটনামাত্রই যে উপেক্ষণীয় নহে ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের মর্যাদা যে বড় হইতে ন্যূন নহে—এই কথাটাই বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বড় বস্তুর গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে উহার সমগ্রতা অপেক্ষা মর্মগ্রাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক একটা মহৎ ঘটনার, একটি মহৎ জীবনের সমগ্র প্রভাব যতই বিশাল হউক না, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি অংশই গভীরতায় ও নিবিড়তায় আমাদের মর্মমূলে অক্ষয় রেখায় মুদ্রিত হইয়া যায়। কাজেই ক্ষুদ্রের মর্যাদা কম কিসে? আমাদের সমীহা, আমাদের মনোযোগের উপর তাহার পূর্ণ দাবি রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য হইবার দাবি তাহার বড়র সমান। এই সত্যটুকু উপজীব্য করিয়া রচিত বলিয়া আলোচ্য কবিতার শিরোনাম হইয়াছে 'ছোটোর দাবি'।

সমালোচনা—'ছোটোর দাবি' কবিতার প্রথম স্তবকটি সমগ্র কবিতার ভূমিকা। ইহাদের মধ্যে কবিকৃতির মূলসুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে তৃতীয় চরণে—

"অতিবড় তুচ্ছ যা তাই ভালবাসি আমরা সবাই"।

যাহা তুচ্ছ বা ছোট তাহাই আমাদের কাছে অতিবৃহৎ-এর মর্যাদা বহন করে

অর্থাৎ যাহা অতিবৃহৎ, অতিবিরাট্, তাহারই একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ অনেক সময় আপন ঐশ্বর্যে মাধুর্যে এমন মহিমোজ্জ্বল হইয়া উঠে যে ইহার কাছে বৃহৎ স্বয়ং আচ্ছন্ন হইয়া যায়, না হয় নূতন মহিমা লাভ করিয়া অধিকতর সার্থক হইয়া উঠে। ছোট ও বড়কে বিচ্ছিন্ন বা নিঃসম্পর্কভাবে দেখা কবির অভিপ্রেত নয় ; তাঁহার ছোট বড়রই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গমাত্র। পরবর্তী স্তবকগুলি এই মূলসূত্রেরই দৃষ্টান্তময় ভাষ্য।

তরু ও তাহার ফুল, হোলি উৎসব ও তাহার ফাগের দাগ, সাগর ও তাহার মুক্তা, বিরাট্ রামায়ণকথা ও তাহার অন্তর্ভুক্ত রাম-গুহক-মিতালি এবং অশোকবনে সীতার সহিত সরমার সখীত্ব, লক্ষশ্লোক মহাভারতের মধ্যে বিদুর-ক্ষুদের সৌরভময় কাহিনীটুকু, বিপুলব্যাপকবিচিত্র কৃষ্ণলীলার মধ্যে কিশোর শ্যামের 'বাঁশরী আর শিখীর পাখা' এবং সুদামার সখ্য, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিশালত্বের মধ্যে আহত হংসকে কেন্দ্র করিয়া বুদ্ধকরুণার ক্ষণিক প্রকাশটুকু, মহামায়ার অশেষ ঐশ্বর্যময় রূপের মধ্যে ভক্তের জন্য গৃহীত ক্ষণিক কন্যারূপ ও স্নেহস্মিতানন মাতৃরূপ, শিখী ও তাহার শাখা, রসালবন ও তাহার একটি পল্লব, খনি ও তাহার মণি, ভ্রমর ও তাহার সঞ্চিত মধুকণা, দিগন্তহারা অভ্রভেদী হিমাচলের অঙ্কলক্ষ্মী মা মেনকার অশ্রুবিন্দু—সর্বত্রই তথাকথিত 'ছোটো' 'বড়ো'রই অঙ্গ।

এই আলোকে দর্শন করিলেই কবিতাটির প্রতি সুবিচার করা হইবে এবং ব্যাখ্যা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

'ছোটোর দাবি' নাম হইতে সহসা এই ধারণাই হয় কবি যেন 'ছোটো' রই প্রশস্তি গাহিতেছেন। কিন্তু কবিতাটি পড়িলেই বুঝা যায় এ ধারণা সত্য নয়। অবশ্য, 'ছোটো'-র প্রশস্তিই তিনি গাহিয়াছেন ; কবির ছোট সাধারণ ছোট নয়, বড়রই অংশভূত। কবি প্রথম স্তবকে যাহা সূত্রিত করিয়াছেন, অন্য স্তবকগুলি তাহারই সোদাহরণ বিশদীকরণ।

দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্তের মেলা গাঁথিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার সচেতন প্রয়াস ছন্দিত বাক্যে রূপায়িত হইলে তাহা পদ্যই হয়, কাব্য হয় না। এইজাতীয় পদ্যে পদলালিত্য ও ছন্দতারল্যের মিশ্রণ ঘটিলে একপ্রকার মাধুর্যময় উপভোগ্যতার সৃষ্টি হয়। 'ছোটোব দাবি' এই লক্ষণাক্রান্ত কবিতা, রসোত্তীর্ণ কাব্য নয়। তবু ইহার মধ্যে কবির নৈপুণ্য আছে প্রচুর। দৃষ্টান্তগুলি সুনির্বাচিত। ইহাদের

উপস্থাপনে কবি বর্ণবাহুল্য বর্জন করিয়াছেন ; কিন্তু কুশলী হস্তে স্বল্পরেখাপাতে যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সুন্দরই হইয়াছে। "ভুলতে পারি হোলির দিবস, ফাগের দাগ যে তুলতে নারি"-র ব্যঞ্জনাটুকু সত্যই মধুর।

"ভুলি কোশল-পৌরভবন ভুলতে নারি অশোককানন,
সরমার সে সখীত্বটি বন্দিনী মা সীতার সাথে"

পাঠকচিত্তকে অশোকবনে সীতা-সরমার সম্মুখে দাঁড করাইয়া দেয়। কবির আন্তরিকতা এ কবিতার বহুস্থলে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই বলিয়া কবিতাটি যে একেবারে ত্রুটিহীন এমন কথা বলা যায় না। "সুদামার প্রেম সখ্যে যে ম্লান পাণ্ডব এবং কৌরবও"—'গৌরব', 'সৌরভ'-এর মিলসূত্রে অবতারিত 'কৌরব' এখানে অর্থহীন, কারণ কৃষ্ণ কৌরবের সখা ছিলেন না। **"পূর্ণতা দেয় বিরাট ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে"**—কবির বক্তব্য এখানে কতকটা বুঝা গেলেও ভাব ভাষার অনুসরণ করে নাই; ইহার অন্বয় কি? পূর্ণতা তাহার ক্ষুদ্র অংশটিকে বিরাট্ করিয়া দেয়? না, ক্ষুদ্র (বিশেষ্য) তাহার (সমগ্রের) অংশটিকে (অর্থাৎ নিজেকে) বিরাট্ করিয়া পূর্ণতা দেয়? প্রথমটিবেই শুদ্ধ অন্বয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এবং এই অন্বয়ে 'পূর্ণতা' 'দেয়'-ক্রিয়ার কর্তা হওয়ায় অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ :

'পূর্ণতা' অর্থাৎ 'হাজার হাজার মূর্তি'র সমন্বয়ে গঠিত বুদ্ধিমহিমার সমগ্র রূপটিই তাহার 'ক্ষুদ্র অংশটিকে' অর্থাৎ 'বুকে কাতর হংস'-ধারণকারী বুদ্ধের অসাম করুণার ক্ষণিক প্রকাশটুকুকে বিরাট্ করিয়া দেয় অর্থাৎ বিপুল গৌরবে মণ্ডিত করিয়া দেয়। এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত এই কারণে যে কবির ইহা অভিপ্রেত নয়—কবির উদ্দেশ্য 'অতি-বড়ো তুচ্ছ যা' তাহারই আত্মনিষ্ঠ মহিমার প্রশস্তি ; কিন্তু এ ব্যাখ্যায় দেখিতেছি 'বড়ো'-র প্রভাবেই 'ছোটো' বড হইয়া উঠিতেছে, তাহার নিজস্ব মহিমায় নয়। কবিতার আদ্যন্তের সঙ্গতিসূত্রে বিচার করিলে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না; কাজেই এ অন্বয় অসঙ্গত। দ্বিতীয় অন্বয়ের ব্যাখ্যা : 'ক্ষুদ্র' অর্থাৎ আহত হংসটিকে কেন্দ্র করিয়া অসীম বুদ্ধকরুণার ক্ষণিক ঐ প্রকাশটুকু 'তাহার' অর্থাৎ বৃহৎ বুদ্ধরূপের অংটিকে অর্থাৎ নিজেকে বিরাট্ করিয়া পূর্ণতা দান করে অর্থাৎ আপনা-আপনি অশেষ মহিমা লাভ করে। তাৎপর্য এই যে 'ক্ষুদ্র' অর্থাৎ একটি তুচ্ছ ঘটনা (আহত হংসকে বক্ষে রাখিয়া সেবা) হাজার হাজার ঘটনা লইয়া রচিত হাজার মূর্তির সমন্বয়ে রচিত পূর্ণ বুদ্ধরূপের একটি

অংশরূপকে বিরাট্ করিয়া তুলিতে পূর্ণতা দান করে অর্থাৎ, ব্যঞ্জনায়, পূর্ণ বুদ্ধরূপকে যেন পূর্ণতর করিয়া তোলে। কবির উদ্দেশ্যকে (দৃষ্টান্তপরম্পরায় যাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যাখা করিতে গেলে এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত হয় : কিন্তু ভাষার অনুসরণে এ ব্যাখ্যা পাওয়া সুকঠিন, কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। তবু আমি এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ; কারণ, যে-মূর্তির কাছে বুদ্ধের হাজার হাজার মূর্তিকে কবি হার মানাইয়াছেন, তাহার নিজস্ব মহিমা এই ব্যাখ্যাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর একটি চরণও ঠিক সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; 'মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা'র কথা বলিতেছি। কতকগুলি প্রশ্ন মনে জাগে—পিতৃগণের মানসকন্যা মেনকা গিরীশের (গিরিরাজ হিমাচলের) পত্নী ; গিরীশ-মেনকা স্বামী-স্ত্রী। গিরীশ বিশাল সন্দেহ নাই ; কিন্তু মেনকার ক্ষুদ্রতা কোথায় ? অতি-বড়ো তুচ্ছ যা'-র বিচারে বিশাল গিরীশের ক্ষুদ্র অঙ্গ মেনকা কেমন করিয়া, কোন্ আদর্শে ? 'মা মেনকা' বলায় মেনকার মাতৃরূপেরই প্রতি কবির ইঙ্গিত রহিয়াছে ; কাজেই গিরীশ হইলেও তাঁহার পিতৃরূপেরই ব্যঞ্জনা পাইতেছি। 'মা মেনকার অশ্রুকণা'র উৎস যে কন্যা পার্বতীর বিচ্ছেদ-জনিত বেদনা ইহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বেদনা কি একা মাতার, পিতার নয় ? হিমাচলেরও চক্ষে কি 'অশ্রুকণা' জাগে না ? কবি কি ভাবিয়া এই চরণটির অবতারণা করিয়াছেন জানি না। কিন্তু ব্যাখ্যা করিতেই হইবে এবং 'মা মেনকা' ও পিতা 'গিরীশ'-এর কন্যাবিচ্ছেদ-বেদনায় সাধারণ ভিত্তিভূমি হইতেই এ ব্যাখ্যা করিব।

একপ্রকার ব্যাখ্যা : পিতা গিরীশ 'বিশাল' এবং অশেষ পৌরুষময় কঠিন। সুতরাং তাঁহার বেদনাবোধ যতই গভীর, যতই তীব্র হউক না কেন, তাহার প্রকাশ অতিসংযত, হয়তো প্রকাশই নাই, মাত্র অনুমানসাপেক্ষ। তাহা আমাদের বুদ্ধিলোকে জাগ্রত হইলেও মর্মলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু 'মা মেনকা' স্নেহকোমলা নারী ; তাঁহার নয়নপ্রান্তে অন্তরের বেদনা সহজেই অশ্রুবিন্দুতে মূর্তিমতী হইয়া উঠে। ঐ একবিন্দু নয়নের জল আমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া আমাদেরও নয়নপথে প্রবাহিত হয়। হিমাচলকে আমরা ভুলিয়া যাই, কিন্তু অশ্রুনয়না মা মেনকাকে ভুলিতে পারি না। সহজকোমলা নারী অশ্রু সংযমকঠোর বিরাট্ পুরুষকে ডুবাইয়া তলাইয়া দেয়।

আর একপ্রকার ব্যাখ্যা: কন্যা পার্বতীর বিচ্ছেদবেদনাবোধ মা মেনকার যেমন আছে, পিতা বিশাল গিরীশেরও তেমনি আছে। দুইজনেরই বেদনা অশ্রুতে সপ্রকাশ। কিন্তু গিরীশ অতীব বিশাল, অত্যন্ত বিরাট্ বলিয়া তাঁহার অশ্রুও সুবিপুল। সে অশ্রু এত অজস্র যে তাহাতে গঙ্গা-যমুনার সৃষ্টি হইয়া যায়। মর্ত্যের ক্ষুদ্র-মানুষ আমরা বেদনার এত বড় প্রকাশকে ধারণায় আনিতে পারি না। কিন্তু মা মেনকার একটি বিন্দু অশ্রু, বেদনার এই সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট প্রকাশটুকু আমরা সহজেই ধরিতে পারি। আমাদের চক্ষুও সহজেই অশ্রুসজল হইয়া ওঠে। তাই আমাদের কাছে মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ ঢাকা পড়িয়া যায়, আচ্ছন্ন হইয়া নিরর্থক হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকেই যেন ভালো বলিয়া মনে করি।

পরিশেষে প্রথম স্তবক-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া সমালোচনা শেষ করিতেছি।

"রেখা টেনে ছোটোর গতি বড়ো যে জল গাবিয়ে চলে": ইহার যে-ব্যাখ্যার দিকে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা জাগে, তাহা এই—একটি ছোট প্রাণী, যেমন হাঁস বা মাছ, যখন জলের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায় তখন তাহার পদসঞ্চালনে বা পুচ্ছতাড়নায় নয়নমনোহর একটি চমৎকার সুন্দরবঙ্কিম রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু কুমীর বা ঐজাতীয় অতিবৃহৎ প্রাণী যখন চলিয়া যায়, তখন তাহার বিপুলবিশাল দেহের প্রচণ্ড আঘাতে আলোড়িত হইয়া জল পঙ্কিল হইয়া উঠে; সৌন্দর্যের আভাসও তাহাতে জাগে না, মন যেন একটা অস্বস্তিময় ক্ষোভ অনুভব করে।

কিন্তু এ ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি হয় দুইটি কারণে। প্রথমতঃ হাঁস 'অতি বড়ো' কুমীরের 'তুচ্ছ' অঙ্গ নয়। দ্বিতীয়তঃ এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে প্রথম স্তবকটি এ কবিতার ভূমিকা, ইহাতে কবি যাহা সূত্রিত করিয়াছেন, পরে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে—এটিকে 'general enunciation' বলা যাইতে পারে। এই কারণে চরণটিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ না করিয়া সাধারণভাবেই বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত অর্থাৎ ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটুকুই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যাহা সুবৃহৎ এবং সুবিশাল তাহার সমগ্র রূপটিকে আমাদের চেতনা ধরিতে পারে না; কিন্তু এই সুবৃহতের একটি ক্ষুদ্র অংশের অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষুদ্রের সমষ্টিতে গঠিত অপরিমেয় বিরাট্ সত্তার একটিমাত্র অংশের পরিস্ফুট প্রকাশ সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের চেতনায় রূপলাভ করে বলিয়া আমরা তাহাকেই সহজেই

বুঝিতে পারি এবং উপভোগ করিতে পারি। বিরাট্ আমাদের চেতনাকে দাবাইয়া চলে অর্থাৎ বোধশক্তিকে পঙ্গু করিয়া আবিল করিয়া দেয়; কিন্তু ক্ষুদ্রের প্রকাশটুকু আমাদের চেতনায় স্পষ্ট সুন্দর রেখা টানিয়া চলে অর্থাৎ সুন্দর পরিপূর্ণ অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। একটা স্থূল উদাহরণ দিয়া ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করি। ধরা যাক্ গঙ্গার উপর দিয়া একখানি বড় স্টীমার যাইতেছে। বিরাট্ স্টীমার—বিশাল তাহার দেহ, দুর্বার তাহার শক্তি, প্রচণ্ড তাহার গর্জন; গঙ্গাবক্ষকে দলিয়া মথিয়া ভাঙিয়া চূরিয়া হেলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফঁসিয়া বীরদর্পে সে চলিয়াছে, যেন এক অতিকায় দানবের বিজয়াভিযান। সে মহাদৃশ্যে আমাদের চেতনা অভিভূত হইয়া যায়। কিন্তু উহারই পিছনে পিছনে জলপুচ্ছের তাড়নায় উদ্ভিন্ন যে সুঠামসুন্দর রেখাটি সর্পিল গতিতে চলিতে থাকে, তাহা আমাদের মনে জাগাইয়া তোলে এক সুকুমার প্রশান্ত অনুভূতি। স্টীমারের বহুবিচিত্র ভীমকান্ত সমগ্ররূপের একটি আংশিক, সুচারু প্রকাশ এই বঙ্কিম রেখাটি; আমরা ইহাকে ভালোবাসি—"অতি-বড়ো তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই"। ঠিক এইভাবেই বুঝিতে হইবে "ভুলায় বড়োর অট্টহাসি ছোটোর কণা নয়নজলে।" ইহার অর্থ বড় মানুষের অট্টহাসি এবং শিশুর অশ্রুবিন্দু, বা এইরকম কিছু নয়। এখানে 'বড়োর' 'ছোটোর ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্নিত হইলেও তাৎপর্যে ইহারা 'অট্টহাসি' ও 'কণা'র বিশেষণ, দুইটি বিপরীতার্থক পদ। অট্টহাসি ও অশ্রুকণা দুইয়ের প্রকাশক্ষেত্র মানুষের মুখমণ্ডল। অট্টহাসির কারণ যদি আনন্দও হয়, তথাপি দর্শকের পক্ষে তাহা কৌতুকাবহ হইলেও ঠিক আনন্দদায়ক হয় না। অট্টহাসির প্রকাশ বিরাট—সমগ্র মুখমণ্ডলের পেশীগুলির. ইহাতে বিকট আক্ষেপ বা convulsion ঘটে, ফলে হয় মুখবিকৃতি। কিন্তু অশ্রুকণায় থাকে একটি প্রশান্ত ভাব, একটি স্থির বেদনাময় মাধুর্য। দর্শকের মনে অট্টহাসি আগ্নেয়গিরির ভূকম্পনের অগ্ন্যুৎপাতের মতো একটা ক্ষণিক আঘাত হানিয়া মিলাইয়া যায়; কিন্তু অশ্রুকণার ফল স্থায়ী, মনে ইহা একটা গভীর রেখাপাত করে।

বক্তব্য: সমালোচনাটি কিছু দীর্ঘ হইয়া গেল—ঠিক 'হইয়া গেল' নয়, ইচ্ছা করিয়াই করিলাম; কারণ কবিতাব্যাখ্যা সহজ করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল।

সংক্ষিপ্তসার—সংসারে ছোট যাহা, অনেক সময় তাহা বড়কে তাহার প্রাপ্য গৌরব হইতে বঞ্চিত করে। ছোট বলিয়াই তাহা হেয় নয়। বিরাট

আমাদের চেতনাকে পঙ্গু করিয়া আবিল করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র অংশটি সুন্দর পরিপূর্ণ অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। বড়র বড়ত্বের মর্যাদা না দিয়া আমরা তাহার তুচ্ছ ক্ষুদ্র অংশকেই সমাদর করি। নয়নপ্রান্তে ছোট একবিন্দু অশ্রু দেখিলে বড় অট্টহাসির কথা ভুলিয়া যাই।

বিশাল গাছটির কথা মনে থাকে না, কিন্তু তাহার ছোট ফুলটিকে ভুলিতে পারি না। দোল-উৎসব স্মৃতিভ্রষ্ট হইলেও তাহার ক্ষুদ্র ফাগ-চিহ্নটি ভুলিতে পারা যায় না। বিশাল রত্নাকরকে মনে থাকে না, কিন্তু তাহার তলের ক্ষুদ্র মুক্তা সাদরে গলায় পরি। ছোটর স্নেহডোরে আমরা সহজেই বাঁধা পড়ি।

রামায়ণের বড বড ঘটনা ও কাহিনীর, এমন কি রাবণের অনির্বাণ চিতার কথাও ভুলিয়া যাই—ভুলি না নিষাদপতি গুহকের সহিত রামচন্দ্রের মিলনের ক্ষুদ্র কাহিনীটি। লঙ্কার অশোককাননে বন্দিনী সীতার সহিত সরমার মধুর সখীত্ব অযোধ্যার রাজৈশ্বর্যকে ম্লান করিয়া দেয়।

কৃষ্ণের পুরী দ্বারকার ঐশ্বর্য-আড়ম্বর, কংসবধের গৌরব, এমনকি সমগ্র কুরুক্ষেত্রসমরের কাহিনীও বিদুরের ক্ষুদ্র আতিথ্যের তুলনায় তুচ্ছ হইয়া যায়। বৃন্দাবনের বংশীধারী ময়ূরপুচ্ছশোভিত শ্রীকৃষ্ণের কথা আমরা মনে রাখি, ভুলিয়া যাই যোদ্ধবেশে তাঁহার বীরত্বের সকল কাহিনী। কুরুপাণ্ডবের সহিত তাঁহার প্রীতির চেয়ে সুদামার সখ্যের কথাই আমাদের মন বেশী করিয়া আকর্ষণ করে।

বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগ ও তাহার অবসানের সুদীর্ঘ ইতিহাস ভুলিতে পারা যায়, কিন্তু আহত হংসটিকে বুকে লইয়া বুদ্ধদেবের করুণাকোমল মূর্তি অবিস্মরণীয়। হাজারহাজার মূর্তি থাকিলেও তাঁহার সেমূর্তিটির তুলনা কোথায়?

সিংহবাহিনী অথবা স্বর্ণসিংহাসনে আসীনা মহামায়ার মহিমা যতই হউক না কেন, সাধক রামপ্রসাদ নিজের বেড়ার ধারে তাঁহার যে মূর্তি দেখিয়াছিলেন তাহার কথা ভাবিলে রামপ্রসাদের সৌভাগ্যে আমরা ঈর্ষান্বিত হই। দুর্গাপূজার শত সমারোহের মধ্যেও মনে জাগে দেবীর আননে মাতৃস্নেহের কোমল মধুর হাসিটি।

ময়ূরের চেয়ে চূড়াশোভী ময়ূরপুচ্ছের আদর আমাদের কাছে বেশী। বিশাল আম্রবনের চেয়ে বেশী মর্যাদা ক্ষুদ্র আম্রপল্লবটির। খনি ভুলিয়া ক্ষুদ্র মণিটিই আমরা তুলি, মধু পাইয়া ভুলি তাহার সংগ্রাহক মৌমাছিকে। গিরিরাণী মেনকার একবিন্দু অশ্রু হিমালয়ের বিরাট্ দুঃখকেও তলাইয়া দেয়।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

বড়োর দাবি দাবিয়ে চলে—বড়র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া চলে; বড়র যে সম্মান প্রাপ্য তাহা তাহাকে পাইতে দেয় না, চাপা দিয়া দেয়। **রেখা টেনে ছোটোর গতি** ইত্যাদি—জলচর ক্ষুদ্র জীব যখন চলিতে থাকে, তখন জলের মধ্যে একটি সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়; কিন্তু বৃহৎ জীব চলিতে আরম্ভ করিলে জল ঘোলা হইয়া যায়। **মন্তব্য**: ইহা সাধারণ অর্থ; কিন্তু স্তবকটির মূল সুরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে হইলে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়: বিরাটের সামগ্রিকরূপটি আমাদের চেতনাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র অংশ চেতনায় সুন্দর মধুর সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। **গাবিয়ে চলে**—ঘোলা করিয়া চলে। **ভুলায় বড়োর অট্টহাসি** ইত্যাদি—অট্টহাসির প্রকাশ বিরাট্; তাহা চকিত চমকে আমাদের মনে স্পন্দন সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু নয়নের কোণে ছোট অশ্রুবিন্দু দেখিলেই তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। ছোট একবিন্দু অশ্রুর স্থির বেদনার মাধুর্য মনে স্থায়ী ছাপ আঁকিয়া দেয়।

দ্বিতীয় স্তবক

তরুবর—বড় গাছ। নারি—পারি না। **তরুবরে হয় না···নারি**—যে বড় গাছের ফুল ফোটে, তাহার কথা আমরা মনে রাখি না; কিন্তু তাহার ছোট ফুলটি আমাদিগকে আকৃষ্ট করে—গাছের কথা মনে না থাকিলেও ফুলটির কথা আমরা ভুলিতে পারি না। **ভুলতে পারি হোলির দিবস**—দোলপূর্ণিমার উৎসব ও আনন্দ উৎসবশেষে আমরা ভুলিয়া যাই। **ফাগের দাগ যে ভুলতে নারি**—প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধবের সাহিত আমাদের দোললীলার সাক্ষ্য আবীরের রক্তরাগটুকু যে উঠিয়াও উঠে না; বড় উৎসব ভুলিতে পারি, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমানুরাগের ক্ষুদ্র চিহ্নটুকু স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় না। **ভুলি সাগর···তার মুকুতায়** ইত্যাদি—বিশাল বারিধির অনন্ত বিস্তার আমাদের স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহার তলদেশের ক্ষুদ্র মুক্তা আমরা সযত্নে গলার মালায় গাঁথিয়া রাখি। **ছোটোর অনুরাগের রাখী**—স্নেহের জন প্রীতিভরে যে রাখী বাঁধিয়া দেয়। ঝুলন-পূর্ণিমার দিন পরস্পরের হাতে ভ্রাতৃভাব-সূচক রাখীবন্ধন বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। আয়াস করেও—চেষ্টা করিয়াও।

তৃতীয় স্তবক

রাবণ-রাজার চিতার সাথে—রাবণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। **রামের মিলন গুহক-গৃহে** ইত্যাদি—নিষাদপতি গুহক ছিলেন রামচন্দ্রের মিত্র। ভাগীরথীতীরে শৃঙ্গবেরপুরে ছিল তাহার বাসস্থান; বনবাসে যাইবার সময় রামচন্দ্র তাহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের নিজগৃহে লইয়া গিয়া যথোচিত আতিথিসংকার ও নানাপ্রকার সাহায্য করেন। রামায়ণের অনেক ভুলি...মিতার সাথে—রামায়ণের যুদ্ধ-বিগ্রহের লোমহর্ষণ কাহিনীগুলি আমাদের স্মৃতিতে স্থায়িভাবে থাকে না, এমন কি যে লঙ্কাযুদ্ধে রাবণবধ হয় তাহাও আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু গুহক-রামচন্দ্রমিলনের ক্ষুদ্র কাহিনীটি ভুলিতে পারি না। **কোশল-পৌরভবন**—অযোধ্যার রাজপ্রসাদের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর। **অশোক-কানন**—লঙ্কারাজ রাবণের প্রিয় বন। এই কাননে রাবণ সীতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। **সরমার সে সখাত্বটি** ইত্যাদি—অশোকবনে বিকটাকৃতি চেড়ী-পরিবৃতা সীতার সহিত একমাত্র যিনি সদয় ও মধুর ব্যবহার করিতেন, তিনি বিভীষণপত্নী সরমা। সুযোগ পাইলেই তিনি আসিয়া নানাপ্রকারে সীতাকে প্রবোধ দিতেন। এই দুইটি দরদী হৃদয়ের নিবিড় বন্ধুত্বের কাহিনী ক্ষুদ্র হইলেও গৌরবে ইহা অযোধ্যার রাজৈশ্বর্যের চেয়ে কম নয়।

চতুর্থ স্তবক

দ্বারাবতী—দ্বারকা, কৃষ্ণের রাজধানী। **ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা**—দ্বারকারাজ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের কথা আমাদের মনে থাকে না। **কংস-বধের গৌরবও**—এমন কি মথুরারাজ কংসকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কৃষ্ণ-বলরাম যে গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন তাহাও। কৃষ্ণকে বধ করিবার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইলে কংস কৃষ্ণবিনাশের উদ্দেশ্যে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আনিবার জন্য অক্রুরকে পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিয়া কংসের মহাবল দুইটি হস্তীকে নিহত করিয়া কংসকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কংসও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধে কংসের মৃত্যু হইল। **কুরুক্ষেত্র গোটা**—সমগ্র কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাহিনী। **বিদুর-ক্ষুদের সৌরভ**—বিদুরের ভিক্ষালব্ধ অন্নের সুঘ্রাণ। বিদুর পাণ্ডবদের পিতৃব্য। তিনি পরম ধার্মিক ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ একবার

হস্তিনাপুরে গিয়া দুর্যোধনের অহংকারদত্ত রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বিদুরের আতিথ্য স্বীকার করেন। ভিক্ষাজীবী বিদুর আর কিছু না থাকায় ক্ষুদের ভাত রাঁধিয়া পরম আদরে অতিথির সৎকার করেন। কৃষ্ণ তাহাতেই, বিশেষ করিয়া বিদুরের আন্তরিকতায়, পরম তৃপ্ত হন। বাঁশরী—শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশী। শিখীর পাখা—ময়ূরপুচ্ছ, যাহা তিনি চূড়ায় পরিতেন। **বাঁশরী আর শিখীর পাখা**—মুরলী আর ময়ূরপুচ্ছে শোভিত বৃন্দাবনে কিশোর শ্রীকৃষ্ণ। **সুদর্শন**—শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত চক্র। মূলে 'সুদর্শনচক্র' বিষ্ণুর অস্ত্র। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ; কৃষ্ণ "বিষ্ণুর অবতার"। কিন্তু কৃষ্ণই বিষ্ণু এবং কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণকর্তৃক ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। মহাদেবের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা দেবতাদের মিলিত তেজে। উপাদানে সুদর্শন নির্মাণ করেন এবং শিবকে দান করেন। শিব ইহা বিষ্ণুকে অর্পণ করেন। **সুদর্শনকে দেয় যে তাপ**—সুদর্শনচক্রধারী যোদ্ধবেশী শ্রীকৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য ও মহিমা ভুলাইয়া দেয়। **সুদামা**—শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী ও বাল্যসখা জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ইহার বন্ধুপ্রীতি অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার নৃপতি, তখন স্ত্রীর পরামর্শে ইনি সখার সহিত দেখা করিতে যান এবং সেই সময় বন্ধুর জন্য ভিক্ষালব্ধ সামান্য চিড়ার নাড়ু কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যসখার এই সামান্য উপহারেও পরম প্রীত হন। **সুদামার প্রেম-সখ্যে যে ম্লান** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার প্রতি পাণ্ডবদের প্রীতি সুদামার সহজ-সুন্দর অনাবিল বন্ধুপ্রেমের কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। **এবং কৌরবও**—এই অংশটি ছন্দের প্রয়োজনে আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়, কারণ কৌরবদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ছিল না।

পঞ্চম স্তবক

সারনাথ—ভারতে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে সারনাথের বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ, ধর্ম ও কৃষ্টির কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। **নালন্দা-মঠ-ধ্বংসটাকে**—প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র নালন্দার গৌরবময় যুগে এবং তাহার ধ্বংসের ইতিহাসকে। এখন সারনাথও নাই, নালন্দাও নাই। সুতরাং 'সারনাথ'-এর সহিত 'ধ্বংস' শব্দটির যোগ বুঝিতে হইবে। **ভুলতে পারি সারনাথ** ইত্যাদি—ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

আমাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব। **মনে পড়ে বুদ্ধদেবের** ইত্যাদি—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক গৌতমের বাল্যকালের একটি ক্ষুদ্র ঘটনার চিত্র সজীব হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে—বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্ব-মহিমার চেয়ে বুদ্ধের করুণার্দ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ইঙ্গিতটুকুর মূল্য আমাদের কাছে অনেক বেশী। ঘটনাটি এইরূপ: একদিন সিদ্ধার্থ অন্যমনস্কভাবে রাজপুরীর উদ্যানে বসিয়া ছিলেন, এমন সময় দেবদত্তের বাণে বিদ্ধ একটি মরাল হঠাৎ আসিয়া তাঁহার কোলের উপর পড়িল। তিনি পরম স্নেহে আহত পাখীটিকে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলে দেবদত্ত আসিয়া সেটিকে তাঁহার শিকার বলিয়া দাবি করিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার জীবন দিয়াছেন বলিয়া কিছুতেই তাহাকে দিতে রাজী হইলেন না। এই ঘটনাটি লইয়া কবি নবীনচন্দ্র সেন একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। **হাজার হাজার মূর্তি তাঁহার** ইত্যাদি—বুদ্ধদেবের হাজার হাজার মূর্তির চেয়ে উল্লিখিত চিত্রটির মহিমা ও আকর্ষণ অনেক বেশী। **পূর্ণতা দেয় বিরাট ক'রে** ইত্যাদি—যাহা খণ্ড ও ক্ষুদ্র, খণ্ডহিসাবে মূল্যই তাহার প্রাপ্য। কিন্তু ক্ষুদ্রের একটা বৃহত্তম মর্যাদাও আছে। যে বিরাটের সে অংশ, তাহাকে পরিপূর্ণতা দান করে বলিয়া ক্ষুদ্র আপন মর্যাদাকে সহস্রগুণে বাড়াইয়া তোলে।

ষষ্ঠ স্তবক

মহামায়া—দুর্গা। **সিংহ এবং সিংহাসনে**—দেবী দুর্গার অসুরদলনী সিংহবাহিনী একটি মূর্তি, আর একটি মূর্তি অন্নপূর্ণারূপে সিংহাসনে উপবিষ্টা। **রামপ্রসাদ**—স্বনামধন্য শ্যামাসাধক ও সঙ্গীত-রচয়িতা। পিতার মৃত্যুতে অভাবে পড়িয়া ইনি প্রথমে ত্রিশ টাকা মাহিনায় মুহুরীর কায গ্রহণ করেন। পরে প্রভুর দয়ায় এই কার্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট সুরে গীত তাঁহার রচিত অজস্র শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত আজও বাঙালার ঘরে ঘরে আদৃত হইয়া থাকে। **রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে** ইত্যাদি—মহামায়ার যে রূপ রামপ্রসাদ নিজের বেড়ার ধারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা না দেখিলেও তাহার কথা শুনিয়া রামপ্রসাদের অপরিসীম সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হই। রামপ্রসাদ একদিন গান গাহিতে গাহিতে বাগানে বেড়া বাঁধিতেছিলেন। একা দড়ি ফিরাইতে অসুবিধা হওয়ায় কন্যাকে ডাকিয়া সাহায্য করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে কন্যা কোনো কার্য উপলক্ষে পিতাকে না বলিয়াই চলিয়া যাওয়ায় রামপ্রসাদ

ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তখন মহামায়া তাঁহার কন্যার মূর্তিতে সেখানে আসিয়া তাঁহার কাজে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে কন্যা আবার ফিরিয়া আসিতেই মহামায়া অদৃশ্য হইলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে একাকী এতখানি বেড়া বাঁধা হইয়াছে দেখিয়া কন্যা পিতার নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিলে রামপ্রসাদ বলিলেন যে পুত্রীর সাহায্যেই এতখানি কাজ হইয়াছে। পুত্রী বলিলেন—তিনি তো অনেকক্ষণ সেখানে ছিলেন না। তখন রামপ্রসাদ বুঝিলেন, স্বয়ং মহামায়াই তাঁহার কন্যার রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিয়াছেন। বাজঘটা—পূজার বাজনা ও ধুমধাম। **অলক্ষ্যে সব** ইত্যাদি—সকলই বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যায়। **বক্ষে জাগে দৃষ্টি** ইত্যাদি—মনের মধ্যে জাগে মাতৃরূপা দেবীর স্নেহ-কোমল দৃষ্টি, সুন্দর মুখখানিতে মধুর হাসি। মহামায়ার এ রূপ ভুলিবার নয়।

সপ্তম স্তবক

শিখী—ময়ূর। চূড়ান্ত শোভা—যাহা চূড়াটিকে সুন্দর করে। শিখীর পাখা—ময়ূরপুচ্ছ। **রসাল**—আমগাছ। তুলনীয়: "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে" —মধুসূদন। **ঘটের ছোট আমের শাখা**—মাঙ্গলিকহিসাবে ঘটের উপর স্থাপিত ক্ষুদ্র আম্রপল্লব। **খনি রেখে মণিই ভুলি**—মণির উৎস বিশাল খনিটির আদর না করিয়া ক্ষুদ্র মণিটিকেই মূল্য দেই। **মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি**—মধুর আস্বাদ পাইয়া আমরা, মধু যে সংগ্রহ করে সেই মৌমাছিকেই ভুলিয়া যাই। **মা মেনকার অশ্রুকণায়** ইত্যাদি—গিরিরাণী মেনকার একবিন্দু চোখের জল আমাদিগকে বিশাল হিমালয়ের বিপুল বেদনার কথা ভুলাইয়া দেয়। কন্যা পার্বতীকে স্বামীগৃহে পাঠাইতে মর্মবেদনা উভয়েই বোধ করেন কিন্তু মেনকার বেদনাই আমাদিগকে গভীরভাবে বিচলিত করে। 'সমালোচনা' দ্রষ্টব্য। গিরীশ—গিরিরাজ হিমালয়।

ব্যাখ্যা

(১) ছোট যে হায় অনেক সময়······কণা নয়ন-জলে। (স্তবক ১)

এই অংশটি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ছোটোর দাবি'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। অনেক ক্ষেত্রে বড় বস্তু অপেক্ষা ছোট বস্তুর মর্যাদা যে বেশী এই সাধারণ সত্যটিই কবি এই অংশে বলিতেছেন।

সংসারে যাহা কিছু বড় তাহাই সাধারণতঃ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষ

করে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় ছোট জিনিস বড় জিনিস অপেক্ষা অধিকতর লক্ষণীয়। পরিমাণে যাহা বড় তাহা একটা স্থূল বিশালতত্ত্বে আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের সূক্ষ্মগভীর অনুভূতিগুলি উপভোগ-সুখ লাভ করিতে পারে না। অতিবড়র স্থূলশক্তির বিশালতা আমাদের বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, আনন্দ-চেতনা সঞ্চার করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বৃহতের ক্ষুদ্র অংশ চলে যেন একটি সুস্পষ্ট সুন্দর রেখাঙ্কিত পথে। ফলে আমাদের চেতনায় যেন একটি নিবিড় সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাহার গতির প্রতিটি ভঙ্গী ও বৈচিত্র্য আমরা নিবিড়ভাবে দেখিবার ও উপভোগ করিবার সুযোগ পাই। এই হিসাবে আমাদের মনোযোগের উপর অতিবড়র ছোট অংশের দাবিই বৃহত্তর। বস্তুতঃ বড় বড়র ছোট তুচ্ছ অংশগুলিই বিশেষভাবে চিত্ত স্পর্শ করে। মানুষ বড়কে সমগ্রভাবে ভালো না বাসিয়া এরূপ ক্ষুদ্রতুচ্ছ অংশগুলিকে বেশী সমাদর করে। প্রবল অট্টহাসি আমাদের চিত্তবৃত্তির উপর সহসা একটা প্রবল আঘাত করে। কিন্তু বেদনা-সিক্ত ছোট অশ্রুকণা চুয়াইয়া চুয়াইয়া প্রবেশ করে আমাদের হৃদয়ের গভীরে। তাই আমাদের হৃদয়ের উপর ছোটর অধিকার বড় হইতে সময় সময় বেশী হয়। ['সমালোচনা' দ্রষ্টব্য।]

(২) রামায়ণের অনেক ভুলি... চিতার সাথে। (স্তবক ৩)

এই অংশটি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'মাটীর বাঁশি'-শীর্ষক কবিতার একটি স্তবক। ছোট ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করিতে কবি রামায়ণ হইতে উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন।

রামায়ণে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিবৃত আছে। কিন্তু মানুষের মনে সে সকল বড় ঘটনা প্রায় বিস্মৃতির মধ্যে লীন হইয়া যায়। রাবণরাজা ও তাঁহার সেই অতুল প্রতাপ যেখানে ভস্মে পরিণত হয়, সেই চিতার আগুন অনির্বাণ। কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে সেটা তেমন অনির্বাণ নহে। তাহার চেয়ে বরং নিষাদপতি গুহকের সেই আন্তরিক মিতালী, হৃদয়বত্তার সেই অনুপম কাহিনীটিই আমাদের স্মরণে অধিকতর উজ্জ্বল, অধিকতর প্রিয়। আবার রাবণের চিতার সহিত জড়িত আছে রাক্ষস [illegible], আরও কত শত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ঘটনা হিসাবে যতই বড় হউক, মর্মগ্রাহিতায় ছোট ঘটনাই বড়। তাই অযোধ্যার ঐশ্বর্য [illegible] ভুলিয়া যাই, ভুলিয়া যায় কোশল-

প্রাসাদের শত আড়ম্বর। কিন্তু লঙ্কার অশোককাননে বন্দিনী বিষাদমলিনা সীতার কথা কেহ ভুলে না। ভুলিতে পারা যায় না সীতার সেই নিরানন্দ বন্দীজীবনে বিভীষণপত্নী সরমার সদয় সহানুভূতি ও পূত সত্তাবের কাহিনী। এরূপে এত বড় রামায়ণের এত শত বড় বড় ঘটনার মধ্যে এমনতর দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণসজল ঘটনাই আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া থাকে। কাজেই বড় অপেক্ষা ছোটর শক্তি কখনো কখনো বেশীই বটে।

(৩) ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা……পাণ্ডব এবং কৌরবও। (স্তবক ৪)

'ছোটোর দাবি'-শীর্ষক কবিতার আলোচ্য স্তবকে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছোটর মর্যাদা প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন।

জগতের বড় বড় ঘটনাগুলি অন্যতর গুরুত্বে যতই বড় হউক, আমাদের হৃদয়ে তেমন একটা গভীর রেখাপাত করে না। উদাহরণস্বরূপ দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের রাজৈশ্বর্যের কথা উল্লেখ করা যায়। সেই সমারোহের মধ্যে রাজরূপে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি কিন্তু আমাদের স্মৃতিপটে স্থায়ী হয় না। কংসধ্বংসে তাঁহার সেই উগ্র বীরমূর্তিও আমরা ভুলিয়া থাকি। অথচ ঘটনাহিসাবে কৃষ্ণের দ্বারকা-বিহার বা কংসবধ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। হইলে কি হয়—ইহাদের চেয়ে ঢের ছোট সামান্য জিনিসই অনুভূতি-নিবিড় হইয়া আমাদের মনে বেশীদিন স্থায়ী হয়। সমগ্র কুরুক্ষেত্রের সেই বিচিত্র-জটিল বিপুল বৃত্তান্ত মানুষ সব মনে রাখিতে পারে না। কিন্তু বিদুরের ক্ষুদে তৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণের কথাটি কেহ ভুলিতে পারে না। পাপাশয় দুর্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ অপেক্ষা ধর্মনিষ্ঠ বিদুরের দেওয়া সামান্য ক্ষুদকণা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে প্রেয় হয়, এই অপূর্ব কাহিনীটি সকলচিত্তে দীর্ঘস্থায়ী। ইহাদ্বারা ক্ষুদ্রেরই জয় ঘোষিত হয়। বস্তুতঃ মর্মগ্রাহিতায় ক্ষুদ্র, বৃহৎ বস্তু হইতে, অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেয়। সেইজন্যই তো শ্রীকৃষ্ণের সেই অমোঘ সুদর্শনচক্র অপেক্ষা তাঁহার শ্রীহস্তের মোহন মুরলীটুকু ও চূড়ার শিখিপুচ্ছটিই আমাদের কল্পনায় চির-জাজ্বল্যমান। সেইজন্যই পাণ্ডব ও কৌরবগণের সকল পরাক্রম ও মহত্ত্ব অপেক্ষা কৃষ্ণ-সুদামার গভীর প্রেম আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। এরূপে জগতের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ছোটখাট ঘটনাগুলিই আমাদের চিত্তে অধিকতর অধিকার বিস্তার করে।

মন্তব্য : 'কৌরবও' ছন্দের মিলের খাতিরে এখানে আসিয়াছে। এখানে ইহা নিরর্থক, কারণ কৌরবের সহিত কৃষ্ণের সখ্য ছিল না।

(৪) ভুলিতে পারি সারনাথ......ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে। (স্তবক ৫)

এই অংশটি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ছোটোর দাবি'-শীর্ষক কবিতার একটি স্তবক। ক্ষুদ্রের মহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি আলোচ্য উদাহরণটি দিয়াছেন।

গৌতম বুদ্ধের কত শত মূর্তি ও মহৎ কীর্তিস্তম্ভ সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া আছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সারনাথের বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির পীঠস্থান নালন্দার ধ্বংসবিশেষ আজিও সেই মহাপুরুষের মহৎ কীর্তি ঘোষণা করে। কিন্তু এই বিরাট্ পুরুষের মহত্ত্ব আমাদের স্মরণে সকল সময়েই জাগিয়া থাকে না। বরং তাঁহার ক্ষুদ্র দুই একটি করুণার্দ্র মোহন মূর্তিই আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। মনে পড়ে শরবিদ্ধ কাতর হংসটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কেমন করিয়া বুদ্ধদেব বসিয়া আছেন। এই ছোট একটি চিত্রের মধ্যে তাঁহার অসীম করুণা ও বিশ্বজয়ী অহিংসা যেন ধরা পড়িয়াছে। করুণায় ও ভাবব্যঞ্জনায় ইহা তাই বুদ্ধদেবের অন্যান্য শতসহস্র মূর্তিকে হার মানাইয়া দেয়। সে-সকল সহস্র মূর্তি তাঁহার স্বরূপের সহস্র দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সকলে মিলিয়া একত্রে যে ছবিটি আমাদের মানসপটে ফুটাইয়া তোলে, তাহাই তো বুদ্ধের সত্যস্বরূপ। কিন্তু সেই সমন্বিত রূপের মহিমা তাহার অংশগুলির উপর নির্ভরশীল—বিশেষ করিয়া এই বেদনাকাতর অশ্রুসজল মূর্তিটি উহার পক্ষে অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধ করুণার অবতার—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই আহত হংসবক্ষে বুদ্ধমূর্তিটি ক্ষুদ্র হইয়াও আমাদের কল্পনার বৃহৎ মহৎ গৌতম-রূপকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

(৫) মহামায়ায় যতই মানাক......মিষ্ট হাসি চন্দ্রাননে। (স্তবক ৬)

'ছোটোর দাবি'-শীর্ষক কবিতার এই স্তবকে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সাধক রামপ্রসাদের জীবনের একটি ছোট কাহিনীর উল্লেখ করিয়া ক্ষুদ্রের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

মা দুর্গার বিজয়িনী মূর্তি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত। সিংহবাহনে অধিষ্ঠিতা শত্রুনিধনরতা দেবী রূপ সত্যই মহিমামণ্ডিত। আবার স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা অন্নপূর্ণারূপেও দেবীর মূর্তিটি মনোহর। কিন্তু এই দুই রূপ অপেক্ষা আরও সুন্দর মূর্তিতে দেখিতে পাই দেবীকে সাধক রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে। একদা মহামায়া ভক্ত রামপ্রসাদের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার কন্যার বেশে আবির্ভূতা হন। রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন, দেবী দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন।

মহামায়ার এই কন্যারূপ, সুমিষ্ট হাস্যবিভাসিত তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি আমাদের কল্পনায় অক্ষয় হইয়া আছে। মা দুর্গার পূজায় কতই না সমারোহ! বাদ্যভাণ্ডের কতই না বিপুল ঘটা! বলির ধুম লাগিয়া যায়। কিন্তু সেই রাজসিক আড়ম্বরের মধ্যে মায়ের যে রূপ দেখিতে পাই তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে কখন্ কোথায় মিলাইয়া যায়। বাদ্যভাণ্ডের সমারোহের সহিত সেই রূপও স্বল্পস্থায়ীই হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তবৎসলা মায়ের স্নেহমধুর অপরূপ সৌন্দর্যে আমাদের হৃদয় ভরিয়া যায়। মহামায়ার মাতৃমূর্তির স্নিগ্ধনয়নের প্রসন্ন দৃষ্টি, অধরের স্নেহকোমল মধুর হাসি পূজাবাড়ীর সকল আড়ম্বর ও আলোক-সজ্জাকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁহার 'ছোটোর দাবি' কবিতায় ছোটর মর্যাদা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন?

উ. সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ছোটোর দাবি' কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ।

উ. সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: চন্দ্রাননে = চন্দ্র + আননে। গিরীশ = গিরি + ঈশ।

সমাস: তরুবরে—তরুদের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (৭মী তৎপুরুষ), তাহাকে। রাবণ-রাজার—রাবণ-নামক রাজা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহার। কোশল-পৌরভবন—পৌর অর্থাৎ পুরস্থিত ভবন (কর্মধারয়); কোশলের পৌরভবন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। অশোক-কানন—অশোক-নামক কানন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কংসবধের—কংসের বধ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার। প্রেম-সখ্যে—প্রেম এবং সখ্য (দ্বন্দ্ব), তাহাতে। নালন্দা-মঠ-ধ্বংসটিকে—নালন্দাস্থিত মঠ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার ধ্বংস (ধ্বংসটি)—(৬ষ্ঠী-তৎপুরুষ), তাহাকে। বুদ্ধদেবের—যিনি বুদ্ধ তিনিই দেব) কর্মধারয়), তাহার। সিংহাসনে—সিংহ-চিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। বাদ্যঘটা

—বাজের ঘটা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। চন্দ্রাননে—চন্দ্রতুল্য আনন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। মহামায়ায়—মহতী মায়া যাঁহার (বহুব্রীহি), তাঁহাকে।

সমস্তপদ-গঠন: কংসবধের গৌরব=কংসবধগৌরব। বিদুর-ক্ষুদের সৌরভ=বিদুর-ক্ষুদসৌরভ। পাণ্ডব এবং কৌরব=পাণ্ডবকৌরব। অনুরাগের রাখী=অনুরাগ-রাখী।

সাধু শব্দ-রূপ: দাবিয়ে—দাবাইয়া। টেনে—টানিয়া। গাবিয়ে গাবাইয়া। যা তাই—যাহা তাহাই। সবাই—সকলে। তরুবরে—তরুবরকে। তার—তাহার। ভুলতে—ভুলিতে। নারি—পারি না। তুলতে—তুলিতে। তার মুকুতায়—তাহার মুক্তাকে। গেঁথে—গাঁথিয়া। করেও—করিয়াও। খুলতে নারি—খুলিতে পারি না। সাথে—সঙ্গে। মানছে—মানিতেছে। ক'রে—করিয়া। মহামায়ায়—মহামায়াকে। দেখেই—দেখিয়াই। চলি—চলিয়া। রেখে—রাখিয়া। পেয়ে—পাইয়া। পড়ল—পড়িল।

এক কথায় প্রকাশ: শিখীর পাখা—শিখিপুচ্ছ (শিখিপিচ্ছ); আমের শাখা—আম্রপল্লব।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: মা মেনকার অশ্রু-কণায় বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা—মা মেনকার অশ্রুকণা বিশাল গিরীশকে ঢেকে ফেলল (বাচ্যান্তর)।

মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে—বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে মনে করি (বাচ্যান্তর)।

মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে রামপ্রসাদের বেড়ার দ্বারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে (জটিল)—সিংহ এবং সিংহাসনে মহামায়াকে বেশ মানালেও রামপ্রসাদের বেড়ার দ্বারে দেখেই যে মনে হিংসা হয় (সরল)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ: অট্টহাসি, আয়াস, অলক্ষ্যে, অশ্রুকণা।

পদ-পরিবর্তন: অনুরাগ—অনুরক্ত। সৌরভ—সুরভি। ধ্বংস—ধ্বস্ত। মূর্তি—মূর্ত। হিংসা—হিংসক, হিংস্রক হিংস্র। মিতা—মিতালি। স্মরণ—স্মৃত।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: পৌর—পুর+অণ্। সখীত্ব—সখী+ত্ব। সৌরভ—সুরভি+অণ্। সখ্য—সখি+য। হার—হার+ই (উচ্চারণে ই-লোপ) শিখী—শিখা+ইন্। ম্লান—ম্লা+ক্ত। বাঁশরী—বাঁশ+রী।

কারক ও বিভক্তি: ভুলায় বড়োর 'অট্টহাসি' ছোটোর কণা 'নয়নজলে' (প্রথমটিতে কর্ম শূন্য বিভক্তি, দ্বিতীয়ে কর্তায়-এ)। 'তরুবরে' হয় না স্মরণ (উক্ত কর্মে অর্থাৎ কর্মবাচ্যের কর্মে-এ)। তার 'মুকুতায়' গেঁথে রাখি গলার 'মালায়' (প্রথমটিতে কর্মে-এ বা -য়, দ্বিতীয়ে অধিকরণে-এ বা -য়)। 'মহামায়ায়' মতই মানাক সিংহ এবং 'সিংহাসনে' (প্রথমটিতে কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তৃরূপী কর্মে -এ বা -য়, দ্বিতীয়ে উপলক্ষণে -এ)।

ব্যাকরণগত টীকা: নারি—নঞর্থক 'নার্' ধাতু (অর্থ—না পারা) +ই। নঞর্থক ক্রিয়ার উদাহরণ।

মুকুতা—মুক্ত>মুকুতা: ক্ত যুক্তব্যঞ্জনটির বর্ণ দুটির মধ্যে উ আসায় ইহা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ।

রাবণ রাজার—'রাবণ নামক রাজা' এই ব্যাসবাক্যে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসে সংস্কৃতের নিয়মে সমস্তপদটি হয় 'রাবণরাজ' (সমাসান্ত টচ্ বা অ-যোগে), কিন্তু বাংলায় সমাসান্ত বিধি সর্বত্র মানা হয় না (মহারাজা, মহারাজ —একই অর্থে দুইটি রূপই চলে)।

অর্থগত পার্থক্য: বলি- দেবতার উদ্দেশে প্রাণিহত্যা; বলী - বলশালী। গিরিশ—মহাদেব, গিরীশ—হিমালয়। শিখি—শিক্ষা করি; শিখী —ময়ূর। শাখা—ডাল; শাঁখা—শঙ্খনির্মিত বলয়।

লিঙ্গ-পরিবর্তন: মিতা—মিতেন। বন্দিনী—বন্দী।

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি-পরিচয়—পাঠ্য পুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি। একথা ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া যেমন, তাঁহার কবিধর্মের দিক্ দিয়াও তেমনি সত্য। কল্পনার সূক্ষ্ম বায়বীয় স্তর হইতে জীবনকে রঙে রঙীন মায়ারূপে দেখিবার বিলাস তাঁহার মধ্যে নাই। বস্তুর বাস্তবকে উহার সকল অসঙ্গতিসমেত যেমনটি তেমনিভাবেই তিনি দেখিয়াছেন

দেখিয়াছেন বলিয়াই যাহাদের সে দৃষ্টি নাই তাহাদের প্রতি তত্র শ্লেষ ও কঠোর জিজ্ঞাসায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তিনি ছাড়েন নাই—কবি রবির শরতের সেই 'মধুর-মুরতি'-র মধ্যে যেমন তিনি সত্যকার বিধুর রূপটি খুলিয়া ধরিয়াছেন, তেমনি প্রবল ব্যঙ্গভরে বলিয়াছেন—

সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো ব'লে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।

অক্টোপাসের মতো যে প্রভাব সমগ্র বাঙালীজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহা হইতে যতীন্দ্রনাথ হয়তো একেবারে মুক্ত নহেন। ভাষায় ছন্দে হয়তো কোথাও কখনও রবীন্দ্রপ্রভাব তিনি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ দিয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহার "আত্মিক আকৃতি ও বন্ধনবোধ,··· আন্তরিক ভালবাসার স্পৃহা ও একান্ত অতৃপ্তির ইতিহাস,···প্রতিবাদী-বৃত্তি ও বিদ্রোহাত্মক উৎপ্রাস, কৃত্রিমতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও ভ্রান্তি-জড়তার তীব্র শ্লেষ" যেমনই মৌলিক, তেমনি আবার এযুগের প্রবৃত্তিসঙ্গত।

বাস্তব জীবনের অসঙ্গতিটাই তাঁহার চোখে বড় হইয়া ধরা দিয়াছে। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যত কিছু অসঙ্গতি দীর্ঘ অভ্যাস ও বদ্ধমূল সংস্কারের ফলে আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, যতীন্দ্রনাথ সেগুলিকে বার বার আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। বৌবাজারের মোড়ে যে "ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে", অথবা মাথায় যখন 'তড়িৎ ব্যজনী' ঘুরে তখন যে 'ললাট উঠিছে ঘামি'—এ সকল বিসদৃশ ঘটনা তাঁহার রসকুতূহলী দৃষ্টিকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং ইহাতে তাঁহার কাব্যে একটি সুচারু কৌতুকরস জমিয়া ওঠে।

বিশ্বাসের দিক্ দিয়া যতীন্দ্রনাথকে pessimist বলিয়া স্বীকার করি না। জীবন রূঢ়, এমন-কি নির্মমও বটে; তাই বলিয়াই তো উহা বর্জনীয় নহে। যতীন্দ্রনাথের বিশ্বাস "নিরবলম্বন আনন্দের কোন গ্রাহ্যরূপ নেই, দুঃখের কণ্টক-বৃন্তেই ফুলের আনন্দরূপের প্রকাশ"। তাই তো রুদ্র নিদাঘকে তিনি কাল বৈশাখীর বর্ষণলেশহীন নির্জলারূপে কামনা করিতে পারিয়াছেন।

দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও ভাবে যেমন, ভাষাতেও তেমনি যতীন্দ্রনাথ মুক্ত। কোনোপ্রকার রীতির শাসন তিনি মানিতে রাজী নহেন। গদ্যকে পদ্য করিয়া তুলিয়া, সাধু-অপর, চলতি-অচল, সংস্কৃত-অসংস্কৃত·· সকল শব্দকেই তিনি কাব্যে গ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

আসল কথা "যতীন্দ্রনাথ ভীরু, পলাতক, আশাভঙ্গ-পরাজিত স্থবিরচিত্ত নন্। সজাগ বুদ্ধি ও ঋজু মেরুদণ্ড নিয়েই তিনি জীবনকে—জীবনের অন্ধকার ও পরিহাসকে গ্রহণ করেছেন।"

উৎস ও নামকরণ—কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'-নামক কবিতাগ্রন্থ হইতে সংকলিত। কবির 'অনুপূর্বা'-নামক কাব্য-সংকলনেও উহা স্থান পাইয়াছে।

এই কবিতাটির মধ্যে একখানি গ্রাম্য হাটের চমৎকার বর্ণনা ফুটিয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য হাটের বস্তুলীন বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য নয়। তাই শেষ স্তবকে এই সংসারকেই তিনি একটি বৃহত্তর হাটরূপে কল্পনা করিয়াছেন। হাট আর বাজারে পার্থক্য আছে। বাজার স্থায়ী, হাট অস্থায়ী—রোজ বসে রোজ ভাঙে। সংসারও তাই। এই হাট সংসারলীলায় এক একটি জীবনে জমিয়া উঠে, আবার অচিরেই ভাঙিয়া যায়। বাস্তব হাট হইতে কবি এইরূপে ভাবের হাটে পৌঁছিয়াছেন। জীবনটা যে একটা নিরর্থ কেনা-বেচা দরকষাকষির হাট—ইহাই কবির মূল বক্তব্য। মূলের পটভূমিকায় যে বাস্তব হাটের বর্ণনা, তাহাতেও এই কবিতা স্বকীয় বিশেষত্বে উল্লেখযোগ্য। ভাব ও বস্তু দুই দিক দিয়াই কবিতাটির শীর্ষনাম সঙ্গত।

সমালোচনা—কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতাটির প্রথম চমৎকারিত্ব বর্ণনার মধ্যে নিহিত। কবি এখানে একখানি গ্রাম্য হাটের বাস্তব রূপ কল্পনায় বর্ণাঢ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। দিনের বেলায় সেখানে কেনা-বেচার সোরগোল, বিকাল পড়িতেই হাট ভাঙিয়া যায়। রাত্রির আঁধারে হাটের শূন্য রিক্ত ছবিটি তখন কেমন দেখায় তাহা কবি পরম দরদ দিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। গোধূলির প্রদোষছায়া ঘনাইয়া আসিতে পূবের মাঠ হইতে অস্তসূর্যের বিলীয়মান শেষ রশ্মি আকাশে বকের পাখাকে আশ্রয় করিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়। তারপর আঁধারের আগমন। দলহারা একটা ক্লান্ত কালো কাক বিলম্বে ফিরে—তাহারই পাখায় ভর করিয়া নামে আঁধার। এই যে বর্ণনা, ইহার মধ্যে শুধু কল্পনার অভিনবত্বই নয়, দৃষ্টির প্রখরতাও লক্ষণীয়। দিনের শেষ আলোটির আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া মিলাইয়া যাওয়া আর শ্রেণীহারা একটি বিচ্ছিন্ন কাকের কালো পাখায় মিলিয়া অন্ধকার নামা—

এ সত্যই কল্পনা নয়। ইহার মধ্যে গভীর পর্যবেক্ষণ-প্রসূত একটা নিত্যকার সত্য আছে।

কবির এই গভীর পর্যবেক্ষণ ও সুকুমার কল্পনাশক্তির সহিত একটি বিশিষ্ট মানসভঙ্গীর উপভোগ্যতা মিলিয়া আছে। জগৎ ও জীবনের রিক্ত, শূন্য দুঃখ ও দৈন্যের পরিণাম তাঁহার চোখে সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। হাটের চিত্রটির মধ্যে পরিত্যক্ত ও অনাদৃত একটা নিঃসঙ্গ দুঃখীর ছবি আছে। হাটের চালার ঘূণে-ধরা বাঁশের খুঁটিগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাতাসের গুঞ্জন তাই কবির নিকট বিদ্রূপের মত প্রকাশ করে। এ অবশ্য কবির বিশিষ্ট কল্পনার ব্যাখ্যা। এই কল্পনার প্রেরণাতেই শিশির-ধোওয়া প্রভাতে সদ্য আহৃত তাজা ফলটির প্রতি মানুষের অনাদর-অবহেলা এবং দিনান্তে শুষ্কপ্রায় ঐ ফলটির স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের মধ্যে কবি জীবনের প্রতি একটি নিষ্ঠুর পরিহাস লক্ষ্য করেন। এইসবের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের মানসভঙ্গীর যে বিশেষত্বটি ধরা পড়ে তাহা ঠিক pessimism বা নৈরাশ্য নহে, উহাকে আমরা বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্যের অভ্যন্তরে যে একটা রসাস্বাদ আছে তাহার উপভোগপ্রবণতা বলিতে পারি। গ্রাম্য হাটের নগণ্য ছবিটির মর্মমূল হইতে কবি নিঙড়াইয়া সেই পরিহাসকঠোর সত্যোপলব্ধির রসটিই বাহির করেন এবং সেই রসে আবিষ্ট হইয়া জগৎ সম্বন্ধে ইহার ব্যাপকতর অর্থ আবিষ্কার করিয়া বসেন। মানুষের জীবনটাও যেন একটা হাট। ইহার চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্নার মর্ম তখন নূতন আলোকে তাঁহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

কবিতাটির মধ্যে কল্পনার এই বিকাশ, ভাবের এই সুনিপুণ পুষ্টি বিশেষ উপভোগ্য।

সংক্ষিপ্তসার—দূরে দূরে অবস্থিত দশবারোখানি গ্রামের মধ্যে একখানি হাট। সান্ধ্য প্রদীপ সেখানে জ্বলে না, প্রভাতে ঝাঁট দিয়া কেহ আবর্জনা সরায় না। যাহারা হাটে আসে তাহারা সন্ধ্যার পূর্বেই বেচাকেনা সারিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। সন্ধ্যাসমাগমে দূর গ্রামের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু হাট থাকে অন্ধকারে। রাত্রি নামিয়া আসে; পাকুড়গাছের ডালপাতার মধ্য দিয়া বাতাস সশব্দে বহিতে থাকে। জনমানবশূন্য হাট নীরব অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়, শোনা যায় শুধু জীর্ণ বাঁশের ফাটলে বহমান বাতাসের বিকৃত শিস্‌ধ্বনি। দিনের বেলায় হাট থাকে পরিচিত-অপরিচিত সহস্র মানুষের দরদাম কেনাবেচার বিচিত্র কোলাহলে মুখর; অসংখ্য পদচিহ্ন তাহার ধূলায়।

ফিরিবার সময় কেহ হয়তো দেখে তাহার প্রচুর লাভ হইয়াছে, কাহাকেও বা লাভের বদলে লোকসানই সহিতে হইয়াছে। হাটের জীবনে অসংখ্য লোকের এই আসা-যাওয়া অবিরাম চলিয়াছে। নদীর এপার ওপার সব জায়গা হইতেই ক্রেতা-বিক্রেতা সেখানে আসিয়া জড় হয়। প্রভাতের টাটকা তাজা ফল শত হাতের নাড়াচাড়ায় মলিন শুষ্কপ্রায় হইয়া বিকালে অবহেলায় অল্প দামে বিকাইয়া যায়।

এই সংসারও একটি বিশাল হাট। প্রতিদিনিয়ত এখানে লক্ষকোটি নূতন প্রাণীর সমাগম ও নির্গম হইতেছে। এই অভিনয়ের বিরাম নাই। এ হাট চারিধার সীমাহীন বিস্তার হইয়া সর্বদাই খোলা রহিয়াছে—যেখানে আসা-যাওয়ার কোনো বাধা নাই। এখান হইতে পরলোকে ফিরিবার সময় কেহ ব্যর্থতায় বিলাপ করে, কেহ বা পাথেয় সঞ্চয় লইয়া লয়। অনন্ত আকাশের নিচে এই একই খেলা চিরকাল চলিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

দূরে দূরে……একখানি হাট—পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে একখানি হাট ; এই হাটখানিই এই গ্রামগুলির অধিবাসীদের চাহিদা মিটায়—এখানে আসিয়া তাহারা কেনাবেচা করে। সাধারণতঃ গ্রাম খুব বড় এবং তাহার অধিবাসীদের সংখ্যা বেশী হইলে সেখানে হাট বসে, ছোট গ্রামে হাট বসে না। **সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না** ইত্যাদি—হাট তো আর গৃহস্থের গৃহ নয় যে সেখানে গৃহস্থবধূ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে আর প্রভাতে ঝাঁট দিয়া আবর্জনা সরাইয়া ফেলিবে। হাট একটা সাধারণ (common) স্থান এবং সাধারণ বলিয়াই তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার দায়িত্ব কাহারও নয়। তাহা ছাড়া সন্ধ্যার পূর্বেই হাটের সব কেনাবেচা শেষ করিয়া লোকে চলিয়া যায় বলিয়া সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিবার জন্য কেহ সেখানে থাকে না, জ্বালিবার প্রয়োজনও হয় না। কবি এখানে ইঙ্গিতে গৃহস্থের ঘরের সহিত তুলনা করিয়া হাটের মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন। গৃহস্থের ঘরখানির কত আদর, কত যত্ন, কিন্তু হাট সর্বদাই অনাদৃত। **যে যাহার সবে**—ইহার অন্বয় এইরূপ : সবে (সকলে) যে যাহার। **বকের পাখায় আলোক** ইত্যাদি—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যখন

অন্ধকার পৃথিবীতে নামিতে থাকে, তখন এই দানবের ভয়েই যেন আলোক প্রথমে পূর্বদিকের প্রান্তর ছাড়িয়া উঁচু গাছের চূড়ায় আশ্রয় লয়; তাহার পর বৃক্ষচূড়া অন্ধকার হইলে আরও উর্ধ্বে আকাশে উড্ডীয়মান বকশ্রেণীর পালক সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু দেখা যায়—আর কোথাও দেখা যায় না। **মন্তব্য:** কবি এখানে একটিমাত্র বাক্যে একটি অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। **দূরে দূরে গ্রামে** ইত্যাদি—সন্ধ্যাসমাগমে দূরে গ্রামগুলির ঘরে ঘরে গৃহস্থবধূরা প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়, কিন্তু হাটে একটি প্রদীপও জলে না —জনমানবশূন্য হাট অন্ধকারে একাকী পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্তবক

নিশা নামে দূরে ইত্যাদি—যখন সব কাক যে যাহার নীড়ে ফিরিয়াছে তখন কোনো কারণে দলছাড়া একটি কাক সঙ্গীদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া উড়িতেছে। চতুর্দিকের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে আকাশে ঐ একক কাকের কালো পাখা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কৃষ্ণা রাত্রি ঐ পাখায় ভর করিয়াই নামিয়া আসিতেছে। নদীর বাতাস—নদীর উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু। **প্রশ্বাস**—যে বায়ু ভিতরে টানিয়া লওয়া হয়, এখানে 'নিশ্বাস' অর্থে ব্যবহৃত। পার্শ্বে পাকুড়-শাখে—হাটের পাশের পাকুড়গাছটির ডালে। **নদীর বাতাস··· পাকুড়-শাখে**—নদীর উপর দিয়া আসিয়া বাতাস হাটের পাশে পাকুড়-গাছটির ডালপাতার মধ্য দিয়া যখন বহিতে থাকে, তখন একরকম ঝিরঝির শব্দ হয়। কবি কল্পনা করিতেছেন, এই শব্দ যেন হাটের দুঃখে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। **দোচালা**—খড় অথবা টিনের দুইটি চালাবিশিষ্ট দেওয়ালবিহীন ঘর। এরূপ ঘরে হাটের অস্থায়ী দোকান বসে। **মুদিল নয়ান**—চোখ বুজিল অর্থাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল; নিদ্রিত প্রাণীর মতো নীরব হইল। 'নয়ন'-এর স্থলে 'নয়ান' এখানে মিলের অনুরোধে করিতে হইয়াছে। মিলের প্রয়োজন না থাকিলেও 'নয়ান' 'অনুপাম' (অনুপম) প্রভৃতি রূপ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও 'নয়ান' লিখিয়াছেন: "করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান"। কারো তরে ইত্যাদি—হাট এখন আর কাহাকেও ডাকিবে না। **বাজে বায়ু আসি** ইত্যাদি—হাটের দোচালাগুলির বাঁশের খুঁটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই ফাটা ঘুণে-ধরা বাঁশের ছিদ্রপথে যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন বাঁশীর বিকৃত

সুরের মতো একটা ধ্বনি শোনা যায়। এই ধ্বনি যেন হাটকে বিদ্রূপ করিতে থাকে। বাতাস অবশ্য নিজে বিদ্রূপ করে না—ফাটা বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে বহিবার সময় যে ধ্বনি আপনা হইতেই হয় তাহাই বিদ্রূপের মতো শোনায়। **একক কাকের ডাকে**—একটিমাত্র কাকের রবে। এই কাকটির কথা কবি পূর্বেই বলিয়াছেন। এখানে 'কাকের ডাক'-এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। হাটের পক্ষে যাহা একান্ত অবাঞ্ছিত সেই রাত্রি আসিয়াছে। ইহা যে আসিবে তাহারই অশুভ সূচনা কাকের ডাকে।

তৃতীয় স্তবক

চেনা-অচেনার ভিড়ে—হাটে নানা গ্রামের বহু লোক আসিয়া ভিড় করে; তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও পরিচিত, কেহ বা অপরিচিত। **কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন**—অসংখ্য পায়ের দাগ যেগুলি নূতন পায়ের ছাপে অস্পষ্ট ও খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সে ঠাঁই ঘিরে—সেই স্থানের চতুর্দিকে; হাটের সর্বত্র। **কত-না ছিন্ন·········ঘিরে**—দিনের বেলা বহু লোকের সমাগমে হাটের সর্বত্র মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়িয়াছে, কিন্তু কোনো চিহ্নই স্থায়ী হইতে পারে নাই—নূতন পায়ের ছাপে পুরাতনগুলি আংশিক বা পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন হাট জনমানবশূন্য। সেখানে শেষ পদচিহ্ন যাহা পড়িয়াছিল, তাহা এখন অবিকৃতই আছে। মাল-চেনাচেনি—হাটে বিক্রয়ের জন্য আনীত বস্তুর পরখ। দর-জানাজানি—দাম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ। **কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি**—ক্রেতার পক্ষে সামান্য দুই-এক পয়সা কমাইবার এবং বিক্রেতার পক্ষে দুই-এক পয়সা বাড়াইবার জন্য কি বিপুল প্রচেষ্টা! হানাহানি—জোরজবরদস্তি (ক্রেতার পক্ষে)। এখানে 'চেনাচেনি জানাজানি টানাটানি হানাহানি'-তে ধ্বনিসাম্য লক্ষণীয়—সুন্দর অনুপ্রাস। **কেউ গেল খালি ফিরে**—কাহাকেও হয়তো পছন্দমতো জিনিস কিনিতে না পারিয়া খালি হাতেই ফিরিতে হইল। অথবা, কেহ লাভ করিল, কাহাকেও বা লোকসান সহিয়াই বাড়ী ফিরিতে হইল।

চতুর্থ স্তবক

কত কে আসিল ইত্যাদি—হাটে অতীতে বহু লোক আসিয়াছে, বর্তমানে আসিতেছে—এবং ভবিষ্যতেও আসিবে। ওপারের লোক—নদীর অপর পারের গ্রামগুলির লোক। **পসরা**—পণ্য; বিক্রয়ের দ্রব্য। **শিশিরবিমল**—নৈশ

শিশিরে স্নান করিয়াছে বলিয়া নির্মল। কথাটি 'প্রভাত'-এর বিশেষণ,— 'ফল'-এর নয়। প্রভাতের ফল—সকালবেলা যে ফল গাছ হইতে ছেঁড়া বা পাড়া হইয়াছে। এই কারণেই সে ফল তাজা। **শত হাতে সহি পরখের ছল—** কত শত লোক ফলটিকে যাচাই করিবার জন্য হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে কিনিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে এমন নয়, কেহ কেহ শুধু দেখিতেই আসিয়াছে। এইজন্যই পরখকে 'ছল' বলা হইয়াছে। বেচারি ফলটিকে এইসব উপদ্রব নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। **বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়**—শত হাতের নাড়াচাড়ায় ফলের সতেজতা আর থাকে না, বিকাল পর্যন্ত তাহা অবিক্রীতই পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিবার তাগিদেই বিক্রেতা অনাদরে সেটিকে কম দামে অনিচ্ছুক ক্রেতার কাছে বেচিয়া ফেলে।

পঞ্চম স্তবক

নূতন করিয়া বসা ইত্যাদি—বহুদিনের পুরাতন এই হাট একদিন সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত বসিয়া ভাঙে; আবার হাটবারে নূতন করিয়া বসে ও ভাঙে। হাটের এই বসা-ভাঙা মেলার মতোই সাময়িক ও অস্থায়ী, কিন্তু এই বসা-ভাঙার ধারাটি চিরন্তন। এই সংসারও যেন একটি বিরাট্ হাট; এখানেও চলিতেছে বসা-ভাঙার সাময়িক অথচ নিত্যলীলা। **দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী** —পৃথিবীতে অহর্নিশ লক্ষকোটি নূতন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিতেছে, তাহারা এই ভবের হাটে নূতন যাত্রী। **নাটের খেলা**—অভিনয়। **নিত্য নাটের খেলা**—বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয়, এই লক্ষকোটি প্রাণীর আসা-যাওয়া ও হাসিকান্না অবিরাম চলিয়াছে। **মুক্ত বাতাসে**—পৃথিবীর বিপুল অবারিত বিস্তারে। **বাধা নাই ওগো** ইত্যাদি—এখানে প্রাণীর আসা-যাওয়ায় বাধা দিবার কেহ নাই। **কেহ কাঁদে**—জীবনের ব্যর্থতায় কেহ হয়তো বিলাপ করে। **কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে**—কেহ বা পরলোকের প্রভূত পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লয়। ঘরে ফিরিবার বেলা—পরলোকে যাত্রা করিবার সময়; পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময়। পরলোকই জীবের ঘর, স্বস্থান,—পৃথিবী সাময়িক লীলাক্ষেত্র মাত্র। চিরকাল একই খেলা—এই একই অভিনয় অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, এ অভিনয়ের আর বিরাম নাই। **মন্তব্য ঃ** মনে রাখিতে হইবে যে শেষ স্তবকে কবি লৌকিক হাট এবং ভবের হাটকে একদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

ভাবায় দুই দিকেরই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। সংসারকে হাটরূপে কল্পনা করা আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই কল্পনা লইয়া বহু লোকসঙ্গীত বাঙলায় রচিত হইয়াছে। তুলনীয়ঃ

"অবেলায় হাট ভাঙলি, শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
ভাঙা হাটের হেটো যারা একে একে গেছে তারা ;
(আমি) কর্মদোষে রইলাম ব'সে পাপের বোঝা শিরে ধরি ॥"

ব্যাখ্যা

(১) বকের পাখায়……আঁধারেতে থাকে হাট। (স্তবক ১)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতার অন্তর্গত। সন্ধ্যা-বেলায় শূন্য হাটের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি উদ্ধৃত অংশের অবতারণা করিয়াছেন।

দূরে দূরে অবস্থিত দশবারোখানি গ্রামের মধ্যে একখানি হাট। দিনের বেলায় তাহাতে বেচাকেনার ধুম লাগে, সন্ধ্যা ঘনাইতেই হাট ভাঙিয়া যায়। হাটে তখন কেউ থাকে না, সেখানে কোথাও একটি দীপও জ্বলে না। সকালে সেখানে ঝাঁট পড়ে না। দিনের বেলাতেই সেখানে যা-কিছু ভিড়। বিকাল পড়িতে সবাই যার যার বাড়ী ফিরিয়া যায়। দিনের আলো পৃথিবী ছাড়িয়া ক্রমে উপরে উঠে। গাছের চূড়া ছাড়িয়া শেষে আকাশে বকের পাখায় সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু ক্ষণিক আশ্রয় লয়। বকশ্রেণী পূবের মাঠের উপর দিয়া দূরে পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে কোথায় মিলাইয়া যায় আর সেই সঙ্গে বেলাশেষের ক্ষীণ আলোটিও বিদায় লয়। যেন আঁধার রাত্রির ভয়ে সেই আলো বকের পাখায় চড়িয়া কোথায় আত্মগোপন করে। ক্রমে আঁধার নামে, দূরে দূরে গাঁয়ে একটি একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু হাটখানি আঁধারে ডুবিয়া যায়।

(২) নিশা নামে দূরে……একক কাকের ডাকে। (স্তবক ২)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক। সন্ধ্যায় পরিত্যক্ত হাটখানির উপর কেমন করিয়া আঁধার ও রিক্ততা নামিয়া আসে এই অংশে তাহারই বর্ণনা।

বেলাশেষের ক্ষীণ আলোক মিলাইয়া যাইতেই আঁধার নামে। তাহার পূর্বেই পশুপাখী সব নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে। সারি বাঁধিয়া কাকেরা ফিরিয়া

গিয়াছে। একটা দলভ্রষ্ট কাক হয়তো বিলম্বে ফিরে। তখন আঁধার হইয়া গিয়াছে। কবির কল্পনায় আঁধার যেন এই একক কাকটির কালো পাখায় ভর করিয়াই পৃথিবীতে নামে। তখন হাটখানি আঁধারে ঢাকিয়া রিক্ততায় খাঁ খাঁ করিতে থাকে। হাটখানির এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য ছবি দেখিয়া পাশের নদীটি শুধু সমবেদনা বোধ করে। সমবেদনায় উহা যে দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাহাই যেন বাতাসরূপে হাটের পাশের পাকুড়গাছটার পত্রমর্মরে শূন্য নিঃস্বন সৃষ্টি করে। হাটের চালাগুলিতে আলো নাই—যেন তাহারা ক্রমে চোখ বুজিয়া রিক্ততার ব্যথা নীরবে সহ্য করে। সেই আঁধারে সেখানে কেহ আসুক, আসিয়া কেনা-বেচা করুক—এমনতর ইচ্ছায় তাহারা আর কাহাকেও ডাক দেয় না। বাতাস আসিয়া চালার জীর্ণ বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশীর শব্দ বাহির করে। সেই শব্দে হাটের প্রতি একটা বিদ্রূপই যেন ব্যক্ত হয়। হাটখানির দিনের সেই প্রাণচঞ্চল ঠাট আর নাই। দিনভর স্বার্থের খেলা সারিয়া মানুষ তাহাকে স্বচ্ছন্দ অবহেলায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—ইহাই যেন সেই বিদ্রূপের মর্ম। সন্ধ্যাবেলায় কেহ তাহার বন্ধু নয়, কেহ তাহার শুভকামনা করে না। তাই না একটা অলক্ষুণে কাকের ডাকে আঁধার আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। হাটের জীবনে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস নিত্যকার প্রাপ্য। স্বার্থের সংসারে এটাই সকলের জীবনে একান্ত সত্য—ইহাই কবির পরোক্ষ বক্তব্য।

(৩) শিশিরবিমল প্রভাতের ···ক্রেতা-বিক্রেতা! (স্তবক ৪)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতার চতুর্থ স্তবকের অংশ। দিনের বেলায় হাটের সহস্র কেনা-বেচা বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি এই অংশটি যোজনা করিয়াছেন।

সকালবেলায় হাট জমে। কত লোক কত জিনিসের পসরা সাজাইয়া বসে। ফলওয়ালার শিশির-ধোওয়া প্রভাতে সদ্য-আহৃত টাটকা ফলগুলি তখনও সতেজ। সেই ফল বিক্রি হইতে হয়তো বেলা পড়িয়া যায়। কত লোক হাতে লইয়া তাহাদের পরখ করে, দামদস্তুর করে, আবার দামে বনে না বলিয়া ফেলিয়া যায়। এইভাবে শেষে বিকাল পর্যন্ত ফলগুলি হয়তো বিকাইয়া যায়। তখন তাহারা আর টাটকা থাকে না। মানুষের এই মূল্য-যাচাই ফলের প্রকৃত মর্যাদার প্রতি উপেক্ষাই সূচিত করে। টাটকা সতেজ লাবণ্যময় ফলটির একটা নিজস্ব মূল্য

আছে। দুঃখের বিষয় লোকে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাই সকালের ফল সকালে বিকায় না, বিকায় বিকালে। হয়তো তাহাও অল্প দামে। ইহাতে ফলের প্রতি একটা অপমান সূচিত হয়। ফল যেন তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করে, কিন্তু নীরবে সে সব অপমান সব দুঃখ সহিয়া বিকালবেলায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। হাটের কেনা-বেচার মধ্যে শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের শোরগোল আর কত লোকের যাওয়া-আসা।

(৪) নূতন করিয়া বসা……চিরকাল একই খেলা! (স্তবক ৫)

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতার শেষ স্তবক। হাটের নিত্যলীলার মধ্যে কবি যে গূঢ় মর্মটি উপলব্ধি করিয়াছেন, এই অংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

ভোরের দিকে হাটবারে হাট জমে, বিকালে আবার তাহা ভাঙিয়া যায়। এইভাবে নিত্য হাট বসা আর ভাঙার খেলা চলিতেছে। প্রতিদিন কত নূতন মানুষের আসা-যাওয়া চলে সেখানে। হাটের প্রাণচাঞ্চল্যের পরেই রিক্ততা, রিক্ততার পর প্রাণচঞ্চল কর্মমুখরতা—এই যে দৈনিক পটপরিবর্তন—এ যেন একটা নাটকের অভিনয়লীলা মাত্র। হাটের এই রঙ্গমঞ্চে যে-কেহ আসিয়া অভিনয় করিতে পারে—কাহারও পক্ষে কোনো বাধা নাই। মুক্ত-বাতাসে স্বচ্ছন্দ এই পালা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। এখানকার বেচা-কেনায় কাহারও লাভ, কাহারও বা লোকসান। একজন ক্ষতির ব্যথায় কাঁদে, আর একজন হয়তো লাভের কড়ি গাঁটে কষিয়া বাঁধে।

হাটের এই বর্ণনার মধ্যে কবি ক্রমে ব্যাপকতর একটি ভাবে পৌছিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার তাঁহার চোখে যেন একটি হাটের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মানুষ এখানে জীবের দিবসকালটি স্বার্থের বিনিময় করিয়া কত লাভ-লোকসান আর হিসাব যাচাই করিয়া কাটায়। জীবনশেষে যখন মৃত্যুর রাত্রি আসে তখন আবার সংসার-হাটের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া তাহাকে বিদায় লইতে হয়। জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্যের জন্য সংসারের হাটে কাহারও দুদিনের আনন্দ, কাহারও বা গভীর বিয়োগব্যথা—কাহারও ব্যর্থতা, কাহারও সাফল্য। সংসার সত্যই হাট—ইহার দুর্বোধ্য কলরোল এই আছে, এই নাই। সবটাই যেন মায়া।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতাটির বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতাটির মর্মকথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

উ.। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতাটির মর্মমূলে রহিয়াছে জীবন-সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় উপলব্ধি। কবিতাটির প্রথমাংশে গ্রাম্য হাটের একখানি বস্তুলীন চিত্র আমাদিগকে চমৎকৃত করে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চিত্রে হাটের সত্যকার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তে একটি ব্যাপকতর ও সুগভীর ভাবের সঞ্চার হয়। অবশেষে শেষ স্তবকে আসিয়া সমগ্র এই সংসারটিই একটি হাটের রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রাম্য হাটের একটি খণ্ড অনুভূতি ক্রমে বিশ্বহাটের ব্যাপক অনুভূতিতে পুষ্ট হয়। মানুষের এই জীবনটা দুদিনের হাসিকান্না মাত্র—সংসারের রঙ্গমঞ্চে কত কি অভিনয় করে মানুষ—হাটের পটভূমিকায় এ যেন স্বার্থের অর্থহীন দরকষাকষি। দিনের শেষে যেমন হাট ভাঙে, জীবনশেষে তেমনি সংসারলীলা সাঙ্গ হয়। অথচ 'যতদিন শ্বাস ততদিন আশ,' লাভ-লোকসানের হিসাবনিকাশ আর চাওয়া-পাওয়ার অনন্ত খেলা। এই লীলায় মানুষের সবসময় যথার্থ শ্রেয়োবোধ থাকে না। কাঞ্চন ফেলিয়া অনেকে কাচে গেরো দেয়। হাটে যেমন সকালের তাজা ফলটির কদর হয় না, বিকালে শুকনা ফলটি কম দামে বিকায়—তেমনি জীবনের সত্যকার মূল্যবান্ বস্তুর প্রতি আমাদের প্রায়ই ভ্রূক্ষেপ থাকে না। আমাদের স্বার্থান্ধ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তাই যেমন বেদনাদায়ক হয়, তেমনি মিথ্যা আনন্দের আত্ম-প্রবঞ্চনাও তাহাতে কম থাকে না। এ জীবন শুধু ক্ষণস্থায়ী হাটের লীলা। এই সত্য আমাদের উপলব্ধির মর্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে জীবন-সম্বন্ধে সত্য ও মূল্য-নিরূপণে আমাদের ভুল না হইবারই কথা। কবি এই জীবনদর্শনই যেন 'হাট'-এর বর্ণনায়, ভাবের বিস্তারে এই কবিতায় ছন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্র. ৩। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

প্র. ৪। "বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ।" —বকের পাখায় কখন কিসের আলোক কেমনভাবে লুকায়?

উ.। **১নং ব্যাখ্যা** দেখ।

প্র. ৫। "বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে।"—কোথাকার জীর্ণ বাঁশে বায়ু আসিয়া বাজে? তাহাতে কিসের জন্য বিদ্রূপ ব্যঞ্জিত হয়?

উ.। **২নং ব্যাখ্যা** দেখ।

প্র. ৬। 'শিশিরবিমল প্রভাতের ফল'

... ...

বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।

—'প্রভাতের ফল' বিকালে কেন ও কি ব্যথা সহে? অংশটির ব্যাখ্যা কর।

উ.। **৩নং ব্যাখ্যা** দেখ।

প্র. ৭। 'দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা।'

—দিবসরাত্রি কোথায় এই নূতন যাত্রী আসে? এখানে উল্লিখিত 'নাটকের খেলা' বলিতে কবি কি বুঝাইতেছেন? আনুপূর্বিক প্রসঙ্গ বুঝাইয়া অর্থ স্পষ্ট কর।

উ.। **৪নং ব্যাখ্যা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস: বেচা-কেনা—বেচা ও কেনা (দ্বন্দ্ব)। শ্রেণীহারা—শ্রেণী হারাইয়াছে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। বিদ্রূপ-বাঁশি—বিদ্রূপসূচক বাঁশি (মধ্যপদ-লোপী কর্মধারয়)। মাল-চেনাচিনি—মালের চেনাচিনি (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)। কানাকড়ি—কানা যে কড়ি (কর্মধারয়)। ওপারের—ও অর্থাৎ ওই পার (কর্মধারয়), তাহার। শিশিরবিমল—বিগত মল যাহা হইতে (বহুব্রীহি) তাহা বিমল; শিশিরের ন্যায় বিমল (উপমান-কর্মধারয়)। দোচালা—দো অর্থাৎ দুই চাল যাহার (বহুব্রীহি), তাহা।

সাধু গদ্য-রূপ : পাখে—পাখায়। শাখে—শাখায় নয়ান—নয়ন। নিয়ে—লইয়া। সহি—সহ্য করিয়া।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : ঝাঁট—ঝাঁট্+অ (উচ্চারণে এই অ-টি লুপ্ত)। একক—এক+ক (স্বার্থে)।

ব্যাকরণগত টীকা : জ্ব'লে ওঠে—একটি অসমাপিকা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া মিলিয়া একটি যৌগিক ক্রিয়া হইয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ার মূল অর্থ থাকে পূর্বাঙ্গে, উত্তরাঙ্গটি পূর্বাঙ্গের অর্থ পূর্ণ অথবা সম্প্রসারিত করে।

নয়ান—মূল শব্দটি 'নয়ন'; এখানে 'আহ্বান'-এর সহিত মিল রাখিবার জন্য 'নয়ান' করা হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলেও কবিরা 'নয়ন'-স্থলে 'নয়ান' প্রয়োগ করেন সম্ভবতঃ শ্রুতিমধুরতার জন্য। তুলনীয়: "আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ান আকুল নয়ান রে" (রবীন্দ্রনাথ); এখানে 'নয়ান'ও এইরূপ।

টানাটানি—পরস্পর টানা অর্থে একই ক্রিয়ার (বিশেষ্যের নয়) দ্বিত্বের ফলে শব্দটি উৎপন্ন। কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যতীহার বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে ব্যতীহার বহুব্রীহি নাই, কারণ একই বিশেষ্যপদের দ্বিত্ব এখানে হয় নাই। কবিতাটিতে এইরূপ আরও শব্দ: চেনাচিনি, জানাজানি, হানাহানি।

বাক্য-রচনা : একক: ভীম একক চলিলেন দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে।

কানাকড়ি: অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতারই বাস্তব মূল্য কানাকড়িও নয়।

পসরা: ফুল্লরা মাংসের পসরা ফেলিয়া জল পান করিতে যাইতে পারে না।

পরখ: ব্যাপারাটা সত্যি কি মিথ্যা একবার পরখ ক'রেই দেখা যাক না।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ: 'আঁধারেতে থাকে'—এখানে 'আঁধার' সত্য-সত্যই অন্ধকার অর্থাৎ বাচ্যার্থে প্রয়োগ; কিন্তু আঁধারে বা অন্ধকারে থাকা'-র বিশিষ্টার্থে প্রয়োগও আছে; অর্থ—কিছু না জানা, অজ্ঞ থাকা; যথা—

আমি তো আঁধারে (অন্ধকারে) ছিলাম, স্বপ্নেও ভাবিনি সে তলে তলে আমাকেই ডোবাবার আয়োজন ক'রে চলেছে।

কালবৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—'কালবৈশাখী' কবিতাটি মোহিতলালের 'হেমন্ত-গোধূলি'-নামক কবিতা-গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে।

এই কবিতায় কবি কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টির একটি লেখা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। চৈত্রের শেষে বৈশাখের প্রারম্ভে বাঙলায় যে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টির খেলা চলে, তাহাকেই আমরা কালবৈশাখী বলিয়া থাকি। উহার প্রচণ্ডতার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য সকলের নিকট উহা বরণীয় হয়। পুরাতন বৎসরের অবসান আর নূতন বৎসরের সুশ্যাম পটভূমিকায় নবজীবনের সঞ্চার—ইহারই অগ্রদূত কালবৈশাখী। কবি এই কালবৈশাখীরই নানান রূপ দেখিয়াছেন মেঘকজ্জল আকাশে, মত্তপ্রভঞ্জনের ভৈরব লীলায়, বিদ্যুৎচমকে, বজ্রের নির্ঘোষে আর ধারাসার বর্ষণে। বিনাশলীলার মধ্য দিয়া নূতন সৃষ্টির সূচনা—ইহাই কালবৈশাখীর তাৎপর্য। কবি কালবৈশাখীর বিচিত্র রূপ হইতে এই ভাবটিতে গিয়া উপসংহার করিয়াছেন। এইভাবে কালবৈশাখীই কবিতাটির আদ্যন্ত বস্তু ও ভাবের অবলম্বন। সুতরাং উহার শিরোনাম 'কালবৈশাখী'।

সমালোচনা—'কালবৈশাখী' কবিতাটির মধ্যে মোহিতলালের যাহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তাহার কিছুটা পরিচয় মিলে। এই বিশেষত্ব হইল মোহিতলালের কাব্যে বুদ্ধির সহিত আবেগ-কল্পনার এক অপূর্ব সমন্বয়। একথা স্পষ্টতই অনুভূত হয় যে কালবৈশাখীর বিচিত্র রূপদর্শনে কবি কেবল কল্পনার মর্মচক্ষু দিয়াই সৌন্দর্য ভোগ করেন নাই, বুদ্ধির বিশ্লেষণে তাহাকে অর্থময় করিয়া তুলিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার নিকট কালবৈশাখী একটি স্থিররূপে, একটা একীভূত রূপকল্পনায় ধরা দেয় নাই। উহার খণ্ড দৃশ্য তাহার নিকট খণ্ডরূপে বৈচিত্র্যময় হইয়া দেখা দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ ও রুদ্ধশ্বাস প্রকৃতির বুকে যখন কালবৈশাখীর ছায়াপাত হয়, তখন দিনের আলো কালো আঁধারে নিভিয়া আসে। বৃক্ষ প্রভৃতি নিস্পন্দ নিথর হইয়া আতঙ্কের সহিত যেন

একটা প্রলয়কাণ্ডের প্রতীক্ষা করে। এই এক দৃশ্য। আকাশে ঘন মেঘের চঞ্চল বিস্তার আর গুরু গর্জন আর এক দৃশ্য প্রকট করে। সেই মেঘ বিশাল একটা রাহুর মুণ্ডের মতো অথবা চলমান একটা পর্বতের মতো যেন সূর্যকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। আবার সেই ঘনঘোর মেঘের বুকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিকাশে কবি দিগ্‌হস্তীর দীর্ঘদন্তে আকাশ-বিদারণের রূপ দেখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, আকাশ-লোকে সেই ভৈরব বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ-চমক, প্রচণ্ড ঝড ও বর্ষণ—সব মিলিয়া যেন দেবাসুরের যুদ্ধের দৃশ্য প্রকট করিয়াছে। এইভাবে কালবৈশাখীর আগম ও নির্গম পর্যন্ত কবির মন প্রকৃতির বিস্তৃত বিক্ষোভের মধ্যে নানা রূপ, নানা অর্থ আরোপ করিয়াছে। কবিতাটির সপ্তম স্তবক পর্যন্ত কবির এইভাবে রূপ হইতে রূপান্তরে দ্রুত প্রয়াণ। তারপর ছেদ। মূল কবিতার কিঞ্চিৎ বর্জনের ফলে এই ছেদরেখা এখানেও আরও বিশেষভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর কবিরও রূপধ্যান অন্তর্হিত; তখন জাগ্রত বুদ্ধির মুখর আলাপই কবিতাটির মধ্যে নবজীবনের আশার কথা সঞ্চারিত করিয়া তোলে। কবিতাটির মধ্যে চিত্রের প্রাচুর্য যেমন উহার উৎকর্ষ সূচনা করে, তেমনি চিত্রগুলির রূপরেখা জটিলতা-সত্ত্বেও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কেবল এক আধ জায়গায় রেখাগুলি অস্পষ্ট। কিন্তু এই চিত্রগুলির দ্রুত-পরিবর্তনের মধ্যে একটি ঝড়ের বেগ দেখা যায়। হার বাহন হইয়াছে অনুরূপ বেগবান্ ছন্দ। ইহার ফলে কবিতাটির মধ্যে যেন কালবৈশাখীর দুর্মদ আবির্ভাবই হইয়া উঠে।

কবিতাটির চিত্রধর্মিতা ও ছন্দোবেগ কবির মৌলিকত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু এই চিত্র-রচনায় কবি এদেশের প্রাচীন কাব্য ও পুরাণের নিকট নিঃসন্দেহে ঋণী। মেঘগুলিকে হাতীরূপে এবং বিদ্যুৎ-চমককে তাহাদের দাঁতে আকাশ-বিদারণের কল্পনায় কবি কালিদাসের মেঘদূত দ্বারা প্রভাবিত। মেঘদূতে এক স্থলে আছে—

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।

এখানে মেঘরূপী হাতীগুলি আকাশে দাঁত ফুটাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্রকে বৃষ্টি ও শস্যের দেবতা এবং বৃত্রাসুরকে অনাবৃষ্টির অধিপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। দেবাসুরের যুদ্ধে বৃত্রাসুরবধ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বুকে অজন্মা ও অনাবৃষ্টির অবসান সূচনা করে। তৃতীয়তঃ, কবিতাটির শেষাংশে যে

ভাব এবং যে মনন-ক্রিয়া দেখি তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' ও ইংরাজ কবি শেলির Ode to the West Wind-এর সাদৃশ্য আছে। কবি এই অংশে প্রভাবিত, অন্ততঃ মৌলিক নহেন। এখানে কেবল ভঙ্গীটাই তাঁহার নিজস্ব। কিন্তু এই ভঙ্গীর এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা পূর্বশ্রুত সঙ্গীতকেও নূতন সুরে, নূতন ভাবে উপভোগ্য করিয়া তোলে। কবি অন্যের কথাকে, অন্যের প্রভাবকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইয়াই যেন এই সার্থকতা অর্জন করিতে পারিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার—কালবৈশাখীর আবির্ভাব আসন্ন। মধ্যাহ্নে রক্তচক্ষু সূর্য ঢাকা পড়িল, পুঞ্জীভূত মেঘের ছায়া বিরাট্ ছাতার মতো পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল। অরণ্যের মুখ বিবর্ণ, বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ। ভয়চকিত মানুষ ও পশুপাখীর তন্দ্রা গেল ঘুচিয়া। ঘোর বিপদের আশঙ্কায় সারি সারি বনস্পতি নিথর নিষ্কম্পভাবে দাঁড়াইয়া যেন ভীষণেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। হয়তো তাহারা বাতাসে আসন্ন মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত পাইয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। পুঞ্জীভূত মেঘরাশি দেখিয়া মনে হয় তাহা যেন আকাশের বিশাল কটাহ হইতে উত্থিত রাশি রাশি ধোঁয়া অথবা কাহারও বিশাল মুণ্ডের কুণ্ডলীপাকানো জটাজাল, অথবা সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত বেগে ধাবমান কোনো সচল পর্বত।

তাণ্ডবরত মহাদেবের আন্দোলিত জটাজালের ন্যায় মেঘরাশি চলিতে লাগিল. গুরুগুরু রবে যেন ঝটিকার নাসিকা-গর্জন শোনা গেল, নীলকণ্ঠের কণ্ঠের ন্যায় আকাশের এক প্রান্ত পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিল। সর্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া পাগলের বেশে ঝড় আসিয়া পড়িল আর অমনি পৃথিবী হইল সান্দ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসিত বিদ্যুৎ-রূপ অঙ্কুশের আঘাতে অস্থির হইয়া মেঘপুঞ্জরূপী দিগ্‌গজগুলি যেন দন্তাঘাতে আকাশ চিরিয়া ফেলিতে লাগিল। ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জন সময় সময় বজ্রনির্ঘোষকেও ডুবাইয়া দিতেছে। এ যেন দূর আকাশের পথে দুই মহাবল যোদ্ধার মধ্যে ঘোর যুদ্ধ। অবশেষে বিদ্যুৎরূপ অসির আঘাতে অনাবৃষ্টির অসুরের দেহ ছিন্নভিন্ন হইল—মুষলধারে নামিল বর্ষণ। ধীরে ধীরে মেঘের কালো রঙ হালকা হইয়া আসিলে আলোকের মুখের কালো যবনিকা অপসারিত হইল।

বিজয়ী সেনাদলের মতো খণ্ডমেঘগুলি গুরুগর্জনে যেন নিজেদের জয়বার্তা

ঘোষণা করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। আকাশের নীলিমা স্বচ্ছ হইল, পৃথিবীর মালিন্য গেল ধুইয়া। বাতাসের মৃদুশ্বাসে আবার নদীর বুকে উঠিল কলধ্বনি আর আলোকে উদ্ভাসিত বৃক্ষরাজি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

নববর্ষের পুণ্যদিনে আসিয়াছে এই কালবৈশাখী। ঝড় বিদ্যুৎ ও প্রচণ্ড বজ্র-নির্ঘোষে মিলিয়া ইহার সামগ্রিক রূপটি ভীষণ হইলেও, কবির মনে ইহা একটা ভয়াতীত অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে, আনিয়া দেয় নূতন আশার বাণী। তাহার আবির্ভাব যেন ধ্বংস ও কল্যাণের দেবতা মহাদেবেরই আবির্ভাব। চৈত্রের ধূলিরাশি উড়াইয়া, তপ্তপৃথিবীকে শীতল করিয়া সে আনে শুষ্ক তৃণাঙ্কুর ও মাটিতে সরস নবীনতা। তাহার রুদ্র রূপ দেখিয়াও পৃথিবী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। কালবৈশাখীর সকল ভীষণতার মধ্যেই যেন মহাকালের শুভ পরামর্শ রহিয়াছে, কারণ সে আসে নবজীবনের অমোঘ আশ্বাস লইয়া।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন—দ্বিপ্রহরের ক্রুদ্ধ চক্ষু। বৈশাখের মধ্যাহ্নে সূর্যের দীপ্তি অত্যন্ত প্রখর হয় বলিয়া তাহাকে দ্বিপ্রহরের ক্রুদ্ধ চক্ষুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই চক্ষুর অগ্নিদৃষ্টিতেই যেন পৃথিবী তপ্ত হইয়া উঠে। **অন্ধ করিল কে**—কে ঢাকিয়া ফেলিল! কালবৈশাখী তাহার কালো মেঘের দ্বারা মধ্যাহ্নের চক্ষু সূর্যকে অন্ধ করিয়াছে, অর্থাৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মেঘে ঢাকা বলিয়া সূর্য তাঁহার দৃষ্টি হারাইয়াছে। **মন্তব্য:** এই স্তবকে কবি যাঁহার প্রসঙ্গে **'কে'** এই অনির্দেশবাচক সর্বনামটি তিনবার প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনিই **'কালবৈশাখী'**। মেঘের রক্তচক্ষুকে যিনি অন্ধ করিলেন, ধরণীর উপর ছায়ার ছত্র ধরিলেন, বনভূমিকে পাণ্ডুর করিয়া এবং জলস্থলের নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া যিনি লোকালয় হইতে পাখীর নীড় পর্যন্ত জীবের তন্দ্রা হরণ করিলেন তিনি কে? তিনি আর কেহই নন, স্বয়ং কালবৈশাখী। **বিরাট ছায়ার ছত্র**—আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। এই আকাশজোড়া বিরাট্ ছায়াকে বিশালকায় ছাতার মতো ধরণীর উপর তুলিয়া ধরিয়াছে কালবৈশাখী। **ধরণীর 'পরে... ধরিল কে**—কে যেন দিগন্তবিস্তৃত মেঘের ছায়াকে একটি বিরাট্ ছাতারূপে

পৃথিবীর উপর ধারণ করিয়াছে। কানন-আনন—বনের মুখ। **পাণ্ডুর**—ফ্যাকাশে। **কানন-আনন পাণ্ডুর করি**—কালবৈশাখীর আবির্ভাব আসন্ন বুঝিতে পারিয়া ভয়ে যেন বনের মুখ বিবর্ণ হইয়াছে, কারণ কালবৈশাখীর দাপটে বনের গাছগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **জলস্থলের নিশ্বাস হরি**—ভয়ে যেন জলস্থলের দম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় জলে-স্থলে সর্বত্র একটা গম্ভীর থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। এই বাতাস বন্ধ হওয়া এবং থমথমে ভাবই ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। আলয়ে কুলায়ে—মানুষের ঘরবাড়ীতে এবং পাখীর বাসায় অর্থাৎ মানুষের এবং পাখীর। **তন্দ্রা ভুলায়ে**—ঘুম ভাঙাইয়া। বস্তুতঃ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যাহা হইতে পারে তাহা তন্দ্রা বা হালকা ঘুম, নিদ্রা নয়। এই তন্দ্রা ঝড়ের আশঙ্কায় ভাঙিয়া গিয়াছে, সকল জীবই ত্রস্তভাবে ঝড়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। গগন ভরিল—সারা আকাশে ছড়াইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় স্তবক

যতেক বনস্পতির—বিশাল গাছগুলির। **ভাগ্য দেখি যে মন্দ**—অদৃষ্ট বড় খারাপ দেখা যাইতেছে। প্রবল ঝড়ে বড় বড় গাছগুলি ভাঙিয়া পড়িতে বা উন্মূলিত হইতে পারে বলিয়াই কবি তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছেন। **নিমেষ গনিছে** ইত্যাদি—এই কারণেই কি তাহারা সারি সারি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া সভয়ে প্রতীক্ষা করিতেছে কখন সেই ঘোর বিপদ্ আসিয়া পড়ে? **মরুৎ-পাথারে**—বাতাসের সমুদ্রে; বায়ুমণ্ডলে। **বারুদের ঘ্রাণ**—বারুদের গন্ধ। কবি কালবৈশাখীর ঝড়কে এখানে তুমুল যুদ্ধরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যুদ্ধে গোলাগুলি ছোড়া হয়, বাতাসে পাওয়া যায় তাহার পোড়া বারুদের গন্ধ। **মরুৎ-পাথারে……তুলিয়াছে প্রাণ?**—গাছগুলি কি ইতিমধ্যেই বাতাসে বারুদের গন্ধ পাইয়া আসন্ন মহাযুদ্ধের শঙ্কায় বিচলিত হইয়াছে? **পশিয়াছে**—প্রবেশ করিয়াছে কি? পৌঁছিয়াছে কি? দূর গগনের বজ্রঘোষণা ছন্দ—দূরে আকাশে কোথায় বজ্রনিনাদে কামানের গোলা ফাটিতেছে তাহার শব্দ। **পশিয়াছে……বজ্রঘোষণ ছন্দ?**—এখনও ঝড় আসিয়া পড়ে নাই। কবি ঝড়ের পূর্বে বনস্পতিগুলির ত্রস্ত নিশ্চলতার একটা কারণ অনুমান করিয়া সে অনুমান ঠিক কিনা তাহাই জানিতে চাইতেছেন। তাঁহার অনুমান—গাছগুলির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে দূরে আকাশের কোথাও গোলাগুলি

ফাটার প্রচণ্ড শব্দ। শত্রুসৈন্য এখনি আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহারা যেন ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে।

তৃতীয় স্তবক

আকাশকটাহে—আকাশরূপ কড়ায়। ধূম্র মেঘের ঘটা—পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার মতো সারি সারি মেঘ। **আকাশটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা**—আকাশরূপ বিশাল কড়ায় কি যেন জ্বাল দেওয়া হইতেছে। তাহা হইতে উত্থিত ধূমই যেন ধূসর মেঘরাশির আকারে দেখা যাইতেছে। ভীমকুণ্ডল জটা—ভয়ংকর পাকানো জটা। **সে যেন......জটা**—আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে দেখিয়া মনে হয়, সেগুলি যেন কাহারও বিশাল মুণ্ডের ভয়ংকর পাকানো জটাজাল। পরবর্তী স্তবকে কবি এই জটাকে তাণ্ডবরত মহাদেবের জটা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। **সচল অচল**—চলমান পর্বত। গতিশীল মেঘে এই পর্বতকল্পনা। পর্বত স্থির; মেঘ চঞ্চল; তাই পর্বতবাচক 'অচল'-এর বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে 'সচল'—কবিকল্পনা। **ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল**—কোন্ সীমাহীন পাতাল ভেদ করিয়া। 'অতল' সাতটি পাতালের মধ্যে একটি। এই পাতাল ভেদ করিয়াই যেন মেঘরূপী চলমান পর্বত উঠিয়াছে। ধাইছে উধাও—প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। গ্রাসিতে মিহিরে—সূর্যকে গ্রাস করিতে; সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিতে। **ছিঁড়িয়া রশ্মিচ্ছটা**—সরল রেখায় বিকীর্ণ সূর্যের আলোককে ছিন্নভিন্ন করিয়া অর্থাৎ সূর্যলোক বাহির পথ হইবার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া।

চতুর্থ স্তবক

তার—সেই কালবৈশাখীর। এই স্তবকে সেই জটাধারী যে তাণ্ডবরত মহাদেব ভিন্ন আর কেহই নন তাহা দুই-একটি ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যায়। **ঘোর নির্ঘোষ**—ভয়ংকর হুঙ্কার, এখানে মেঘের গভীর গর্জন। **দুলিয়া উঠিল জটাভার**—কালবৈশাখী যেন নটরাজবেশে তাণ্ডব আরম্ভ করিল, তাই তাহার জটারাশি আন্দোলিত হইলে অর্থাৎ ঝড়ের বেগে মেঘরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শুরু হয়ে গেছে ইত্যাদি—মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কবির কল্পনায় এই ধ্বনি যেন কালবৈশাখীরই নাসিকা-গর্জন। পিঙ্গল—পীতাভ গাঢ় নীল। গলতলদেশ—গলার নীচের অংশটা। মেঘের পক্ষে, মধ্যগগনকে মস্তক ধরিলে দিক্-চক্রবালের কিছু উপরে হইবে তাহার গলার

তলদেশ। **পিঙ্গল হল গলতলদেশ**—দিগন্তের কিছু উপরের মেঘরাশি লঘু হইয়া ম্লান সূর্যালোকে পীতাভ নীলবর্ণ ধারণ করিল, যেমন দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষ কণ্ঠে ধারণ করায় মহাদেবের কণ্ঠও নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। এখানে কালবৈশাখীকে মহাদেবরূপে কল্পনা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে। **ধুলিধুসরিত উন্মাদবেশ**—মহাদেব যেমন সর্বাঙ্গে ছাই মাখিয়া পাগলের বেশে তাণ্ডবে মাতেন তেমনি আত্মহারা মেঘের দেহেও ঝড়ের বেগে উত্থিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিবসের ভাগে—দিবাভাগে; দিন থাকিতে থাকিতেই। **টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার**—অন্ধকার যেন সন্ধ্যার কালো চুল। দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এই চুল বেণী বাঁধিয়া সংযত করিয়া রাখে। কিন্তু কালবৈশাখীর মেঘ দিন শেষ না হইতেই তাহার এই বেণী টানিয়া খুলিয়াছে অর্থাৎ দিনেই সান্ধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিয়াছে।

পঞ্চম স্তবক

অঙ্কুশ—হাতীকে চালনা ও সংযত করিবার অস্ত্রবিশেষ। ইহার কতকটা সোজা কতকটা বাঁকা। **অঙ্কুশ কার...দিক্-অন্তে**—এখানে কবি ধীরে ধীরে একটি রণক্ষেত্রের ছবি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। সরল-বক্র রেখায় তাহার দীপ্তি যেন একটি প্রকাণ্ড অঙ্কুশের রূপে প্রতিভাত হইতেছে। **দিগ্‌বারণেরা**—দিগ্‌হস্তীরা। ঐরাবত, পুণ্ডরীক প্রভৃতি আটটি প্রকাণ্ড হাতী আটটি দিকের রক্ষক বলিয়া কল্পিত হয়। ইহাদের পিঠে চাপিয়া দেবরাজ যেন সদলে আজ যুদ্ধে নামিয়াছেন বেদনা-অধীর—অঙ্কুশের আঘাতে ব্যথায় অস্থির হইয়া। **বিদারিছে নভ দন্তে**—দাঁত দিয়া আকাশ চিরিয়া ফেলিতেছে। কবি এখানে স্পষ্টতঃই কালিদাসের মেঘদূত-দ্বারা প্রভাবিত। মেঘদূতেও আছে,—আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে মেঘাবৃত পর্বতের সানুদেশে মেঘগুলি যেন হাতীর মতো দাঁত ফুটাইয়া খেলা করিতেছে। রণ-দুন্দুভি—যুদ্ধের দামামা। বাজে···রণ-দুন্দুভি—বজ্রের গর্জনে যেন এই যুদ্ধের দামামার ধ্বনি শুনা যাইতেছে। ঝড়ে সে আওয়াজ ইত্যাদি—কখনও বা ঝড়ের মত্ত হুঙ্কার বজ্রধ্বনিকেও ডুবাইয়া দিতেছে। **যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল**—কোনো দুইটি মহাশক্তিশালী সৈন্যদলের মধ্যে যেন প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। পরের স্তবকে এইযুদ্ধকে কবি

দেবাসুরের যুদ্ধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্যুলোকের দূর পন্থে—আকাশের দূর পথে; দূর আকাশের কোনো জায়গায়।

ষষ্ঠ স্তবক

বঙ্কিম নীল অসির ফলকে—নীল রঙের বাঁকা তলোয়ারের ফলায়। নানাভ বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখাকেই কবি এখানে অসির ফলক বলিয়াছেন। দেহ হল কার ভিন্ন?—কাহার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইল? পূর্ব স্তবকে দুই যুধ্যমান দলের কথা বলা হইয়াছে। এখানে কবির প্রশ্ন—তাহাদের মধ্যে কে পরাজিত হইয়া প্রাণ দিল? **অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা** ইত্যাদি—অনাবৃষ্টি যেন এক অসুরের মূর্তি ধরিয়া এতকাল পৃথিবীর মানুষকে শঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু কালবৈশাখীর আবির্ভাবে দেবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে পারিল না, মৃত্যুবরণ করিল। সহজ কথায়, কালবৈশাখীর আবির্ভাবে অনাবৃষ্টির সকল সম্ভাবনা দূর হইয়া ধারাসারে নামিল বর্ষণ। পুরাণে অনাবৃষ্টি বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্র শস্য ও বৃষ্টির অধিপতি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং কালবৈশাখীর আবির্ভাবে এই দেবাসুরের দ্বন্দ্বকল্পনায় কবি পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। বাঁধ-ভাঙা জল—যে জল বাঁধ বা কৃত্রিম বাধা ভাঙিয়া আসিয়াছে। নেমে......জল—এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে দেখিয়া মনে হয় জলরাশি যেন বাঁধ ভাঙিয়া আসিতেছে। মেঘকজ্জল—মেঘের কাজলকালো রঙ। ম্লান...মেঘকজ্জল—কিছুক্ষণ বর্ষণের পর মেঘের কাজলকালো রঙ কতকটা হালকা বা ফ্যাকাশে হইয়া আসে। **আলোকের মুখে** ইত্যাদি—পুঞ্জীভূত মেঘ সূর্যালোকের মুখের উপর যে কালো পর্দা টানিয়া দিয়াছিল অর্থাৎ সূর্যালোককে দৃষ্টির অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এতক্ষণে সরিয়া গেল, আবার আলো দেখা দিল।

সপ্তম স্তবক

হেরো—দেখো। সে রণবাহিনী—সেই যুদ্ধরত সেনাদল। ইহার কথা পঞ্চম স্তবকে বলা হইয়াছে। বর্ষণের পর আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ডগুলিই এখানে রণবাহিনী। **ফিরে চলে সে......বিজয়শঙ্খ**—যুদ্ধশেষে বিজয়ী সেনাদল যেমন শঙ্খরবে বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতে করিতে ফিরিয়া যায়, তেমনি কালবৈশাখীর ঝড় ও বর্ষণের শেষে বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ডগুলি বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে; তখনও

থাকিয়া থাকিয়া মেঘগর্জন শুনা যাইতেছে তাহা যেন তাহাদেরই জয়সূচক শঙ্খধ্বনি। আকাশের নীল নির্মল হল—প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অনাবৃষ্টির আকাশের নীলিমা ঘোলাটে হইয়াছিল, বৃষ্টির ফলে তাহা আবার স্বচ্ছ ও নির্মল হইল। ধরার পঙ্ক—পৃথিবীর ধূলামাটি। মৃদু উচ্ছ্বাসে—মন্দ বেগে। নদী…ভাষে… কুলুকুলু ধ্বনি করিয়া নদী স্ফীত হইতেছে। আলো-ঝলমল—আলোকে উদ্ভাসিত। বিটপীর দল—গাছগুলি। নিশ্বাসে নিঃশঙ্ক—নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে অর্থাৎ মন্থর পবনে আন্দোলিত হইতেছে। ঝড়ের পূর্বে ইহারই ভয়ে রুদ্ধশ্বাস নিশ্চল হইয়া ছিল।

অষ্টম স্তবক

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে—নূতন বৎসরের শুভ পবিত্র দিনে অর্থাৎ বৈশাখের প্রথম দিনে। বাসর—দিন। **নববর্ষের……আসে**—কালবৈশাখী অন্য সময়েও আসে, কিন্তু কবির বর্ণিত কালবৈশাখী বৈশাখের প্রথম দিনে আসিয়াছে। **হোক সে ভীষণ** ইত্যাদি—কালবৈশাখীর রূপ যে ভয়ংকর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রূপ দেখিয়াই কবির মনে এমন একটা অনির্বচনীয় আনন্দ জাগে যাহা তাঁহার সকল ভয় দূর করিয়া দেয়। প্রাণ ভরে আশ্বাসে—কালবৈশাখী তাপদগ্ধ মানুষের কাছে নূতন আশা ও সান্ত্বনার বাণী লইয়া আসে, নবজীবনের আনন্দে প্রাণ ভরিয়া দেয়।

নবম স্তবক

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে—চৈত্র পুরাতন বৎসরের সর্বশেষ মাস। তাহার মৃত্যু অর্থাৎ অবসান হইয়াছে বৈশাখের আবির্ভাবে। কবি কল্পনা করিয়াছেন, চৈত্রের শবদেহকে যেন চিতায় দগ্ধ করা হইয়াছে এবং কালবৈশাখী সেই দেহের অবশেষ চিতাভস্মকে উড়াইয়া চৈত্রকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। রূপক ভাঙিলে, সূর্যের খরতাপে তপ্ত পৃথিবীই চৈত্রের চিতা আর চিতাভস্ম পৃথিবীর ধূলিজাল। কালবৈশাখী এই ধূলিরাশিকেই উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর—মুষলধারে বর্ষণে তপ্ত পৃথিবী শীতল হইয়াছে, তাহার জ্বালা জুড়াইয়াছে। তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারিত রস—প্রখর রৌদ্রতাপে শুষ্কপ্রায় বিবর্ণ তৃণাঙ্কুরগুলিকে কালবৈশাখীর বর্ষণ আবার সরস ও সজীব করিয়াছে। মধু ভরি বুকে মৃত্তির—মৃত্তিকা বা মাটিকে সরসতার মাধুর্য দান করিয়া। সে আসিছে

আজ কাল-বৈশাখে—আজ বৈশাখের প্রথম দিনে শিব বা মঙ্গলের দেবতা আসিতেছেন। **টঙ্কার**—ধনুকের ছিলার শব্দ। **পিনাক**—শিবের ধনুর নাম। এইজন্য 'পিনাকপাণি' শিবের অনেক নামের মধ্যে একটি। **তবু জয় জয় ইত্যাদি**—ভয়ংকর হইলেও কালবৈশাখীর কল্যাণকারিতার জয়গান না গাহিয়া কবি পারেন না।

দশম স্তবক

ধরার ধরে না হর্ষ—পৃথিবীর আনন্দের অবধি থাকে না। **ওরি মাঝে**—আকৃতির ভীষণতার অন্তরালে। **কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ**—ধ্বংসের দেবতা সর্বসংহারক কালের অত্যন্ত গোপন মন্ত্রণা। কালপুরুষ কালবৈশাখীকে পৃথিবীতে পাঠান কেবল পুরাতনের ধ্বংস করিতে নয়;—অত্যন্ত গোপনে তাহাকে নূতন সৃষ্টির, নবজীবনের প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শও দেন। কবির কল্পনায় কালবৈশাখী প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র নয়। ইহার পিছনে দেবতার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। **নীল-অঞ্জন-গিরি নিভ**—রসাঞ্জনে রচিত পর্বতের ন্যায়। 'নীলাঞ্জন' পারা দিয়া প্রস্তুত এক রকমের কাজল, সুর্মা। ইহার রঙ নীল, ঠিক কালো নয়। **কায়া**—দেহ। কালবৈশাখীর দেহ নীলাঞ্জনে গঠিত পর্বতের ন্যায় অর্থাৎ যুগপৎ ভীষণ ও সুন্দর। **নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া**—নিশীথের মতো নীরব এবং মেঘের মতো ঘোর অন্ধকারময় ছায়া। **ওরি মাঝে·· দুর্ধর্ষ**—কালবৈশাখীর ভয়ংকর রূপের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক অমোঘ আশার বাণী, পুরাতনের বিলোপ ঘটাইয়া কল্যাণময় নবজীবনের প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সম্ভাবনা। **দুর্ধর্য**—অনাক্রমণীয়, প্রবল, এখানে—অব্যর্থ, নিশ্চিত।.

ব্যাখ্যা

(১) হেরি যে হেথায় আকাশকটাহে······রশ্মিছটা। (স্তবক ৩)

এই অংশটি কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' কবিতার একটি স্তবক। কালবৈশাখীর আকস্মিক আবির্ভাবে আকাশের ঘনঘটা বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এখানে একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

কালবৈশাখীর ঝড় আসন্ন। ঘনঘোর কালো ছায়া মধ্যদিনের প্রখর দীপ্তি ঢাকিয়া দিয়াছে। চারিদিকে নিথর নিস্পন্দ একটা জড়তা—এই বুঝি ঝড় ছুটে।

আকাশটা যেন দিগন্ত-জোড়া বিরাট্ কড়াইয়ের মতো। উহাতে কি যেন জ্বাল দেওয়া হইতেছে এবং তাহা হইতে যে ধূম বাহির হইতেছে তাহাই মেঘের আকার ধারণ করিতেছে। উহার নীচে মেঘমণ্ডলের জমাট ধূসর রূপে যেন এক বিরাট ছিন্নমুণ্ডের মতো দেখা যায়। সেই মুণ্ডের কুণ্ডলীপাকানো জটাজাল ধূমল বর্ণ বিকাশ করিয়া নিম্নে ঝুলিতেছে। এই ঘন মেঘ যেন একটা চলমান বিরাট্ পাহাড়-বিশেষ। পাতালের অগাধ তল 'অতল'-স্তর হইতে যেন উহা আকাশে উঠিয়া দুরন্তবেগে ধাবমান। এই জটাজালমণ্ডিত বিশাল বস্তুটা যেন রাহুর মতো সূর্যকে গ্রাস করিবার জন্য দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিয়াছে, এবং সূর্যের কিরণমালাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

[আকাশকটাহ, ভীমকুণ্ডল জটা ও অতল—এইগুলির উপর টীকা লেখ।]

(২) ওই শোন তার ঘোর…বেণীবন্ধন সন্ধ্যার (স্তবক ৪)

এই অংশটি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' কবিতা হইতে উদ্ধৃত : কালবৈশাখীর আবির্ভাবে আকাশলোকে যে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহারই বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই অংশটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

কালবৈশাখীর ঝড় আসন্ন। এমন সময় সারা আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে। জমাট মেঘ কবির চোখে একবার একটা সঞ্চরমাণ পাহাড়, আর একবার জটাজুটবিলম্বী বিরাট্ একটা মুণ্ডরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু সে যে ঠিক কি ও কে—তাহা যেন কবি বুঝিয়া উঠেন না। কালবৈশাখীই এই বিচিত্র রূপ প্রকট করিতেছে। মেঘের ঘনঘোর গর্জন যেন সেই ভয়ংকর কালবৈশাখীর নাসিকাগর্জন। রাহুর ছিন্ন মুণ্ডটির মতো ঐ যে আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া একটা জটাজড়িত বিশাল মেঘের মুণ্ড, উহার জটারূপী মেঘস্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই জটাজালের বর্ণ একেবারে পিঙ্গল হইয়া গেল, ধূলার উঠিল ঝড়। তারপর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া নটরাজবেশে, ধূলিধূসরিত দেহে কালবৈশাখী যেন শুরু করিয়া দিল তাণ্ডব। চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল। অন্ধকার যেন সন্ধ্যারূপিণী কোনো রমণীর রাশি রাশি কালো চুল। দিবাশেষেই সেই চুলের বেণী খুলিয়া এলাইয়া দেওয়া হয় আর তাহাতেই নামে সন্ধ্যার আঁধার। কিন্তু আজ ভীমভৈরব এই কালবৈশাখী দিবসের মধ্যভাগেই সন্ধ্যাদেবীর বেণীরূপ সেই অন্ধকার টানিয়া খুলিয়াছে। তাহাতেই আঁধারের এলোচুলের কালোছায়ায় চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছে।

(৩) **অঙ্কুশ কার······দ্যুলোকের দূর পন্থে।** (স্তবক ৫)

এই অংশটি কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টির সময় ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক ও বজ্রনিনাদের বর্ণনাই এই অংশটির প্রসঙ্গ।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে একদিন ঘনঘটা করিয়া কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু হয়। তখন মেঘের মধ্যে দিকে দিকে বিদ্যুৎচমক আর ঘোরগর্জন আরম্ভ হয়। কবির কল্পনায় দৃশ্যটি দুই পরাক্রান্ত বীরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। এ যেন দেবাসুরের যুদ্ধ। দেবরাজ ইন্দ্র সদলে হাতীর পিঠে চাপিয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন, হয়তো অসুরগণও হাতীতে চড়িয়াই যুদ্ধ করিতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মনে হইতেছে যেন হাতীর মাথায় অঙ্কুশের আঘাত এবং সেই সময় অঙ্কুশের উজ্জ্বল জ্যোতি ঝলসিয়া উঠিতেছে। দিক্‌সমূহকে হস্তিরূপে কল্পনা সুপ্রাচীন, মোহিতলালও তাহাদিগকে এখানে হস্তিরূপে দেখিয়াছেন। দিকে দিকে যে বিদ্যুচমক, তাহা যেন বিভিন্ন দিকের এই দিকহস্তীগুলির মাথার অঙ্কুশের ঝলক। অঙ্কুশের আঘাতে ঐ হাতীগুলি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রণায় পাগল হইয়া তাহারা যে চীৎকার করে তাহাই বজ্রনির্ঘোষরূপে মানুষের কানে পৌঁছায়; দীর্ঘদন্তে যে তাহারা রণক্ষেত্র ঐ আকাশটাকেই বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তাহাই যেন মধ্য-আকাশে বিদ্যুৎরেখায় বিকশিত হইয়া উঠে। আকাশের কোন সুদূর স্তরে এই যে যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে ঘন ঘন দুন্দুভিও বাজিতেছে। মেঘের গুরুগুরু গর্জনই এই দুন্দুভির শব্দ। ঝড়ের গভীর নিঃস্বন আবার এই শব্দকে কখনও ঢাকিয়া দেয়। তাই থাকিয়া থাকিয়া আকাশ-লোকের সেই যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে —এমন শোনা যায়।

(৪) **বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে······হল ছিন্ন।** (স্তবক ৬)

কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' কবিতা হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি-বর্ণনাই এই অংশটির প্রসঙ্গ।

কালবৈশাখীর ঝড়-ঝঞ্ঝা যখন আকাশ তোলপাড় করে তখন মনে হয় যেন দেবাসুরে যুদ্ধ লাগিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ ও বৃষ্টির অধিপতি বলিয়াই কল্পিত হইয়া থাকেন। যে শক্তি আকাশে মেঘ জমিতে দেয় না, যাহার প্রচণ্ড প্রকোপে

পৃথিবীতে অনাবৃষ্টির সৃষ্টি হয়, তাহাই অসুর। ইন্দ্রের সহিত সেই অসুরের যুদ্ধই কালবৈশাখী। সেই যুদ্ধের সময় আকাশের বুকে যে আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎচমক দেখা যায় তাহা যেন ঈষৎ নীল জ্যোতি বিকাশ করে। উহা যেন ইন্দ্রের হাতের তরবারিটির বাঁকা ফলক। ভীষণ ঝড়ে জমাট মেঘ ক্রমে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। সেই মেঘের ফাঁকে নীল আকাশের কিঞ্চিৎ আভাস বিদ্যুৎ-ঝলকে ফুটিয়া উঠে। দুইদিকে মেঘ-মধ্যে একটু আঁকাবাঁকা মুক্ত আকাশের রেখা। যেন মেঘরূপী অসুরটার ধড় আর মুণ্ড ছিন্ন হইয়া গিয়াছে সেই রেখায়। এই দৃশ্যের মধ্যেই কবি অনাবৃষ্টিরূপী অসুরটার বধ কল্পনা করিয়াছেন। অসুরটা বধ হওয়ামাত্র বৃষ্টির আর বাধা থাকে না। অমনি ধারাসারে নামে জল,—নদীর বাঁধ ভাঙিলে যেমন অজস্র জল বন্যার বেগে ছুটিয়া আসে, ঠিক তেমনি। সারা আকাশে এইবার মেঘের কাজল-কালো বর্ণ ফ্যাকাশে হইয়া আসে। জমাট মেঘ জল হইয়া গলিয়া পড়ে, মেঘের যে কালো পর্দাখানি এতক্ষণ সূর্যের আলোকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা এইভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মুষলধারে বৃষ্টি আকাশ পরিষ্কার করিয়া আলোক ফুটাইয়া তোলে।

(৫) চৈত্রের চিতা-ভস্ম……সেই শুভ কীর্তির। (স্তবক ২)

এই অংশটি কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' কবিতার অন্তর্গত। এই অংশটিতে কবি কালবৈশাখীর সর্বধ্বংসী করাল মূর্তির মধ্যে যে নবজীবনের অগ্রদূত রহিয়াছে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়াছেন।

চৈত্রের শেষে বৈশাখের প্রারম্ভে কালবৈশাখীর আবির্ভাব যেন নটরাজের কালভৈরব মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হয়। বিগত বৎসরের শবদেহটি চৈত্রমাসের খরতপ্ত প্রকৃতির মধ্যে যেন পুড়িতে থাকে। আকাশ-প্রান্তরব্যাপী চৈত্রের সেই ভীষণ রৌদ্রতাপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া লেলিহান শিখার মতো আকাশে উঠে— উহাই যেন একটি বিরাট্ জ্বলন্ত চিতার দৃশ্য রচনা করে। তাহাতে বিগত বর্ষটির যাবতীয় প্রাণসম্পদ্—শ্যামল তৃণশষ্প আর সরসতা—সব পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়। এমন সময় আসে কালবৈশাখী প্রলয়ঙ্কর রূপে। মত্ত প্রভঞ্জনে উহা সেই চিতা হইতে ধূলিরাশি আর জীর্ণ গলিত পত্রের পুঞ্জ উড়াইয়া লইয়া যায়। এই ধূলা, এই জীর্ণপত্রস্তূপ—সবই তো বিগত বৎসরের চিতাভস্ম। এইভাবে কালবৈশাখী তাহার প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায় মৃত বৎসরের শেষ দেহাবশেষ,শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষে

উড়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আনে সে অজস্র বর্ষণ। সেই বর্ষণে শুষ্ক তৃণাঙ্কুর রসসিক্ত হয়, মাটির স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় অমৃতস্বাদ জল। মাতা বসুমতী প্রকৃতির ধাত্রী। এই জল তাঁহার বুকের পীযূষধারা-স্বরূপ—উহাই মধু। এই মধুস্বাদ জলরস টানিয়াই প্রকৃতির বৃক্ষলতা পুষ্ট হইয়া উঠে। কালবৈশাখী এইভাবে একদিকে ধ্বংস অন্যদিকে নূতন জীবনের সঞ্জীবনী সুধা লইয়া আসে। পৃথিবীর জ্বালা জুড়াইয়া দেয় তাহার স্নিগ্ধ ধারাবর্ষণ। কবি তাই কালবৈশাখীর মধ্যে কল্যাণময় স্বরূপটিই বড় করিয়া দেখেন, তাহাকে স্বাগত জানান। নটরাজরূপে প্রলয়কাণ্ডে তাহার আবির্ভাব—তাহার পিনাকের টঙ্কারই সূচিত হয় গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে। তবু এই প্রলয়ঙ্কর ভৈরব মূর্তির আবির্ভাব শুভ। তাঁহারই পদক্ষেপে পৃথিবীতে পুরাতন সৃষ্টির বিনাশ, নূতন জীবনের বিকাশ।

(৬) এত যে ভীষণ,...... আশ্বাস দুর্ধর্ষ। (স্তবক ১০)

এই অংশটি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। উদ্ধৃত অংশটিতে কবি কালবৈশাখীর স্বরূপ-বর্ণনার উপসংহার করিয়াছেন।

কালবৈশাখীর আবির্ভাব ভয়ংকর সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি উহা সকলের নিকট বিশেষভাবে কাম্য। উহার আগমনে সকলেই আনন্দে মাতিয়া উঠে। কবি ইহার হেতু বুঝিয়াছেন। কালবৈশাখীর মধ্যে শুধু ধ্বংসশক্তিই নহে, সৃজনশক্তিও নিহিত রহিয়াছে। যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাকে ধ্বংস করা এবং সেই ধ্বংসস্তূপ উড়াইয়া দিয়া নবজীবনের বীজাঙ্কুর বিকশিত করিয়া তোলা—ইহাই তো কালবৈশাখীর প্রকৃত কাজ। ঋতুরাজ কালপুরুষ সৃজনরহস্যের মূল সূত্রটি যেন ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করেন। নীলাভ বিশাল একটা পর্বতের মতো কালবৈশাখীর ভয়ংকর রূপ। তাহার করাল ছায়ায় মধ্যদিনেও নৈশ অন্ধকার আর স্তব্ধতা পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলে। দেখিলে ভয় হয়। উহা যেন এক সৃষ্টি-বিনাশী রূপ। কিন্তু বিনাশের মধ্য দিয়াই নবজীবনের সূত্রপাত। একদিকে যাহা জীবনের শেষ, মৃত্যু—অন্যদিকে তাহাই নবজন্মের মাহেন্দ্রক্ষণ। কালবৈশাখী নূতন সৃষ্টির আয়োজন করিবার জন্যই জরাজীর্ণ গলিত স্খলিত পত্রের জঞ্জাল দূর করিয়া দেয়। তারপর প্রচুর বর্ষণ-অভিষেকে মুকুল ও কিশলয়ের করে উদ্বোধন। এইভাবে ধ্বংসের ভিতর দিয়া সৃজন—এই কর্মের মঙ্গলদূত বলিয়াই কালবৈশাখী সকলের এত প্রিয়।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবি মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা অনুসরণ করিয়া কালবৈশাখীর আবির্ভাব ও তিরোভাব বর্ণনা কর।

উ.। **সংক্ষিপ্তসারের** প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ২। (ক) কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' কবিতার মূল ভাবটি নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর। (খ) কবিতাটির বিচিত্র রূপকল্পনা কি নিছক বস্তুলীন বর্ণনা, অথবা উহার মধ্যে মূল ভাবটির একটি সূক্ষ্ম ফল্গুধারা নিহিত রহিয়াছে? আলোচনা কর।

উ.। (ক) মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' কবিতার মূল ভাবটির অবলম্বন হইল এই সত্য যে ধ্বংসের মধ্যেই নবজীবনের বীজাঙ্কুর নিহিত থাকে। আপাত-দৃষ্টিতে কালবৈশাখী সত্যই ভয়ংকর। ঝড়ঝঞ্চার তুমুল তাণ্ডবে উহা এক প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে। তাই উহার আকস্মিক আবির্ভাব-সম্ভাবনায় সমগ্র প্রকৃতি যেন সভয় প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। মনুষ্যগৃহ হইতে পাখীর বাসা পর্যন্ত সর্বত্র সেই আতঙ্কের ছায়াপাত হয়। বৃহৎ বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হওয়ার শঙ্কায় একেবারে নিস্তব্ধ নিথর হইয়া যায়। তারপর যখন কালবৈশাখী সত্যই আসিয়া পড়ে তখন আকাশে বাতাসে কি ভীষণ রুদ্রলীলা—চারিদিকে যেন সৃষ্টির বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। মোহিতলাল কালবৈশাখীর এই ভয়ংকর রূপ বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঝড়ের পরই বর্ষণ-বর্ণনার সময় কবি কালবৈশাখীর কল্যাণমূর্তিটি খুলিয়া ধরিয়াছেন। কালবৈশাখী জীর্ণ পুরাতনের স্তূপকে উড়াইয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে ধারাসারে বর্ষণ করিয়া নবজীবনের অঙ্কুর-বিকাশও সহজ করিয়া তোলে। যাহা জীর্ণ, যাহা গলিত, তাহার আবর্জনা দূর না করিলে নূতন সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। কালবৈশাখীর ধ্বংসকার্যের মধ্যে কালপুরুষের যেন সেই রূঢ় হলাকর্ষণ আর আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজটি সাধিত হয়। তাহার ফল রসসিক্ত মৃত্তিকার সরস অভিষেকে অচিরেই প্রকৃতির সুশ্যাম প্রাণস্ফুরণ। কালবৈশাখী এইভাবে ধ্বংসের মধ্য দিয়া সৃজনের ভার বহন করে এবং এই ভাবটিই মোহিতলালের কবিতার মর্মবাণী।

(খ) 'কালবৈশাখী' কবিতাটির সপ্তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে

তাহাকে প্রথমে বস্তুলীন বর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। কবি কালবৈশাখীর আসন্ন আবির্ভাবে প্রকৃতির ছবিটি দিয়া বর্ণনা শুরু করিয়াছেন। তারপর আকাশের মেঘের ঘনঘটাকে তিনি বিচিত্ররূপে দেখিয়াছেন। কখনও উহা একটা জটাসমাচ্ছন্ন বিরাট্ মুণ্ড, কখনও একটা চলমান পর্বত। মেঘের গর্জন, ঝটিকার নিঃস্বন, কি এক ভীমভৈরবমূর্তির যেন নাসিকাগর্জন। এই ভাবে কবি ক্রমে কালবৈশাখীর তাণ্ডববর্ণনায় আসিয়া পড়িয়াছেন। ইহার মধ্যে কবি একটা দেবাসুরের যুদ্ধের কল্পনা করিয়াছেন। এইখানে কবিতাটির মূল ভাবের পটভূমিকা রচিত হইয়াছে। আমরা জানি, দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ ও শস্যের অধিপতিরূপে পুরাণাদিতে চিত্রিত হন। অনাবৃষ্টি—শস্য তথা প্রকৃতির শত্রু, একমাত্র বর্ষণাধিপ দেবরাজ তাহার বন্ধু। অনাবৃষ্টি এখানে তাই অকল্যাণ বা অসুরের রূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার সহিত যুদ্ধে দেবরাজের জয় নবজীবনের পথ প্রস্তুত করে। জগৎ জুড়িয়া অনাদিকাল হইতে কল্যাণ ও অকল্যাণের এই শক্তি দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। বিতাটির মধ্যে এই দুই শক্তির সংগ্রাম-বর্ণনার একটা সার্থকতা আছে। কালবৈশাখীকে কবি যুগপৎ ধ্বংস ও সৃষ্টির শক্তিরূপেই দেখিয়াছেন। অকল্যাণকে দলিত না করিলে তো কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কালবৈশাখী তাই যাহা জীর্ণ ও অসুন্দর, পুরাতন ও অকল্যাণকর, তাহাকে ধূলির সহিত উড়াইয়া লইয়া যায়। তারপর বর্ষণে বর্ষণে পৃথিবীকে শস্যশ্যাম করিয়া তোলে। এই কথাটারই ব্যঞ্জনা আছে সেই দেবাসুরের যুদ্ধকল্পনায়। কিন্তু তাই বলিয়া এই কবিতার রূপকল্পনাগুলির মধ্যে আদ্যন্ত মূল ভাবের ফল্গুধারা আবিষ্কার করা কঠিন। কবি প্রথমটায় সত্যই একটু বস্তুলীন। বস্তুকে দেখিতে দেখিতে কল্পনা জাগিয়াছে। কল্পনার সহিত জাগ্রত হইয়াছে কবির মনন-ক্রিয়া। তারপর একটু ছোট বিরামের সেতু বাহিয়া কবি মূল ভাবটিতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। একথা সত্য যে কবিতাটির মধ্যে এজন্য কোনো বিশেষ অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় নাই। বরং কল্পনা হইতে ভাবের ক্রমিক বিকাশ ও পুষ্টির ধারাটি হইতে অনেকটা সুন্দর ও স্বাভাবিকই হইয়াছে।

প্রঃ ৩। কবি মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' কবিতাটির বস্তু-বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি : বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনে)। দিগ্‌বারণ = দিক্ + বারণ। দ্যুলোক = দিব্ + লোক। নিশ্চিহ্ন = নিঃ + চিহ্ন। এখনি = এখন + ই (বাঙলা সন্ধি)। উচ্ছ্বাসে = উৎ + শ্বাসে।

সমাস : মধ্যদিনের—দিনের মধ্যে (বাঙলামতে ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ, সংস্কৃতমতে একদেশী), তাহার। মরুৎ-পাথারে—মরুতের পাথার (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। বজ্রঘোষণ—বজ্র ঘোষণা করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। আকাশ-কটাহে—আকাশরূপ কটাহ (রূপক-কর্মধারয়), তাহাতে। ভীমকুণ্ডল—ভীম কুণ্ডল যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। গলতলদেশ—তলই দেশ অর্থাৎ অংশ বা অঞ্চল (কর্মধারয়); গলের তলদেশ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। ধূলিধূসরিত—ধূলির দ্বারা ধূসরিত (৩য়াতৎপুরুষ)। দিগ্‌বারণেরা—দিকে অধিষ্ঠিত বারণ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহার। রণদুন্দুভি—রণে ব্যবহৃত দুন্দুভি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অনাবৃষ্টির—নয় আবৃষ্টি (নঞ্‌তৎপুরুষ), তাহার। বাঁধ-ভাঙা—বাঁধ ভাঙিয়াছে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। বিজয়শঙ্খ—বিজয়সূচক শঙ্খ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ—নীল অঞ্জন (কর্মধারয়, সন্ধি বর্জন করিয়া) তাহার দ্বারা রচিত গিরি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); নীল-অঞ্জন-গিরি তুল্য (নিত্যসমাস)। নিশীথনীরব—নিঃ (= নাই) রব তাহাতে (বহুব্রীহি); নিশীথের ন্যায় নীরব (উপমানকর্মধারয়)।

সাধু শব্দ-রূপ : হরি—হরণ করিয়া। ব্যাকুলি—ব্যাকুল করিয়া। পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। হেরি—দেখি। বিদারিছে (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—বিদীর্ণ করিতেছে। যুঝিতেছে—যুদ্ধ করিতেছে (অথবা,'যুঝিতেছে'-ই গদ্যেও চলে)। পন্থে—পথে। এতখনে—এতক্ষণে। হেরো—দেখো। উথলিছে—উথলিয়া উঠিতেছে। নিশ্বসে—নিশ্বাস ফেলে। সঞ্চারি—সঞ্চারিত করিয়া। মৃত্তির—মৃত্তিকার। চমকিয়া—চমকাইয়া।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : ধূম্র—ধূম + র (বিশেষণ)। ধূসরিত—ধূসর (বিশেষণ) + ণিচ্ (নামধাতু) + ক্ত। সঞ্চারি—সম্—চর + ণিচ (সংস্কৃত ধাতু) + ইয়া। দুর্ধর্ষ—দুর্—ধৃষ + খল্।

ব্যাকরণগত টীকা ঃ ব্যাকুলি—ব্যাকুল (বিশেষণ+ণিচ্ (নামধাতু)+ইয়া। কেবল পদ্যে ব্যবহৃত নামধাতুজ ক্রিয়া।

পশিয়াছে—সংস্কৃতের 'প্র—বিশ, ধাতু উপসর্গসমেত বাঙলায় 'পশ্' ধাতু হইয়া গিয়াছে ; পশ্+ইয়াছে=পশিয়াছে। এইরূপ ক্রিয়াও কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

গ্রাসিতে—'গ্রাস' শব্দটি বিশেষ্য ; ইহাই বিনা প্রত্যয়ে নামধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে। কেবল পদ্যে ব্যবহৃত।

ধূসরিত—'প্রকৃতি-প্রত্যয়' দ্রষ্টব্য।

নিশ্বসে—নি+শ্বস্ (সংস্কৃত ধাতু)+এ। সংস্কৃত ধাতুজাত বাঙলা ক্রিয়া, কেবল পদ্যে ব্যবহৃত।

পন্থে—পন্থ+এ=পন্থে ; 'পথ' অর্থে 'পন্থ' শব্দের প্রয়োগ বাঙলায় থাকিলেও বিরল। তুলনীয় : "ঘোর কুটিল পন্থ তার।"—রবীন্দ্রনাথ।

ঝনঝনি—'ঝনঝন' ধ্বন্যাত্মক অনুকার-শব্দ ; ইহাই ধাতু হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া 'ঝনঝন' ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়ার উদাহরণ।

মৃত্তির—'মৃত্তিকার' পদটিকে ছন্দের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'মৃত্তির' রূপ দেওয়া হইয়াছে।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ আকাশ ভাঙিয়া পড়ে—এই শব্দসমষ্টিকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ হয় 'বিষম বিপন্ন বোধ করে' : পকেটে হাত দিয়া শ্যামলালের তো মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল—চ'শ টাকা সমেত মনিব্যাগটি উধাও।

ধরার ধরে না হর্ষ—এখানে 'ধরা' ক্রিয়াটি বিশিষ্টার্থক ঃ ধরে না=পরিমেয় হয় না, অপরিমেয়।

বাক্য-রচনা ঃ পাণ্ডুর : পঞ্চমীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় সব-কিছুই যেন কেমন মায়াময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ধূম্র : মহাদেবের ধূম্র জটাজাল হইতে ভাগীরথীর উৎপত্তি—ইহাই পৌরাণিক কাহিনী।

উধাও : শীর্ণ পত্ররাশি ঝড়ের বেগে ঊর্দ্ধআকাশে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে।

বাঁধ-ভাঙা : প্রতিবৎসর বর্ষায় দামোদরের বাঁধ-ভাঙা জল বর্ধমানবাসীর অশেষ দুর্গতির হয়।

যবনিকা : জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী যবনিকা উত্তোলন করিবার চেষ্টা মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে করিয়া আসিতেছে।

টঙ্কার : সেই মহাবীরের ধনুর টঙ্কার শুনিয়াই অনেকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দুর্ধর্ষ : গুর্খারা যোদ্ধা হিসাবে দুর্ধর্ষ।

ঘনঘোর : সেই ঘনঘোর অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়াই পথিক পথ চলিতে লাগিল।

ত্রিরত্ন

কালিদাস রায়

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

কলিদাস রায় কেবল একজন সুকবিই নহেন, তিনি একজন খ্যাতিমান, শিক্ষক ও সমালোচক। ছন্দ ও অলংকারসমৃদ্ধ কাব্যরচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার কবিতায় বহিরঙ্গের কলাচাতুর্যের সহিত অন্য বহুতর গুণের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহার লিখিত সমলোচনাগুলি নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ।

উৎস—নিত্যানন্দ দাস-রচিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের একটি কাহিনীর কাব্যরূপ কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতাটি।

কাহিনীটি এই :

কামরূপরাজ্যের রাজধানী 'এগার সিন্দূর' নগরের খ্যাতিম্যান্ পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রূপনারায়ণ অসৎসঙ্গে মিশিয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৎসরের পর বৎসর পরম ধৈর্যে বহু চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে সৎপথে আনিতে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগী করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ হতাশ হইলেন। একদিন খাইতে বসিয়া ভাতের থালায় একপাশে একটু ছাই দেখিয়া ইহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় রূপনারায়ণ মাতার মুখে শুনিলেন যে এ কাজ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে তাঁহার পিতার আদেশে। রূপনারায়ণ অনাহারে

গৃহত্যাগ করিলেন। মাতাকে বলিয়া গেলেন—যদি লেখাপড়া শিখিতে পারি তবেই গৃহে ফিরিব।

পঞ্চবটি-নামক একটি গ্রামে গিয়া রূপনারায়ণ পাঠ করিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ। তারপর নবদ্বীপে আসিয়া কয়েক বৎসরের অক্লান্ত সাধনার আয়ত্ত করিলেন ন্যায়শাস্ত্র এবং সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন। সেখান হইতে তিনি উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। পুরীতে স্বল্পকাল থাকিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া রূপানারায়ণ চলিয়া গেলেন ভারতের সারস্বততীর্থ বারাণসীতে। সেখানে 'আচার্য' উপাধি লাভ করিয়া আরো জ্ঞানলাভের আশায় তিনি গেলেন পুনানগরীতে। পুনায় মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের নিকট বেদ ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া রূপনারায়ণ 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করিলেন।

এমন অসামান্য পাণ্ডিত্য-সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাব পরিবর্তিত হইল না। ঔদ্ধত্যের সহিত মিলিত হইল আত্মাভিমান। রূপনারায়ণ দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইলেন। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অখণ্ডনীয় যুক্তিপরম্পরার কাছে দক্ষিণ তথা উত্তর ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী মাথা অবনত করিতে লাগিলেন। অচিরে তিনি 'দিগ্‌বিজয়ী' আখ্যা লাভ করিলেন। নবীন-প্রবীণ সকল পণ্ডিতের বিভীষিকা 'দিগ্‌বিজয়ী' রূপনারায়ণ।

অবশেষে 'দিগ্‌বিজয়ী' আসিলেন বৃন্দাবনে বিশ্রুতনামা পণ্ডিত সনাতন ও রূপগোস্বামীকে পরাজিত করিবার বাসনায়। বৈষ্ণব রূপ-সনাতন বিনা তর্কেই তাঁহাকে 'জয়পত্র' লিখিয়া দিলেন—বিনীতভাবে তাঁহারা জানাইয়া দিলেন যে তাঁহাদের কথা লোকে বাড়াইয়া বলিয়াছে, তাঁহার মতো পণ্ডিতকেশরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। জয়পত্রের ভাব ভাষা সবই উদ্ধত দিগ্‌বিজয়ীর, রূপ-সনাতন শুধু তার লিপিকার।

তবু দিগ্‌বিজয়ী স্বস্তি পাইলেন না—তিনি শুনিয়াছিলেন যে রূপ-সনাতনের এক মহাবিদ্বান্ ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন। সেই ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ জীবগোস্বামীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন এবং রূপ-সনাতনের পরাজয়বার্তা সদম্ভে ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের লিখিত তথাকথিত জয়পত্র দেখাইয়া তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্রুদ্ধ জীবগোস্বামী সে আহ্বান গ্রহণ করিলেন।

তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল যমুনাতীরে অসংখ্য শ্রোতার সম্মুখে। একদিন, দুইদিন ......পঞ্চম দিনেও বোঝা গেল না জয়লক্ষ্মী কাহার কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিবেন।

ষষ্ঠ দিনে মনে হইল দিগ্‌বিজয়ীর চরণতলের মাটি যেন একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। সপ্তম দিনে হইল ভীষ্মের শরশয্যা।

দিগ্‌বিজয়ীর দম্ভই শুধু চূর্ণ হইল না, রূপ-সনাতনের প্রতি অসৎ আচরণের জন্য অনুতাপেও তিনি জর্জরিত হইতে লাগিলেন। সজলচক্ষে রূপ-সনাতনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীর ভক্তিবাদী বৈষ্ণবে রূপান্তর ঘটিল।

রূপগোস্বামী কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের এই আচরণ সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে আশ্রম হইতে বিতাড়িত করিলেন। শ্রীজীব মন্দিরের অনতিদূরে এক পর্ণকুটিরে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। একবৎসর পরে সনাতনের চেষ্টায় রূপের রোষ প্রশমিত হইল এবং জীব আশ্রমে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন। বৈষ্ণবের জীবনধর্ম কি জানিতে চাওয়ায় রূপ সনাতনকে বলিয়াছিলেন—'জীবে দয়া'। সনাতন তখন শ্লেষ করিয়া রূপকে বলেন—"তুমি কেমন বৈষ্ণব? তোমার তো 'জীবে দয়া' দেখিতেছি না।" রূপ তখন লজ্জিত হন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনেন।

ইহাই 'প্রেমবিলাস'-বর্ণিত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ। কবিশেখর কালিদাস কাব্যোচিত ভাবে ইহাকে পরিবর্তিত করিয়া 'ত্রিরত্ন' রচনা করিয়াছেন।

নামকরণ—কবিতাটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'আহরণ'-নামক কবিতা-সংকলন হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই কবিতার রূপ, সনাতন ও জীব এই তিনজন পরম বৈষ্ণবের চরিত্র-মাহাত্ম্যই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। মথুরার এক দিগ্‌বিজয়ী তার্কিক একবার বৃন্দাবনে পদার্পণ করেন। তর্কযুদ্ধে তিনি রূপ ও সনাতনকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রসাদপুষ্ট পরম বৈষ্ণব রূপ-সনাতন বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন এবং সবিনয়ে পণ্ডিত-প্রবরকে জয়পত্র লিখিয়া দেন। পথিমধ্যে গর্বোদ্ধত এই পণ্ডিতের সহিত জীবের সাক্ষাৎ হয়। গুরুর মর্যাদারক্ষার জন্য জীব তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন এবং অচিরেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। এই সংবাদে রূপ অসন্তুষ্ট হন। জীবের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে তিনি ক্ষমা করিলেন না—আশ্রম হইতে তিনি তাঁহাকে নির্বাসিত করিলেন। সনাতন ইহাতে ব্যথিত হইলেন। তিনি অভিযোগ করিলেন যে রূপও অভিমান হইতে মুক্ত নহেন। পাণ্ডিত্যের

না হউক, দীনতার অভিমানে তিনি ক্ষমাগুণ ভুলিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র রূপ আত্মদোষ বুঝিতে পারিলেন এবং জীবকে ক্ষমা করিয়া বুকে ধরিয়া অশ্রুসাগরে মগ্ন হইলেন। ইহাই কবিতাটির কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে কবি যে তিনটি মহৎ চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি মহামূল্য রত্নস্বরূপ। রূপ, সনাতন ও জীব—প্রত্যেকেই মানবচরিত্রের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। এই হিসাবেই তাঁহারা রত্নের সহিত উপমিত হইয়াছেন। এই কবিতা এই তিনজন মহাপুরুষেরই মাহাত্ম্যকীর্তন। সেইজন্য ইহার শিরোনাম 'ত্রিরত্ন'।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতকে নবরত্ন বলা হইত। কবিশেখর এখানে তিনজন মহাপুরুষকে, সেই রীতিতে, 'ত্রিরত্ন' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

সমালোচনা—কবিশেখর কালিদাস রায় 'ত্রিরত্ন' কবিতাটির মধ্যে সুবিখ্যাত তিনজন বৈষ্ণবসাধকের পূত-চরিত্রকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর সম্বন্ধে একটি কাহিনীই কবিতাটির বিষয়বস্তু। কাহিনীটি উপভোগ্য, উহার বিবরণ আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। এই বিবরণ কৌশলের মধ্যেই নিহিত আছে কবিশেখরের সুস্পষ্ট কৃতিত্ব। কবি পাণ্ডিত্য-গর্বে স্ফীত সেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের অভিযানটি রাজকীয় সমারোহে বর্ণনা করিয়াছেন। রূপ-সনাতনকে বিনাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে উক্ত পণ্ডিতের দ্বিগুণ আস্ফালন এখানে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে মানুষমাত্রেরই এই আস্ফালনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। রূপ-সনাতনের বিনয়ের তাৎপর্য যিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য যতই হউক, দম্ভ অসহনীয়। কাজেই শ্রীরূপের প্রিয়শিষ্য শ্রীজীবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার যথেষ্ট কারণ এই বিবরণের মধ্যে রহিয়াছে। একদিকে প্রগাঢ় গুরুভক্তি, অন্যদিকে তারুণ্যোচিত তেজস্বিতা—এই দুই কারণে শ্রীজীব সেদিন দর্পী পণ্ডিতকে তর্ক-যুদ্ধে হতগর্ব নতশির করিয়া দেন। ইহার মধ্যে তাঁহার যে বিন্দুমাত্র আত্মশ্লাঘার ভাব ছিল না তাহা পাঠকমাত্রেরই স্পষ্ট ধারণা হয়। অথচ এই ঘটনায় শ্রীরূপ শ্রীজীবের প্রতি বিরূপ হন। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের এই অক্ষমার মধ্যেও যে আর একপ্রকার অভিমান রহিয়াছে তাহা শ্রীরূপকে দেখাইয়া দেন। তখন গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটে প্রেমাশ্রুর পবিত্র অজস্র উৎসারে। বর্ণনাটির এই সুন্দর ধারার মধ্যে

আবেগস্রোত—অভিমান হইতে রোষে, রোষ হইতে বিচ্ছেদ-ব্যথায় এবং সর্বশেষে মিলনের আনন্দোচ্ছল অশ্রু-উচ্ছ্বাসে আসিয়া স্থৈর্যলাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা আছে। আবেগকে এইভাবে মথিত করিয়া কবি যেন একটি পরম উপলব্ধির নবনী ছানিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাহা পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই উপলব্ধি হইল বৈষ্ণব-বিনয়ের পরম আদর্শটিরই সম্পর্কিত। তৃণের চেয়েও নীচ, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ অভিমানবর্জিত যে ব্যক্তি অন্যকে মান দিতে জানেন, তিনিই ভগবানের যথার্থ উপাসক। ইহাই বৈষ্ণব-বিনয়ের সারকথা। রূপ-সনাতনের চরিত্রে কবি এই মাহাত্ম্যই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা জয়গর্বী পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দীনতার অভিমান তখনো শ্রীরূপের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া ছিল। প্রিয়শিষ্যের প্রতি তাই তাঁহার সেই কঠোর অক্ষমা দেখা দিল। সনাতন শ্রীরূপকে ভুল ধরাইয়া দিলেন। তখন সকল অহংকার শ্রীরূপের হৃদয় হইতে অশ্রুস্রোতে ধুইয়া মুছিয়া গেল। রূপ সনাতন ও জীব—কে যে তখন কাহার চেয়ে মহৎ সে কথা আর উঠে না। বৈষ্ণবসাধনার নিষ্কর্ষটি আমাদের রসচেতনায় উজ্জ্বল হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে। এইখানেই কবিতাটির প্রধান আবেদন ও উৎকর্ষ।

কবিতাটির কাহিনীমূলক বিষয়বস্তু হইতে এইভাবে একটি অপূর্ব ভাববস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহার বর্ণনা ও ছন্দে এমন একটি সরল ও অনায়াসসিদ্ধ বিশেষত্ব আছে যে ভাব এখানে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যে তত্ত্ব-মীমাংসা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। তত্ত্ব যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যের উপলব্ধির মধ্যে উপরি পাওনার মতো আসে তখন আর কোনো বিরোধ থাকে না। তত্ত্ব তখন তরলিত রসবস্তু হইয়া আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী হয়। কবিশেখরের 'ত্রিরত্ন' তাহারই একটি সুন্দর উদাহরণ।

সংক্ষিপ্তসার—একদিন চতুর্দোলায় চাপিয়া জয়মাল্যভূষিত এক দিগ্-বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার অশ্বারূঢ় চারণ, পতাকা ও জয়ধ্বনিকারী অনুচরদের সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। ভয়ে পণ্ডিতগণ পুঁথিপত্র গুটাইয়া ফেলিলেন। রূপ ও সনাতন এখানে নীরব নিভৃতে সাধন-ভজনে রত থাকিলেও, দেশে দেশে তাঁহাদের যশোভাতির খ্যাতি শুনিয়া এই পণ্ডিতপ্রবর তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজ

করিবার জন্য বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সোজাসুজি রূপ-সনাতনের কুঞ্জে গিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিনা-বিচারেই জয়পত্র লিখিয়া দিলেন।

জয়গর্বে তূর্যধ্বনি করিতে করিতে পণ্ডিত ফিরিয়া আসিলেন। জনতা ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে তাঁহার পথ করিয়া দিল। জীব তখন প্রাতঃস্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে আশ্রমে ফিরিতেছেন। রূপ ও সনাতন বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন এই মর্মে পণ্ডিতের সদম্ভ আস্ফালন শুনিয়া তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল এবং তিনি এই দম্ভের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিবার জন্য পণ্ডিতকে বিচারে আহ্বান করিলেন। রূপ ও সনাতনের অনুগৃহীত শিষ্য ও সন্তান তিনি, তাঁহাদের অসীম জ্ঞানের কণামাত্রই তিনি পাইয়াছেন; তথাপি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াই যেন পণ্ডিত বিজয়ীর গর্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু অহংকারী পণ্ডিত সহাস্যে বালক জীবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে জীব আবার তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

যমুনার তীরে তর্ক আরম্ভ হইল। কৌতূহলী ব্রজবাসিগণ দলে দলে আসিয়া দুইজনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জীব পণ্ডিতের সকল কূট প্রশ্নের উত্তর দিয়া অচিরেই তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। জনতা তখন পণ্ডিতকে ধিক্কার দিতে লাগিল। লজ্জায় অপমানে বিবর্ণমুখে তিনি সোজা মথুরার দিকে পলাইয়া বাঁচিলেন। জীবের এই জয়বার্তা রূপ ও সনাতনের কানে পৌঁছাইল। জনতার ভিড় ঠেলিয়া জীব যখন কুঞ্জে ফিরিলেন, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে।

কুঞ্জে তখনো কেহ আহার করে নাই। জীব আসিতেই ক্রুদ্ধ রূপ তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, যশ ও প্রতিষ্ঠার কাঙাল অশুচি জীবের মুখ-দর্শন করিবার ইচ্ছা আর তাহার নাই, তাঁহার সমস্ত শিক্ষা নিষ্ফল হইয়াছে। এমন ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান রাজসভা—ব্রজধাম নয়। জীব গুরুর পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রূপের রাগ পড়িল না। অবশেষে জীব অন্নজল ত্যাগ করিয়া যমুনার তীরে হরিনাম-জপে রত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

শ্রীজীবের এই কাতরতায় ব্যথিত সনাতন নিভৃতে শ্রীরূপকে বলিলেন—জীবকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই; জীব গুরুর মর্যাদারক্ষার

জন্যই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার এই অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। উত্তরে রূপ জানাইলেন যে জীব বৈষ্ণব হইয়াও অবৈষ্ণবোচিত জ্ঞানগর্ব পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত বৈষ্ণব হইবেন সর্বতোভাবে দীন, জয়-গৌরবের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার থাকিবে না। গুরুর মর্যাদারক্ষার জন্যই যদি জীব এইরূপ করিয়া থাকেন, তবে তিনি গুরুকেও চিনিতে পারেন নাই। সনাতন সহাস্যে বলিলেন—জীব বালক বলিয়া এখনো অভিমান জয় করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু বৈষ্ণবগুরু হইয়াও রূপ যে ক্রোধ জয় করিতে পারেন নাই তাহা কি তাঁহার অপরাধ নয়? এই অজুহাতে সনাতন কি তাঁহাকে ত্যাগ করার কথা ভাবিতে পারেন? আর দীনতার অভিমানই বা বৈষ্ণবের মধ্যে থাকিবে কেন? সর্ব-জীবে দয়া বৈষ্ণবের ধর্ম; কিন্তু রূপ জীবের প্রতি দয়া দেখাইতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া রূপের চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন, বৈষ্ণব হইয়াও আপন সন্তানকে ক্ষমা করিতে না পারায় প্রকৃত অপরাধী তিনিই। না বুঝিয়া জীবের প্রতি তিনি ঘোর অবিচার করিয়াছেন, তাঁহার মনে দারুণ বেদনা দিয়াছেন। তাই তিনি সনাতনকে অনুরোধ করিলেন তৎক্ষণাৎ গিয়া জীবকে ফিরাইয়া আনিতে।

সনাতনের সঙ্গে জীব আসিলেন—কঙ্কালসার মলিন মূর্তি। রূপ তাহাকে বুকে জড়াইয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিলেন, বার বার তাঁহার ললাটে চুম্বন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা দূর করিয়া দিলেন। তাঁহাদের দুইজনের সম্মিলিত অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া দিগ্‌বিজয়ীর স্পর্শে অশুচি ব্রজধামের ধূলি আবার পবিত্র হইল।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

দিগ্‌জয়ী—নানা দিকের অর্থাৎ বহু স্থানের পণ্ডিতগণকে যিনি শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। **দিগ্‌গজ**—আটটি দিকের প্রত্যেকটি এক একটি বিশাল হস্তীর দ্বারা রক্ষিত হয় বলিয়া কল্পনা করা হয়, ইহাদের নাম দিগ্‌গজ। শব্দটির লাক্ষণিক অর্থ 'শক্তিশালী'। **বীরপণ্ডিত**—যোদ্ধা যেমন প্রকৃত যুদ্ধে অন্যকে পরাস্ত করিয়া বীরখ্যাতি লাভ করে, এই পণ্ডিতও তেমনি তর্কযুদ্ধে অন্যকে পরাস্ত করিয়াছেন; তাই তিনিও বীর। (**মন্তব্য**: এই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বন্ধে 'উৎস' দ্রষ্টব্য।) **ব্রজধামে**

—বৃন্দাবনে। দন্তী—দাঁতওয়ালা হাতী। পঙ্কজবনে—পদ্মবনে। **যেন রণমদে……নামে**—যেন একটি যুদ্ধোন্মত্ত হাতী পদ্মবনে নামিল। বিশালকায় হাতী নামিলে যেমন পদ্মবন বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তেমনি এই গর্বিত পণ্ডিতও যেন আপন পাণ্ডিত্যের শক্তিতে ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় বৃন্দাবনকে দলিত করিতে আসিয়াছেন। এখানে সুন্দর ও সুকুমার পদ্মের সহিত বৈষ্ণব ভক্তি ও বিনয়ের এবং পদ্মবনের সহিত ব্রজধামের তুলনা করা হইয়াছে। **ঝাণ্ডা**—পতাকা। **অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা**—ঘোড়ার মাথায় নিজের পরিচয়-জ্ঞাপক পতাকা উডাইয়া। চারণ—ঘোষক; ভাট। ফুকারি—চিৎকার করিয়া। **চতুর্দোলা**—চারিজন লোকের দ্বারা বাহিত পালকি। **পণ্ডিত দোলে**—পণ্ডিত গর্বভরে নিজের দেহ দোলাইতেছেন। রাজোচিত সম্মান ও প্রতিপত্তি পাইয়া তাঁহার যেন আর মাটিতে পা পড়ে না। জয়নাদ—জয়সূচক ধ্বনি। **ভয়ে সব পুঁথিপত্র গুটায়**—যে-সব পণ্ডিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য পুঁথি খুলিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহারা দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের ভয়ে পুঁথিপত্র গুটাইয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক

রূপ সনাতন—ইহারা দুই ভাই; সনাতন বড, রূপ ছোট। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে উত্তরবঙ্গে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের পিতার নাম কুমারদেব। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনজন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন—সনাতন, রূপ ও অনুপম (বল্লভ)। অনুপমই প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। রূপ ও সনাতন দুইজনেই ছিলেন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের মন্ত্রী—জ্যেষ্ঠ সনাতন ছিলেন তাঁহার 'দবির খাস' এবং রূপ ছিলেন 'সাকর মল্লিক'। ইঁহাদের মূল নাম রূপ ও সনাতন ছিল কিনা বুঝা কঠিন; কারণ, চরিতামৃতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস। আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন॥" ছোট ভাই রূপ মহাপ্রভুর দর্শনে ও কথামৃত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া আগে সংসার ত্যাগ করেন এবং মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সনাতনও ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। ইহা ছাড়া আরবী এবং ফার্সী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রূপের পরে সংসার ত্যাগ করিয়া ইনি চৈতন্যদেবের শিষ্য হন এবং বৃন্দাবনে ধর্মচর্চায়

আত্মনিয়োগ করেন। রূপ ও সনাতন দুইজনেই পরম সাধুশীল বৈষ্ণব ও চৈতন্যভক্ত। সাধনভজনরত—কৃষ্ণের পূজা-আরাধনায় ব্যস্ত। রটিয়াছে—বিস্তৃত হইয়াছে; ছড়াইয়া পড়িয়াছে। **বিচারমল্ল**—তর্কযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী। কুস্তিগির (মল্ল কুস্তিতে অন্যকে পরাস্ত করিতে চায়, ইনি চান শাস্ত্রের বিচারে। অভিযান—যুদ্ধযাত্রা। প্রেমাবেশে মজি—কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া অর্থাৎ তন্ময় হইয়া **'যুদ্ধং দেহি'**—(সংস্কৃত) যুদ্ধ দাও অর্থাৎ আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। **মৃদু** হাসি—এ হাসি পণ্ডিতের দম্ভ দেখিয়া। দোঁহে—দুইজনে। **বিজয়পত্রী**—পণ্ডিতই (বিনাযুদ্ধে) জয়লাভ করিয়াছেন এই মর্মে স্বীকৃতিসূচক পত্র **জয়-ভিখারীর করে**—জয়লাভই যাঁহার একমাত্র কাম্য তাঁহার হাতে; জয়ের কাঙালকে।

তৃতীয় স্তবক

তূর্য—তূরী; ফুঁ দিয়া বাজাইবার একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। **সূর্য তখন মাথার** ইত্যাদি—অর্থাৎ বেলা তখন ক্রমে বাড়িতেছে। **ভয়ে-বিস্ময়ে**—ভয়, দম্ভ ও সমারোহ দেখিয়া, আর বিস্ময় রূপ-সনাতনকে পরাস্ত করিয়াছেন এই কথা শুনিয়া। সিক্তবসনে—ভিজা কাপড়ে। **শ্রীজীব**—ইনি রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর বৃন্দাবনে আসিয়া ইনি রূপের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যামূলক কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ছয়জন প্রধান আচার্যের অন্যতম ইনি। **আস্ফালন**—বড়াই; আত্মগৌরব ঘোষণা। **বিনা বিচারেই**—অর্থাৎ ভয় পাইয়াই। পণ্ডিতের বক্তব্য—রূপ ও সনাতন বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্গে বিচারে আঁটিয়া উঠা যাইবে না, তাই তাঁহারা 'ভয় পাইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই'। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-বিনয়ই তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল।

চতুর্থ স্তবক

শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল—শ্রীজীব আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না, অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। **যাঁহাদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ** ইত্যাদি—সযত্নরচিত কুঞ্জ বা উপবনে হাতী প্রবেশ করিলে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সেইরূপ এই পণ্ডিত মত্ত-হাতীর মতো রূপ ও সনাতনের পবিত্র আশ্রমে অভিযান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চূর্ণবিচূর্ণ করিতে। এখানে 'কুঞ্জ'—বৈষ্ণবের আশ্রম। **চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান**—একান্ত অনুগৃহীত শিষ্য ও পুত্রস্থানীয়। শ্রীজীব রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া সন্তানস্থানীয় এবং রূপের শিষ্য। **জ্ঞান-সাগরের শুধু এক অঞ্জলি**—রূপ ও সনাতনের শাস্ত্রজ্ঞান সমুদ্রের মত গভীর ও অপার। তাঁহাদের নিকট যে জ্ঞান জীব লাভ করিয়াছেন তাহা এতই সামান্য যে মহাসমুদ্রে বিশাল বারিরাশির তুলনায় তাহা যেন অঞ্জলিভরা জল। এই কথার দ্বারা জীব সবিনয়ে নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা ও গুরুর জ্ঞানের ব্যাপকতা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানকে সাগরের সহিত তুলনা সকল ভাষাতেই অতি সাধারণ হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটনও 'Ocean of knowledge' বলিয়াছেন। জিনি—জয় করিয়া। **মোরে জিনি তবে** ইত্যাদি—রূপ-সনাতনের সহিত তর্কযুদ্ধে জয়ী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁহাদের জ্ঞানের কণিকামাত্রের অধিকারী আমাকেই পরাস্ত করা তোমার সাধ্যাতীত—করিতে পারিলে তুমি সত্যই বিজয়গৌরব দাবি করিতে পার।

পঞ্চম স্তবক

অকুণ্ঠ—কুণ্ঠাহীন; দ্বিধাহীন; সোজাসুজি। অভিমানী—অহংকারী; দাম্ভিক। **কেশরী কি কভু** ইত্যাদি—শক্তির দিক দিয়া সামান্য শশক ও পশুরাজ সিংহের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তাই সিংহের পক্ষে দুর্বল শশকের প্রাণবধ করা শুধু শক্তির অপচয় নয়, অমর্যাদাকরও বটে। দাম্ভিক পণ্ডিত এই কথাটা বলিয়া তরুণ জীবের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে চান। জীবকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে যাওয়া যেন তাঁহার মতো দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। **পারাবার**—সমুদ্র। **গোষ্পদ**—গোরুর খুরের চাপে মাটিতে যে ছোট গর্ত হয় তাহাতে সঞ্চিত জল। **পারাবার পার……গোষ্পদে**—সমুদ্রেই ডোবা সম্ভব, গোষ্পদের সামান্য জলে ডোবা অসম্ভব। তেমনি মহা মহা পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া শেষে এই ক্ষুদ্র বালকের কাছে পরাস্ত হওয়াও অসম্ভব। তিষ্ঠ—(সংস্কৃত ক্রিয়া) দাঁড়াও; থাম।

ষষ্ঠ স্তবক

যমুনার তীরে—জীব এতই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন যে আশ্রমে ফিরিবার তরও তাঁহার সহিল না,—সিক্তবসনে যমুনাতীরেই তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন।

মল্ল—কুস্তিগির ; এখানে তর্কযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী। **শাণিত প্রশ্নবান**—ধারালো তীরের মতো কূট ও কঠিন প্রশ্ন। বাণ সত্যিকারের যুদ্ধের অস্ত্র, আর কূটপ্রশ্ন তর্কযুদ্ধের অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়াই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা হয়। **হেলায় সে-সব করিলেন** ইত্যাদি—জীব অতি সহজেই সেইসব কূটপ্রশ্নের উত্তর দিলেন। দুই দণ্ডেই—অতি অল্পকালের মধ্যেই। ধ্বনিতেছে—শব্দ করিতেছে ; উচ্চারণ করিতেছে।

সপ্তম স্তবক

অবনতশির—লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া। **বিতণ্ডাবীর**—বিতণ্ডা অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে যিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর—বিবর্ণ; ফ্যাকাশে। **ধ্বজা গুটাইয়া**—পরিচয়জ্ঞাপক পতাকাটি গোপন করিয়া। জীবের নিকট পরাজয়ের পর এই পতাকার আর তাঁহার কোনো প্রয়োজন রহিল না। **সোজা পলাইল**—লজ্জায় অপমানে লোকসমক্ষে মুখ দেখানো ভার হইল বলিয়া তিনি স্থানত্যাগ করিলেন। **শুভসংবাদ ভাবি**—বৃন্দাবনের এক তরুণ পণ্ডিতের কাছে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হার মানিয়াছেন, ইহা বৃন্দাবনের পক্ষে গৌরবের বলিয়াই ব্রজবাসিগণের ধারণা। সিক্ত বসন—ভিজা কাপড়। তৃতীয় প্রহর বেলা—প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। **ঠেলি জনতার মেলা**—আনন্দিত ব্রজবাসীরা বিজয়ী জীবকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সেই ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে হইল, তাহাতে আরো দেরি হইয়া গেল।

অষ্টম স্তবক

কুঞ্জে—আশ্রমে। **যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরাবিষ্ঠা** ইত্যাদি—জীব দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ীর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ; হয়তো এ খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে আছে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবের উচিত যশখ্যাতির কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। অহংকার মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া সম্মান প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবের নিকট বিষ—অপবিত্র। সেই যশপ্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়া জীব অত্যন্ত অপবিত্র হইয়াছেন—যেন অশুচি জীব শূকরীর ততোধিক অপবিত্র বিষ্ঠা সারা গায় মাখিয়াছেন। **বৃথা তোমা পালিলাম**—তোমাকে লালনপালন করিয়া শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ অবৈষ্ণবোচিত মনোভাব তোমার ঘুচে নাই। **রাজসভা তব সুযোগ্য ঠাঁই** ইত্যাদি—যশখ্যাতির প্রতি লোভ

রাজসভার পণ্ডিতের পক্ষে শোভন—তাহাতে রাজানুগ্রহলাভের সুযোগ হয়। কিন্তু প্রেম ও ভক্তির পবিত্র ভূমি এই বৃন্দাবন তাহার স্থান নয়।

নবম স্তবক

কোপের হল না ক্ষয়—রাগ এতটুকুও পড়িল না। **তমাল তরু**—কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষবিশেষ। এই তরু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। ধারা—অবিরল অশ্রু। **ফুলে উঠে বুক**—গুরুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া শোকে, অনুশোচনায় তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। **বসনে ঢাকিয়া মুখ**—এমন মুখ দেখাইতেও আজ তাঁহার লজ্জা।

দশম স্তবক

বিরূপ—অপ্রসন্ন; ক্রুদ্ধ। বিরূপ শ্রীরূপে—দুইটি কথায় 'রূপ'ধ্বনি থাকায় এখানে অনুপ্রাস অলংকার। **বৈষ্ণবগুরু হয়ে তব** ইত্যাদি—তুমি বৈষ্ণবদের আচার্য; অথবা, তুমি শুধু গুরু নও, বৈষ্ণবও; তোমার এমন বুদ্ধির ভুল হইল কেন? জীবকে ত্যাগ করা তোমার মোটেই উচিত হয় নাই।

একাদশ স্তবক

তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু ইত্যাদি—বৃক্ষের চেয়েও যে সহনশীল, তৃণ হইতেও যে নীচ, সে-ই বৈষ্ণব। এই অংশটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের মর্মানুবাদ। তুলনীয়:

> "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—(শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি)

জয়গৌরব···বড়ো—প্রকৃত বৈষ্ণব কখনো মানের কাঙাল হইবে না। **গুরুরেও সে না চিনে**—যে গুরু স্বয়ং মর্যাদা বা মান-সম্মান কামনা করেন না, তাঁহার মর্যাদারক্ষার জন্য শিষ্যের আগ্রহ একান্ত অসংগত। জীবের এইরূপ আগ্রহ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি তাঁহার গুরুকে চিনিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ স্তবক

জিনিবারে—জয় করিতে। অভিমান—অহংকার। তাত—পিতৃস্থানীয়। **বৈষ্ণব হয়ে রোষ জিনিবারে** ইত্যাদি—বৈষ্ণব সর্বপ্রকার ক্রোধ জয় করিবেন। ক্রোধ জয় করিতে না পারা যদি বৈষ্ণবের পক্ষে দোষ হয়, বৈষ্ণব-

গুরু রূপের পক্ষে তাহা গুরুতর অপরাধ। অছিলায়—অজুহাতে। **দীনতার অভিমান—তাও অভিমান**—বৈষ্ণব দীন হইবেন বটে, কিন্তু দীন হইয়াও যদি মনে করেন যে দীন হইতে পারিয়াছেন, তবে সে দীনতাও অহংকারের স্পর্শে দুষ্ট হইল। এই সূক্ষ্ম অহংকারও অবৈষ্ণবোচিত। **বৈষ্ণব মোরা নই**—অহংকারের লেশমাত্র থাকা পর্যন্ত, সম্পূর্ণ নিরহংকার না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। **জীব**—প্রাণীদিগের প্রতি। **জীবে**······**ধর্ম**—সর্বজীবে দয়া বৈষ্ণবের পরম ধর্ম, তাই বৈষ্ণবেরা জীবহিংসা করেন না। 'জীবে'—শ্রীজীবের প্রতি। কবি 'জীবে' কথাটিকে দুই অর্থে প্রয়োগ করায় এখানে যমক অলংকার হইয়াছে। 'জীবের দয়া···কই ?'—উৎস' দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ স্তবক

অশনি—বজ্র। কুসুমকোমল—ফুলের মতো নরম। মূঢ়—মূর্খ।

চতুর্দশ স্তবক

কঙ্কালসার দেহ—অনাহারে ও দুঃখে শ্রীজীবের দেহ কয়দিনেই অস্থিচর্মসার হইয়াছে। **অরুণ নয়ন**—কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। **অবুঝ শিশুর মতো**—শিশু যেমন একবার কান্না আরম্ভ করিলে আর কিছুতেই থামিতে চায় না তেমনভাবে। **জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত**—রোষবশে প্রত্যাখ্যান করিয়া মনে যে বেদনা দিয়াছিলেন তাহা দূর করিলেন। তিতিল—ভিজিল। **ব্রজ**—ধূলি। **শুচি হল তায়** ইত্যাদি—প্রেম ও ভক্তির পুণ্যপীঠ ব্রজধাম দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের অহংকারের স্পর্শে যে অশুচি হইয়া পড়িয়াছিল, রূপ ও জীব দুইজনেই তাহাতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আজ উভয়ের অশ্রুর বন্যায় যেন সেই মলিনতা ধুইয়া-মুছিয়া গেল। উভয়ের মন হইতে অহংকার দূর হওয়ায় বৃন্দাবন আবার পবিত্র হইল।

ব্যাখ্যা

(১) বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি······কি গোষ্পদে ?" (স্তবক ৫)

এই পঙ্‌ক্তি দুইটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন'-শীর্ষক কবিতার অংশ। উদ্ধৃত অংশের উক্তিতে মথুরার বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বল্লভভট্ট শ্রীজীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।

উক্ত পণ্ডিতপ্রবর রূপ-সনাতনের নিকট হইতে বিনাযুদ্ধে জয়পত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন। রূপ-সনাতন পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিহার করিয়াছিলেন বলিয়াই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং সেই দর্পী পণ্ডিতকে জয়গৌরব হেলায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত কিন্তু ইহাকে ভয়ার্তের পরাজয় স্বীকার বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কাজেই তাঁর আস্ফালনের অন্ত ছিল না। পথিমধ্যে নদীতে স্নান সারিয়া ফিরিবার কালে শ্রীজীব এই গর্বোদ্ধত পণ্ডিতের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার আস্ফালন শুনিয়া শ্রীজীবের ধৈর্যচ্যুতি হইল, তিনি পণ্ডিতকে তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতপ্রবর অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। রূপ-সনাতনকে যিনি পরাস্ত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে রূপ-সনাতনের শিষ্য নিতান্ত বালক এই শ্রীজীবের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যেন অপমানকর। এই কথাটিই পণ্ডিত একটি রূপকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সিংহ বিক্রম দেখায় তাহার তুল্য শক্তিশালী জীবের সহিত যুদ্ধে। সামান্য খরগোসটাকে হত্যা করিতে সে ঘৃণা বোধ করে। পণ্ডিত নিজে যদি সিংহ হন, তবে শ্রীজীব যেন তুচ্ছ একটা শশক মাত্র—এইরূপই দৃপ্ত তাঁহার ধারণা। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে সে কি কখনো গোষ্পদে ডুবিয়া মরে? পণ্ডিতপ্রবর বড বড পণ্ডিতদিগকে সমুদ্র এবং তাঁহাদের তুলনায় শ্রীজীবকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া এইভাবে তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন করেন।

পণ্ডিতের উদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে একটু নাটকীয় পূর্বাভাস রহিয়াছে। ইনি অবশেষে এই গোষ্পদেই ডুবিবেন, শ্রীজীবের নিকট তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন।

(২) জীব, পিছে তব······নহে এ ব্রজধাম। • (স্তবক ৮)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। ইহা শ্রীজীবের প্রতি শ্রীরূপের উক্তি।

জীব নদীতে স্নান সারিয়া ফিরিবার পথে দিগবিজয়ী পণ্ডিতটির আস্ফালন শুনিলেন। শুনিলেন বিনা-বিচারে রূপ-সনাতন নাকি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। এই লইয়া পণ্ডিতপ্রবর আস্ফালন করিতে করিতে যাইতেছেন। শ্রীজীব ইহাতে অধৈর্য হইয়া পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিয়া পলায়নে বাধ্য করিলেন। বৃন্দাবনে সাড়া পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে শ্রীজীবের ভিজা কাপড় গায়েই শুকাইয়া গিয়াছে।

তিনি যখন আশ্রমে ফিরিলেন তখন দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে দেখিয়া শ্রীরূপ রুষ্ট হইলেন। তীব্র ধিক্কার দিয়া তিনি শ্রীজীবকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শ্রীজীব আজ যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে শূকরের বিষ্ঠার মতোই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও সর্বথা বর্জনীয়। শ্রীজীব অহংকারে স্ফীত হইয়া সেই খ্যাতিরূপ অশুচি বিষ্ঠা সর্বাঙ্গে মাখিয়া ফিরিয়াছেন। শুষ্ক বস্ত্র দেখিয়া শ্রীরূপ ধারণা করিলেন, জীব যমুনার জলে শুচিস্নানও পর্যন্ত করেন নাই। ইহাতে তাঁর ক্রোধ বাড়িয়া গেল। এতকাল তিনি বৈষ্ণব-বিনয়ের শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, জীবের মধ্যে তাহার কিছুমাত্র প্রভা স্থায়ী হয় নাই বলিয়াই আজ তিনি পাণ্ডিত্যের অহংকার দেখাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীরূপ ঘৃণাভরে শ্রীজীবের মুখদর্শন করিতেও অস্বীকৃত হইলেন। জীব আশ্রম হইতে বিতাড়িত হইলেন। কারণ শ্রীরূপ বলিলেন, পাণ্ডিত্যের অহংকার যাঁহার মধ্যে তাঁহার পক্ষে রাজসভাই যোগ্যস্থান; কেন-না সেখানে বিচার-বিতর্কে সেই অহংকার জাহির করার সুযোগ আছে। বৈষ্ণবের আশ্রমে এই অভিমানের তথা অভিমানীর স্থান নাই।

(৩) বুঝাবার তাই আছে……এশিক্ষা এতদিনে! (স্তবক ১১)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। শ্রীজীবকে শ্রীরূপ কেন ত্যাগ করেন তাহার কারণ বিবরণ-প্রসঙ্গে রূপ সনাতনকে উদ্ধৃত উক্তি করেন।

শ্রীজীব জয়গর্বী পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুরুর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সনাতন ইহার মধ্যে আত্মম্ভরিতা বা অন্য কোনো দোষ দেখিতে পান নাই। সুতরাং রূপ কেন জীবকে ত্যাগ করিলেন তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। রূপ বলিলেন, ইহা আর বুঝাইয়া বলার মতো কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি সমস্তপ্রকার অহংকার ও গৌরববোধ বিসর্জন দিয়া, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু, তৃণ অপেক্ষা দীন হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব। বিনয়ের পরাকাষ্ঠাই বৈষ্ণবধর্মের সার কথা এবং জীবকে এতকাল এই শিক্ষাই তিনি দিয়া আসিয়াছেন। জয়মদমত্ত পণ্ডিতকে বিনা-বিচারে জয়পত্রী লিখিয়া দিয়া সেই বৈষ্ণব-বিনয়ের দৃষ্টান্তই স্থাপন করিয়াছিলেন। অথচ জীব ঠিক সেই পণ্ডিতকেই তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আজ পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন।

সনাতন ইহার মধ্যে গুরুভক্তিরই নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছেন। গুরুকে পরাস্ত না করিয়াই একজন অকারণ আস্ফালন করিবে, তাঁহার অপূর্ব বিনয়কে কাপুরুষতা বলিয়া প্রচার করিবে,—ইহা জীবের পক্ষে সহানাতীত হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রূপের মতে ইহাও মস্ত অপরাধ। রূপ কখনো মর্যাদা চাহেন নাই, বৈষ্ণব-দীনতাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার বস্তু। ইহা জানিয়াও শিষ্য জীবের পক্ষে তাঁহার মর্যাদারক্ষার জন্য ধৈর্যের অভাব ও পাণ্ডিত্যের অহংকার দেখানো সংগত হয় নাই। বস্তুতঃ জীবের এই অপরাধ রূপের মনে রূঢ় আঘাত করিয়াছে। সেইজন্য তীব্র ধিক্কারের সহিত তিনি জীবকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইভাবে জীবকে ত্যাগ করার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীরূপ বৈষ্ণব-দীনতার নিষ্কর্ষটি এই অংশে ব্যক্ত করিয়াছেন।

(৪) **দীনতার অভিমান……'জীবে' দয়া তব কই ?"** (স্তবক ১২)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। ইহা শ্রীরূপেরপ্রতি সনাতনের উক্তি। রূপ তাঁহার প্রিয়শিষ্য জীবকে ত্যাগ করেন। রূপ ও সনাতনের মধ্যে এই লইয়া কথোপকথন হয়, সেই প্রসঙ্গেই সনাতনের উদ্ধৃত উক্তি।

জীবকে ত্যাগ করার কারণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান। রূপ জীবকে বৈষ্ণব-দীনতার যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গিয়া জীব অধৈর্য ও অহংকার প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য রূপ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। সনাতনের যুক্তি এই যে, রূপ নিজেও অভিমানমুক্ত নহেন। পাণ্ডিত্যের অভিমান অবশ্য তাঁহার নাই, কিন্তু বৈষ্ণব-দৈন্যের অভিমান তাঁহার আছে। এই অভিমানের ফলেই তিনি নিজেও জীবের প্রতি অধৈর্য ও অক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ সর্বজীবে দয়া। কিন্তু সেই দয়ার ভাব রূপ এইক্ষেত্রে পরিহার করিয়াছেন। শিষ্য জীবের প্রতি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া তাঁহার পক্ষে ক্ষমা করাই সংগত ছিল। বিশেষতঃ, জীব আত্ম-অপরাধ উপলব্ধি করিয়া গুরুর নিকট সানুনয়ে ক্ষমাও চাহিয়াছিলেন। রূপ তো তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দয়াধর্ম দেখাইতে পারিলেন না। বৈষ্ণব-দীনতার একপ্রকার অভিমানে তখন তিনি

আচ্ছন্ন ছিলেন। সেইজন্যই সেই দীনতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট শিষ্যকে তিনি উপেক্ষাভরে পায়ে ঠেলিয়া দিলেন। সুতরাং অভিমান, অধৈর্য ও দয়ার অভাব —এই তিন অপরাধে শ্রীরূপ নিজেই অপরাধী। জীবকে শাস্তি দেওয়া সংগত হয় নাই—এই অংশে ইহাই সনাতনের ইঙ্গিত।

(৫) কী কথা শুনালে ! হায়…এ মূঢ়ের অবিচার। (স্তবক ১৩)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতার অন্তর্গত। সনাতনের বিশ্লেষণ শুনিয়া জীবকে ত্যাগ করা যে অন্যায় হইয়াছে তাহা শ্রীরূপ উপলব্ধি করিলেন এবং উদ্ধৃত বচনে জীবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সনাতনকে অনুরোধ করিলেন।

রূপ বুঝিলেন জীব পাণ্ডিত্যের অভিমান দেখাইবার জন্য অপরাধী। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করার মধ্যে রূপের নিজেরই বৈষ্ণব-দীনতার অভিমান ও দয়ার অভাব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং জীবের অপেক্ষা রূপের অপরাধই বেশি। শ্রীরূপ সনাতনের অপূর্ব বিশ্লেষণ শুনিয়াই সহসা এই উপলব্ধিতে পৌঁছিলেন। ক্রোধ ও অভিমানের মোহ যেন তাঁহার হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙার পর স্বচ্ছ চেতনা ফিরিয়া পাওয়ার মতো শ্রীরূপ যেন সহসা সত্য দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার প্রবল অনুতাপ উপস্থিত হইল। মোহবশে তিনি জীবকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই বিতাড়ন বজ্রের মতো কঠোর আঘাত হানিয়াছিল জীবের কুসুমের মতো নম্র প্রাণে। এই কথা ভাবিয়া শ্রীরূপের প্রবল একটা আত্মধিক্কার জাগিল। অভিমান আর অক্ষমার মোহে তাঁহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সেই মূঢ় অবস্থায় তিনি জীবের প্রতি অন্যায় করিয়াছিলেন। নিজে অপরাধী হইয়া নিরপরাধ শিষ্যকেই শাস্তি দিয়াছিলেন। শ্রীরূপের এই কথাকয়টির মধ্যে গভীর অনুশোচনা ব্যক্ত হইয়াছে এবং জীবকে ফিরাইয়া আনার অনুরোধে তাঁহার প্রেমাশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

(৬) চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল…পরশে অশুচি ব্রজ। (স্তবক ১৪)

এই পঙ্‌ক্তিচয় কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতার শেষাংশ। শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গুরু-শিষ্যের মধুর মিলনদৃশ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গেই কবি উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

সনাতনের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ বুঝিলেন জীবকে পাণ্ডিত্যের অভিমানে অভিমানী ভাবিয়া ত্যাগ করা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে

তাঁহার নিজের দীনতাবোধের অভিমান ও অক্ষমা প্রকাশ পাইয়াছে। তখন তাঁহার গভীর অনুশোচনা উপস্থিত হইল। জীবকে ত্যাগ করিয়া তিনি যে কত বড় আঘাত দিয়াছেন তাহা তখন তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন, এবং প্রিয় শিষ্যের জন্য আকুল হইয়া তিনি তখনই তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। অনশনক্লিষ্ট জীব ফিরিলেন। রূপ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আরো কাতর হইলেন। জীবকে বুকে জড়াইয়া তিনি শিশুর মতো অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন। জীবও এই প্রেমের অভিষেকে অশ্রুধারায় গলিয়া গেলেন। তখন শ্রীরূপ ও শ্রীজীব—এই দুইজনের চারি চক্ষু হইতে নিঃসৃত সেই পূতধারা বৃন্দাবনের ধূলি সিক্ত করিয়া দিল। অভিমানস্ফীত দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডিতের আবির্ভাবই হইয়াছিল যত অনর্থের মূল। তাঁহার অভিমান যেন অপবিত্র একটা প্রবল অভাবের মতো বৃন্দাবনকে স্পর্শমাত্রে অশুচি করিয়া দিয়াছিল এবং সেই প্রভাবে স্বয়ং শ্রীরূপও কিছু সময় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইবার শ্রীরূপের মোহ কাটিল, জীবের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিল। আর সেই মিলনমুহূর্তে তাঁহাদের অশ্রুধারা স্বর্গের সুরধুনীর ন্যায় সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া দিয়া বৃন্দাবনের ধূলিকণাটি পর্যন্ত পবিত্র করিয়া দিল।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতার কাহিনী নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। "দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক—(ক) এই 'পণ্ডিত দাম্ভিক'টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (খ) উক্ত পণ্ডিত কিরূপে কাহার দ্বারা দণ্ডিত হইলেন?

উ.। সংক্ষিপ্তসার ও **টীকা** হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

প্র. ৩। "না জানি কত-না পায় সে যাতনা এ মূঢ়ের অবিচারে।"—(ক) 'এ মূঢ়' বলিতে এখানে কাহাকে বুঝাইতেছে? (খ) কি অর্থে কেমনভাবে তিনি মূঢ় হন? (গ) এখানে উল্লিখিত 'মূঢ়ের' কোন্ অবিচারের কথা হইতেছে?

উ.। সংকেত: (ক) শ্রীরূপকে বুঝাইতেছে। (খ) শ্রীরূপ জীবকে ত্যাগ

করার সময় বৈষ্ণব-দৈন্যের অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধের বশে তিনি জীবকে ত্যাগ করিয়া অক্ষমা প্রদর্শন করেন। এইভাবে অভিমান, ক্রোধ, অক্ষমা—এইসব মিলিয়া শ্রীরূপের মোহাবেশ সৃষ্টি করে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়। এই মোহের অবস্থাই মূঢ়তা। এই অর্থে তিনি মূঢ় হইয়া পড়েন। (গ) উদ্ধৃত অংশে 'অবিচার' কথাটি শ্রীরূপ কর্তৃক শ্রীজীবকে ত্যাগ করার কাহিনীটিকেই বুঝাইতেছে।

প্র. ৪। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

প্র. ৫। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ন' কবিতাটির সারাংশ উল্লেখ করিয়া মূল ভাবটি পরিস্ফুট কর।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: দিগ্‌জয়ী = দিক্ + জয়ী। দিগ্‌গজ = দিক্ + গজ। আজো = আজ + ও (বাংলা সন্ধি)। আমাদেরি = আমাদের + ই (ঐ)। আরো = আর + ও (ঐ)। তখনো = তখন + ও (ঐ)। গোষ্পদ = গো + পদ।

সমাস: দিগ্‌জয়ী—দিক্‌সমূহ জয় করিয়াছেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ)। পঙ্কজবনে—পঙ্কে জন্মে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ); পঙ্কজের বন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। জয়নাদ—জয়সূচক নাদ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সাধনভজনরত—সাধন এবং ভজন (দ্বন্দ্ব); তাহাতে রত (৭মীতৎপুরুষ)। বিচারমগ্ন—বিচারে মগ্ন (৭মীতৎপুরুষ)। ভয়ে বিস্ময়ে—ভয়ে এবং বিস্ময়ে (অলুক্ দ্বন্দ্ব)। চরণাশ্রিত—চরণকে আশ্রিত (২য়াতৎপুরুষ)। জ্ঞানসাগরের—জ্ঞানরূপ সাগর (রূপক-কর্মধারয়), তাহার। রণে-আহ্বান-বাণী—রণে অর্থাৎ রণার্থ আহ্বান (৪র্থীতৎপুরুষ); তাহার বাণী (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। পুরবাসী—পুরে বাস করে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। প্রশ্নবাণ—প্রশ্নরূপ বাণ (রূপক-কর্মধারয়)। অবনতশির—অবনত শির যাহার (বহুব্রীহি), সে। বিতণ্ডাবীর—বিতণ্ডায় বীর (৭মীতৎপুরুষ)। কুসুমকোমল—কুসুমের ন্যায় কোমল (উপমান-কর্মধারয়)।

মুখদর্শন—মুখের দর্শন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। কঙ্কালসার—কঙ্কাল সার যাহার (বহুব্রীহি), তাহা।

সাধু শব্দ-রূপ: দোহে (উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০)—দুইজনে। জিনি—জয় করিয়া। বধে—বধ করে। ধ্বনিতেছে—ধ্বনি করিতেছে। পালিলাম—পালন করিলাম। ত্যজিয়া—ত্যাগ করিয়া। ত্যজিলে—ত্যাগ করিলে। জিনিবারে (উ. মা. ১৯৬০)—জয় করিতে। ত্যজিব—ত্যাগ করিব। চুমিয়া—চুম্বন করিয়া। তিতিল (উ. মা. ১৯৬০)—ভিজিল, সিক্ত হইল। আগায়—অগ্রসর হয় (অথবা, 'আগায়'-ই গদ্যরূপ)।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: দম্ভী—দম্ভ+ইন্। পাণ্ডিত্য—পণ্ডিত+ষ্যঞ্। কুতূহলী—কুতূহল+ইন্। বৈষ্ণব—বিষ্ণু+অণ্। গুরুতর—গুরু+তরপ্। সহিষ্ণু—সহ+ইষ্ণুচ্। হারি—হার্+ই (আধুনিক উচ্চারণে এই ই-টি

,'

সমস্ত পদ গঠন: রণমদে মত্ত=রণমদমত্ত। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি=পাণ্ডিত্যখ্যাতি। রূপ আর সনাতন=রূপ-সনাতন। যমুনার তীরে=যমুনাতীরে। তমাল-তরুর তল—তমাল-তরুতল। জীবে দয়া=জীবদয়া।

ব্যাকরণগত টীকা: পুঁথিপত্র—'পত্র' কথাটি এখানে বহুত্ববাচক, ইহার স্বতন্ত্র অর্থ নাই।

আগায়—সংস্কৃত 'অগ্র'—আগ; এই 'আগ'-ই আ-প্রত্যয়যোগ নামধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে।

বধে—হন্+অপ্=বধ (বিশেষ্য); এই 'বধ'ই বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে। নামধাতুজাত ক্রিয়া।

তিষ্ঠ—সংস্কৃতের স্থা (ধাতু)+লোট্ হি=তিষ্ঠঃ এই 'তিষ্ঠ' বাঙলায় মূল সংস্কৃতের অর্থেও যেমন চলে (এখানে চলিয়াছে), তেমনি চলে বাঙলা ধাতুরূপে—পাড়ায় আর 'তিষ্ঠিতে' (তিষ্ঠ+ইতে) পারা যায় না (তিষ্ঠিতে=থাকিতে)।

পালিলাম, ত্যজিয়া, ত্যজিলে, ত্যজিবে—প্রত্যেকটি সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন বাঙলা ক্রিয়া; ইহাদের প্রয়োগ হয় কেবল পদ্যে।

পরশে—স্পর্শে>পরশে: বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।

গরব—গর্ব>গরব: বিপ্রকর্ষ।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগঃ রূপের হৃদয় গলিল না—এখানে 'হৃদয় গলিল না' = হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, অতএব 'গলা' ক্রিয়াটি বিশিষ্টার্থক।

বাক্য-রচনা: প্রতিফল: এই অন্যায়ের প্রতিফল একদিন তুমি পাবেই; চরণাশ্রিত: মহতের চরণাশ্রিত ব্যক্তির বিপদের ভয় থাকে না।

কুতূহলী: কুতূহলী জনতার সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে বেচারার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

শাণিত: ঘাতকের শাণিত খড়্গ মুহূর্তের মধ্যে শ্রীমতীর মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিল।

সহিষ্ণু: এ সংসারে সহিষ্ণু না হইলে শ্রেয়কে লাভ করা যায় না।

অছিলা: জীমূতবাহন একটা জরুরী কাজের অছিলায় মিত্রাবসুকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

কুসুমকোমল: বিদ্যাসাগরের সংকল্প ছিল বজ্রকঠোর কিন্তু অন্তর ছিল কুসুমকোমল।

অবুঝ: অবুঝ শিশু যখন প্রশ্ন করে, 'আমার মাকে তোমরা এমন করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' তখন সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে এমন ভাষা পৃথিবীতে কই?

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

কবি-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম বিদ্রোহী কবি বলিয়াই পরিচিত। অসংখ্য গজল, গান ও অন্য নানাপ্রকার কবিতার রচয়িতা হইলেও 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবিরূপেই তাঁহার স্থায়ী ও ব্যাপক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে তাঁহার "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতায় আত্মপরিচয়টি অনেকাংশে সত্য। কবি বলিয়াছেন:

"বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুজে তাই সব সবি।

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমি কি বুঝি তার কিছু ?
হাত উঁচু আর হ'ল নাক ভাই, তাই লিখি ক'রে ঘাড় নিচু

দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক মাথায়, বন্ধু বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে !
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুক কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি রয়েছে সোনার শত ছেলে ।
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ ।"

এই বিবরণে কবি যতই বিনয় প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহার কাব্য যে ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গমাত্র নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাব্য আন্তরিক ও গূঢ় দুঃখের অনুভূতি হইতে স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে দেশপ্রেমের কাব্য ছিল বিদেশী কাব্যের অনুকরণমাত্র। রবীন্দ্রনাথের হাতে এইজাতীয় কাব্যে আন্তরিকতার সুর সংযোজিত হয় বটে, কিন্তু সৌকুমার্য ও মাধুর্যের আতিশয্যে তাহাতেও অগ্নিজ্বালা ফুটে না। দ্বিজেন্দ্রলাল, বিশেষ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথই এই কাব্যের ওজস্বিতার উদ্দীপন করেন ; কাজী নজরুল সেই সুরটিকে চরমে তুলিয়া জ্বালাইয়া দেন আগুন। সুতরাং নজরুলের কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। এইজন্যই তিনি সাধারণের নিকট এত অধিক সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুলের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্যত্র। পল্লী, প্রকৃতি ও মানুষকে লইয়া তিনি যে বস্তুনিষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যে একটি স্বতন্ত্র কবি-পরিচয় গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেইটাই নজরুলের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব।

উৎস—কবির 'সর্বহারা'-নামক কাব্যে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়; পরে ইহা 'সঞ্চিতা' কাব্যসংকলনগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

নামকরণ—আলোচ্যমান কবিতায় কবি জাতির এক অতিশয় সংকটময় কাল কল্পনা করিয়াছেন। এই সংকট যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিপুল সমুদ্রের তুল্য। জাতিকে সেই ভীষণ সংকট পার হইতে হইবে। কিন্তু উপস্থিত বিপদের এই সমুদ্র পার হইলেই যে আমাদের যাত্রাপথ সুগম হইবে তাহা নহে। ইহার পরেও রহিয়াছে দুর্গম ভবিষ্যৎ। অশনিগর্জন আর ঘনঘটার ভয়াবহ আকাশতলে দুস্তর জাতির গতিপথ। এই পথে জাতিকে যে কর্ণধার চালনা করিবেন তাঁহাকে সর্বদা সাবধান হইতে হইবে। বিপদ্ ও সংগ্রামের রক্তাপ্লুত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়া পৌছিতে হইবে সুদিনের উদয়াচলে। নির্ভীক ও সতর্ক নেতাই আমাদের সেই বিদ্রোহ বিক্ষোভময় বিপর্যয়ে পরিচালনা করিতে পারিবেন। তাই কবি এই কবিতায় জাতির সর্বাধিনায়কের উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন এবং সেইজন্য কবিতাটির শিরোনাম হইয়াছে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

সমালোচনা—'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' দেশপ্রেমের কবিতা। ইহার মধ্যে তাই বিষয় ও কল্পনার চমৎকারিত্ব গৌণবস্তু। আন্তরিকতাময় অনুভূতিই এই-জাতীয় কবিতার প্রাণ এবং তাহা পাঠকচিত্তে যে পরিমাণ উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে পারে সেই পরিমাণে সার্থক। আলোচ্যমান কবিতায় আমরা এই অনুভূতির আন্তরিকতা এবং বলিষ্ঠ প্রেরণার জ্বালাময় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। বিষয়বস্তু এখানে সাধারণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সংকটময় মুহূর্ত; চতুর্দিকে বিপ্লব-বিক্ষোভ; সম্মুখে বন্ধুর পথ। এমন সময় চাই দক্ষ নায়কের অভ্রান্ত পরিচালনা। অদম্য নিষ্ঠা, অপূর্ব আত্মত্যাগ আর ভয়লেশহীন অবিচলিত মনোবল যাঁহার আছে, তিনিই জাতিকে এই সংকটের দিনে সকল বিপত্তির মধ্য দিয়া পরিচালিত করিতে পারেন। কবি জাতির সর্বাধিনায়কের প্রতি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সংগ্রামের দুরূহতা-সম্বন্ধে শঙ্কা জাগাইবার জন্য নহে। কাণ্ডারীকে তিনি 'হুঁশিয়ার' করিতেছেন, বলিতেছেন যে সম্মুখে আমাদের—'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার', কিন্তু সেইসঙ্গে এই বাধাগুলি নিশীথ রাত্রিতেই 'লঙ্ঘিতে হবে' বলিয়া সংকল্পের মন্ত্রটিই পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করিতেছেন। ভাবের দিক্ দিয়া তাই কবিতাটি উদ্দীপনাময়ী।

যে রূপকল্পনার মধ্য দিয়া কবি দেশসেবায় এই উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাও সুন্দর। সাগরবক্ষে একটি নৌকা, তাহার মধ্যে একদল অভিযাত্রী। সাগর—কালের সমুদ্র। ঝড়-ঝঞ্ঝার আকারে দেখা দিয়াছে জাতির সংকট।

দুর্ভাগ্য দেখা দিয়াছে তামসী রাত্রিরূপে। এই পরিবেশ কল্পনার মধ্যে অভিযাত্রীরূপে কবি জাতিকে দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন তিনি শতাব্দীর পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা দেশবাসীর চিত্তে বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও কিছুটা উগ্র হইয়া উঠিতেছে তাহাও কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। দেশাত্মবোধের আদিগুরু বঙ্কিমের দীক্ষা যেন কবির মধ্যেও সুস্পষ্ট। তাই তিনিও দেশকে মাতা এবং দেশসেবককে মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া দেশবাসী পরস্পর পরস্পরকে যাহাতে এক মায়ের সন্তানরূপে ভাবিতে শিখে সেই মর্মে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

সত্যকার কবিগণ এক হিসাবে ভবিষ্যদ্‌বক্তা তাঁহাদের স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যতের পটলেখা স্বতঃই ভাস্বর হইয়া উঠে। কাজী নজরুল তাই জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে আশা-হতাশার অপূর্ব চিত্রটি কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত ও ভগ্নোদ্যম একদল অভিযাত্রী পিছাইয়া পড়িয়াছেন, সম্মুখবর্তীদের প্রাণেও বুঝি বা আর আগের বল নাই। এমন সময় নায়কের অন্তঃশক্তি হারাইলে চলিবে না। কবি তাই পলাশীর রণাঙ্গনে জাতিকে নূতন ইতিহাস রচনা করিবার প্রেরণা দিয়াছেন। পলাশী আমাদের জাতীয় চেতনার খেদসূচকই নহে, উত্তেজনা ও প্রেরণারও উৎস। কবি সেই পলাশীর কথা স্মরণ করাইয়া, বিশেষ করিয়া ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণকারী শতেক শহীদের অশরীরী আবির্ভাব বর্ণনা করিয়া শান্ত মনকে আবার উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। মনে পড়ে রাজপুতানার সেই গল্প। 'মৈ ভুখা হুঁ'—আমি বুভুক্ষু—চাই রাজরক্ত। মহাকালীর সেই বুভুক্ষার বলি হয় সহস্র রাজপুত বীর। আজ আমাদের নিকটও দেশমাতৃকার বেদীমূলে যাঁহারা আত্মবলিদান করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যেন সেই ক্ষুধাই ব্যক্ত করিয়াছেন—চাই আরো রক্তদান, আরো আত্মত্যাগ—তবেই দেশের স্বাধীনতা আসিবে। কবির এই উপলব্ধিটুকুই যেন আলোচ্যমান কবিতার শেষাংশে অভিব্যক্ত। এই সূত্রে মনে পড়ে নেতাজী সুভাষের বাণী—"Give me blood and I shall give you liberty."

সংক্ষিপ্তসার—জাতীয় জীবনের এক সংকটময় কালে কবি দেশনেতা তথা দেশকর্মীদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। জাতির অগ্রগতির পথে

আজ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, সে পথ দুর্গম ও দুস্তর। স্বাধীনতারূপ লক্ষ্যের প্রতি জাতির এই অগ্রগতিকে ঝটিকাহত উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে তামসী নিশায় কর্ণধারহীন ক্ষুদ্র তরণী লইয়া যাত্রার সহিত তুলনা করা যায়। এই ভীষণ সংকটে প্রয়োজন অমিতবীর্য অবিচলিত নেতার। এইরূপ একজন নেতার অভ্রান্ত পরিচালনা জাতি পদে পদে প্রার্থনা করিতেছে। সকল বাধা-বন্ধ ঝড়-তুফান উপেক্ষা করিয়া জাতিকে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। পরাধীন অত্যাচারিত দেশবাসীর পুঞ্জীভূত প্রবল অসন্তোষ আজ বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশমাতৃকার সেবক বীরগণকে অতি সাবধানে জনশক্তির এই হৃদয়বিক্ষোভকে দেশের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে—বঞ্চিত সর্বহারাদিগকে দেশের মুক্তি অভিযানে সৈনিকের গৌরব দিয়া সসম্মানে গ্রহণ করিতে হইবে। আত্ম-পরিচালনে অক্ষম জাতি দুর্গতির গহ্বরে নামিয়া চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। এমন সময়ে কেহ যাহাতে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলিয়া, জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা না করিতে পারে, সেদিকে দেশনেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাঁহাকে বলিতে হইবে—জাতীয় স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, জাতির দুদিন সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই দুদিন। দুর্গমপথে অভিযানরত স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের মধ্যে যদি অভিযানের সাফল্য-সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয়, যদি পথশ্রমে ও হতাশায় কেহ পিছাইয়া পড়ে, তবুও জাতির সর্বাধিনায়ক তাঁহার গুরুদায়িত্ব ত্যাগ করিয়া মধ্যপথে রণে ভঙ্গ দিবেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পলাশীর কলঙ্কময় কাহিনী নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। পলাশীর যুদ্ধে বাঙালী তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। আসন্ন ভবিষ্যতে যে নূতন যুদ্ধ হইবে, তাহাতে শত শহীদের বক্ষোরক্তে স্বাধীনতাসূর্য নূতন অরুণিমায় রঞ্জিত হইয়া উদিত হইবে এবং এক নবযুগের সূচনা করিবে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন করিতে গিয়া যেসকল বীর ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়াও অমর হইয়াছেন, তাঁহাদের অশরীরী আত্মা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে। তাঁহারা দেখিতে চান, জাতি চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত কিনা। জাতির নেতা এই অগ্নিপরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া জাতিকে মুক্তির পথে অভ্রান্তভাবে পরিচালিত করিতে পারিবেন—ইহাই কবির আশা। কবি জাতির নেতাকে এই গুরুদায়িত্বের কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

প্রথম স্তবক

দুর্গম গিরি—দুরারোহ পর্বত। **কান্তার**—দুর্গম স্থান বা অরণ্যানী। **দুস্তর পারাবার**—দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র। **রাত্রি-নিশীথে**—গভীর রাত্রিতে। **দুর্গম গিরি··· রাত্রি-নিশীথে**—জাতির ঘোর দুদিন উপস্থিত। তাহার অগ্রগতি তথা লক্ষ্যের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কিন্তু দেশকর্মী তথা দেশনায়ককে এই সকল বাধায় তিলমাত্র ভীত না হইয়া সম্মুখের পানে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কথাটিই কবি নানারূপ প্রাকৃতিক বাধার রূপক আশ্রয় করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 'রাত্রি-নিশীথ' আশার আলোকহীন অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথের প্রতীক। লক্ষ্য করিতে হইবে যে কবিতাটি দেশনেতাকে উদ্দেশ করিয়া রচিত হইলেও ইহার আসল উদ্দেশ্য দেশকর্মীদের অন্তরে স্বদেশকে বিদেশীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করা।

দ্বিতীয় স্তবক

দুলিতেছে তরী ইত্যাদি—এখানে কবি, বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র একখানি নৌকায় দুঃসাহসিক যাত্রীদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা বিক্ষুব্ধ জাতীয় জীবনের প্রতীক। জাতি যেন নৌকায় করিয়া সমুদ্রবক্ষে অগ্রসর হইতেছে। **ফুলিতেছে জল**—প্রবল ঝটিকার বিক্ষোভে সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। তরঙ্গের প্রচণ্ড অভিঘাতে নৌকা তথা যাত্রীদের অবস্থা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল। **ভুলিতেছে মাঝি পথ**—নৌকার কর্ণধার দিশহারা হইয়া অভ্রান্তভাবে নৌকা চালাইতে পারিতেছে না। **হিম্মৎ**—শক্তি, সাহস। শব্দটি ফার্সী। **হাঁকিছে ভবিষ্যৎ**—জাতির অগ্রগতির পথে যাহা লক্ষ্যস্থল, তাহাই জাতির ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ প্রকৃত শক্তিশালী নেতাকে এই সংকটে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইতেছে। **নিতে হবে ·····তরী পার**—জাতিরূপ তরুণীকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার করিয়া স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

তৃতীয় স্তবক

তিমির রাত্রি—অন্ধকারময়ী নিশা। এই তামসী রজনীই মহাকালীরূপিণী দেশমাতৃকার পূজার প্রশস্ত সময়। 'তিমির' শব্দটি বিশেষ্য, এখানে বিশেষণ-

রূপে ব্যবহৃত। **মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা**—দেশমাতৃকার সেবামন্ত্রে দীক্ষিত কর্মী বা যোদ্ধার দল। **সান্ত্রী**—ইংরেজী sentry। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে প্রথমে বাঙালীকে শিখাইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের পরোক্ষ প্রভাব নজরুলের উপরও লক্ষ্য করা যায়। **যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা** ইত্যাদি—পরাধীন জাতির জনগণ যুগে যুগে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াছে। তাহাদের হৃদয় এই পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা সহ্য করিয়াও নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ছিল; কিন্তু আজ তাহাতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় তাহারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। **ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে** ইত্যাদি—ঐহিকের সর্বসুখবঞ্চিত পরাধীন ভারতবাসীর হৃদয়বেদনা চরমে উঠিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে, আগ্নেয়গিরির অন্তর্বহ্নির ন্যায় অচিরেই হয়তো তাহার স্ফুরণ ঘটিবে। **ইহাদের পথে নিতে হবে** ইত্যাদি—জনশক্তির এই অমেয় হৃদয়বিক্ষোভকে দেশের স্বাধীনতা-অর্জনের কাজে লাগাইতে হইবে। দেশের প্রতিটি বুভুক্ষু সর্বহারাকে সসম্মানে বাঁচিবার অধিকার দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্ধর্ষ সৈনিকে পরিণত করিতে হইবে—কিন্তু সাবধানে! একটি ভুল পদক্ষেপ হইলেই জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ স্তবক

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া—উপযুক্ত নেতার অভাবে জাতি কর্ণধারহীন তরণীর যাত্রীর ন্যায় ঘোর সংকটে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। **জানে না সন্তরণ**—সাঁতার না জানিলে যেমন জলে সমূহ বিপদ্, আত্ম-পরিচালনাশক্তির অভাবেও জাতির তেমনই বিপদ্। কাণ্ডারী—মাঝি, কর্ণধার। মাতৃ-মুক্তিপণ—দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের প্রতিজ্ঞা। **কাণ্ডারী!......মাতৃ-মুক্তিপণ**—দেশনায়কের সম্মুখে আজ অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত। তাঁহার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা এবং পরিচালনার দক্ষতার প্রমাণ দিবার সময় জাতির এই সংকটমুহূর্তে আসিয়াছে। **"হিন্দু না ওরা মুসলিম?"** ইত্যাদি—জাতির দুর্দিনে কোনো দুষ্টবুদ্ধি স্বার্থপর মানুষ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলিয়া জাতির মধ্যে বিভেদসৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। **কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ** ইত্যাদি—জাতির যিনি নেতা, তাঁহার উদ্দেশেই কবি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। জাতির নেতাকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে এক দেশমাতৃকার সন্তান বলিয়া ভাবিতে

এবং পরিচয় দিতে হইবে, সম্প্রদায়নিবিশেষে সকলকে এক জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে। জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া যে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি বর্জন করিতে না পারে, সে নেতা হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

পঞ্চম স্তবক

গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা ইত্যাদি—এই স্তবকে কবি সংকটের মুহূর্তে জাতিকে একদল অভিযাত্রী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকল বাধা ও দুর্যোগ উপেক্ষা করিয়া জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে দুর্গম পার্বত্য পথে অভিযান চালাইয়াছেন। **গিরিসংকট**—পর্বতগাত্রের অতিশয় দুর্গম এবং বিপজ্জনক স্থান। **গুরু গরজায় বাজ**—একে তো দুর্গম পার্বত্য পথ, তাহার উপর আবার আকাশে প্রচণ্ড অশনিনির্ঘোষ আসন্ন ঝটিকার ইঙ্গিত দিতেছে। **পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে** ইত্যাদি—দুর্গম পথে চলিতে চলিতে যাহারা হতাশা ও শ্রমে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মনে সন্দেহ জাগিতেছে—আমরা লক্ষ্যে শেষপর্যন্ত পৌঁছিতে পারিব তো? **কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ?**—হতাশা ও শ্রমে যাহারা অভিযানের সাফল্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে, সেই দুর্বল সঙ্গীদের স্তিমিতপ্রায় প্রেরণা কি জাতির নেতাকেও হতোদ্যম করিয়া দিবে? তিনি কি অন্যের কথায় অগ্রগতির পথ ছাড়িয়া ফিরিবার পথ ধরিবেন?—কখনই না। তাঁহাকে অটল বিশ্বাস লইয়াই জাতিকে সম্মুখের পথে চালাইতে হইবে। **ত্যজিবে কি পথমাঝ?**—তিনি কি মধ্যপথে রণে ভঙ্গ দিবেন? **ক'রে হানাহানি**—শ্রান্ত অভিযাত্রীকে নূতন উদ্দীপনা নূতন শক্তি দিতে হইলে যদি আঘাতের প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে। আঘাতের ফলেই তাহার জড়বৎ চেতনার জাগরণ ঘটিবে। **নিয়াছ যে মহাভার**—তুমি যে জাতিকে তাহার লক্ষ্য অর্থাৎ স্বাধীনতায় পৌঁছাইয়া দিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ দায়িত্ব বর্জন করা কিছুতেই চলিবে না।

তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর—ইতিহাস-বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হইয়াছিল। সে আজ প্রায় দুইশত বৎসরের কথা। আজিকার ভারতীয় জাতি যেন সুযোগ্য নেতার পরিচালনে সেই

পলাশীর রণক্ষেত্রে আসিয়া নূতন যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত। পলাশীর প্রথম যুদ্ধে বাঙালী তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, কিন্তু আসন্ন দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া সে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবে। ইহাই কবির আশা। পলাশী বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার একটি স্থান। ইহার আম্রকাননে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ হয়। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কুমন্ত্রণায় সিরাজ পলায়ন করেন এবং ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ জয়লাভ করে। **খুনে**—রক্তে। শব্দটি ফার্সী। **খঞ্জর**—ছোরা। **বাঙালীর খুনে ...খঞ্জর**—পলাশীর যুদ্ধে বহু বাঙালী বীরের রক্তক্ষয় করিয়া ক্লাইভ কূটকৌশলে বাঙলার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল। **ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে** ইত্যাদি—পলাশীর রণক্ষেত্রের প্রান্তরবাহিনী গঙ্গার জলে সেদিন বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হইয়াছিল। এই পঙ্‌ক্তিটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তুলনীয়: "নিভিল কি দিনমণি ডুবিলে এবার ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধুজলে" (পলাশীর যুদ্ধ)। **উদিবে সে রবি** ইত্যাদি—স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিকদের বক্ষোরক্তে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য নূতন অরুণিমায় রঞ্জিত হইয়া ভারতের নূতন যুগের সূচনা করিতে উদিত হইবে। ভারতবাসীর রক্তদান বিফল হইবে না। পলাশীর কলঙ্কিত ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিত হইবে।

সপ্তম স্তবক

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল ইত্যাদি—দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্য যে সকল মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জাতির সসম্মানে স্বাধীনভাবে বাঁচিবার অধিকার সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন; যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াও অমর হইয়াছেন। তুলনীয়: "বিজয়ী বীরের দল, মরিয়া তোমরা শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।"—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। **আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে** ইত্যাদি—সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের অশরীরী আত্মা যেন জাতির এই সংকটের মুহূর্তে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা দেখিতে চান স্বাধীনতাকামী জাতি চরমত্যাগের জন্য প্রস্তুত কিনা; কারণ রক্তের ঋণ শোধ না হইলে লুপ্ত স্বাধীনতা যে ফিরিবার নয়। **আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?**—জাতির

সম্মুখে যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত, তাহাতে কোন্ স্বার্থ নেতার প্রধান লক্ষ্য হইবে—জাতীয় স্বার্থ, না তুচ্ছ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ? সহজ কথায়, জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত দেশনেতা কাহার প্রাধান্য দিবেন—জাতির, না সম্প্রদায়ের? উত্তরে কবি ইহাই আশা করেন যে, জাতীয় স্বার্থ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বহু ঊর্ধ্বে। দেশ-নেতাকে এই মহাসত্য ভুলিলে চলিবে না।

ব্যাখ্যা

(১) দুর্গম গিরি, কান্তার……যাত্রীরা হুঁশিয়ার! (স্তবক ১)

আলোচ্যমান অংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। এই অংশে কবি রূপকের সাহায্যে জাতির সংকটময় অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শতাব্দীর পরাধীনতায় অধঃপতিত জাতি আজ হতাশা আর অজ্ঞতার ঘনঘোরে নিমজ্জিত। এই হতাশা ও অজ্ঞতা যেন গভীর রাত্রির মসীময় অন্ধকারস্বরূপ। এইরূপে বর্তমান আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ বিপৎসঙ্কুল। জাতির প্রগতির পথে এক একটি বিপুল প্রতিবন্ধক দুর্গম পর্বতের মতো দাঁড়াইয়া আছে। এইসকল বিপদ্ পার হইয়া জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে গহন অরণ্যপথের ন্যায় ক্লেশকর, নিঃসঙ্গ, অপরিচিত পথে। সে পথ গিয়াছে দুঃখের ঊষর মরুভূমির মধ্য দিয়া। তাহারও পরে রহিয়াছে বিপ্লব ও বিপর্যয়ের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। এইসকল সংকটের মধ্য দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সুদিনের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে হইবে। দেশকর্মীদের তাই প্রস্তুত হইতে হইবে। দুর্গম পথের সকল দুঃখ ও ভুলের সম্ভাবনা জানিয়া হইতে হইবে আমাদের সতর্ক।

(২) দুলিতেছে তরী…… নিতে হবে তরী পার। (স্তবক ২)

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-শীর্ষক কবিতার এই অংশটিতে কবি নজরুল ইস্‌লাম বিক্ষুব্ধ জাতীয় জীবনের চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জাতীয় বিক্ষোভের দিনে যে সতর্ক নেতার নির্ভীক অভ্রান্ত পরিচালনা প্রয়োজন, এই অংশটির তাহাই বক্তব্য।

কালসমুদ্রের বিপুল বক্ষে আমাদের জাতি যেন একটি তরণীবাহিত যাত্রীর দল। যুগযুগব্যাপী পরাধীনতার ফলে সঞ্জাত নিষ্ক্রিয়তা আজ টুটিয়া গিয়াছে। জনগণমন সহসা ফিরিয়া পাইয়াছে তাহার লুপ্ত সম্বিৎ। এই জাগরণ, এই জাতীয় বিক্ষোভ বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইয়া যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। নেতৃবৃন্দ এই আকস্মিক বিপ্লবে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিপ্লব ও সংকট ঝড়ের আকার ধারণ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিয়াছে নবযুগকে। তাই কালসমুদ্রের অংশ এই যে বিক্ষুব্ধ যুগ, ইহার মধ্য দিয়া জাতীয় তরণীকে অভ্রান্ত লক্ষ্যের প্রতি চালিত করিতে হইবে। বিপ্লব ও বিপর্যয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা সেই তরণীর পাল ছিঁড়িয়া, জল কাঁপাইয়া এই যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিল, তাহার মধ্যে জাতিকে চালনা করিতে পারেন একমাত্র অমিতবীর্য অভ্রান্তলক্ষ্য নির্ভীক বীর। সেই বীর আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন এবং অগ্রগতির পথে আমাদিগকে অনিরুদ্ধভাবে পরিচালিত করুন।

• •

(৩) তিমির রাত্রি ·····দিতে হবে অধিকার। (স্তবক ৩)

এই অংশটি বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। জাতির এক অতিশয় সংকটমুহূর্তে দেশকর্মীদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্যমান অংশের সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

যুগ-যুগান্তব্যাপী পরাধীনতার পর জাতি যেদিন জাগিয়া উঠিয়াছে, সেদিন ঘরে-বাহিরে অসংখ্য সংকট তামসী রাত্রির আকারে দেখা দিয়াছে। কবি দেশকে মাতা এবং দেশসেবকদিগকে দেশমাতার সাধকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। দেশমাতা যেন শক্তিরূপিণী মহামায়া; তাঁহার পূজার প্রশস্ত ক্ষণ তিমিরান্ধ রাত্রিই বটে। দেশকে যাঁহারা মাতা জ্ঞান করেন এবং মাতৃজ্ঞানেই তাঁহার সেবা করেন, সেই দেশকর্মিগণ সাবধান হইয়া যেন কার্যে ব্রতী হন। বহুযুগের পুঞ্জীভূত দুঃখ আজ দেশবাসীর চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। হৃদয়ে হৃদয়ে দেখা দিয়াছে বিদ্রোহ। একটা জলস্রোত চারিদিকে বাধা পাইয়া রুদ্ধ হইয়া পড়িলে যেমন ফুলিয়া উঠে, ঠিক তেমনি দেশবাসীর হৃদয়ে পুঞ্জীভূত চাপা দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপুল জনশক্তির অমেয় হৃদয়-বিক্ষোভকে দেশের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। সহায়তা লইতে হইবে লাঞ্ছিত বঞ্চিত সর্বহারাদের। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভুলও জাতির ভাগ্যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিতে পারে।

এই কথা মনে রাখিয়া জনবিক্ষোভকে সুচিন্তিত পথে পরিচালিত করিতে হইবে, কাজেই দেশকর্মিবৃন্দের পক্ষে সতর্কতা প্রয়োজন। এই অংশে কবির ইহাই বক্তব্য।

(৪) অসহায় জাতি মরিছে……সন্তান মোর মা'র। (স্তবক ৪)

এই অংশটি কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। কবি এই অংশে দেশনায়ককে সম্প্রাদায়িক ভেদাভেদ ভুলিয়া একনিষ্ঠ চিত্তে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

কর্ণধারহীন নৌকা যেমন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, ঠিক তেমনি বিচক্ষণ নেতার সুদক্ষ পরিচালনার অভাবে জাতি সংকটসমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছে। দেশবাসীর মধ্যে ধর্মের নামে দেখা দিয়াছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এই আত্মঘাতী ভেদ-বিবাদের মধ্যে জাতিকে পরিচালনার ভার যে নেতার উপর ন্যস্ত, তাঁহার পক্ষে আজ অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত। সকল ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠিয়া মাতৃস্বরূপা জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জনই তাঁহার ব্রত। এই ব্রতে প্রগাঢ় নিষ্ঠার দ্বারা দেশনায়ক জাতিকে হিন্দু-মুসলমান ভেদ-জ্ঞান ভুলাইয়া দিতে পারেন। আপনার হৃদয়ে আন্তরিক জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করিতে পারেন তিনি সকলের মধ্যে, এবং হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, কেবল বিপন্ন মানুষের উদ্ধারই যে আমাদের ব্রত—এই মহান্ ভাবে জাতিকে তিনি উদ্বোধিত করিতে পারেন। এ কাজ অতিশয় কঠিন সন্দেহ নাই। কঠিন বলিয়াই কবি জাতির কর্ণধারের প্রতি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

(৫) গিরিসংকট; ভীরু…… নিয়াছ যে মহাভার।' (স্তবক ৫)

এই অংশটি কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত। কবি জাতীয় জীবনের এক অতিশয় সংকটময় মুহূর্তের বর্ণনা করিতেছেন এবং সেই সংকটে অবিচলিত বিশ্বাসে অগ্রসর হইবার জন্য দেশনায়ককে অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

কবি জাতিকে মুক্তিপথের অভিযাত্রিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যাত্রাপথের একটি স্থলে কঠোরতা ও প্রতিরোধ যেন গিরিবর্ত্মের মতো দুর্গমতা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর আবার আকস্মিক কতকগুলি ভয়ংকর বিপদ্ অশনি-

নির্ঘোষের মতো অভিযাত্রী সৈনিকদিগের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে। পথশ্রমে ও হতাশায় ভগ্নহৃদয় হইয়া কেহ কেহ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের মনে জাতির মুক্তি-সম্বন্ধে যেন সন্দেহ জাগিয়াছে এবং সেই সন্দেহ তাহাদের সংগ্রাম-প্রেরণা স্তিমিত করিয়া দিতেছে। এই ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখে দেশনায়ককে বিশ্বাস হারাইলে চলিবে না। অচল নিষ্ঠায় আর অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। বিপুল সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহাকে ভগ্নোদ্যম জাতিকে সম্মুখে চালাইতেই হইবে। ইহাই তাঁহার একান্ত কর্তব্য। এই কর্তব্যের গুরুদায়িত্ব ভুলিলে চলিবে না, চলিবে না অর্ধপথে রণে ভঙ্গ দিলে।

(৬) কাণ্ডারী! তব সম্মুখে……খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। (স্তবক ৬)

এই অংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অভিযাত্রী জাতির সম্মুখে কবি এখানে একটি আশার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন।

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে পলাশীর রণাঙ্গনে বাঙালী তাহার স্বাধীনতা হারায়। বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক ক্লাইভ সেদিন অসংখ্য বাঙালীবীরের রক্তক্ষয় করিয়া ইংরেজশাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। ভারতের ভাগ্যরূপ সূর্য সেদিন সন্ধ্যায় পলাশীপ্রান্তরবর্তী গঙ্গার জলে অস্তমিত হয়। আজ দুইশত বৎসর পরে বহু দুর্গম বাধা উত্তীর্ণ হইয়া স্বাধীনতাকামী জাতি যেন সেই পলাশীরই প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি আসন্ন, কিন্তু ভবিষ্যতের এই যুদ্ধ ভারতের মুক্তি আনয়ন করিবে, পরাধীনতার কলঙ্কে মসীলিপ্ত পলাশীর ইতিহাস আগামী যুদ্ধের পর নূতন করিয়া লিখিত হইবে। দেশবাসীর অজস্র রক্তক্ষয়ে আবার আমরা স্বাধীনতা লাভ করিব, আবার ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য রক্তরঞ্জিত হইয়া নবযুগের সূচনা করিবে। দেশনায়কের সম্মুখে কবি এই আশার চিত্রটিই তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই আশায় আশান্বিত হইয়া প্রবল প্রেরণায় তিনি জাতিকে মুক্তিসংগ্রামে চালিত করুন, ইহাই কবির আকাঙ্ক্ষা।

(৭) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে ……কাণ্ডারী হুঁশিয়ার। (স্তবক ৭)

আলোচ্যমান পঙ্‌ক্তি কয়টি কবি নজরুল ইস্‌লামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' শীর্ষক কবিতার শেষ স্তবক। এই অংশে কবি স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদদিগের স্মৃতি

সম্মুখে স্থাপন করিয়া জাতিকে আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতেছেন এবং জাতির অধিনায়ককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

দেশের মুক্তির জন্য কত বীর ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই মহৎ ব্রতে আত্মবলি দিয়া তাঁহারা জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহাদিগকে মারিতে পারে নাই, বরং এরূপ গৌরবময় মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাঁহারা জাতির অমর জীবনের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ মৃত্যুতে যে জীবনের জয় সূচিত হয়, গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাহারই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন এই শহীদবৃন্দ। আজ তাঁহাদের অশরীরী আত্মা যেন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির মুক্তির জন্য তাঁহারা চাহেন আরো ত্যাগ, আরো আত্মবলি। তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী। তাই তাঁহাদের দাবি পূর্ণ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু দেশের জন্য নিজেকে মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে সমর্পণ বড সহজ কথা নয়। বিশেষ করিয়া জাতির স্বার্থে ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের ('জাতের') স্বার্থে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন আত্মত্যাগের পরীক্ষা সুকঠোর। এই সংকটের দিনে জাতির অধিনায়ক যেন সাবধান থাকেন, ইহাই কবির বক্তব্য।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় কবি নজরুল ইস্‌লাম যাহা বলিয়াছেন, তাহা রূপক ভাঙিয়া সরলভাবে প্রকাশ কর।

উ.। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় কবি নজরুল ইস্‌লাম মুক্তিকামী জাতিকে একটি বিশেষ পরিবেশ-কল্পনার মধ্যে অভিযাত্রী বাহিনীরূপে দেখিয়াছেন। মহাকাল সমুদ্রস্বরূপ। উহারই এক একটা অংশ এক একটা যুগ। সেইরূপ এই অংশে অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট যুগে আমাদের জাতিটি যেন নৌকারোহী যাত্রীর দল। আজিকার নবযুগ এক সংকটময় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জাতির দুর্ভাগ্য ও শতাব্দীর পরাধীনতার অন্ধকার যেন তামসী রাত্রির মতো ঘনঘোর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে পড়িয়া অগ্রগতির পথ আমরা ঠিক করিতে পারিতেছি না। এদিকে জাতীয় সংকটসমূহ ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝার আকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদের কাল, আমাদের জীবন তাই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ লাভ করিয়াছে। নৌকারোহী যাত্রিস্বরূপ জাতিকে এই সমুদ্রে পাড়ি দিতে হইবে। তাই বিচক্ষণ কর্ণধারস্বরূপ যিনি জাতির নেতা, তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনা চাই। নৌকায় মাঝি থাকে বহু, কর্ণধার একজন, দেশসেবকের সংখ্যা অগণ্য। ইহাদের তো সতর্ক হইতে হইবেই, নায়ককে সাবধান থাকিতে হইবে সর্বাধিক। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক-নির্বাচনে দেশের নায়ককে সর্বহারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত দেশবাসীর কথা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাদের মধ্যে যুগসঞ্চিত বিক্ষোভটিকে মুক্তি-সংগ্রামে নিয়োগ করিতে হইবে। জাতির আজ বড়ই দুর্দিন। অসীম সমুদ্রে নিমজ্জমান মানবের মতো তাহার অবস্থা। এই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকিলে চলিবে না। দেশ মাতা, আমরা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলে তাঁহার সন্তান। সকলেই আমরা মানুষ আর সকল মানুষই ভাই-ভাই। এই ভ্রাতৃত্ববোধ সংহত করিয়া জাতিকে বিপৎসঙ্কুল সংগ্রামের পথে চালিত করিতে হইবে। সাগরপারের অপর সীমায় হয়তো আরো সংকট আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। হয়তো দেখিব দুর্গম গিরিসংকটের মধ্যে বিসর্পিত আমাদের অগ্রগতির পথ। হয়তো তখন শতেক শঙ্কা আকাশের বুকে বজ্রহুংকারে জাগিবে। হয়তো তখন শ্রান্ত সৈনিকদলের কেহ কেহ সভয় সন্দেহে পিছাইয়া পড়িবে। যাহারা আগাইয়া যাইবে, তাহাদের মনেও হয়তো হতাশার কালো ছায়া কিছুটা বিস্তার লাভ করিবে। কিন্তু শুধু অধিনায়ক যদি তখনও অবিচল সংকল্পে অটুট থাকেন, তবে ভগ্নোদ্যম বাহিনীর মধ্যে তিনি আবার প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারিবেন। ক্রমে সংকট গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া আমরা সমতলে আসিয়া পড়িব। দুইশত বৎসর পূর্বে পলাশীর প্রান্তরে আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, আজ আমরা পলাশীর নূতন ইতিহাস রচনা করিব। একদা যেখানে ভারতের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয়, সেইখানেই আবার সৌভাগ্যের রক্তরাঙা তরুণ তপনের আবির্ভাব ঘটিবে। এই বিশ্বাস, এই প্রেরণায় বুক বাঁধিয়া আমাদের চলিতে হইবে। ফাঁসিকাষ্ঠে যাঁহারা দেশের জন্য আত্মবলি দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অশরীরী আত্মা যেন আমাদের নিকট আরো কিছু ত্যাগ দাবি করিতেছে। স্বাধীনতার জন্য চাই অকুণ্ঠ ত্যাগ, নির্ভীক আত্মবলি। এই ত্যাগের পথে, সংগ্রামের পথে আমাদের নেতা যেন সতর্ক পরিচালনা করেন—ইহাই কবির সাবধানবাণী।

প্র. ২। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির সার নিজের কথায় সংকলন কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ৩। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিচার করিয়া ইহার শীর্ষনাম সমর্থন কর।

উ.। নামকরণ দেখ।

প্র. ৪। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির যে সকল দিক ও বিষয় তোমার ভালো লাগিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখ।

অথবা

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির সম্বন্ধে একটি আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধিঃ দুস্তর = দুঃ + তর। পুনর্বার = পুনঃ + বার। পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা।

সমাসঃ রাত্রি-নিশীথে—রাত্রির নিশীথে অর্থাৎ মধ্যাংশ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। তিমিররাত্রি—তিমিরময়ী রাত্রি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মাতৃমন্ত্রী—মাতার অর্থাৎ মাতৃভক্তির মন্ত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহা আছে ইহাদের এই অর্থে মাতৃমন্ত্র + ইন্। যুগযুগান্তশঙ্কিত—যুগের অন্ত (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); যুগ হইতে যুগান্ত (বিনা অব্যয়ে অব্যয়ীভাব); তাহা ব্যাপিয়া শঙ্কিত (২য়া তৎপুরুষ)। মাতৃমুক্তিপণ—মাতার মুক্তি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার জন্য পণ (৪র্থী তৎপুরুষ)। গিরিসংকট—গিরির সংকট অর্থাৎ দুর্গম অঞ্চল (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর—পশ্চাৎস্থিত পথ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) তাহার যাত্রী (তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহার। দিবাকর—দিবা করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। জয়গান—জয়সূচক গান (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

সাধু শব্দ-রূপ: লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘন করিতে। ঘোষিয়াছে—ঘোষণা করিয়াছে। গরজায়—গর্জন করে। ত্যজিবে—ত্যাগ করিবে। উদিবে—উদিত হইবে। রাঙিয়া (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—রাঙা হইয়া। ইহাদেরে—ইহাদের অথবা ইহাদিগকে। জিজ্ঞাসে—জিজ্ঞাসা করে।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: দুর্গম—দুর্+গম্+খল্। হুঁশিয়ার—হুঁশ আছে অর্থে হুঁশ+ইয়ার। ফেনাইয়া—ফেন+আ (নামধাতু)+ইয়া। পুঞ্জিত—পুঞ্জ+ইতচ্ (জাতার্থে)। ত্যজিবে—ত্যজ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইবে। ফাঁসি—ফাঁস্+ই। উদিবে—উৎ—ই (সংস্কৃত ধাতু+ইবে)।

বাক্য-রচনা: কান্তার: গহন কান্তারে শ্বাপদকুলের বাস।

পারাবার: মৃত্যুর পারাবারেই কি সকল জীবনের পরিসমাপ্তি?

অলক্ষ্যে: পাপকাজ সকলের অলক্ষ্যে করা হইলেও ভগবানের দৃষ্টি এড়ায় না।

ব্যাকরণগত টীকা: লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘ্ (সংস্কৃত ধাতু)+ইতে; কেবলমাত্র পদ্যে ব্যবহৃত। কবিতাটিতে এইরূপ আরও প্রয়োগ 'ঘোষিয়াছে', 'উদিবে'।

ফেনাইয়া—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

সান্ত্রী—ইংরেজী 'sentry' শব্দের বাঙলা রূপ; বিদেশী শব্দ। অন্য বিদেশী শব্দ 'হিম্মৎ', 'খুন'।

জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্=জিজ্ঞাস্ (ধাতু); জিজ্ঞাস্+এ। অতএব এটি সনন্ত ক্রিয়াপদ (নামধাতু নয়)। কিন্তু এইজাতীয় ক্রিয়া কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।

গরজায়—গর্জ (বিশেষ্য)>গরজ (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি); গরজ+আ (নামধাতু)+এ।

রাঙিয়া—'রাঙা' বিশেষণ; ইহারই আ-প্রত্যয়টি লোপ করিয়া 'রাঙ্' নামধাতু হইয়াছে। রাঙ্+ইয়া=রাঙিয়া। ['রাঙাইয়া', এই নামধাতু 'রাঙ্' হইতেই আ-প্রত্যয়যোগে সৃষ্ট প্রেরণার্থক ধাতুজাত ক্রিয়া।]

গদ্যাংশ

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

বাঙলা গদ্যের সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু রূপের প্রবর্তক হিসাবে বিদ্যাসাগর সর্বজন-বরেণ্য। ইহার "জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে ভারসমতা আনিয়াছিলেন অক্ষয়-কুমার। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে আরোপ করিলেন লালিত্য এবং শ্রুতিমাধুর্য। বাঙ্গালা গদ্যের যথার্থ তাল বা rhythm আবিষ্কার করিয়া তদনুযায়ী বাক্যগঠন-রীতি প্রচলন করা বিদ্যাসাগরের অনুপম কীর্তি। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের স্রষ্টা না হইয়াও শুধু বাঙ্গালা গদ্যের সুষ্ঠু এবং ললিত রীতির প্রবর্তয়িতা বলিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরদিন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গৌরবের অধিকারী রহিবেন।"

"সংস্কৃত কবিগণের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহাই আধুনিক আদর্শে যুগপ্রবৃত্তির শাসনে সংযত হইয়া বাংলাভাষার নবরূপ নির্মাণের প্রেরণা হইয়াছিল; মধুসূদন দত্ত কান ও প্রাণের যে সাধনায় বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও আর এক পথে তেমনই সাধনার ফলে এই গদ্যচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।.........বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্তির অশেষ নিদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন।"— মোহিতলাল।

উৎস—কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের ছায়া অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় "শকুন্তলা" গ্রন্থ রচনা করেন। পাঠ্যাংশটি তাহা হইতে সংকলিত।

নামকরণ—আলোচ্যমান পাঠ্যাংশে কণ্বমুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা রহিয়াছে। এইজন্য উহার এইরূপ শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে।

সমালোচনা—যে ভাষা বাঙলা গদ্যের ভিত্তিস্বরূপ, আলোচ্যমান গদ্যাংশে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। গদ্যেরও যে একটা ছন্দ রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও যে ভাব তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় লীলায়িত রঙ্গে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে, বিদ্যাসাগরের এই রচনা তাহারই একটি আদি নিদর্শন।

এই গল্পাংশে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে ইহাতে স্ত্রীলোকের কথোপকথনের অংশটুকু অনেকটা লঘু—প্রায় প্রচলিত বাঙলা। কিন্তু কণ্ব বা শার্ঙ্গরবের ভাষা তুলনায় অনেক গুরু-গম্ভীর। ইহা লেখকের স্বাভাবিকতা-বোধেরই পরিচয় দেয়।

গল্পহিসাবেও ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুণ রহিয়াছে। অনুবাদ বা মূল যাহাই হউক, যে গল্প পাঠককে বর্তমানের কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া যুগান্তরে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, সেই গল্প বিশেষ প্রশংসার্হ। "শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা" পড়িবার সময় কোন্ এক জাদুমন্ত্রে যেন কালের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া একেবারে সাক্ষাৎ কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হই। কৃত্রিম পরিবেশে বর্ধিত এ-যুগের পাঠক তাই গল্পে পুরাকালের আশ্রমজীবনের পবিত্র আবহাওয়ার এক অপূর্ব রসাস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন।

পূর্বসূত্র—মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে লালিতপালিত হইয়া ক্রমে শকুন্তলা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। একদিন মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া একটি মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে মালিনীতীরে কণ্বের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। মহর্ষি তখন আশ্রমে ছিলেন না—শকুন্তলাকে অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত করিয়া তাহার গ্রহশান্তির জন্য সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। শকুন্তলাই রাজার যথোচিত পরিচর্যা করিলেন। শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ নৃপতি অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের দ্বারা ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হইল। তপোবনে ফিরিয়া কণ্ব এক দৈববাণী শুনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাহার পর, দুষ্মন্তের কথামত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজধানী হইতে রথ আসিল না দেখিয়া তিনি শকুন্তলাকে পদব্রজেই পতিগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সংক্ষিপ্তসার—শকুন্তলার পতিগৃহে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। তাঁহার সহিত যাইবেন গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে মহর্ষি কণ্বের দুই

শিষ্য। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাদের প্রিয়সখীকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া দিলেন। শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় স্নেহপ্রবণ মহর্ষির হৃদয় শোকাকুল, কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ। বনবাসী তপস্বী হইয়াও তিনি স্নেহের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই তিনি কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় গৃহীদিগের নিরতিশয় শোকের কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে শকুন্তলাকে আর বিলম্ব করিতে নিষেধ করিয়া তিনি সন্নিহিত তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিলেন এবং তাহাদের পরম অনুরাগিণী শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুমোদন করিতে বলিলেন।

গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া শকুন্তলা প্রাণসখী প্রিয়ংবদার নিকট গিয়া বলিলেন, দয়িতকে দেখিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেও তপোবন ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদাও শকুন্তলা-বিরহে তপোবনের জীবকুলের নিরানন্দ ও শোকাকুল অবস্থার প্রতি সখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

যাত্রার বিলম্ব দেখিয়া কণ্ব পুনরায় শকুন্তলাকে সত্বর হইতে বলিলে তিনি বলিলেন, বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। এই বলিয়া তিনি ভগিনীস্নেহে লালিত আশ্রমলতা বনতোষিণীর নিকট গিয়া বিদায় লইলেন এবং তাহার ভার তাঁহার সখীদ্বয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। সখীপরিত্যক্তা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহর্ষি ভর্ৎসনার স্বরে তাঁহাদিগকে শোক সংবরণ করিতে আদেশ দিলেন।

কুটীরপ্রান্তে শায়িতা একটি পূর্ণগর্ভা হরিণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শকুন্তলা তাহার নির্বিঘ্নে প্রসবের সংবাদ যথাসময়ে জানাইতে পিতাকে অনুরোধ করিলেন। কণ্ব বলিলেন, তিনি এ সংবাদ দিতে কখনই ভুলিবেন না।

শকুন্তলা কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটি মাতৃহীন হরিণশিশু বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। তিনি ফিরিয়া তাকাইতে কণ্ব বলিলেন, মাতৃবিয়োগ হইলে যাহাকে শকুন্তলা পরম স্নেহে নিজ সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিয়াছিলেন, সেই অসহায় হরিণশিশুই তাঁহার গমনে বাধা দিতেছে। শকুন্তলা সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে প্রবোধ দিতে গিয়া নিজেই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নানা কারণে বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব মহর্ষিকে বলিলেন, তিনি যেন আর অগ্রসর না হইয়া সেইখানেই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া দেন। তদনুসারে সকলে ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলে মহর্ষি দুষ্যন্তকে এই অনুরোধ জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার প্রতি শকুন্তলার স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরাগ এবং নিজ উচ্চ বংশমর্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া দুষ্যন্ত যেন অন্যান্য সহধর্মিণীর ন্যায় শকুন্তলার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখেন। পরে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া তিনি, পতিগৃহে গিয়া সপত্নী, দাসী এবং স্বামীর সহিত শকুন্তলাকে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর উপদেশ দিলেন। আর কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে গৌতমী বলিলেন, বধূদিগের পক্ষে এই উপদেশই যথেষ্ট। শকুন্তলা যেন ইহাই সযত্নে মনে রাখেন।

ইহার পর মহর্ষি শকুন্তলাকে বলিলেন আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইতে। শকুন্তলা অনুমতি চাহিলেন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে। কিন্তু উঁহারা উভয়েই অনূঢ়া বলিয়া মহর্ষি তাঁহাদের যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তবে তিনি গৌতমীকে শকুন্তলার সঙ্গে পাঠাইলেন। বিচ্ছেদ-বেদনায় শকুন্তলা ভাঙিয়া পড়িলেন, কণ্বের কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রভূত কাতর অশ্রু বর্ষণ করিলেন। মহাতপা কণ্বের নয়নযুগল বাষ্পাকুল হইল। তবু সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি বলিলেন যে শকুন্তলা একটা সংসারের গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হইতে যাইতেছেন। সংসারের কর্মব্যস্ততায় তাঁহার শোক নিশ্চয় অন্তর্হিত হইবে। তখন শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন কবে আবার তিনি সেই তপোবনে ফিরিয়া আসিবেন। মহর্ষি বুঝাইয়া বলিলেন, সংসারধর্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিয়া যথাকালে স্বামীর সহিত শকুন্তলা একদিন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। সেইদিন তপোবনের শান্ত পরিবেশে আবার তাঁহার পুনরাগমন হইবে।

বেলা হইয়া যাইতেছে। গৌতমীর কথায় তখন শকুন্তলা শেষ সম্ভাষণ করিতে সখীদিগের নিকট গেলেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহারা শকুন্তলাকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন, এবং রাজা যদি তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব করেন তবে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইতে বলিলেন। সখীরা এমন কথা কেন বলিলেন তাহা না বুঝিয়া শকুন্তলার ভীরু হৃদয়টি ভয়ে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সখীরা বলিলেন, ইহা কেবল স্নেহাতিশয্যবশেই তাঁহাদের অমূলক শঙ্কা, শকুন্তলার ভয়ের কারণ কিছু নাই।

সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ সমাপ্ত হইল। অতঃপর শকুন্তলা গৌতমী প্রভৃতির সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে দূরে তাঁহারা দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে আপন মনে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, গচ্ছিত ধন ধনস্বামীর হাতে ফিরাইয়া দিবারই ন্যায় শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া আজ তিনি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। **প্রস্থানসময়**—যাত্রা করিবার কাল, শকুন্তলার পতিগৃহে যাইবার সময়। শকুন্তলাকে প্রভাতকালেই পতিগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। **গৌতমী**—মহর্ষি কণ্বের ভগিনী। **শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত**—কণ্বের দুই শিষ্য। ইহাদের মধ্যে শার্ঙ্গরবই প্রধান। **শকুন্তলা**—(শকুন্ত- √লা+ক স্ত্রীলিঙ্গে আ) "মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন। মেনকাও সদ্যোজাত কন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন একটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী স্বীয় পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর মহামুনি কণ্ব বালিকাটিকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাইয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত কর্তৃক রক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়া বালিকার নাম শকুন্তলা রাখিলেন।" —স. বা. অ.। **সমভিব্যাহারে**—সঙ্গে, সহিত। **অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা**—শকুন্তলার প্রিয় সখীদ্বয়। ইহাদের দৈহিক রূপ, বয়স এবং মানসিকতা প্রায় শকুন্তলারই ন্যায়। **যথাসম্ভব**—এস্থলে যথাজ্ঞান, যতদূর জানিতেন ততদূর। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কখনও অলঙ্কার পরিধান করেন নাই। তথাপি চিত্রবিদ্যার সহিত পরিচয় ছিল বলিয়া কোন্ অঙ্গের কি অলঙ্কার তাহা জানিতেন। **বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন**—কাপড় পরাইয়া দিয়া অলঙ্কার যেখানে যেটি দিলে মানায় সেখানে সেটি পরাইয়া দিলেন। [পতিগৃহে যাইবার সময় শকুন্তলার বেশভূষার

মধ্যে ছিল পরনে রেশমের শাদা শাড়ী, পায়ে আলতা এবং অঙ্গে নানা রকমের অলঙ্কার। এগুলি কিন্তু তাঁহার নিজের নহে। পতিগৃহে যাইবার পূর্বে আশ্রমের কয়েকটি বৃক্ষ হইতে বিস্ময়জনকভাবে তিনি এগুলি উপহার স্বরূপ পাইয়াছিলেন।] **মহর্ষি**—কণ্ব, শকুন্তলার পালক-পিতা। মালিনী-নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। **উৎকণ্ঠিত**—ব্যাকুল, অস্বস্থ। **বাষ্পরাশি**—অশ্রু। **বাক্‌শক্তিরহিত**—কথা বলিবার ক্ষমতাবিহীন। **জড়তা**—অবসাদ, কর্মে অনুৎসাহ। **বনবাসী**—লোকালয় হইতে দূরে নির্জন অরণ্যে ধ্যানধারণায় কালযাপনশীল তপস্বী, অতএব গৃহীদের দুর্বলতা হইতে মুক্ত। **ঈদৃশ**—এইরূপ। **বৈক্লব্য**—কাতরতা, বিহ্বলতা, অধীরতা, চিত্তচাঞ্চল্য। **দুঃসহ**—অসহনীয়। **অদ্য শকুন্তলা……করিয়া থাকে**—এই অংশটি মূলের একটি শ্লোকের একপ্রকার হুবহু অনুবাদ। তুলনীয় :

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥"

বিষম—অসমান, স্থান-কাল-পাত্রভেদে মনের উপর বিপরীত প্রভাব বিস্তারকারী। **বুঝিলাম,……বস্তু**—যিনি স্নেহ করেন এবং যে স্নেহের পাত্র—ইহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিলে স্নেহ উভয়কেই পরম আনন্দদান করে, কিন্তু একে অপর হইতে দূরে সরিয়া গেলে এই স্নেহই উভয়ের অন্তর বেদনাতুর করিয়া তোলে। অতএব বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্নেহের কার্য পরস্পরবিরোধী। **অদ্য শকুন্তলা……বিষম বস্তু**—এই কথাগুলির মধ্যে মহর্ষি কণ্বের চরিত্রের পরিচয় রহিয়াছে। পালক-পিতা হইলেও শকুন্তলার প্রতি তাঁহার স্নেহ অকৃত্রিম। শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদে তাঁহার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত এবং বেদনাতুর হইলেও তিনি সাধারণ গৃহীর মতো নহেন। ঋষির ন্যায়ই তিনি ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাবাবেগের মুহূর্তেও এই যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি—ইহাই প্রকৃত ঋষির বৈশিষ্ট্য। **কালহরণ**—কালক্ষেপ, বিলম্ব। **সন্নিহিত**—নিকটবর্তী। **ভূষণ-প্রিয়া**—অলঙ্কার পরিতে যিনি ভালবাসেন। **পল্লবভঙ্গ করিতেন না**—পাতা ছিঁড়িতেন না। **কুসুমপ্রসব**—ফুল ফোটা।

সেই শকুন্তলা—তোমাদের প্রতি এতদূর অনুরাগিণী শকুন্তলা। অনুমোদন করো—সম্মতি দাও। হে সন্নিহিত ········অনুমোদন করো—তুলনীয় ঃ

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

"তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান ;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু ;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে ;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়॥—রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ।

অ ২। গাত্রোত্থান করিলেন—উঠিলেন। **আর্যপুত্রকে**—রাজা দুষ্মন্তকে। "সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বামীকে আর্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করার রীতি আছে।" ব্যগ্র—উৎসুক। নিরানন্দ—আনন্দহীন। **পরাঙ্মুখ**—বিমুখ, নিবৃত্ত। আম্রমুকুল—আমগাছের মঞ্জরী। মধুকর—ভ্রমর, মৌমাছি। **জীবমাত্রই··· পরিত্যাগ করিয়াছে**—এই অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সম্পর্ক কত নিবিড়। তপোবন ব্যতীত শকুন্তলা অসম্পূর্ণ এবং শকুন্তলা ব্যতীত তপোবনও অসম্পূর্ণ।

অ. ৩। **তাত**—পিতা এবং পূজ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ। **বনতোষিণী**—শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ের দ্বারা ভগিনীস্নেহে বর্ধিত আশ্রমের একটি লতা। মূলে আছে বনজ্যোৎস্না (বনজোসিণি)। সম্ভাষণ—বিদায়কালীন কথোপকথন। **শাখাবাহু**—শাখারূপ বাহু। দূরবর্তিনী—দূরাবস্থিতা। **সখি! আমাদিগকে······বলো**—এই বাক্যটির মধ্য দিয়াই শকুন্তলাবিরহে সখীদ্বয়ের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনার প্রকাশ হইয়াছে। প্রিয়-সখীকে বিদায় দিয়া তাঁহারা সত্যই নিরবলম্ব ও রিক্ত।

অ. ৪। প্রান্ত—শেষসীমা। **এই হরিণী নির্বিঘ্নে** ইত্যাদি—মনে রাখিতে হইবে শকুন্তলা নিজেও অন্তঃস্বত্বা। সম্ভবতঃ এইজন্যই গর্ভিণী হরিণীটির জন্য তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠা।

অ. ৫। কতিপয় পদ—কয়েক পা। **গতিভঙ্গ হইল**—গমনে বাধা পড়িল, গতি রুদ্ধ হইল। মাতৃবিয়োগ—মাতার মৃত্যু। **শ্যামাক**—একপ্রকার ধান্য। ইঙ্গুদি—একপ্রকার ফল। ইহার তৈল ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। **ব্রণশোষণ**—ক্ষতনিরাময়। **যাহার মাতৃবিয়োগ ………গতিরোধ করিতেছে**—তুলনীয় :

"যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥"—কালিদাস।

শেষ চরণটি ঠিক অনুগত না হইলেও মোটের উপর সুন্দর বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কৃত ইহার অনুবাদটিও দিলাম :

"ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হ'লে মুখে যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।"

গায়ে **হস্তপ্রদান করিয়া**—গায়ে হাতে বুলাইয়া। **রক্ষণাবেক্ষণ**—পালন ও তত্ত্বাবধান। অশ্রুবেগে—অশ্রুর প্রবাহে। পদক্ষেপ করাতে—পা ফেলাতে। **বৎসে! শান্ত হও,…আঘাত লাগিতেছে**—তুলনীয় :

"উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং
বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া বিরতানুবন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে
মার্গে পদানি খলু তে বিষমাভবন্তি॥"—কালিদাস।

অ. ৬। আপনকার—আপনার। **প্রতিগমন করুন**—প্রত্যাবর্তন করুন, ফিরিয়া যান। **ক্ষীরবৃক্ষ**—সম্ভবতঃ বটবৃক্ষ; ইহার পাতা ভাঙিলে দুধের ন্যায়

নির্যাস বাহির হয়। **অন্য বৃক্ষও হইতে পারে।** **আবেদন**—অনুরোধ। **অতি প্রধান বংশে**—দুষ্মন্তের জন্ম পৌরব বংশে। **বন্ধুবর্গের অগোচরে**—আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে। **স্বেচ্ছাক্রমে**—স্বেচ্ছায়, নিজ ইচ্ছায়। **অনুরাগিণী**—প্রণয়িনী, সমর্পিতচিত্তা। সহধর্মিণী—স্ত্রী। সেকালে রাজারা একাধিক বিবাহ করিতেন। **আমরা বনবাসী……… বলিয়া দিবার নয়**—তুলনীয় :

"অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলঞ্চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চতাম্।
সামান্য প্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ॥"

অ. ৭। **সন্দেশ**—বার্তা। **লৌকিক ব্যাপারে**—সাংসারিক বিষয়ে। অনভিজ্ঞ—অভিজ্ঞতাহীন। **শুশ্রূষা**—পরিচর্যা। **সপত্নী**—সতীন। পরিচারিণী—দাসী। **কার্কশ্য**—রূঢ় আচরণ, কর্কশতা। **রোষবশা**—ক্রোধের বশবর্তী, ক্রুদ্ধ। **প্রতিকূলচারিণী**—বিরুদ্ধাচারিণী। কুলের **কণ্টকস্বরূপ**—বংশের কাঁটার ন্যায় অর্থাৎ বংশের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশ ও অমর্যাদাকর। **তুমি পতিগৃহে গিয়া ………কুলের কণ্টকস্বরূপ**—তুলনীয় :

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ॥"—কালিদাস।

শকুন্তলার প্রতি এই উপদেশ এবং দুষ্মন্তের প্রতি বার্তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে মহর্ষি কণ্ব 'লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ' নহেন ; সাংসারিক জ্ঞানের দিক্ দিয়া এগুলি রত্ন। **দেখ, গৌতমীই বা** ইত্যাদি—নিজে সকল জানিয়াও গৌতমীর সমর্থনলাভের চেষ্টা, ইহা কণ্বের বিনয় সূচিত করিতেছে। **এই বই**—ইহা ছাড়া।

অ. ৮। সে পর্যন্ত—রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদ অবধি। **ইহাদের বিবাহ হয় নাই** ইত্যাদি—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার বিবাহ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে শকুন্তলার সহিত রাজসদনে যাওয়া দৃষ্টিকটু। তুলনীয় : "বৎসে, ইমে অপি দেয়ে" (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। গদ্গদস্বরে—বাষ্পাকুলকণ্ঠে, শোকের আবেগে

সজলকণ্ঠে। **অনুক্ষণ**—সর্বদা। সসাগরা ধরিত্রী—সাগরসহ পৃথিবী। একাধিপতি—একচ্ছত্র রাজা। দুষ্মন্তকে বুঝাইতেছে। অপ্রতিহত-প্রভাব—অবারিত প্রভাব-সম্পন্ন; যাঁহার প্রভাব বা শক্তি বিনা বাধায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে সেইরূপ ব্যক্তি। তনয়—পুত্র। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার এই পুত্রই বিশ্ববিখ্যাত রাজা ভরত। সন্নিবেশিত—অধিষ্ঠিত। তদীয়—তাহার। **শান্তরসাস্পদ**—শান্তরসের আশ্রয়। অনাবিল শান্তি ও শুচিতার পীঠস্থান বলিয়া তপোবনে ভোগলালসা, এক কথায় প্রবৃত্তির স্থান নাই। সেখানে আছে শুধু নিবৃত্তি ও সাম্যভাব। তাই তপোবন-জীবন শান্তরসের আশ্রয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে শান্ত নবম রস। ইহার লক্ষণ: "ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্বেষু ভাবেষু শমপ্রমাণঃ ॥" **শান্তরসাস্পদ·· আসিবে**—কণ্ব এই কথা-কয়টিতে বানপ্রস্থের ইঙ্গিত করিতেছেন। সেকালে মানুষ বার্ধক্যে যোগ্য পুত্রের হাতে সংসারভার অর্পণ করিয়া আশ্রমে গিয়া ধ্যানধারণায় আত্মনিয়োগ করিত। ইহারই নাম বানপ্রস্থ। প্রাচীনকালের চতুরাশ্রমের ইহা তৃতীয় পর্যায়।

অ. ৯। এক কালে—একসঙ্গে। কিয়ৎক্ষণ—কিছুকাল। **সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন** ইত্যাদি—এই উক্তির পিছনে একটু ইতিহাস আছে। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া শকুন্তলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তারপর তিনি রাজধানীতে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা একদিন স্বামিচিন্তায় অতিশয় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে কোপনস্বভাব দুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও শকুন্তলার ভাবস্বপ্ন ভাঙিল না। মুনি রাগিয়া গেলেন। অভিশাপ দিলেন—যাহার চিন্তায় শকুন্তলা এমন মগ্ন, স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। অনসূয়া দুর্বাসার এই ভীষণ অভিশাপ শুনিয়া যথেষ্ট মিনতি করিলেন। অবশেষে মুনির রাগ পড়িল। কিন্তু মুনির কথা তো বিফল হইতে পারে না। তাই তিনি বলিলেন যে শকুন্তলা যদি দুষ্মন্তকে কোনো স্মারক আভরণ দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার শাপ হইতে অব্যাহতি মিলিবে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার আঙ্গুলে একটি নিজের নামাঙ্কিত আঙটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। অনসূয়া এই আঙটিটিকেই যোগ্য অভিজ্ঞান বা স্মারক আভরণ বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্যাপারটা কেবল অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার মধ্যেই গোপন রহিল। শকুন্তলা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। এইখানে তাই শকুন্তলাকে রাজা না চিনিতেও পারেন এই ইঙ্গিতটি রহিয়াছে। শকুন্তলার মনের দিকে চাহিয়া সখীরা

ইহার চেয়ে বেশী স্পষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ এই সম্ভাবনার কথাটি খুলিয়া বলেন নাই। **স্বনামাঙ্কিত**—নিজের নাম খোদাই করা। **তোমরা এমন কথা বলিলে কেন** ইত্যাদি—শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বলিয়া রাজা তাঁহাকে না চিনিতেও পারেন এমন কথার অর্থ বুঝিলেন না। অথচ শঙ্কাটা যে একেবারেই অমূলক এমন দৃঢ় প্রত্যয়ও তাঁহার হৃদয়ে দেখা গেল না। আগামী ঘটনার ছায়া পড়ে মানুষের মনে (Coming events cast their shadows upon the mind); শকুন্তলার মনেও সত্যকার দুর্ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে। রাজা সত্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। শকুন্তলা রাজার নামাঙ্কিত আঙটিটি হারাইয়া ফেলিবেন। কাজেই দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। এই ঘটনারই ইঙ্গিত ফুটিয়াছে শকুন্তলার অজানা শঙ্কায়। ভাবী ঘটনার এইরূপ ইঙ্গিতকে বলে Dramatic irony বা নাটকীয় পূর্বাভাস। **স্নেহের স্বভাবই এই** ইত্যাদি—স্নেহ অর্থাৎ স্নেহপরবশ মন স্বভাবতঃই দুর্বল। স্নেহভাজনের অমঙ্গল আশঙ্কায় কারণে অকারণে স্নেহকারীর হৃদয় দুর্বল হইয়া থাকে। এখানে এই স্বভাবটির কথাই বলা হইতেছে। ইহার প্রসঙ্গ রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে না চিনিতেও পারেন—এই শঙ্কার কথা। শঙ্কাটি অমূলক ছিল না। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুর্বাসার অভিশাপ জানিতেন। কিন্তু শকুন্তলার নিকট সেকথা গোপন রাখিবার জন্যই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এখানে কথাটাকে ঘুরাইয়া একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতেছেন।

অ. ১০। স্থাপিত ধন—গচ্ছিত ধন। ধনস্বামী—টাকার মালিক। প্রত্যর্পিত হইলে—ফিরাইয়া দেওয়া হইলে। **স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে** ইত্যাদি—কথাকয়টি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর একটি শ্লোকের মর্মানুবাদ। **মূল শ্লোকটি এইরূপ :**

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥"

অর্থাৎ কন্যা পরধনস্বরূপ। তাহাকে আজ তাহার গ্রহীতা অর্থাৎ স্বামীর নিকট প্রেরণ করিয়া মুনি পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন। অপরের গচ্ছিত ধন অপরকে

ফিরাইয়া দিলে যেমন হৃদয় দায়মুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়, সেইরূপ স্বস্তি আসিয়াছে কণ্বর হৃদয়ে।

ব্যাখ্যা

(১) কী আশ্চর্য !·········অতিবিষম বস্তু। (অ. ১)

আলোচ্যমান অংশটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' পাঠ্যাংশের অন্তর্গত।

মহর্ষি কণ্বের আদরের দুলালী শকুন্তলা আজ আশ্রম ছাড়িয়া পতিগৃহে যাইবেন। পালিতা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করিয়া মহর্ষির হৃদয় আজ শোকাকুল ; এক অবর্ণনীয় অবসাদ তাঁহাকে নিতান্ত বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। তিনি বুঝিতেছেন, শকুন্তলার প্রতি স্নেহই তাঁহার এইরূপ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। মায়ামুক্ত বনবাসী তপস্বী হইয়াও তিনি স্নেহের প্রভাব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পবিত্র তপোবনে থাকিয়াও যে তপোবন-বিরুদ্ধ ভাব তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছে ইহাতে তিনি বিস্মিত। পালিতা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইতে তাঁহার ন্যায় তপস্বীরই যখন এইরূপ দুর্দশা, তখন ঔরস কন্যাকে বিদায় দিবার সময় গৃহীরা অবশ্যই অসহ্য মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। মহর্ষি বুঝিতে পারিয়াছেন, স্নেহই ইহার মূল কারণ। স্নেহ ক্ষেত্র এবং সময় বিশেষে মানুষের মনের উপর পরস্পরবিরোধী প্রভাব বিস্তার করে। যাহাদের মধ্যে স্নেহসম্পর্ক থাকে, পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিলে তাহারা স্নেহবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্য দিয়া পরম আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু একে অন্য হইতে দূরে সরিয়া গেলে উভয়েই অত্যন্ত মানসিক কষ্ট ভোগ করে। স্নেহ আছে বলিয়াই এইরূপ দুঃখানুভব হয়—নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয়ের বিরহে কেহই কষ্ট ভোগ করে না।

['বৈক্লব্য' কথাটির অর্থ লেখ]

(২) এই বলিয়া·······সকলে অনুমোদন করো। (অ. ১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত।

পালিতা কন্যা শকুন্তলার আসন্ন বিরহে নিজ অন্তরের গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিয়া মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের বৃক্ষগুলিকে সম্বোধন করিয়া শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুমোদন করিতে বলিলেন। শকুন্তলা আবাল্যপরিচিত

আশ্রম হইতে বিদায় লইতেছেন। আশ্রমের প্রতিটি বৃক্ষলতার সহিত তাঁহার হৃদয়ের একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। শকুন্তলা তাহাদের সকলের প্রতি পরম অনুরাগিণী ও স্নেহশীলা। স্নেহবশে তিনি বৃক্ষসেচন শেষ করিবার আগে জলপান করিতেন না। পুষ্পপল্লবের অলঙ্কার তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইলেও অলঙ্কারের জন্য পল্লবভঙ্গ করিয়া তিনি বৃক্ষগুলিকে বেদনা দিতে পারিতেন না। তাহাদের প্রথম পুষ্পোদ্‌গমের সময় উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত হর্ষ অনুভব করিতেন। তাই পরম স্নেহভাজন এই বৃক্ষগুলিও শকুন্তলার বিরহ-ব্যথা বোধ করিতেছে মনে করিয়া মহর্ষি তাহাদিগকে তাহার স্বামিগৃহে যাত্রার অনুমতি দিতে বলিয়াছেন। শকুন্তলা যে তপোবনেরই অঙ্গীভূত —তপোবনের মূক প্রকৃতির নিকট বিদায় না লইয়া তিনি পতিগৃহে যাইবেন কিরূপে?

[এই অংশটি যে সংস্কৃত শ্লোকের একপ্রকার গদ্যানুবাদ, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলে ভালো হয়।]

(৩) হরিণগণ আহারে-বিহারে…পরিত্যাগ করিয়াছে। (অ. ২)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'র এই অংশটিতে শকুন্তলার প্রাণসখী প্রিয়ংবদা শকুন্তলা-বিরহে তপোবনের জীবকুলের নিরানন্দ অবস্থার বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতি সখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আবাল্যপরিচিত তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে শকুন্তলাই যে কেবল বেদনা বোধ করিতেছেন এমন নহে—তপোবনের প্রতিটি প্রাণীই তাঁহার বিরহে কাতর। স্বভাবচঞ্চল হরিণগণ তাহাদের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া আছে। আহারে তাহাদের রুচি চলিয়া গিয়াছে—মুখের গ্রাস মুখ হইতে খসিয়া পড়িতেছে। অন্য দিনে যে ময়ুর-ময়ুরী গাছের ডালে ডালে ও কুটীর-প্রাঙ্গণে পরম আনন্দে নাচিয়া বেড়াইত, আজ তাহারা ঊর্ধ্বে মুখ করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। কোকিলগণ আর আম্রমুকুলের রসাস্বাদ করিতেছে না, তাহাদের মধুর স্বরলহরীতে তপোবন আজ আর মুখর হইতেছে না। ভ্রমরেরা ফুলে ফুলে মধু আহরণের চেষ্টা করিতেছে না এবং তাহাদের সুমিষ্ট গুঞ্জনধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে। এক কথায় তপোবনের জীবজগৎ যেন শকুন্তলার বিরহ-বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়াছে।

(৪) আমরা বনবাসী……বলিয়া দিবার নয়। (অ ৬)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' পাঠ্যাংশ হইতে ইহা উদ্ধৃত। এই অংশটি রাজা দুষ্মন্তের প্রতি মহর্ষি কণ্বের বার্তা।

শকুন্তলার সহযাত্রীদের অন্যতম, শিষ্য শার্ঙ্গরবের অনুরোধে কণ্ব ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া শিষ্যকে দুষ্মন্তের নিকট গিয়া এই বার্তা নিবেদন করিতে নির্দেশ দিলেন—আমরা অরণ্যে বাস করিয়া তপস্বীর জীবন যাপন করি। তুমিও অত্যন্ত উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বংশ-গুণে তুমি তোমার কর্তব্য কখনই বিস্মৃত হইতে পার না। শকুন্তলা তাহার আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতেই স্বেচ্ছায় তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। এইসকল কথা বিবেচনা করিয়া তোমার নিকট প্রেরিত শকুন্তলাকে তুমি স্নেহের চক্ষে দেখিবে। তোমার বহু পত্নী থাকিলেও এই স্নেহ তাহার প্রাপ্য। এইরূপ করিলেই তুমি তোমার সংযম, তোমার বংশগৌরব এবং তোমার প্রতি শকুন্তলার স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরাগ এ-সকলকেই তুল্য মর্যাদা দিতে পারিবে। বধূজনের আত্মীয়স্বজন এই পর্যন্তই অনুরোধ এবং কামনা করিতে পারে। ইহার বেশী অর্থাৎ অধিকতর গৌরব এবং স্নেহ, ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শকুন্তলার ভাগ্যে থাকিলে তাহা হইবে, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার কথা নয়। [এস্থলে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর মূল শ্লোকটি যথাযথ উদ্ধৃত করিবে।]

(৫) তুমি পতিগৃহে গিয়া ……কুলের কণ্টকস্বরূপ। (অ. ৭)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'র এই অংশটি স্বামিগৃহে প্রস্থানোদ্যত শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশ। কণ্ব শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'

পতিগৃহে গিয়া তুমি সযত্নে গুরুজনদিগের পরিচর্যা করিবে। সপত্নীগণ সাধারণতঃ ঈর্ষার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও তুমি তাহাদের সহিত এমন আচরণ করিবে যাহাতে তাহারা সকল সময়ে মনে করিতে পারে তুমি তাহাদের প্রিয় বন্ধু—সমভাবে তাহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী। দাসীজনের সহিত তুমি সর্বদা উদার ব্যবহার করিবে। সৌভাগ্যে গর্বিত হইবে না। স্বামী রূঢ় আচরণ করিলেও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া সর্বদা তাঁহার অনুগামী হইবে, ক্রোধের পরিবর্তে সুমধুর ব্যবহারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। যে সকল বধূ পতিগৃহে থাকিয়া সর্বদা

এরূপভাবে চলিতে পারে, তাহারাই গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব এবং মর্যাদা লাভ করে। বহুবল্লভ স্বামীর গৃহে দায়িত্ব এবং মর্যাদাই বধূজনের একান্ত কাম্য। কণ্টকাকীর্ণ পথে যেমন চলিতে পারা যায় না, স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী বধূদের দ্বারাও তেমন বংশের মর্যাদা রক্ষা হয় না।

[কালিদাসের শ্লোকটি এস্থলে সঠিক উদ্ধৃত কর।]

(৬) স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

(অ. ৯)

এই অংশটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'-শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবার জন্য উক্ত সখীদ্বয় আলোচ্যমান মন্তব্য করিয়াছেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা জানিতেন যে দুর্বাসার অভিশাপে রাজা দুষ্মন্ত, স্মরণ করাইয়া দিলেও, শকুন্তলাকে চিনিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র উপযুক্ত অভিজ্ঞান বা স্মারক চিহ্নস্বরূপ কোনো আভরণ দেখাইতে পারিলেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিবেন। দুষ্মন্তের একটি অঙ্গুরীয় শকুন্তলার হাতে ছিল, সুতরাং রাজার বিস্মরণকালে এই অঙ্গুরীয়টি দেখাইয়া যাহাতে শকুন্তলা আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, সেই ইঙ্গিতই ছিল অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার কথায়। কিন্তু শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপের কথা জানিতেন না; কাজেই এইরূপ অকারণ সাবধানবাণীর মর্ম না বুঝিয়া তিনি অজানা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তখন কাতরা শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবার জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। স্নেহপরবশ চিত্তের একটি সাধারণ দুর্বলতা এই যে, স্নেহভাজন-সম্বন্ধে তাহা সর্বদাই অমূলক ও অকারণ আশঙ্কা করিয়া থাকে। সেইজন্য অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, রাজা শকুন্তলাকে না চিনিতে পারেন এমন সম্ভাবনা-সম্বন্ধে যেন সেই অহেতুক সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আলোচ্যমান মন্তব্যে সখীদ্বয় এইভাবেই শকুন্তলাকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সত্য কথাটি গোপন করিবার উদ্দেশ্যই ইহার মধ্যে নিহিত।

(৭) স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে……নিরুদ্বেগ হইলাম। (অ. ১০)

এই অংশটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'-শীর্ষক

কাহিনীর অন্তর্গত। শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিয়া মহর্ষি কণ্ব কিরূপ দায়মুক্ত ও স্বস্তি বোধ করিলেন, এই অংশে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা পতিগৃহের অভিমুখে পা বাড়াইলেন। গভীর বিচ্ছেদবেদনার মধ্যেও কণ্ব একটি সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলেন। কন্যা অপরের গচ্ছিত ধনস্বরূপ, কয়েক বৎসর লালনপালন করিয়া তাহাকে স্বামীর হস্তে অর্পণ করিতেই হয়। যতদিন পর্যন্ত এইরূপ স্বামীর হস্তে কন্যাকে অর্পণ করা না হয়, ততদিন পিতা অতিশয় দায়গ্রস্ত থাকেন। কণ্বমুনিও তাই এতকাল শকুন্তলার দায়িত্ব বহন করিতেছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার দুশ্চিন্তাও কম ছিল না। বিশেষতঃ শকুন্তলা ছিলেন পালিতা কন্যা। কাজেই আজ যখন শকুন্তলা পতিগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন তখন তিনি শোকাকুল হইলেন বটে, কিন্তু সেই শোকের মধ্যেও অনেকটা নির্ভার ও দায়মুক্ত বোধ করিলেন। পরের টাকা গচ্ছিত রাখিলে তাহা লইয়া মানুষের দুশ্চিন্তাই হয় সার। নিজের টাকার বেলায় নিজের লাভ-লোকসান ও ক্ষয়-ক্ষতির জন্য কাহারও নিকটে কোনো লজ্জা পাইবার বা জবাবদিহি করিবার কারণ থাকে না, কিন্তু পরের টাকার কপর্দকও নষ্ট হইলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। সুতরাং এইরূপ গচ্ছিত ধনকে যেদিন কড়ায় গণ্ডায় নিকাশ করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায়, সেদিন মানুষ স্বভাবতঃই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। মহর্ষি কণ্বও আজ সেইরূপ স্বস্তিবোধ করিলেন। স্নেহের দুলালী শকুন্তলার বিচ্ছেদে ইহাই হইল তাঁহার পরম সান্ত্বনা।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। "শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা" পাঠ্যাংশের কোন্ দিকটা তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়? কারণ-সহ তোমার এই নির্বাচন সমর্থন কর।

উ। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কাহিনীটিতে প্রথমেই দেখিতে পাই তপোবন-জীবনের একটি রমণীয় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। লোকালয়ের বহু দূরে অবস্থিত ছায়ানিবিড় এই স্থানটি তরু-লতায় ফলে-ফুলে পবিত্রতার একখণ্ড

অনাবিল হাস্তের মতো উদ্ভাসিত। আর তাহারই মধ্যে মহর্ষি কণ্ব দেবকল্প মহত্ত্ব লইয়া যেন বিশাল বনস্পতির মতো দণ্ডায়মান। এই আশ্রমবাসীদের আচার-ব্যবহার এবং বাক্যালাপের মধ্যে এমন একটা শালীনতা এবং নৈতিক উৎকর্ষের পরিচয় রহিয়াছে, যাহা চিত্তকে সহজেই এক মহান্ ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। ক্ষীরপাদপের পাদমূলে দাঁড়াইয়া মহর্ষি কণ্ব যেকয়টি সংক্ষিপ্ত এবং মূল্যবান্ উপদেশ উচ্চারণ করেন, কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া এযুগেও তাহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

কিন্তু মহান্ যাহা তাহা হৃদয়কে বিস্ময় ও শ্রদ্ধাতেই মাত্র পূর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ। অন্তরের অন্তস্তলে অধিকতর গভীরভাবে রেখাপাত করে দৃশ্যটির করুণ আবেদন। এই কারণেই শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যে করুণ অংশটুকু আমার নিকট সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হয়।

শকুন্তলা চলিয়া যাইবেন। তাহাতে সমগ্র তপোবনটি বিয়োগব্যথায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। পশুপক্ষী, তরুলতা সকলেই শোকে মুহ্যমান। হরিণগণ তাহাদের আহার বিহার ত্যাগ করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে। ময়ুর-ময়ূরীর সহজ আনন্দস্ফূর্তি নাই, তাহাদের নৃত্য থামিয়া গিয়াছে, বিচ্ছেদবিধুর হৃদয়ে তাহারা উর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে। কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদ হইতে বিরত, তাহাদের সুমধুর কূজন নীরব হইয়া গিয়াছে। মধুকর-মধুকরী মধুপান ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের গুঞ্জনও থামিয়া গিয়াছে। অদূরে কুটীরের একপ্রান্তে আসন্নপ্রসবা এক হরিণী বিষণ্ণ চিত্তে শয়ান। সর্বত্র একটা বিষাদের করাল ছায়া এই তপোবনভূমিকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই দৃশ্যের মধ্যেই শকুন্তলা যাত্রা করিলেন। সহসা তাঁহার গতিভঙ্গ হইল। মাতৃহীন এক হরিণশিশু শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। শকুন্তলা ইহাকে মাতৃস্নেহে শৈশব অবধি লালনপালন করিয়াছেন। সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিয়া তিনি ইহাকে খাওয়াইতেন। কুশের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার মুখে ক্ষত হইলে ইঙ্গুদি তৈল-দ্বারা ব্রণশোষণ করিয়া দিতেন; তাই, তাঁহার চলিয়া যাইবার সময় এই একান্ত নিরাশ্রয় জীবটি তাঁহাকে পশ্চাতে আকর্ষণ করিবার বৃথা প্রয়াস করিতেছে। বস্তুতঃ, দৃশ্যটি এতই করুণ যে পাঠকের চিত্ত পর্যন্ত ব্যথাতুর হইয়া উঠে।

এই যে চেতন-অচেতন-নির্বিশেষে সমগ্র প্রকৃতির সহিত শকুন্তলার এরূপ হৃদয়সম্বন্ধ তাহা সত্যই মর্মস্পর্শী। কণ্বমুনি শোকে অভিভূত হইয়াছেন। ইহা মায়ামুক্ত মহর্ষির পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় হইলেও অস্বাভাবিক কিছুই নহে। কারণ, কণ্বমুনিও মানুষ, তাঁহারও পিতৃহৃদয় ব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? এমনকি সেই হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী ও কোকিল প্রভৃতি পশু-পক্ষীর হৃদয়-বেদনাও অনুভব করিতে পারি, কেননা তাহারা সচেতন জীব। কিন্তু অচেতন প্রকৃতিও যে বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা। ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপগর্ভে বাস করিয়া এবং নিজের চারিদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কঠিন আবরণ গড়িয়া এযুগের মানুষ আমরা শামুকের মতো নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয়স্পর্শে বহিঃপ্রকৃতিও যে একটা বিস্ময়কর সাড়ায় মর্মরিয়া উঠে, একথা এযুগে দুই-একটি মরমী কবিহৃদয় ছাড়া আর কেহ অনুভব করিতে পারে না। তাই ঐ যে অচেতন প্রকৃতি, ঐ যে বনতোষিণী যাহাকে আলিঙ্গন না করিয়া শকুন্তলা যাইতে পারিতেছেন না, ঐ যে তরুলতা যাহাদের মূলে জলসেচন না করিয়া তিনি কখনও জলগ্রহণ করিতেন না, যাহাদের কুসুম-প্রসবের সময় হইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না—সেই মূক প্রকৃতির বেদনাতুর ম্রিয়মাণ ছবিটি বিস্ময়ে করুণতায় আমার চিত্তকে সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে স্পর্শ করে।

প্র. ৩। শকুন্তলার প্রতি কণ্বমুনির উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এসকল উপদেশ আধুনিক যুগেও প্রযোজ্য কিনা বিচার কর।

উ.। পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্‌কালে শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্ব অতিশয় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উপদেশ দেন। তাহার মর্ম এইরূপ : গুরুজনের প্রতি সেবা, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার এবং পরিচারিকাদিগের প্রতি সদয় আচরণ—এসকল বধূদের প্রধান কর্তব্য। সৌভাগ্যগর্ব পরিহার করিতে হইবে এবং স্বামী কর্কশ আচরণ করিলেও, তাঁহার প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যথা সংসারের সুখ নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বামীর প্রতিকূল আচরণ যাঁহারা করেন তাঁহারা সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব আত্মসাৎ করিতে পারেন বটে, কিন্তু স্বামীর সোহাগে বঞ্চিত হন এবং পরিবারস্থ সকলের নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। বধূদের প্রতি নির্দিষ্ট আচরণ পালন না করিলে স্ত্রীলোক কুলের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠেন।

কণ্বমুনির উপদেশ সংক্ষেপে ইহাই। এযুগেও এসকল উপদেশ বধূদের পালন-যোগ্য কিনা সে অবশ্যই বিসংবাদিত প্রশ্ন। কারণ, উপদেশমাত্রই একটা বিশিষ্ট আদর্শের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ভারতীয় একটা সনাতন আদর্শের কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। কিন্তু এযুগেও সে আদর্শ অব্যাহত এবং অবিকৃত রহিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব আমাদের জীবনযাত্রার উপর যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং আমাদের আত্মীয়-পরিজনসহকারে একান্নভুক্ত বিশাল পরিবারগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া আবার নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। মূলকথা, আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে জীবনধারণ করিতেছি, আমাদের জীবনাদর্শ আবার নূতনরূপে পুরাতনে-নূতনে গড়িয়া উঠিতেছে। অতএব এই সন্ধিক্ষণে আলোচ্যমান উপদেশগুলি বধূদের অবশ্য পালনীয় বলিলে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারবাদী অনেক স্বাধীনতাপন্থী মহিলা হয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন। কিন্তু সে শঙ্কা-সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে এবং এই উত্তরপত্রে আমাদের পক্ষে তাহা নথিবদ্ধও করিতে হইবে। অতএব ধরিয়া লওয়া গেল, অন্তঃপুরই স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কার্যক্ষেত্র। সেখানে স্ত্রীলোক সেবাতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত, অন্ততঃ অতিশয় বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীলোক মাতা এবং রমণী—যুগপৎ এই দুইটি রূপেই আমাদের মধ্যে বিরাজ করেন। রমণীরূপে স্বামীর নিকট সর্বতোভাবে রমণীয় হইয়া উঠিবেন—এ চেষ্টা অবশ্যই তাঁহার সর্বদা থাকা উচিত। স্বামীর দৈবাৎ অন্যায় আচরণের প্রতিদানে প্রতিষেধকহিসাবে মিষ্ট ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। অন্যায়ের প্রতিবাদ হয়তো করা উচিত কিন্তু তাহাও এমন মিষ্টতাসহকারে সময় বুঝিয়া করা যায় যাহাতে অন্তঃপুরে গজকচ্ছপের তাণ্ডব অনিবার্য হইয়া না উঠে। সুতরাং স্বামীর প্রতি আচরণের নিদেশ কণ্বমুনি যাহা দিয়াছেন তাহা এযুগের বধূদের পক্ষে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি। পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি আচরণের যে নির্দেশ তিনি দিয়াছেন তাহার অধিকাংশ এযুগে আরও বিশেষভাবে পালনযোগ্য। গর্বোদ্ধত ব্যবহার এবং পরিচারিণীদের প্রতি রূঢ়তা—এই দুইটি যে অবশ্যবর্জনীয় সে সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। বাকী রহিল কেবল গুরুজনের প্রতি সেবাশুশ্রূষার কথা। যেকালে নিম্নসাধারণের মধ্যে পর্যন্ত 'পরিবার' শব্দটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, সেকালে অনেক নবপরিণীতার নিকট নীতিটি মনঃপূত না হইবারই কথা (ইংরেজীর অনুকরণে family = পরিবার = wife)। আত্মীয়পরিজন

বিহনে স্বতন্ত্রভাবে শহরের কোনো এক কুঠুরির মধ্যে নীড় বাঁধিয়া "কপোত কপোতী যথা" অবস্থান করিবার আকাঙ্ক্ষা কাহার হৃদয়ে না জাগে? কিন্তু তথাপি বলিতে হয় এ আদর্শটি এদেশের মাটির সহিত সম্পর্কশূন্য। ইউরোপের স্ত্রীলোক প্রধানতঃ রমণী, আর আমাদের দেশের স্ত্রীলোক প্রধানতঃ মাতা। তাঁহার সেবাপরায়ণ স্নিগ্ধ করস্পর্শ গুরুজনদিগকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে বৃহত্তর পরিধি ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে—ইহাই অতি সুন্দর। অতএব বধূদের প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশের প্রথমাংশটুকুও এযুগে পালনযোগ্য—ইহাই আমাদের সুচিন্তিত মত। সপত্নীদের সহিত প্রিয়সখীব্যবহারের প্রশ্নটি এযুগে তেমন গুরুতর নহে, কারণ বহুবিবাহপ্রথা একপ্রকার লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

প্র. ৪। "মহিলারা এইরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ।"—এই উদ্ধৃত অংশে কিরূপ ব্যবহারের কথা বুঝাইতেছে? এইরূপ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি? বর্তমান সমাজে উহার কোনো ব্যতিক্রম দেখিয়াছ কি না? (ক. বি. ১৯৪২)

উ.। আলোচ্যমান প্রশ্নের উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত 'ব্যবহার' দ্বারা বধূদের প্রকৃষ্ট ব্যবহারের কথাই বুঝাইতেছে। গুরুজনদের প্রতি সেবা, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার, দাসদাসীর প্রতি সদয় আচরণ, সৌভাগ্যগর্ব পরিহার এবং কর্কশ আচরণ করিলেও স্বামীর প্রতি অনুকূল ব্যবহার—বধূদের পক্ষে এরূপ আচরণ বিশেষ প্রশংসনীয়।

পারিবারিক জীবনকে মধুর ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য বধূদের পক্ষে এরূপ আচরণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোক প্রধানতঃ মাতা, সেবাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। গুরুজনদিগকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সেবাযত্ন ক্রমে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়ে। আধুনিক পরিবারগুলি অবশ্য ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে। এদেশের প্রাচীন আদর্শটি একেবারে নির্বাসিত হইতে পারে না। এই কারণে গুরুজনের প্রতি সেবাপরায়ণ ব্যবহার বধূদের এখনও অবশ্য কর্তব্য। নচেৎ সংসারে সুখ নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহারের কথা এযুগে উঠে না; কারণ, বহুবিবাহপ্রথা লুপ্তপ্রায়। দাসদাসীর প্রতি সদয়

আচরণ করার কি প্রয়োজনীয়তা সে-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলাই বাহুল্য এবং সৌভাগ্যগর্ব পরিহার না করিলে পরিবার-জীবন যে নানাদিক্ দিয়াই বিষময় হইয়া উঠে ইহাও সর্বজনবিদিত। স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও স্ত্রীর সুমিষ্ট ব্যবহারই ফলপ্রদ মনে করি। অন্যায়ের প্রতিবাদ হয়তো করা সঙ্গত, কিন্তু তাহা স্বামীর প্রতিকূল আচরণ না করিয়াও করা চলে। অন্যথা শান্তিময় গৃহকোণ রণাঙ্গনে পরিণত হয়, সকল সুখ ক্রমে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

এসকল নীতির কথা বহুপ্রচলিত ও বহুকালপ্রচলিত থাকা-সত্ত্বেও প্রায়ই ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। এই ব্যতিক্রম যে কেবল এ-যুগেই হইতেছে তাহা নহে, অল্পবিস্তর সকল যুগেই হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে হইবে একথা অবধারিত। তবে সাধারণতঃ প্রতিযুগেই কণ্বমুনির উপদিষ্ট আচরণের আদর্শটি মোটামুটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমান সমাজে এই আদর্শটির সম্বন্ধেই যেন প্রশ্ন জাগিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বামীর প্রতি বধূর ব্যবহারের কথা ধরা যাউক। এ যুগে স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় পরিবারের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সমান স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। কাজেই স্বামীর অন্যায় বিনা প্রতিবাদে স্ত্রী মানিয়া লন না, ইহাতে স্বামীর প্রতিকূলে যাইতে হইলেও তিনি কুণ্ঠিতা নহেন। দ্বিতীয়তঃ গুরুজনের প্রতি সেবার আদর্শটি ক্রমেই অতীতের বস্তু হইয়া উঠিতেছে; কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে এযুগের নরনারী গুরুজনাদি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াই দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিতে অধিকতর লালায়িত। গুরুজনের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করিবার কর্তব্যবোধ অধিকাংশ আধুনিকার নাই—অন্ততঃ ইহা তাঁহাদের নিকট যে মুখ্যস্থান লাভ করে না একথা অতিশয় সত্য। নিন্দার কথা হইতেছে না; যুগধর্মের অমোঘ শাসনে পুরাতন আদর্শটির যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহাই মাত্র বলা হইল।

প্র. ৫। তোমার পঠিত প্রবন্ধ হইতে শকুন্তলার স্নেহমমতার কথা বিবৃত কর এবং মহর্ষি কণ্বের লৌকিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর।

উ.। (ক) শকুন্তলার স্নেহমমতার সীমাহীন দৃষ্টান্ত 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' প্রবন্ধটির অধিকাংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; চেতন-অচেতন-নির্বিশেষে তপোবনের প্রতিটি তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত পর্যন্ত তাঁহার এক নিবিড় হৃদয়সম্বন্ধ গড়িয়া

উঠিয়াছিল। তরুমূলে জলসেচন ছিল তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস। কিন্তু ইহা তাহার খেয়ালমাত্র নহে। ইহার মূলে ছিল সেই তরুলতার প্রতি একটা প্রগাঢ় মাতৃস্নেহ। তাই তাহাদের মূলে জলসেচন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না; তাঁহাদের কুসুমপ্রসবের সময় হইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। বনের পশুকে ধরিয়া তিনি মাতৃস্নেহে লালন-পালন করিতেন। কোথাকার কোন্ এক মাতৃহীন মৃগশিশু একদা তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। শ্যামাক আহরণ করিয়া তিনি তাহাকে আহার করাইতেন। কুশাগ্রে ক্ষত হইলে ইঙ্গুদিতৈলদ্বারা তাহার মুখের ব্রণ শোষণ করিয়া দিতেন। এইরূপই ছিল তাঁহার স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ হৃদয়। তাই, তিনি যখন পতিগৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন তখন দেখিতে পাই বিচ্ছেদব্যথায় সমগ্র বনভূমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। হরিণগণ আহার ভুলিয়া স্থির হইয়া আছে—মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে। ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য ত্যাগ করিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। কোকিলগণ নীরব, আম্রমুকুলেও তাহাদের আর রুচি নাই। মধুকর-মধুকরীর নিকট মধু কটু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের গুঞ্জনও থামিয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন। মমতাময় হৃদয় তাঁহার অজস্র ক্রন্দনে উৎসারিত হইতেছে। তথাপি যাইতে হইবে। কিন্তু ভগিনীপ্রতিম বনতোষিণীকে একবার আলিঙ্গন না করিয়া তিনি যাইতে পারেন নাই। যাওয়া তো বাস্তবিক এত সহজও নয়। অপত্যস্নেহে লালিত সেই মাতৃহীন মৃগশিশু বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া পশ্চাতে টানে। অব্যক্ত ভাষায় মূক জীবের প্রাণের কথা "যেতে নাহি দিব" শকুন্তলাকে বিহ্বল করিয়া দেয়।

শেষপর্যন্ত অবশ্য শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদায়ের বর্ণনাতীত করুণতার মধ্যে তাঁহার স্নেহমমতার তুলনাহীন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

(খ) আলোচ্যমান প্রবন্ধের শেষাংশে যে উপদেশ বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে কণ্বমুনির লৌকিক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাই। মহর্ষি কণ্ব বনবাসী। গুরুজন, পরিজন ও দাসদাসী লইয়া জীবনযাত্রার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় না থাকারই কথা; কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বধূদের কর্তব্য গুরুজনের সেবা, সপত্নীদের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার, দাসদাসীর প্রতি সদয় আচরণ, সৌভাগ্যগর্ব পরিহার এবং কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও

স্বামীর প্রতিকূল আচরণে বিরত থাকা। গৌতমী বলিয়াছেন, ইহার অধিক বধূদের কিছু বলিবার নাই। লৌকিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিও নিশ্চয় এবিষয়ে দ্বিমত হইতে পারেন না। দুষ্মন্তের প্রতি মহর্ষি কণ্ব যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাও অনুরূপ লৌকিক অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। দুষ্মন্তের বংশগৌরব এবং তাঁহার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগ স্মরণ করাইয়া দিয়া মহর্ষি কেবল শকুন্তলার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতে আবেদন করিয়াছেন। ইহার অধিক বিধাতার বিধেয়, কণ্বমুনি সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন নাই। লৌকিক ব্যাপারে পূর্ণ-অভিজ্ঞ পিতাও কন্যাসম্বন্ধে এইরূপই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

কণ্বের লৌকিক অভিজ্ঞতার অপর একটি দৃষ্টান্ত পাই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সহিত গমনে অসম্মতি জ্ঞাপনের মধ্যে। অনূঢ়া তরুণীকে এইরূপভাবে অপরিচিত স্থানে, বিশেষতঃ রাজপ্রাসাদে প্রেরণ বাস্তবিক শোভন নয়। মহর্ষির উক্তি তাই তাঁহার গভীর সমাজ ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানেরই পরিচায়ক।

তৃতীয়তঃ, শোকাকুল শকুন্তলার প্রতি একটি প্রবোধবাক্যও কণ্বমুনির লৌকিক জীবনসম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট। সংসার এমনই স্থান যে সেখানে দায়িত্ব ও জটিলতায় মানুষ একেবারে ডুবিয়া যায়। সেই কারণে বিচ্ছেদব্যথা সেখানে স্থায়ী হইতে পারে না। শকুন্তলা একটা রাজ-পরিবারের গৃহিণী হইতে যাইতেছেন। অতএব সংসারের কাজেই তাঁহার শোক অপনীত হইবে। ঋষির এই কথার মধ্যেও লৌকিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে।

প্র. ৬। "বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।"

(ক) কোন্ প্রসঙ্গে কাহার এই উক্তি?

(খ) বক্তা কি অর্থে স্নেহ অতি বিষম বস্তু—এই কথা বুঝিয়াছেন?

উ.। (ক) মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় অত্যন্ত কাতরতা বোধ করেন। নিজের এই বিহ্বল অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি এই উক্তি করেন।

(খ) মহর্ষি বনবাসী, ঋষি। শকুন্তলাও তাঁহার পালিতা কন্যামাত্র। তথাপি এই কন্যারই বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তিনি অস্থিরতা বোধ করিতেছেন। চক্ষু তাঁহার অবিরল অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হয়; শোকাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসে, মুখে কথা সরে না। বিহ্বল জড়তায় তাঁহাকে যেন আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় মহর্ষি আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঋষি, মায়ামমতার প্রভাব গৃহীর চেয়ে তাঁহার

উপর অনেক কম হইবেই। আত্মসংযম ও সাধনাবলে মোহ ও সংস্কার হইতে তিনি উর্ধ্বে। অথচ স্নেহের প্রভাবে তিনিও কাতর হইতেছেন। ইহা হইতে সহজেই তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে, এ অবস্থায় গৃহীর বেদনা আরও সাংঘাতিক হইবে। সুতরাং স্নেহ যে সুখেরই মূল তাহা নহে, ক্ষেত্রবিশেষে উহা পরম বেদনারও হেতু। কখনও কখনও স্নেহ তাহা হইতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এই অর্থে উহা বিষম। আবার দুঃখ এবং সুখ উভয় দিকেই প্রভাব আছে বলিয়া স্নেহের প্রভাব বিষম অর্থাৎ অসমান বা পরস্পর-বিরোধী। উভয় অর্থেই মহর্ষি স্নেহকে বিষম বুঝিয়া থাকিবেন।

প্র. ৭। "যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।"

(ক) এই কথা কে, কখন, কাহাকে এবং কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছিল? (খ) ইহার পশ্চাতে কি কারণ ছিল? (গ) এই কথা বলায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কি প্রক্রিয়া দেখা যায় এবং সেই সময়ই বা বক্তা কি বলেন?

উ.। (ক) অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে তাঁহার পতিগৃহে যাত্রার সময় এই কথা বলেন। প্রসঙ্গ—বিদায়-সম্ভাষণ। বিচ্ছেদের জন্য প্রত্যেকেই তখন শোকার্ত। ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস কমিলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রিয়সখীকে এই কথা বলিলেন,—আপাত-দৃষ্টিতে সাধারণ সাবধানবাণী হিসাবেই।

(খ) কিন্তু ইহার পশ্চাতে একটা গূঢ় কারণ অবশ্যই ছিল। একদিন মহামুনি দুর্বাসা কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। শকুন্তলা তখন দুষ্মন্তের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এবং সেইজন্য দুর্বাসামুনির অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। মুনি কুপিত হইয়া শকুন্তলাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যাঁহার চিন্তায় তিনি মগ্ন সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে চিনিতে পারিবেন না। শকুন্তলা এই অভিশাপের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রমাদ গণিলেন, মুনিকে অনেক অনুনয় করিলেন। অবশেষে মুনি একটু সদয় হইলেন এবং এই কথা বলিলেন যে, কোনো স্মারক চিহ্ন দেখাইতে পারিলে রাজা শকুন্তলাকে চিনিবেন। এইজন্যই সখীদ্বয় শকুন্তলার প্রতি উদ্ধৃত উক্তি করিলেন।

(গ) শকুন্তলা এই উক্তি শুনিবামাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন। রাজা চিনিতে পারিবেন না—এমন সম্ভাবনাও হইতে পারে? শকুন্তলা একথা কল্পনাও করিতে

পারেন না। তাই অশুভ সাবধানবাণী তাঁহার উপর এক অতিশয় ভীতিপ্রদ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সখীদ্বয় তখন তাঁহার ভয় ভাঙাইবার জন্য সচেষ্ট হন। বলেন যে—ও যেন একটা কথার কথা। স্নেহভাজনের সম্বন্ধে মানুষ খারাপটাই বেশী ভাবে। সেইজন্যই তাঁহারা এমনিতেই ঐরূপ শঙ্কার কথা বলিয়াছেন। এইভাবে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রকৃত সত্যটি চাপিয়া যান।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: আশ্চর্য = আ + চর্য। সংবরণ = সম্ + বরণ। সন্নিহিত = সম্ + নিহিত। প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা। ব্যগ্র = বি + অগ্র। নিরানন্দ = নিঃ (নির্) + আনন্দ। পরাঙ্মুখ = পরাক্ + মুখ। নীরব = নিঃ + রব। রক্ষণাবেক্ষণ = রক্ষণ + অবেক্ষণ। তপোবন = তপঃ + বন। বহির্ভূত = বহিঃ + ভূত। প্রত্যর্পিত = প্রতি + অর্পিত। নিরুদ্‌বেগ = নিঃ + উদ্‌বেগ।

প্রশ্ন: 'দুষ্মন্তরাজধানী-উদ্দেশে', কথাটিতে সমাস থাকা সত্ত্বেও সন্ধি করা হয় নাই কেন ?

উত্তর: শ্রুতিকটুতার জন্য সন্ধি করা হয় নাই।

সমাস: যথাসম্ভব—সম্ভবকে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব) অথবা যথা সম্ভব (সুপ্‌সুপা)। বাক্‌শক্তিরহিত—বাক্ উচ্চারণের শক্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার দ্বারা রহিত (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। বনবাসী—বনে বাস করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। তপোবনতরুদিগকে—তপঃ অর্থাৎ তপস্যার জন্য বন (চতুর্থীতৎপুরুষ, সংস্কৃতমতে তাদর্থ্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তপোবনজাত তরুগুলি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাদিগকে। ভূষণপ্রিয়া—প্রিয় ভূষণ যাহার অর্থাৎ যে-নারীর (বহুব্রীহি), সে। প্রিয়ংবদা—প্রিয় (কথা) বলে যে নারী (উপপদ-তৎপুরুষ)। নিরানন্দ—নিঃ (= নাই) আনন্দ যাহার (বহুব্রীহি), সে। পরাঙ্মুখ—পরাক্ মুখ যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা। ঊর্ধ্বমুখ—ঊর্ধ্ব মুখ যাহার (বহুব্রীহি), সে। শাখাবাহু—শাখারূপ বাহু (রূপক কর্মধারয়)। মাতৃহীন—মাতার দ্বারা হীন (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। রক্ষণাবেক্ষণ—রক্ষণ এবং অবেক্ষণ (দ্বন্দ্ব)। স্বেচ্ছাক্রমে—স্ব অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার ক্রম

(ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। স্নেহদৃষ্টি—স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সপত্নীদিগের—সমান পতি যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহাদের। অনুক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে (অব্যয়ীভাব)। সসাগরা—সাগরের সহিত বর্তমান (বহুব্রীহি, তুল্যযোগে)। একাধিপতির—এক অধিপতি (কর্মধারয়, দ্বিগু নয়), তাহার। অপ্রতিহতপ্রভাব—প্রকৃষ্ট ভাব প্রভাব (প্রাদিতৎপুরুষ); নয় প্রতিহত (নঞ্-তৎপুরুষ); প্রতিহত প্রভাব যাহার (বহুব্রীহি), সে। স্বনামাঙ্কিত—স্ব-র অর্থাৎ নিজের নাম (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা অঙ্কিত অর্থাৎ চিহ্নিত (তৃয়াতৎপুরুষ)। নিরুদ্বেগ—নিঃ (= নাই) উদ্বেগ যাহার (বহুব্রীহি), সে।

সমস্ত পদ-গঠন : প্রশ্ন : 'পল্লবভঙ্গ' শব্দটির অনুকরণে 'ভঙ্গ'-কে উত্তরপদ করিয়া কয়েকটি সমস্তপদ গঠন কর।

উত্তর : প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ধনুর্ভঙ্গ, স্বরভঙ্গ, ধ্যানভঙ্গ, গতিভঙ্গ, নিদ্রাভঙ্গ, রসভঙ্গ, সভাভঙ্গ, মোহভঙ্গ।

[এইরূপে গঠিত সমস্তপদকে লইয়া বাক্য-রচনা অভ্যাস করিতে হইবে।]

'দৃষ্টিপাত'-এর অনুকরণে 'পাত' উত্তরপদরূপে : দেহপাত, বজ্রপাত, কর্ণপাত, ইন্দ্রপাত, নেত্রপাত, অশ্রুপাত।

'গতিরোধ'-এর অনুকরণে 'রোধ' উত্তরপদরূপে : কণ্ঠরোধ, বাক্‌রোধ, শ্বাস-রোধ।

'মাতৃহীন'-এর অনুকরণে 'মাতৃ' পূর্বপদরূপে : মাতৃভূমি, মাতৃস্নেহ, মাতৃবাক্য, মাতৃহন্তা, মাতৃভক্তি।

'ধনস্বামী'-র অনুকরণে 'ধন' পূর্বপদরূপে : ধনকুবের, ধনাঢ্য, ধনধান্য, ধনপতি, ধনরত্ন, ধনরাশি, ধনাভাব, ধননাশ, ধনলোভ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : সমভিব্যাহার—সম্ + অভি + বি + আ— হৃ + ঘঞ্। উৎকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠা + ইতচ্। পরিপূরিত—পরি— পূর্ + ক্ত। বৈক্লব্য—বিক্লব + ষ্যঞ্। দুঃসহ—দুর্—সহ্ + খল্। সন্নিহিত—সম্ + নি—ধা + ক্ত। সমর্পণ—সম্—ঋ + ণিচ্ + ল্যুট্। দণ্ডায়মান—দণ্ড + ক্যঙ্ (নাম ধাতু) + শানচ্। শুশ্রূষা—শ্রু + সন্ + অ + স্ত্রীলিঙ্গে আ। দাক্ষিণ্য—দক্ষিণ + ষ্যঞ্। সন্নিবেশিত—সম্ + নি—বিশ্ + ণিচ্ + ক্ত।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : 'পা উঠিতেছে না'—এখানে 'উঠা' ক্রিয়াটির অর্থ 'উত্থান' নয় ; তাই 'উঠা'-র প্রয়োগ এখানে বিশিষ্টার্থক।

প্রশ্ন : 'উঠা' ক্রিয়াটির আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : ছেলেটির চোখ উঠেছে। চালের বাজার (বা দাম) উঠেছে। আজকাল যাত্রার দল করিয়া খরচ উঠে না। এত পেয়েও তোমার মন উঠে না। এই বাড়ীতে তোমার অন্ন উঠেছে।

প্রশ্ন : 'ভালো দেখায় না' বাক্যাংশটির অর্থ নির্দেশ করিয়া ইহাকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

উত্তর : ভালো দেখায় না — সমীচীন বা সঙ্গত হয় না।

শুধু-হাতে বৌভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া ভালো দেখায় না।

প্রশ্ন : 'পড়িয়া যাইতেছে' ক্রিয়াটিকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ কর।

উত্তর : বর্তমানে আলুর দাম পড়িয়া যাইতেছে (কমিতেছে)।

পদ-পরিবর্তন (বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং তাহার বিপরীত) : সমাধান (বি)—সমাহিত (বিণ)। অভিভূত (বিণ)—অভিভব (বি)। সন্নিহিত (বিণ)—সন্নিধান (বি)। ভঙ্গ (বি)—ভগ্ন (বিণ)। বিরত (বিণ)—বিরতি, বিরাম (বি)। দাক্ষিণ্য (বি)—দক্ষিণ (বিণ)। সংবরণ (বি)—সংবৃত (বিণ)। সাংসারিক (বিণ)—সংসার (বি)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল (সরল)—যখন প্রস্থান করিতে হইবে সেই সময় উপস্থিত হইল (জটিল)।

অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে (জটিল)—অদ্য শকুন্তলা যাইবে (-ক), সেইহেতু আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে (যৌগিক)।

বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু (জটিল)—স্নেহকে অতি বিষম বস্তু বলিয়া বুঝিলাম (সরল)।

আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি (যৌগিক)—আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি (সরল)।

সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও (জটিল)—সখীদিগকে তোমার বক্তব্য বলিয়া লও (সরল)।

যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও (জটিল)—রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারিলে তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও (সরল)।

স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে (জটিল)—স্নেহের স্বভাবই অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করা (সরল)।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ নিরানন্দ—সানন্দ। পরাঙ্মুখ—উন্মুখ। ঊর্ধ্বমুখ—অধোমুখ। নীরব—সরব। বিরত—নিরত। দাক্ষিণ্য—কার্পণ্য। ব্যস্ত—সমস্ত। নিরুদ্‌বেগ—সোদ্‌বেগ।

উপসর্গ-যোগে নূতন শব্দ-গঠন : 'অভিভূত'—প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, অনুভূত, উদ্ভূত, পরিভূত।

'সমাপ্ত'—প্রাপ্ত, অবাপ্ত, ব্যাপ্ত, পর্যাপ্ত।

'আঘাত'—অপঘাত, সংঘাত, বিঘাত, প্রতিঘাত (প্রত্যাঘাত)।

'ব্যস্ত'—পরাস্ত, সমস্ত, ন্যস্ত, নিরস্ত, অভ্যস্ত, পর্যস্ত, (বিপর্যস্ত)।

বাচ্যান্তর ঃ আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে ?—আমার অঞ্চল কাহার দ্বারা টানা হইতেছে ?

তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন করো—তোমাদের উভয়ের দ্বারা এক কালে আলিঙ্গন করা হউক।

তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও—তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় যেন দেখানো হয়।

কারক ও বিভক্তি (উদ্ধারচিহ্নের মধ্যবর্তী পদগুলির) : 'মধুপানে' বিরত হইয়াছে (অপাদানে -এ)। নয়ন 'বাষ্পবারিতে' পরিপূরিত হইতেছে (অনুক্ত-কর্তায় বা করণে -তে)। আমি বনতোষিণীকে তোমাদের 'হস্তে' সমর্পণ করিলাম (সম্প্রদানে -এ)। 'শকুন্তলাতে'ও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে (অধিকরণে -তে)।

অনুক্তি পূরণ : যিনি…হইয়াও,…, কদাচ তোমাদের…করিতেন না ; তোমাদের…সময় উপস্থিত হইল, যাঁহার…সীমা থাকিত না ; অদ্য সেই… পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে …করো।

ময়ূর-ময়ূরী, …পরিত্যাগ করিয়া. …হইয়া রহিয়াছে ; কোকিলগণ,… রসাস্বাদে…হইয়া,…লইয়া আছে।

[এইরূপ আরও কতকগুলি অংশে অনুক্ত পূরণ পাঠ্যপুস্তক দেখিয়া অভ্যাস করিতে হইবে ; যথা—শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশাংশে, সখীদ্বয়ের সাবধান বাণীতে ইত্যাদি।]

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ : যথাসম্ভব, বৈক্লব্য, দুঃসহ, পরাঙ্মুখ, রক্ষণাবেক্ষণ, লৌকিক, সন্নিবেশিত, সাংসারিক, হৃৎকম্প।

চলিত-ভাষায় রূপান্তর : যে-কোনো অংশই এই উদ্দেশ্যে তুলিয়া দেওয়া হইতে পারে ; সুতরাং সেইভাবেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য : সমভিব্যাহার—সম+অভি+বি+আ-হৃ+ঘঞ্। চারিটি উপসর্গের যোগে গঠিত এই একটি শব্দই সংস্কৃতে পাওয়া যায়।

তাঁহারে, তোমারে—বর্তমানে সাধু গদ্যে সর্বনামে -রে বিভক্তির প্রয়োগ নাই, আছে -কে। বিদ্যাসাগরের সময়ে অর্থাৎ বাঙলা গদ্যের গঠনের যুগে এইরূপ প্রয়োগ দোষের বলিয়া পরিগণিত হইত না।

সান্ত্বনা করিবে—বর্তমানে এই রূপ অচল, সচল রূপ 'সান্ত্বনা দিবে'।

আপনকার—আপন+ষষ্ঠী বিভক্তি 'কার'। 'র', 'এর'-এর মতো 'কার'ও ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, যদিও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। 'কার'-যুক্ত কয়েকটি পদ : এখানকার, তখনকার, সবাকার, উপরকার, ভিতরকার, অদ্যকার, কল্যকার ইত্যাদি।

সাগরসঙ্গমে নবকুমার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

বঙ্কিম-সাহিত্য: ইহার উদ্দেশ্যমূলকতা—বঙ্কিমসাহিত্য-সম্বন্ধে মোহিতলাল বলিয়াছেন, "একটি মূল লক্ষ্যের অভিমুখে, অতিশয় অবিচলিত পদক্ষেপে আপনার মনঃপ্রাণের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একজন পুরুষ-বীর, এই জাতির আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিপন্থা নির্মাণে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যত কিছু বাধা—অশিক্ষিতের অবিশ্বাস, শিক্ষিতের অশ্রদ্ধা, বিধর্মীর আক্রোশ, প্রেমহীনের পরিহাস—এই সকল অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আপনার অন্তরের অগ্নি ও তাহারই আলোকশিখাকে সম্বল করিয়া এই নির্ভীক পুরুষ যে অসীম বিশ্বাসে সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন—তাঁহার সেই বিশ্বাসই আর সকলকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দুর্জয় আত্মপ্রত্যয়ের বলেই তিনি একটি জাতির মনোরাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।" ইহাই বঙ্কিম-সাহিত্যের গোড়ার কথা। স্পষ্টতঃ একটি মূল লক্ষ্যের অভিমুখে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক। তবে স্থূলভাবে উদ্দেশ্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অপেক্ষা প্রগাঢ়তর অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য। মোহিতলালের অন্যতম মন্তব্য হইতেই আবার ইহার অর্থ পরিষ্কার হইবে। তাঁহার কথায়, ভাব ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাণী হইয়া উঠে এবং "ভাবের এই যে বাঙ্ময় রূপ বা বাণী, ইহা সম্ভব হয়—যখন সেই ভাব ব্যক্তিবিশেষের ভাব, অতিশয় মৌলিক ও স্বতন্ত্র; এই বাণী ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশ…।" এই অর্থে বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বাণী রহিয়াছে। তাহাতে "গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবের বিচিত্র ও পূর্ণতম বিকাশ সুস্পষ্ট হইয়া আছে।"

জীবন-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা সমগ্র ও সুসমঞ্জস উপলব্ধি তাঁহার সাহিত্যকে উদ্দেশ্যমূলক করিয়াছে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "যেমন কুলী-মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ

করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশ খুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম।” তবে ঔপন্যাসিকরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই উপন্যাসের মধ্যেও আবার এই উদ্দেশ্যের সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশের সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। “উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকের শুধু গল্পপিপাসা মিটাইয়া রসসিসৃক্ষু বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু বঙ্কিমের আরও একটা দিক ছিল, তাহা হয়ত আরও গুরুতর। শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জ্ঞানে, কর্মে, মননে সর্বত্র উদ্বুদ্ধ করাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার অদম্য প্রবৃত্তি বঙ্কিমের চিত্তে চিরজাগরূক ছিল।”—সুকুমার সেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলী—বঙ্কিমের রচনাশৈলীর যে কয়টি বিশেষত্ব অধ্যাপক সুকুমার সেন নির্দেশ করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ :

“(ক) বাক্যের বহর ছোট এবং বাক্যগুলি সাধারণতঃ সরল।

(খ) অধিক সংযোজক অসমাপিকার অব্যবহার, এবং তৎস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার।

(গ) ......বিবিধ উপায়ে......বাগ্‌ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনয়ন।

(ঘ) রচনাকে সরস এবং ভাবভঙ্গিকে বিশ্রব্ধ করিয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পাঠক অথবা বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ।

(ঙ) বর্ণনভঙ্গির অন্তরঙ্গতা। ইহাই বঙ্কিমের নিজস্ব রীতির মূলগত বিশেষত্ব। পূর্ববর্তী লেখকদিগের আখ্যায়িকায় বর্ণনভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বা বিশ্রব্ধতা নাই, লেখকের স্থান সেখানে কথকের অনুরূপ, শ্রোতার ভূমিকা গৌণ। বঙ্কিমী পদ্ধতিতে বর্ণনা কাহিনীর অপেক্ষা পাঠকের পরিচর্যা কম প্রয়োজনীয় নয়।”

বঙ্কিমের ভাষাকে সাধারণতঃ বিদ্যাসাগরী ও আলালী ভাষার মধ্যগা বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের রচনারীতি আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমী বিশিষ্ট রচনাশৈলী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে আলালী ভাষাও মিশ্র সাধুভাষা। উহাতে প্রচলিত বাক্‌সম্ভারের ব্যবহার প্রধানতঃ কথোপকথনের অংশেই সীমাবদ্ধ। অন্যত্র যে ভাষার ব্যবহার হইয়াছে তাহা বিদ্যাসাগরের রীতি হইতে খুব দূরবর্তী নহে। বঙ্কিমের রচনায় আলালী

কথোপকথনের ভাষাও বর্জিত হইয়াছে। অতএব বিদ্যাসাগরের রীতিকেই বঙ্কিমী রীতির ভিত্তি বলা যাইতে পারে; তবে উহাতে উপরি-উক্ত বিশেষত্বগুলি সংযোজিত হইয়া একটি নূতন রচনাশৈলীর সৃষ্টি হইয়াছে।

এই রচনাশৈলীর প্রধান গৌরব ভাবসম্পদ্। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বঙ্কিম "ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া ভাবমন্দাকিনী অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।"

উৎস ও রচনাকাল—আলোচ্য কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। কপালকুণ্ডলার প্রকাশকাল বঙ্গাব্দ ১২৭৩, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—পাঠ্যাংশে নবকুমার কিরূপে নির্জন বনবাসে বিসর্জিত হইয়াছিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী কাহিনী নিম্নরূপ:

নবকুমার এক কাপালিকের নয়নগোচর হয়। কাপালিকের পালিত কপালকুণ্ডলা নাম্নী ষোড়শী রমণী তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া হিজলীর ভবানীমন্দিরের পূজক অধিকারীর নিকট লইয়া আসে। অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশযাত্রা করে। মেদিনীপুরে চটির নিকটে মতিবিবি-নাম্নী এক মুসলমান রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই মতিবিবিই নবকুমারের প্রথমা পরিণীতা ভার্যা পদ্মাবতী। বাধ্য হইয়া ইহার মাতাপিতা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় নবকুমার ইহাকে পরিত্যাগ করে। মতিবিবি স্বামীর নিকট নিজ পরিচয় গোপন রাখিল বটে, কিন্তু সেইদিন হইতে তাহার স্বামিসঙ্গলাভের প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া পৈতৃক বাসস্থান সপ্তগ্রামে আসিল। এক বৎসর পরে মতিবিবিও সেখানে আসিয়া স্বামীর প্রেমভিক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। সেই হইতে কপালকুণ্ডলার চরিত্র-সম্বন্ধে নবকুমারের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন রাত্রিকালে কপালকুণ্ডলা তাহার ননদ শ্যামাসুন্দরীর সহিত স্বামী বশ করিবার ঔষধ সংগ্রহ করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলে পুরুষের

ছদ্মবেশে মতিবিবি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। নবকুমার গোপনে ইহা লক্ষ্য করিল এবং স্বীয় স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে নবকুমারের মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। একদিন পূর্ববর্ণিত কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া কপালকুণ্ডলার সহিত পুরুষবেশী মতিবিবির গোপন মিলন দেখাইলেন। ক্রোধে এবং কাপালিকের প্রদত্ত সুরাপানে উত্তেজিত নবকুমার কপালকুণ্ডলার চরিত্রহীনতায় নিঃসংশয় হইয়া কাপালিকের নির্দেশে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার পূর্বে স্নান করাইবার জন্ম নদীতীরে লইয়া গেল। তীরে দাঁড়াইয়া কপালকুণ্ডলা নবকুমারকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিল বটে, কিন্তু গৃহে ফিরিতে রাজী হইল না। এমন সময় তরঙ্গাভিঘাতে নদীতট ভাঙিয়া গেলে কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া গেল। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ম নবকুমার জলে ঝাঁপ দিল, কিন্তু দুজনের কেহই ফিরিল না।

সমালোচনা—'কপালকুণ্ডলা'-সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞাতসারে ছন্দে কাব্য-রচনায় অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলায় তিনি অজ্ঞাতসারে গদ্যে কাব্য-রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" পাঠ্যাংশটুকু 'কপালকুণ্ডলা'র নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ হইলেও ইহা হইতেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইহা প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বেকার কাহিনী। সেই সুদূর অতীত—যাহা আমাদের কল্পনায় মধুর স্বপ্নের মতো বিরাজমান—তাহাকে লইয়া কত রূপকথা, কত লৌকিক কাহিনী। উহারই মধ্যে রূপায়িত করিয়া কাহিনীটিতে বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব রোমান্টিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবজীবন ও সমসাময়িক কালের স্বভাবতঃই একটা সংকীর্ণ গণ্ডি রহিয়াছে। উহার বাহিরে গেলেই গল্প অলীক ও অসম্ভাব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু অতীতের কোনো সীমারেখা নাই। অতএব ইতিহাসের পূর্ণ সমর্থন না থাকিলেও অনেক সময় সেকালের রঞ্জিত কাহিনীও একপ্রকার সম্ভাব্যতা লাভ করে। 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার'-এর কাহিনীটিও আমাদিগকে অনুরূপ এক জগতে লইয়া যায়। সেই জনমানবহীন নির্জন বনানী, সীমাহীন অনন্ত সমুদ্র, এবং তাহার মধ্যেও প্রাচীন বাঙলার কয়েকটি সরল প্রাণী, তাহাদের সরল বিশ্বাস, পুণ্যলাভার্থে তাহাদের দূরদেশে adventure, সর্বশেষে নির্জন বনে নবকুমারের নির্বাসন—এ-সকলই আমাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে।

রচনারীতির নৈপুণ্যের জন্মই অবশ্য কাহিনীটি এত সজীব হইয়াছে—কেবল

অতীত কাহিনী বলিয়া নয়। বর্ণনভঙ্গীর এমন একটি অন্তরঙ্গতা ইহাতে রহিয়াছে যাহাতে গল্পটি সহজেই আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া লয়। ইহার মধ্যে বঙ্কিমের মার্জিত রসিকতাও মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিবিধ শব্দবিন্যাস করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ক্রন্দন অথবা 'খাবার সময় বুঝা যাবে' বলিয়া নবকুমারের একাকী প্রস্থান—এরূপ দু'একটি সংযত অথচ সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস রচনাটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

পাঠ্যাংশের শেষের দিকে বঙ্কিম নীতির উপদেশ দিয়াছেন। গল্পের সহিত ইহার কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। তবে উহাই বঙ্কিমের রীতি। তাঁহার সকল সাহিত্যপ্রয়াসের অভ্যন্তরে রসসৃষ্টির সহিত যে একটি মহত্তর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল —ইহা তাহারই প্রমাণ; ইহা ছাড়া পাঠকের পরিচর্যার জন্য বিশ্রব্ধভাবে মধ্যম-পুরুষের প্রয়োগও এই অংশে লক্ষণীয়।

সংক্ষিপ্তসার—প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে মাঘের এক রাত্রিশেষে সাগরসঙ্গম হইতে একটি নৌকা ফিরিতেছিল। সেকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে নৌকাগুলি দলবদ্ধ হইয়া চলিত, কিন্তু রাত্রিশেষের কুয়াশায় পথ হারাইয়া এই নৌকাটি দলভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। যাত্রীরা সব নিদ্রিত, কেবল এক বৃদ্ধ ও নবকুমার-নামক একটি যুবক জাগিয়া বসিয়া ছিল। বৃদ্ধ মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই দিন কতটা যাওয়া যাইবে, কিন্তু মাঝিরা ইহার কোন সঠিক উত্তর দিতে না পারায় বৃদ্ধ তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক বলিল—যাহা দৈবের হাতে তাহা পণ্ডিতদিগেরও দুর্জ্ঞেয়, সামান্য মূর্খ মাঝিরা তাহা জানিবে কি করিয়া? অতএব বৃদ্ধের পক্ষে এরূপ অধীরতা অসঙ্গত।

বৃদ্ধের অধীরতার কারণ ছিল। সাগরসঙ্গমে আসিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে চোরে তাহার ২০।২৫ বিঘা জমির ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সংবৎসর পুত্রকন্যাগণ-সহ কি খাইবেন সেই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। নবকুমার বৃদ্ধকে স্মরণ করাইয়া দিল যে তাহার পক্ষে পুণ্যলাভের জন্য অভিভাবকহীন অবস্থায় ঘরবাড়ী ফেলিয়া আসা সঙ্গত হয় নাই। তাহার নিজের সে বালাই ছিল না, আসিয়াছিল সমুদ্রদর্শন করিতে।

এদিকে মাঝিদের কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারা গেল নৌকা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। এখন সমুদ্রে পড়িয়া সকলে অকূলে মারা যায় এই আশঙ্কায় তাহারা

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যাত্রীদের মধ্যেও শোরগোল পড়িয়া গেল। নবকুমার বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে শান্ত করিয়া মাঝিদিগকে নিশ্চেষ্ট হইয়া স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিল। কারণ, সূর্যোদয় আসন্ন, ইতিমধ্যে নৌকা মারা যাইবার আশঙ্কা নাই। মাঝিরা নবকুমারের নির্দেশ মানিয়া লইল বটে, কিন্তু আরোহীদের মধ্যে শঙ্কা দূর হইল না। পুরুষেরা পরম উৎকণ্ঠায় দুর্গানাম জপিতে লাগিলেন আর স্ত্রীলোকেরা বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্যোদয় হইলে দেখা গেল ভয়ের কারণ নাই, সম্মুখে ৫০।৬০ হাতের মধ্যেই এক বিশাল মোহানার পার্শ্বে সমুদ্রের পশ্চিম তটরেখা। অদূরে রসুলপুরের নদী ধীরমন্থর গতিতে আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। অপর পারের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। যাত্রীদিগের এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ আসিল। তারপর সুরু হইল আহারাদি উদ্যোগপর্ব।

কিন্তু কাঠের যোগাড় কোথায়? বৃদ্ধের অনুরোধে নবকুমার একাকী কুঠার-হস্তে বাহির হইয়া পড়িল এবং কাছাকাছি কোথাও সুবিধামতো গাছ না পাইয়া বহুদূরবর্তী অরণ্যানীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার অনেক দেরী হইতে লাগিল।

নবকুমারের আসিতে দেরী দেখিয়া যাত্রীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার জল্পনা চলিতেছিল। নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিল। সহসা বিপুল উচ্ছ্বাসে জোয়ার আসিয়া পড়িল। চাল-ডাল তীরে পড়িয়া রহিল এবং তীরের নিকট থাকা বিপজ্জনক বলিয়া মাঝিরাও নৌকা ছাড়িয়া দিল। প্রবল স্রোতের সহিত অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া তাহারা রসুলপুরের নদীর মুখ হইতে নৌকা ফিরাইতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া প্রবলতর জলোচ্ছ্বাসে উত্তরমুখী হইয়া নৌকা তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল। অচিরেই নৌকা রসুলপুরের নদীর মোহানা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িল। এখন ভাবনার বিষয় হইল নবকুমারকে ফিরাইয়া আনিতে যাওয়া সঙ্গত কিনা। মাঝিরা ইহাতে সম্মত হইল না, বিশেষতঃ তাহাদের ধারণা নবকুমারকে শিয়ালে খাইয়াছে। যাত্রীরাও দেখিল, ফিরিয়া যাইতে হইলে আর এক ভাঁটার অপেক্ষা করিতে হয় এবং পরদিন জোয়ারের পূর্ব পর্যন্ত অনাহারে কাটাইতে হয়। সুতরাং রসুলপুরের নদীর মোহানায় আর ফিরিয়া যাওয়া হইল না। নবকুমার এইভাবে অজ্ঞাত এবং ভীষণ নির্জন বনানীর মধ্যে একাকী পরিত্যক্ত হইল।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

যাত্রীর নৌকা—যাত্রিবাহী নৌকা (Passenger boat)। **গঙ্গাসাগর**—গঙ্গানদী যেস্থলে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিশিয়াছে। এই স্থান হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। তুলনীয় : "গঙ্গাসাগরের স্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি···।"—রজনীকান্ত। **পর্তুগীস**—ইউরোপের পর্তুগাল দেশের অধিবাসী। ইহারাই সর্বপ্রথম জলপথে ভারতবর্ষে আসে। তদবধি ইহারা ভারতে বাণিজ্য করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেক জলপথে দস্যুতা করিয়া নিরীহ নৌকাযাত্রীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। নাবিকদস্যু—জলদস্যু (Pirates)। কুজ্ঝটিকা—কুয়াশা। দিঙ্‌নিরূপণ—দিঙ্‌নির্ণয়, কোন্‌টি কোন্ দিক্ তাহা স্থির করা। **বহর**—নৌশ্রেণী (a fleet of boats)। **জাগ্রৎ**—জাগরিত। নাবিকদিগকে—নৌকার মাঝি-মাল্লাদিগকে। বারেক—একবার।

যাহা জগদীশ্বরের ইত্যাদি—যাহা মানুষের হাতে নহে—ভগবানের হাতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। **বেটারা**—বৃদ্ধের শত্রুগণের (চোরদের) উদ্দেশে ব্যবহৃত। বিঘা—৮০ হাত দীর্ঘ ও ৮০ হাত প্রস্থ ভূমিখণ্ডকে এক বিঘা বলে। পশ্চাদাগত—পরে যাহারা আসিয়াছিল। অভিভাবক—গৃহের তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত বয়স্ক ব্যক্তি। **তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে**—বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। মানুষের জীবনকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে ; যথা—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি কাটিলে অবশিষ্ট থাকে বার্ধক্য। **তীর্থদর্শনে যেরূপ** ইত্যাদি—শুদ্ধচিত্তে গৃহে বসিয়া সৎকার্যে রত থাকিলেই তীর্থদর্শনের পুণ্য হয়। পুণ্যসঞ্চয় করিতে হইলে যে তীর্থে যাইতেই হইবে, এমন কোনো কথা নাই। তুলনীয় : "গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।"

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী ইত্যাদি—মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত। ইহার অর্থ—অয়শ্চক্রনিভস্য (লৌহের অর্থাৎ নীল ইস্পাতের চাকার মতো) লবণাম্বুরাশেঃ (সমুদ্রের) তমালতালী-বনরাজিনীলা (তমাল ও তালবনসমূহের বর্ণে নীল) তন্বী বেলা (ক্ষীণ তটভূমি) দূরাৎ (দূর হইতে) ধারানিবদ্ধা (অবিচ্ছিন্নভাবে অঙ্কিত) কলঙ্করেখা ইব (কজ্জলকৃষ্ণ রেখার মতো) আভাতি (শোভা পাইতেছে)। কালিদাসের এই

শ্লোকটি অতিশয় বিখ্যাত এবং প্রিয়। অনেকের মুখেই ইহার আবৃত্তি শুনা যায়। এই কারণে মূলশ্লোকের অনুগত এক ছন্দে গ্রথিত অনুবাদ ইহার সহিত দিলাম :

"লৌহচক্রসম সিন্ধু লবণসলিল
বেষ্টিয়া তমালতালীবনরাজিনীল,
তন্বঙ্গী সৈকতভূমি দূরে যায় দেখা
ধারায় গ্রথিত যেন কজ্জলের রেখা "

(অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ)

• শ্রুতি—কর্ণ, কান। **একতান-মনা**—এক বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত। থারাবি—খারাপ (বিশেষ্য)। **বার-দরিয়া**—বাহির সমুদ্র। দরিয়া = সমুদ্র বা নদী।

সশঙ্কচিত্তে—ভীত মনে। দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে—দিক্ ঠিক করিতে পারে নাই, এক দিকে যাইতে আর এক দিকে আসিয়াছে। অকূল—কূল বা তীর না পাইয়া, কূলহীন সমুদ্রে।

হিমনিবারণ জন্য—বাহিরের ঠাণ্ডা যাহাতে না লাগে সেজন্য। **কেনারায় পড়্**—নৌকা তীরের নিকটে লইয়া যা। নব্য—যুবক।

চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে—ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে। এক ঘণ্টা আড়াই দণ্ডের সমান। অতএব পাঁচ দণ্ড দুই ঘণ্টা। পশ্চাৎ—পরে। তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল—যুবকের কথামতো নৌকা স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিল।

নিশ্চেষ্ট—চেষ্টাবিহীন, অলস। **কণ্ঠাগতপ্রাণ**—যাহাদের প্রাণ গলা পর্যন্ত আসিয়াছে, আর একটু হইলেই বাহির হইয়া যাইবে ; মৃতপ্রায়। **তরঙ্গান্দোলন-কম্প** ঢেউয়ের ফলে নৌকা আন্দোলিত হওয়ায় দোলা। **দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন**—বিপদ্ নিবারণের জন্য ভয়হারিণী দুর্গাদেবীকে ডাকিতে লাগিলেন। বিবিধ শব্দবিন্যাসে—বিনাইয়া বিনাইয়া, নানাপ্রকার কথা বলিয়া ; যথা, "ওগো, আমার কি হবে গো" ইত্যাদি। **গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন**—সেকালে সন্তানহীনা নারীগণ সন্তানলাভের মানসে প্রথম সন্তান গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিবার মানত করিতেন। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিয়া দেন। **ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই**—কথিত আছে, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিবার পর গঙ্গাদেবী স্বয়ং যাহার সন্তান তাহাকে ফিরাইয়া দিতেন ; এই স্ত্রীলোকটির বেলায় তাহা হয় নাই। **সে-ই কেবল**

কাঁদিল না—পুত্রকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়া সে শোকে নিজ জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য নিজ প্রাণ হারাইবার ভয়ে সে কাঁদে নাই।

অনুভবে—অনুমানে। এক প্রহর—প্রায় তিন ঘণ্টা। আট প্রহরে এক দিন-রাত্রি হয়। পীর—মুসলমান ফকির বা সাধু। **দরিয়ার পাঁচ-পীর**—সমুদ্রের বদর, আলি, কালু, গাজী, একদলি—এই পাঁচজন পীর। ইঁহারা মুসলমান নাবিকগণের উপাস্য। তাহাদের বিশ্বাস, এই পাঁচ-পীরের নাম স্মরণ করিলে সমুদ্রে সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়। মোহানা—যেখানে নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়ে। **রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত**—সূর্যের কিরণসমূহে উজ্জ্বল। সচরাচর—সাধারণতঃ। নীলপ্রভ—ঈষৎ নীলবর্ণ, নীলাভ। **কলধৌত-প্রবাহবৎ**—গলিত রূপার ধারার ন্যায়। কলধৌত=রৌপ্য। সৈকত-ভূমিখণ্ডে—বালুকাময় নদীতীরে।

জলোচ্ছ্বাস-আরম্ভেই—জোয়ার আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই। **প্রাতঃকৃত্য**—প্রাতঃকালে করণীয় মলত্যাগ, দন্তধাবন প্রভৃতি কার্য।

বিপত্তি—বিপদ, অসুবিধা। **প্রাগুক্ত**—পূর্বকথিত। **খাবার সময় বুঝা যাবে**—বাঘের ভয়ে এখন কেহই আমার সহিত আসিল না, কিন্তু খাইবার সময় সকলেই আসিবে; তখন তোমাদিগকে খাইতে দিব না। কাষ্ঠাহরণে—কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে। ছেদনযোগ্য—কাটিবার উপযুক্ত। **সম্যক্ বিবেচনা** ইত্যাদি—কাষ্ঠ সংগ্রহ, বহন ইত্যাদি ব্যাপারে কি অসুবিধা হইতে পারে, এইজাতীয় কার্যে অনভ্যস্ত নবকুমার পূর্বে তাহা চিন্তা করে নাই।

প্রত্যাগমন—ফিরিয়া আসিতে। **সমভিব্যাহারিগণ**—সঙ্গিগণ, নৌকার অপরাপর যাত্রিগণ। **সম্ভাব্য কাল**—যে সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা সম্ভব সেই সময়। **আর-এক ভাঁটার কর্ম**—ভাঁটার সময় নদীর জল উপরদিকে না গিয়া নীচের দিকে আসিয়া থাকে; সুতরাং সেই টানে নৌকাকে নীচের দিকে লইয়া আসিবার অসুবিধা হয়। এই ভাঁটার সুযোগ নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় ভাঁটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভৈরব কল্লোল—ভীষণ গর্জন। জলোচ্ছ্বাসকালে—জোয়ারের ফলে জল-বৃদ্ধির সময়ে। তণ্ডুলাদি—চাউল প্রভৃতি। **স্বেদস্রুতি**—ঘামের ধারা। **আত্ম-বন্ধু**—আত্মীয়। তুলনীয়: "গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।"—রবীন্দ্রনাথ।

বিসর্জিত—পরিত্যক্ত। পরের উপবাস-নিবারণার্থে—অপরে যাহাতে উপবাসী না থাকে সেজন্য। আত্মোপকারীকে—নিজের উপকারক ব্যক্তিকে। **তুমি অধম** ইত্যাদি—কেহ হীন আচরণ করিলেই যে তাহার প্রতিদানে হীন আচরণ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে কোনো যুক্তি নাই। তুলনীয়ঃ

"কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তা ব'লে কুকুরে কামড়ান কিরে মানুষের শোভা পায়?"—সত্যেন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যা

(১) মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের.........হইবে না। (অ. ২)

এই পঙ্‌ক্তি-কয়টি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অংশ 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার'-কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দিগ্‌ভ্রান্ত একখানি যাত্রিবাহী নৌকার একজন বৃদ্ধ আরোহী মাঝিদিগকে সম্বোধন করিয়া সেদিন তাহারা কতদূর যাইতে পারিবে জিজ্ঞাসা করিলে মাঝি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারিল না। ইহাতে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে নবকুমার এইরূপ উক্তি করিয়াছিল।

তৎকালে জলপথে যাতায়াত নানাপ্রকারে বিপৎসঙ্কুল ছিল। পথিমধ্যে পর্তুগীজ দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব তো ছিলই, তাহা ছাড়া অকালের ঝড় বা বান নৌকাকে কোথায় হইতে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার কোনো স্থিরতা ছিল না। বিশেষ করিয়া অজ্ঞাত কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন পথ। সুতরাং মাঝিরা সেদিন যে কতদূর যাইতে পারিবে তাহা সঠিক বলিবে কিরূপে? সাধারণ অবস্থায় অভিজ্ঞ মাঝি বলিয়া দিতে পারে যে দিনে কতটা পথ যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে মানুষের কোনো হাত নাই, যেখানে এত প্রকারের আপদ্-বিপদ্ দৈব-দুর্ঘটনা বিবেচনা করিতে হইবে, সেখানে একটি দিগ্‌ভ্রান্ত নৌকার মাঝির পক্ষে এইরূপ কিছু বলাই দুষ্কর। যাহা দৈব তাহা মানুষের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক ব্যক্তি দৈব-সম্বন্ধে সঠিক কোনো নির্ণয় করিতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ এক অশিক্ষিত মাঝির পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা কিরূপে সম্ভব? তাই বৃদ্ধের পক্ষে অধীর ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া মাঝিদিগকে তিরস্কার করা নিতান্তই অসঙ্গত।

(২) যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি........ হইতে পারে। (অ. ২)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অংশ 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার'-নামক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে দিগ্‌ভ্রান্ত একখানি নৌকার দুইজন আরোহীর মধ্যে বাক্যালাপ চলিতেছিল। তাহাদের একজন প্রাচীন, অন্যজন যুবা—নাম নবকুমার। বৃদ্ধ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত কারণ তিনি শুনিয়াছেন চোর তাঁহার কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমির ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া নবকুমার অভিভাবকহীনভাবে বাড়ীঘর ফেলিয়া বৃদ্ধের তীর্থে আসা উচিত হয় নাই, এইরূপ মন্তব্য করিলে বৃদ্ধ উগ্র হইয়া বলিয়াছিলেন—বার্ধক্যেই যদি তিনি পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় না করিবেন তবে করিবেন কবে? ইহার উত্তরে নবকুমার বলিয়াছিল—

পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করিতে হইলে যে তীর্থদর্শন করিতে হইবে ইহার কোনো অর্থ নাই। সাধারণ লোকে আজীবন ধর্মকর্ম-সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়া ইহার সম্বন্ধে সচেতন হয়। তখন তাহারা তীর্থদর্শনের দ্বারা পাইকারীভাবে পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তীর্থদর্শনে পুণ্যলাভ সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু গৃহে বসিয়াও তীর্থদর্শনের ফললাভ হইতে পারে। নানা কারণে সকলেই তীর্থভ্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু গৃহে বসিয়া যে পুণ্যলাভ করা যায় তাহা সকলের পক্ষেই সম্ভব। শুদ্ধ শান্ত চিত্তে যে ব্যক্তি সর্বদা সৎকর্মে ব্রত থাকেন তিনি গৃহী হইলেও তপস্যার বা তীর্থদর্শনের ফললাভ করিতে পারেন—ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম।

(৩) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরের......কেবল কাঁদিল না। (অ. ১৮)

আলোচ্য অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অংশ 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার'-নামক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রিবাহী নৌকাখানির মাঝিরা নবকুমারের নির্দেশে নৌকা স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিলে আরোহীরা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল। বিপদ্ নিবারণের উদ্দেশ্যে পুরুষেরা দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল আর স্ত্রীলোকেরা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজনই কেবল কাঁদিল না। সন্তানের রোগমুক্তি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে মানত করিয়া আসিয়াছিল গঙ্গাসাগরে তাহার সন্তান নিক্ষেপ করিবে। সে আশা করিয়াছিল, গঙ্গাদেবী স্বয়ং

তাহার সন্তানকে তাহার কোলে ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু সে আশা তাহার পূর্ণ হয় নাই। নিজদোষে পুত্রকে হারাইয়া অপরিসীম শোকে এবং আত্মধিক্কারে নিজ জীবনের প্রতিও সে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই নৌকার অন্যান্য সকল আরোহী যখন মৃত্যুভয়কাতর হইয়া ক্রন্দনরত, তখন একমাত্র সে-ই জীবনরক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, মৃত্যুভয়ে ক্রন্দনও করে নাই।

[গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের প্রথাটি টীকারূপে যোগ কর।]

(৪) তুমি অধম—তাই বলিয়া ·····না হইব কেন? (অ. ২৯)

আলোচ্য বাক্যটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার'-নামক কাহিনীর শেষাংশ। নবকুমার তাহার অনাত্মীয় নৌকারোহীদিগের উপবাসকষ্ট নিবারণের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া একাকী বিজন অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লেখকের শঙ্কা—অকৃতজ্ঞতার ঘৃণ্য কাহিনী পাঠ করিয়া কেহ হয়তো প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতে পারেন যে তিনি আর কখনও পরের উপকার করিতে অগ্রসর হইবেন না। কারণ, উপকারের বিনিময়ে যদি অপকারই লাভ করিতে হয় তাহা হইলে লোকের পরোপকারের প্রবৃত্তি চলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক বলিতে চাহেন, যিনি এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইবেন তিনি উপহাসাস্পদ। অকৃতজ্ঞ খলপ্রকৃতি ব্যক্তিদের স্বভাবই এই যে তাহারা উপকারীরও অপকার করিয়া বসে। তাহারা নরাধম সন্দেহ নাই। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা অপরের উপকার-অপকার নিরপেক্ষ হইয়া পরোপকার-সাধনে ব্রতী হইয়া থাকেন। কে তাহাদের উপকার করিল কে অপকার করিল, তাহার দিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না। বস্তুতঃ, পরের উপকার করিয়া তাহারা অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন এবং এই আনন্দই তাহাদিগকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করে। তাহারা উত্তম। অধম ও উত্তমের আদর্শের মধ্যে উত্তমের আদর্শই সর্বদা গ্রহণীয় এবং অধমের আদর্শ বর্জনীয়।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। "নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন"—নবকুমার কিরূপে বনবাসে বিসর্জিত হইয়াছিলেন তাহার কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

উ.। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি

যাত্রিবাহী নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিতেছিল। রাত্রিশেষে ঘোর কুজ্ঝটিকায় নৌকার মাঝিরা দিক্ ঠিক করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং নৌকা কোথায় যাইতেছে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এই নৌকায় নবকুমার-নামক এক যুবক তীর্থদর্শনের জন্য যতটা না হউক সমুদ্রদর্শনের জন্য যাত্রীদের সঙ্গে আসিয়াছিল। মাঝিদের ভয়ত্রস্ত আলাপ হইতে যখন বুঝা গেল যে তাহাদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, তখন যাত্রীদিগের মধ্যে শোরগোল পড়িয়া গেল। কিন্তু নবকুমারের পরামর্শে মাঝিরা নৌকাটিকে স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিল। কিছুকাল পরে রৌদ্র উঠিলে সকলেই আশ্বস্ত হইল এবং দেখা গেল নৌকার পঞ্চাশ হাতের মধ্যেই সমুদ্রের পশ্চিম তট।

জোয়ার আসিতে তখনও দেরী আছে। মাঝিদের পরামর্শে যাত্রীরা এই অবসরে তীরে নামিয়া আহারের উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকায় রান্নার কাঠ নাই। অগত্যা এক বৃদ্ধের অনুরোধে নবকুমার কুঠার-হস্তে কাষ্ঠ-আহরণে চলিল। বাঘের ভয়ে কেহই তাহার সহিত যাইতে রাজী হইল না। তীরের নিকটবর্তী স্থানে সুবিধামতো গাছ না পাইয়া নবকুমার দূরে গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া সে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল। কিন্তু নবকুমার বড়ঘরের ছেলে। অনভ্যাসের ফলে কাঠের বোঝা বহিয়া আনিতে তাহার বেশ পরিশ্রম হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া আসিতে আসিতে তাহার অনেক দেরী হইয়া গেল।

এদিকে নবকুমারের ফিরিতে দেরী দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিল তাহাকে বাঘে খাইয়াছে। সম্ভাব্য সময় অতীত হইলে তাহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। ইতিমধ্যে ভৈরব কল্লোলে জোয়ার আসিয়া পড়িল। জোয়ারের সময় তীরের নিকট থাকিলে নৌকা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় মাঝিরা তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়িয়া দিল এবং যাত্রীরাও চাল-ডাল তীরে ফেলিয়া রাখিয়া ত্রস্তে আসিয়া নৌকায় উঠিল।

মাঝিরা নৌকা সামলাইতে পারিল না ; প্রবল জলস্রোতে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। আরোহীদের মধ্যে কেবল একজনেরই নবকুমারের কথা মনে পড়িল, কিন্তু মাঝিরা 'তাহাকে শিয়ালে খাইয়াছে' এইরূপ বলায় সে-ও নিরস্ত হইল। স্রোতের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া মাঝিরা নদীর মধ্য হইতে

নৌকাকে বাহির করিল বটে, কিন্তু তখনই প্রবলতর স্রোতে উত্তর-মুখী হইয়া নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। মাঝিরা নৌকা ফিরাইতে পারিল না।

স্রোতের বেগ যখন কমিয়া আসিয়াছে তখন নৌকা রসুলপুরের মোহানা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। নবকুমারের জন্য সেখানে ফিরিয়া আসিতে হইলে অনর্থক দেরী তো হইবেই, উপরন্তু দুইদিন অনাহারে যাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে এই মনে করিয়া তাহারা ফিরিয়া না-আসাই সিদ্ধান্ত করিল। মাঝিরা বলিয়াছে, নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে—সকলেই এই কথা মানিয়া লইল। নবকুমারকে লইবার জন্য নৌকা আর ফিরিল না।

এইরূপে নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইল।

প্র. ২। "তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?" —কোন্ প্রসঙ্গে কে এই উক্তি করিয়াছেন? কেনই বা করিয়াছেন?

অথবা

"তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?"—যে প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়া মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর। (ক. বি. ১৯৪৭)

উ.। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র নৌকাযাত্রীদিগের অকৃতজ্ঞতার অসাধু দৃষ্টান্তে শঙ্কিত হইয়া পাঠককে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন।

গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিবার সময় দলভ্রষ্ট একটি যাত্রবাহী নৌকা রাত্রিশেষের ঘোর কুজ্ঝটিকায় দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অবশেষে রসুলপুরের নদী যেখানে আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে তাহারই পশ্চিমতটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। জোয়ার আসিতে তখনও বিলম্ব থাকায় আরোহীরা মাঝিদের পরামর্শে তীরে নামিয়া রন্ধনাদির আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকায় রন্ধনের জন্য কাষ্ঠ ছিল না। অবশেষে এক বৃদ্ধের অনুরোধে যাত্রীদের মধ্য হইতে নবকুমার-নামক একজন যুবক কুঠার-হস্তে একাকী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে চলিল। তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ তাহার সঙ্গী হইল না। তীরের নিকটে সুবিধামতো কাষ্ঠ না পাইয়া বাধ্য হইয়া নবকুমারকে গভীর বনে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দৈহিক পরিশ্রম করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কাঠের বোঝা বহিয়া আনিতে তাহার বেশ কষ্টই হইতে লাগিল। একবার বিশ্রাম করিয়া একবার কিছু পথ চলিয়া আসিতে

আসিতে তাহার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। ইতিমধ্যে জোয়ার আসিল এবং স্রোতের বেগে নৌকা মোহানা হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল। স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে যখন নৌকা ফিরানো সম্ভব হইল তখনও যাত্রীরা উপবাস-কষ্ট ও বিলম্বের ভয়ে নবকুমারের জন্য ফিরিতে রাজী হইল না। এইরূপে নবকুমার সেই ভীষণ বিজন অরণ্যে একাকী পরিত্যক্ত হইল। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহই নবকুমারের আত্মীয় ছিল না। তাহাদের উপবাস-কষ্ট নিবারণের জন্যই নবকুমার পরোপকারে ব্রতী হইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু অকৃতজ্ঞ আরোহীর দল তাহার উপকারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে একাকী সেই ভীষণ সমুদ্র-কূলে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরোপকারের প্রতিদান দিল। এই প্রসঙ্গে লেখক উপরিলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন।

মন্তব্যটির সহিত মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু যে ঘৃণ্য অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ এই কাহিনীটির মধ্যে রহিয়াছে তাহা পাঠ করিয়া লোকের পরোপকারে স্পৃহা যাহাতে চলিয়া না যায়, লোকে যাহাতে এই কৃতঘ্নতার অনুসরণ না করে, এইজন্য লেখক উৎকণ্ঠিত হইযাছেন। পরোপকারে প্রবৃত্তি দান করিবার জন্যই তিনি বলিয়াছেন—যে উত্তম, অন্যে তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলেও নিজ প্রকৃতি-অনুসারে তাহার উত্তমই থাকা উচিত অর্থাৎ অপরের উপকার করা উচিত। অধমের অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহার পক্ষে অধম ও অকৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত অশোভন।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা। দিগন্ত = দিক্ + অন্ত। ব্যাপ্ত = বি + আপ্ত। দিঙ্নিরূপণ = দিক্ + নিরূপণ। কথোপকথন = কথা + উপকথন। বারেক = বার + এক (বাঙলা সন্ধি)। তিরস্কার = তিরঃ + কার। প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা। দিগ্ভ্রম = দিক + ভ্রম। নিশ্চেষ্ট = নিঃ + চেষ্ট। দিঙ্মণ্ডল = দিক্ + মণ্ডল। প্রাগুক্ত = প্রাক্ + উক্ত। কিয়দ্দূর = কিয়ৎ + দূর। ক্ষণেক = ক্ষণ + এক (বাঙলা সন্ধি)। জলোচ্ছ্বাস = জল + উচ্ছ্বাস (উৎ + শ্বাস)। আত্মোপকারী = আত্ম ('আত্মা' নয়) + উপকারী।

সমাস ঃ নাবিকদস্যুদিগের—নাবিক যে দস্যু (কর্মধারয়), তাহাদের ;

যাতায়াত—যাত ও আয়াত (দ্বন্দ্ব—দুইটি পদই বিশেষ্য)। জন্মজন্মান্তরে- অন্য জন্ম জন্মান্তর (নিত্যসমাস); জন্ম (অর্থাৎ বর্তমান জন্ম) ও জন্মান্তর (দ্বন্দ্ব), তাহাতে। একতান-মনা—এক তান যাহার (বহুব্রীহি) তাহা একতান; একতান মন যাহার (বহুব্রীহি), সে। সশঙ্কচিত্তে—শঙ্কার সহিত বর্তমান সশঙ্ক (তুল্যযোগে বহুব্রীহি); সশঙ্ক চিত্ত (কর্মধারয়), তাহাতে। কণ্ঠাগতপ্রাণ—কণ্ঠকে আগত (২য়াতৎপুরুষ) বা কণ্ঠে আগত (৭মীতৎপুরুষ—বাঙলামতে); কণ্ঠাগত প্রাণ যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহাদের। তরঙ্গান্দোলনকম্প—তরঙ্গের আন্দোলন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তজ্জনিত কম্প (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। প্রহরাতীত – প্রহরকে অতীত (২য়াতৎপুরুষ)। রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত—রবির রশ্মি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহাদের মালা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা প্রদীপ্ত (৩য়াতৎপুরুষ)। সৈকতভূমিখণ্ডে—সৈকত (অর্থাৎ বালুকাময়) ভূমি (কর্মধারয়); তাহার খণ্ড (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। প্রাতঃকৃত্য-সম্পাদনে—প্রাতঃকালীন কৃত্য (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার সম্পাদন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহাতে। ব্যাঘ্রভয়ে—ব্যাঘ্র হইতে ভয় (৫মীতৎপুরুষ), তাহাতে। বৃক্ষাবলী-শোভিত—বৃক্ষের আবলী (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা শোভিত (৩য়া-তৎপুরুষ)। জলোচ্ছ্বাসকালে—জলের উচ্ছ্বাস (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার কাল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। উপবাসনিবারণার্থ—উপবাসের নিবারণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার জন্য ইহা (নিত্যসমাস)। নিকটস্থ—নিকটে থাকে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)।

সমস্তপদ-গঠন: যাত্রীর নৌকা=যাত্রিনৌকা। যুবা পুরুষ=যুবপুরুষ। বক্তার স্বর=বক্তৃস্বর। উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে=উপযুক্তবৃক্ষানুসন্ধানে। দরিদ্রের সন্তান=দরিদ্রসন্তান।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: ব্যাপ্ত—বি—আপ্+ক্ত। জাগ্রৎ—জাগৃ+শতৃ। খারাবি—খারাব+ই (ভাববিশেষ্য)। ঔৎসুক্য—উৎসুক+ষ্যঞ্। সৈকত—সিকতা+অণ্। মীমাংসা—মন্+সন্+অ ভাববাচ্যে+স্ত্রীলিঙ্গে আ। হত্যা—হন্+ক্যপ্ ভাববাচ্যে+স্ত্রীলিঙ্গে আ (সংস্কৃতে অবশ্য শুধু 'হত্যা' হয় না, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইলে হয়)। বিসর্জিত—বি—সৃজ্+ক্ত কর্মবাচ্যে (পদটি হওয়া উচিত 'বিসৃষ্ট')।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ 'ইতস্ততঃ করিয়া'—সংস্কৃতে 'ইতস্ততঃ'-এর অর্থ 'এখানে সেখানে'; বাঙলায়, 'দ্বিধা'।

'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে' = বার্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে।

'কেনারায় পড়্'—এখানে পড়্ = আশ্রয় গ্রহণ কর্।

প্রশ্ন ঃ 'পড়া' ক্রিয়াটির আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর ঃ আলুর দাম পড়িয়াছে (কমিয়াছে)। তার এখন দুঃসময় পড়েছে (আরম্ভ হইয়াছে)। এক এক জনের ভাগে কত পড়ল (প্রাপ্তি ঘটিল)?

'নৌকা মারা যাইবে না' এখানে 'মারা যাইবে'—ডুবিবে বা বিধ্বস্ত হইবে।

প্রশ্ন ঃ 'মারা যাওয়া' ক্রিয়াটির আরও বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর ঃ তার তিনশ টাকা মারা গেল (নষ্ট হইল)। তোমার আদিরের চোটে ছেলেটা যে মারা যায় (বিপন্ন বোধ করে)।

'প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে' = প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইবে, মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হইবে।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই—মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই ('মহাশয়'-কে কর্তৃপদ করিয়া)।

এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব (গঠনে যৌগিক কিন্তু অর্থে জটিল)—এখন পরকালের কর্ম না করিলে কবে করিব (সরল)?

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর (সরল)—যে বলিল তাহার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর (জটিল)।

যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ—যাত্রীদের প্রাণ ভয়ে কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়াছে (সমাস ভাঙিয়া ব্যবহার)।

কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে (জটিল)—কাহারও তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার উপযুক্ত সাহস হইল না (সরল)।

নৌকা আর ফিরিল না—নৌকার আর ফেরা হইল না (বাচ্যান্তর)।

তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন (যৌগিক)—তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন (সরল)?

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"—বৃদ্ধ জানিতে চাহিলেন তবে সে আসিল কেন (পরোক্ষ উক্তি)।

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না (নেতিবাচক)—সকলেই নবকুমারের সহিত যাইতে অস্বীকার করিল (স্থাপনাত্মক বা অস্ত্যর্থক)।

খাবার সময় বুঝা যাইবে—খাবার সময় বুঝে নেব (বাচ্যান্তর)।

তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই (অস্তিবোধক) —তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক বাঁচি না (অপোহনাত্মক বা নেতিবাচক)।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল—এই হেতু বশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমন বিলম্বিত হইতে লাগিল—('প্রত্যাগমনে'-কে কর্তৃপদে রূপান্তরিত করিয়া)।

কারক ও বিভক্তি (উদ্ধারচিহ্নের মধ্যবর্তী পদগুলির): তাহা 'পণ্ডিতে' বলিতে পারে না (কর্তায়-এ)। এ সংবাদ তিনি অন্য যাত্রীর 'মুখে' পাইয়াছিলেন (অপাদানে-এ)। 'মহাশয়ের' আসা ভালো হয় নাই। অনুক্তকর্তায় এর)। 'সমুদ্র' দেখিব বড সাধ ছিল (কর্মে শূন্য বিভক্তি)। এই 'আশঙ্কায়' ভীত হইয়াছে (অপাদানে য় বা-এ)। সে পুনর্বার পরের 'কাষ্ঠাহরণে' যাইবে (কারক নাই, উদ্দেশ্য বুঝাইতে অকারক চতুর্থী বা-এ)।

বাক্য রচনার জন্য শব্দ: দলবদ্ধ, অপেক্ষাকৃত, ঈষৎ, ঔৎসুক্য নানাবিধ, উপক্রম, মন্দীভূত, উপহাসাস্পদ, জন্মজন্মান্তরে।

ব্যাকরণগত টীকা: জাগ্রৎ—জাগৃ+শতৃ। কিন্তু আধুনিক বাঙলায় এই শুদ্ধ শব্দটির পরিবর্তে অশুদ্ধ 'জাগ্রত' শব্দটিই বেশী প্রচলিত।

সম্বৎসর—সম্+বৎসর='সংবৎসর' শুদ্ধ, কারণ অন্তঃস্থ বর্ণ (এক্ষেত্রে অন্তঃস্থ-ব) পরে থাকিলে 'ম' অনুস্বার হইয়া যায়। কিন্তু 'সম্বৎসর' কথাটি ভুল হইলেও বহুপ্রচলিত।

'কোন্ দেশে এলাম, তা যে বুঝিতে পারি না'—চলিত-ভাষার মধ্যে সাধু-ভাষার ক্রিয়াপদ 'বুঝিতে' ব্যবহার করায় এখানে গুরুচণ্ডালিয়া দোষ হইয়াছে, 'বুঝিতে'-র পরিবর্তে 'বুঝতে' ব্যবহার করিলে এই দোষ কাটিয়া যায়। বঙ্কিমের রচনায় এইরূপ দোষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য-প্রতি—'সূর্য' এবং 'প্রতি' একসঙ্গে যুক্ত থাকিলেও সমাসবদ্ধ নয়; 'প্রতি' অনুসর্গ, তাহার যোগে 'সূর্য' দ্বিতীয়ান্ত।

প্রাণপণে—প্রাণ পণ যাহাতে তাহা (বহুব্রীহি), সেইভাবে। ক্রিয়াবিশেষণে -এ বিভক্তি।

স্বাদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থ হইতে সংকলিত। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনের অতীত স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ নিজ পরিবার, সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে তাঁহার নানান কথা মনে পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে প্রয়োজনমতো বর্ণনা করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে প্রবন্ধটির আরম্ভে এই বাক্যটি আছে: "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারে হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।" ইহার পরই পাঠ-সংকলনে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মধ্যস্থলে একটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া বাকী সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ-সংকলনে স্থান পাইয়াছে।

এই প্রবন্ধের আরম্ভের যে চিত্রটি পাঠ-সংকলনে বর্জিত হইয়াছে তাহাতে প্রবন্ধটির প্রসঙ্গনির্দেশ আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁহার পরিবারের স্বদেশী ভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শিরোনাম দেখিলে প্রবন্ধটিকে একটি চিন্তামূলক প্রবন্ধ বলিয়া মনে হয়! এই শিরোনাম মূলগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। 'জীবন-স্মৃতি'র আলোকে ইহার বিশেষ তাৎপর্যও একটা আছে। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'

হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই শিরোনাম একটু ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। প্রবন্ধটি মোটেই চিন্তামূলক নয়, ইহা সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক। ইহার যথার্থ শিরোনাম "আমাদের স্বাদেশিকতা" বা ঐ ধরণের একটা কিছু হওয়া উচিত। সেকালে স্বাদেশিকতার আবেগ ঠাকুর-পরিবারের কয়েকটি লোককে পাইয়া বসিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে ঠাকুর পরিবারের অন্য সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর স্বদেশাভিমান দৃঢ়মূল ছিল কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-প্রমুখ কয়েকজনের মধ্যে উহা এক উগ্র আকার ধারণ করিয়াছিল। অল্পবয়সের উত্তেজনায় ও ভাব প্রবণতায় জ্যোতিরিন্দ্রের এই স্বাদেশিকতা হয়তো একটু উৎকেন্দ্রই হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে আবার বাহির হইতে দুই-একজন পাকামাথাও আসিয়া জুটিলেন। এগুলি অর্থহীন হইলেও অনর্থক নয়। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশকে দেশীভাবাপন্ন করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল এই সকল কার্যকলাপ। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এই 'স্বাদেশিকতা' বর্ণনায় তাই কৌতুক বোধ করিলেও ইহা অশ্রদ্ধার বস্তু নহে। এই প্রবন্ধে এইভাবে কৌতুক রসে রসসিক্ত করিয়া নিজ পরিবার ও পরিবার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাদেশিকতা বর্ণনা করিয়াছেন, বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতা বিষয়ে কোন মৌলিক আলোচনা করেন নাই। সুতরাং ইহার শিরোনাম সার্থক হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না।

সমালোচনা—স্বাদেশিকতা প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতীত জীবনের একটি দিক্ খুলিয়া ধরিয়াছেন। শৈশব হইতে যে পরিবেশে তিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বাহ্যতঃ পুরাপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন বলিয়াই বোধ হইত। ইহার মধ্যে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ কোথা হইতে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাইলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরই এই বিবরণ। স্বদেশের প্রতি এই আন্তরিক শ্রদ্ধা তিনি তাহার পিতার নিকট হইতেই সবপ্রথম পাইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম যেমন আন্তরিক তেমনই ছিল সুদৃঢ়। সেকালে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এ-বস্তুটির বিশেষ অভাব ছিল। স্বদেশ দূরের কথা, দেশের ভাষার প্রতিও তাহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। এমন দিনে মহর্ষির দেশপ্রেম দুর্লভ মহত্ত্বে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিত এবং তাহাই সমগ্র ঠাকুর-পরিবারটির মধ্যে স্বদেশপ্রীতির একটা গভীর আবেগ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবেই সর্বপ্রথম দেশের প্রতি অনুরাগ শিক্ষা করেন। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুমেলার প্রভাবও তাঁহার মধ্যে স্বাদেশিকতা পুষ্ট করে। তৃতীয়তঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঞ্জীবনী সভা' বালক রবীন্দ্রনাথকে এককালে রীতিমতো মাতাইয়া

তুলিয়াছিল। ইহা ছাড়া মনীষীপ্রবর রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ স্পর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার পক্ষে বহুল পরিমাণে পুষ্টিকর হইয়াছিল।

আলোচ্য প্রসঙ্গটির বিষয়বস্তু মোটামুটি ইহাই। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র অংশ-হিসাবে ইহার একটি বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্র-জীবনের মূলে যে প্রগাঢ় দেশপ্রীতি ও জাতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধে গৌরববোধ দেখি—তাহারই বীজাঙ্কুর কোথায়, সেই সন্ধান এই বিবরণে আছে। তাহা ছাড়া বিবরণ-হিসাবে তো প্রসঙ্গটির স্বতন্ত্র মূল্য আছেই। ছেলেবেলার কথা পরিণত বয়সে ভাবিতে বসিলে সকলেই কিছু-না-কিছু কৌতুক বোধ করে। রবীন্দ্রনাথও সেই কৌতুকবোধ লইয়াই তাঁহার বাল্যকালের স্বাদেশিকতা বর্ণনা করিয়াছেন। শুধুমাত্র আবেগ ও উত্তেজনায় মাতিয়া সেকালে তাঁহারা যাহা করিতেন সেগুলি অনেকক্ষেত্রেই অর্থহীন, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। রবীন্দ্রনাথ উহার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। সেকালে বাঙালীজীবন এমন এক নিস্তরঙ্গ বদ্ধদশায় উপনীত হইয়াছিল যে, কেহ তাহার বিচিত্র শক্তিকে চালনার সুযোগ পাইত না। তাই নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা কয়েকটি আবেগপ্রবণ ব্যক্তির মধ্যে যে বীরত্বের স্পৃহা প্রবুদ্ধ করে তাহা নানান দিকে বিকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য বাল্য-জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্যদের 'সঞ্জীবনী সভা'য় 'উত্তেজনার আগুন' পোহাইতেন।

কিন্তু 'সঞ্জীবনী সভা'র খ্যাপামির তপ্ত হাওয়াকে রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাতে বিষ না থাকিলেও হুলের খোঁচাটা বেশ স্পষ্ট। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও, রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় মনস্বী যাহার সভাপতি তাহা এমন লঘুহাস্যে উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। বীরত্বের প্রহসনও সময় সময় একটা উপযোগিতা বহন করে। তাহাতে ফোর্ট উইলিয়মের একখণ্ড ইটও না খসিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রভাবে মানুষের অন্তরলোকে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আসল কথা 'সঞ্জীবনী সভা'র উগ্র মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথ যে এককালে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে কথাটা পরবর্তী কালে তিনি মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

এই 'সঞ্জীবনী সভা' ইটালীর বিখ্যাত নেতা মাৎসিনির বিপ্লবাত্মক গুপ্ত সভার ক্ষীণ অনুকরণেই গঠিত হয়। ইটালীর গুপ্ত সভাটির নাম ছিল 'কার্বোনারী

(Carbonari) বা 'কাঠপোড়ানি'। ইহাদের সাংকেতিক ভাষা ও অনুষ্ঠানাদি ছিল কাঠপোড়ানিদের ভাষা হইতে গৃহীত। কাজেই দলের সভ্য ছাড়া অন্যেরা ইহাদের ভাষা বুঝিত না। 'সঞ্জীবনী সভা'রও তেমনি সাংকেতিক নাম ছিল—'হাঞ্চু পামু হাফ' এবং ইহার কার্যবিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক অদ্ভুত গুপ্তভাষায় লিখিত হইত। লাল রেশমে জড়ানো একটি বেদমন্ত্রের পুঁথি, দুইটি মড়ার মাথার খুলি (Skull), খুলিগুলির চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি—এই ছিল সভার উপকরণ। মড়ার মাথার খুলি মৃত ভারতের প্রতীক; মোমবাতি জ্বালাইবার অর্থ—এই ভারতকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে, ভারতের জ্ঞানচক্ষু খুলিতে হইবে। সভার প্রারম্ভে ঋক্‌মন্ত্রে উদ্গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম্"।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' লিখিবার সময় এই 'সঞ্জীবনী সভা'র নাম উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী সভা' বাঙলার বিপ্লববাদের হয়তো পথনির্দেশ দিয়াছে এবং 'জীবনস্মৃতি' লেখার সময় সত্য সত্যই সরকারের "সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া" উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পন্থা পরিবর্তনের হেতু আর অনুমান করা প্রয়োজন হইবে না। তবে রবীন্দ্রজীবনী-লেখক প্রভাতবাবুর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: " 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাঙালীর মৃতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি দান করিবার জন্য তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আজ সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্বজনীন পোশাক, তাঁহার শিকার করা ও শিকার শেখানোর উদ্যম, তাঁহার তাঁত ও দিয়াশলাই এর কল করিবার জন্য প্রয়াস, সর্বশেষে স্বদেশী স্টীমার কোম্পানী খুলিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইবার কাহিনী আজ বিস্মৃত ইতিহাসের মধ্যে গিয়াছে; কিন্তু বাঙালীর সকল প্রকার স্বাদেশিকতার মূলে এই মহাত্মার ব্যর্থজীবনের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে। সেকথা ভুলিলে জাতীয় কৃতঘ্নতা হইবে।"

তবু জ্যোতিদাদার শিকার ও স্বদেশী দিয়াশলাই ও কাপড়ের কল-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিবরণ উপভোগ্য। কারণ এই অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠিক উপহাস করেন নাই, অতীতকে যেন উপভোগ করিয়াছেন। বড়লোকের স্বাদেশিকতা যেটুকু আবেগসর্বস্ব সেইটুকু আন্তরিক এবং এই আন্তরিকতা বালকোচিত ছেলেখেলায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও উপেক্ষার বস্তু হয় না। ইহাকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়াছেন, আমরাও তাহাতে যোগ দিতে পারি। কিন্তু

ব্যাপারটার ব্যবহারিক গুরুত্ব যাহাই হউক, নৈতিক মূল্য উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্তরে এইরূপ আবেগপ্রবণতা সর্বত্রই ছিল। তাই বলিয়া জাতীয় জাগরণের মূলে এইসব তথাকথিত পাগলামির দান অল্প ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এইদিক দিয়া বিষয়টিকে দেখেন নাই। নিজের শৈশব লইয়া পরিণত বয়সে আমরা যেরূপ কৌতুকবোধ করি, বাঙালীর স্বাদেশিকতার শৈশব লইয়া রবীন্দ্রনাথ তেমনি একটা কৌতুকহাস্য উপভোগ করিয়াছেন। ব্রজবাবু ও রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া এই অংশে রবীন্দ্রনাথ নির্মল হাস্য করিয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণে বক্রোক্তি আর রসস্নিগ্ধ উপমা-তুলনা বাস্তবিক অনবদ্য।

বিবরণটির শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গ হইতে হঠাৎ বিদায় হইয়াছেন এবং মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর একটি অপূর্ব লেখা চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী সভা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর প্রতি পরোক্ষভাবে একটা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, এই অপরাধ-শোধনের জন্যই সচেতনভাবে রাজনারায়ণ বসুর মহিমময় স্বরূপটি তিনি সবশেষে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যে-ভাবেই হউক, অল্পপরিসর বর্ণনায় এমন সুন্দর চরিত্র-চিত্রণ একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই সাধ্য।

সংক্ষিপ্তসার—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। সে সময়ে শিক্ষিত লোকে দেশের ভাব ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলেও, মহর্ষির পুত্রদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা ও সমাদর বরাবরই ছিল। ঠাকুর-পরিবারের সাহায্যে 'হিন্দুমেলা' বলিয়া একটা মেলার অনুষ্ঠান হইত। তাহাতেই প্রথম ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তিসহকারে ভাবিবার চেষ্টা হয়। এই মেলায় স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই সমাদর দেখানো হইত। বালকবয়সে রবীন্দ্রনাথ একবার 'হিন্দুমেলা'য় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। সেটি লর্ড লিটনের আমলের দিল্লী-দরবার-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল। তরুণসুলভ উত্তেজনার অভাব তাহাতে না থাকিলেও সরকারকে তাহা মোটেই বিচলিত করে নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে একটা পোড়ো-বাড়িতে একটি গুপ্তসভার অধিবেশন হইত। সভার সবকিছুই হইত গোপনে, পরিবারের অন্য সকলের অজ্ঞাতসারে। বালক রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য

ছিলেন। তাঁহাকে কিছুই করিতে হইত না, তবু সমস্ত অনুষ্ঠানটির গোপনীয়তায়, উৎসাহ ও উত্তেজনায় তিনি রোমাঞ্চিত হইতেন। কার্যক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইবার কোনো উপায় সভ্যদের ছিল না; তাই সভাসমিতি বাক্যালাপ ও গানের মাধ্যমে মানবধর্মের অঙ্গীভূত এই বীরধর্ম প্রকাশ করিতে হইত। বীরত্বপ্রকাশের সুষ্ঠু পথ না থাকায় একটা নিরর্থক উত্তেজনার স্রোত সকলের অন্তরে গোপনে প্রবাহিত হইত। সভায় যাহা হইতেছিল তাহা বীরত্বের অভিনয় মাত্র; কিন্তু সরকারের সন্দেহ হইলে তাহারও পরিমাণ হয়তো শুভ হইত না। সভার সেই হাস্যকর কার্যে ইংরেজ সরকারের কোনো অনিষ্টই হয় নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবিবারে রবিবারে দলবল লইয়া শিকারে বাহির হইতেন। আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকিত না; সঙ্গে থাকিত প্রচুর লুচি-তরকারি। রবাহূত অনাহূতের ভিড জমিয়া যাইত। কিন্তু পশুপাখি একটাও মারা পড়িত না, কেবল হইত মানিকতলার কোনো পোড়োবাগানে ঢুকিয়া লুচি-তরকারির সদ্গতি। মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজবাবু এইরূপ একজন উৎসাহী 'শিকারী' ছিলেন। একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়া তিনি মালীর কাছে নিজেকে বাগানের অধিকারীর ভাগিনেয় বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিলেন এবং তাহাকে দিয়া ডাব পাডাইয়া ইচ্ছামতো সকলকে খাওয়াইলেন।

সভার সভ্যগণের মধ্যে একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু জমিদার ছিলেন। গঙ্গার ধারে তাঁহার একটি বাগান ছিল। একদিন সকল সভ্য সেখানে গিয়া একত্র ভোজন করিলেন। বৈকালে তুমুল ঝড আরম্ভ হইলে সকলে তীরে দাঁডাইয়া সমস্বরে গান জুড়িয়া দিলেন। অসঙ্গীতজ্ঞ বৃদ্ধ রাজনারায়ণও তুমুল উৎসাহে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে গলা ছাড়িয়া যোগ দিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিলে রাত্রির গভীর অন্ধকারে সকলে গ্রাম্যপথে গাডি করিয়া ফিরিলেন।

দেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা-স্থাপনও সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য সভ্যেরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। অনেক চেষ্টার পর কয়েক বাক্স দিয়াশলাই তৈয়ারি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে খরচ যেমন অতিরিক্ত হইল তেমনি হইল জ্বালাইবার অসুবিধা। আগুন ছাড়া, জ্বালানো যাইত না বলিয়া সে দিয়াশলাই বাজারে চলিল না।

একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈয়ারি করিতেছে শুনিয়া সকলেই

পরম উৎসাহ ও আশায় কল দেখিতে গেলেন। ছাত্রটিকে দেনা মিটাইবার জন্য অর্থসাহায্য করা হইল। অবশেষে দেখা গেল সেই কলে গামছা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এমনই একখানা গামছা মাথায় জড়াইয়া একদিন ব্রজবাবু ঠাকুরবাড়িতে গিয়া উল্লাসে নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। পরে দুইজন বুদ্ধিমান্ লোকের পরামর্শে কাপড়ের কল গড়িবার সংকল্প ত্যাগ করা হইল।

বাল্যকাল হইতেই রাজনারায়ণবাবুর সহিত পরিচয় থাকিলেও লেখক তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার মধ্যে নানা বিপরীত গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। পক্ককেশ বৃদ্ধ হইলেও দলের সর্বকনিষ্ঠের সহিতও তিনি অবাধে মিশিতেন। বাহিরের প্রবীণতার অন্তরালে মনটি ছিল তাঁহার চিরনবীন। পাণ্ডিত্য, বয়স, রোগশোক, সংসারের নানা দুঃখকষ্ট—কিছুতেই তাঁহার প্রফুল্লতা নষ্ট করিতে পারে নাই। নিজের জীবন ও সংসারের ভার ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি দেশের হিতচিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকিতেন। বাঙলাভাষায় অনভ্যস্ত হইলেও তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত বাঙলাসাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। দেশের দৈন্য, খর্বতা ও অপমান তাঁহাকে মর্মাহত করিত। শিশুর ন্যায় সরল আত্মভোলা এই মানুষটিই ছিলেন তেজস্বিতার আধার, এবং এই তেজ মিশিয়াছিল তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমে। স্বদেশের নামে তাঁহার দুইচক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। উৎসাহে আত্মহারা হইয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে সকলের সহিত দেশাত্মবোধের গান আরম্ভ করিয়া দিতেন। চিরতরুণ সদাহাস্যময় এই ব্যক্তির পবিত্র জীবন দেশবাসীর স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া থাকিবার যোগ্য।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। **পিতৃদেবের**—রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। কলিকাতায় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ইঁহার জন্ম, মৃত্যু ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। আন্তরিক শ্রদ্ধা—অকৃত্রিম অনুরাগ। **জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও**—জীবনের সর্ববিধ গুরুতর পরিবর্তন বা ওলট-পালটের মধ্যেও। ঠাকুর-পরিবারে দেবেন্দ্রনাথই দেশপ্রচলিত ধর্ম ছাড়িয়া প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহী হন। তাহা ছাড়া তাঁহার জীবদ্দশায়ই পরিবারে পাশ্চাত্ত্য আদবকায়দার প্রবর্তন। এইগুলিকে 'বিপ্লব' বলা যাইতে পারে।

আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে। **সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়**—বাঙলাদেশে স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত ঋত্বিক্ বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ যে সময়ের কথা লিখিতেছেন সে সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে, বাঙালীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন হয় নাই। পরে বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালীর স্বাদেশিকতার জাগরণ ও পুষ্টি করিতে থাকেন। **শিক্ষিত লোক**--ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক। নবপ্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মোহে শিক্ষিত বাঙালী তখন স্বদেশের সব-কিছুই অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন। মাতৃভাষার—বাঙলাভাষার কোন নূতন আত্মীয়—সম্ভবতঃ নূতন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ কোনো আত্মীয়। সে পত্র লেখকের ইত্যাদি—চিঠিখানা ইংরেজীতে লিখিত বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা দেবেন্দ্রনাথের মাতৃভাষা-প্রীতির উদাহরণ।

অ. ২। **হিন্দুমেলা**—বাঙলা ১২৭৩ (ইংরেজী ১৮৬৭) চৈত্রসংক্রান্তিতে 'চৈত্রমেলা' নামে এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়, পরে প্রতিবৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের মনে আত্মনির্ভরতা, জাতীয় ভাব তথা স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটানো। বাঙালীর স্বাদেশিকতার ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান ঘটনা। অবশ্য ইহার 'হিন্দুত্ব' মূল্য কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। **নবগোপাল মিত্র**—'ন্যাশনাল পেপার'-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। কর্মকর্তারূপে—প্রথম কয়েক বৎসর 'হিন্দুমেলা'র সম্পাদক বা প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র ছিলেন সহকারী সম্পাদক। পরে গণেন্দ্রনাথ ইহার কর্তৃত্ব ত্যাগ করিলে নবগোপাল সম্পাদক হন। **মেজদাদা** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনিই প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। বলিতে গেলে বাঙালী নারীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক পর্দাবিলোপের ইনিই পথপ্রদর্শক। **মিলে সবে ভারতসন্তান**- গানখানির প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরূপ :

"মিলে সবে ভারতসন্তান
একতান, এক মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটক'-এর প্রথম অঙ্কে সম্পূর্ণ গানখানি সন্নিবেশিত আছে।

অ. ৩। **লর্ড কর্জনের সময়**—লর্ড কর্জন যখন ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন তখন (১৮৯৮-১৯০৫) প্রথম বঙ্গভঙ্গ ইঁহারই কুকীর্তি। দিল্লী-দরবারে--কর্জনের সময় দিল্লী-দরবার হয় ১৯০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে। সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিসেক-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই মহাসভায় বহুদিন ধরিয়া বিপুল সমারোহ ও উৎসবাদি হয়। **গদ্য প্রবন্ধ**—প্রবন্ধটির নাম 'অত্যুক্তি'। **লর্ড লিটনের সময়**—লর্ড লিটন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত; তাঁহার সময়ে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীতে আর একটি দরবার-সভার অনুষ্ঠান হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এজন্য কোনো উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করিলে দিল্লী-দরবার হইতে সেই কথা ঘোষণা করা হয়। পদ্যে—এই কবিতাটির কোনো নাম নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ইহা স্থান পাইয়াছে। কবিতাটিতে অতীতের সহিত তুলনায় বৃটিশ শাসনে ভারতের দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। **তখনকার**—লর্ড লিটনের সময়—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন দিল্লী-দরবার হয়, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল প্রায় ষোলো (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ 'মে' মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়)। কর্জনের সময় যখন দিল্লী-দরবার হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ রচনা করেন কর্জনের লাটগিরির সমকালে। **তখনকার ইংরেজ গভর্মেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত**--রুশিয়া ছিল তখন প্রবলপ্রতাপ জারের শাসনাধীন। রুশিয়ার সহিত ইংরেজদের শত্রুতাও ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে এই ঘটনার পূর্বে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬) হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে ইংরাজের কোনো লাভই হয় নাই। তাহা ছাড়া আফগানিস্থানের আমীর শের আলি গোপনে রুশিয়ার সহিত চক্রান্ত করিতেছিলেন বলিয়া এই সময়ে (১৮৭৮) আফগান যুদ্ধও ঘটিয়াছিল। ইংরেজ সরকার যে সত্যই রুশিয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা মনে করিতেন যে কোনো মুহূর্তে রুশিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে। বয়সোচিত উত্তেজনা —বালকসুলভ উদ্দীপনা। **নবীন সেন**—বাঙলার খ্যাতনামা কবি। ইহার

'অবকাশ-রঞ্জিনী', 'পলাশীর যুদ্ধ', রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'অমিতাভ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

অ. ৪। জ্যোতিদাদা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক্রমে দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের নামঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী, **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,** স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্র সুসাহিত্যিক ও সুকবি ছিলেন। 'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া এবং অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। সঙ্গীতরচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইহা ছাড়া ইনি 'ভারতী' মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছেন। **একটি সভা**—এই সভার নাম 'সঞ্জীবনী সভা'। ইহার সাংকেতিক নাম 'হা ম্ চু পা মু হা ফ'। **বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু**—রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)। ইনি একজন বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী, ধর্মপ্রাণ ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। 'সেকাল আর একাল' ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দ ইঁহারই দৌহিত্র। **কলিকাতার এক গলির মধ্যে** ইত্যাদি—ঠন্ঠনের এক পোড়োবাড়িতে এই সভার অধিবেশন হইত। "ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারে দীক্ষা পেলাম।" **ঋক্‌মন্ত্রে**—ঋগ্‌বেদের মন্ত্র ("সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্") উচ্চারণ করিয়া। রোমহর্ষণ—রোমাঞ্চ; গায়ের লোম খাড়া হওয়া। **আমার মতো অর্বাচীনও**—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ হইবে। খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে—পাগলামির উত্তেজনাকর পরিবেশের মধ্যে। **উত্তেজনার আগুন পোহানো**—শীতকালে আগুন পোহাইলে যেমন দেহে আরাম লাগে, তেমনি উত্তেজনার মধ্যে থাকিলেও মনে একপ্রকার আনন্দানুভূতি হয়। **বীরত্ব জিনিসটা কোথাও** ইত্যাদি—অর্থাৎ বীরত্ব দেখাইতে গেলে অনেক সময় বিপদেও পড়িতে হয়। ইহার ধাক্কা—বীরত্বের আবেগ। সেই ধাক্কাটা···করিয়াছি—যে-কোনো প্রকারে হউক বীরত্ব প্রকাশ করিতে হইবে, এই আবেগের মোড় ফিরাইয়াছি। **তাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া**—বীরত্বপ্রকাশের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া। বস্তুতঃ তথাকথিত 'অসামরিক' বাঙালীর পক্ষে বীরত্ব প্রকাশ করিবার কোনো উপযুক্ত

ক্ষেত্র ছিল না। কেরানিগিরির রাস্তা—ইংরেজী শিখিয়া সরকারী দপ্তরে কেরানী হইবার পথ। **নহিলে মানবধর্মকে সাড়া দেওয়া হয়**—বীরধর্ম মানবধর্মেরই অঙ্গীভূত এবং বীরোচিত কার্যকলাপের মধ্য দিয়াই এই বীরধর্মের উদ্বোধন ও পুষ্টি ঘটে। বীরত্বের অনুশীলন না হইলে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। **অন্তঃশীলা**—গোপনে গোপনে প্রবহণশীলা। সন্দিগ্ধতা—সন্দেহ। **বীরত্বের প্রহসন-মাত্র অভিনয় করিতেছিল**—প্রকৃত বীরোচিত কাজ না করিয়া বীরত্বের একপ্রকার হাস্যকর অভিনয় করিতেছিল। **ট্রাজেডি** (tragedy) বিয়োগান্ত নাটক; মর্মান্তিক ঘটনা অর্থাৎ কঠিন রাজদণ্ড। সাঙ্গ—সমাপ্ত; শেষ। **ফোর্ট্ উইলিয়ম**—সুতানুটি গ্রামে কুঠি রক্ষা করিবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে উহার নাম 'ফোর্ট উইলিয়ম' রাখে। বর্তমানে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একই নাম বহন করিলেও অনেক পরে নির্মিত হয়। পূর্বেই দুর্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের মত যে বর্তমান কলিকাতা জেনারেল পোস্ট আফিস যেখানে অবস্থিত সেখানে পূর্বের দুর্গটি ছিল। **ফোর্ট…খসে নাই**—অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের কোনো অনিষ্টই হয় নাই। **রবাহূত**—যাহারা সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছে। **অনাহূত**—যাহাদের ডাকা বা নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। নগণ্য—হিসাবের মধ্যে আনিবার মতো নয়। **হত আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব**—প্রকৃত শিকার হইলে কিছু পশুপাখি অবশ্যই আহত বা নিহত হইবে; এইরূপ পশুপাখিরই যখন অভাব হইত এবং সে অভাবটার জন্য কেহই দুঃখিত হইত না, তখন বুঝিতে হইবে শিকারটা উপলক্ষ মাত্র—আসল লক্ষ্য সকলে মিলিয়া কিছু হৈ-চৈ এবং খাওয়া-দাওয়া করা। **বউঠাকুরানী**—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। **ঐ জিনিসটা শিকার** ইত্যাদি—লুচি-তরকারি বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যাইত বলিয়া দলের কাহাকেও না খাইয়া থাকিতে হইত না। রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করিয়া বলিতেছেন যে, লুচি-তরকারি যদি পশুপাখি হইত এবং শিকার করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হইত তবে সকলের ভাগ্যে অবশ্যই উপবাস ঘটিত, কারণ শিকার কিছুই জুটিত না।

অ. ৫-৬। কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম। পাত্রটা খাদ্যবস্তু নয় বলিয়াই রক্ষা পাইত, খাদ্যবস্তু হইলে নিমেষে উদরসাৎ হইত। **ব্রজবাবু**—

ব্রজনাথ দে। ইহার পরিচয় লেখক নিজেই দিয়াছেন। **অহিংস্রক শিকারী**—জীবহত্যা না করিয়াও শিকারী অর্থাৎ নির্জীব লুচি-তরকারির শিকারী। **মেট্রোপলিটান কলেজ**—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত কলেজ। প্রথমে তিনি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলকেই কলেজে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এই কলেজের নাম বিদ্যাসাগর কলেজ। **শশব্যস্ত**—ব্যস্তসমস্ত।

অ. ৭। একটি মধ্যবিত্ত জমিদার। এই ব্যক্তিটি কে তাহা জানা দুষ্কর। **গান জুড়িয়া দিলাম**—'আজি উন্মাদ পবনে' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গানখানি তখন গাওয়া হইয়াছিল। সাতটা সুর—ষড্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সাতটি স্বর। সংক্ষেপে ইহাকে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি বা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি বলা হয়। রাজনারায়ণ বাবুর...তাহা নহে—অর্থাৎ রাজনারায়ণবাবু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, তাঁহার কণ্ঠে সাতটি সুর নির্ভুলভাবে বাহির হইত না। **সূত্রের চেয়ে ভাষ্য** ইত্যাদি—ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতির সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য; কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা বা ভাষ্য সাধারণতঃ সুবিস্তৃত হয়। **আগুনের 'হরির লুঠ'**—প্রকৃত হরির লুটে বাতাসা বা মণ্ডা ছড়ানো হয়; কিন্তু এখানে ছড়াইবার বস্তু বাতাসা নয়, আগুনের ফুলকি।

অ. ৮। **উপযুক্ত হাতে খ্যাংরা কাঠির** ইত্যাদি—বাঙলাদেশে স্ত্রীলোকেরা ঝগড়ার সময় কখনো কখনো খ্যাংরা-কাঠি অর্থাৎ ঝাঁটা দিয়া প্রতিপক্ষকে প্রহার করেন। কাঠিগুলি কাঁটার মতো গায়ে ফোটে। সে জ্বালা বিষম। **ভারত-সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন** ইত্যাদি—যে দিয়াশলাই তৈয়ারি হইল তাহা দুইদিক হইতেই মূল্যবান। ভারতবাসীর স্বাদেশিকতার নিদর্শন বলিয়া ইহার ভাবমূল্য অসামান্য; ইহা তৈয়ারি করিতে সত্যই প্রচুর খরচা হইয়াছিল বলিয়া ইহার বস্তুমূল্যও যথেষ্ট। **নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে** ইত্যাদি—অর্থাৎ সাধারণ দিয়াশলাইয়ের মতো সে দিয়াশলাই ঘষিয়া জ্বালানো যাইত না। **দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ** ইত্যাদি—দেশপ্রেম যতই তীব্র হউক না কেন, তাহা দিয়া দিয়াশলাই জ্বালানো যায় না। কাজেই যে দিয়াশলাই ঘষিয়া জ্বালানো যায় না তাহা স্বদেশে প্রস্তুত হইলেও বাজারে অচল।

অ. ৯-১০। **কিন্তু বিশ্বাস করিবার** ইত্যাদি—কিন্তু একটা কিছু

হইতেছে যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে দেশের বড় কাজ হইবে—এইরূপ বিশ্বাস ও আশা আমাদের অসীম ছিল। **আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল** ইত্যাদি—বাইবেলের কাহিনী এই যে ঈশ্বর প্রথম মানব আদম ও প্রথম নারী ঈভকে স্বর্গোদ্যানে বাস করিবার সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় ঈভ এই ফল আস্বাদন করেন এবং এই পাপের ফলে আদম ও ঈভ স্বর্গরাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া পৃথিবীতে আসেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে দুইজন বুদ্ধিমান লোকের উপদেশে যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহারা পণ্ডশ্রম করিতেছেন, তখন তাঁহাদের সব আশা ও বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গেল।

অ. ১১। বৈপরীত্যের—পরস্পরবিরোধী ভাবের। **বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না**—বয়সের তফাত থাকিলেও মেলামেশা ও হৃদ্যতার কোনো বাধা ছিল না। **শুভ্র মোড়কটির মতো**—সাদা আবরণটির ন্যায়। **তাঁহার বাহিরের……রাখিয়া দিয়াছিল**—বাহিরে প্রবীণ হইলেও মনটি ছিল তাঁহার চিরনবীন। অস্বাস্থ্য—অসুস্থতা; অসুখবিসুখ। **'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'**—এই অংশটি উপনিষদের একটি কবিতার প্রথম চরণ। সমগ্র কবিতাটি এই: "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥।" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৩; কঠোপনিষৎ ১।২।২৩)।—এই আত্মাকে বহু বেদ-অধ্যয়নের দ্বারা ('প্রবচনেন') গ্রন্থের অর্থ ধারণা করিবার শক্তির দ্বারা ('মেধয়া'), বহু শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণের দ্বারা ('বহুনা শ্রুতেন') লাভ করা যায় না। ইনি (আত্মা) যাহাকে বরণ করেন সে-ই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। তাহার নিকট আত্মা স্বরূপ প্রকাশ করেন; রাজনারায়ণ বসু-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য এই যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং বিপুল অভিজ্ঞতা রাজনারায়ণের সরল উচ্চহাস্যপ্রিয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। **প্ল্যান** (plan)—পরিকল্পনা। **রিচার্ড্‌সন**—হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক Captain D. L. Richardson। শেক্সপীয়ারের নাটক এমন সুন্দরভাবে ইনি পড়াইতেন যে ছাত্রগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইঁহার নিকট অধ্যয়নের ফলে মধুসূদনের কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। রিচার্ডসন পরে নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মাটির মানুষ—সাদাসিধা আত্মভোলা

মানুষ (বাঙলা ইডিয়ম)। একসূত্রে বাঁধিয়াছি ইত্যাদি—এই বিখ্যাত গানটি রবীন্দ্রনাথেরই রচিত। তেজঃপ্রদীপ্ত—তেজে উজ্জ্বল।

ব্যাখ্যা

(১) তখনকার ইংরেজ গভর্মেণ্ট……ভয় করিত না। (অ. ৩)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা'-শীর্ষক বিবরণপ্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। বাল্যকালে স্বাদেশিকতার আবেগে রবীন্দ্রনাথ যে সকল উগ্র গদ্য-পদ্য রচনা করিতেন তাহার বিবরণপ্রসঙ্গেই এই অংশটি আসিয়াছে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দিল্লীর দরবার-সম্বন্ধে একটি আক্রমণাত্মক কবিতা রচনা করেন। তখনো তাঁহাদের বাড়িতে হিন্দুমেলার অধিবেশনাদি হইত। নবগোপাল মিত্র মহাশয় ছিলেন তাহার কর্মকর্তা। এই হিন্দুমেলারই একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত কবিতাটি পাঠ করেন। উহাতে এমন বস্তু ছিল যাহা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কিন্তু সেদিনকার সরকার এমন চৌদ্দ-পনের বছরের বালক-কবির লেখাকে ভয় করিত না। বস্তুতঃ সেকালে রুশিয়ার আতঙ্কেই ইংরেজ সরকার বিশেষভাবে আবিষ্ট ছিল। আমরা জানি ঠিক সেই সময়টাতেই যে আফগান যুদ্ধ বাধে তাহার কারণ রুশিয়ার প্রতি ইংরেজ সরকারের এই আতঙ্কই বটে। বিপদ্ যে অন্য কোথা হইতেও আসিতে পারে—একথা তাহারা কল্পনাও করিত না। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের এত উগ্র আক্রমণাত্মক কবিতাটির প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নাই।

(২) এই সভায় আমাদের……আগুন পোহানো। (অ. ৪)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালের উগ্র স্বাদেশিকতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে এখানে 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা বলিয়াছেন। পঙ্ক্তিটি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা'-শীর্ষক অধ্যায়ের অংশ।

ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলের একটি পোড়োবাড়িতে "সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্তসমিতির বৈঠক হইত। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার প্রতিষ্ঠাতা, স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইহার সভাপতি। সভার কাজের মধ্যে সর্বত্র একটা গোপনতার ভাব ছিল। এইটাই সভাটির মধ্যে একটি রহস্যময় ভয়ংকরতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। তারপর বক্তৃতার আলোচনায় এবং সংকল্পগ্রহণেও বোধ হয় একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব থাকিত, সভাগৃহে একটা টেবিলের উপর লাল রেশমী কাপড়ে জড়ানো একখানি ঋক্‌মন্ত্রের পুঁথি থাকিত, তাহার উভয় পার্শ্বে থাকিত দুইটি মড়ার মাথার খুলি,

সেই খুলির দুই চক্ষুকোটরে জ্বলিত দুইটি মোমবাতি। খুলিটি মৃত ভারতের প্রতীক, মোমবাতি তাহাতে নূতন প্রাণ, নূতন জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করারই সংকেত। ইটালীর মাৎসিনির 'কার্বোনারী' নামক গুপ্তসমিতির অনুকরণে ছিল এই সমিতি গঠিত। বালক রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত অল্পবয়স্ক হইলেও উহার সভ্য ছিলেন। অন্যদের সহিত তিনিও সেখানে সত্যই কি করিতেন, তাহা তখন তাঁহার মনেও আসিত না। সেখানে তাঁহারা কেবল সেই উত্তেজনার আবহাওয়ায় উগ্র স্বাদেশিকতাবোধকে চরিতার্থ করিতেন। এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ চমৎকার একটি রূপকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শীতের দিনে আগুন পোহানো বেশ আরামদায়ক। সেই সময়টায় নির্বীর্যতায় দেশও যেন একটা অন্তরলোকের শীত-ঋতুতে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই মানসিক শীতার্ততার পক্ষে উত্তেজনা ছিল আগুনের মতো আরামদায়ক। 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্যবৃন্দ বীরত্বের কথা আর উগ্রতার কথায় সেই উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন এবং তাহার মধ্যে আগুন-পোহানোর মতো একপ্রকার আরাম পাইতেন। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে পিছনের দিকে তাকাইয়া এইভাবেই তাঁহার বাল্যের উগ্র স্বাদেশিকতাকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৩) তাহার অভাবে কেবলই……পরিমাণ অভাবনীয়। (অ. ৪)

'সঞ্জীবনী সভা'-নামক গুপ্ত সমিতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশে-এই ধরনের গুপ্তসমিতির উদ্ভব ও উত্তেজনা সম্বন্ধে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা'-শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্গত।

'সঞ্জীবনী সভা'য় রবীন্দ্রনাথ অন্যদের সহিত একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশাত্ম-বোধে মাতিয়া থাকিতেন। সেকালে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের চেতনা বীরত্বের কাজে অভিব্যক্তি খুঁজিত। কিন্তু ইংরেজ শক্তির সুকৌশল পরিকল্পনায় এই অভিব্যক্তির কিছুমাত্র সুযোগ ছিল না। বস্তুত বাঙালীজীবন তখন একটা বদ্ধ জলার মতো নিস্তরঙ্গ অবস্থায় পচিতে শুরু করিয়াছে। এই অবস্থায় নানা কারণে যখন কয়েকজনের মধ্যে বীরত্ব কামনার একটা ধাক্কা লাগিল, তখন তাহার বিক্ষোভ যেন হৃদয়ের বাঁধ উপচাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল,—উহাকে কিছুতেই সহজভাবে সামলানো গেল না। উত্তেজনাপূর্ণ গান ও বক্তৃতা, কল্পনা ও আলাপে সেই বীরত্বকামনাকে জ্বালাইয়া-পুড়াইয়াও শেষ করা যাইত না। কাজেই গুপ্তসমিতির এই চাপা উত্তেজনা (রবীন্দ্রনাথের মতে) একটা বিকারের সৃষ্টি করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সঞ্জীবনী সভা'র বিশেষ উদাহরণ ছাড়িয়া

একটা নির্বিশেষ সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের প্রবৃত্তিগুলির প্রত্যেকটিরই সহজ অভিব্যক্তির সুযোগ থাকা আবশ্যক। তাহাদের কোন একটিকে যদি চাপিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে মনে স্বাভাবিক নিয়মেই একটা বিকারের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ আমলে বাঙালীর বীরত্বের প্রবৃত্তি চাপা পড়িয়াছিল। বাহিরের কর্মে অভিব্যক্তির সুযোগ না পাইয়া উহা তাই গুপ্তসমিতির কার্যকলাপে একটা উত্তেজনার ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হইতে চাহিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে প্রবৃত্তির বিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার পরিণাম যে একটা কিছু অভাবনীয় হইয়া উঠিতে পারিত তাহাও অনুমান করিয়াছেন।

বাঙলার বিপ্লববাদের ভাবী ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের মধ্যে সত্য দেখিতে পাইবেন। সেকালে একমাত্র বাঙালীই 'অসামরিক জাতি' বলিয়া গণ্য হইত। কেরানীগিরি ছাড়া বাঙালীর আর কোনো কার্যক্ষেত্র ছিল না। জাতিহিসাবে ইহাতে বাঙালীর বিচিত্র চিত্তবৃত্তি লীলাক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইত না। অন্তরে অন্তরে কৃত্রিম অবস্থার চাপে সেইগুলি বিকৃত পথ কাটিয়া অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ধারায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে সেইদিকেই অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছিলেন।

(১৪) **অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে…আমরা হাসিতেছি।** (অ. ৪)

বিখ্যাত 'সঞ্জীবনী সভা'র বিবরণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন। মন্তব্যটি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা' শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মাৎসিনির 'কার্বোনারি' নামক গুপ্তসমিতির অনুকরণে এক গুপ্তসভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহারই নাম 'সঞ্জীবনী সভা'। এই সভায় সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতের মুক্তি কল্পনা করা হইত। এইজন্য সভার মধ্যে একটা গোপন উত্তেজনা বহিত, বীরত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও আলোচনাদি হইত। ইহা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে কোনো বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে এই সভা অবতীর্ণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই 'সঞ্জীবনী সভা'র গোপন অধিবেশনে যে সকল কার্যকলাপ হইত তাহাকে 'বীরত্বের প্রহসন-মাত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই সভার সভ্যবৃন্দ যেন ঠন্‌ঠনিয়ার একটা পোড়োবাড়ির গুপ্তকক্ষকে রঙ্গমঞ্চ করিয়া এই প্রহসনেরই অভিনয় করিত। অভিনয় সত্যের অনুকরণ মাত্র—প্রহসন আবার সত্যের অতিরঞ্জিত ও হাস্যকর অভিনয়। সেই অভিনয়ে একটা বিরাট রাজশক্তিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে খান খান করিয়া ফেলার আস্ফালন ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহার

দ্বারা সেই রাজশক্তির দুর্গদেওয়াল হইতে একটি ইটও খসানো যায় নাই। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাই 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা ভাবিয়া কৌতুক বোধ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে বর্জন করিয়াছিলেন। তাই 'সঞ্জীবনী সভা'র কার্যকারিতাকে তিনি পরিহাস করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'সঞ্জীবনী সভা'ই ছিল বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লববাদের পথপ্রদর্শক। পরবর্তী কালে 'সঞ্জীবনী সভা'র বীজ হইতে অঙ্কুরিত বহুতর গুপ্তসমিতি প্রহসনমাত্র ছিল না। তাহাদের কার্যকলাপ ইংরেজশক্তিকে একদিন সত্যই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' তাহার পূর্বেই লেখা হইয়া গিয়াছে।

(৫) রাজনারায়ণ বাবুর কণ্ঠে…করিতে লাগিল। (অ. ৭)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্যবৃন্দের এক ভোজ বর্ণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্যবৃন্দ একবার এক নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাগানবাড়িতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভোজ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। বিকালে ভীষণ ঝড় উঠিল। ঝড়ের উন্মাদনায়, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এই বিপ্লবী সভ্যবৃন্দও মাতিয়া উঠিলেন। গান ধরিলেন, 'আজি উন্মাদ পবনে' ইত্যাদি। 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি বিখ্যাত মনস্বী রাজনারায়ণ বসুও সেই গানেও যোগ দিলেন। কিন্তু তাহার কণ্ঠ যেমন ক্ষীণ তেমনি ছিল একটু বেসুরা। স্বরগ্রামের সাতটা সুর তাঁহার গলায় ঠিক খেলিত না। তবু তিনি গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিলেন। দুর্বল কণ্ঠের সে গান, সুরভঙ্গ ছাড়া হয়তো লক্ষ্যেই পড়িত না। তবু তাঁহার সে কি হাত-নাড়া আর মাথা-ঝাঁকুনি! হাত নাড়িয়া তিনি সুরের দুর্বলতার যেন ক্ষতিপূরণ করেন, মাথা ঝাঁকাইয়া যেন তাল রাখেন। রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করিয়া ইহার চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। তত্ত্বগ্রন্থে সূত্র বা মূল কথাটি সংক্ষিপ্তই থাকে; কিন্তু তাহার ভাষ্য বা বিশদ ব্যাখ্যা আয়তনে অনেক বেশি বিস্তৃত হয়। এখানে রাজনারায়ণবাবুর বেলাতেও গানটা ছোট, কিন্তু গানটার ব্যাখ্যা বা ভাবজ্ঞাপক হাত-নাড়া ও মাথা-ঝাঁকানি ছিল অত্যন্ত বেশি।' হাত ও মাথার এই অতিশয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বাতাস যেন পরম কৌতুকে মাতিয়া উঠিল এবং রাজনারায়ণবাবুর লম্বা লম্বা পাকা দাড়ির মধ্যে তোলপাড় শুরু করিল। রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণবাবুর এই বিবরণটির মধ্যে অপূর্ব একটি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সহৃদয় নির্মল হাস্যে বাঙলার স্বাদেশিকতার দাদু বলিয়া অভিহিত

মনস্বী রাজনারায়ণের অমিত উৎসাহ এখানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বয়সের পার্থক্য আর স্বরসাধনায় অক্ষমতা তাঁহার এই উৎসাহকে ব্যাহত করিতে পারিত না। তরুণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া চিরতরুণ এই বৃদ্ধ সর্বদা প্রাণ খুলিয়া গাহিয়া উঠিতেন।

(৬) দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ……বাজারে চলিত। (অ. ৮)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতির' 'স্বাদেশিকতা'-শীর্ষক অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত। সঞ্জীবনী সভা'র উদ্যোগী যে স্বদেশী দিয়াশলাই প্রস্তুত হয় তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত মন্তব্যে পরিহাস করিয়াছেন।

এই স্বদেশী দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে উদ্যোগীদের উৎসাহ যতটা ছিল ততটা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং বহু চেষ্টায় যখন তাহা প্রস্তুত হইল তখন দেখা গেল যে খরচা অনেক পড়িয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ একবাক্স দিয়াশলাইয়ের যাহা উৎপাদন-মূল্য হইল, তাহাতে একটা গোটা গ্রামের পুরা একটি বছর চুলা ধরাইবার ব্যবস্থা করা যাইত। তাহা ছাড়া সাধারণ ঘষাঘষিতেও আবার দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলিত না, তাহাতে আগুন ধরাইয়া তবে জ্বালাইতে হইত। সুতরাং এমন দিয়াশলাইয়ের চাহিদা হইল না; বাজারে চলিল না। দিয়াশলাইয়ের দহন-শক্তি উহার বারুদ ও শলাকার উপর নির্ভর করে। বারুদের বদলে প্রস্তুতকারীদের অগ্নিগর্ভ দেশাত্মবোধ যদি সেই দিয়াশলাইয়ের দাহিকাশক্তি বাড়াইতে পারিত, তবে তাহা বাজার হইতে আজও লুপ্ত হইত না। রবীন্দ্রনাথের এই পরিহাস-উক্তির ইঙ্গিত এই যে, প্রস্তুতকারীরা ছিল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত. তাহাদের দেশানুরাগ অন্তরে অগ্নিশিখার মতো জ্বলিত। সেই জ্বলন্ত অনুরাগ তো বাহির করিয়া দিয়াশলাইয়ের শলাকায় মাখানো যায় না। তাহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বারুদ লাগাইয়া সহজে দাহ্য করিতে হয়। 'সঞ্জীবনী সভা'র উৎসাহিবৃন্দ একথা বুঝেন নাই। দিয়াশলাইটা দেশী হইলেই চলে না, ইহার কার্যকারিতা ও সস্তা দাম—এই দুইটাই হইল উহার চাহিদার হেতু। স্বদেশী দিয়াশলাইয়ের দুইটার কোনটাই ছিল না। ছিল খালি উহার পিছনে গুটিকয়েক লোকের জ্বলন্ত দেশপ্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম দিয়াশলাইয়ের জ্বলনশীলতা বাড়ায় না, কাজে কাজেই সেই স্বদেশী দিয়াশলাইয়ের প্রচলন হইল না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সার কথা।

(৭) অবশেষে দুই একটি……স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল। (অ. ১০)

এই অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবনী সভা'র স্বদেশী শিল্প প্রচেষ্টার অবসান

বর্ণনা করিয়াছেন। অংশটি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা'-শীর্ষক' অধ্যায়ের অন্তর্গত।

স্বদেশী দিয়াশলাই ও কাপড়ের কল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য 'সঞ্জীবনী সভা' বিশেষ উদ্যোগী ছিল। কিন্তু এই সকল কাজে অযথা অপব্যয় ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। শেষপর্যন্ত সভার মধ্যে দুই একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন লোক আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা এই সকল অর্থহীন উদ্যমের অবাস্তবতা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এতকাল সভার সভ্যবৃন্দ যেন ভাবের স্বর্গে বাস করিতেন। বাস্তব জগতের কঠোর সত্য-সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। নবাগত সভ্যগণ তাঁহাদের বাস্তব জ্ঞান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। বাইবেলে কথিত আছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধে আদি মানবী ঈভের সঙ্গে আদি মানব আদম স্বর্গোদ্যান হইতে ভ্রষ্ট হন। এখানেও সেইরূপ বাস্তব জ্ঞানরূপ ফল খাইয়া 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্যবৃন্দ কল্পনার স্বপ্নলোক হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। সহজ কথায় তাঁহাদের বাস্তববোধ ফিরিয়া আসিল।

আর একটি কথা উহ্য আছে। বাইবেলের গল্পের সর্পরূপী শয়তানই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার প্ররোচনা দেয়। এখানে নবাগত দুই একজন সভ্য কি তাহা হইলে শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রাথমিক উদ্যমে ব্যর্থতা হয়তো পরবর্তীকালে সার্থকতায় পরিণত হইত। বস্তুত আজ দেশে দেশী দিয়াশলাই ও কাপড়ের কলের অভাব নাই। সেকালেও এই প্রয়াস ব্যর্থতার সোপান বাহিয়া হয়তো সাফল্যলাভ করিত। অন্ততঃ 'সঞ্জীবনী সভা'র এই সকল উদ্যম দেশবাসীর পক্ষে উদ্দীপনা ও নূতন নূতন কর্ম প্রচেষ্টার প্রেরণা যোগাইত। সুতরাং সেই সভার কার্যক্রম সহসা বন্ধ করিয়া সভাটিকে যাঁহারা ভাঙিয়া দেন, সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা কি শয়তানের কাজ করেন নাই? রবীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তবু তাঁহার বর্ণনভঙ্গীর আলোকেই এই অর্থই যেন অনিবার্য হইয়া উঠে।

(৮) তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা……রাখিয়া দিয়াছিল। (অ. ১১)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা'-শীর্ষক পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত। মনস্বিপ্রবর রাজনারায়ণ বসুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত রূপকটির প্রয়োগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যেই রাজনারায়ণ বসুর সান্নিধ্যে আসেন। 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতিরূপে তিনি সর্বদাই ঐ সভার সকল তরুণ সভ্যের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। ইহাতে তাঁহার বয়স যেন কোনো বাধা সৃষ্টি করিত না। কেন করিত না, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহারই একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বয়সের ফলে রাজনারায়ণবাবুর চুলদাড়ি সাদা হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের দিকে এই পাকা চুল আর পাকা দাড়ি যেন তাঁহার প্রবীণতা বা বয়সের পরিপক্বতার প্রতীক ছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে একটা সাদা মোড়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার দেহের বার্ধক্যই সূচনা করিত, অন্তরের নহে। মোড়কের মধ্যে রাখিলে টাট্‌কা জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। মোড়ক বাহিরের জলবায়ু, আলোক ও উত্তাপ হইতে তাজা বস্তুকে রক্ষা করে। রাজনারাণ বসুর বার্ধক্যপীড়িত সাদা চুলদাড়িসংবলিত দেহখানিও সেইরূপ মোড়কের কাজ করিয়াছিল। ইহারই অভ্যন্তরে তাঁহার চিরতরুণ প্রাণ সর্বদা তাজা থাকিত।

(৯) **এই ভগবত্তক্ত চিরবালকটির……সন্দেহ নাই।** (অ. ১১)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা' হইতে উদ্ধৃত। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর বর্ণনাশেষে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত মন্তব্যে উপসংহার টানিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসু এককালে স্বদেশী আন্দোলনের দাদু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। নানা দিক্ দিয়া দেশের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি আমরণ সকল প্রকার সভা-সমিতির মূলে ছিলেন অফুরন্ত প্রেরণাস্বরূপ। এই মানুষটি ক্রমে যখন বার্ধক্যে প্রপীড়িত হইলেন, তখনো অন্তর তাঁহার তাজাই রহিল। একদিকে ছিলেন তিনি হাসিমাখা মাটির মানুষ, অন্যদিকে যেন তেজের একটি আগ্নেয়গিরি। দেশের অপমানে সেই তেজ তাঁহার বিস্ফোরণের মতো ঠিকরাইয়া বাহির হইত। অথচ অন্য সময় এই লোকটি হাসিখুশী, ভারি ভালোমানুষ। রোগশোক, দুঃখদৈন্য—কিছুতেই তাঁহার চিত্তের প্রসাদগুণ নষ্ট করিতে পারে নাই। তাহার কারণ, তাহার জীবন ছিল ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত। এইজন্য দুঃখশোক তাঁহাকে কখনো মলিন করে নাই, তাঁহার তারুণ্য কখনো সতেজ পবিত্রতা হারায় নাই। এই অপূর্ব চরিত্র আমাদের পক্ষে যুগে যুগে আদর্শস্বরূপ। ইহা আমাদের প্রেরণার উৎস। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাঁহার স্মৃতিকে আমাদের দেশে অক্ষয় করিয়া রাখা উচিত।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-যে প্রভাব স্বাদেশিকতার সঞ্চার ও পুষ্টিবিধান করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।

উ.। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রথম সঞ্চার হয় তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই প্রভাবে। স্বদেশের প্রতি মহর্ষির একটি প্রগাঢ় ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নানাপ্রকার ঝড়ঝাপ্‌টা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্বদেশপ্রেম তাঁহার নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই। মহর্ষির এই দেশপ্রীতি সমগ্র ঠাকুর পরিবারের মধ্যে স্বদেশানুরাগের একটি স্থির শিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। যেকালে দেশী ভাষা ও ভাবকে শিক্ষিতরা হেলা করিতেন, সেই কালেই তিনি পুত্রদের মাতৃভাষা অনুশীলনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একবার একজন আত্মীয় দেবেন্দ্রনাথকে ইংরাজীতে পত্র লেখেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহা ফিরাইয়া দেন। ইহা হইতে তাঁহার দেশপ্রীতির গভীরতা অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এমন পিতার সান্নিধ্যে ও পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতঃই পূর্ণমাত্রায় স্বদেশাত্মবোধ আত্মসাৎ করিয়া লন।

এই সময় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শৈশব হইতেই ঠাকুরবাড়ি ছিল হিন্দুমেলার অধিষ্ঠান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার সৃষ্টি। এই মেলার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের প্রবল একটি প্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের উপর সক্রিয় হয়। বাল্যের আবেগ প্রবণতায় রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তখন স্বদেশী গানে আর কবিতায় মাতিয়া উঠে। এই হিন্দুমেলাতেই তিনি কয়েকটি স্বরচিত দেশাত্মবোধ মূলক কবিতা পাঠ করেন। হিন্দুমেলা এইভাবে প্রত্যক্ষ স্পর্শ ও অনুশীলনের পথে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঞ্জীবনী সভা' রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার পুষ্টির পক্ষে তৃতীয় প্রভাব। এই সভা-গঠনের মূলে ছিল ইটালীর বিপ্লবী মাৎসিনির 'কার্বোনারি'-নামক গুপ্তসভার আদর্শ। মাৎসিনির কাহিনী তখন সবে এদেশে প্রচারলাভ করিয়াছে। তাঁহার গুপ্তসমিতির অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই 'সঞ্জীবনী সভা' গড়িলেন, ইহার সভাপতি হইলেন স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু। রবীন্দ্রনাথও ইহার সভ্য হইলেন। ঠন্‌ঠনিয়ার এক পোড়োবাড়িতে এই সভার গুপ্তবৈঠক বসিত। সভায় থাকিত লাল রেশমী কাপড়ে বাঁধা বেদমন্ত্রের পুঁথি,

দুইটি মড়ার মাথার খুলি; খুলির দুই চক্ষুকোটরে জ্বলিত দুইটি মোমবাতি। সভ্যবৃন্দ 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' ইত্যাদি মন্ত্রে সভার কাজ আরম্ভ করিতেন। যেদিন নূতন সভ্য দীক্ষা লইতেন সেদিন সভাপতি রক্তবস্ত্রে শোভিত হইতেন। এই সমিতি সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিত। নানা আলোচনা, গান ও বক্তৃতায় সেই উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশীভাবেরই অভিষেক চলিত সেখানে। বাহিরে শিকার প্রভৃতি ব্যপদেশে বন্দুক-চালনার মহড়া হইত। আসল শিকার অবশ্য তাহাতে কিছু হইত না। তারপর স্বদেশী শিল্পের জন্যও এই সমিতি প্রভূত চেষ্টা করিত। ইহার সব চেষ্টাই অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং 'জীবনস্মৃতি'র পাঠ-সংকলন-গৃহীত অংশে এই লইয়া রবীন্দ্রনাথ কৌতুকও করিয়াছেন। কিন্তু 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের স্বাদেশিকতার উপর যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আবেগপ্রবণ বালকটি চিরকালই কবিরূপে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী কালে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় বা বক্সার গুলিবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা উপলক্ষে সেই 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্য বালকবীরটি যেন একাধিকবার কম্বুকণ্ঠে বিদ্রোহ করিয়া উঠিয়াছে। পরিণত বয়সের শান্ত মুহূর্তে নানা স্থানে, উপন্যাসে ও বক্তৃতায়, অবশ্য সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতাই তিনি করিয়াছেন। কিন্তু 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রভাব তিনি হৃদয় হইতে একেবারে মুছিতে পারেন নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের কৈশোর অতিবাহিত হয়। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ স্পর্শও রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার যথেষ্ট পুষ্টিবিধান করে।

মোটামুটিভাবে উল্লিখিত কয়েকটি প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার সঞ্চার ও পুষ্টিসাধন করে।

প্র. ২। "ইহা স্বাদেশিকের সভা।"—এই সভাটির সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

উ.। 'এই 'স্বাদেশিকের সভা'টির নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই ইহার প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীঅরবিন্দের দাদামহাশয় ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইহার সভাপতি। সভাটি যেকালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইটালীর বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনির ইংরেজী জীবনকথা এদেশে প্রচারলাভ করে। বাগ্মীবীর সুরেন্দ্রনাথ অসংখ্য বক্তৃতায় তাঁহাদের কথা প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারই

অনুরোধে যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'আর্যদর্শন' নামক পত্রিকায় মাৎসিনির জীবনী বাঙলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। মাৎসিনির কথা তখন শিক্ষিত যুবকদের মনে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিল। যৌবনে মাৎসিনি একটি গুপ্তসমিতির সভ্য হন, তাহার সাংকেতিক নাম ছিল কার্বোনারি বা কাঠপোড়ানি। এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে কাঠপোড়ানিদের ভাষা হইতে গৃহীত একরকম সাংকেতিক ভাষা চলিত। সমিতির সভ্য ভিন্ন অন্যেরা ইহার অর্থ বুঝিত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সমিতিটিরই অনুকরণে 'সঞ্জীবনী সভা' গঠন করেন। ঠনঠনিয়ার একটি পোড়োবাড়িতে ইহার বৈঠক বসিত। সভার মধ্যে একটি টেবিলের উপর লাল রেশমী কাপড়ে জড়ানো একটি বেদমন্ত্রের পুঁথি থাকিত। তাহার দুইপাশে থাকিত দুইটি মড়ার মাথার খুলি। সেই খুলির দুই চক্ষুকোটরে মোমবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। তারপর 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' ইত্যাদি মন্ত্র গীত গাহিয়া সভার কাজ আরম্ভ হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত এক অদ্ভুত সাংকেতিক ভাষায় এই সভার বিবরণী লিখিত ও পঠিত হইত। 'সঞ্জীবনী সভা'র সাংকেতিক নাম ছিল—"হাঞ্চু পামু হফ"।

মাথার খুলিগুলি মৃত ভারতের প্রতীক, তাহাদের চোখে বাতি দিয়া যেন এই সভা মৃত ভারতকে সঞ্জীবিত করার এবং তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সাধনাকে সূচিত করিত।

সভার আদর্শ ছিল একদিকে সশস্ত্র বিপ্লব, অন্যদিকে জাতীয় শিল্পসাধনার পুনরুন্নয়ন। শিকার করার মধ্য দিয়া বন্দুক-চালনার শিক্ষা দেওয়া ছিল সভাটির উদ্দেশ্য। স্বদেশী দিয়াশলাই ও কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য 'সঞ্জীবনী সভা' বহু প্রয়াস ও অর্থের অপচয় করে। আমরা জানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশী স্টীমার কোম্পানী প্রবর্তনের প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহাতে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। 'সঞ্জীবনী সভা' ইহার পর ভাঙিয়া যায়। ইহাই উল্লিখিত স্বাদেশিকের সভাটির মোটামুটি ইতিহাস।

প্র. ৩। 'ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী"—(ক) এই শিকারীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তাঁহাদের 'অহিংস্রক' বিশেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (খ) ব্রজবাবুর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ।

উ.। (ক) এই শিকারীরা ছিলেন 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্য। ইহারা সশস্ত্র

বিপ্লবে ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেন। মাঝে মাঝে ইহারা মানিকতলা অঞ্চলের বাগানবাড়িগুলিতে শিকারে যাইতেন। শিকারের ছলে বন্দুক-চালনায় শিক্ষা দেওয়াই ছিল সভার উদ্দেশ্য। কাজেই আসল শিকার সেখানে বড একটা হইত না। বাড়ি হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রচুর লুচি-তরকারী করিয়া দিতেন। শিকার-শেষে সকল সভ্য মিলিয়া সেই লুচি শেষ করিতেন। এদিকে একটি পাখিও শিকার হইত না, একবিন্দু রক্তপাতও ঘটিত না। সুতরাং এই শিকারে হিংসার কোনো সংস্রব ছিল না বলা চলে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করিয়া শিকারীদের অহিংস্রক বিশেষণ দিয়াছেন। তাঁহারা কেবল লুচি-তরকারী শিকারী ছিলেন, বড়জোর পথের বাগানের ডাবের জল পর্যন্ত তাঁহারা শিকার করিতেন। কাজেই তাঁহাদের শিকারে হিংসার লেশমাত্র ছিল না বলিয়া তাঁহারা অহিংস্রক শিকারী।

(খ) ব্রজবাবুর পুরানাম ব্রজনাথ দে। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। কিছুকাল তিনি ঠাকুরবাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজও করিয়াছিলেন। ব্রজবাবুর বয়স হইয়াছিল। তবু তিনি 'সঞ্জীবনী সভা'র অন্যান্য তরুণদের মতো ছিলেন স্বপ্নচারী, পরম উৎসাহী। তাহা ছাড়া ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ একটু রসিকতাও ছিল। একদিন 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্যবৃন্দের সহিত শিকার হইতে ফিরিবার সময় তিনি মানিকতলার একটি বাগানে ঢুকিয়া পড়িলেন। ঢুকিয়াই মালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাগানের মালিক তাঁহার মামা আসিয়াছিলেন কিনা। মালী বলিল—না, তিনি আসেন নাই। তখন মালিকের ভাগিনেয় ব্রজবাবুর হুকুমে মালী ডাব পাড়িয়া আনিল, শিকারীরা আকণ্ঠ লুচি তরকারীর পর স্নিগ্ধ পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, ঐ বাগানের মালিক ব্রজবাবুর কেহই নহেন। তিনি কেবল মালীকে ঠকাইয়া মজা করিয়াছিলেন।

ব্রজবাবু লোকটির মধ্যে 'সঞ্জীবনী সভা'র আদর্শবাদিতা পাগলামীর স্তরেই পৌঁছিয়াছিল। 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রচুর অর্থসাহায্যে যে দেশী কাপড়ের কলটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে ব্রজবাবুর উৎসাহই বোধ হয় বেশী ছিল। অবশেষে একদিন পর্বত মূষিক প্রসব করিল। সেই কাপড়ের কলে একখানা গামছা তৈয়ারি হইল। ব্রজবাবু তাহা মাথায় বাঁধিয়া ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার তখন মাথার চুলে পাক ধরিয়া

গিয়াছে। তবু স্বদেশীভাবের অন্ধ আবেগে তিনি এমনই মাতিয়া গিয়াছিলেন। জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রভাতে যে কয়টি পরিণত শিশু অন্ধ আবেগে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, ব্রজবাবু তাঁহাদেরই একজন।

প্র ৪। রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধের বিবরণ ও বর্ণনা অনুসরণ করিয়া রাজনারায়ণ বসুর চরিত্রটি নিজের ভাষায় চিত্রণ কর।

উ.। 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসুর প্রথমে উল্লেখ পাই 'সঞ্জীবনী সভা'-প্রসঙ্গে। তিনি ছিলেন এই সভার সভাপতি। 'সঞ্জীবনী সভা'র মতে গুপ্ত সমিতির পৌরোহিত্য করার মধ্যে তাঁহার বীরহৃদয়ের চিরনবীনতা পরোক্ষ-ভাবে ধরা পড়ে। রাজনারায়ণকে যে লোকে ভারতীয় জাতীয়তায় দাদু বলিত, এই কথার যাথার্থ্য মুহূর্তে আমাদের প্রত্যয় স্পর্শ করে। 'সঞ্জীবনী সভা'র সকল উত্তেজনা ও আবেগ কর্মক্ষেত্রে কোনো সার্থকতা লাভ করুক আর না-করুক, উহার মধ্যে যে প্রগাঢ় দেশানুরাগ ও বিরাট আদর্শবাদিতা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাহারই পুরোধারূপে দেখি এই বৃদ্ধ রাজনারায়ণকে। দেখি তরুণের সহিত বয়সের পার্থক্য তুচ্ছ করিয়া তরুণ হইয়া তিনি মিশিতেছেন। দেখি ঝড়ের উন্মাদনায় তাঁহার চিত্তও বিদ্রোহের ছন্নছাড়া গানে মাতিয়া উঠে। সত্য বটে তিনি একটু বেসুরা ছিলেন, সত্য বটে বার্ধক্যজড়িত কণ্ঠে তাঁহার তেমন শক্তি ছিল না, কিন্তু তাহাতে কি হয়? হৃদয়ের অন্তরাল হইতে যখন তাজা প্রাণ তাঁহার গাহিয়া উঠিত তখন নিঃসংকোচে তিনি অজস্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রাণ ঢালিয়া দিতেন সমবেত সঙ্গীতে। রাজনারায়ণ অগ্নিমন্ত্রের প্রথম ঋত্বিক, বাঙলার বিপ্লববাদের প্রথম পুরোহিত। পক্ক ও ইঁচড়ে-পক্ক অনেক মানুষ বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পনাকে হাস্যকর খ্যাপামি জ্ঞান করিত। রবীন্দ্রনাথও উহাকে গুরুতর পরিহাস করিয়াছেন। কিন্তু রাজনারায়ণ সশস্ত্র বিপ্লবকে অলীক কল্পনা ভাবিতেন না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' লেখার পরবর্তী ঘটনাবলী রাজনারায়ণের বিশ্বাসকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস যদি অসত্যও হইত, তবুও তাঁহার বিপুল দেশাত্মবোধ ও দুর্গম বিদ্রোহী চিত্তের গৌরব কমিত না। তাঁহার মধ্যে মূর্ত দেখি নেপোলিয়নের সেই বাণী—'অসম্ভব কথাটা কেবল নির্বোধের অভিধানেই আছে'।

রবীন্দ্রনাথ এই লোকটির অনির্বচনীয় প্রভাব বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতেন না।

[ইহার পর **সংক্ষিপ্তসারের** শেষ অনুচ্ছেদ লেখ। অনুচ্ছেদটির প্রথম পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া আরম্ভ কর।]

প্র. ৫। রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা সংক্ষেপে লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ৬। রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

প্র ৭। রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে প্রকৃত বক্তব্য কি তাহা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধটির শিরোনাম-সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উ.। **উৎস ও নামকরণ** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি : অহরহ (:) = অহ: + অহ (:)। আরো = আর + ও (বাঙলা সন্ধি) হাস্যোচ্ছ্বাস = হাস্য + উচ্ছ্বাস (উৎ + শ্বাস)।

সমাস : পরিবারস্থ—পরিবারে থাকে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। চোদ্দ-পনেরো বা চোদ্দ পনেরো (বহুব্রীহি)। মধ্যাহ্নে—অহ্নের অর্থাৎ দিনের মধ্য (সংস্কৃতমতে একদেশী; বাঙলামতে ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। রোমহর্ষণ—রোমের হর্ষণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। অসুবিধাকর—সুবিধা (সুপ্‌সুপা); নয় সুবিধা (নঞ্‌তৎপুরুষ); অসুবিধা করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। রবাহূত—রবের দ্বারা আহূত (৩য়াতৎপুরুষ)। অনাহূত—নয় আহূত (নঞ্‌তৎপুরুষ)। শশব্যস্ত—শশের ন্যায় ব্যস্ত (উপমান-কর্মধারয়)। মধ্যবিত্ত—মধ্য (বিশেষণ) বিত্ত যাহার (বহুব্রীহি), সে। অপরাহ্ণ—অহ্নের অর্থাৎ দিনের অপর (একদেশী বা ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। চুলা-ধরানো—চুলাকে ধরানো (২য়াতৎপুরুষ)। অল্পবয়স্ক—অল্প বয়স (বয়ঃ) যাহার (বহুব্রীহি), সে (সমাসান্ত কপ্‌-প্রত্যয়যোগে)। অনৈক্য—নয় ঐক্য (নঞ্‌তৎপুরুষ)।

সমস্তপদ-গঠন: রহস্যে আবৃত = রহস্যাবৃত। হত আহত = হতাহত। হরির লুঠ = হরিল্লুঠ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: পোড়ো—পড্ + উয়া = পড়ুয়া > পোড়ো। খ্যাপামি —খ্যাপা + আমি। কেরানিগিরি—কেরানি + গিরি। রাশীকৃত—রাশি + চি (অভূততদ্ভাবে) + কৃ + ক্ত। জলন্ত—জল্ (সংস্কৃত ধাতু) + অন্ত। পাক—পাক্ + অ (উচ্চারণে এই অ-টি লুপ্ত)। বৈপরীত্য—বিপরীত + ষ্যঞ্।

উপসর্গ-যোগে শব্দগঠন: **প্রশ্ন:** 'বিকার' শব্দটির 'বি' উপসর্গের স্থলে অন্যান্য উপসর্গ বসাইয়া নূতন নূতন শব্দ গঠন কর।

উত্তর: প্রকার, অপকার, সংস্কার, অনুকার, অধিকার, প্রতিকার উপকার, আকার।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ: তাহার সকল-প্রকার রাস্তা মারিয়া—এখানে 'মারিয়া' কথাটি 'বন্ধ করিয়া' (বিশিষ্ট) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মারা' ক্রিয়াটির এইরূপ আরও বিশিষ্ট প্রয়োগ: ভাত মারা, চাল মারা, গুঁড়ি মারা, চোখ মারা, মটকা মারা, ভাতে মারা, পকেট মারা, ডুব মারা ইত্যাদি।

গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক—এখানে 'লাগা' ক্রিয়াটির অর্থ 'সঙ্গত বা সমঞ্জস হওয়া'। এইরূপ আরও প্রয়োগ: শীত লাগা, কাজে লাগা, পিছনে বা সঙ্গে লাগা, চোখে লাগা, কাঁটা লাগা, গ্রহণ লাগা, মন লাগা, এঁড়ে লাগা, আগুন লাগা ইত্যাদি।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয় (অস্তিবাচক)—ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা তাহার পূর্বে আর হয় নাই (নেতিবাচক)।

সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল (সরল)—সেই সভায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান হইত তাহা রহস্যে আবৃত ছিল (জটিল)।

রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয় (যৌগিক)—রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ না রাখিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয় (সরল)।

একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই—একদিনও আমরা উপবাস করিতে বাধ্য হই নাই (বাচ্যান্তর)।

মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই (নেতিবাচক)—মানিকতলায় পোড়ো বাগান প্রচুর আছে (অস্তিবাচক)।

এজন্ত সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন (সরল)—এজন্ত সভ্যেরা যাহা আয় করিতেন তাহার দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন (জটিল)।

দেশালাই তৈরি করতে হবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত (যৌগিক)—দেশালাই তৈরির উপযুক্ত কাঠি পাওয়া শক্ত (সরল)।

সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি—সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা আজ আমাদিগকে হাসাইতেছে ('আলোচনা'-কে কর্তৃপদরূপে ব্যবহার করিয়া)। [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০]

ব্যাকরণগত টীকা : অন্তঃশীলা (উ. মা. ১৯৬০) বাক্যে 'বহিতে থাকে' ক্রিয়াপদটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 'গুপ্ত উত্তেজনা'-কে রবীন্দ্রনাথ নদী রূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেইভাবে আলোচ্য পদটি হওয়া উচিত ছিল 'অন্তঃসলিলা' (অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে সলিল যাহার)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শুধু এই প্রবন্ধে নয়, অন্যত্রও 'অন্তঃশীলা' কথাটি এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যকরাও কথাটি প্রয়োগ করিতেছেন ঠিক একই অর্থে। 'অন্তঃশীলা'-র ব্যবহার ভুল।

সম্বৎসর—সম্ + বৎসর = সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে 'সংবৎসর', কারণ অন্তঃস্থ বর্ণ (এক্ষেত্রে অন্তঃস্থ ব') পরে থাকিলে 'ম্'-স্থানে অনুস্বার হয়। রবীন্দ্রনাথ ভুল সন্ধিটিই প্রয়োগ করিয়াছেন, যদিও না করিলেও পারিতেন।

বাক্য-রচনা ঃ বয়সোচিত : তিনি প্রবীণ হইলেও তাঁহার মধ্যে বয়সোচিত গাম্ভীর্যের বড় অভাব।

রোমহর্ষণ : সেই রোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিতে শহর ভাঙিয়া আসিল।

অর্বাচীন : প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃত রচনায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

বাক্যালাপ : দুই ভাইয়ে এখন বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ।

প্রহসন : ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার যাহা হইল তাহাকে বিচারের প্রহসনই বলা চলে।

বৈপরীত্য : 'প্রতিকূল' শব্দটি বৈপরীত্য বুঝাইতে অব্যয়ীভাব সমাসে নিষ্পন্ন।

প্রতিভা

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'নানা প্রবন্ধে'র রচনাগুলি সৃষ্টিমূলক নহে। উহাদের মধ্যে "লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যেরই প্রকাশ নাই—নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ আছে,—আবার সেই পাণ্ডিত্য এবং নিজস্ব চিন্তাকে সুস্পষ্ট অথচ সুন্দর করিয়া সাহিত্যিক ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লেখকের ছিল।......সুপ্রণালীবদ্ধ উচ্ছ্বাসবিহীন আঁট-সাঁট লেখাই রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা ও নীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির ভিতরে লেখকের একটি চিকন বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—এই বিশ্লেষণশক্তিই তাঁহার চিন্তাকে অনেক স্থানে মৌলিকতা দান করিয়াছে; তবে তিনি দেশ-বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেনও অনেক।"

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে উহা লেখকের 'নানা প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। মূল প্রবন্ধটি দীর্ঘতর। মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর সম্পাদনায় স্থানে স্থানে উহার বহু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সঙ্গতি রাখিবার জন্য লেখকের রচনা নহে এমন দুই একটি বাক্যও সংযোজিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রতিভা। প্রাচীনকালে এ সম্বন্ধে লোকের কিরূপ ধারণা ছিল, সেই ধারণার যুক্তিযুক্ততা আছে কিনা এবং বর্তমান কালে

প্রতিভার বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির কোন্‌টি কতটুকু যুক্তিযুক্ত—এসকল বিষয়ের আলোচনাই প্রবন্ধটিতে করা হইয়াছে। ইহার মূল লক্ষ্য হইল প্রতিভার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ। এইজন্য ইহার শিরোনাম 'প্রতিভা'।

সমালোচনা—আলোচ্য প্রবন্ধটি চিন্তামূলক। একপ্রকার রচনা আছে যাহাতে ভাব-ভাবনা মানস রসায়ণে সংশ্লিষ্ট হইয়া নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠে। আর একপ্রকার রচনা বিশ্লেষণধর্মী, বস্তুনিষ্ঠ। উহারা সৃষ্টি নহে, কেবল যুক্তি-শৃঙ্খলের প্রকৃষ্ট বন্ধনগুণে উহারা প্রবন্ধ। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। যুক্তিই উহার ভিত্তি, তথ্যই উহার প্রাণ, এবং সেই কারণে উহার আবেদন বুদ্ধিতে, হৃদয়ে নহে।

প্রতিভা-সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা যেভাবে এ প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে তাহার মধ্যে লেখকের সুচিক্কণ একটি বিশ্লেষণ শক্তি স্পষ্ট। ব্যুৎপত্তির দিক্ দিয়া 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে' অর্থাৎ নব নব বিকাশশক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধিরই নাম প্রতিভা। লেখক এই সংজ্ঞার মূল সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন—নূতন সৃষ্টির শক্তিকেই তিনি প্রতিভার মৌলিক লক্ষণ বলিয়া ধার্য করিয়াছেন। প্রাচীনকালে এদেশে ও বিদেশে লোকে এই শক্তিকে দৈবপ্রভাব বলিয়া বিশ্বাস করিত। বর্তমান কালে আবার বিপরীত সীমায় একদল লোকের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগমাত্র। লেখক এই দুই কালের মতগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিভাসম্বন্ধে প্রকৃত সত্যটি উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনিও স্বীকার করেন প্রতিভা, দৈবী না হইলেও, জন্মগত। কিন্তু অনুশীলন-নিরপেক্ষ সহজ স্ফূর্তিরূপে প্রতিভাকে তিনি গণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে শিক্ষা, অভ্যাস, মনোযোগ সকলই প্রতিভার সহায় এবং এ বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন।

সমগ্রভাবে তাঁহার আলোচনাক্রম সুসংবদ্ধ এবং বলিবার ভঙ্গীটিও বিশেষ প্রাঞ্জল। প্রবন্ধটির অপর বিশেষত্ব হইল সংযম। বক্তব্যকে যুক্তির পথে চালিত করিবার জন্য সূচিমুখ বিশ্লেষণ যেমনই লেখকের বিশেষত্ব, উহাকে গুছাইয়া অল্পকথায় ব্যক্ত করাতেও তেমনি তাঁহার কৃতিত্ব। অতএব প্রবন্ধকার যে নিপুণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচার, বুদ্ধি সকলই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহারই সংজ্ঞা অনুসারে যাহাকে প্রতিভা বলা সঙ্গত

সেই নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ এই প্রবন্ধে নাই। কাজেই রসবস্তুর অভাব ইহাতে অনিবার্য। প্রবন্ধটির যাহা-কিছু উপভোগ্যতা তাহা একান্তভাবেই বুদ্ধিগত।

সংক্ষিপ্তসার—এ জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন তাঁহাদিগকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একদল জ্ঞানে বা কর্মে অনন্যসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন, অপরদল নূতন সৃষ্টির শক্তিসম্পন্ন। এই শেষোক্ত শ্রেণীকেই প্রতিভাশালী বলা সঙ্গত। কারণ, প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানুষ কেবল অন্যের সৃষ্টির সুদক্ষ অনুকরণ করিতে সমর্থ। অন্যের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বা ভাব কৃতিত্বের সহিত আয়ত্ত করিয়া আপনার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিতেই মাত্র তাঁহারা পারেন, কিন্তু অভূতপূর্ব সৃষ্টি তাঁহাদের সাধ্যাতীত। ভগবানের যে শক্তি সৃষ্টিকে রক্ষা করে তাহা অবশ্যই সাধারণ নহে। সেইরূপ, যেসকল শক্তিশালী মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠজ্ঞানকর্মের ফলশ্রুতিগুলি অপূর্ব দক্ষতাগুণে ধারণ করেন, তাঁহাদের মহিমাও নগণ্য নহে। তাঁহারাও ভগবানের পালনশক্তির অংশভাগী। কিন্তু তথাপি প্রতিভাশালী মাত্র তাঁহারাই যাঁহারা ভগবানের সৃষ্টিশক্তি কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন। সেই হিসাবে রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকিই প্রতিভাশালী, রামায়ণ-বেত্তা বা রামায়ণ-কণ্ঠস্থ ব্যক্তি নহেন।

পুরাকালে প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ দৈবী শক্তি বলিয়া গণ্য হইত। দস্যু রত্নাকরের মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণতি অথবা মহামূর্খ কালিদাসের মহাকবি কালিদাসে রূপান্তর-সম্বন্ধে প্রচলিত লোকপ্রবাদগুলি এই বিশ্বাসই প্রমাণ করে। ইংলণ্ডের পুরাবিদ্ বিডি সাহেবের একটি বিবরণেও অনুরূপ বিশ্বাস নিহিত দেখিতে পাই। সঙ্গীতবিরাগী সিড্‌মন্ নাকি স্বপ্নযোগেই লোকোত্তর গীতিশক্তি লাভ করেন। এসকল কাহিনী প্রমাণ করে যে প্রতিভা সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্বাস ছিল এই যে, উহা একটি আকস্মিক দৈবীশক্তি। প্রকৃতপক্ষে ইহা একেবারে অমূলকও নহে, যদিও ইহার মূলে কোনো যুক্তিসহ প্রমাণ বা প্রাকৃতিক সত্য দৃষ্টিগোচর নহে।

বিধাতা মানুষকে রুচি, প্রকৃতি ও ক্ষমতা-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনো সাহিত্যরসিক হয়তো গণিতবিমুখ, কেহ বা আবার কাব্য রসে এতই বঞ্চিত সে সপ্তকাণ্ড রামায়ণেও তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। কেহ চিত্রানুরাগী, কেহ বা সঙ্গীতপ্রেমিক, কেহ ভালোবাসে কুসুমিত রম্য কানন, কেহ চায় বিজন শৈল। কেহ চিন্তাশীল কিন্তু কর্মবিমুখ, কেহ কর্মনিপুণ কিন্তু চিন্তা-

বিমুখ। এইরূপভাবে সহজাত প্রবৃত্তি ও শক্তিভেদে মানুষ বিভিন্ন। প্রতিভাও সেইরূপ বিভিন্নমুখী এবং সেই কারণেই কালিদাস বা আর্যভট্ট, সেক্সপিয়র বা নিউটন—এক এক জনের প্রতিভা এক এক দিকে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সেই কারণেই সকলেই আর তাঁহাদের মতো হইতে পারে না।

প্রতিভা সহজাত কিন্তু শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। শিক্ষা তথা অনুশীলন ব্যতিরেকে কেবল অন্তর্নিহিত প্রতিভাবলেই মানুষ বড হইতে পারে না। 'কল্পনার পুত্র' যে সেক্সপিয়র, তিনি যে সরস্বতীরও সাধক ছিলেন তাহার প্রমাণ বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আইন, লাটিন ভাষা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে তাঁহার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার কথা আজকাল সর্বজনবিদিত। আমাদের কালিদাস-সম্বন্ধেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। জগতের এই শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়ের জীবনকথা বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। তবে শিক্ষার স্থল কেবল বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নহে—গ্রন্থ, সমাজ প্রকৃতি সকল স্থলেই শিক্ষায়তন বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাদের যে-কোনো একটি হইতে শিক্ষা করিতে হইলে প্রচুর প্রয়াস প্রয়োজন।

কেহ কেহ প্রতিভাকে অভ্যাস বা মনোযোগ বলিয়াও বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে নিরপেক্ষ বিধাতা সকলকে সমান শক্তির অধিকারী করেন। ইহার মধ্যে যাহারা পুনঃপুনঃ যত্নদ্বারা অথবা গভীর মনোযোগদ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করে তাহারাই উৎকর্ষ লাভ করে। তাহাদিগকেই প্রতিভাশালী বলা চলে। কিন্তু মতটি বিচার-সহ নহে। প্রতিভা অনুশীলন-মাত্র নহে। অভ্যাসদ্বারা বডজোর ছন্দোনৈপুণ্য লাভ করা যায় এবং তাহাতে বডজোর ভট্টিকাব্যই রচিত হইতে পারে। কিন্তু রঘুবংশ রচনা করিতে হইলে চাই সত্যিকার প্রতিভা। প্রকৃতপক্ষে অভ্যাসদ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ হয় তাহা পুনঃপুনঃ প্রয়াসের ফল। কিন্তু অভ্যাস যাহা আছে তাহাকে লইয়াই চলে, যাহা নাই তাহা আবিষ্কার করিতে পারে না। অভ্যাসে অনুষ্টুপ ছন্দে রচনা সহজতর হইতে পারে, উহার দ্বারা ভাস্করাচার্যের বা নিউটনের তত্ত্বে অধিকার গভীরতর হইতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি বা আবিষ্কার তাহাদ্বারা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বিবেচনা করাও ভুল। মনোযোগ বুঝিবার এবং স্মরণ রাখিবার পক্ষেই সহায়ক। কিন্তু এরূপ বুঝা বা স্মরণের

উপজীব্য তো যাহা আছে তাহাই। কাজেই মনোযোগ নূতন-সৃষ্টি সমর্থ নহে এবং সেই কারণে উহাকে প্রতিভা বলা চলে না। কারণ, সৃষ্টিক্ষমতাই প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তবে একথাও সত্য যে অভ্যাস ও মনোযোগ উভয়েই প্রতিভার পক্ষে উপযোগী। নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইতে হইলে পুরাতনকে ভালো করিয়া জানা প্রয়োজন এবং সেই জন্য প্রয়োজন অভ্যাস ও মনোযোগের। শিক্ষারও উদ্দেশ্য তাহাই—প্রাচীন বিদ্যায় কুশলতাপ্রদানই উহার লক্ষ্য। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তি পারদর্শী ব্যক্তিমাত্র—কেবল শিক্ষার দাবীতেই তিনি প্রতিভাশালীর সম্মান পাইতে পারেন না।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। প্রাধান্য লাভ করেন— শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন। **পুরাতন জ্ঞান ও কার্যপ্রণালী**—যে সকল বিষয় ও কর্মপন্থা লোকে বহুকাল হইতেই জানে। সুপরিপক্ক—সুনিপুণ। নূতনপথদর্শী—নূতন পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ; নূতন তত্ত্ব ও কার্যপ্রণালী উদ্ভাবনে দক্ষ। অন্যনির্দিষ্ট কর্মে—অন্যে যে কাজের উপায় নির্দেশ করিয়াছে তাহাতে। বিলক্ষণ—যথেষ্ট। অভিনব প্রকার—সম্পূর্ণ নূতন রকমের। **প্রতিভাশালী**—সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর উদ্ভাবনের উপযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট। তুলনীয়: "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে"।

অ. ২। তদনুরূপ—তাহার ন্যায়। **অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলংকৃত হইতে পারেন**—অন্যের দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন ভাবসম্পদে নিজেরা সম্পন্ন হইতে পারেন। বিজ্ঞানবিদ্—বিজ্ঞান যিনি জানেন। **তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি** ইত্যাদি—ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি রূপে যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন ও সংহারকার্য করিয়া থাকেন। এই তিন প্রকারের কার্যের মধ্যে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বলিয়া সৃষ্টিকর্তাই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী। যাঁহারা প্রতিভাহীন হইলেও দক্ষ, তাঁহারা বিষ্ণুর মত সৃষ্ট বস্তুর রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু নূতন সৃষ্টির শক্তি তাঁহাদের নাই। আদ্যন্ত—গোড় হইতে শেষ পর্যন্ত। লিখন-পঠনে—লিখিবার শক্তি এবং পড়িবার সময়ে। ঈদৃশ দক্ষতা—এইরূপ নৈপুণ্য। **আদিকবি বাল্মীকি**—রামায়ণ-রচয়িতা মহর্ষি। তাঁহার পূর্বে যে ছন্দোবদ্ধ

কবিতা ছিল না এমন নয়। বেদগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় বলিয়াই সাধারণতঃ **স্বীকৃত** হয়। সেই হিসাবে লৌকিক ছন্দে (অনুষ্টুপছন্দ) রচিত রামায়ণই আদি কাব্য এবং বাল্মীকিও তাই ভারতবর্ষের আদিকবি। অনেকের মতে ইনি জগতেরও আদিকবি। **নূতন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকারিণী প্রতিভা**—যে প্রতিভার বলে বাল্মীকি নূতন কাব্যলোক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। কবি কল্পনায় সৃষ্ট জগৎ দৃশ্যমান জগৎ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু নূতন সৃষ্টির মর্যাদা তাহারও প্রাপ্য।

অ. ৩। দেবানুগৃহীত—দেবতার বিশেষ কৃপাভাজন। **পূর্বকালে প্রতিভাশালী……গণ্য হইতেন**—প্রাচীনকালে প্রতিভাকে দেবদত্ত শক্তি বলিয়া মনে করা হইত, এবং যেসকল পুরুষ এই শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতেন তাঁহারাও দেবতার বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শিক্ষা নিরপেক্ষ—শিক্ষা বা অনুশীলনের সহিত সম্পর্কবিহীন। **দেবদত্ত শক্তি**—দেবতার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা; অতএব দেবতা স্বেচ্ছায় যাঁহাকে ইহা দান করিবেন তিনি ছাড়া আর কাহারও ইহা লাভ করিবার উপায় নাই। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে—এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা। **রঙ্গময়ী কল্পনা**—কল্পনার লীলাবিলাসে মগ্ন কোনো পুরুষ। এখানে সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসই লেখকের লক্ষ্য, কারণ কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাল্মীকির সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীটি পাওয়া যায়। **প্রত্যক্ষ করিয়াছেন**—দেখিয়াছেন। **দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর** ইত্যাদি—রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকির পূর্বনাম রত্নাকর। কথিত আছে ইনি যৌবনে ছিলেন দুর্ধর্ষ দস্যু; পথিক দেখিলেই ইনি তাহার প্রাণসংহার করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতেন। একদিন দেবর্ষি নারদের পরামর্শে ইনি পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কেহই তাঁহার পাপের ভাগী নহে। তখন নিতান্ত অনুতপ্ত চিত্তে ইনি দেবর্ষির নিকট পাপক্ষালনের উপায় জানিতে চাহিলেন। নারদ তাঁহার কর্ণে রাম-নাম দিলেও আড়ষ্ট রসনায় 'রাম' উচ্চারণ হইল না। অগত্যা 'ম-রা' 'ম-রা' মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। রত্নাকর ষাট হাজার বৎসর একাসনে বসিয়া এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। সাধনাকালে তাঁহার দেহ বল্মীকে (উইঢিবি) আবৃত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল বাল্মীকি। একদিন তমসাতীরে স্নান করিতে যাইবার সময় তিনি এক ব্যাধকে ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্য হইতে পুরুষটিকে

শরাঘাতে বধ করিতে দেখিলেন। পতিবিয়োগবিধুরা ক্রৌঞ্চির শোক তাঁহার হৃদয় বেদনায় উন্মথিত করিয়া দিল। হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে অনুষ্টুপ্‌ছন্দে গ্রথিত একটি শ্লোক ব্যাধের প্রতি অভিশাপের রূপে বাহির হইয়া আসিল— "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥" ইহাই হইল আদি কবিতা। তাহার পর ব্রহ্মা আসিয়া মুনিবরকে এই ছন্দে রামায়ণ রচনা করিতে বলিলে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিলেন। **ভাবরত্নাকর**—বহুমূল্য রত্নের ধারক সমুদ্রের মতো অমূল্য ভাব-সম্পদের ধারক। **জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন**—লৌকিক কাহিনীতে আস্থাবান লোকেরা প্রচার করিয়াছেন। **শকুন্তলাপ্রণেতা কালিদাস**—যে মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটক হিসাবে এইখানি ভারতবর্ষের তো বটেই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। জার্মান দার্শনিক ও কবি গ্যেটে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। **শকুন্তলাপ্রণেতাকালিদাস মহামূর্খ······প্রত্যাগমন করেন**—কিংবদন্তী আছে যে ভারতের স্বনামধন্য সংস্কৃতকবি কালিদাস যৌবনের আরম্ভ পর্যন্ত মহামূর্খ ও অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাবতী রাজকন্যা কমলা প্রচার করেন যে যিনি বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। একদিন কয়েকজন পণ্ডিত রাজকন্যার নিকট পরাজিত হইয়া প্রতিশোধের উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, কালিদাস একটি গাছের ডালে বসিয়া সেই ডালটিই কাটিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, এই মহামূর্খের সহিত বিদ্যাভিমানিনী কমলার বিবাহ দিতে হইবে। তাঁহাদের অনুরোধে কালিদাস রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখে কিছু না বলিয়া পণ্ডিতদের শিক্ষামতো আকার-ইঙ্গিত করিলে তাঁহারা সেগুলির অর্থ করিয়া বিচারে কালিদাসকে জয়ী করাইয়া দিলেন। রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু বাসরঘরেই স্বামীর মূর্খত্বের পরিচয় পাইয়া কমলা তাঁহাকে পদাঘাতে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিদাস সরস্বতীদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে ও নির্দেশে সরস্বতীকুণ্ডে স্নান ও জলপান করিয়া সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহাকবি হইয়া গৃহে ফিরিলেন। **এই প্রত্যয়ের সাহায্যে······ প্রত্যাগমন করেন**—মহর্ষি বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধে যে

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে লেখকের মতে তাহা কোনো কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত কাহিনী বা জনশ্রুতি—তাহাদের ঐতিহাসিক কোনো মূল্যই নাই। এইরূপ কাল্পনিক কাহিনী যে প্রচারিত হইতে পাইয়াছে তাহারও কারণ, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি—এই বিশ্বাস। কাননে—বনে। প্রসাদ—অনুগ্রহে। সর্ববিদ্যাবিশারদ—সকল শাস্ত্রে পারদর্শী। পণ্ডিত-চূড়ামণি—পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য।

অ. ৪। **ঈদৃশী কিংবদন্তি**—এইরূপ জনশ্রুতি। **ইংলণ্ডীয় পুরাবিদ্ বিডি সাহেব** (Baede বা Bede) ইনি একজন বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। আনুমানিক ৬৭৩-৭৩৫ খৃস্টাব্দ ইঁহার জীবৎকাল। বাল্যকাল হইতে তিনি মঠে জীবন যাপন করেন এবং Jarrow নামক বিখ্যাত মঠের অধ্যক্ষরূপে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। বিডি সাহেব লাটিন ভাষায় Ecclesiastical History নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। সেণ্ট্ জনের গস্‌পেলও (Gospel) তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। **সাক্সন কবি সিড্‌মন্**—বিডি সাহেবের বিবরণ হইতে জানা যায় যে সিড্‌মন্ ছিলেন Hild এর মঠে একজন ভৃত্য। তিনি নাকি সঙ্গীত একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন এক ভোজসভায় সঙ্গীতাদি-শ্রবণে অশক্ত হইয়া তিনি আস্তাবলে পলায়ন করেন, কারণ পশুর তত্ত্বাবধানই ছিল তাঁহার কর্তব্য। তথায় অচিরেই তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন এবং স্বপ্নযোগে সঙ্গীতচর্চায় আদিষ্ট হন। সেই হইতে সিড্‌মন্ কবিত্বসম্পন্ন হইয়া উঠেন এবং বাইবেলের Genesis ও Exodus-এর কাহিনী-সম্বন্ধে বহু সঙ্গীত রচনা করেন। সঙ্গীত-রসাস্বাদবিহীন—সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত। স্বপ্নাদেশবশতঃ—স্বপ্নে আদেশ পাইয়া। অপ্রামাণ্য—প্রমাণ-সহ নহে। অনৈসর্গিক—অস্বাভাবিক।

অ. ৫। সাত-কাণ্ড রামায়ণ—রামায়ণের আদ্যন্ত। রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। অম্লানমুখে—কোনোরূপ অপ্রতিভ না হইয়াই। **উপপত্তি হইল না**—প্রমাণ হইল না। 'উপপত্তি' শব্দটি ন্যায়শাস্ত্রের। কাজেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে যিনি একটা সিদ্ধান্ত খুঁজিবেন তিনি খুব সম্ভবতঃ একজন নৈয়ায়িক। এই ইঙ্গিতই এখানে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুরম্য—অতি সুন্দর। **অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া**—তুচ্ছ মনে করিয়া। **গীতসাগরে নিমগ্ন**

হইবে—সঙ্গীতের অপূর্ব মাধুর্য উপভোগ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইবে। বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ—নির্জন অরণ্যসমাকুল পার্বত্য অঞ্চল। বন্ধুর—অসমতল। **প্রসূনপরিপূরিত বল্লরীপল্লব-বিভূষিত নিকুঞ্জে** কুসুমিত লতাপত্রশোভিত উপবনে। মনস্তুষ্টিসাধনার্থ—নিজের মনকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। **এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ** ইত্যাদি—বিভিন্ন লোকের বিষয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্য বা প্রবণতার ফলেই প্রতিভাশালী ও প্রতিভাহীনের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। যে একপ্রকার শক্তির অধিকারী, সে শত চেষ্টা করিয়াও অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে প্রতিভা স্বাভাবিক ও দেবদত্ত শক্তি। **আর্যভট্ট**-বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ। ইনি কুসুমপুরের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ববর্তী। পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ ও আহ্নিকগতি ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার মত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। 'আর্যসিদ্ধান্ত' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। **সেক্ষপিয়র**—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে জন্মিয়া ১৬১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত ৩৫ খানি নাটকের মধ্যে *Hamlet, Macbeth, Julius Cæsar, Merchant of Venice, King Lear, Othello* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটক ছাড়া দুইখানি কবিতাগ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। **নিউটন** (Newton)—ইংলণ্ডের একজন ক্ষণজন্মা লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ১৬৪২ খৃস্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের আবিষ্কার, আলোকের গতিনির্ণয় এবং আরও নানারূপ নিয়ম প্রকাশ করিয়া ইনি জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। **নতুবা, আমি, তুমি, সকলেই** ইত্যাদি—প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তি না হইলে যে-কোনো লোক যে-কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিত।

অ. ৬-৭। শিক্ষানিরপেক্ষ—শিক্ষা বা অনুশীলনের প্রয়োজন যাহাতে নাই। সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ—জগতে যে-কোনো বিষয়ে বড় হইতে হইলে পরিশ্রম করিতেই হইবে, কেবল স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই উন্নতি-লাভ সম্ভব নয়। **'কল্পনার পুত্র'**—দেবীরূপে কল্পিত কল্পনার সন্তান। **'সেক্ষপিয়র…অভিহিত হইয়াছেন**—ইংরেজ কবি Milton সেক্ষপিয়রকে

'**কল্পনার পুত্র**' আখ্যা দিয়াছেন। তুলনীয়: "Sweetest Shakespeare, *Fancy's child*"। **যাঁহাকে লোকে অনেক দিন……আসিয়াছে**—যে মহাকবি তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন' সেই Shakespeare-এর বাল্যকাল-সম্বন্ধে লোকে বিশেষ কিছুই জানে না। যেটুকু জানা যায় তাহা এই যে, বাল্যে তাঁহার লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। জন্মভূমি Stratford-on-Avon-এর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তিনি মাতৃভাষা ও সামান্য লাটিন শিক্ষা করেন। তাঁহার আঠারো বৎসর বয়স এই সামান্য শিক্ষারই পরিচয় মিলে। আঠারো বৎসরে সেক্ষপিয়র ছাব্বিশ বৎসরের Anne Hathaway-কে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে জীবিকান্বেষণে তিনি লণ্ডনে আসেন। নাটক-নিচয়—নাটকসমূহ। '**সরস্বতীর বরপুত্র**'—বিদ্যাদেবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান অর্থাৎ সকল বিদ্যার পারদর্শী। **তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না**—কালিদাসের মেঘদূতের একটি শ্লোকে নিচুল নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। টীকাকার মল্লিনাথের মতে এই নিচুল কালিদাসের সহপাঠী ছিলেন। **তিনি যে রামায়ণ মহাভারত** ইত্যাদি—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি হইতে কালিদাসের রামায়ণাদি-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। **কালিদাস অন্যান্য শাস্ত্রেও** ইত্যাদি—কালিদাস যে জ্যোতিষশাস্ত্র জানিতেন তাহার প্রমাণ 'জ্যোতির্বিদ্যাভরণ' নামে একখানি গ্রন্থ তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। রঘুবংশে প্রমাণ আছে যে তিনি চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ জানিতেন। কুমারসম্ভবে তাঁহার সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় আছে।

অ. ৮। **শিক্ষার স্থল অনেক**—এখানে লেখক যে শিক্ষার কথা বলিতেছেন তাহা কেবল কেতাবী বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। তাই ইহাদের বাহিরেও শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

অ. ৯। **শিক্ষার অমৃতময় ফল**—শিক্ষার সাহায্যে মানুষের উন্নতি। **সৃষ্টিকর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী** ইত্যাদি—ভগবান্ সকল মানুষকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাই তিনি যে পক্ষপাতিত্ব করিয়া কাহাকেও এমন শক্তি দিবেন যাহা অন্যের নাই, এরূপ হইতে পারে না—ইহা অভ্যাস বা মনযোগের ফলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত সাধারণ শক্তি। বর্তমানযুগের ইংরেজ মনীষী

Bertrand Russell-ও বলিয়াছেন, "Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration" অর্থাৎ প্রতিভার মধ্যে দেবদত্ত শক্তি শতকরা এক ভাগ, আর নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রমের ফল।

অ. ১০। **ছন্দোগ্রন্থনে**—কতকগুলি কথাকে ছন্দে গাঁথিতে। **তাঁহাদের মধ্যে কয়জন কবি?**—কেবল ছন্দোযোজনায় নিপুণ হইলেই কবি হইতে পারা যায় না; ছন্দোবদ্ধ রচনার কৃত্রিম কাঠামোর উপর যিনি অকৃত্রিম রসপ্রতিমা গড়িতে পারেন তিনিই সত্যিকার কবি। একটি সংস্কৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণ এইরূপ: "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ", অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে মাঘের 'শিশুপালবধম্' শ্রেষ্ঠ কিন্তু (একমাত্র) কবি হইতেছেন কালিদাস—আর কেহ কবিপদবাচ্য নহেন। অতএব কাব্য লিখিলেই কবি হওয়া যায় না। **ভট্টিকার**—'ভট্টিকাব্যম্'-এর রচয়িতা। ভট্টিকাব্যম্ কাহার রচিত তাহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। অনেকের মতে শ্রীধরস্বামীর পুত্র ভট্টির রচনা বলিয়াই কাব্যখানির নাম আছে ভট্টিকাব্যম্। ইঁহাকে প্রসব করিয়াই ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়, পিতাও সংসার ত্যাগ করেন। তখন বলভীরাজ শিশুটিকে আনাইয়া প্রতিপালন এবং শিক্ষাদান করেন। পরে ইনি রাজকুমারগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের শিক্ষার জন্য রামচরিত অবলম্বন করিয়া এই মহাকাব্য রচনা করেন। টীকাকার ভরতমল্লিক বলেন, ভট্টিকাব্যম্ কাব্যপ্রদীপকার ভর্তৃহরির রচনা। ইঁহার রচনা-সম্বন্ধে একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন রাজকুমারেরা অধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকটে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি হাতী সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল। হাতী গেলে নাকি ব্যাকরণ পড়া নিষিদ্ধ; অথচ ব্যাকরণ না পড়াইয়াও উপায় নাই। কাজেই গুরু, নামে কাব্য হইলেও কার্যতঃ ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, এমন একখানি বই (ভট্টিকাব্যম্) রচনা করিয়া রাজপুত্রদের পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। **ভট্টিকার বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন**—ভট্টিকাব্যের কাব্যহিসাবে কোন মূল্যই নাই, ব্যাকরণের সূত্রগুলির উদাহরণরূপেই ইহার যাহা-কিছু মূল্য। কাজেই ইহার রচয়িতাকে কবি না বলিয়া বৈয়াকরণই বলা উচিত। **মন্তব্য:** কাব্যহিসাবে ভট্টিকাব্যের মূল্য নাই, এ-কথা বলা সঙ্গত নয়; শারদ-বর্ণনাত্মক দ্বিতীয় সর্গে যথেষ্ট কাব্য আছে। **কিন্তু কে তাঁহাকে** ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের সহিত তাঁহার তুলনা করিবে না।

অ. ১১। অভ্যাসের প্রকৃতি—অভ্যাসের স্বরূপ। **কার্যসমষ্টিজাত**—একই কার্য বার বার করার ফলে উৎপন্ন। তৎসম্পাদন—তাহা করা। **অনায়াসসাধ্য**—অল্প পরিশ্রমে যাহা করিতে পারা যায়। তৎপক্ষে—সেই কার্যটির প্রতি। **অনুষ্টুপ্**—সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। এই ছন্দে বাল্মীকির রামায়ণ রচিত। ইহা ষোড়শাক্ষরী বৃত্তি।

অ. ১২। **পুরাতনাতিরিক্ত**-যাহা ছিল তাহা হইতে বেশী বা ভিন্নরূপ। **অভ্যস্ত বিদ্যা……পারে না**—অভ্যাসের ফলে জানা জিনিসই ভালো করিয়া আয়ত্ত হয়, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান জন্মে না। **যে 'নূতন সৃষ্টি'** ইত্যাদি—নূতন কিছু সৃষ্টি বা আবিষ্কার করাই প্রতিভার মূলগত বৈশিষ্ট্য; অভ্যাসের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। **ভাস্করাচার্য**—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। বীজলবীড গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ বলেন যে লীলাবতী ইঁহারই কন্যা। ইনি পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু পৃথিবীর গোলকত্ব ও মাধ্যাকর্ষণশক্তির সূচনা তাঁহার 'গোলাধ্যায়' গ্রন্থে আছে। **প্রিন্সিপিয়া**—(Principia) ইহা স্যার আইজাক্ নিউটনের অন্যতম গ্রন্থ। গণিত ও অন্যান্য বিষয়ক তাঁহার বহু যুগান্তকারী তথ্য এই পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে।

অ. ১৩। **যে বিষয়ে যে পরিমাণে** ইত্যাদি—মনোযোগের ফলে অধীত বিষয় মনে রাখিতে পারা যায়। কাজেই যে বিষয়ে যত বেশী মনোযোগ দেওয়া যায় সে বিষয় তত বেশী মনে থাকে। **পূর্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়**--পূর্বে যে বিষয়ের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা পুনর্বার আলোচনা না করিয়াও উপস্থিত করিতে পারা যায়। প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ—নূতন বস্তুর সৃষ্টিশক্তি বা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক্ষমতা।

অ. ১৪। **সহকারী**—সহায়ক। **এইরূপ পুরাতন তত্ত্বসংগ্রহই**—শিক্ষা আমাদিগকে নূতন কিছু না দিয়া পুরাতন ও প্রচলিত বস্তু ও তত্ত্বের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। শিক্ষার লক্ষ্যই এইরূপ। কিন্তু যেহেতু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে পুরাতনের সহিত পরিচয় অপরিহার্য, অতএব শিক্ষা প্রতিভার প্রধান সহায়। **যাঁহারা ঈদৃশ শিক্ষাতেই** ইত্যাদি—যাঁহারা

পুরাতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরিচয় লাভ করিলেই সন্তুষ্ট হন, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করেন না বা করিতে পারেন না, তাঁহারা পণ্ডিত বা কৃতবিদ্য হইলেও অভিনব সৃষ্টির গৌরব হইতে বঞ্চিত।

ব্যাখ্যা

(১) তাঁহারা ভগবানের.........বঞ্চিত রহিয়াছেন। (অ. ২)

আলোচ্য অংশটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন।

যেসকল লোক পৃথিবীতে পুরাতন ও পরিচিত বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, লেখকের মতে তাঁহারা প্রতিভার অধিকারী নহেন। সাধারণে যাহা করিতে পারে না তাহাতে তাঁহারা অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন। এই হিসাবে তাহাদের কৃতিত্বও কম নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রতিভাবান বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই হইল নূতন সৃষ্টির শক্তি, অনাবিষ্কৃতের আবিষ্কারক্ষমতা। এই শক্তি হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। জগতের মানুষ যাহা জানিয়াছে, বুঝিয়াছে, বা শিখিয়াছে, তাহার সম্যক্ রক্ষা ও পোষণই তাহাদের পক্ষে সম্ভব—নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্কার তাহাদের শক্তির অতীত। লেখক একটি উপমার সাহায্যে এই শক্তিভেদের কথা বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণুরূপে সৃষ্ট জগৎ ও জীবের পালন করেন, কিন্তু স্বয়ং সৃষ্টি করেন না; সৃষ্টি যিনি করেন তিনি ব্রহ্মা। প্রতিভাহীন দক্ষ পুরুষদিগকে পালনকর্তা বিষ্ণুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পালনের অতিরিক্ত কোনো সৃজনীশক্তি তাঁহাদের নাই আর যাঁহারা 'প্রতিভাবান্', তাঁহারা ব্রহ্মার মতো নূতন সৃষ্টিশক্তির অধিক—যাহা লোকে কোনোদিন শোনে নাই, জানে নাই, শিখে নাই, ভাবে নাই, সেই অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার দিকেই তাহাদের বুদ্ধি ধাবিত হয়।

(২) এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি...প্রত্যাগমন করেন। (অ. ৩)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। প্রতিভা যে শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি, প্রাচীনকালে মানুষের এইরূপ একটা ধারণার ফলে কি হইয়াছে তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাচীনকালে লোকে বিশ্বাস করিত যে প্রতিভাবান্ পুরুষগণ দৈবী শক্তির অধিকারী—দেবতা অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে কোন বিশেষ ক্ষমতা দান করেন, তাহার বলেই সে নূতন নূতন সৃষ্টিমহিমায় জগৎকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। এই বিশ্বাসের ফলেই জগতে প্রাচীন মনীষীদের সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছে এবং লোকেও তাহা বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছে। এইরূপ একটি জনশ্রুতির লক্ষ্য মহাকবি কালিদাস। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর মতো অপূর্ব নাটক প্রণয়ন করিয়া যিনি বিশ্বের রসিক সমাজের অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, অনন্যসাধারণ কবিত্বে স্বর্গ-মর্ত্যের মিলন-সাধন করিয়াছেন, প্রচলিত কিংবদন্তী-অনুসারে সেই কালিদাস নাকি ছিলেন গণ্ডমূর্খ। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি গাছের ডালে বসিয়া সেই ডালটিকে কাটিতে উদ্যত হয়, তাহার মতো মূর্খ জগতে আর কে আছে ? এহেন কালিদাসই নাকি পরে তাঁহার অপরিমেয় মূর্খতার জন্য বিদুষী স্ত্রীর পদাঘাতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অভিমানে বনে চলিয়া যান এবং সেখানে দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া অচিরেই সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গৃহে ফিরেন। এই কাহিনীর মর্মকথাটি হইল এই যে, কোনোরূপ শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যতীতই লোকে, এমনকি মূর্খ ব্যক্তিও, দেবতার অনুগ্রহে প্রতিভার অধিকারী হইতে পারে। লেখক পরে দেখাইয়াছেন যে এই বিশ্বাসের মূলে কোনো সত্য নাই ; কালিদাসের কাব্য হইতে তাঁহার শিক্ষাহীনতার কথা সমর্থিত হয় না।

[কালিদাস-সম্বন্ধে জনশ্রুতিটির পূর্ণ বিবরণ টীকারূপে যোগ কর।]

(৩) প্রসিদ্ধ সাক্সন কবি সিড্মন্—গীতিশক্তি জন্মে। (অ. ৪)

আলোচ্য অংশটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রতিভা যে শিক্ষানিরপেক্ষ দৈবী শক্তি, প্রাচীনকালের মানুষের এইরূপ একটি ধারণার উদাহরণস্বরূপ লেখক এস্থলে ইংলণ্ডের একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের পুরাতত্ত্ববিদ্ বিডি সাহেব তাঁহার গ্রন্থে সাক্সন কবি সিড্মনের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রথম অবস্থায় নাকি সিড্মনের কবিপ্রতিভা তো দূরের কথা, সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করিবার শক্তিও ছিল না, বরং সঙ্গীতের প্রতি একটা সহজাত বিরাগ ছিল। সঙ্গীতে মুগ্ধ না হয় এমন মানুষ

জগতে খুব কমই আছে। তথাপি এহেন অরসিক ব্যক্তি যে হঠাৎ একদিন গীতরসিক ও শক্তিমান গীতি-রচয়িতা হইয়া উঠিবেন, তাহার কারণ নাকি দেবতার অনুগ্রহ। সিড্‌মন্‌ ছিলেন ইংলণ্ডের এক মঠের আস্তাবল-রক্ষক। একদিন ভোজসভায় ধর্মসঙ্গীত আরম্ভ হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন এবং আস্তাবলে স্বস্থানে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের কাহিনী অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। তিনি নিজের অক্ষমতা ও সঙ্গীতের প্রতি বিরাগের কথা বলিলে তাঁহাকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, সে শক্তি তিনি লাভ করিবেন। ইহাই নাকি তাঁহার কবিপ্রতিভা লাভের ইতিহাস। সিড্‌মন্‌-সম্বন্ধে এই জনশ্রুতিটি এই বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত বহন করে যে, দেবতার অনুগ্রহ বা অনুরূপ কোন অলৌকিক উপায়েই মানুষ প্রতিভার অধিকারী হয়—এই লোকোত্তর শক্তি লাভ করিতে হইলে তাহাকে কোনোরূপ চেষ্টা-যত্ন বা অনুশীলন করিতে হয় না।

[সিড্‌মনের কাহিনী এবং তাঁহার পূর্ণ পরিচয় টীকারূপে যোগ কর।]

(৪) এইরূপ স্বাভাবিক…নিউটন হইতে পারিতাম। (অ. ৫)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা'-শীর্ষক প্রবন্ধের এই অংশটিতে লেখক প্রতিভা যে দেবদত্ত স্বাভাবিক শক্তি এই মতের আংশিক সমর্থন করিয়াছেন।

জগতের মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতার জন্য একজনের যাহা ভালো লাগে অন্যের তাহা লাগে না; একজনে যাহা সহজে বুঝিতে পারে অন্যে তাহা মোটেই বুঝিবে না। এই বৈচিত্র্যের ফলে কেহ গণিতজ্ঞ, কেহ দার্শনিক, কেহ চিন্তাশীল, কেহ বা আবার কর্মদক্ষ। যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ ও শক্তি আছে, সে অনুশীলনের ফলে কেবল তাহাতেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। শত চেষ্টা করিলেও অন্যবিষয়ে উৎকর্ষলাভ তাহার সাধ্যাতীত। এই কথা প্রতিভাহীন এবং প্রতিভাবান্‌ উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। প্রতিভা যদি স্বাভাবিক শক্তি না হইত, যদি কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে প্রতিভার অধিকারী হওয়া সম্ভব হইত, তবে একই ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার পথে কোনো বাধাই থাকিত না—যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কালিদাস বা সেক্ষপিয়রের মতো মহাকবি, অথবা

আর্যভট্টের মতো খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ্ বা নিউটনের মতো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিত। এরূপ যখন হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়, তখন এই সত্যই সমর্থন লাভ করে যে প্রতিভা স্বাভাবিক অর্থাৎ দেবদত্ত শক্তি। এই শক্তি না থাকিলে শিক্ষা বা অনুশীলন নিষ্ফল হইতে বাধ্য। আবার যাহার যেদিকে স্বাভাবিক শক্তি, তাহার পক্ষেও অন্যদিকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সম্ভব নহে। সেক্ষপিয়রের ছিল স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা; তাই তিনি সেক্ষপিয়রই হইতে পারিতেন এবং হইয়াছিলেনও। তাঁহার পক্ষে আইন্‌স্টাইন হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। [কালিদাস, আর্যভট্ট, সেক্ষপিয়র ও নিউটনের পরিচয় দাও।]

(৫) যে কার্য কোনো ব্যক্তি……ইহা সম্ভব নহে। (অ. ৯)

এই অংশটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা' প্রবন্ধের অন্তর্গত। প্রতিভাকে যাঁহারা কেবল অভ্যাস মনোযোগের ফল বলিয়া থাকেন, এস্থলে লেখক তাঁহাদের মতের সমর্থনে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ প্রতিভাকে স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগের ফল। অভ্যাসের অর্থ একই কাযের বার বার পুনরাবৃত্তি। বার বার একই কায যে করে, তাহার সেই কাযে বিশেষ শক্তি ও দক্ষতা জন্মে; যে কাযে বার বার মনোযোগ দিতে হয়, তাহাতে লোকে এমন একটা নৈপুণ্য লাভ করে যে, অন্যের চেয়ে অল্পসময়ে অথচ সুষ্ঠু-ভাবে তাহা সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ইহার নাম প্রতিভা। প্রতিভাকে দেবদত্ত বা স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে ভগবান্‌কেও অপক্ষপাতী সমদর্শী বলা চলে না। ভগবান্ কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। ভগবানের বিধানে যদি অবিচার না-ই থাকে, তবে তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে লোকোত্তর শক্তির অধিকারী করিয়া অপর সকলকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত। আসল কথা এই যে, ভগবান্ সকলকে সমান শক্তি দিয়াই পৃথিবীতে পাঠান। চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা যাঁহারা এই শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রতিভাবান। অতএব প্রতিভা দেবদত্ত শক্তি হইতে পারে না—ইহা অভ্যাস ও মনোযোগের ফলে প্রাপ্ত বিশেষ নৈপুণ্যমাত্র। এই হিসাবে যাহার অভ্যাস ও মনোযোগ যত বেশী হইবে, তাহার প্রতিভালাভের সম্ভাবনাও তত বেশী।

(৬) এইজন্যই আমরা পূর্বে……নিরপেক্ষ নহে। (অ. ১৪)

এই বাক্যটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। প্রতিভা-সম্বন্ধে নিজস্ব মতটির পুনরুল্লেখ করিয়া লেখক এস্থলে তাহাই সিদ্ধান্ত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

(প্রতিভা যে অভ্যাস ও মনোযোগের ফল—এই মতের সমর্থনে সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, অভ্যাসের ফলে উৎকর্ষলাভ সম্ভব হইলেও নূতন সৃষ্টির শক্তি লাভ করা যায় না। তাই প্রতিভা যে স্বাভাবিক শক্তি একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তবে অভ্যাসের প্রয়োজন যে একেবারেই নাই এমন নহে। প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ও বিকাশের পক্ষে অভ্যাস ও অনুশীলন অপরিহার্য। যিনি কোন বিষয়ে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চান, তাঁহার সেই বিষয়ে পুরাতন তত্ত্বগুলি না জানিলে চলিবে না। সেগুলি জানিতে হইলে অভ্যাস ও মনোযোগের, এককথায় শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষার পোষকতা না থাকিলে শক্তিশালী প্রতিভাও নিষ্ফল হইয়া যায়: যাহা একদিন অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাট্ মহীরুহ হইতে পারিত তাহা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিভা অভ্যাস না হইলেও, অভ্যাস বা শিক্ষা যে প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সহায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে স্বাভাবিক অনন্যসাধারণ শক্তি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষার ফলে তাহার সম্যক্ স্ফূর্তি ও বিকাশ ঘটিলেই সে জগৎকে নূতন নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে। শিক্ষার সহিত প্রতিভার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী না হইলেও খুবই ঘনিষ্ঠ—শিক্ষাহীনের প্রতিভা থাকিয়াও নাই।)

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। প্রাচীন প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাস ও মত খণ্ডন করিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিভা-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা লেখকের যুক্তিপারম্পর্য অনুসরণ করিয়া নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। প্রতিভা বস্তুটি যে কি সে-সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি নানা-প্রকার ধারণা চলিয়া আসিতেছে। পুরাকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইহা

দেবদত্ত শক্তি। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে অথবা মূর্খ কালিদাসের কবি কালিদাসে রূপান্তর-সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এই প্রাচীন বিশ্বাসেরই প্রমাণ দেয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ পুরাবিদ্ বিডির বিবরণে কবি সিড্‌মনের স্বপ্নযোগে গীতিশক্তি-লাভের কাহিনী বিবৃত আছে। ইহাও প্রমাণ করে যে সেকালের মানুষ প্রতিভাকে দৈবপ্রভাবরূপেই গণ্য করিত। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ বিশ্বাসের মূলে কোন প্রাকৃতিক সত্য বা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ প্রতিভা আকস্মিক কোন একটা লোকোত্তর শক্তির প্রভাব নহে—ইহা মানুষের স্বভাবজ অসাধারণ শক্তি। এ জগতে মানুষ রুচি, প্রকৃতি ও শক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের এক এক জনের মধ্যে এক এক প্রকার শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। এসকল বিভিন্ন শক্তিরই উৎকৃষ্ট এক শ্রেণীকে প্রতিভা বলা যাইতে পারে। অবশ্য প্রতিভাও বিভিন্নমুখী হইয়া থাকে। প্রতিভার অভাবে রামা-শ্যামা সকলেই যেমন কালিদাস বা সেক্ষপিয়র হইতে পারে না, প্রতিভার সদ্ভাবেও তেমনি কালিদাস আর্যভট্ট হইতে পারেন না। নিউটনের পক্ষে সেক্ষপিয়র হওয়ারও সাধ্য ছিল না।

সে যাহাই হউক, প্রতিভা যে স্বাভাবিক শক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে। সেক্ষপিয়রের বা মহাকবি কালিদাসের জীবনকথায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 'কল্পনার পুত্র' বলিয়া অভিহিত যে সেক্ষপিয়র, তাঁহারও যে ব্যাপক অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতা ছিল, সে সত্য আজকাল স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের কালিদাসও পূর্ববর্তী কাব্য-সাহিত্য পুরাণাদি সকল বিষয়ে যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই এই হয় যে প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে। অবশ্য শিক্ষা হইতে বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ অধ্যয়ন বুঝায় না। জগতের বৃহত্তর শিক্ষায়তন মনুষ্যসমাজ, বিভিন্ন গ্রন্থে ও উদার প্রকৃতির মধ্যে বিস্তারিত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যত্ন ও মনোযোগসহকারে এইগুলি হইতে পর্যাপ্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

শিক্ষার বাহ্য চমকে মুগ্ধ কোনো কোনো ব্যক্তি প্রতিভাকে স্বভাবজ শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগমাত্র। পুনঃপুনঃ প্রয়াসের ফলে অথবা গভীর অভিনিবেশের দ্বারা মানুষ যে অনন্য-সাধারণ শক্তিলাভ করে, তাহাকেই এই দল প্রতিভা বলিয়া থাকেন। কিন্তু

অভ্যাস ও মনোযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই মত গ্রহণযোগ্য হয় না। অভ্যাস যাহা আছে তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রয়াসে আয়ত্ত করিতে পারে মাত্র, কিন্তু নূতন সৃষ্টি তাহার সাধ্যাতীত। কাজেই ইহাকে প্রতিভা বলা সঙ্গত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মনোযোগ স্মৃতির সহায়কমাত্র। একটি বস্তু থাকিলেই তাহাতে মনোযোগ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে, এবং মনোযোগ যত গভীর হয় ততই তাহা স্মরণে গাঁথিয়া যায়। কিন্তু যাহা নাই তাহার সৃষ্টি তো মনোযোগের সাধ্য নহে। তবে উহাকে প্রতিভা বলা যাইবে কি করিয়া? নূতন সৃষ্টিক্ষমতাই প্রতিভার মৌলিক লক্ষণ। অভ্যাস বা মনোযোগে তাহা অবর্তমান।

কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণের পক্ষে অভ্যাস ও মনোযোগের উপযোগিতা আছে। কারণ, এই দুইটির দ্বারা পুরাতন ও বর্তমান বিষয়গুলি আয়ত্ত করা সহজ হয় এবং তাহাতে নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্কারের পথ সুগম হয়। সুতরাং অভ্যাস ও মনোযোগ প্রতিভার প্রয়োজনীয় সরকারী, কিন্তু প্রতিভা স্বাভাবিক অনন্য-সাধারণ সৃষ্টিশক্তি।

প্র. ২। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা'-শীর্ষক প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর আলোচনা কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার ও **আলোচনা** দেখ।

প্র. ৩। "তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।"

(ক) এই অংশে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? (খ) কি অর্থে কি বস্তুকে পালনশক্তি এবং কি বস্তুকেই বা সৃষ্টিশক্তি বলা হইয়াছে? (গ) ইহাদের উৎস কি?

উ.। (ক) এই অংশে 'প্রতিভা' প্রবন্ধের লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষ বা পারদর্শী ব্যক্তিদের কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা অন্যের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বা নিয়মনীতি অনুসরণ ও অনুশীলন করিয়া সেই সেই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন তাঁহারা দক্ষ ব্যক্তি মাত্র, সত্যকার প্রতিভাশালী নহেন। এখানে এইরূপ দক্ষ ব্যক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

(খ) মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। একপ্রকার শক্তি যাহা আছে তাহাকে চর্চা ও চেষ্টা দ্বারা বাঁচাইয়া রাখে, বাড়াইয়াও তোলে। নিপুণ কৃষক বীজ তৈয়ারী করিতে পারে না বটে, কিন্তু সযত্ন লালনে সে বীজ

হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের বিকাশ সহজ করিয়া দিতে পারে। তাহার এই দক্ষতা পালনশক্তির পরিচায়ক। যে শক্তি এইরূপে অন্যের উদ্ভাবিত তত্ত্ব বা বস্তুকে অনুশীলন দ্বারা উৎকর্ষ দান করে, তাহাই পালনশক্তি। ইহা কর্মদক্ষতারই নামান্তর।

যে শক্তিবলে মানুষ আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা সম্পূর্ণ নূতন কিছু প্রস্তুত করিতে পারে, সেই শক্তিরই নাম সৃষ্টিশক্তি। মহর্ষি বাল্মীকি এই শক্তিবলেই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণের মধ্যে একটা কল্পনার জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহা যেন নূতন একটা ব্রহ্মাণ্ড। বাল্মীকি নূতন জগতের সৃষ্টিকর্তা। তাহার প্রতিভার ন্যায় শক্তিকেই এখানে সৃষ্টিশক্তি বলা হইয়াছে।

(গ) লেখক এই দুইপ্রকার শক্তির উৎস যে ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্‌কে আমরা সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা এই তিন রূপে জানি। সৃষ্টিকর্তাহিসাবে তিনি বিশ্ব রচনা করেন। পালনকর্তা হিসাবে তিনি বিশ্বকে পালন করেন বা রক্ষা করেন। তাঁহার সৃষ্ট মানুষ তাঁহার এই তিন শ্রেণীর কোনো-না-কোনো শক্তির বিশেষ অধিকারী হয়। কাহারও মধ্যে দেখা যায় সৃজনীশক্তি, কাহারও মধ্যে শুধু দক্ষতা বা পালনশক্তি। সুতরাং এইসকল শক্তি সহজাত—ইহাদের উৎস ভগবান্।

প্র. ৪। 'কল্পনার পুত্র' ও 'সরস্বতীর বরপুত্র'—এই দুইটির পার্থক্য কি? কাহাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা হইয়াছে?

উ.। 'কল্পনার পুত্র' ও 'সরস্বতীর বরপুত্র'—এ দুইয়ের অর্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নাই। উভয়েরই অর্থ: শিক্ষা-নিরপেক্ষভাবে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু নিছক শব্দার্থ দেখিতে গেলে দুইটির অর্থগত পার্থক্য আছে। 'কল্পনার পুত্র' কথাটি কবি Milton-এর 'Fancy's child'-কথারই বাঙলা অনুবাদ। মিল্টন ইংরেজ কবি। Fancy বা কল্পনাকে গ্রীসদেশে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে নহে। তাহা ছাড়া কথাটির সহিত কোনো-পূর্ব কাহিনীরও সংযোগ নাই। সুতরাং ইহার অর্থ—অপূর্ব কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয়টির অর্থ—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ সরস্বতীর নিকট বরপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সন্তান। ইহার সহিত যে পূর্বকাহিনীটি জড়িত আছে, তাহাতেও এই অর্থই সমর্থন লাভ করে।

'কল্পনার পুত্র' বলিতে সেক্ষপিয়রকে বুঝানো হইয়াছে। মিল্টন তাঁহাকে এইরূপভাবে অভিহিত করেন। অনেকের ধারণা সেক্ষপিয়র অশিক্ষিত ছিলেন। কেবল অপূর্ব পর্যবেক্ষণ ও সহজাত কল্পনাশক্তিবলে তিনি বিশ্ববিশ্রুত কবি-কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এইজন্যই মিল্টন তাঁহাকে 'কল্পনার পুত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'সরস্বতীর বরপুত্র' বলিতে মহাকবি কালিদাসকে বুঝানো হইয়াছে। কথিত আছে যে কালিদাস প্রথমে অতিশয় মূর্খ ছিলেন। অবশেষে সরস্বতীর বর লাভ করিয়া তিনি মহাকবি হইয়া উঠেন। এইজন্য তিনি সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হন।

প্র. ৫। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বর্ণিত 'মন্ত্রশক্তি' ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আলোচিত 'প্রতিভা'র সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া একটা তুলনামূলক আলোচনা লেখ।

উ.। 'মন্ত্রশক্তি' বলিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহাকে রাজকৃষ্ণবাবুর ভাষায় দেবানুগৃহীত শক্তি বলা চলে। বর্তমানে মানুষ যাহাকে প্রতিভা বলে, রাজকৃষ্ণবাবুর মতে তাহাকেই এককালে লোকে ঐশী শক্তিরূপে ধারণা করিত। তাই প্রাচীনকালে এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিগণকে দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য করা হইত। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তর বা মূর্খ কালিদাসের কবি কালিদাসে পরিণতি-সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলি এই দৈবী শক্তির কথাই প্রচার করে। শুধু এদেশে কেন—ইংলণ্ডের কবি সিড্‌মনের গীতিশক্তিলাভ-সম্বন্ধে যে কাহিনীটি শোনা যায়, তাহার মূলেও প্রতিভা যে ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে। প্রমথবাবুর 'মন্ত্রশক্তি'ও এইরূপ দেবানুগৃহীত। প্রাচীনদের মতো তাঁহার মত এই যে, "পৃথিবীর সব খেলাতেই তিনি দিগ্বিজয়ী হন, যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে।"

প্রমথবাবুর 'দেবতার ভর' কথাটার মধ্যে একটা গ্রীক্ শব্দের আশ্চর্য অনুবাদ লক্ষ্য করা যায়। যে শক্তিবলে মানুষ সংসারে লোকোত্তর কীর্তি অর্জন করে, গ্রীকগণও তাহাকে দেবতার ভরজনিতই জ্ঞান করিত। তাহাদের ভাষায় en-theos-mos বা দেবতার ভরই সকল কীর্তির প্রেরণামূলে রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রমথবাবুরও ঠিক সেইরূপ মত। কিন্তু মন্ত্র বলিলেই অভ্যাস বা দীক্ষাগুরুর কথা মনে হয়। প্রমথবাবুর মন্ত্রগুরুর নিকট দীক্ষালব্ধ নিয়মিত

অভ্যাসের যোগ্য মন্ত্রও নহে। রাজকৃষ্ণবাবু যাহাকে প্রতিভা বলিয়াছেন, ইহা প্রায় তাহাই। ইহার স্বরূপসম্বন্ধে অবশ্য তিনি কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, এই মন্ত্রশক্তি সেই শক্তি যাহার বলে সামান্য মানুষও অসামান্য কীর্তি-অর্জনে সমর্থ হয়। ইহা যে কখন, কেন এবং কাহার উপর দেখা দেয় তাহা বলা দুষ্কর। এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে ঈশ্বর পাটনীর মতো দুই-একটি মানুষই জন্মসূত্রলব্ধ কোনো একটা দুর্জ্ঞেয় আত্মিক বা মানসিক শক্তির আকর্ষণে এই দৈব প্রভাব বা মন্ত্রশক্তিকে নিজের উপর ভর করাইতে পারে। অতএব ইহা অনুশীলনের বিষয় নহে—দৈব ব্যাপার।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রতিভা ফলশ্রুতির দিক্ দিয়া মন্ত্রশক্তিরই তুল্য। বস্তুতঃ ইহাও সেই অসাধারণ শক্তি যাহা মানুষকে অনন্যসাধ্য কার্যসাধনে সামর্থ্য দেয়। কিন্তু ইহা মানুষেরই প্রকৃতিগত বস্তু—কোনো প্রভাব নহে। প্রত্যেক মানুষই এ জগতে কোনো না-কোনো শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এসকল শক্তিরই কোনো একটা যখন উৎকর্ষ লাভ করিয়া কাহারও মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে, তখন তাহাকে প্রতিভা বলা হয়। অবশ্য এই উৎকর্ষের পথ অনুশীলন-নিরপেক্ষ নহে। শিক্ষা—সে বিদ্যালয়েই হউক বা প্রতিবেশগতই হউক—প্রতিভার বিকাশের সহায়ক। তাই বলিয়া প্রতিভা কেবলমাত্র অনুশীলনেই লভ্য নহে, ইহা অভ্যাসজাতও নহে, মনোযোগের ফলও নহে—ইহা অনুশীলনবিকশিত মানুষের স্বাভাবিক শক্তি। ইহা স্থূলভাবে রাজকৃষ্ণবাবুর মত।

স্পষ্টতঃই তাহা হইলে 'মন্ত্রশক্তি' ও 'প্রতিভা'র এইদিক দিয়া সাদৃশ্য যে উভয়ই দেবদত্ত। তবে প্রতিভা অনুশীলনসাপেক্ষ, মন্ত্রশক্তি সেরূপ নহে। দ্বিতীয়তঃ, 'মন্ত্রশক্তি' মানুষের প্রকৃতিগত দুর্জ্ঞেয় এবং অসাধারণ ক্ষমতা বটে, তবে তাহা কীর্তির প্রত্যক্ষ কারণ নহে। উহার বিশেষত্ব এই যে, উহা একটা অলৌকিক প্রভাব বা দেবতার ভর আবাহন করিয়া আনিতে পারে। মানুষের মধ্যে যখন এইরূপ দৈব্য প্রভাব দেখা দেয়, তখনই সেই মানুষ লোকোত্তর মহিমার কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। সেইজন্য প্রতিভাহীন সাধারণ মানুষও এই শক্তিবলে কল্পনাতীত সাফল্য ও কীর্তির অধিকারী হইতে পারে। রাজকৃষ্ণবাবু প্রতিভার ক্ষেত্রে বাহ্যশক্তির এই আকস্মিক আবির্ভাব স্বীকার করেন না। 'মন্ত্রশক্তি'র সহিত 'প্রতিভা'র দ্বিতীয় পার্থক্য।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস : নূতনপথদর্শী—নূতন পথ (কর্মধারয়) ; তাহা দর্শন করে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। বিজ্ঞানবিদ্—বিজ্ঞান জানেন (বিদ্ = জানা) যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ)। কণ্ঠস্থ—কণ্ঠে থাকে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। নূতন-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-কারিণী—নূতন ব্রহ্মাণ্ড (কর্মধারয়) ; তাহার সৃষ্টি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহা করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গে)। প্রত্যক্ষ—অক্ষির সম্মুখে (অব্যয়ীভাব)। সর্ববিদ্যাবিশারদ—সর্ব বিদ্যা (কর্মধারয়) ; তাহাতে বিশারদ (৭মীতৎপুরুষ)। সঙ্গীতরসাস্বাদ-বিহীন—সঙ্গীতের রস (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার আস্বাদ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার দ্বারা বিহীন (৩য়াতৎপুরুষ)। সাহিত্যরসপান—সাহিত্যের রস (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার পান (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) অকিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ) ; নয় কিঞ্চিৎকর (নঞ্-তৎপুরুষ)। তরুলতাশূন্য—তরু এবং লতা (দ্বন্দ্ব) ; তাহাদের দ্বারা শূন্য (৩য়াতৎপুরুষ)। বল্লরীপল্লববিভূষিত—বল্লরী এবং পল্লব (দ্বন্দ্ব) ; তাহাদের দ্বারা বিভূষিত (৩য়াতৎপুরুষ)। মনস্তুষ্টি-সাধনার্থ—মনের তুষ্টি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার সাধন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার জন্য ইহা (নিত্যসমাস)। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন—নয় লৌকিক (নঞ্তৎপুরুষ) ; অলৌকিক শক্তি (কর্মধারয়) ; দ্বারা সম্পন্ন (৩য়াতৎপুরুষ)। অভিনবতত্ত্বমন্দিরে—অভিনব তত্ত্ব (কর্মধারয়) ; তাহার মন্দির (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : প্রাধান্য—প্রধান+ষ্যঞ্ (য)। আকস্মিক—অকস্মাৎ+ইক্ (ইক)। তাৎকালিক—তৎকাল+ঠক্ (ইক)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন (যৌগিক)—তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইলেও বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন (সরল)।

প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় (নেতিবাচক)—প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা আংশিকভাবে সত্য (অস্তিবাচক)।

আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ—আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না ('শিক্ষানিরপেক্ষ' কথাটির সমাস ভাঙিয়া ব্যবহার)। [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০]

সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ—সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে ('পরিশ্রমসাপেক্ষ' কথাটির সমাস ভাঙিয়া ব্যবহার)—কোনোপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমনিরপেক্ষ নয় (নেতিবাচক)।

যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী (সরল)—যে যত্নশীল, সে-ই রত্নলাভে অধিকারী (জটিল)।

যে কালিদাস 'সরস্বতীর বরপুত্র' তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না (জটিল)—'সরস্বতীর বরপুত্র' কালিদাসও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না (সরল)—যে কালিদাস 'সরস্বতীর বরপুত্র', তিনিও কি অধ্যয়নশূন্য ছিলেন (প্রশ্নবোধক)?

কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই (নেতিবাচক)—কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তাহা সন্দেহাতীত (অস্তিবাচক)।

যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব (প্রশ্নবোধক)?—যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কালিদাস হইতে পারিব না (নেতিবাচক)।

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে (সরল)—যদি আমরা অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করি, তবে এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে (জটিল)।

প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটি নাই (জটিল)—প্রতিভার প্রধান লক্ষণটি মনোযোগে নাই (সরল)।

প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বলা যাইতে পারে না—প্রতিভাকে মনোযোগ মাত্র বলিতে পারি না (বাচ্যান্তর)।

বাক্য-রচনা: প্রাধান্য: উদ্যোগী পুরুষই সংসারে প্রাধান্য লাভ করেন। আদ্যন্ত: তোমার পত্রখানি আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি।

তাৎকালিক: তাৎকালিক প্রথা অনুসারে বিধবা স্বামীর চিতাগ্নিতে প্রাণ দিলেন।

পক্ষপাতী: পক্ষপাতী বিচারকের দ্বারা কখনও ন্যায়বিচার হইতে পারে না।

পুনরুদ্ধার: বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এমনভাবে লুপ্ত হইয়াছে তাহাদের পুনরুদ্ধার বোধ হয় অসম্ভব।

মহাত্মা রামমোহন

শিবনাথ শাস্ত্রী

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙলার নবযুগস্রষ্টাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পরিচয় পঞ্জীতে তাঁহার জন্ম, জীবন ও কর্মসাধনার মোটামুটি ইতিহাস আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ধর্মপ্রচারক, সমাজসংস্কারক, লোকসেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক।" কিন্তু শিবনাথের বিচিত্র কর্মসাধনার মূলে সত্যকার যে ব্যক্তিস্বরূপটির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা মূলতঃ সাহিত্যিক। শিবনাথ তাঁহার অপরিমেয় শক্তিকে সাহিত্যক্ষেত্রে সংহত করিলে অক্ষয় সম্মানের অধিকারী হইতেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য কেশবচন্দ্র—এই দুইজন শক্তিশালী সাহিত্যিকের মতো সাহিত্যিক শিবনাথ ধর্ম ও সমাজসংস্কারব্রতে আত্মবলি দিয়া গিয়াছেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছেন—"এক সময়ে শব্দযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনো কোনো দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এবিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালীসমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্মচিন্তায় ও কর্মজীবনে তিনি যা কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিক সাহিত্যশক্তি ও কবি প্রতিভায় সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের ও সমাজজীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্মসমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাগ্মিতাশক্তি ও সাহিত্যসম্পদের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে···।"

উৎস ও নামকরণ—'মহাত্মা রামমোহন' প্রবন্ধটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড' হইতে সংকলিত। মূলে প্রবন্ধটির নাম 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়', পাঠ-সংকলনে 'রাজা' ও 'রায়' কথা দুইটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

'মহাত্মা রামমোহন' প্রবন্ধে লেখক রামমোহনের চরিত্রমাহাত্ম্যই বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা রামমোহনের কর্মবহুল বিচিত্র জীবনকথা এই প্রবন্ধে স্থান পায় নাই, ইহাতে এত স্থানও নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য রামমোহনের মহান্ আত্মাকেই আমাদের চক্ষু সম্মুখে তুলিয়া ধরা। রামমোহন মানবের আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন এবং সকল মানবাত্মাকে এক পরমাত্মার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। এইজন্যই নিপীড়িত মানুষমাত্রই—সে যে-দেশেরই হউক না কেন—তাঁহার পরম আত্মীয় ছিল। রামমোহনের স্বাধীনতাকামনা এবং পরাধীনের জন্য তীব্র আবেগ—এ সবেরই মূলে ছিল এক প্রত্যয়: সকল আত্মা পরমাত্মার অংশ। এইখানেই তাঁহার বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল প্রেরণা, এইখানেই তাঁহার মহান্ আত্মার প্রসার, বিপুল মহত্ত্ব। এই প্রবন্ধে লেখক রামমোহনের এই স্বরূপটিই আমাদের সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়াছেন। সেইজন্যই ইহার শিরোনাম, শুধু 'রামমোহন' নহে, 'মহাত্মা রামমোহন'। বলা বাহুল্য, এই শীর্ষনাম সম্পূর্ণ সার্থক।

সমালোচনা—'মহাত্মা রামমোহন'-শীর্ষক প্রবন্ধটি একটি উৎকৃষ্ট চরিত-কথা। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহনকে এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। রামমোহন যে সত্যই মহাত্মা, ইহা তিনি তাঁহার জীবনের সুনির্বাচিত কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রামমোহনের যাবতীয় শক্তি ও মহত্ত্ব একটি উৎস হইতে উৎসারিত। সেই উৎসটির কথা তিনি প্রবন্ধের সূচনাতেই বিবৃত করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র জ্ঞান করিতেন এবং এই মানবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। এই উপলব্ধিই ছিল তাঁহার অফুরন্ত মানবপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বাবলম্বন, আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামশক্তির মূলে। ইহাই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধটির সারকথা। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি রামমোহনের আত্মার মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল লেখকের বাস্তবধর্মিতা। রামমোহন কেন বড় হইয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যায় তিনি বিন্দুমাত্র ভাগ্যবাদিতার আশ্রয় লন নাই। মানুষ তাহার ভাগ্যবিধাতা—এই কথাটাই রামমোহনের জীবনের মধ্য দিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রমাণ যতটাই হউক, লেখকের মধ্যে নবযুগের বাস্তবদৃষ্টি স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলাদেশে যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে, তাহাতে

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি একটা আত্যন্তিক শ্রদ্ধা মিশিয়া ছিল। আর সেই বিজ্ঞান-সাধনা ছিল মূলতঃ পুরুষকারে বিশ্বাসী। শিবনাথ শাস্ত্রী সেই বিশ্বাসে ভর করিয়াই রামমোহনের চরিত্র ও মহত্ত্ব রামমোহনেরই সাধনার ফলশ্রুতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এতবড় একটা মহাপুরুষকে তিনি মানুষই রাখিয়াছেন, ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি আরোপ করিয়া তিনি তাঁহাকে অতিমানব করেন নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে লেখকের উপর মানবধর্মের প্রভাব বুঝা যায়।

প্রবন্ধটি আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের লেখা। কিন্তু ইহার প্রাঞ্জলতা ও বাঁধুনি সত্যই প্রশংসনীয়। শব্দ ও বাক্যের যোজনায় লেখকের এমন যথাযোগ্যতা-বোধ আছে যে, বক্তব্যবিষয় সর্বত্র স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র অবান্তরতা নাই। শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস এখানে দুই-একটি বিস্ময়সূচক কথাতেই সংযত। বাঙলা গদ্যের আদর্শ-হিসাবে তাই প্রবন্ধটি আজও 'অনুকরণযোগ্য'।

রাজা রামমোহন রায়ের অনেক কথা অনেক কীর্তি আমরা জানি। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের যথার্থ স্বরূপটি আর কোনো প্রবন্ধে এত অল্পে এত সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয় নাই। শিবনাথ শাস্ত্রীর এই কৃতিত্ব কিন্তু নিছক ভাষার নৈপুণ্যে নহে। বস্তুতঃ এইখানেই তাঁহার সাহিত্যিক গুণের পরিচয়! রামমোহনের জীবন হইতে তিনি যে ঘটনাগুলি বলিয়াছেন, সেগুলি এক এক ঝলকে তাঁহার চরিত্রটি উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। এই নির্বাচনের দক্ষতার সহিত যুক্ত হইয়াছে লেখকের অনায়াসসিদ্ধ মনোরম বর্ণনভঙ্গী। রামমোহনের আবেগ ও উত্তেজনার বিবরণগুলির মধ্যে একটু নাটকীয়তাও আছে। কিন্তু চরিত্রবিচারে এ বিষয়ে লেখকের সংযম না থাকিলে যুক্তি ও বিশ্লেষণ দুর্বল ও শ্লথ হইয়া পড়ে। তাই শাস্ত্রী মহাশয় সর্বদাই সংযত। প্রত্যেকটি বিবরণশেষে সুকৌশলে তিনি সিদ্ধান্তটির সমাহার করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার—রামমোহন মানবাত্মাকে পরমাত্মার অংশজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক যে-কোনো কারণে এই মানবাত্মার দাসত্ব ও লাঞ্ছনা তাঁহার সহনাতীত। এই কারণে পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাকামী জাতির আন্দোলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। কোনো জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে শুনিলে তিনি মর্মাহত হইতেন।

অস্ট্রিয়ার নিকট ইটালীয় দেশপ্রেমিকগণের পরাজয়ের সংবাদ যেমন তাঁহার পক্ষে বেদনাদায়ক হইয়াছিল, তেমনি স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সংবাদ তাঁহাকে আনন্দে উৎফুল্ল করিয়াছিল। তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী ডিগবী সাহেবের সাক্ষ্য এই যে, রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের সংবাদ জানিবার জন্য অধীর আগ্রহে বিলাতী ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন এবং স্বাধীনতা-পক্ষের পরাজয়-সংবাদ পাইলে কাঁদিয়া ভাসাইতেন। উত্তমাশা অন্তরীপে জাহাজে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পা ভাঙিয়াছিল; কিন্তু একখানা ফরাসী জাহাজে জনগণের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন দেখিয়া তিনি সকলের নিষেধসত্ত্বেও ভাঙা পা লইয়াই সেই পতাকা অভিবাদন করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

রামমোহন যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন পার্লামেণ্টে জনগণের অধিকার বৃদ্ধির প্রস্তাব-সংবলিত 'রিফর্ম বিলের' আলোচনা চলিতেছিল। তিনি এমন আন্তরিকতার সহিত এই বিলের সমর্থন করিয়াছিলেন যে, ইহা পাস না হইলে বৃটিশ অধিকার ছাড়িয়া স্বাধীন আমেরিকায় বসবাসের সংকল্প পর্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এমন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান সত্যই দুর্লভ।

এই মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞানই রামমোহনের চরিত্রে আত্মমর্যাদাবোধ আনিয়া দিয়াছিল। একটি ঘটনায় ইহা অত্যন্ত পরিস্ফুট। জ্যৈষ্ঠমাসের এক অপরাহ্লে রামমোহন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাঁহার বন্ধু এডামের বাড়িতে গিয়া জল চাহিলেন। জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইবার পর তিনি যাহা বলিলেন তাঁহার মর্ম এই যে, বিশপ মিড্‌লটন পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং এইভাবে তাঁহার অন্তরে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানিয়াছেন, কারণ এই প্রলোভনে ভুলিবার মতো হীনচিত্ত তিনি নন। এই ঘটনার পর আর রামমোহন বিশপের মুখদর্শন করেন নাই। বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টাকে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার অসীম আত্মনির্ভরশক্তির উৎসও ছিল এই মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান। আত্মশক্তিতে গভীর বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি বীরের ন্যায় সকল বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিতেন। বুলডগের কামড়ের মতো যে কাজ তিনি একবার আরম্ভ করিতেন, কিছুতেই তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে বিচলিত না করিয়া বরং আনন্দই দান করিত।

বস্তুতঃ বিপদ্, মৃত্যুভয় বা মানুষের বিরোধিতায় আরব্ধ কার্য ত্যাগ করাকে তিনি কাপুরুষতা ও আত্মশক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস তাঁহার Third Appeal to the Christian Public ছাপিয়া দিতে অসম্মত হইলে তিনি নিজব্যয়ে ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া তাহাতে বইখানি ছাপিয়াছিলেন। ডফ্ সাহেব কলিকাতায় প্রথম মিশনারী স্কুল স্থাপন করিতে গিয়া শহরবাসীর প্রবল বিরোধিতা ও অসহযোগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। রামমোহনের সাহায্য চাহিবামাত্র তিনি স্বয়ং ডফের স্কুল বসাইবার ভার লইলেন এবং বাড়ি ভাড়া করিয়া দিয়া, ছাত্র সংগ্রহ করিয়া, খুলিবার দিনে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এবং আরও নানাভাবে ডফ্‌কে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে তাঁহার বিরোধীরা নানাপ্রকারে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সংকল্পচ্যুত হন নাই। যে-যুগে সমুদ্রযাত্রা করিলেই হিন্দুকে জাতিচ্যুত হইতে হইত, সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগেই তিনি বিলাত যাইবার জন্য একজন পাচক ও একজন হিন্দু-ভৃত্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ষোলো বৎসর বয়সে পিতার দ্বারা গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াও তিনি যে সংকল্পে অটল ছিলেন, তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আত্মনির্ভরশক্তি আসিতে পারে না। জগতে মানুষ নিজেই নিজের উত্থান-পতনের জন্য দায়ী। বাধাবিঘ্ন ও সংকট সকলের জীবনেই আসে। যাহারা সেগুলিকে দলিত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে তাহারা বড় হয়, যাহারা পারে না তাহারা ক্ষুদ্র। রামমোহন সকল প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহান্; সাধারণ লোকে সেরূপ পারে না, নীচে পড়িয়া যায়, তাই তাহারা ছোট। রামমোহন যে উপরে উঠিতে পারিয়াছিলেন তাহারও মূলকথা আত্মশক্তি ও মানবাত্মার মহত্ত্বে দুর্জয় বিশ্বাস।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। মানবের আত্মাকে—মানুষের দেহমধ্যে অবস্থিত চৈতন্যময় সত্তাকে। **পবিত্র চক্ষে দেখিতেন**—শ্রদ্ধা করিতেন; পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন **এই মানবাত্মা……অঙ্গীভূত**—ঈশ্বর বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা। মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার প্রভেদ এই যে মানবাত্মা দেহের পঞ্জরে বদ্ধ, কিন্তু পরমাত্মা

আকাশস্থ চৈতন্য, সর্বঘটে বিরাজিত থাকিয়াও মুক্ত। মানবাত্মায় পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া মানবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যেই চৈতন্যময় পরমাত্মাকে দেখিতে পান। রামমোহনের এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি মানবাত্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। **সামাজিক দাসত্ব**—সমাজে একশ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীর কতকগুলি অধিকার-হরণ। সামাজিক বিধানে কোনো শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর সেবা করিতে বাধ্য হইলে তাহাও সামাজিক দাসত্ব। ইহার উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই পাওয়া যাইবে। **রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্ব**—বিজিত পরাধীন জাতি তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলে বিদেশী শাসকবর্গ তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকে। কখনও কখনও স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিলে প্রজাদিগকেও এইরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। ইহাই রাজনৈতিক অত্যাচার, এবং শাসকবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্বদা বশংবদ হইয়া থাকা বা জাতিগতভাবে বিদেশীর পদানত হইয়া থাকা রাজনৈতিক দাসত্ব। **এইজন্য**—এই কারণে ইহার দ্বারা পবিত্র মানবাত্মাকে অপমান করা হয় বলিয়া। **পৃথিবীর যে কোন বিভাগে**—জগতের যে কোনো দেশে। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত বিদেশীর অধীনতাপাশ অথবা স্বৈরাচারী নরপতির উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিত। তাহারই সহিত—সেই চেষ্টার সহিত। **তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত**—তাঁহার আন্তরিক সমর্থন থাকিত। স্বাধীনতা লাভ-প্রয়াসে—স্বাধীনতা অর্জন করিবার চেষ্টায়। অকৃতকার্য—বিফল; ব্যর্থ। মর্মাহত হইতেন—মনে আঘাত পাইতেন। **ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর ইত্যাদি**—এখানে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে (Naples) বিদ্রোহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইটালীর নেপল্‌স্ রাজ্য ছিল তখন বুরবঁ (Bourbon)-বংশীয় স্বেচ্ছাচারী রাজা প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের শাসনাধীন। তাঁহার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুবক এবং ছাত্রগণ একটি গুপ্তদল গঠন করে। এইদল ইতিহাসে Charcoal Burners বা Carbonari বলিয়া খ্যাত। ইহার প্রচেষ্টায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং বিদ্রোহীগণ রাজার কাছে দাবি করেন যে স্পেনে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন নেপ্‌লসেও চালু করিতে হইবে। ফার্ডিনাণ্ড তৎক্ষণাৎ এই দাবি মানিয়া লইলেন কিন্তু পরে Metternich-এর

হস্তক্ষেপাধিকার নীতি (Doctrine of Right of Intervention) অনুসারে অস্ট্রিয়া সৈন্যদল পাঠাইয়া এই নিয়মতন্ত্র বাতিল ও স্বৈরতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। নেপ্‌ল্‌স্‌বাসিগণের, বিশেষ করিয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে ইহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। শয্যাস্থ হইলেন—মনের দুঃখে ভাঙিয়া পড়িলেন ; গভীর মর্মবেদনায় অবসন্ন হইলেন। **নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না**—Silk Buckingham নামে ইংরেজের সহিত রামমোহনের সেদিন সাক্ষাতের কথা ছিল, নেপ্‌ল্‌সের দুর্দশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হওয়ায় তিনি বাকিংহামকে লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি সেদিন দেখা করিতে অক্ষম। এই ঘটনা ঘটে ১৮২১ খৃস্টাব্দের ১১ই আগস্ট। **স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল** —১৮০৮ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ন স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজা সপ্তম ফার্ডিনাণ্ডকে ফ্রান্সে নজরবন্দী করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা Joseph-কে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্পেনীয়দের বিরোধিতায় Joseph পলায়ন করিতে বাধ্য হন ; তখন ফার্ডিনাণ্ডের অনুপস্থিতিতে ১৮১২ খৃস্টাব্দে জনগণ তাঁহারই নামে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিয়া সেই অনুসারে শাসনকার্য চালাইতে থাকে। কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর (১৮১৫ খৃঃ) ফার্ডিনাণ্ড স্বরাজ্যে ফিরিয়াই এই শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইহাতে এবং আরও কয়েকটি কারণে প্রজাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১৮২০ খৃস্টাব্দের একটি সামরিক বিদ্রোহের ফলে রাজা পুরাতন-ব্যবস্থা চালু করিতে বাধ্য হন। এই বিদ্রোহের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই নেপ্‌ল্‌স্‌বাসিগণ (Neapolitans) বিদ্রোহ করিয়াছিল। টাউনহল—(ইংরেজী Town Hall) নগরবাসীদিগের মিলনগৃহ—যেখানে সভা, নাগরিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি হইয়া থাকে। এখানে কলিকাতার পরিষদ্‌-ভবনের সন্নিকটে অবস্থিত বিরাট্‌ গৃহের কথা বলা হইয়াছে। **তখন তিনি ····ভোজ দিলেন**—এ-সম্বন্ধে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন : "১৮২১ খৃস্টাব্দে স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তজ্জন্য কলিকাতার টাউন হলে নিজব্যয়ে একটি প্রকাশ্য ভোজ (public dinner) দিয়াছিলেন।" **ডিগবী সাহেব**—John Digby নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান। রামমোহন কিঞ্চিদধিক একবৎসর সরকারী অর্থাৎ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরি করিবার পর ইহার খাস মুন্‌শী বা

দেওয়ান হন। ডিগ্‌বী রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর, এবং রংপুরে বিভিন্ন সময়ে কাজ করিয়াছেন এবং রামমোহনও এই স্থানগুলিতে গিয়া ডিগবীর অধীনে চাকুরী করিয়াছেন। মনিব হইলেও ডিগবী রামমোহনের গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই বন্ধুত্ব রামমোহনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। **তাঁহার নিকট কর্ম করিবার সময়**—১৮০৫ হইতে ১৮১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নয় বৎসর কাল রামমোহন ডিগবীর অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। **ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য** ইত্যাদি—রামমোহন কেবল স্বদেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক অগ্রগতির ব্যাপারে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। বিলাত হইতে চিঠিপত্রের সঙ্গে অনেক ইউরোপীয় সংবাদপত্রও ভারতবর্ষে আসিত। সেগুলি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা জানিয়া লইতেন। এইসব সংবাদপত্রের অপেক্ষায় তিনি অধীর আগ্রহে কাল কাটাইতেন। **কিন্তু এখানে ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ বলিবার তাৎপর্য কি?** ডিগবী যে সময়ের কথা বলিয়াছেন তখন (১৮০৫-২৮১৪) নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট। প্রকৃত ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ১৮০৫-১৪—এই সময়ে বিপ্লব কোথায়? মনে হয় শিবনাথ শাস্ত্রী 'ফরাসী বিপ্লব' কথাটি একটু শিথিলভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। নেপোলিয়নের অপরিমিত জিগীষা দমন করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার প্রতিই হয়তো তিনি ইঙ্গিত করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে রামমোহন প্রথমে নেপোলিয়নের প্রশংসকই ছিলেন, কারণ নেপোলিয়ন বিপ্লবকেই আগাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় নেপোলিয়ন জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার পদদলিত করিয়া বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন তখন তাঁহার সহানুভূতি নেপোলিয়ন হইতে সরিয়া তাঁহার বিরোধী পক্ষের প্রতি গেল। এই পক্ষকেই লেখক পরে **'স্বাধীনতা-পক্ষ'** বলিয়াছেন। **দরদর ধারে**—অজস্রধারায়। **কপোল**—গাল; গণ্ড। **কুমারী কলেট**—(S. D. Collet) ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী জনৈক ইংরেজ মহিলা। ইনি Life and Letters of Raja Rammohan Roy নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ইহা ১৯০০ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়। কলেট নিজে গ্রন্থখানি

সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বনে তাঁহার কোনো বন্ধু ইহা সমাপ্ত করেন। **ইংলণ্ড-গমনকালে**—রামমোহন রায় ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ-ব্যাপারে ভারতবর্ষের ভাবী শাসনব্যবস্থার আলোচনা হইবে এবং সতীদাহ-নিবারণ সম্পর্কে বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনোভাব কি তাহাও জানা যাইবে—এই ভাবিয়াই রামমোহনের বিলাত যাইবার আগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার বিলাতে যাওয়ার সুবিধা করিয়া দিলেন দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ। কোম্পানী কয়েকটি বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ করিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট বৃত্তি কম করিয়া দেয়। বৃত্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিলাতে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলে আবেদন করিবার জন্য তিনি রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া দূতরূপে প্রেরণ করেন। বাঙালীদের মধ্যে রামমোহনই প্রথম বিলাত যান। **গুড্ হোপ অন্তরীপ**—(Cape of Good Hope) বা উত্তমাশা অন্তরীপ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমতম প্রান্ত। তখনও সুয়েজ খাল কাটা হয় নাই, তাই ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইতে হইলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত। কেহ কেহ বলেন, লেখকের বর্ণিত পরবর্তী ঘটনাটি উত্তমাশা অন্তরীপে ঘটে নাই, ঘটিয়াছিল তাহারই অদূরে কেপটাউন শহরের পোতাশ্রয়ে। **জাহাজে পড়িয়া গিয়া ইত্যাদি**—রামমোহন যে জাহাজের যাত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম Albian। উত্তমাশা অন্তরীপে রামমোহন ঘণ্টা দুইয়ের জন্য একবার তীরে নামিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় জাহাজের সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত পান। আঠারো মাস তাঁহাকে খোঁড়া অবস্থায় চলিতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। **ফরাসী জাহাজে .....উড্ডীন করিয়াছে**—ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লসের শাসনকালে, ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ২৮শে জুলাই, প্যারিসে গণ-অভ্যুত্থান হয়। ইতিহাসে ইহার নাম 'জুলাই বিপ্লব'। এই বিপ্লবের ফলে চার্লস ইংলণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং জনগণ তাহাদের পূর্ব স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। তাহারা বুরবঁ রাজবংশীয় শ্বেত পতাকা বর্জন করিয়া বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা গ্রহণ করে এবং অর্লেয়াঁ রাজবংশের লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসায়। রামমোহনের জাহাজ যখন উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে, তখন দুইখানি ফরাসী জাহাজ ফরাসী জনগণের স্বাধীনতার প্রতীক এই ত্রিবর্ণ পতাকা উড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। **অভিবাদন**—

নমস্কার। **কাপ্তেন**—(Captain) জাহাজের ভারপ্রাপ্ত উচ্চতম কর্মচারী। **আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি** ইত্যাদি—ফরাসীরা অত্যাচারী রাজাকে সরাইয়া তাহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, এই আনন্দে রামমোহন তাহাদের গৌরব ঘোষণা করিলেন—ফরাসী জাহাজ হইতে ফিরিবার সময় বার বার বলিতে লাগিলেন, "Glory, glory, glory to France!"

অ. ২। **তাঁহার ইংলণ্ড-বাসকালে**—১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল হইতে মৃত্যুপর্যন্ত (২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) রামমোহনের ইংলণ্ডে বাস। **পার্লেমেণ্ট মহাসভা** ইংলণ্ডের আইন-সভা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বপর্যন্ত ইহাতে একটিমাত্র পরিষদ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে House of Commons ও House of Lords নামে দুইটি পরিষদে বিভক্ত হয়। বহুকাল ধরিয়া এই দুই পরিষদের মধ্যে House of Lords এর ক্ষমতাই ছিল বেশী। ১৯১১ খৃস্টাব্দের সংস্কারের পর House of Commons-ই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে এই সভা আহ্বান করেন এবং ভাঙিয়া দেন। **রিফর্ম বিল**—পার্লামেণ্টের সংস্কারমূলক আইনের খসড়া। ইহাতে জনসাধারণের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করিবার প্রস্তাব ছিল। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ১লা মার্চ Lord Russel এই বিল House of Commons-এ উপস্থাপিত করেন। বহুকাল ধরিয়া তুমুল তর্কবিতর্কের পর ১৯শে এপ্রিল একটি সংশোধন প্রস্তাবে সরকারপক্ষের পরাজয় ঘটে এবং পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া হয়। নূতন নির্বাচনে জয়ী হইয়া Lord Russel আবার ২৪শে জুন দ্বিতীয় রিফর্ম বিল উপস্থাপিত করেন। House of Commons-এ পাস হওয়ার পর ইহা House of Lords-এ নাকচ হইয়া যায়। ইহাতে জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ডিসেম্বর মাসে পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিলে ১১ই ডিসেম্বর তৃতীয়বার বিলটি উত্থাপিত হয় এবং যথারীতি House of Commons-এ পাস হয়। ১৮৩২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুন House of Lords-ও গৃহবিবাদের শঙ্কায় বিলটি পাস করেন। পার্লামেণ্টের ইতিহাসে এমন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার খুব কমই হইয়াছে এবং এই বিল লইয়া জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল তেমন খুব কমই দেখা গিয়াছে। **আপনাকে এতদূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন**—বিলটি যাহাতে পাস হয় তাহার জন্য এমনভাবে উঠিয়া

পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন—অর্থাৎ মনের সংকল্প মনেই না রাখিয়া বাহিরেও স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলিযাছিলেন। বিধিবদ্ধ—আইনরূপে গৃহীত। ইংলণ্ডের অধিকারে—বৃটিশ অধিকারভুক্ত কোনো দেশে। **ঐ আইন …থাকিবেন না**—রিফর্ম বিল পাস না হইলে তিনি বুঝিতেন যে ইংলণ্ডের জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারবৃদ্ধির সদিচ্ছাই যখন ব্রিটিশ সরকারের নাই তখন ভারতীয় প্রজা হইয়া তিনি ইহার চেয়ে খারাপ ছাড়া ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। তাই এমন স্বাধীনতা বিরোধী সরকারের অধিকার ছাড়িয়া তাঁহার অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা। পৈতৃক—পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। স্বোপার্জিত—নিজের চেষ্টায় যাহা উপার্জন করিয়াছেন। **স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে**—আমেরিকার উপনিবেশগুলি তৃতীয় জর্জের আমলে বৃটিশ শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল। রামমোহন মনে করিয়াছিলেন আমেরিকায় গেলে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবেন। **কী মানবাত্মার মহত্বজ্ঞান**—মানুষের আত্মা যে পবিত্র ও মহান্, তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করা বা তাহার স্বাধীনতা খর্ব করা যে পাপ, এই জ্ঞান কত গভীর হইলে রামমোহনের মতো উক্তি করিতে পারা যায়।

অ. ৩। আত্মমর্যাদাজ্ঞানের—আত্মসম্মানবোধের। **উইলিয়াম এডাম** (William Adam) জনৈক ইংরেজ পাদ্রী। ইহার এবং আর একজন পাদ্রীর সহযোগিতায় রামমোহন বাইবেলের কিছু অংশ বাঙলায় অনুবাদ করেন। এই সূত্রে এডামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এডাম রামমোহনের প্রভাবে খৃস্টিয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হইয়াছিল। এজন্য খৃস্টানগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া 'Second fallen Adam' বলিতেন। ইহার তাৎপর্য এই যে শয়তানের হাতে পড়িয়া আদিমানব আদমের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ রামমোহনের হাতে পড়িয়া এডাম সাহেবের পতন হইয়াছে। মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন—মুখ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাঁহার ভয় হইল—তাঁহার আশঙ্কা হইল রামমোহন হয়তো কোনো গুরুতর বিপদে পড়িয়াছেন। **তুমি যদি কিছু মনে না কর ইত্যাদি**—কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে আসিয়া তাঁহার নগ্নগাত্র হওয়া সামাজিক শিষ্টাচারবিরোধী। অথচ রামমোহন গ্রীষ্ম ও ততোধিক উত্তেজনার বশে পরিচ্ছদ না খুলিয়া অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। তাই তাঁহার এই

অনুমতি-গ্রহণ। ত্বরায়—তাড়াতাড়ি। **বিশপ মিড্‌লটন**—কলিকাতার প্রথম বিশপ। খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইনি ১৮১৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। শিবপুরে বিশপ্‌স্‌ কলেজের প্রতিষ্ঠা ইঁহারই উৎসাহে সম্ভব হইয়াছিল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়। আমার পদ আরো বড়ো হইবে—রাজদরবারে আমার প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং আমি উচ্চ সরকারী চাকুরি লাভ করিতে পারিব। ছোটলোক—হীনমনা; আধ্যাত্মিক কারণ ব্যতিরেকে সামান্য বৈষয়িক উন্নতির লোভে ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার মতো নীচপ্রকৃতি।

অ. ৪। মুখ দর্শন করেন নাই—মুখ দেখেন নাই; দেখাসাক্ষাৎ করেন নাই। **বৈষয়িক সুখের প্রলোভন**—চাকুরি বা টাকাপয়সার লোভ। ধর্মে প্রবৃত্ত করা—ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করা। অমার্জনীয়—যাহা মার্জনা বা ক্ষমা করা যায় না।

অ. ৫। মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান—মানবাত্মা যে মহান্‌ ও পবিত্র এই বোধ। হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া—মানসিক গুণাবলীর ভিত্তিস্বরূপ ছিল বলিয়া। **স্বাবলম্বন-শক্তি**—সকল বিষয়ে নিজের উপর নির্ভর করিবার ক্ষমতা। গূঢ়—গোপন; অন্তর্নিহিত। বিমুখ—বিরত। নিরুদ্যম—নিশ্চেষ্ট; উৎসাহহীন। করণীয়—করা উচিত। বজ্রমুষ্টিতে—দৃঢ়ভাবে। পূর্ণমাত্রায় না করিয়া—সমাপ্ত না করিয়া; অসমাপ্ত রাখিয়া। নিরস্ত—বিরত। **বুলডগ-নামক কুকুর**—Bulldog একজাতীয় খর্বাকৃতি কিন্তু বিশালদেহ কুকুর। ইহার মুখখানা দেখিতে কদর্য ও ভীতিপ্রদ। ইহার প্রকৃতিও হিংস্র। লেখক ইহার যে বৈশিষ্ট্যের কথা পরে বলিয়াছেন, তাহাকে ইংরাজীতে 'bulldog tenacity' বলা হয়। অভীষ্ট—ঈপ্সিত; সংকল্পিত।

অ. ৬। হঠিয়া যাওয়া—পিছাইয়া যাওয়া বা পলায়ন করা। প্রাণভয়ে—প্রাণ যাইতে পারে এই আশঙ্কায়। **প্রতিকূলতা**—বিরোধিতা; বিরুদ্ধাচারণ। সংকল্পিত অনুষ্ঠান—যে কাজ করা হইবে বলিয়া মনে মনে স্থির করা হইয়াছে। কাপুরুষতা—ভীরুতা। **ব্যাপটিস্ট মিশন**—প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানদের একটি বিশিষ্ট মতাবলম্বী শাখাকে 'ব্যাপটিস্ট' (Baptist) বলা হয়। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ইঁহাদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির নাম Baptist Mission। এই মিশন ভারতবর্ষেও আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। মিশনারি—ধর্মপ্রচারের

কার্যকেই যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। **Third Appeal to the Christian Public**—রামমোহনের প্রচারিত এই পুস্তকখানির পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৮২০ খৃস্টাব্দে রামমোহন Precepts of Jesus, Guide to Peace and Happiness নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। Friend of India পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেব এই গ্রন্থের নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন, কারণ ইহাতে যীশুখ্রীস্টের ঈশ্বরতত্ত্ব, তাঁহার অলৌকিক কার্যকলাপ ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি বাইবেলের বাক্য স্থান পায় নাই। রামমোহন A Friend of Truth নামে লিখিয়া ইহার উত্তরে An Appeal to the Christian Public নামে পুস্তক প্রকাশ করিলেন; মার্শম্যান আবার আক্রমণ করিলে তিনি স্বনামে প্রকাশ করিলেন Second Appeal to the Christian Public। মার্শম্যান আবার উত্তর করিলেন। ইহার উত্তরে রামমোহন প্রকাশ করিলেন Third (Final?) Appeal to the Christian Public. এবারে মার্শম্যান নিরুত্তর হইলেন। **তাঁহাদের ছাপাখানায়**—Baptist Mission Press-এ। দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ছাপিয়া প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এই ছাপাখানাটি প্রথম স্থাপিত হয়। পরে ইহা অন্যান্য ছাপার কাজও করিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে এই ছাপাখানাটি কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। ৪০টি ভাষায় ছাপার কার্য এখানে করা হয়। রামমোহন শেষোক্ত পুস্তকখানি বাদে সবগুলিই এখান হইতে ছাপাইয়া লইয়াছিলেন। মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন—ছাপিয়া দিতে রাজি হইলেন না, কারণ মিশনারিগণ মনে করিলেন যে এই পুস্তকখানি খৃস্টধর্মবিরোধী। **নিজে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া**—ছাপিবার সকল যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিজের টাকায় কিনিয়া। রামমোহন এইরূপে প্রথম দেশীয় ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত তাঁহার ছাপাখানার নাম ছিল ইউনিটেরিয়ান প্রেস (Unitarian Press)। কম্পোজিটারের কাজ—ছাপাখানার অক্ষরগুলিকে পর পর সাজাইবার কাজ। নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া—'Third Appeal' সেই ছাপাখানার ছাপাইয়া। **ছাড়িলেন**—নিরস্ত হইলেন। **স্কচ**—স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। আলেকজাণ্ডার ডফ্—'সাক্ষী' গল্পের শব্দার্থ ও টীকা দ্রষ্টব্য। **তাহার আহ্বানে কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন**—ডফ সাহেব ১৮২৯ খৃস্টাব্দে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ইংরেজীশিক্ষার ভিতর দিয়া ভারতবাসীকে

খৃস্টানধর্মে দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। বৃটিশ যেখানে যায় বাইবেল ঢাকা দিয়া বুলেট লইয়া যায়। এ-কথা বার্নার্ড শও বলিয়াছেন। এই সনাতন নীতি-অনুসারেই ডফ্ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রামমোহনের 'আহ্বান' কথাটি বুঝলাম না। রামমোহন এই স্কচমিশনারি-পুঙ্গবটিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতে আনাইয়াছিলেন, এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। ডফ্‌কে স্কুল-স্থাপনায় সাহায্য করিয়া রামমোহন কিঞ্চিৎ পাপই করিয়াছিলেন, যাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে। 'India and India's Mission'-নামক পুস্তিকায় আমাদের অন্নপুষ্ট ডফ্ "হিন্দুধর্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদে 'Vedantic Doctrines Vindicated' এবং 'Rational Analysis of the Gospel' নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। ডফ্ সাহেব ইহাতে চটিয়া আগুন হইয়া উঠেন। এসব কথা বলিয়াছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

প্রথম মিশনারি স্কুল—খৃস্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্কুল। ডফের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নাম Free Church Institution। তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন—একমাত্র তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিলেন। **শহরের ভদ্রলোকেরা** ইত্যাদি—কলিকাতাবাসীদের মনে আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে এদেশে পাদ্রী সাহেবদিগকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে দিলে তাহারা ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত করিবে। এই কারণে **"মিশনারি** স্কুল স্থাপনে" তাঁহারা প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। ইহাই ছিল বাধা দেওয়ার প্রধান কারণ; তা ছাড়া, ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্তন হইলে তাঁহাদের ধর্ম, রীতিনীতি সব যে লোপ পাইবে, এ শঙ্কাও তাঁহাদের মনে ছিল। তাই তাঁহারা যত প্রকারে সম্ভব ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে। তাই তিনি ডফ্‌কে সানন্দে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। **দেশীয় বিভাগে**—কলিকাতার যে-সকল পল্লীতে দেশীয় লোক অর্থাৎ বাঙালীরা বাস করিতেন সেই অঞ্চলে; বাঙালীপ্রধান অঞ্চলে। পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ইত্যাদি—ধর্মনাশের ভয়ে কোন অভিভাবকই খৃস্টান ডফের স্কুলে ছেলে পাঠাইতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পিছ-পা হইবার—পিছাইয়া পড়িবার; দমিবার। **ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাশ্রিত ফিরিঙ্গী**

কমল বসু—কমল বসুর বাড়ীতে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি উপাসনা-সভা স্থাপিত হইয়াছিল (১৮২৭)। তখন **ব্রাহ্মসমাজ** বলিয়া কোন সমাজ তো দূরের কথা, ব্রাহ্মধর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহাও ঠিক গড়িয়া উঠে নাই। লেখক এই উপাসনা-সভাকেই শিথিলভাবে 'ব্রাহ্মসমাজ' বলিয়াছেন। পরে অবশ্য কমল বসুর বাড়ির পাশেই একটি গৃহ ১৮২৯ খৃস্টাব্দের নির্মাণ করা হইয়াছিল, রামমোহন যাহার নাম দিয়াছিলেন ব্রহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা। কমল বসু খৃস্টান ছিলেন না, পর্তুগীজ বণিক্‌দের কাজ করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ফিরিঙ্গি বলিত। **কমল বসুর ··· স্থির করিয়া দিলেন**—আপার চিৎপুর রোডে কমল বসুর বাড়ি মাসিক ৪০৲ টাকায় ভাড়া করিয়া দিয়া ডফ্‌কে স্কুল-স্থাপনে সহায়তা করিলেন। নিরস্ত হইলেন না—থামিলেন না। পরামর্শদানাদি দ্বারা—উপদেশ প্রভৃতি দিয়া। বিলাত গমনার্থ—বিলাতে যাইবার জন্য। প্রতিপক্ষগণ—বিরোধিগণ। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার নিন্দা করার জন্য এবং প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, রামমোহনের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠেন। এমন কি এক সময় তাঁহার প্রাণনাশের শঙ্কাও দেখা গিয়াছিল। জাতিচ্যুত—(হিন্দু-সমাজ) হইতে বহিষ্কৃত ; একঘরে। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে ইত্যাদি—এখানে মনে রাখিতে হইবে যে পৈতৃক সম্পত্তি রামমোহন পূর্বেই পাইয়াছিলেন। এই সম্পত্তি হারাইতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখানো হইয়াছিল। সমুদ্রে পা বাড়াইলেই ইত্যাদি—রামমোহন যে সময়ে বিলাত যাত্রা করেন (১৮৩০) তখন দেশবাসীর মনে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার ছিল যে 'কালাপানি' পার হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গেলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয়। সুতরাং তেমন লোককে হিন্দুসমাজ ঠাঁই দিত না। অভীষ্টসাধনে—সংকল্প সিদ্ধ করিবার জন্য। প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া। পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি—জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কেহই তখন সমুদ্রযাত্রার নাম পর্যন্ত করিতে পারিত না। তাই বিলাতে যাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কতদূর কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কঠিন হইলেও রামমোহন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাচকের নাম ছিল রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এবং ভৃত্যের নাম ছিল রামহরি দাস। সঙ্গে তাঁহার বারো বৎসরের পালিতপুত্র রাজারামও ছিল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও জানাইয়া রাখি যে, রামমোহন দুধ খাইবার সুবিধার জন্য দুইটি দুগ্ধবতী গাভীও জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে···

হইয়াও—ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট-আত্মীয়স্বজন তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। ফলে রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হন। তিনি যে পিতা-কর্তৃক গৃহতাড়িতই হইয়াছিলেন এমন কোন সঠিক প্রমাণ নাই।

অ. ৭। **আপনার ঘর আপনি রচনা করে**—নিজের ভাগ্য বা প্রতিষ্ঠা নিজেই সৃষ্টি করে। বড় হইয়া দাঁড়াইবে—মহত্ত্ব লাভ করিয়া উন্নত হইবে। **তাহার উপরে উঠা**—বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া স্বীয় সংকল্পে অটুট থাকা। **নীচে পড়িয়া যাই**—ঘাতপ্রতিঘাত ও সংকটে ভীত হইয়া পিছাইয়া পড়ি। ভিতরকার কথা—নিগূঢ় সত্য। অপরাজিত—যাহা কখনও পরাজয় স্বীকার করে নাই।

ব্যাখ্যা

(১) অপর দিকে স্পেনে যখন……ভোজ দিলেন। (অ. ১)

এই অংশটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মহাত্মা রামমোহন'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। রাজা রামমোহন দুনিয়ার সকল দেশের সকল পরাধীন জাতির যে কিরূপ পরম বন্ধু ছিলেন, তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক এই অংশটি বিবৃত করিয়াছেন।

রামমোহন ছিলেন সকলপ্রকার দাসত্বের বিরোধী। তাই সমাজ বা রাজ-শক্তি যেখানেই মানুষকে পরাধীনতার নাগপাশে জড়াইয়া রাখিয়াছে সেইখানেই নিপীড়িতের প্রতি সমবেদনা তাঁহার বহিয়া গিয়াছে। আর পরাধীন মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইত, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তাহাদের শুভ সংবাদের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেন। তাহাদের জয়ে তিনি উৎফুল্ল হইতেন, তাহাদের পরাজয়ে ভাঙিয়া পড়িতেন। ইটালীর নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীরা যেদিন দীর্ঘ সংগ্রামের পর অস্ট্রিয়ার নিকট পরাজিত হয়, সেদিন দুঃখে ও হতাশায় তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। সিল্ক বাকিংহাম-নামক সাহেবের সহিত সেদিন তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা। সেই সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। একটি পত্র লিখিয়া তিনি এই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন এবং কারণ হিসাবে নেপল্‌সের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিলেন। আবার আর একদিন, স্পেনদেশে যেদিন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাঁহার আহ্লাদের উচ্ছ্বাস দেখে কে! ১৮২০ খৃস্টাব্দে সংবাদ পৌঁছিল যে স্পেনের সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিয়াছে এবং ১৮১২ খৃস্টাব্দের সনদের ভিত্তিতে রাজশক্তিকে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য করিয়াছে। রামমোহন এই সংবাদে এত উৎফুল্ল হইলেন যে বেশ ঘটা করিয়া সেদিন তিনি কলিকাতার পৌরমন্দিরে ভোজ দিলেন।

রামমোহন যে স্বাধীনতার কত বড পূজারী ছিলেন এইখানেই তাহার প্রমাণ মিলে। সংকীর্ণ দেশাত্মবোধে তাঁহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে নাই। বিশ্বমানবের স্বাধীনতা তথা মঙ্গলের জন্যই ছিল তাঁহার সুতীব্র উৎকণ্ঠা। আত্মার এই প্রসারই তাঁহাকে মহাত্মা অভিধার যোগ্য করিয়াছে।

[ইটালীয়ানগণের পরাজয়, রামমোহনের নিমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতা, স্পেনে নিয়মতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা ও টাউন-হলে ভোজ—এইগুলির সঠিক বিবরণ **শব্দার্থ ও টীকা** দেখিয়া যোগ কর]।

(২) তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন…অভিবাদন করিলেন। (অ. ১)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মহাত্মা রামমোহন'-শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ। মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতাপ্রিয়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এই অংশটি যোজনা করিয়াছেন। অংশটি কুমারী কলেটের একটি বিবরণ হইতে গৃহীত।

রামমোহন যখন বিলাত যাত্রা করেন, সেই সময়ে ফরাসী দেশে বিখ্যাত 'জুলাই বিপ্লবের' (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে) জয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। রামমোহন পরম আগ্রহে সেই সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের পথে তাহাদের জাহাজখানি যখন উত্তমাশা অন্তরীপে কেপটাউনে উপস্থিত হয় তখন ফরাসী বিপ্লবের জয়জয়কার। সেই বন্দরেই তখন দুইটি ফরাসী জাহাজ স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা উডাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে রামমোহন জাহাজে পডিয়া গিয়া পা ভাঙিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতার পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। ভাঙা পা লইয়া তিনি অতিকষ্টে ফরাসী জাহাজে গেলেন। গিয়া পতাকাটিকে অভিবাদন করিয়া ফরাসী দেশের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজের জাহাজে ফিরিলেন। এই

বিবরণ কুমারী কলেটের বর্ণনা হইতে গৃহীত। ইহা হইতে রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রিয়তার স্বরূপ ও গভীরতা বুঝা যায়। তিনি কেবল সংকীর্ণ স্বদেশ-প্রেমে অন্ধ ছিলেন না। তাই শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্যই নহে, পরন্তু সকল দেশের সকল জাতির মুক্তিতেই তাঁহার সমান আগ্রহ ছিল। ফরাসী জাতির মুক্তিতে তাই রামমোহন এত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রামমোহনের মহান আত্মা ছিল দুর্নিবার, দৈহিক বাধা তাহাকে কোথাও মুহূর্তের জন্য প্রতিহত করিতে পারে নাই। উল্লিখিত ঘটনাটি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

(৩) এডাম বলিয়াছেন,……মুখদর্শন করেন নাই। (অ. ৪)

আলোচ্য পঙ্‌ক্তি কয়টি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাত্মা রামমোহন'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্বন্ধে একটি ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে লেখক এই অংশটিতে উপনীত হইয়াছেন।

ঘটনাটি তৎকালের খৃস্টান ধর্মযাজক উইলিয়াম এডামের বিবরণ হইতে গৃহীত। এডাম ছিলেন রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু। একদিন বিশপ মিড্‌লটন রামমোহনকে ডাকাইয়া এই প্রলোভন দেখান যে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি ঘটিবে। ইহাতে রামমোহন ঘৃণায় ও উত্তেজনায় একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন। অধৈর্য হইয়া তিনি জৈষ্ঠের দিনের প্রখর তাপে শ্রান্ত অবস্থায় সরাসরি এডামের গৃহে আসেন এবং জামাকাপড খুলিয়া একটু জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হন। বিশপ বৈষয়িক উন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রচুর অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামমোহন যেন এতই হীন যে টাকার লোভেই ধর্মও জলাঞ্জলি দিতে পারেন। বিপশের প্রস্তাবে অবজ্ঞা বুঝিতে পারিয়া রামমোহনের সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় জলিয়া যায়। তিনি বিশপের প্রতি তীব্র ধিক্কার জ্ঞাপন করেন। এই ঘটনার পর আর কখনও তিনি বিশপের মুখদর্শন করেন নাই। রামমোহনের প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাজ্ঞানের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চরিতকার শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মানবাত্মার মহত্ত্ব-সম্বন্ধে রামমোহনের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সেই শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূত এই আত্মমর্যাদা।

(৪) রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি…আনন্দিত হইত। (অ. ৫)

এই অংশটি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাত্মা রামমোহন'-শীর্ষক প্রবন্ধের

অন্তর্গত। মহাত্মা রামমোহনের অতুলনীয় স্বাবলম্বন ও অপরাজেয় সংকল্প বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রামমোহনের সকল শক্তির উৎস ছিল মানবাত্মার মহত্ত্ব-সম্বন্ধে একটা দৃঢ় উপলব্ধি। মানুষের আত্মা পরমাত্মার অংশ, সুতরাং তাহা অমোঘ—এইরূপ যাঁহার প্রত্যয় তাঁহার পক্ষে আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি বলিষ্ঠ স্বাবলম্বন অভ্যাস করিয়াছিলেন, এই স্বাবলম্বনের মূলে ছিল তাঁহার অটুট সংকল্পের শক্তি। শত বাধা, শত বিঘ্ন তাঁহাকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। একবার যাহা ধরিতেন তাহা তিনি মরণ পণ করিয়া ধরিতেন এবং তাহা সম্পন্ন করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। এ বিষয়ে রামমোহনের সংকল্পশক্তিকে বিখ্যাত 'বুলডগ'-নামক কুকুরের কামড়ের সহিত তুলনা করা যায়। বুলডগ নাকি একবার যাহাকে কামড়াইয়া ধরে তাহাকে নিজের মাথা ছিঁড়িয়া গেলেও ছাড়ে না। তেমনি রামমোহন তাঁহার বজ্রের মতো কঠোর মুঠায় যে কাজ একবার আঁকড়াইয়া ধরিতেন, তাহাকে শেষ না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। এ বিষয়ে বাধাবিঘ্ন তাঁহার দুর্বলতা আনয়নের পরিবর্তে বাড়াইয়া দিত। বীরের পক্ষে বাধা-বিপদের সহিত লড়াই করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। যে আনন্দে অজানা পথের অভিযাত্রী দুর্গম মরু আর দুরন্ত পাহাড় লঙ্ঘন করিয়া যায়, সেই প্রকার আনন্দেই রামমোহনের বীরহৃদয় বিপদ ও বাধার সম্মুখে অধিকতর অনুপ্রাণিত বোধ করিত। জেদ তাঁহার বাড়িয়া যাইত, সংকল্প হইত অনমনীয় ইস্পাত। এমনই ছিল মহাত্মা রামমোহনের আন্তর মাহাত্ম্য, চরিত্রের দৃঢ়তা।

(৫) তিনি যে উপরে······অপরাজিত বিশ্বাস। (অ. ৭)

এই অংশটি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাত্মা রামমোহন'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। রামমোহন-চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের ইহাই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহনের অপূর্ব স্বাধীনতাপ্রিয়তা, প্রচণ্ড আত্মমর্যাদা-জ্ঞান, সুদৃঢ় স্বাবলম্বন ও অমোঘ সংকল্প প্রভৃতি গুণের সমালোচনা করিয়াছেন। এই সকল অসাধারণ গুণের সমন্বয়ে তাঁহার মধ্যে একটি মহান ব্যক্তিপুরুষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহা দৈবের খেলা নহে, ইহা সাধনার ফল। রামমোহন মানুষের আত্মাকে পরমাত্মার অংশ জ্ঞান করিতেন এবং উহার শক্তি

ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি নিজের আত্মিক শক্তিতেও গভীর বিশ্বাস রাখিতেন এবং এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তাঁহার অনড় স্বাবলম্বন গড়িয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন সেই স্বাবলম্বন ও একনিষ্ঠ সাধনার বলে এত বড় হইতে পারিয়াছেন। মানুষ মাত্রই নিজের ভাগ্যবিধাতা। রামমোহন সেই মানুষেরই একজন এবং সেইজন্যই তাঁহার সকল মহত্ত্বের মূলে ছিল তাঁহার নিজেরই পুরুষকার, নিজেরই অনবচ্ছিন্ন সাধনা। জীবনে শত পাপ-প্রলোভন, বাধাবিঘ্ন আর বিপদ ঝঞ্ঝাট সকলেরই আসে। যাঁহারা সেই সব উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই বড় হন। রামমোহনও এইভাবে বড় হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তি ও সাধনার মূলে ছিল এই প্রত্যয় যে মানবাত্মা অমোঘ শক্তিসম্পন্ন। এই প্রত্যয় অপরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার যেমন কারণ তেমনি আত্মবিশ্বাস ও কর্মশক্তিরও ইহাই ছিল প্রধান উৎস। আর ইহাতেই তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। . .

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া মহাত্মা রামমোহনের চরিত্র-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। মহাত্মা রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তার স্বরূপ আলোচনা কর। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই স্বাধীনতা-প্রিয়তার মূলে কি কারণ দেখিতে পাইয়াছেন?

উ.। মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতা-প্রিয়তা ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ় ও ব্যাপক। শুধু নিজের দেশের জন্যই তিনি স্বাধীনতা কামনা করিতেন না,—পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতিরই মুক্তির জন্য ছিল তাঁহার সমান আগ্রহ। জগতের সকল পরাধীন জাতির সহিত তিনি একটা হৃদয়সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছিলেন। তাই স্বাধীনতা-যুদ্ধে তাহাদের জয়-পরাজয়ে তাঁহার চিত্ত আনন্দে বা দুঃখে সাড়া দিত। দূর ইউরোপে সেদিন রাজনীতিক্ষেত্রে ঘন ঘন পরিবর্তন হইতেছিল। নবজাগ্রত মানুষ সেখানে পায়ের নিগড় ভাঙিয়া চূর্ণ করিতে সংগ্রামে নামিয়াছে। আসিয়াছে ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাহার প্রথম জোয়ার কাটিয়া গিয়াছে। তারপর নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান—

বিশ্বগ্রাসী সম্রাট্রূপে। তারপর আবার বিদ্রোহের ফল্গুস্রোত—ফলে ১৮১৫ নাগাদ আবার নেপোলিয়নের পতন। এই ক্রমবিবর্তন-ধারার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের প্রতি রামমোহনের প্রাথমিক শ্রদ্ধাও লোপ পাইয়াছে, ক্রমে পরাধীন মানুষের সংগ্রামের অনুকূলেই তাঁহার সকল কামনা একাগ্র হইয়াছে। ডিগ্‌বী সাহেবের অধীনে কাজ করিবার সময় সেইজন্যই রামমোহন বিলাতী ডাকের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। দিনে দিনে স্বাধীনতার সংগ্রাম কতটা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে —উহাই ছিল তাঁহার সাগ্রহ লক্ষ্যের বস্তু। অবশেষে নেপোলিয়নের পতনের দিনে নিশ্চয় তাঁহার আনন্দ হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহাতেই ফরাসীজাতির মুক্তি পরিপূর্ণ হয় নাই। আরও বহু পর্যায়ে ফরাসী বিপ্লব আগাইয়া চলিয়াছে। সেইসঙ্গে রামমোহনের সহানুভূতিও সর্বদা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষেই পুষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের পথে তিনি যখন উত্তমাশা অন্তরীপে কেপটাউনে পৌঁছিয়াছেন, তখন ফরাসীর ১৮৩০ খৃস্টাব্দের 'জুলাই বিপ্লব' সার্থক হইয়াছে। সেই বন্দরেই ছিল সদ্যোমুক্ত ফরাসীজাতির ত্রিবর্ণপতাকা উড়াইয়া দুইখানি জাহাজ ভাঙা পা লইয়া, সকল নিষেধ ও শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেই ফরাসী জাহাজে গিয়া ফরাসীর স্বাধীনতার পতাকা অভিবাদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আছে রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতাকামীদের জয় রামমোহনকে এইভাবেই আনন্দে আত্মহারা করিত। ১৮২০ খৃস্টাব্দে স্পেনে সামরিক বিদ্রোহ এবং আংশিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন এমনিভাবে তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল। সেদিন আনন্দের আতিশয্যে তিনি কলিকাতার পৌরমন্দিরে মহাসমারোহে এক ভোজ দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে মানুষ জয়ী হইলে তাঁহার যেমন আনন্দ হইত, সেই যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইলে তেমনি তাঁহার পরম দুঃখ হইত। তাহারই উদাহরণ পাই নেপল্‌স্‌বাসীদের পরাজয়ে রামমোহনের অবসন্নতায়। রামমোহন সেদিন এতই ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে একেবারে শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে বাকিংহামের সহিত সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ বাতিল করিতে হইয়াছিল। আর একবার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে 'রিফর্ম্ বিল' লইয়া যে তুমুল কাণ্ড চলে তখনও দেখি রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তা কত গভীর। ইংলণ্ডে ঐ 'বিল' না পাস করিলে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন আমেরিকায় গিয়ে বাস করিবেন—এইরূপ সংকল্প ঘোষণা করিলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তা

সম্বন্ধে দুইটি সত্য লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রীতি ছিল বিশ্ব-ব্যাপ্ত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধে তাহা সীমাবদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সেই স্বাধীন প্রীতি হৃদয়াবেগের স্তরেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। রামমোহন সক্রিয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই, সেইজন্যই তাঁহার হৃদয়-বিক্ষোভ ছিল এত বেশি।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহনের এই স্বাধীনতা প্রিয়তার মূলে যে কারণটি দেখাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই: রামমোহন মানুষের আত্মাকে পরমাত্মার অংশ জ্ঞান করিতেন। এই জ্ঞান হইতে তাঁহার মধ্যে একটা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হইয়া থাকিবে। ইহারই প্রেরণায় তিনি মানবাত্মার যেখানে ও যাহাতে অপমান তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। সামাজিক রীতি-নীতির অত্যাচার ও অন্যায় মানুষকে যেখানে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া আছে, সেখানে তিনি মানবাত্মার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। আমাদের দেশের সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার আমরণ যুদ্ধ এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সামাজিক পরাধীনতার ন্যায় রাজনৈতিক পরাধীনতাও মানবাত্মার প্রচণ্ড অবমাননা। সেজন্য দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রামকে তিনি অন্তর দিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। মোট কথা, রামমোহন যে চিরকাল মানুষের মুক্তি-আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই জন্য। ইহার শাস্ত্রী মহাশয়ের মত। তিনি ইহাকে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ বলিয়া মনে করেন না।

প্র. ৩। রামমোহন রায় বলিলেন: "...আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রথম দুঃখ আজ পাইয়াছি।"—**কোন্ প্রসঙ্গে কাহার নিকট রামমোহন রায় এই কথা বলেন? এই আঘাত ও দুঃখটির সম্বন্ধে যাহা যেন লেখ। ইহার মধ্যে রামমোহন-চরিত্রের কি পরিচয় আছে?**

উ.। রাজা রামমোহন রায় এই কথা খৃস্টান পাদ্রী এডাম সাহেবের নিকট বলিয়াছিলেন। বিশপ মিড্লটন রামমোহনকে পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। উহাতে রামমোহন অত্যন্ত কুপিত ও ধিক্কৃত বোধ করেন এবং মনের সেই ভাবটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই তিনি এডামকে উদ্ধৃত কথা কয়টি বলেন।

[ইহার পর ৩নং ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ লেখ।]

প্র. ৪। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মহাত্মা রামমোহন' প্রবন্ধটির বস্তু-বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

প্র. ৫। (ক) "ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অস্ট্রিয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না"—ইটালীয়গণের এই পরাজয়-সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (খ) উদ্ধৃত অংশে কোন্ 'নিমন্ত্রণে'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে?

উ.। **শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি** দেখ।

প্র. ৬। "অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল…।"—স্পেনে এই নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

উ.। **শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি** দেখ।

প্র. ৭। "ডিগ্‌বীসাহেব লিখিয়াছেন যে,…রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতাসহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন।"—এখানে ফরাসী বিপ্লবের কোন্ সময়কার কথা বুঝাইতেছে? আলোচনা কর।

উ.। **শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি** দেখ।

প্র. ৮। "কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তখন……সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।"—উল্লিখিত ঘটনাটি কোথায়, কখন ও কোন্ খৃস্টাব্দে ঘটে? সেই সময় ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার পশ্চাতে সেই দেশের কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রচ্ছন্ন আছে?

উ.। **শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: পরাস্ত = পরা + অস্ত। স্বোপার্জিত = স্ব + উপার্জিত। পরিচ্ছদ = পরি + ছদ। উন্মোচন = উৎ + মোচন। অন্তর্নিহিত = অন্তঃ + নিহিত। অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট। ষোড়শ = ষট + দশ। চক্ষে = চক্ষু + এ (বাঙলা সন্ধি)।

সমাস: মানবাত্মা—মানবমধ্যস্থ আত্মা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসে—স্বাধীনতার লাভ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার জন্য প্রয়াস (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। অকৃতকার্য—কৃত হইয়াছে কার্য যাহার দ্বারা (বহুব্রীহি); নয় কৃতকার্য (নঞ্ তৎপুরুষ)। মর্মাহত—মর্মে আহত (৭মী-তৎপুরুষ)। শয্যাস্থ—শয্যায় থাকে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। জয়ধ্বনি—জয়-সূচক ধ্বনি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। স্বোপার্জিত—স্ব-র অর্থাৎ নিজের দ্বারা উপার্জিত (৩য়াতৎপুরুষ)। আত্মমর্যাদাজ্ঞানের—আত্মার মর্যাদা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার জ্ঞান (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার। খ্রীষ্টধর্ম—খ্রীষ্টপ্রচারিত ধর্ম (মধ্য-পদলোপী কর্মধারয়। (অন্তর্নিহিত—অন্তঃ (= মধ্যে) নিহিত (৭মীতৎপুরুষ)। স্বকার্যসাধনে—স্ব-র অর্থাৎ নিজের কার্য (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), অথবা স্ব (নিজ) কার্য (কর্মধারয়); তাহার সাধন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। বজ্রমুষ্টি—বজ্রতুল্য (দৃঢ়) মুষ্টি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); প্রতিপক্ষগণ—পক্ষের প্রতিকূল প্রতিপক্ষ (অব্যয়ীভাব—বাঙলায় বিশেষ্যবৎ প্রয়োগ); তাহাদের গণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। প্রতিজ্ঞারূঢ়—প্রতিজ্ঞাকে আরূঢ় (২য়াতৎপুরুষ)। জাতিচ্যুত—জাতি হইতে চ্যুত (৫মীতৎপুরুষ)। পশ্চাৎপদ—পশ্চাৎ পদ যাহার (বহুব্রীহি), সে। গৃহতাড়িত—গৃহ হইতে তাড়িত (৫মীতৎপুরুষ)। স্বাবলম্বন-শক্তি—স্ব-র অবলম্ব (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); স্বাবলম্বনই শক্তি (কর্মধারয়)। অন্তরীপ—অন্তঃ (= মধ্যে) অপ্ অর্থাৎ জল যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। শরণাপন্ন—শরণকে আপন্ন (২য়াতৎপুরুষ) পিছু-পা—পিছু পা যাহার (বহুব্রীহি), সে।

সমস্তপদ-গঠন: স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার = স্বাধীনতা-ক্ষেত্রবিস্তারের। খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন = খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন। মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন = মস্তকবিচ্ছিন্ন। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত = পৈতৃকসম্পত্তি বঞ্চিত।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: অঙ্গীভূত—অঙ্গ + চ্বি (অভূততদ্ভাবে) + ভূ + ক্ত। বিলাতী—বিলাত + ঈ। উড্ডীন—উৎ—ডী + ক্ত। পৈতৃক—পিতৃ + ঠঞ। গূঢ়—গুহ্ + ক্ত। বিচ্ছিন্ন—বি—ছিদ্ + ক্ত। উৎসাহিত—উৎসাহ + ইতচ্। ঊর্ধ্বতন—ঊর্ধ্ব + তন।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ: 'ভোজ দিলেন'—এখানে 'দিলেন'-এর অর্থ 'দান করিলেন' নয় বলিয়া প্রয়োগটি বিশিষ্টার্থক। দিলেন = খাওয়াইলেন।

এইরূপ আরও প্রয়োগ : গোল দেওয়া, চিঠি দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, মার দেওয়া, গাল দেওয়া, দেয়াল দেওয়া, কুয়ো দেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, (পুকুরে) জাল দেওয়া, বকুনি দেওয়া, কান দেওয়া, চোখ দেওয়া, হাত দেওয়া, জাত দেওয়া ইত্যাদি।

পদ-পরিবর্তন : রাজনৈতিক--রাজনীতি। বিস্তৃত—বিস্তার। উন্মোচন—উন্মোচিত। প্রলোভন—প্রলুব্ধ। বিচ্ছিন্ন—বিচ্ছেদ। অবমাননা—অবমানিত। সংগ্রহ—সংগৃহীত। উদ্যত—উদ্যম। অনুমিত—অনুমান। মুদ্রিত—মুদ্রণ।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : রামমোহন জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রথম দুঃখ আজ পাইয়াছি"—রামমোহন জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন যে তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ সেদিন তিনি পাইয়াছেন (পরোক্ষ উক্তি)।

দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল--দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন (বাচ্যান্তর)।

কোনো বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না--কোনো বিঘ্ন বা বাধায় তিনি স্বকার্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম হইতেন না (তাঁহাকে'-কে কর্তৃপদে পরিণত করিয়া)।

তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র ছিল না (নেতিবাচক)—তাঁহার পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল (অস্তিবাচক বা স্থাপনাত্মক)।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না (জটিল) —মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞানহীন লোকের স্বাবলম্বন-শক্তি আসে না (সরল)।

রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বড়ো (যৌগিক)—রামমোহন রায় উপরে উঠিতে পারায় বড়ো (সরল)।

এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে—এ জগতে মানুষের দ্বারা আপনার ঘর আপনি রচনা করা হয় (বাচ্যান্তর)।

কারক ও বিভক্তি : অতি পবিত্র 'চক্ষে' দেখিতেন (করণে-এ) 'স্বকার্যসাধনে' বিমুখ (অপাদানে-এ)। মানবাত্মার 'মহত্ত্বে' অপরাজিত বিশ্বাস (অধিকরণে-এ)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ : রাজনৈতিক, অকৃতকার্য, মর্মাহত, বৈষয়িক, পূর্ণমাত্রায়, অপরাজিত।

এক কথায় প্রকাশ : পাঠ করা উচিত = পঠনীয়। আরও বড়ো = উচ্চতর (বৃহত্তর)। অন্তরের সহিত = সান্তরে (অপ্রচলিত)।

অর্থগত পার্থক্য : কপোল—গাল ; কপাল—ললাট। ত্বরায়—তাড়াতাড়ি ; তরায়—পার করে, উত্তীর্ণ করে। মুদ্রিত—ছাপা ; মুদিত—বোজা।

ণত্ব-বিধান : প্রশ্ন : 'অপরাহ্ণে' কথাটিতে ণত্বের কারণ কি ?

উত্তর : প্র, অপর, পূর্ব প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়।

সমুদ্রপথে

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙলাসাহিত্যের একজন প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। বাঙলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি আবিষ্কার ও অর্থ উদ্ধার করিয়া তিনিই সর্বপ্রথম গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া যান। সেইক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যত কাজ হইয়াছে একা শাস্ত্রীমহাশয়ের গবেষণার তুলনায় তাহা যে বড় বেশি কিছু নয়, একথা বলিলে অন্যায় হয় না। এই বিরাট কাজের মূলে ছিল শাস্ত্রী-মহাশয়ের অতুলনীয় অনুসন্ধিৎসা, ধৈর্য, শ্রমশীলতা ও বিচক্ষণ পাণ্ডিত্য। ইহার তুলনা বিরল। পাণ্ডিত্যের সহিত অপূর্ব রচনা দক্ষতাই শাস্ত্রীমহাশয়কে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাঙলা গদ্যের সেই আদিপর্বে শাস্ত্রীমহাশয় কত সরল ভাষায় কিরূপ সুন্দর গদ্য লিখিতেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তাঁহার চিন্তা যে কত সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ ছিল এগুলি তাহারই প্রমাণ। এ-যুগে অন্যত্র অনেক সাহিত্যিক ও কবির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু হরপ্রসাদ ও রামেন্দ্রসুন্দর—এই দুইজন বাঙলা গদ্যের আদর্শ-লেখকের সম্মান পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। হরপ্রসাদের লেখাগুলির দেশময় প্রচারের

প্রয়োজন আসিয়াছে। কারণ এই লেখাগুলি শুধু উপাদেয়ই নয়, পুষ্টিকরও বটে। রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ-সংবর্ধনায় লিখিয়াছেন, "অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেননি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে-যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; সে যুগ বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না।…হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর দর্শনশক্তি ছিল।

যে-কোনো বিষয় শাস্ত্রীমহাশয় হাতে নিয়েছেন তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন এবং সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাঙলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল, এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এ জিনিসটা বড় বিরল।" হরপ্রসাদের এই অপূর্ব শক্তিই প্রধান বিশেষত্ব।

উৎস ও নামকরণ—'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক কাহিনীটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে'-নামক উপন্যাসের অংশ। এই অংশের কথাবস্তু—সমুদ্রে ঝড়, তাহার মধ্যে বিহারী দত্তের স্ত্রী-কন্যার শোচনীয় অবস্থা এবং সর্বশেষে সমুদ্রের ঢেউ নিবারণের কাহিনী। বিহারী দত্ত বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপগুলি ঘুরিয়া দেশে ফিরিতেছেন। ফিরিতেছেন সমুদ্রপথে, এবং এই কাহিনী ভাগে সেই সময়কার ঘটনাবলীরই বিবরণ রহিয়াছে। এইজন্যই অংশটির এইরূপ শীর্ষনাম। কিন্তু শুধু 'সমুদ্রপথে' কথাটি নির্বিশেষ বর্ণন বুঝায়। আলোচ্য কাহিনীটি কিন্তু বিশেষ একটি বিবরণ। সুতরাং 'সমুদ্রপথে বিহারী দত্ত'—এই ধরণের শীর্ষনামই অধিকতর সঙ্গত হইত।

সমালোচনা—'সমুদ্রপথে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের অংশ। উপন্যাসটি কাল্পনিক বটে, কিন্তু উহার পটভূমিকা প্রাচীন বাঙলার একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কাজেই গল্প-হিসাবে উপভোগ্যতা ছাড়াও অংশটির অন্যতর একটি আবেদন আছে। উপন্যাসটির সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় নিজেও

বলিয়াছেন যে উহা নিছক গল্প। সেকালের কথাই এই গল্পের উপজীব্য। কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র ও পরিবেশের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয় যেন বিগত দিনের একটি মহিমময় ছবি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ইতিহাস নথি-নজির আর কঠোর তথ্যের সমবায়। তাহাকে জীবন্ত করিয়া দেখিতে গেলে সেই ইতিহাসের উপকরণ লইয়া কল্পনার রসায়নে রূপ দিতে হয়। 'বেণের মেয়ে' সেই চেষ্টারই নিদর্শন। তাঁহার আলোচ্য অংশটির মধ্যে তাই আমরা সেকালের একটি সুন্দর চিত্র পাই। বাঙালী সেদিন বাণিজ্য করিত—দূর সিংহল আর দূরতর যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ ঘুরিয়া বিহারী দত্ত ফিরিতেছেন। প্রচুর সম্পদ্ আর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের সহিত সংযোগস্পর্শ লইয়া তিনি দেশে ফিরিতেছেন। এমন সময় সমুদ্রে ভীষণ ঝড উঠিয়াছে। ঝড়ের সময় বাঙালী মাঝির বিক্রম ও দক্ষতার কথা আমাদের বুক গর্বে স্ফীত করে। আবার ঠিক সেই সময় যাত্রীদের সহিত তাহাদের বাগ্ বিতণ্ডা ও বচসা বাঙালীচরিত্রের চিরন্তন কলহপ্রবণতার আভাস দেয়। স্ত্রীকন্যার অসুখে বিহারী দত্তের আকুলতা তেমনি সনাতন বাঙালীটির পরিবার প্রীতি ফুটাইয়া তোলে। এইভাবে সেকালের একটি পরিবেশের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয় চিরকালের বাঙালীকে নিপুণভাবে ধরিয়া দিয়াছেন।

এই নিপুণতাকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে শাস্ত্রীমহাশয়ের ভাষার সরলতার প্রতি। এতকাল আগেও সরল ও সুন্দর গদ্য লেখা হইয়াছে —এ এক পরম বিস্ময়। দ্বিতীয়তঃ, সরলতার সহিত যুক্ত হইয়াছে সৌন্দর্য ও কথাশিল্পের অন্যসব মহার্ঘ উপাদান। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ—তাহার মধ্যে নৌবহরের উত্তাল উত্থানপতন—এই বর্ণনাটি সত্যই অপূর্ব। আবার এই বর্ণনার মধুরসের সহিত মিশিয়াছে উপাদেয় সংলাপ। মাঝিমাল্লাদের সহিত যাত্রীদের বচসা শুধু স্বাভাবিক নয়, বেশ নাট্যগুণ-সম্পন্নও বটে। ইহাতে কাহিনীটিতে যেমন বৈচিত্র্য আসিয়াছে তেমনি হইয়াছে গতিসঞ্চার। ইহার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ঢেউ যখন সকলকে গ্রাস করিতে আসে তখন বচসা থামে। ইহাই স্বাভাবিক। বিপদ্ তীব্রতম হইয়া উঠিলে এইভাবেই পরস্পরের কলহ থামিতে বাধ্য।

বাঙালী মাঝির সমুদ্রবিদ্যা প্রচুর ছিল। এখানে বিবৃত ঢেউ-নিবারণের উপায়টি বৈজ্ঞানিক-সত্য। সমুদ্রযাত্রায় বাঙালীর বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের

প্রমাণ ইহার মধ্যে স্পষ্ট। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে এই যে বিগত দিনের বাঙালীর একটি উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন, ইহার মূলে শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্বদেশাত্মবোধেরও পরোক্ষ পরিচয় পাই। শাস্ত্রীমহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন, 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। এই গল্প পড়িবার সময় তাই মনে হয় বুঝি বা বাঙালীকে তাহার গৌরবের কথা তিনি ছবি আঁকিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চান।

আলোচ্য কাহিনীভাগের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের রচনাশৈলীর বিশেষত্বগুলি অনেকাংশে ধরা পড়িয়াছে। অপূর্ব সংযম ও সরলতাই তাঁহার লেখার প্রধান গুণ। কোথাও অবাস্তবতা নাই, উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নাই। তথাপি বর্ণনা তাঁহার প্রাণবন্ত ও মর্মগ্রাহী। গদ্য লেখার এই ভঙ্গীটি আজিকার দিনেও শ্রেষ্ঠ লেখকের আদর্শ।

সংক্ষিপ্তসার:—বিহারী দত্তের ডিঙাগুলি ক্রমে বালীদ্বীপে পৌঁছিল। বালীদ্বীপকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া তিনি দ্বীপপুঞ্জের সকল দ্বীপেই একবার করিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। তারপর বাণিজ্যসংক্রান্ত সকল কাজ সারিয়া এবং ব্যবসায়ের পথ আরো প্রশস্ত করিয়া পাঁচ মাস পরে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। এবার ব্যবসায়ে অন্যান্য সকল বারের চেয়ে আশাতীত বেশী লাভ হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত। তাঁহার ধারণা তাঁহার মেয়ের ভাগ্যগুণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে; তাই মেয়ের প্রতি তাঁহার স্নেহও বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েটিও সকলের আদর এবং নানান জনের নিকট হইতে নানান জিনিস পাইয়া, বহু নূতন নূতন জায়গা দেখিয়া মহা আনন্দে দিন কাটাইয়াছে। তবু স্বদেশে ফিরিবার নামে সে উল্লসিত।

ক্রমে উনপঞ্চাশখানি ডিঙা আসিয়া বালীদ্বীপে মিলিত হইল। প্রয়োজনমতো সেগুলিকে মেরামত করিয়া বিহারী একদিন বহর লইয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। আসিবার সময় যেমন, ফিরিবার সময়ও তেমনি—সমুদ্র শান্ত, স্থির। বিহারী মহানন্দে ছইয়ের উপর উঠিয়া দেখেন, সব ডিঙাই পাল তুলিয়া ধীরগতিতে চলিয়াছে। অমনি তিনি মনে মনে এবারকার অপ্রত্যাশিত লাভের হিসাব করিতে থাকেন।

কিন্তু একদিন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা গেল। মাঝি

তাহার প্রতি বিহারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইল যে শীঘ্রই ঝড় উঠিবে, যে যাহার কামরায় স্থির হইয়া বসিয়া না থাকিলে বিপদ হইতে পারে।

দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল। বাতাস প্রবল বেগে সোঁ সোঁ শব্দে বহিয়া নৌকাগুলিকে যেন উল্টাইয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু বাঙলার নিপুণ মাঝি হাল ধরায় নৌকার কোন বিপদ্ হয় না। তাহার আদেশে সব নৌকার পাল নামাইয়া গুটাইয়া ফেলা হইল। নৌকার পালসমেত তলাইয়া যাওয়ার ভয় দূর হইল। কিন্তু বিপদ হইল প্রকাণ্ড ঢেউগুলিকে লইয়া। এক একটা বিশাল ঢেউ ছুটিয়া আসিয়া নৌকাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে চায়, ছইয়ের উপর দিয়া লাফাইয়া ওপারে গিয়া পড়ে। সকলেই ভয়ে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। একটা ঢেউ চলিয়া গেলে তাহাদের মন কিছুটা শান্ত হয়; আবার নূতন ঢেউ আসিলেই সেই পূর্বের অবস্থা। প্রবল বাতাসে স্ফীত সমুদ্রের ঢেউগুলি বিশ-ত্রিশহাত উঁচু, তাহার উপর নৌকাগুলিকে মোচার খেলার মতো দেখায়। ঢেউগুলি উপরে উঠিয়া যখন ভাঙিয়া পড়ে, তখন তাহা হইতে রাশি রাশি তুলার মতো শাদা ফেনা বাহির হয়। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণে নৌকা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে, তবু প্রাণভয়ে ভীত যাত্রীরা এই বিষম বিপদের জন্য তাহাদের গালাগালি করে। মাঝিরাই বা তাহা সহ্য করিবে কেন, তাহারাও গালি দিতে ছাড়ে না। বিহারী দত্তের প্রাণের চেয়ে তাহারা নিজের প্রাণ বেশি মূল্যবান্ মনে করে; কারণ তাহারা মরিলে তাহাদের পরিবারকে দেখিবার কেহ থাকিবে না, কিন্তু ধনী বিহারী দত্তের লোকজনের অভাব নাই। এমনিভাবে তর্কাতর্কি চলে, কিন্তু ঢেউ আসিতেই আবার সব বন্ধ হইয়া যায়।

এদিকে বিহারীর মেয়েটি ঢেউ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী-স্ত্রীতে অনেক চেষ্টা করিয়া তাহার চেতনা সাময়িকভাবে ফিরান, আবার সমুদ্রের নিকট হুংকার শুনিয়া তাহার চেতনা লুপ্ত হয়। এমন সময় বিহারীর স্ত্রীরও বমির ভাব দেখা গেল। তিনি কাঠের সেঁউতিতে অবিরাম বমি করিতে লাগিলেন। বিহারী উন্মাদের মতো মাঝিকে ডাকিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন যে যেমন করিয়া হউক সকলকে বাঁচায়। কিন্তু মাঝি নৌকাডুবির আশঙ্কায় হাল ছাড়িতে সম্মত হয় না। অবশেষে মাঝি বলে যে বিহারী যদি সাত-আট লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে সে ঢেউ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। স্ত্রী ও কন্যার

প্রাণের বিনিময়ে বিহারী যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। ইহা শুনিয়া মাঝি তাহার বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। তাহার নির্দেশে আর একজন মাঝি মাল্লাদের সাহায্যে খোলের ভিতর হইতে পঞ্চাশটা গর্জন তেলের পিপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর এবং প্রবল ঝড়ের মুখে সেই পিপার সমস্ত তেল সমুদ্রে ঢালিয়া দিতে লাগিল। এত-কষ্টে-সংগ্রহ-করা তেল এইভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইলেও বিহারী নীরব রহিলেন।

তেল যতদূর ছড়াইতে লাগিল, সমুদ্রও ততদূর স্থির হইতে লাগিল। বাতাসের বেগ পূর্বের মতো থাকিলেও ঢেউ-ওঠা বন্ধ হইল। শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়া নৌকা বেগে চলিতে লাগিল। বিহারীর স্ত্রী-কন্যা সুস্থ হইল। মাঝির উপর বিহারীর বিশ্বাস বাড়িয়া গেল। তিনি মাঝিকে প্রচুর পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। দুপুরবেলা মাঝি তাহাকে ডাকিয়া দেখাইল যে সবগুলি নৌকা স্থির-সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিম মুখে চলিয়াছে। সে জানাইল যে ঝড়ে তাহাদের যথেষ্ট উপকারই হইয়াছে—সাত-আট দিনের পথ তাহারা একবেলায় অতিক্রম করিয়াছে, এবং সেইদিনই সন্ধ্যার কাছাকাছি কোনো সময়ে গঙ্গার মোহানায় পৌঁছিতে পারা যাইবে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১-২। ডিঙাগুলি—সমুদ্রগামী নৌকাগুলি। **বালীদ্বীপ**—পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপ ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও কৃষ্টির দ্বারা এককালে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এমনকি ইহা হিন্দুরাজার শাসনাধীনও ছিল। এই দ্বীপকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাগরিকা' নামে একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম 'বলি' দ্বীপ। বড়ো আড্ডা—প্রধান কেন্দ্র। বিহারী—সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের সমৃদ্ধ সদাগর বিহারীলাল দত্ত। ইনি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের একটি কাল্পনিক চরিত্র। **যবদ্বীপ**—পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আর একটি দ্বীপ। ইহার বর্তমান নাম 'জাভা'। এই দ্বীপটির উল্লেখ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক জায়গায় আছে। **সুমাত্রা**—একটি বৃহৎ দ্বীপ। **বোর্নিও**—অন্য একটি বৃহৎ দ্বীপ। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশ বৃটিশ শাসনাধীন ও দক্ষিণাংশ ওলন্দাজদিগের অধিকারমুক্ত

হইয়া কয়েক বৎসর হইল স্বাধীন হইয়াছে। উপরোক্ত দ্বীপ চারিটি এবং আরো কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া বর্তমান ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। **তদারক**—দেখাশুনা। **বাহাল বরখাস্ত করিলেন**—কর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনর্নিয়োগ এবং কর্মচ্যুত করিলেন। যাহাদের কাজকর্মে বিহারী সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহাদিগকে এবং নূতন লোককেও কর্মে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু যাহারা কাজে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, তাহারা কর্মচ্যুত হইল। 'বাহাল' ও 'বরখাস্ত' দুইটিই ফার্সী শব্দ। **ফালাও**—প্রসারিত; সুগম। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন—পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে অথবা সেইসব পণ্যের বিনিময়ে সেখানকার যেসব জিনিস কিনিলেন বা পাইলেন। প্রাচীনকালে বাঙালী সদাগরগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কেবল বাঙলার পণ্য বিক্রয় করিতেন না, সেখানকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি কিনিয়া বিক্রয়ের জন্য স্বদেশে লইয়া আসিতেন। সংস্কার—মনের বদ্ধমূল ধারণা। মেয়ের পয়েই—কন্যার সৌভাগ্যেই; ভাগ্যবতী কন্যা সঙ্গে ছিল বলিয়াই। এই কন্যাই 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের নায়িকা মায়া। **পয়**—সৌভাগ্য, সুলক্ষণ। কারবার—ব্যবসায়ের সম্পর্ক। সব মন্দিরে····· পূজা দিয়াছে—পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে বহু প্রাচীন মন্দির দেখা যায়; ইহাদের কতকগুলি হিন্দুদের, কতকগুলি বৌদ্ধদের। বিহারীর কন্যা স্বাভাবিক ধর্মশীলতাবশতঃ সবগুলিতে গিয়া পূজা দিয়াছে। **সাতগাঁ**—বা সপ্তগ্রাম। ইহা ছিল মধ্যযুগে বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান বন্দর এবং বর্তমান হুগলী জেলায় গঙ্গা ও সরস্বতীর উপরে স্থাপিত। এখানে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাই ছিল বেশী। বর্তমান হুগলী শহরের প্রায় তিন মাইল দূরে ইহা অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় এই সুসমৃদ্ধ জনপদটি ক্রমে প্রাধান্য হারাইয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। বিহারী দত্ত এই সাতগাঁয়ের অধিবাসী ছিলেন। **খেলুড়ি**—খেলার সাথী বা সঙ্গী। **ঠাকুরদের**—প্রাতিবেশী ব্রাহ্মণদিগের।

অ. ৩। ভাসিল—যাত্রা করিল। **জয় সাতগাঁয়ের কালী**—সমুদ্রযাত্রা যাহাতে নিরাপদ হয় সেই উদ্দেশ্যে কেহ কেহ স্বদেশের দেবীর শরণাপন্ন হইল। **বরুণদেবের জয়**—জলের দেবতা বরুণ। জলপথে যাহাতে কোনো বিপদ্ উপস্থিত না হয় সেইজন্যই মাঝিরা বরুণদেবকে স্মরণ করিল। **স্থির**—শান্ত; অচঞ্চল। ঠিক সেই ভাব—অর্থাৎ সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত। ছই—নৌকার ছাদ।

ডিঙা গনিয়া দেখে—সব কয়খানি ঠিক আছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্ত। লাভালাভ কষে—বাণিজ্য করিয়া কিরূপ লাভ হইল বা হইবে তাহার একটা হিসাব করে।

অ. ৪-৫। **দক্ষিণ-পূর্ব কোণে**—অগ্নিকোণে। অগ্নিকোণে কৃষ্ণমেঘ প্রবল ঝড়ের সূচনা করে। প্রমাদ—বিপদ্। **পাটনী**—নৌকা-ব্যবসায়ী জাতি-বিশেষ। তুলনীয়: "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী"—ভারতচন্দ্র। **গুঁজড়াইয়া**—বাতাসের বেগে কাত হইয়া বা উল্টাইয়া। ঝড়ের ধাক্কা—প্রবল বায়ুর আঘাত। গোঁ-গোঁয়ানি—ক্রন্দনের মতো বাতাসের শব্দ। **চড়ন্দাররা**—যাত্রীরা। **ত্রাহি ত্রাহি**—(সংস্কৃত ক্রিয়া) রক্ষা কর, রক্ষা কর। ইষ্টদেবতা—উপাস্য দেবতা। **মোচার খোলার মতো**—বিশালকায় ঢেউগুলির মাথায় ডিঙাগুলি এত ছোট ও অসহায় যে সেগুলিকে নদীর জলে মোচার খোলার মতো মনে হয়। মোচার খোলার আকৃতি অনেকটা নৌকার মতো। **পিঁজা তুলা**—ঢেউয়ের উপরিভাগে সাদা ফেনা দেখা যায়; সে ফেনা এত সাদা যে তাহার তুলনা চলিতে পারে পেঁজা তুলার সঙ্গে। **ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া**—অর্থাৎ ঢেউগুলি যখন উপরে উঠিয়া ভাঙিয়া পড়ে তখন। গালি পাড়ে গালাগালি দেয়; ভৎর্সনা করে। **মাঝিমাল্লারা**—মাঝি নৌকার প্রধান নাবিক আর মাল্লা সাধারণ নাবিক। **তাহাদের গলদ্ঘর্ম হইতেছে**—তাহাদের দেহ হইতে ঘাম ঝরিতেছে।

অ. ৬-৮। **সাঙ্গা**—শ্রেণীবদ্ধ নৌকা। **বাঙলা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে**—বাঙলাদেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে গভীর শোক ও নৈরাশ্য দেখা দিবে। এই মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায় বিহারী দত্তের খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল। তিনি মরিলে বাঙলার গৌরব নষ্ট হইবে। পরিবারদের—পরিবারস্থ লোকজনের।

অ. ৯-১১। **দাঁত-কপাটি**—মূর্ছায় দাঁতে দাঁতে শক্তভাবে লাগিয়া যাওয়া। বিহারীরা স্ত্রী-পুরুষে—স্বামী বিহারী ও তাঁহার স্ত্রী—এই দুইজনে মিলিয়া। **গা বমি-বমি করিয়া উঠিল**—সমুদ্রপথে নৌকা বা জাহাজে করিয়া যাইবার সময় ঢেউয়ের দোলায় অনেকেরই এইরূপ বিবমিষা (বমির ইচ্ছা বা ভাব) হয়, ইহাকে সমুদ্রপীড়া (sea-sickness) বলে। **সেঁউতি**—নৌকার জল ছেঁচিয়া

ফেলিবার পাত্রবিশেষ ; সেচনী। তুলনীয় : "কাঠের সেঁউতি মোর হল অষ্টাপদ" —অন্নদামঙ্গল (অষ্টাপদ = সোনা)। বেণেবউ—বেণে বা বণিক বিহারী দত্তের স্ত্রী। বড়ো মাঝি—প্রধান নাবিক। রক্ষা থাকিবে না—অর্থাৎ ঝড়ের বেগে ডিঙা ডুবিয়া যাইবে। বিপদের সময় অভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মাঝি অন্যের হাতে হাল ছাড়িয়া দিতেও ভরসা পাইতেছে না।

অ ১২-১৪। যথাসর্বস্ব—যাহা কিছু আছে সব। সেও আচ্ছা—তাহাও ভালো। ঘরে—অর্থাৎ নৌকার নিজ কামরায়। আমি যাহা জানি—ঢেউকে শান্ত করিবার যে বিদ্যা আমার জানা আছে। খোল—নৌকার যে অংশে মাল বোঝাই করা হয়। গর্জন-তৈল—'গর্জন' চিরসবুজ প্রকাণ্ড বৃক্ষ। ইহার জন্মস্থান পূর্ব-ভারত ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ। ইহার কাষ্ঠ হইতে ধূনার মতো এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এই ধূনারই তরল রূপ 'গর্জনতৈল'। ফুসফুস ও কণ্ঠনালীর নানা রোগে, দূষিত ঘায়ে, এমনকি কুষ্ঠরোগেও এই তেল উপকারী। কোনো কোনো বাঙলা অভিধানে ইহাকে বাতবেদনানাশক প্রসিদ্ধ কবিরাজী তৈল বলা হইয়াছে- ইহা ঠিক নহে। পিপা—মৃদঙ্গের (খোল) আকৃতি-বিশিষ্ট বড় চোঙা বা খোল। পাটাতন—নৌকার কাঠের তৈয়ারি মেঝে।

অ. ১৫। তেল যতদূর যাইতে লাগিল ইত্যাদি—জলের উপর তেল অতি সহজে এবং অল্পসময়ে ছড়াইয়া পড়ে। পদার্থবিদ্যার Surface Tension-তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে জলের উপর তেল পড়িলে সত্যই জলের বিক্ষোভ কমিয়া যায়। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে চাঁদ-সদাগরের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় এইরূপ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শান্ত করিবার জন্য তেল ঢালার একটি ঘটনার কথা লেখা আছে। দর্পণ—আয়না। দর্পণের মতো স্থির—কঠিন পদার্থ আয়নার কোনো চাঞ্চল্য থাকে না বলিয়া তাহাতে প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় ; সেইরূপ সমুদ্রের জলও এত শান্ত হইল যে তাহাতে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়। গঙ্গার মোহনায়—গঙ্গানদী যেখানে গিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে সেখানে ; সাগরসঙ্গমে।

ব্যাখ্যা

(১) **দেশের লোকের সঙ্গে……পথ ফাঁদাও করিলেন।** (অ. ১)

এই অংশটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত।

সিংহল ও অন্যান্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিহারী দত্তের বাণিজ্য ও তাহার শুভফল বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন।

বিহারী দত্ত বিরাট বাণিজ্যবহর লইয়া বালী ও যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে দীর্ঘ পাঁচ মাস বাণিজ্য করিলেন। বাণিজ্য ভালো হইল। দত্ত মহাশয় গভীর মনোযোগে হিসাব দেখিলেন, কর্মচারীদের কাজকর্ম দেখাশুনা করিলেন এবং প্রয়োজনমতো কাহাকেও ইস্তফা দিলেন, কাহাকেও বা বাহাল করিলেন। এই বাণিজ্যের দ্বারা দত্ত মহাশয় শুধু ব্যক্তিগত ধনসম্পদ্ই বৃদ্ধি করিলেন না, বাঙালীর সহিত সেই সকল দেশের ব্যাপকতর বাণিজ্যের পথও প্রস্তুত করিয়া আসিলেন। বাঙালী তখন বহির্বাণিজ্য করিত, বাণিজ্যের প্রকৃষ্ট নীতিগুলিও তাহাদের জানা ছিল। দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য যত প্রসার পায় বিশেষ ব্যবসায়ীর তত সুবিধা হয়। এককভাবে একজন অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্র স্থায়ী করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বহির্বাণিজ্য যতই প্রসার পায়, সেই সূত্রে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ততই বৃদ্ধি পায়। বিহারী দত্ত নিশ্চয়ই এসকল জানিতেন, তাহা ছাড়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতিও হয়তো ছিল। তাই বিদেশের সহিত দেশের লোকের ব্যবসায় বৃদ্ধি করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

(২) তথাপি দেশে ফিরিবার………এমনি টান। (অ. ১)

এই অংশটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। বালী, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিয়া বিহারী দত্ত যখন দেশে ফিরিবেন তখন তাঁহার মেয়ের উল্লাসই এখানে বর্ণনীয়।

বিহারী দত্তের সেবার খুব ভালো ব্যবসা হইয়াছিল। সঙ্গে ছিল তাঁহার মেয়ে। দেশে দেশে বণিক্ ও রাজারা তাঁহাকে পরম আদর করিয়া নানা জিনিস দিয়াছে। দত্ত মহাশয় নিজেও মেয়ের প্রতি আদর বাড়াইয়া দিয়াছেন, কেননা তাঁহার বিশ্বাস মেয়ের ভাগ্যেই সেবার তাঁহার এত বেশী লাভ হইয়াছে। সুতরাং সকলের আদরে সকল দিক্ দিয়া মেয়েটির আনন্দের সীমা ছিল না। তবু দেশে ফিরিবার কথায় তাহার আনন্দ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। দেশের প্রতি প্রবাসীর এই সহজ আকর্ষণ নিত্য বস্তু। শতসহস্র উপহার আর সোহাগ দেশে ফিরিবার মতো এত আনন্দ দিতে পারে না। বিহারী দত্তের কন্যার তাই এত

উল্লাস। দেশের ছবি, দেশের সঙ্গী, কত খেলা, গঙ্গায় স্নান—আরো কত কি ভাবিয়া দেশের জন্য তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল।

(৩) ফেন রাশি রাশি,………ছড়াইয়া পড়িতেছে। (অ. ৫)

এই অংশটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের বিবরণ-প্রসঙ্গে লেখক এই বর্ণনা দিয়াছেন।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘ পাঁচ মাস বাণিজ্যের পর বিহারী দত্তের বাণিজ্য-বহর দেশে ফিরিতেছে। যাইতে যাইতে পথে ঝড় উঠিল। ক্রমে দুই-একদিনে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পাইল। তখন সমুদ্রে ভয়ানক বিক্ষোভ দেখা দিল। বড বড় ঢেউ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। তারপর সহসা সেই ঢেউয়ের চূড়া ফাটিয়া অজস্র ফেনা বাহির হয়। সেই শুভ্র ফেনপুঞ্জ দেখিতে রাশি রাশি পেঁজা তূলার মতো। সারা সমুদ্রে এই ঢেউ আর ঢেউ-ভাঙা ফেনার ছডাছডি। দেখিয়া মনে হয় রাশি রাশি পেঁজা তূলা যেন সমুদ্রের বুকে ছডাইয়া পডিতেছে।

(৪) বিহারী মরিলে তাঁহার ·····কে আছে বলো দেখি। (অ. ৭)

এই অংশটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক কাহিনীর মধ্যে মাঝিমাল্লাদের উক্তি। বিহারী দত্তের বহর যখন ঝডের মুখে পডে তখন যাত্রীদের সহিত মাঝিদের বচসা চলে এবং সেই প্রসঙ্গে মাঝিরা উদ্ধৃত উক্তি করে।

সেই ভীষণ ঝডের মধ্যে নৌকাগুলি এই ডুবে তো সেই ডুবে। যাত্রীরা ভাবে মাঝিরা ঠিকমতো নৌকা সামাল দিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা বকাবকি করে। একজন বলিল, এই বহরের মধ্যে বিহারী দত্তের মতো বিখ্যাত বদান্য ব্যক্তি আছেন। বহরখানি ডুবিলে বিহারী দত্তও মরিবেন। ফলে বাঙলাদেশ দীন হইয়া পডিবে। তাহার উত্তরে মাঝিরা বলিল যে, বিহারী দত্ত মরিলে আর যা-ই হউক না তাঁহার পরিবার বিপন্ন হইবে না। তাঁহার ধনদৌলত লোকলস্কর সবাই থাকিবে। কিন্তু মাঝিরা এক-একজন এক-একটি পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। তাহারা মরিলে তাহাদের পরিবারগুলি একেবারে জলে পড়িবে। মানুষমাত্রই নিজেকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি। তাহার পর মাঝিরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্বের কথাও ভাবিয়াছে। তাই বিহারী দত্তের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা ও আনুগত্য থাকা-সত্ত্বেও তাহারা উদ্ধৃত উক্তি করিয়াছে।

অবশ্য যাত্রীদের বকাবকির ঝাঁজই তাহাদের মুখে এই কঠোর সত্যটা বাহির হওয়ার অন্যতম কারণ।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'র বিবরণ অনুসরণ করিয়া সমুদ্রে ঝড় ও ঝড়ের মধ্যে বিহারী দত্তের বাণিজ্যবহরের অবস্থা বর্ণনা কর।

উ.। বিহারী দত্ত বালী, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে দীর্ঘ পাঁচমাস বাণিজ্য করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার উনপঞ্চাশখানি নৌকার বিরাট্ বহর। দুই-চারিদিন বেশ কাটিল। সমুদ্র শান্ত ছিল। কিন্তু ··

[ইহার পর **সংক্ষিপ্তসার**-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ হইতে শেষ পর্যন্ত লেখ।]

প্র. ২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক বিবরণটির মধ্যে প্রাচীন বাঙলার মাঝিদের যে পরিচয় আছে তাহা নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। 'সমুদ্রপথে' বিবরণটির মধ্যে একাদশ শতকের বিখ্যাত বাঙালী বণিক্ বিহারী দত্তের সমুদ্রপথে দেশে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী আছে। এই প্রত্যাবর্তনের সময় সমুদ্রে ভীষণ ঝড উঠে। তখন মাঝিরা যেরূপভাবে নৌকাগুলি সামাল দেয় তাহার মধ্যে প্রাচীন বাঙলার মাঝিদের পরিচয় পাই। ঝড়ের মুখে তাহারা নৌকা ঠিক রাখিয়াছে। অবিচলিত ধৈর্য ও দক্ষতায় তাহারা ঢেউয়ের দোলায় নৌকাগুলিকে ভরাডুবি হইতে রক্ষা করিয়াছে। তরঙ্গের বিক্ষোভ যখন ভয়ংকর হইয়া উঠিল, এক-একটা ঢেউ যখন বিশ-ত্রিশহাত উঁচু হইয়া উঠিল, তখন যাত্রীরা ভয় পাইয়াছে। কিন্তু মাঝিরা টলে নাই। কেহ হাল ছাড়ে নাই, কেহ বেচাল হয় নাই। বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও সহজ শক্তিবলে তাহাদের স্নায়ু যেন লৌহদৃঢ়। ঝড়ের বেগ প্রবল হইয়া উঠিলে তাহারা পাল গুটাইয়া ফেলিয়াছে—নচেৎ পালসুদ্ধ নৌকাগুলি তলাইয়া যাইত। এ তাহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয়।

মাঝিদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও স্নায়ুবলের সহিত জড়িত তাহাদের অসীম কর্তব্যপরায়ণতা। বিপদের গুরুত্ব যখন খুব বেশি তখন স্বয়ং বিহারী দত্তের কাতরতাও তাহাদের কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। উদাহরণস্বরূপ, বিহারী দত্ত

স্ত্রী-কন্যার দুর্দশা দেখিয়া যখন বড মাঝিকে ডাকিলেন, তখন হাল ছাডিয়া বড মাঝি নড়ে নাই। বিহারী দত্তকেই আসিতে হইয়াছিল। বিপদের গুরুত্ব বোধ ও দায়িত্বজ্ঞানের ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারপর বড মাঝি ঢেউয়ের উপর তেল ঢালিয়া যেভাবে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শান্ত করিল, তাহা বাঙালী মাঝির গভীর সমুদ্রবিদ্যার পরিচয় দেয়।

সর্বশেষে মাঝিরা মাঝি হইলেও চিরন্তন বাঙালী। কথা-কাটাকাটি আর বচসায় তাহারাও সাধারণ বাঙালীর মতো পটু। সাধারণ বাঙালীর মতোই তাহাদের পরিবার-প্রীতি ও পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ। মনিবের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের অভাব নাই। তাই বলিয়া নিজ নিজ পরিবার ভুলিয়া মনিবের জন্য অনর্থক আত্মবিসর্জনের মিথ্যা মোহও তাহাদের ছিল না। এই মোহমুক্ত স্বাধীনচিত্ততা বাঙালী মাঝির পরম গৌরবময় পরিচয়। তাহারা দেব-দেবতায় বিশ্বাসী—সেইজন্য হয়তো অদৃষ্টবাদীও বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের পুরুষকারের অভাব দেখা যায় না। বিপদের সহিত লড়াই করিয়া বাঁচিবার সংকল্প ও শক্তি ছিল তাহাদের প্রচুর। ইহাই তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

প্র. ৩। "কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশী দরকারী।"—

(ক) এই উক্তি কোন্ প্রসঙ্গে কাহার বা কাহাদের ?

(খ) এই উক্তির আসল বক্তব্য স্পষ্ট কর।

উ.। **২নং ব্যাখ্যা** দেখ।

প্র. ৪। "মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি।"—

(ক) এ কাহার উক্তি ? এখানে কোন্ ঢেউ-এর প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে ? (খ) বক্তা এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারিয়াছিল কি ? পারিলে, সে কিভাবে তাহা করিয়াছিল ?

উ.। (ক) বিহারী দত্তের বাণিজ্যবহরের বড মাঝির এই উক্তি। বিহারী দত্ত বিদেশে বাণিজ্য করিয়া যখন সমুদ্রপথে দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন একদিন ভীষণ ঝড উঠে। ঝড়ের বেগে নৌকাগুলি অত্যন্ত বিপন্ন হয়। বিশ-ত্রিশহাত উঁচু এক-একটা ঢেউ ফুলিয়া উঠে। নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠিয়া নীচে গডাইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বিহারী দত্তের স্ত্রী-কন্যা বমি

করিয়া অস্থির। বিহারী বড মাঝিকে খবর দেন। মাঝি না আসায় দত্ত মহাশয় নিজেই গিয়া বড মাঝিকে এই অবস্থার একটা প্রতিকার করিতে অনুরোধ করেন। মাঝি তখন উদ্ধৃত উক্তি করে।

(খ) বক্তা বড মাঝি এই ঢেউ সত্যই থামাইতে পারিয়াছিল। বিহারী দত্ত স্ত্রী-কন্যার জন্য সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মাঝি তাই তাঁহার সাত-আট লাখ টাকা জলাঞ্জলি দিয়া ঢেউ থামায়। নৌকাগুলির খোলের মধ্যে ছিল বড বড গর্জনতেলের পিপা। বড মাঝির আদেশ পাইয়া একজন নিম্নতর মাঝি-মাল্লাদের সাহায্যে সেই পিপাগুলি গড়াইয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড়ের বেগে পিপাগুলি হইতে সমস্ত তেল গড়াইয়া সমুদ্রে পড়িল। দেখিতে দেখিতে ঢেউ থামিয়া গেল। বাতাসের বেগ যেমন তেমনই রহিল, কিন্তু ঢেউ একেবারেই উঠিল না। এইভাবে বড় মাঝি সমুদ্রের বুকে সেই ভীষণ ঢেউয়ের কবল হইতে বিহারী দত্ত ও তাঁহার সমস্ত বহরটিকে রক্ষা করিল।

প্র. ৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'-শীর্ষক বিবরণটির সম্বন্ধে একটি আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি : লাভালাভ = লাভ + অলাভ। পুরস্কার = পুরঃ + কার। সংস্কার = সম্ + কার।

সমাস : যবদ্বীপ—যব-নামক দ্বীপ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। লাভালাভ—নয় লাভ অলাভ (নঞ্‌তৎপুরুষ); লাভ এবং অলাভ (দ্বন্দ্ব)। ইষ্টদেবতার—ইষ্ট যে দেবতা (কর্মধারয়), তাঁহার। প্রাণপণে - প্রাণ পণ যাহাতে (বহুব্রীহি), সেইরূপে। গলদঘর্ম – গলৎ অর্থাৎ ঝরিতেছে ঘর্ম যে অবস্থায় (বহুব্রীহি—ব্যাখ্যামূলক), তাহা। সাত-আট — সাত বা আট (বহুব্রীহি)। যথাসর্বস্ব—সর্ব (= সকল) স্ব (= ধন)—কর্মধারয়; যথা সর্বস্ব (সুপ্‌সুপা)।

সমস্তপদ-গঠন : গঙ্গায় স্নান = গঙ্গাস্নান। ঠাকুরদের বাড়ি = ঠাকুরবাড়ি। যাহা জানি = যথাজ্ঞান। দর্পণের মতো—দর্পণতুল্য।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ ফলাও—ফল্ + আও। খেলুড়ি—খেল্ + আড়ি = খেলাড়ি > খেলুড়ি। গোঁগোঁআনি—গোঁগোঁ + আনি। চড়ন্দার—চড়ন + দার। পাটাতন—পাটা + তন। ফেনা—ফেন + আ (স্বার্থে)।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগঃ বিহারীর আনন্দ ধরে না—এখানে 'ধরে' ক্রিয়াটির প্রয়োগ বিশিষ্টার্থক, কারণ আনন্দ ধরে না = আনন্দের পরিমাপ হয় না। 'ধরা' ক্রিয়ার এইরূপ আরও বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : সিগারেট বা মদ ধরা, মনে ধরা, ট্রেন ধরা, রোগে ধরা ইত্যাদি।

আমি হাল ছাড়িলে রক্ষা থাকিবে না—এখানে 'হাল ছাড়িলে' বাচ্যার্থে অর্থাৎ সত্য সত্যই (নৌকার) হাল ছাড়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিশিষ্টার্থক প্রয়োগও আছে; যথা—চার বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করিয়া বিশ্বনাথ এতদিনে হাল ছাড়িয়াছে (= হতাশ হইয়াছে)।

বেণেরও মনটা ঠাণ্ডা হইল—এখানে 'ঠাণ্ডা' বিশেষণটির প্রয়োগ বিশিষ্টার্থক (ঠাণ্ডা = শান্ত)।

ঝড় উঠিবে—এখানে 'উঠা' ক্রিয়াটি বিশিষ্টার্থক (আরম্ভ হওয়া)। এইরূপ আরও প্রয়োগ : অম্ল উঠা, মন উঠা, কানে উঠা, জাতে উঠা, চোখ উঠা, দাম উঠা ইত্যাদি।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তনঃ সব দিন সমান যায় না—সব দিন কি সমান যায় (প্রশ্নবোধক)?

মাঝিরা একখানা কাঠের সেঁউতি আগাইয়া দিল,—বেণেবউ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না (যৌগিক)—মাঝিরা একখানা কাঠের সেঁউতি আগাইয়া দিলে বেণেবউ তাহাতে অবিরাম বমি করিতে লাগিলেন (সরল)।

বাতাসের যে জোর সেই জোরই রহিল (জটিল)—বাতাসের জোর পূর্ববৎ রহিল (সরল)।

তাহার সব ডিঙ্গাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে—তাহার সব ডিঙাগুলি সে দূরে দূরে দেখিতে পাইতেছে (বাচ্যান্তর)।

মাঝি বলিল, "ঝড়ে আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় সাত-আট দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি"—মাঝি বলিল যে ঝড়ে তাহাদের বড়োই

উপকার করিয়াছে, তাহারা এক বেলায় সাত-আট দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছে (পরোক্ষ উক্তি)।

কারক ও বিভক্তি : বিহারী সমস্ত 'দ্বীপে দ্বীপে' ঘুরিয়া বেড়াইলেন (প্রথম 'দ্বীপে'-তে অপাদানে -এ, দ্বিতীয়টিতে অধিকরণে -এ)। 'গঙ্গায়' স্নান করিবে (অধিকরণে -এ বা -য়)। তোরা 'আমাদের' ডুবাইলি দেখিতেছি (কর্মে -দের বা -এর। 'ঝড়ে' আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে (কর্তৃকারকে -এ)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ : তদারক, পয়, মিস্‌মিসে, প্রমাদ, ইষ্টদেবতা, গলদ্‌ঘর্ম, দাঁত-কপাটি।

ব্যাকরণগত টীকা : কাজকর্ম—'কাজ' এবং 'কর্ম' সমার্থক বলিয়া এটি দ্বন্দ্বসমাসের উদাহরণ নয় (যদিও কোনো কোনো বৈয়াকরণ ইহাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলিয়াছেন)। এটি সমার্থক শব্দযুগ্মের উদাহরণ।

সবাই বিকাইয়া গিয়াছে—কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ, কারণ 'সব' (সর্বনাম)-কেই 'বিকাইয়া গিয়াছে' ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে হইতেছে, যদিও আসলে ইহা কর্ম।

ত্রাহি—ত্রৈ (রক্ষা করা—সংস্কৃত ধাতু)+লোট্‌ হি। ক্রিয়াপদটি সংস্কৃত হইলেও বাঙলায় বহু প্রচলিত।

চলিত-ভাষায় রূপান্তর : সমগ্র বিবরণটি আধুনিক অর্থাৎ লঘু সাধুভাষায় লিখিত। ইহা হইতে যে-কোনো অংশ তুলিয়া চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে।

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' নামক পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধটি সংগৃহীত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে ভাগীরথীর উৎসস্থলে পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে লেখকের আবাল্য সংস্কারের অন্তর্নিহিত একটা গূঢ়তত্ত্বের মর্ম-উদ্ধার ও

উহার ব্যাখ্যাই মুখ্যরূপে দেখা গিয়াছে। যে যায়, সে কোথায় যায়? নদী যে বহিয়া যায়, ইহা কি চিরতরে চলিয়া যায়? সৃষ্টিচক্রের এই দুর্জ্ঞেয় লীলাসম্বন্ধে লেখকের জিজ্ঞাসা ভাগীরথীর উৎসে গিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। ভাগীরথী ও তাহার উৎস যেন নিমিত্তমাত্র; একটা গভীর তত্ত্ব-উপলব্ধিই এই প্রবন্ধের মুখ্যবিষয়। অতএব ইহা একটা Adventure-কাহিনী নহে, এবং সেই কারণে ইহার নাম 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধান' না হইয়া 'সন্ধানে' হওয়ায় তাৎপর্যময় হইয়াছে। এইরূপ নামকরণ দ্বারা লেখক ভাগীরথীর উৎস-সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ দিবার দায়িত্ব স্বীকার করেন নই। উহার উৎসের সন্ধানে বাহির হইয়া তাঁহার যে পরম অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তিনি যে অন্যতর সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্যেও পাওয়া যাইতে পারে।

সমালোচনা—ভাগীরথীর উৎস সম্বন্ধে যে একটা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে, উহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। লেখক কাহিনীটিকে রূপকহিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে উহার অভ্যন্তরে একটি সত্য নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই রূপকথার রাজ্যের বৃত্তান্ত; সর্বত্রই তাহা বাস্তবসত্যের উপর রূপকের আবরণমাত্রই নহে। তাহাদের সত্যাসত্য বিচার সাধারণতঃ বাস্তবের মাপকাঠি দিয়া চলিতে পারে না। সেইজন্য লেখক যদিও ভাগীরথী-সম্বন্ধে কাহিনীর অংশতঃই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি তাহা যথাযথ বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা লাভ করে নাই।

বস্তুতঃ এই প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নহে। লেখক বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনি সেইসঙ্গে অতিশয় কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুকও বটেন। দৃষ্টি তাঁহার স্বভাবতঃই যুক্তির পথ ধরিয়া চলিতে চাহে। কিন্তু কল্পনা এই নিয়মনির্দিষ্ট বাঁধা-খাত ছাড়িয়া মহাশূন্যে পাখা মেলে। মানুষের বুদ্ধির সোপান বাহিয়া যতটুকু উঠা যায় তাহার উপরেও একটি বিরাট্ অব্যক্ত রাজ্য পড়িয়া রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের রসকুতূহলী মন সেই রাজ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য-উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছে। সাদা চোখে দেখিলে যাহা অতিশয় সরল একটি ভৌগোলিক ঘটনা বলিয়া মনে হয়, তাহাই শিল্পীর নিকটে পরম বিস্ময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে সেইজন্যই লেখকের এত বিস্ময়। এই কারণেই তিনি

তাহার অপরূপ সৌন্দর্য ও বিচিত্র রূপ নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি নিছক শিল্পীই নহেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। দৃশ্যকে তিনি নির্লিপ্ত দ্রষ্টারূপে দেখিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না—ভাগীরথীর উৎস তাহার সকল বৈচিত্র্য লইয়াও তাঁহার সমগ্র মনোযোগ অধিকার করিয়া বসিতে পারে। ইহার সম্বন্ধে সুপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীটির কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইবার জন্য তাঁহার কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। দার্শনিকের ন্যায় তাই তিনি বিজ্ঞানের প্রদেশের বাহিরে 'অব্যক্তের' রাজ্যে একটা মীমাংসা পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। 'শিব ও রুদ্র! রাক্ষস ও সংহারক!' —ইহার তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার—লেখকের বাড়ি গঙ্গার নিকটেই অবস্থিত ছিল। বাল্য-কাল হইতেই নদীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিভিন্ন ঋতুতে এবং জোয়ার-ভাঁটায় নদীর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল ইহা একটি চেতন ও দ্রুত-পরিবর্তনশীল প্রাণী। ইহার কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে তিনি অনেক কথাই শুনিতে পাইতেন। নদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন, সে আসিয়াছে মহাদেবের জটা হইতে। তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত। একবার এই নদীর তীরেই লেখক তাঁহার এক প্রিয়জনের দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? নদীর কুলুকুলু ধ্বনির মধ্য হইতে ইহার উত্তর আসিল,—"মহাদেবের পদতলে। আমরা যথা হইতে আসি তথায় ফিরিয়া যাই।"

একদিন লেখকের ইচ্ছা হইল গঙ্গার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিবেন। উত্তর-পশ্চিমে তুষারাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া তিনি বহু গিরিগহন অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বন্ধুর পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে সম্মুখে একটি বিরাট্‌কায় শৃঙ্গ পড়িল। নিম্নে রজতসূত্রের ন্যায় গঙ্গার ক্ষীণ রেখা দৃশ্যমান। এই শৃঙ্গে উঠিতে পারিলেই এই ক্ষীণরেখার আরম্ভ কোথায় দেখা যাইবে। লেখক দ্বিগুণ উদ্যমে শৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন। উপরে উঠিতেই দুইটি তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ দেখা গেল—একটি নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল। নন্দাদেবীর প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া লেখক তাহাকে মাতৃরূপিণী পৃথিবী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। ইহার নিকটেই মহাদেবের ত্রিশূল। এই ত্রিশূল আকাশ, মর্ত্য ও পাতাল—এই

ত্রিভুবনকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। লেখক বুঝিলেন, এই ত্রিশূলই স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক। পথপ্রদর্শকের নির্দেশমতো বহু গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া তিনি বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার ক্ষীণধারার ক্ষীণ শব্দ এখানে আর শুনা গেল না। এই তুষারক্ষেত্র বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের স্ফটিকনির্মিত একটি স্থিরমূর্তির ন্যায় পরম রমণীয়। এইস্থান হইতে দেখা গেল, দূরে পর্বতশ্রেণীর গলিত তুষার আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিম্ন-উপত্যকায় পড়িতেছে। বহুকষ্টে লেখক এই তুষারনদী অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলেন। একস্থানে আসিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে পতনশীল তুষারপর্বতের বজ্রনির্ঘোষ। জলপ্রপাতগুলি হইতে জল পড়িতেছে। সমগ্র বনস্থলী যেন পূজাপ্রাঙ্গণ। যে কুয়াশা এতক্ষণ নন্দাদেবী ও ত্রিশূলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সরিয়া গিয়া শূন্যে আশ্রয় লইয়াছে। নন্দাদেবীর শীর্ষদেশে এক অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি এবং তাহা হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্ দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছে। লেখক বুঝিলেন, এই ধূম্রপুঞ্জই মহাদেবের জটা। এইস্থানেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের রূপ পাশাপাশি দেখিয়া তিনি ইহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলেন।

বারিকণা পর্বতমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা বিদীর্ণ করিতেছে এবং ভগ্ন পর্বতকে পর্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নে লইয়া যাইতেছে। ঘর্ষণের ফলে প্রস্তররাশি চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণার মিলনে যে জলধারা রচিত হইয়াছে তাহাই এই প্রস্তরচূর্ণ স্রোতোবেগে লইয়া গিয়া সাগরে মিশিয়াছে। যাইবার পথে এই পর্বতের অস্থিচূর্ণ উভয়পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডকে উর্বর ও বৃক্ষলতায় শ্যামল করিয়া তুলিতেছে। বারিকণাগুলি বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিয়া মৃত ও পরিত্যক্ত সকল দ্রব্য সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে এবং এইরূপে সমুদ্রের মধ্য হইতে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া বারিকণাগুলি আবার আভ্যন্তরীণ উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয় এবং এই রুদ্ধবাষ্প পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতরূপে বাহির হইয়া আসে। ইহার ফলে ভূকম্পন হয়, কতক ভূভাগ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন ভূভাগের সৃষ্টি করে। সমুদ্রস্থ বারিকণাগুলি সূর্যতাপে বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুবেগে পর্বতাভিমুখে চলে এবং মহাদেবের বিপুল জটার মধ্যে আশ্রয় লয়। আবার তাহারা তুষারকণার আকারে পর্বতের উপর পতিত হয়।

তাহাদের এই আসা-যাওয়া অবিরাম চলিতেছে। লেখক নদীকে প্রশ্ন করিলে এখনো শুনিতে পান, সে আসিয়াছে মহাদেবের জটা হইতে। কিন্তু এই সত্য এখন আর তাঁহার নিকট দুর্বোধ্য নহে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১-২। বাড়ির নিম্নেই—বাড়ীর পাশ দিয়াই। লেখক, তাঁহার পিতা যখন কাটোয়ায় ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ের কথা বলিতেছেন। সখ্য—বন্ধুত্ব। বৎসরে এক সময়ে—বর্ষাকালে। **বারিপ্রবাহের পরিবর্তন**—জলধারার পরিবর্তন অর্থাৎ কখনো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠা, কখনো বা শীর্ণকায় হওয়া। **অতি পরিবর্তনশীল জীব**—যে প্রাণী অবিরাম দ্রুতগতিতে বদলাইয়া যাইতেছে। **ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত**—নারদের অনুরোধে মহাদেব সংগীত আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহা শুনিয়া গলিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গানামে খ্যাত। ইহার বহুকাল পরে কপিলমুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভগীরথ পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতনকালে দেবাদিদেব মহাদেব ইঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন এবং পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিন্দুসরোবরে ত্যাগ করেন। সেখান হইতে গঙ্গার সপ্তধারার একটি ধারা ভগীরথের পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন এবং ভাগীরথীনামে খ্যাত হইলেন। **স্মৃতিপথে উদিত হইত**—মনে পড়িত। চিরাভ্যস্ত—বহুকাল-পরিচিত। **মহাদেবের জটা হইতে**—ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ হইতে উৎপন্ন গঙ্গার ধারা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আসিয়া পতিত হইল, তারপর সেখান হইতে মর্ত্যে পতিত হইবার সময় সে বিপুল বেগ কে ধারণ করিবে? মহাদেব তাঁহার বিপুল জটাজালমণ্ডিত মস্তক পাতিয়া গঙ্গার ধারাকে ধারণ করিলেন। সেই জটামধ্যে ষাট হাজার বৎসর গঙ্গা ঘুরিতে লাগিলেন, বাহির হইবার পথ পাইলেন না। ভগীরথ পুনরায় মহাদেবের স্তব আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া জটাবন্ধন হইতে গঙ্গাকে মুক্তি দিলে পর গঙ্গা পৃথিবীতে প্রবাহিত হইলেন। ইহাই পৌরাণিক কাহিনী—লেখক ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরে দিয়াছেন।

অ. ৩-৬। **পার্থিব অবশেষ**—প্রাণহীন দেহ। মানুষের মৃত্যু হইলে দেহমধ্যস্থ আত্মা ঊর্ধ্বগামী হয়, পৃথিবীতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা মৃতদেহ। **বাৎসল্যের বাসমন্দির**—স্নেহের আধার, যে দেহের মধ্যে স্নেহ বাস করিত। অনুপ্রাস লক্ষণীয়। অজ্ঞান—যাহা জানা যায় নাই। অজ্ঞেয়—যাহা জানা যায় না। **যে যায় সে তো আর ফিরে না**—তুলনীয়ঃ "The undiscovered country from whose bourne no traveller returns" —*Shakespeare.* প্রবাস—বিদেশে বাস। উৎস—উৎপত্তিস্থান। **মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি**—জগতের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এই প্রশ্নটির সদুত্তর বাহির করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং বোধ হয় এই প্রচেষ্টার ফলেই জগতের সমুদয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ধর্মের উৎপত্তি। লেখক এইখানে নদী-প্রবাহের সঙ্গে জীবন-প্রবাহের তুলনা করিয়া এই কূটপ্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নদীর জলধারার ন্যায় জীবনধারাও মৃত্যুর মধ্যে শেষ হইয়া যায় না, জীবন ও মৃত্যু পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে আবর্তিত হইতে থাকে, এবং এই চক্র-আবর্তনের কোনো আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি নাই। **আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ**—আমার জীবনের উপর একটা নিবিড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছ।

অ. ৭-১০। তুষারমণ্ডিত—বরফে আচ্ছন্ন। **জাহ্নবী**—গঙ্গা। ভগীরথের সহিত মর্ত্যে আসিবার পথে গঙ্গা জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া যান। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া জানু বিদারণ করিয়া (মতান্তরে কর্ণপথে) তাঁহাকে মুক্তি দেন। সেই হইতে গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয় হইয়া জাহ্নবীনামে খ্যাত হন। জনপদ—নগর বা লোকালয়। বিজন—নির্জন স্থান। **পুরাণকথিত**—পুরাণে বিখ্যাত বা উল্লিখিত। **সরযূনদী**—ইহারই তীরে অযোধ্যানগরী অবস্থিত ছিল। গিরিগহন—পার্বত্য অরণ্য। বন্ধুর—অসমতল, উঁচুনিচু। **অভ্রভেদী**—মেঘলোকেরও ঊর্ধ্বপ্রসারী, গগনস্পর্শী। অভীষ্ট—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্থাৎ গঙ্গার উৎপত্তিস্থান দর্শন। রজতসূত্র—রূপার সুতা। **নন্দাদেবী, ত্রিশূল**—হিমালয়ের দুইটি শৃঙ্গ।

অ. ১১-১২। অপসৃত হইল—সরিয়া গেল। অনন্তপ্রসারিত—

দিগন্তবিস্তৃত। গরীয়সী—গৌরবময়ী। মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত—মহাদেবের হস্তে ত্রিফলাযুক্ত যে অস্ত্র তাহার নাম ত্রিশূল। এস্থলে ত্রিশূল-অভিহিত একটি বিখ্যাত তুষার-শিখরকে লেখক মহাদেবের ত্রিশূলরূপে কল্পনা করিতেছেন। নন্দাদেবী-নামক অপর একটি শিখরের নিকটেই ইহা অবস্থিত। **ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত**—ত্রিশূল-নামক বিখ্যাত তুষার-শিখরকে লেখক মহাদেবের ত্রিশূলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া এই শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিতেছে—যেন ত্রিলোকবেধী অক্ষরূপে সৃষ্টিরক্ষা করিতেছে। মহাদেব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা—স্থিতিকালে শৃঙ্গরূপ এই ত্রিশূলদ্বারা সংহত করিয়া যেন ত্রিভুবন রক্ষা করিতেছেন। গ্রথিত—গাঁথা। আয়ুধ—অস্ত্র। সাকাররূপে—প্রত্যক্ষভাবে, মূর্তিমদ্‌ভাবে। **স্থিতি**—সৃষ্ট জগতের রক্ষা।

অ. ১৩-১৬। **তুষারনদী**—চলমান বরফের রাশি। পর্বতের চির-তুষারাচ্ছন্ন উচ্চশিখরে ক্রমাগত বরফের পর বরফ জমিতে জমিতে খুব ভারী হইয়া পড়ে এবং নিজের ভারেই তাহা নীচের দিকে গড়াইয়া নামিতে থাকে। ইহার নাম তুষারনদী বা হিমবাহ (glacier)। তুষারনদী অতি মন্থর গতিতে চলে এবং পাহাড় কাটিয়া পথ করিয়া লয়। এইভাবে কিছুদুর নামিয়া আসিবার পর ক্রমশঃ উত্তাপ পাইয়া হিমবাহ গলিতে আরম্ভ করে এবং নদীর সৃষ্টি হয়। গিরিসংকট—পর্বতের উপরিস্থিত দুর্গম স্থান। কল্লোলিনী—কুলকুল ধ্বনিকারিণী নদী। ঐন্দ্রজালিক—জাদুকর। উর্মিমালা—তরঙ্গসমূহ। প্রস্তরীভূত—প্রস্তরে পরিণত। **তিষ্ঠ**—(সংস্কৃত ক্রিয়া) থাক, থাম। মহাশিল্পী—শ্রেষ্ঠ স্থপতি। **স্ফটিক**—একপ্রকার স্বচ্ছ প্রস্তর। সংক্ষুব্ধ—তরঙ্গসংকুল। **কোন মহাশিল্পী যেন** ইত্যাদি—লেখক যে তুষারক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায়। সমুদ্রের ঢেউ গতিশীল, কিন্তু এই তুষারক্ষেত্রে সব-কিছুই নিস্তব্ধ ও অচঞ্চল এবং স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র। তাই লেখক কল্পনা করিয়াছেন যে এই নিশ্চল সমুদ্র যেন কোনো নিপুণ শিল্পীর রচনা। উত্তুঙ্গ—অতিশয় উচ্চ। ভৃগুদেশে—সানুদেশ। বঙ্কিম—আঁকা-বাঁকা। কুজ্ঝটিকা—কুয়াশা। যবনিকা—আবরণ। **ধবলগিরি**—নেপাল রাজ্যের প্রান্তে অবস্থিত হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলির অন্যতম। দুরারোহ—যাহাতে আরোহণ করা অতি কষ্টকর। **যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি, বায়ুস্তর** ইত্যাদি—ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। যত উপরে উঠা যায় বাতাস ততই লঘু হইতে থাকে। দেবধূপ—

দেবপূজার জন্ত ধূপ। এই উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ হইতে বহুদূরে থাকায় সম্পূর্ণরূপে মালিন্তশূন্ত এবং এই নির্মল বায়ুমণ্ডলের যেন মৃদু অথচ মনোরম সৌরভ আছে ; লেখক এই সৌরভকে দেবতাদিগের ধূপগন্ধ বলিয়া মনে করিতেছেন। **লক্ষণীয় :** ভৌগোলিক পরিবেশকে লেখক অতি কৌশলে পৌরাণিক পরিবেশের সহিত মিলাইবার জন্ত দেবপূজার উপযুক্ত পবিত্র আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া লইতেছেন। সৌরভ—সুগন্ধ (বিশেষ্য)। হতচেতনপ্রায়—প্রায় সংজ্ঞাহীন।

অ. ১৭-১৯। বনস্থলী—বনরাজ্য। **স্থলী**—অকৃত্রিম ভূমি। **পারিজাত**—স্বর্গের নন্দনকাননে পাঁচটি দেবতরুর অন্যতম। স্বতঃ—নিজেরাই, স্বেচ্ছায়। বজ্রনিনাদ—ভীষণ শব্দ। পুলকিত—আনন্দে রোমাঞ্চিত। **ভাস্বর**—উজ্জ্বল। **দুর্নিরীক্ষ্য**—যাহার দিকে তাকানো যায় না। এই কি মহাদেবের জটা ?—নন্দাদেবী-নামক হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের উপরিভাগ বেষ্টন করিয়া সূক্ষ্ম-বাষ্পকণারচিত এক ভাস্বর পরিমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক তাহাকে মহাদেবের জটারূপে কল্পনা করিতেছেন। মহাদেবের জটা হইতে ভাগীরথী নির্গত—ইহা পৌরাণিক কাহিনী। এই ভাস্বর বাষ্পজাল গঙ্গার প্রকৃত উৎস। তাই তাহাকে মহাদেবের জটারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। চন্দ্রাতপ—চঁদোয়া, উৎসবাদিতে ব্যবহৃত চন্দ্রচিহ্নিত বৃহৎ আচ্ছাদনবস্ত্র। ত্রিশূলাগ্র—ত্রিশূল নামক শৃঙ্গের চূড়া। রুদ্র—ধ্বংসের দেবতা। **শিব ও রুদ্র**—পুরাণে কথিত আছে, মহাদেব শান্ত শিবমূর্তিতে পৃথিবীকে রক্ষা করেন, মঙ্গলবিধান করেন এবং উগ্রমূর্তিতে পৃথিবীতে প্রলয় সাধন করেন। **মহাচক্র-প্রবাহিত**—বৃহৎ চক্রের ন্যায় আবর্তনশীল ধারায় অবস্থিত (in a stream moving in a cylic fashion)।

অ. ২০-২৩। হিমাণুরূপ—শিশিরকণার মতো। অণুপ্রমাণ—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। উপলস্তূপ—প্রস্তরের স্তূপ। উভয়তঃ—দুইদিকে। সরিৎ—নদী। পর্বতের অস্থিচূর্ণ—প্রস্তরকণিকা। পর্বতকে জীবরূপে কল্পনা করিলে কঠিন পাথরগুলিই তাহার অস্থি।

অ. ২৪-২৯। **নূতন রাজ্য**—নূতন ভূমিভাগ, ব-দ্বীপ প্রভৃতি। বিতাড়িত হইয়া—আলোড়িত হইয়া। বেলাভূমি—তীরভূমি। **পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে**—পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নিতে। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হইলেও

উহার অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত। আহুতি—যজ্ঞের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য। বিদারণ করিয়া—ভেদ করিয়া। অগ্ন্যুদ্গার—অগ্ন্যুৎপাত। অশনি—বজ্র। তুহিনাকারে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণারূপে।

ব্যাখ্যা

(১) যে যায় সে তো আর……"মহাদেবের পদতলে"! (অ. ৩-৪)

'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'-শীর্ষক প্রবন্ধের এই অংশটিতে লেখক জগদীশচন্দ্রের একটা তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিবৃত হইয়াছে।

মহাদেবের জটা হইতে ভাগীরথীর অবতরণ-বৃত্তান্ত লেখকের বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। আবাল্য তিনি নদীর কলধ্বনির মধ্যে তাহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে একই উত্তর শুনিতে পাইতেন—"মহাদেবের জটা হইতে"। নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানিয়াও এবং নিজে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক হইয়াও লেখকের নিকট বিষয়টি রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়। কারণ, সৃষ্টি ও লয়, উৎপত্তি ও বিনাশ —এই দুইটি প্রশ্ন লেখকের নিকট অবিচ্ছেদ্য সমস্যারূপে দেখা দেয়। পৌরাণিক কাহিনীটির মধ্যে একহিসাবে ইহার একটা মীমাংসা আছে। মহাদেবের জটা হইতে যাহার উৎপত্তি, মহাদেবের পদতলেই তাহার লয়। রক্ষক ও সংহারক একাধারে কল্পিত। কিন্তু বিজ্ঞান এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ। তাই এক প্রিয়বন্ধুর বিয়োগান্তে লেখকের নিকট প্রশ্নটি পুনরায় দুর্জ্ঞেয় হইয়া দেখা দিয়াছিল। এই যে তাঁহার বন্ধুর মৃত্যু হইল, তাহার অর্থ কি এই যে তিনি অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হইলেন? নদীপ্রবাহ যেমন আপাতদৃষ্টিতে কেবল চলিয়াই যায়, ফিরে না—মানুষও কি সেইরূপ জীবনধারা বাহিয়া চিরতরে চলিয়া যায়? মৃত্যুতেই এইভাবে মানুষের শেষ কিনা, শেষ হইলে বা না হইলে মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়, এই জিজ্ঞাসা লেখকের হৃদয়ে এক তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। নদীর নিকট হইতেই আবার ইহার একটা অতীন্দ্রিয় উত্তরও তিনি পাইয়াছিলেন—"মহাদেবের পদতলে"। অর্থাৎ ভাগীরথীর ন্যায় মানুষও যাহার মধ্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতেই লয় পায়। মহাদেব একাধারে এক সৃষ্টি ও লয়ের প্রতীক।

(২) এই ত্রিশূল............এই মহাস্ত্রে গ্রথিত ! (অ. ১১)

এই অংশটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। ভাগীরথীর উৎসে যাইবার পথে লেখক হিমালয়ের উত্তুঙ্গ প্রদেশে দুইটি শিখর দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহাদের একটির নাম ত্রিশূল। এই অংশে তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে।

এই শিখরটি যেন পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গমর্ত্যপাতাল এই ত্রিভুবনকে বিদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। মহাশূন্য পর্যন্ত উহা উন্নতশীর্ষ—যেন কল্পিত স্বর্গধাম পর্যন্ত উহা ভেদ করিয়াছে। অতএব সূত্র যেমন ফুলরাশি গ্রথিত করিয়া একত্র বদ্ধ রাখে, উহা সেরূপ ত্রিভুবনকে একত্র রাখিয়াছে। উহার বিহনে ত্রিভুবন যেন আলাদা হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। লেখকের নিকট তাই উহা স্থিতির আয়ুধরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু এই ত্রিশূল প্রলয়কালে রুদ্রের হস্তে সংহারাস্ত্ররূপে কল্পিত হইয়া থাকে। লেখক ইহাকে সেই ত্রিশূলের সাকার রূপহিসাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং একই বস্তুর সহিত স্থিতি প্রলয়ের কল্পনা জড়িত করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন। রক্ষক ও সংহারক এক ও অভিন্ন—লেখক ইহাই প্রতিপন্ন করিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন।

(৩) এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে···তাহা পরে বুঝিলাম। (অ. ১২)

এই অংশটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের লিখিত 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ প্রদেশে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল নামক দুইটি শিখর দেখিয়া লেখকের যে তত্ত্বোপলব্ধি হইয়াছিল, এই অংশে তাহারই পূর্বাভাস রহিয়াছে।

নন্দাদেবী লেখকের নিকট ধরিত্রীরূপে প্রতীয়মান হইল। ইহা যেন পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-সংবলিত এই বিরাট্ সৃষ্ট জগতের প্রতীক। মাতা যেমন সন্তানসন্ততি পরিবৃত একটি সংসারের প্রতীক, ইহাও তেমনি সমগ্র জগতের মাতৃমূর্তি। ইহা হইতেই মাতার স্তন্যধারার ন্যায় নদীধারা প্রবাহিত। এই নন্দাদেবীর পার্শ্বেই রহিয়াছে ত্রিশূল। ইহাও যেন মহাদেবের হস্তে কল্পিত ত্রিশূলের সাকার রূপ। পাতাল হইতে উঠিয়া, মর্ত্য ভেদ করিয়া ইহা মহাশূন্যকেও বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সূত্র যেরূপ ফুলদল গাঁথিয়া রাখে, ইহাও সেরূপ স্বর্গমর্ত্যপাতাল এই ত্রিভুবনকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা না

থাকিলে ত্রিভুবন যেন আলাদা হইয়া ভাঙিয়া পড়িত। কাজেই ইহা স্থিতির প্রতীক। কিন্তু কল্পিত ত্রিশূল মহাদেবের সংহার-অস্ত্রও বটে। এই বাস্তব ত্রিশূলের মধ্যেও যে ধ্বংসের শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, লেখক পরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উহার উপর জটাজালের ন্যায় পুঞ্জীভূত হইয়া যেসকল বারিকণা বিরাজ করে, তাহারা নিজেরাও যেরূপ নদীর ধ্বংসাবেশেষ, পৃথিবীর অন্যতর বহু ধ্বংসলীলারও সেরূপ তাহারা কারণ। সুতরাং ধ্বংসের প্রচ্ছন্ন রূপও সেই ত্রিশূলের মধ্যে বিদ্যমান। লেখক তাহা পরে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এক ও অভিন্ন।

[ত্রিশূল—ইহার উপর টীকা লেখ।]

(৪) ক্রমে দেখিলাম,····· রচনা করিয়া গিয়াছেন। (অ. ১৪ ; ক. বি, ১৯৪১, ১৯৪৮)

এই অংশটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। এস্থলে লেখক হিমালয়ের অতি-উচ্চপ্রদেশে তুষারক্ষেত্রের একটি মনোরম চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

হিমালয়ের যতই ঊর্ধ্বে উঠা যায় ততই নদীরেখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে দেখা যায়। অবশেষে তুষারক্ষেত্রে নদীর জলধারা জমাট তুষাররূপে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবহমান নদীর কলধ্বনি সেখানে নাই। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই অপরূপ তুষারক্ষেত্র একটা স্থিরদৃশ্য। কিন্তু সেই তুষার মসৃণ ও সমতল নহে, উচ্চনীচ হইয়া ছোট ছোট তরঙ্গের ন্যায় তাহা দিগন্তবিস্তৃত। নিম্নে তরল প্রবাহে যাহা লীলাচঞ্চল ঊর্মিমালারূপে স্পন্দমান, এইখানে যেন মন্ত্রবলে তাহাই সহসা নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। 'তিষ্ঠ' বলিয়া এক সম্মোহন শব্দদ্বারা কেহ যেন তাহাদিগকে স্থির করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ দৃশ্যটি এতই মনোরম যে উহা যে নিতান্ত নৈসর্গিক তাহা মনে হয় না। মনে হয় কোনো এক সুনিপুণ ভাস্কর এই স্থানে স্ফটিক ক্ষোদিত করিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা এতই শুভ্র যে বিশুদ্ধ স্ফটিকদ্বারা যেন ইহা নির্মিত। কিন্তু এই বিশাল দৃশ্যরচনার জন্য এত স্ফটিকই বা কোথা হইতে আসিল ? লেখক কল্পনা করিয়াছেন, বিশ্বের সকল স্ফটিক আনিয়া যেন উহা রচিত হইয়াছে। এতই বিশাল ও মনোরম সেই দৃশ্য।

(৫) তখন কণাগুলি একে ......নির্মাণ করি।" (অ. ১২ ; ক. বি. ১৯৪৪)

এই অংশটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। লেখক বারিকণাগুলির মুখ দিয়া, তাহারা কিরূপে নূতন নূতন ভূমিভাগ গড়িয়া তোলে সেই ভৌগোলিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন।

বাষ্পীভূত বারিকণাগুলি বায়ুতাড়িত হইয়া পর্বতশিখরের উচ্চতম প্রদেশে তুহিনাকারে অবস্থান করে। পরে তাহারা হিমবাহরূপে নিম্নে অবতরণ করিয়া হিমরেখায় বিগলিত হইয়া প্রবাহের সৃষ্টি করে। তখন বারিকণা পর্বত-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে এক-একটি শিখরকে ভাঙিয়া ফেলে এবং ক্রমশঃ খরস্রোতা নদীরূপে আপন পথে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলে। এই ভগ্ন-শিখরের প্রস্তরসমূহ ঘর্ষণে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে পরিণত হয়। দেহের মাংসের আবরণ নষ্ট হইয়া গেলে যেমন কেবল অস্থি পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই শিখরদেহ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার অস্থিস্বরূপ প্রস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে পরিণত হয়। তখন উহাদের লইয়া বারিকণা নূতন সৃষ্টির জন্য মাতিয়া উঠে। শিখরকে যাহারা ধ্বংস করিয়াছে তাহারাই আবার সৃজনে লাগিয়া যায়। শিলাখণ্ডগুলি পরস্পর ঘর্ষণে আরো ক্ষয় পাইয়া পলিতে পরিণত হয় এবং এই পলিমাটি দিয়া নূতন স্থলভাগ সৃষ্ট হয়, নদীর উভয় তীর উর্বর হইয়া উঠে, সমুদ্রের মোহনায় জাগিয়া উঠে নূতন নূতন ভূভাগ।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ নদী?" নদী উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"—ইহার তাৎপর্য আলোচনা কর।

উ.। পুরাণে কথিত আছে ভাগীরথীর উৎপত্তি মহাদেবের জটা হইতে। মহাদেবের সংগীত শুনিয়া বিগলিত বিষ্ণুপদ গঙ্গারূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থান করেন। কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতনকালে দেবাদিদেব মহাদেব ইহাকে স্বীয়

জটাজালে ধারণ করেন এবং পরে ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মুক্তি দেন—ইহাই সংক্ষেপে গঙ্গানদীর উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী। বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধের পুরাণবর্ণিত এই কাহিনীটির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রবন্ধটি বিজ্ঞান ও পুরাণের সমন্বয়।

লেখক বাল্যে শুনিয়াছিলেন, ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার জটাজালাশ্রয়ী গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাই তিনি যখন নদীর নির্জন তীরে গিয়া বসিতেন, তখনই তাঁহার মনে হইত নদী যেন তাহার কলধ্বনির মধ্য দিয়া বলিতেছে—সে মহাদেবের জটা হইতে আসিয়াছে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের গল্পটির মধ্যে সত্য রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাই একদিন তিনি নদীতীরে যাইয়া বলিলেন, "নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।" তারপর তিনি ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের জন্য বাহির হইলেন। বহু কষ্টে হিমালয়ের নানা দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি নন্দাদেবী ও ত্রিশূল-নামক দুইটি তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। এক তুষারনদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনি দেখিলেন, নন্দাদেবীর শীর্ষের উপর এক অতি বিপুল জ্যোতি বিরাজ করিতেছে। এই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্যে লেখকের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এতদিন পরে তিনি পুরাণবর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলেন। ত্রিশূল নামক শৃঙ্গকে তিনি মহাদেবরূপে এবং সেই ধূমরাশিকে মহাদেবের জটারূপে বুঝিতে পারিলেন। সূর্যতাপে বাষ্পীভূত সমুদ্রজল বায়ু-তাড়িত হইয়া উচ্চ পর্বতশিখরের প্রতি ধাবিত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আকারে তথায় অবস্থান করে। এই মেঘপুঞ্জকেই পুরাণকার মহাদেবের জটা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই জটাশ্রয়ী বারিকণাসমূহ তুহিনাকারে পর্বতশীর্ষে পড়ে এবং এই স্তূপীকৃত তুহিন পর্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নে যাইয়া তুষারনদীর সৃষ্টি করে। এই তুষারনদী দ্রব্য হইয়া প্রথমে ক্ষীণধারায় এবং পরে প্রশস্ত হইয়া নানা জনপদ ও দেশের মধ্য দিয়া বহিয়া সমুদ্রে পড়ে। সুতরাং মহাদেবের জটাই ভাগীরথীর প্রকৃত উৎস।

প্র. ২। "নদী, আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"—এই কথাটি কাহার? লেখক নদীর উৎস-সন্ধানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বিবৃত কর।

উ.। উদ্ধৃত কথাটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধে গঙ্গানদীর প্রতি লেখকের উক্তি।

লেখক বাল্যকাল হইতেই গঙ্গার তীরে বসিয়া নদীকে প্রশ্ন করিতেন, 'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ'। নদীর কলগানের মধ্যে দিয়া তিনি যেন উত্তর পাইতেন, 'মহাদেবের জটা হইতে'।

[ইহার সহিত **সংক্ষিপ্তসারের** ২য় অনুচ্ছেদ যোগ কর]

প্র. ৩। "শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম।"—বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়া দৃষ্টান্তসহ অর্থটি বুঝাইয়া দাও। (ক. বি. ১৯৪৩)

উ.। ভাগীরথীর মর্ত্যে অবতরণ-সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীটি লেখকের মনোরাজ্যে একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবাল্য তাঁহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে ভাগীরথী মহাদেবের জটা হইতে আসিয়াছে এবং বহু জনপদ গিরিকান্তার অতিক্রম করিয়া উহা আবার মহাদেবের পদতলেই ফিরিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ তিনি তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

পরিণতবয়সে লেখক যখন ভাগীরথীর সত্যকার উৎসে যাইয়া উপস্থিত হন তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন, সৃষ্টি ও লয়ের রূপ একাধারেই বিদ্যমান। ভাগীরথী যেস্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে সেইস্থানেই গিয়া আবার লয় পাইতেছে। অতএব যাহার মধ্যে সৃষ্টি তাহার মধ্যেই লয়, অর্থাৎ রক্ষক ও সংহারক যে একই আধারে বিরাজ করিতে পারে—এই পরম তত্ত্বের তিনি মর্মোদ্ধার করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল নামে দুইটি শিখর দণ্ডায়মান—একটি মাতৃরূপিণী ধরিত্রী, অপরটি মহাদেবের ত্রিশূলরূপে যেন ত্রিভুবন গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। পাশাপাশি অবস্থিত এই দুইটি শিখরের যে রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন সৃষ্টি ও স্থিতির রূপ। নন্দাদেবীর মৌলিমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া এক ভাস্বর জ্যোতিঃপুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। তাহা হইতে অনবচ্ছিন্ন ধূমরাশি নির্গত হইয়া জটাজালের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়াছে।

এই প্রদেশেই ভাগীরথীর উৎপত্তি। লেখক এইবার বুঝিতে পারিলেন যে, এই জটাসন্নিভ ধূমপুঞ্জই রূপক হইয়া মহাদেবের জটা বলিয়া অভিহিত হয়। উহা হইতেই ভাগীরথী মর্ত্যে প্রবাহিত।

এই ভাগীরথী আবার সেই উত্তুঙ্গপ্রদেশ হইতে তুষারক্ষেত্র বাহিয়া, বহু জনপদ-অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে পতিত হইতেছে। প্রবাহকালে কণা কণা প্রস্তরখণ্ড লইয়া পথে কত নূতন নূতন ভূমি, কত উর্বর জনপদ গড়িতেছে। সর্বত্রই এই বিচিত্র সৃষ্টির লীলা চলিয়াছে। সংখ্যাতীত বারিকণা-গঠিত ভাগীরথীর এই জলধারা অবশেষে সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন করিতেছে এবং পুনরায় বাষ্প অবস্থায় বাত্যাবিতাড়িত হইয়া সেই উৎসস্থল হিমালয়শীর্ষ ধূমপুঞ্জের রূপে লয় পাইতেছে। কখনো বা এই বাষ্পীভূত বারিকণা বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীবক্ষ হইতে নানা বস্তু ধৌত করিয়া নিয়া সাগরগর্ভে বিচিত্র দেশ রচনা করিতেছে। কখনো বা তাহারা আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটাইয়া সংহারলীলায় সহায়তা করিতেছে। ভাগীরথীর উৎস হইতে প্রবাহ এবং তথায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এইভাবে কতই না সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলা চলিতেছে। যে বারিকণা সৃষ্টির কারণ তাহাই আবার সংহারের পরোক্ষ হেতু এবং উহার যাহা উৎস তাহাই আবার লয়ের স্থান। লেখক তাই সৃষ্টি ও লয়, বা রক্ষক ও সংহারককে একাধারে এইভাবে কল্পনা করিয়াছেন। শিবরূপে যিনি সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের মঙ্গলের কারণ, রুদ্ররূপে তিনিই ধ্বংসের দেবতা। সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ ভিন্ন নহে। ভাগীরথর উৎস ও লয়ের স্থল যেরূপ এক ও অভিন্ন, রক্ষক ও সংহারক, সেরূপ এক ও অবিচ্ছেদ্য।

প্র ৪। 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দাও। (ক. বি. ১৯৪৭)

উ.। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ হইতে লিখিয়া যাও। শেষের চারিটি ছত্র ত্যাগ করিয়া নিম্নের অংশটি সংযোজিত কর :

লেখক এইরূপে সৃষ্টিতত্ত্বের মূলীভূত বৈজ্ঞানিক সত্যটি উপলব্ধি করিলেন—বুঝিলেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ ভিন্ন নহে। যাহা গড়ে তাহাই ভাঙে এবং ভাঙিয়া গড়িয়া ইহাই আবার সৃষ্টি রক্ষা করে।

প্র. ৫। "যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে।"

—এই 'ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলি' কিসের? লেখক কোথায় ইহাদের কিরূপে দেখিতে পান?

উ.। এই তরঙ্গগুলি ঘনীভূত গঙ্গাধারারই তরঙ্গ। উৎসের দিকে অতি উর্ধ্বে একস্থানে গঙ্গার ধারা জমিয়া তুষারে পরিণত হইয়াছে। সেইখানে এই জমাট তুষার তরঙ্গভঙ্গের লীলায় স্থির হইয়া আছে। এইরূপে গঙ্গার তরঙ্গগুলি তরল অবস্থাতে যেমন তেমনি জমাট অবস্থাতেও লীলায়িত হইয়া আছে। কেবল এই অবস্থায় তাহাদের সকল চঞ্চলতা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া লেখকের মনে হইয়াছে, কেহ যেন মন্ত্রবলে সেই তরল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

প্র. ৬। 'আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নুতন করিয়া নির্মাণ করি।'

—এই উক্তি কাহাদের? এখানে কাহার অস্থি এবং অস্থি বলিতে কি বস্তু বুঝাইতেছে? বক্তারা এই অস্থি দিয়া কেমন করিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করে?

উ.। তুষারক্ষেত্রস্থিত বারিকণাসমূহের উক্তি।

এখানে ভগ্ন শৈলের অংশগুলিকে অস্থিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বারিকণাগুলি হিমাণুরূপে শিলাময় পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ক্রমাগত ক্ষয়ক্রিয়ায় উহাদের এক-একটি শিখর ভাঙিয়া নিম্নে পাতিত করে। এইরূপে একটা ভগ্ন শৈলশিখর তুষারক্ষেত্রে যখন শায়িত হয়, তখন বারিকণাগুলি তাহাকে লইয়া নিম্নে প্রবাহিত হয়। ক্রমাগত ঘর্ষণে এই শৈলশিখর খণ্ডবিখণ্ডিত হয়। এই সকল খণ্ড ও চূর্ণ পর্বতের অস্থিস্বরূপ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা স্বতন্ত্রভাবে শক্তিহীন। কিন্তু সম্মিলিতভাবে তাহারা বিরাট্ শক্তি ধারণ করে। সেই শক্তিবলে তাহারা পর্বতের শিখরগুলিকে নীচে বহিয়া লইয়া চলে। চলিবার সময় ঐ শিখরগুলির ঘর্ষণে কাটিয়া কাটিয়া পথ প্রস্তুত হয়। সেই প্রক্রিয়াতেই চূর্ণীকৃত প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা নূতন নূতন উপত্যকার সৃষ্টি হয়। তাহার পর সাগরের দিকে বারিকণাসমূহ নদীস্রোতে আরো

অগ্রসর হয়। পথে হয়তো মরুভূমি পড়ে। নদীধারা দুই কূল ছাপাইয়া প্রস্তরচূর্ণ ছড়াইয়া দেয়। এই প্রস্তরচূর্ণই পলিমাটি এবং এই পলিমাটির আস্তরণে মরুমৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহাতে শ্যামল বৃক্ষলতা গজাইয়া উঠে। এইরূপে বারিকণাগুলি পৃথিবীর দেহে নূতন উপত্যকা ও সুশ্যাম উর্বরক্ষেত্র রচনা করিয়া চলে। দিন দিন তাহারা পৃথিবীর দেহ ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়ে।

প্র. ৭। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

—'এই গতি' কাহার কোন্ গতিকে বুঝায়? ইহার যে কি বিরাম নাই, শেষ নাই—তাহা বুঝাইয়া দাও।

উ.। 'এই গতি' বলিতে লেখক বারিকণাসমূহের বাষ্পাকার হইতে তরল অবস্থায়, তরল হইতে বাষ্পে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার অবিশ্রান্ত গতিকে বুঝাইতেছেন।

ইহারা পৃথিবীপৃষ্ঠে নামিয়া আবর্জনাদি যাবতীয় মৃত ও পরিত্যক্ত বস্তুকে ধুইয়া মুছিয়া সমুদ্রের দিকে লইয়া চলে। চলার পথে এইসকল বস্তু সংযোগে নূতন ভূভাগ গড়ে। মানুষের জ্ঞানসীমার বাহিরে এমন কত যে নূতন ভূখণ্ড গড়িতেছে তাহা কেহ জানে না। তাহার পর সমুদ্রে পতিত হইয়া এই বারি-বিন্দুগুলি উত্তাল তরঙ্গ বেলাভূমিতে আঘাত করে। একদিকে কূল ভাঙে, অন্যদিকে চর জাগায়। কখনও বা এই বারিকণাগুলি আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জ্বলন্ত তরল ধাতুর সহিত গিয়া মিশে। তখন অগ্ন্যুদ্গিরণ হয়, ভূমিকম্পে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। তাহাতে উচ্চভূমি নিম্নগামী হয়, নিম্নভূমি আবার উচ্চে উঠে। তারপর সমুদ্রবক্ষে সূর্যের তেজে এইসকল বারিকণা ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয় এবং আকাশে উঠিতে থাকে। আকাশে উঠিয়া ইহারা ঝটিকা বা বজ্রশক্তি বলে পর্বতের শিখরে চালিত ও সঞ্চিত হয়। সেখান হইতে আবার গলিয়া বাষ্প তুষারে, তুষার হইতে জলে পরিণত হয়। এইভাবে বারিকণার গতি অবিরাম, উহার শেষ নাই।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: নভোমণ্ডল = নভঃ + মণ্ডল। উত্থিত = উৎ + স্থিত। শিরোপরি = শির + উপরি (বাঙলা সন্ধি; সংস্কৃতমতে ভুল—শুদ্ধ রূপ 'শির উপরি')। কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা। অগ্ন্যুদ্গার = অগ্নি + উদ্গার। উত্তুঙ্গ—উৎ + তুঙ্গ।

সমাস : আজন্মপরিচিত—জন্ম হইতে আজন্ম (অব্যয়ীভাব); আজন্ম পরিচিত (সুপ্‌সুপা)। কূর্মাচল-নামক—কূর্মাচল নাম যাহার (বহুব্রীহি), তাহা (সমাসান্ত 'কপ্‌'-যোগে)। কূলপ্লাবিনী—কূল প্লাবিত করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গে)। সস্নেহ—স্নেহের সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি)। শিখরতুষারনিঃসৃত—শিখরস্থ তুষার (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহা হইতে নিঃসৃত (৫মীতৎপুরুষ)। অর্ধোন্মীলিত—অর্ধ উন্মীলিত (সুপ্‌সুপা)। মহাচক্র প্রবাহিত—মহৎ চক্র (কর্মধারয়); তাহাতে প্রবাহিত (৭মীতৎপুরুষ)। অস্থিচূর্ণ-সংযোগে—চূর্ণ অস্থি (কর্মধারয়, বিশেষণের পরনিপাত); তাহার সহিত সংযোগ (৩য়াতৎপুরুষ), তাহাতে। পাতাল-পুরস্থ—পাতলাই পুর (কর্মধারয়); সেখানে থাকে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। মহাযজ্ঞোত্থিত—মহান্‌ যজ্ঞ (কর্মধারয়); তাহা হইতে উত্থিত (৫মীতৎপুরুষ)। অভ্রভেদী—অভ্রকে ভেদ করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : সখ্য—সখি+য। পার্থিব—পৃথিবী + অণ্‌। ভস্মীভূত—ভস্ম+চ্বি (অভূততদ্ভাবে)+ভূ+ক্ত। অরণ্যানী—অরণ্য + আনীপ্‌ (স্ত্রীলিঙ্গে)। গরীয়সী—গুরু+ঈয়সুন্‌+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। প্রস্তরীভূত—প্রস্তর+চ্বি (অভূততদ্ভাবে)+ক্ত। চূর্ণীকৃত, রাশীকৃত চূর্ণ, রাশি+চ্বি (অভূত-তদ্ভাবে)+কৃ+ক্ত। উড্ডীন—উৎ—ডী+ক্ত।

উপসর্গ-যোগে শব্দ-গঠন : প্রশ্ন : 'অতিবর্তন' কথাটিতে যে উপসর্গ আছে তাহার পরিবর্তে বিভিন্ন উপসর্গ ব্যবহার করিয়া শব্দ গঠন কর।

উত্তর : প্রবর্তন, পরাবর্তন, সমাবর্তন (সম্‌+আ); নিবর্তন, অনুবর্তন, বিবর্তন, উদ্বর্তন, প্রত্যাবর্তন (প্রতি + আ), পরিবর্তন, আবর্তন।

তদ্ধিতান্ত বা কৃদন্ত শব্দ-গঠন : রজতসূত্রের ন্যায় = রজত-সূত্রবৎ। শঙ্খধ্বনির ন্যায় = শঙ্খধ্বনিবৎ। সৃষ্টিকর্তা = স্রষ্টা। তুষারে পরিণত = তুষারীভূত।

নির্দেশানুযায়ী বাক্যের পরিবর্তন : নদীকে আমার একটি অতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত (সরল)—আমার মনে হইত যে নদী একটি অতি পরিবর্তনশীল জীব (জটিল)—নদীকে আমি একটি অতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে করিতাম (বাচ্যান্তর)।

নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' (প্রত্যক্ষ উক্তি)—নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম সে কোথা হইতে আসিতেছে (পরোক্ষ উক্তি)।

আমরা যথা হইতে আসি, তথায় ফিরিয়া যাই (জটিল)—আমরা উৎপত্তিস্থান হইতে আসিয়া তথায় ফিরিয়া যাই (সরল)।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ নদী।" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।" (প্রত্যক্ষ উক্তি)—নদীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম সে কোথা হইতে আসিয়াছে। নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল যে সে মহাদেবের জটা হইতে আসিয়াছে (পরোক্ষ উক্তি)।

সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল যখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না—সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল (বা, ত্রিশূলকে) যখন আর স্পষ্ট দেখিতেছি না (বাচ্যান্তর)।

সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে—সেই মহাতেজ পৃথিবী (বা, পৃথিবীকে) কম্পিত করিতেছে ('মহাতেজে'-কে কর্তৃপদে রূপান্তরিত করিয়া)।

এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না—এখন আর বুঝিতে ভুল করি না ('ভুল'-কে কর্তৃপদ হইতে কর্মপদে পরিণত করিয়া)—এখন ঠিকই বুঝিতে পারি (নঞর্থ পরিহার করিয়া)।

পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি (অস্তিবোধক)—পুরাতনের মধ্যে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই (নেতিবাচক)।

ব্যাকরণগত টীকা: দণ্ডায়মান—দণ্ড (বিশেষ্য+ক্যঙ্ (নামধাতু) +শানচ্। নামধাতুজাত শব্দের উদাহরণ।

পথপ্রদর্শক—পথিন্+প্রদর্শক = পথি+প্রদর্শক = পথিপ্রদর্শক (সংস্কৃত সমাসের নিয়মে)। কিন্তু বাঙলায় 'পথ'-ই প্রাতিপদিকরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সমাসবদ্ধ পদটিকে শুদ্ধই বলিতে হইবে।

শিরোপরি—সন্ধি দ্রষ্টব্য। সংস্কৃতে বিসর্গসন্ধির নিয়মে অঃ+অ ভিন্ন স্বর (শিরঃ+উপরি) = বিসর্গলোপ (শির উপরি)। কিন্তু বাঙলায় বিসর্গটি অস্বীকার করিয়া শব্দটিকে ('শির') সাধারণ অকারান্ত শব্দ ধরিয়া স্বরসন্ধি করা হয়।

নিমজ্জিত—নি – মস্‌জ্‌—ক্ত = নিমগ্ন ; কিন্তু ভুল হইলেও 'নিমগ্ন' অর্থে 'নিমজ্জিত' শব্দটি বাঙলায় খুব চলে।

বাক্য-রচনা: চিরাভ্যস্ত: আমার চিরাভ্যস্ত কর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে চিনিতে ভুল করিও না।

অজ্ঞেয়: মৃত্যুর রহস্য অজ্ঞেয়।

অবরোধ: শত্রুসৈন্য তিন মাস দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল।

প্রস্তরীভূত: মৃত জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে বিজ্ঞানের ভাষায় জীবাশ্ম বলে।

তুষারশয্যা: সকালবেলা বাজারে গিয়ে দেখি, একমাত্র ইলিশমাছই আছে, কিন্তু তারা সব তুষারশয্যায় শুয়ে।

উড্ডীন: স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা চিরকাল উড্ডীন থাকিবে ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই অন্তরের কামনা।

চলিত-ভাষায় রূপান্তর: সমগ্র প্রবন্ধটি সাধু-ভাষায় রচিত বলিয়া ইহার যে-কোনো অংশ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে। ১৯৬০-এর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা… …ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে' অংশটি দেওয়া হইয়াছে।

সাক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' নামে স্থান পাইয়াছে। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'র আকার আরও বড়। উহারই কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া 'সাক্ষী' গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছে। এই গল্পটি শুধু পাঠ-সংকলনেই নয়, অন্য কয়েকটি গ্রন্থেও 'সাক্ষী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

'সাক্ষী' মূল গল্প 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' অপেক্ষা আকারে ছোট, প্রকারে মোটামুটি একই। কাজেই মূল নামের পরিবর্তন-সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, এই পরিবর্তনের সার্থকতা আছে। 'সাক্ষী' নামে সংক্ষেপিত গল্পের মূল লক্ষ্য হইল রামকানাই। এখানে তাঁহার নির্বুদ্ধিতা মোটেই প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং নিরীহ নির্বিরোধ এই চরিত্রটির সততা এবং সেই সততা-পুষ্ট অপূর্ব দৃঢ়তার আলোকে রামকানাই-চরিত্রের মহিমাটিই এই গল্পের রসকেন্দ্র। গৃহস্থ-হিসাবে রামকানাই একজন গোবেচারী শান্তিপ্রিয় বাঙালী, কিন্তু সাক্ষী হিসাবে তিনি সাধুতার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই সাক্ষী রামকানাই এইভাবে আমাদের মনোযোগের একান্ত পাত্র। একদিকে স্ত্রী-পুত্র, অন্যদিকে সত্য —এই দুয়ের মধ্যে তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন এ-সম্বন্ধে সংশয়টিই গল্পের suspense সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাঁহার সত্য-সাক্ষ্য-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের চরম পরিণতি ঘটিয়া গিয়াছে। সুতরাং শেষপর্যন্ত এই সাক্ষী ও তাঁহার সাক্ষ্যই গল্পটির সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যের বস্তু এবং এই কারণে গল্পটির নূতন নামকরণ অর্থাৎ 'সাক্ষী' নাম সম্পূর্ণ সার্থক ও সঙ্গত।

ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য—"ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র; উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয়-নির্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার অল্প-পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতালাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষরকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মতো ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব, গল্পের পরিণতি বা চরিত্র-বিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সেগুলিকে সুনির্বাচিত হইতে হইবে। কোনোরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই, পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যা-সমাধানের একটি ছেদচিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়।"

ছোট গল্পের প্রকৃতিসম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষত্বগুলি মনে রাখিলেই ইহার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা হইতে পারে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আধুনিক সাহিত্যে ইহা এতই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, কোনো সাধারণ সূত্রে ইহাদিগকে বাঁধিয়া দেওয়া চলে না। কাব্যে lyric বা গীতি-কবিতার যে স্থান, গল্পরচনায় ছোট গল্পেরও প্রায় সেইরূপ স্থান। " 'লিরিক্' কবিতা যেমন একটি ভাবকে আশ্রয় করে, ছোট গল্প তেমনি একটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে।"

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প—"তাঁহার দুই-একটি গল্পে হাস্যরসের প্রাচুর্য ও লঘুতর স্পর্শ থাকিলেও, অধিকাংশের মধ্যেই জীবনের গভীর কথা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও রহস্যময় সূত্রগুলিরই আলোচনা হইয়াছে। আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে মরুভূমির বিশাল ধূসর বালুকা-বিস্তার মাত্র দেখা যায়, তিনি সেখানেও সেই সর্বদেশসাধারণ ভাবমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া বাহ্যবিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন। বাস্তবজগতের রিক্ততার মধ্যে যে বিশাল ভাব-সম্পদ্ কবিচক্ষুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া আছে তিনি সেই ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের সেই স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অন্যান্য প্রদেশের যেমন একচ্ছত্র সম্রাট্, ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার পূর্বে কয়েকটি ছোট গল্প রচিত হইলেও তাহাদের মধ্যে ছোট গল্পের সকলপ্রকার বৈশিষ্ট্য ছিল না। "প্রকৃত ছোট গল্প প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা।"

সমালোচনা—'সাক্ষী' গল্পের ঘটনাবস্তু অত্যন্ত সাধারণ। নিঃসন্তান বিত্তশালীর উইলটার প্রতি অনেক আত্মীয়ের যে লোভ থাকে তাহা আমরা সর্বদাই দেখি। কিন্তু সেই উইলটা কখনো সকলের মন তুষ্ট করিতে পারে না, বঞ্চিতেরা তখন নানান দুরভিসন্ধি জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় লয়। এই ধরনের কদর্য ব্যাপার

বাঙালীসমাজে প্রায় নিত্যকার ঘটনা ; তবে এইরূপ ব্যাপারে রামকানাইয়ের মতো নিঃস্বার্থ ও সত্যপরায়ণ সাক্ষী বড়ই বিরল। গল্পটির কেন্দ্রে এই বিরল বস্তুটিকে স্থাপনও পরম মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ রামকানাই চরিত্র আঁকিয়াছেন।

ইহার মধ্যে যে নৈপুণ্য দেখি তাহা প্রধানতঃ ঘটনার উপস্থাপনা ও বিবরণের মধ্যেই নিহিত। গুরুচরণের শেষসময়ে উইল-লেখার দৃশ্যটি হইল গল্পটির সূচনা। রামকানাই যখন গুরুচরণকে উইল করার তাগিদ দিয়াছেন, তখন তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে একটা আশা যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্যতঃ গুরুচরণ বিষয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকেই দিয়া গেলেন। রামকানাই তাহাতে হতাশ হইলেন, কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হইলেন না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইল। বিচলিত হওয়ারই কথা। বহুদিনের বহু আশার বস্তু এমনভাবে অকস্মাৎ হাতছাড়া হইয়া গেল। নবদ্বীপ মূর্খ ও লোভী. তাহার মা-ও তাই। গুরুচরণের বিষয়টার উপর নিশ্চিন্ত ভরসা রাখিয়াই নবদ্বীপের সংসার হইয়াছে। এখন নিরুপায় হইয়া দুষ্ট বন্ধুর কুপরামর্শ গিলিতে তাহার বিন্দুমাত্র দেরী হইল না। নীতি ও বুদ্ধির যাহার বালাই নাই, সেইরূপ অশক্ত অকর্মণ্যের পক্ষে এরকম মিথ্যা-জাল জুয়াচুরি স্বাভাবিক। সুতরাং মোকদ্দমা বাধিল। ইহার পূর্বে রামকানাইকে কাশীতে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছে। এ শুধু নবদ্বীপ ও তাহার মায়ের চক্রান্তে নহে, ইহার পিছনে গল্পকার রবীন্দ্রনাথেরও হাত আছে। মামলার সমস্ত ঘটনা রামকানাইয়ের জ্ঞাতসারে এবং তাঁহার উপস্থিতিতে ঘটিলে যে খুব একটা বাধা পড়িত তাহা মনে হয় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে রামকানাইয়ের শেষ সাক্ষ্যের মনস্তত্ত্ব ঠিক থাকিত না। রামকানাই কাশী হইতে ফিরিয়া ঘটনাটা হঠাৎ শুনিবার জন্যই এত আহত বোধ করিয়াছিলেন এবং এই আকস্মিক আঘাতেই তাঁহার ন্যায়বুদ্ধি সহসা যতটুকু শক্তি আছে সবটুকু একত্র করিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় কয়েক মুহূর্তের জন্য বীরদর্পে মাথা চাড়া দিয়াছে। ইহার পরই রামকানাইয়ের মূর্ছা। রামকানাই যে সত্যই দুর্বল স্ত্রীশাসিত বাঙালী গৃহস্থ একথা নিশ্চিত। দীর্ঘকাল চাপে-চক্রান্তে তাঁহাকে খুশিমতো ঘোরানো যে অসম্ভব হইত, এমন মনে হয় না। তবু তাঁহাকে কাশীতে পাঠানো হয়। গল্পের দিক দিয়া রামকানাইয়ের নির্বাসন, নবদ্বীপ ও তাহার মায়ের বিষয়লোভকে কদর্যতম করিয়া তুলিয়াছে। শেষ দৃশ্যে রামকানাইয়ের প্রত্যাবর্তন বেশ নাটকীয়। স্ত্রীপুত্রের অভ্যর্থনায় বাড়ি ফিরিতে পাওয়ায় এই অনুগত ভদ্রলোকটি

কৃতার্থভাবে উৎফুল্ল হইয়া আসিয়াছেন। একদিন না যাইতেই সাক্ষীর সমন পাওয়ায় তাহার পক্ষে আঘাতটা তাই এত সাংঘাতিক হইয়াছে। তাহার পর পুত্র ও গৃহিণীর শাসন ও ক্রন্দন তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে। দুইদিন অন্নজল ত্যাগ করিয়া শেষে যখন উপবাসক্লিষ্ট রামকানাই সাক্ষ্য দিতে উঠিয়াছেন তখন তাঁহার কণ্ঠে তাঁহার চেতনায় শুধু মিথ্যার প্রতিবাদ ও সত্য ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নাই। এইটুকু বলার পরই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে রামকানাইকে কেবল ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক সন্নিবেশে এত বড় সত্যাগ্রহী করিয়া তুলিয়াছেন। এইখানেই গল্পটির প্রধান বিশেষত্ব। ইহা ছাড়া নবদ্বীপ, নবদ্বীপের মা, ব্যারিস্টার, বরদাসুন্দরী ও তাহার মামাতো ভাই প্রভৃতির মুখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা দিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। এক-এক জনের এক একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রগুলিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—যেন এক-একটি বিদ্যুৎচমকে তাহারা আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। জ্যেঠার শ্রাদ্ধ না করার আস্ফালনে নবদ্বীপের ক্লীব আক্রোশ ও নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে। ব্যারিস্টারের একটিমাত্র দম্ভোক্তির মধ্যে তাহার চারিত্রিক বাহাদুরি-প্রিয়তা প্রকট। সুবিধামতো পক্ষ-পরিবর্তন ও বরদাসুন্দরীর নিকট মোকদ্দমা-জয়ের সংবাদ-পেশের মধ্যে বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটি নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। বরদাসুন্দরী যে মামাতো ভাইয়ের মিথ্যা বিবরণ নির্বিচারে বিশ্বাস করিয়া রামকানাইকে মন্দ ভাবিয়াছেন, তাহার মধ্যেই তাহার সহজ বিশ্বাস-প্রবণতা ও মেরুদণ্ডহীন দুর্বল চরিত্রটির আভাস রহিয়াছে। নবদ্বীপের মা অবশ্য অনেকবার কথা বলিয়াছে এবং এই কথার ঘোরপ্যাঁচ, ঠেশ ও ঝাঁক এমনভাবে বিতরণ করিয়াছে যে বাহবা দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই মহিলাটির সংলাপে গল্পটিকে অত্যন্ত বাস্তব ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাকে তিনি কখনও নাম ধরিয়া উল্লেখ করেন নাই। গুরুচরণের দ্বিতীয়া পত্নী বরদাসুন্দরী, কিন্তু রামকানাইয়ের গৃহিণী শুধু 'নবদ্বীপের মা'। ইহার তাৎপর্য আছে। পুত্রের জন্য বিষয়লিপ্সা ছাড়া তাহার জীবনে আর যেন প্রেরণা নাই। পতির প্রতি অনুরাগ তাহার পুত্রস্বার্থের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সুতরাং নিজের বা পতির নামে নয়, পুত্রের নামেই তাহার যথার্থ পরিচয়। বাঙালীর ঘরে অবশ্য পুত্রের নামে মাতার পরিচয় সুপ্রচলিত ও বিশেষ গৌরবের। কিন্তু নবদ্বীপের মা-কে সেই সাধারণ অর্থে গৌরব দেওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথ পুত্রস্নেহে ও স্বার্থ-লোভে অন্ধ এই

প্রাকৃত রমণীকে অসৎ ও অপদার্থ পুত্রের যাবতীয় নষ্টামির প্রেরণারূপিণী করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাহার একমাত্র পরিচয় 'নবদ্বীপের মা'।

গল্পটির বিবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রসকৌতুক যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। তাহার জন্য ইহার উপভোগ্যতা যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের রসিকতার উপাদান শুধু সংলাপে নহে, চরিত্রগুলির মধ্যেও নিহিত আছে। অত্যন্ত প্রচলিত কথাকে স্থানবিশেষে অতিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিলে একপ্রকার কৌতুকের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়া' কথাটিকে 'শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া' বলা বেশ কৌতুকপ্রদ। তাহা ছাড়া নবদ্বীপের শাসানি তো রীতিমতো হাস্যকর। যাত্রার দলের ভীমের মতো তাহার শূন্য আস্ফালন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুরুচরণের আচারনিষ্ঠার অভাব বিবৃত করিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মন্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা মূল গল্পটির পক্ষে অপরিহার্য তো নয়ই, প্রয়োজনীয়ও নয়। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভিতর ব্রহ্ম-সংস্কারেরই এই উৎপাত।

রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া গল্পটি এইভাবে নানাদিক দিয়া উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে ঘটনা ও সংঘাতের বা চরিত্ররূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির তুলনায় ইহা কিছুই নয়। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের লিপিকৌশল এখানে সম্যক্ ধরা পড়ে নাই।

সংক্ষিপ্তসার—গুরুচরণের শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পাশে আছেন তাঁহার ভাই রামকানাই। ভ্রাতার অনুরোধে গুরুচরণ উইলের বয়ান বলিয়া গেলেন। কম্পিত হস্তে রামকানাই তাহা লিখিয়া গেলেন এবং সর্বশেষে গুরুচরণ দুষ্পাঠ্য কম্প্ররেখায় আপন-স্বাক্ষর লিখিয়া দিলেন। এই দলিলবলে গুরুচরণ সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী বরদাসুন্দরীকেই দান করিলেন। ইহা রামকানাই ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল গুরুচরণ তাঁহার পুত্র নবদ্বীপকেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। এই আশাতেই রামকানাই নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই এবং তাহার বিবাহও অল্পবয়সে দিয়াছিলেন। যাহা হউক, গুরুচরণের আচরণে রামকানাই ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। তীব্র ভাষায় মৃত ভাসুরকে তো বটেই, জীবিত স্বামীকেও গালাগালি ও ভৎর্সনা করিতে ছাড়িলেন না।

পুত্র নবদ্বীপ অকৃতজ্ঞ জ্যেষ্ঠতাতের মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ করিবে না বলিয়া শাসাইল। মৃতের উপর এই তর্জনের কি প্রভাব পড়িল তাহা বুঝা না গেলেও, নবদ্বীপের সান্ত্বনা হইল যে পরলোকে পিণ্ডের অভাবে গুরুচরণের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। রামকানাই দলিলখানি তাহার বউঠাকুরাণীর হাতে দিয়া মুক্ত হইলেন এবং খাদে-পড়া বলদটি যেমন গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতো খাইয়াও নিশ্চল থাকে, সেইরূপ গৃহিণীর তীব্র আক্রমণ নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় নবদ্বীপ বন্ধুবান্ধবদের সুপরামর্শে আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং মায়ের নিকট সদম্ভে ঘোষণা করিল, ভাবনার কিছু নাই, সম্পত্তি তাহারই হইবে : কিন্তু কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য রামকানাইকে স্থানান্তরে পাঠাইতে হইবে।

নবদ্বীপের মায়ের তাড়নায় রামকানাইকে শীঘ্রই একটা অছিলায় কাশীযাত্রা করিতে হইল। তাঁহার অগোচরে এদিকে দুই প্রস্থ মামলা বাধিয়া উঠিল। বরদাসুন্দরী ও নবদ্বীপচন্দ্র উভয়ে উভয়ের নামে উইল-জালের অভিযোগ করিল। বরদাসুন্দরীর পক্ষে সাক্ষীর বড় অভাব। একটি আশ্রিত মামাতো ভাই এবং রামকানাই ব্যতীত আর কেহ সাক্ষী দিবার নাই। মামলা যখন বেশ পাকিয়া উঠিল তখন গৃহিণীর আহ্বানে রামকানাই কাশী হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। একদিন না যাইতেই তাঁহার হাতে আদালতের এক সমন আসিয়া পৌঁছিল। রামকানাই স্তম্ভিত হইলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া-কাটিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে নবদ্বীপকে কেবল তাহার জ্যেঠার সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই নয়, জেলে পাঠাইবার জন্যও বরদাসুন্দরীর এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু আসল ব্যাপার বুঝিতে রামকানাইয়ের বিলম্ব হইল না। তিনি প্রতিবাদ করিতে গেলে নবদ্বীপের মাতা স্বমূর্তি ধারণ করিলেন এবং নবদ্বীপের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য মামলার সমর্থন করিতে লাগিলেন। মাতার সঙ্গে পুত্রও আসিয়া যোগ দিল। উভয়ে তর্জন-গর্জন এবং অশ্রুবিসর্জন—সকলরকম সম্ভাব্যপন্থায় রামকানাইকে বাগ মানাইতে চেষ্টা করিল। হতবুদ্ধি রামকানাই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অন্নজল তাহার উঠিয়া গেল।

এইরূপে রামকানাইয়ের দুইদিন নিরম্বু উপবাসের পর মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর অন্যতম সাক্ষী মামাতো ভাইটিকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিয়া লইয়াছে। আদালতে গিয়া

সে অবলীলাক্রমে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী যখন নবদ্বীপের দিকে হেলিতেছেন, তখন রামকানাইয়ের ডাক পড়িল। ব্যারিস্টার কৌশলে বেড়ার জালে জড়াইয়া রামকানাইয়ের নিকট হইতে সত্য কথাটি আদায় করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপবাসক্লিষ্ট বৃদ্ধ দুর্বল রামকানাই এত কথার জবাব দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া শুধু এইটুকুই জানাইলেন যে, আসল উইলখানি তাহার লেখা এবং দাদা গুরুচরণের স্বাক্ষরিত। সেই দলিলে গুরুচরণ সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রী বরদাসুন্দরীকে দিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়াই রামকানাই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্যারিস্টার বাহাদুরি লইবার জন্য বলিলেন, বৃদ্ধ তাঁহার জেরায় কোণঠাসা হইয়া সত্য কথাটি বলিয়াছেন। মামাতো ভাইটি তাহার দিদিকে বুঝাইল যে তাহার সাক্ষ্যের ফলেই মামলা রক্ষা পাইয়াছে, এবং দিদিও তাহাই বুঝিলেন। কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বন্ধুরা বৃদ্ধের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়া ভাবিল, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ভয়ে তাঁহার মুখ হইতে সত্য কথাটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১-৮। **জবাব দিয়া গেল**—রোগীর বাঁচিবার কোনো আশা নাই এই মত প্রকাশ করিয়া গেল ; রোগী যে চিকিৎসার অতীত হইয়াছে এইরূপ মন্তব্য করিয়া গেল। 'জবাব দেওয়া' বাঙলা ইডিয়ম। অন্য অর্থেও ইহার প্রয়োগ লক্ষণীয় : প্রভু ভৃত্যকে জবাব দিলেন (কর্মচ্যুত করিলেন)। **উইল**—(ইংরেজী will হইতে) উত্তরাধিকারীকে স্বেচ্ছাকৃত দান-পত্র ; মৃত্যুর পরে মৃতের বিষয়সম্পত্তির ভোগদখল-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপত্র। **স্থাবর**—স্থিতিশীল ; দীর্ঘকাল স্থায়ী ; যাহা স্থানান্তরিত করা যায় না। **অস্থাবর**—অর্থ, অলংকার, আসবাবপত্র প্রভৃতি যাহা স্থানান্তরিত করা চলে। **ধর্মপত্নী**—বিবাহিতা স্ত্রী, সহধর্মিণী। **কলম সরিতেছিল না**—হাত আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। **অপুত্রক**—পুত্রসন্তানহীন। **উত্তরাধিকারী**—পরবর্তী মালিক। **উত্তর**—পরবর্তী। **পৃথগন্ন**—এক বাড়িতে বা এক পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াও একান্নবর্তী নয় ; যাহাদের আহার্যাদি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। **এই আশায়**—জ্যেঠামহাশয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার আশায়। **সকাল-সকাল**—অল্পবয়সে ; বিবাহোচিত বয়সের পূর্বেই শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ

করিয়া—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া; শত্রুর সকল অমঙ্গল-কামনা ব্যর্থ করিয়া 'শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া' বাঙলা ইডিয়ম; রবীন্দ্রনাথ রসিকতার জন্য ইহাকে তদ্রূপ দিয়াছেন। বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই—অর্থাৎ নবদ্বীপ সন্তানের পিতা হইয়াছে। **তথাপি**—এই একটি কথার মধ্যেই রামকানাইয়ের বলিষ্ঠ নীতিবোধ ও মজ্জাগত সাধুতার ইঙ্গিত রহিয়াছে। নির্জীব—অসাড়; অবশ।

অ. ৫-৭। গোল—গণ্ডগোল; কলরব। মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়—মুমূর্ষু মানুষের বুদ্ধি ঘোলাইয়া যায়, হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়া বসে। সোনার চাঁদ—রূপে গুণে অতুলনীয়। **এমন···ভাইপো থাকিতে**—যে কথাটি নবদ্বীপের মা উহ্য রাখিয়াছে তাহার মর্ম এই যে নিজের স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া গুরুচরণের পক্ষে মোটেই উচিত হয় নাই। তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই—অর্থাৎ তোমার তো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নাই। **এমন ব্যবহার**—শোকের সময় পরের বিষয়সম্পত্তি লইয়া দুর্ভাবনা। এখন—এই শোকের সময়। **কাল হইয়াছে**—মৃত্যু হইয়াছে। সর্বনাশ বা কর্মনাশের কারণ হওয়া অর্থেও 'কাল হওয়া' ইডিয়মটির প্রয়োগ হয়। অতুলনীয়: "এক কাল হৈল মোর নয়ালী যৌবন। আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥" মুখাগ্নি—শবদাহকাল শবের মুখে অগ্নিপ্রদানরূপ সংস্কার বিশেষ। শ্রাদ্ধশান্তি—মৃতের আত্মার তৃপ্তি ও শান্তির জন্য অনুষ্ঠান। যদি করি তো ইত্যাদি—অর্থাৎ কিছুতেই করিব না।

অ. ৮-৯। **ডফ্ সাহেব**—রেভারেণ্ড ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডফ্ (১৮০৬-১৮৭৮)। ইনি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। মিশনারিরূপে ইনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ভারতবাসীকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল ইঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ইনি Free Church Institution নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার ব্যাপারে ইনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। প্রায় চারিবৎসর কাল ইনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং উহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম-সম্বন্ধেও ইনি অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত Free Church Institution (যাহার সহিত পরে Duff College যুক্ত হইয়াছিল) এবং হেদুয়াপুষ্করিণীর পূর্বদিকে স্থাপিত General Assembly's Institution একসঙ্গে মিলিত হইয়া Scottish

Church College-এ পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় থাকিবার সময় ডফ সাহেব অনেকগুলি হিন্দু যুবককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দু-সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় ইঁহার বিরোধিগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। সে ডফ্ সাহেবের ছাত্র—সে Free Church Institution-এর ছাত্র ছিল বলিয়া ডফ্ সাহেবের প্রভাবে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও সংস্কারগুলির প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিখিয়াছিল। শাস্ত্রমতে—হিন্দুশাস্ত্রের বিধানে। যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য—যে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ অর্থাৎ গোমাংস। **আমি যদি ক্রীশ্চান হই** ইত্যাদি —গোমাংস গুরুচরণ প্রকাশ্যভাবেই খাইত, নহিলে লোক তাহাকে ক্রীশ্চান বলিবে কেন ? হিন্দুধর্মবিরোধী গুরুচরণের এই উত্তরটি বর্বর রসিকতা। অকারণে এই অংশটির অবতারণা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীর পক্ষে এই অংশটি একান্তই অনাবশ্যক।

মন্তব্য ঃ 'গুরুচরণ লোকটা' হইতে 'অনেক সুবিধা আছে' পর্যন্ত অনুচ্ছেদ দুইটি কাহিনীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধশান্তি, পিণ্ডদান প্রভৃতিকে হিন্দু পবিত্র সংস্কার বলিয়া মনে করেন। সংস্কারমুক্ত ধর্ম জগতে কোথাও নাই। রবীন্দ্রনাথের আপন ধর্মও সংস্কারমুক্ত নহে। অথচ রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে সুযোগ পাইলেই বিদ্রূপ করিয়াছেন। **বর্তমান ক্ষেত্রে** হিন্দুর ধর্মবোধে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যেই তিনি **সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন**। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা অশোভন।

সদ্যোমৃত – সবেমাত্র যে মরিয়াছে। পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায়—নবদ্বীপ গুরুচরণের শ্রাদ্ধশান্তি করিবে না বলিয়া শাসাইয়াছে। শ্রাদ্ধশান্তি না হইলে মৃতের পক্ষে পরলোকে গিয়া পিণ্ড পাইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তাহার উপবাসের ভয় থাকে। পিণ্ড—পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত গোলাকার খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস। সদ্যোমৃত অবস্থায়……সম্ভাবনা নাই—জীবিত অবস্থায় যে হিন্দুর সংস্কারগুলির প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিল, সে যে মরিয়া পরলোকে পিণ্ড পাইবে না বলিয়া ভয় পাইবে, এমন সম্ভাবনাই নাই। তাহাছাড়া মৃত সত্যসত্যই শঙ্কিত হইল কিনা তাহা বুঝিবারও কোনো উপায় নাই। পরলোকে গিয়া মরিয়া থাকিবে—পরলোকে পিণ্ডের অভাবে উপবাসী থাকিতে থাকিতে বাঁচা আর সম্ভব হইবে না। পেট চলিয়া যায়—গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। যে লোকে গেলেন—পরলোকে।

ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মিলে না—ইহলোকে উপার্জনে অক্ষম হইলে কেহ ভিক্ষা করিয়াও দিন চালাইতে পারে, কিন্তু পরলোকের অধিবাসীদের সে সুবিধা নাই। তাহাদের একমাত্র খাদ্য ইহলোকের মানুষের প্রদত্ত পিণ্ড। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় না দেয়, তবে তাহা চাহিয়া পাইবার উপায় নাই। বাঁচিয়া……সুবিধা আছে—ইহলোকে বাঁচিয়া থাকিলে নিজেই নিজের আহার্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়, অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কিন্তু পরলোকে এমনটি হয় না। তাই বাঁচিয়া থাকার সুবিধা অনেক।

অ. ১০-১৪। **লইয়া পড়িলেন**—তীব্রভাবে আক্রমণ ও ভর্ৎসনা করিলেন। 'লইয়া পড়া' বাঙলা ইডিয়ম। খাদ—গর্ত। **আমি তো দাদা নই**—তোমাদের বিচারে নবদ্বীপকে বিষয় না দেওয়ার জন্য দাদাই অপরাধী। তবে আক্রমণটা আমার উপর কেন? ফোঁস করিয়া—ক্রুদ্ধ সর্পের মতো গর্জন করিয়া। ভণ্ডুল—পণ্ড; ব্যর্থ। কর্মনাশা—কার্য পণ্ড করে যে। কর্ম নাশ করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)।

অ. ১৫-১৬। তাহার নিজের নামে—তাহাকেই জ্যেঠামহাশয় তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন এই মর্মে। **নিঃস্বার্থ সাক্ষী**—যে সাক্ষীর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। এইরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্যই আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়। গৃহপোষ্য—আশ্রিত। **পাকিয়া উঠিল**—জমিয়া উঠিল; দুই পক্ষই জয়লাভের জন্য প্রস্তুতি ও তোড়জোড় করিল।

অ. ১৭-২১। **সপিনা**—বিচারালয়ে হাজির হইবার আদেশপত্র বা হুকুমনামা। কথাটি ইংরেজী subpœna হইতে আসিয়াছে। অবাক্ হইয়া—উইল লইয়া গোপনে গোপনে যে এত কাণ্ড গড়াইবে তাহা রামকানাই কল্পনাও করিতে পারেন নাই; তাই এই বিস্ময়। **হাড়জ্বালানী**—যে নারী অন্যের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। **ডাকিনী**—পিশাচীবিশেষ। এই কথাটির লক্ষ্য বরদা-সুন্দরী। সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার ইত্যাদি—নবদ্বীপচন্দ্র জ্যেঠামহাশয়ের উইল জাল করিয়াছে একথা প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি হইবে কারাবাস। **চক্ষুস্থির**—অবাক্‌দৃষ্টি; বিস্ময়ে হতভম্ব। **নিজমূর্তি ধারণ করিয়া**—নিজের পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর প্রকৃতিটি প্রকাশ করিয়া। ললাটে—কপালে। অনায়াসে—অবলীলাক্রমে; অত্যন্ত সহজভাবে। জয়শ্রী—বিজয়লক্ষ্মী।

অ. ২২-২৪। শুষ্করসনা—যাহার জিভ শুকাইয়া গিয়াছে। **সাক্ষ্য-মঞ্চের কাঠগড়া**—আদালতে সাক্ষীকে যে মঞ্চ বা পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে হয় তাহার চতুর্দিকের কাষ্ঠনির্মিত বেষ্টনী বা রেলিঙ। উপবাসে দুর্বল রামকানাই সহজভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া এই কাঠগড়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন। জেরা—বিচারকের সম্মুখে বাদী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদিগকে কূটপ্রশ্নের দ্বারা সত্যাসত্য-পরীক্ষা। বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া—অর্থাৎ উইলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক নাই এমন বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া। প্রসঙ্গের—আসল বিষয়ের, গুরুচরণের উইলের। বলিয়া লই—আগেই বলিয়া ফেলি, পাছে সত্যকথাটি বলিবার সুযোগ না হয়। দাখিল করিয়াছেন—আদালতে পেশ বা অর্পণ করিয়াছেন। মিথ্যা—জাল।

অ. ২৫-২৮। **অ্যাটর্নি**—আমমোক্তার; আইনব্যবসায়ী। ইঁহারা মামলার তদ্বির-তদারক করেন কিন্তু বিচারকের সম্মুখে কোনো পক্ষের হইয়া কিছু বলিবার জন্য উপস্থিত হইতে পারেন না। **বাই জোভ**—ইংরেজী দিব্যবিশেষ (By jove)। **ঠেসে ধরেছিলুম**—জেরার চোটে সত্যকথাটি বলিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। রামকানাই যে সত্যকথাটি বলিলেন তাহার সকল কৃতিত্ব এই ব্যারিস্টার মহাশয় লইতে চান। বুড়া—রামকানাই। **মকদ্দমায় রক্ষা পায়**—মামলায় দিদির জিত হয়। এই মামাতো ভাইটিও নবদ্বীপের হইয়া সাক্ষ্য দিয়া অবশেষে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই জয়ী দিদির মনস্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করিয়াছে। **বুদ্ধিমান্ বন্ধুরা**—এখানে 'বুদ্ধিমান' কথাটি ব্যঙ্গ করিবার জন্যই 'বুদ্ধিহীন' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। নবদ্বীপের বন্ধুরা রামকানাইয়ের প্রকৃতির স্বরূপ মোটেই বুঝিতে পারে নাই। তাই তাহারা রামকানাইয়ের সত্যভাষণের একটা সাধারণ সম্ভাব্য কারণ অনুমান করিয়া লইয়াছে। বাক্সের মধ্যে—মঞ্চের উপর। আস্ত নির্বোধ—নিরেট বোকা। সংসারের সাধারণ মানুষ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুই-একটা মিথ্যাকথা বলাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে না। তাই তাহাদের বিচারে যে স্বার্থহানি করিয়াও সত্যকথা বলে সে নিতান্ত নির্বোধ। সমস্ত শহর—গোটা কলিকাতা।

ব্যাখ্যা

(১) মেজ বউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের······হয় নাই— (অ. ৬)

এই অংশ রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের অন্তর্গত। গুরুচরণের মৃত্যুর ঠিক

অব্যবহিত পরে তাঁহার উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা গালমন্দ শুরু করে। রামকানাই তখন গৃহিণীকে থামাইবার জন্য উদ্ধৃত মন্তব্য করেন।

গুরুচরণ মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বে উইল করিয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বরদাসুন্দরীকে দিয়া যান। রামকানাই প্রভৃতি সকলেরই একান্ত ভরসা ছিল নবদ্বীপই ঐ বিষয় পাইবে। ব্যাপার অনুরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া রামকানাই একটু হতাশ হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী একেবারে রণমূর্তি ধারণ করিল। গুরুচরণের বুদ্ধিনাশ হইয়াছিল,—ইত্যাদি নানান অবজ্ঞার কথায় নবদ্বীপের মা ভীষণ শোরগোল পাকাইয়া তুলিল। মৃতের সৎকারও তখন হয় নাই। রামকানাই স্বভাবতঃই স্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন। তাই বেশ বিরক্তির সঙ্গেই নবদ্বীপের মা-কে তখনকার মতো চুপ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরুচরণের না হয় মৃত্যুর সময় বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। নবদ্বীপের মায়ের মৃত্যু আসন্ন হয় নাই, সুতরাং বুদ্ধিনাশ হওয়া সঙ্গত নয়। অথচ বুদ্ধি থাকিলে ভাসুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এরূপ শোরগোল শোভা পায় না। রামকানাই ইঙ্গিতে স্ত্রীকে এই কথায় বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, গুরুচরণ মারা গেলেন বটে, রামকানাই তো আরও কিছুকাল আছেন। কাজেই নবদ্বীপের মা'র কথা শুনাইবার যোগ্যপাত্রের অভাব হইবে না। সময়ান্তরে তাঁহাকে এ-সব লইয়া খুব আক্রমণ করার সুযোগ তো পড়িয়াই রহিল। রামকানাই এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া স্ত্রীকে এই অশোভন শোরগোল থামাইতে বলিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রামকানাইয়ের মুখে এই যে উক্তি দিয়াছেন তাহার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন রসিকতা আছে। ভাইয়ের মৃত্যুর ঠিক পরেই রামকানাইয়ের মতো মানুষের পক্ষে এরূপ শোকতাপহীন অবিচলিত ভাব ও রসিকতা যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই উক্তির ভাষা চলিত নয়, সাধু। অন্যত্র সংলাপভাগে রবীন্দ্রনাথ চলিত-ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং রামকানাইয়ের মুখে এ যেন লেখকের উক্তি, এমন মনে হয়।

(২) নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা……মরিয়া থাকিবে। (অ. ৮)

রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্প হইতে অংশটি উদ্ধৃত। গুরুচরণ মৃত্যুর সময় যে উইল করিয়া যান তাহাতে নবদ্বীপ তাঁহার বিষয় হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়।

সেইজন্যই নৈরাশ্য ও ক্রোধে সে নিঃসন্তান জ্যেঠার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ করিবে না বলিয়া সংকল্প ঘোষণা করে। উদ্ধৃত অংশটি সেই প্রসঙ্গেই বিবৃত।

নবদ্বীপের অনেক আশা ছিল। গুরুচরণ নিঃসন্তান, সে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, সুতরাং বিষয়সম্পত্তির একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী। রামকানাইও এই ভরসাতে পুত্রকে বিবাহ করাইয়াছিলেন। আজ গুরুচরণের মৃত্যুকালে যখন দেখা গেল যে নবদ্বীপ গুরুচরণের খড়কুটাটিরও উত্তরাধিকার পাইল না, তখন নবদ্বীপের নৈরাশ্যের সীমা রহিল না। জ্যেঠার উপর তাহার ক্রোধ হইল চূড়ান্ত। কিন্তু প্রতিশোধের তো পথ নাই। গুরুচরণ মৃত। তাঁহার দাহের সময় নবদ্বীপেরই মুখাগ্নি করিবার কথা। শ্রাদ্ধ করার জন্যও সে-ই যোগ্য ব্যক্তি। এখন এই মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ না করিলে জ্যেঠার শাস্তি হয়। এই ভাবিয়া নবদ্বীপ ক্রোধভরে সেই মর্মে ঘোষণা করিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরে গুরুচরণের নাস্তিকতা বিবৃত করিয়াছেন। জীবৎকালে যে গুরুচরণ কোনো আচার-অনাচার মানিত না, মরার পর তাহার যে মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধের অভাবে কিছুমাত্র শাস্তি হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নবদ্বীপের ঝাল ঝাড়ার অন্য উপায় নাই। সে আপন বুদ্ধি ও সংস্কারমতো ভাবিল এই একটা মস্ত প্রতিশোধ লওয়ার পথ। আপাততঃ বিষয়লোভ অপেক্ষা তাহার ক্রোধ চরিতার্থ করার পথ আবিষ্কার করিয়া সে একটু শান্তিলাভ করিল। পরকালে গিয়া গুরুচরণ পিণ্ড পাইবেন না, অতএব তিনি অনাহারে মরিয়া থাকিবেন—মূর্খ নবদ্বীপের যেন এইরূপ অনুমান। নবদ্বীপের কথায় অবশ্য এই ধারণার প্রমাণ নাই। আসলে ইহা নবদ্বীপকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ।

(৩) বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে। (অ. ৯)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের অন্তর্গত। গুরুচরণের উপর নবদ্বীপের আক্রোশ এবং শাসানি উল্লেখ করিয়া লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন।

নবদ্বীপ জ্যেঠার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্র ক্ষেপিয়া গেল। কিন্তু জ্যেঠা তখন মৃত। নবদ্বীপ শাসাইতে লাগিল যে সে জ্যেঠার মুখাগ্নি করিবে না, পিণ্ডও দিবে না। এইভাবে ঝাল ঝাড়িবার ভাবটা যেন এই যে, ইহাতে জ্যেঠার যোগ্য শাস্তি হইবে। গুরুচরণ নাস্তিক ছিলেন। সুতরাং

মুখাগ্নি বা পিণ্ডের প্রতি তাঁহার লালসা না থাকারই কথা। কিন্তু মরার পর মানুষের নাকি ইহলোকের পিণ্ডাদিই একমাত্র আহার্য হয়। পরলোকে ভিক্ষা করিয়াও অন্ন মিলে না। যদি তাহাই হয়, তবে মরা বড় ঝকমারি। তাহার চেয়ে বাঁচিয়া থাকার অনেক সুবিধা। কারণ, এখানে জ্যেঠার বা অন্যের সম্পত্তি না পাইলেও পেট চালানো খুব দুষ্কর হয় না। আর কিছু না হউক, ভিক্ষার পথ তো সবার জন্য খোলা। আহার-সংস্থানব্যাপারে তাই ইহলোক পরলোকের চেয়ে অনেক ভালো জায়গা। সুতরাং এখানে বাঁচিয়া থাকায় অনেক লাভ আছে। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে এই তথ্য পরিবেশনের ছলে নবদ্বীপকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। অকাট অকর্মা নবদ্বীপ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হানিয়া খুব আত্মপ্রবোধ পাইয়াছে। কিন্তু বুঝে নাই ইহাতে মড়ার কিছু লাগে নাই। সে পিণ্ড না দিলে পরলোকে তাহার মৃত জ্যেঠার অনশনক্লেশ হইবে কিনা তাহা অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। যদি হয়, তবে অনশন অপেক্ষা আরও কষ্টের বিষয় হইবে এই যে, এইরূপ অপদার্থের উপরও আবার অন্নের জন্য নির্ভর করিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকাকালে নবদ্বীপের মতো অপদার্থেরও কোনোরকমে পেট চলে। মরিলে পেটের জন্য যদি ইহার মতো লোকের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে দুঃখ রাখিবার যে জায়গা হয় না। তাই মরার চেয়ে বাঁচার অনেক সুবিধা। রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যের খোঁচাটা এইখানেই।

(৪) বোঝাই গাড়ি-সমেত খাদের……দাদা নাই। (অ. ১১)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের অন্তর্গত। মৃত্যুকালে গুরুচরণ রামকানাইকে দিয়া যে উইল লেখাইলেন তাহাতে গুরুচরণের দ্বিতীয়া পত্নীই সব পাইলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইল। রামকানাই নিজের হাতে এইভাবে নিজপুত্রের ভবিষ্যৎ আশা নষ্যাৎ করার ক্রীড়নক হইলেন। এই কারণে বাড়ি ফিরিবামাত্র স্ত্রীর আক্রমণে তাঁহার কি অবস্থা হইল—উদ্ধৃত অংশে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

রামকানাইয়ের স্ত্রী গুরুচরণের শব-সৎকারের পূর্বেই তাঁহার গৃহে একপ্রস্থ শোরগোল করিয়া আসিয়াছে। রামকানাই তাহাতে বাধা দিয়া থামাইয়া দিয়াছেন। এখন তিনি বাড়ি ফিরিবামাত্র অবস্থা চরমে উঠিল। নবদ্বীপের মা তো একেবারে মারমুখো হইয়া উঠিলেন। এতদিনের এত আশা

রামকানাই নিজের হাতে নষ্ট করিলেন। ইহা তাঁহার চরম মূর্খতামাত্র নয়, যেন শত্রুতাও। নিঃসন্তান গুরুচরণের এই বিষয়টা নবদ্বীপই পাইবে এইরূপ একটা নিশ্চিন্ত আশা রামকানাইও পোষণ করিতেন। কাজেই তিনি যেন প্রকৃত অপরাধী এইভাবে কিছুকাল বিমূঢ় অবস্থায় রামকানাই খালি গালি খাইতে লাগিলেন। তাহার অবস্থাটা সত্যই বড় করুণ হইল। একটা মালবোঝাই গোরুর গাড়ি যখন খাদে পড়ে, তখন বলদটার বিড়ম্বনার অবধি থাকে না। সহস্র লাথি-গুঁতা খাইয়াও তাহার নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। নীরবে নিশ্চলভাবে তখন তাহাকে সব নির্যাতন সহিতে হয়। রামকানাইয়ের হইল ঠিক সেই অবস্থা। তাঁহার নিজের দোষে কিছু ঘটে নাই। উইল করিয়াছেন গুরুচরণ, তিনি তাহার লেখকমাত্র। গুরুচরণের ইচ্ছার উপর তো তাঁহার হাত নাই। সুতরাং অনেকক্ষণ পর তাঁহার বুদ্ধি খুলিল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ। উইল তো তাঁহার দাদা করিয়াছেন। গালমন্দের ভাগী যদি কেহ হন সে তিনি। আর রামকানাই যখন দাদা নহেন, তখন তাঁহার আর দোষ কি?

রামকানাই বুঝেন নাই যে এই উইলটা লেখার সময় চতুর লোক কিছু এদিক-ওদিক করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইত। তাহা তিনি করেন নাই বলিয়াই তাঁহার স্ত্রীর এই ক্রোধ।

(৫) হাড়জ্বালানী ডাকিনী……আয়োজন করিতেছে। (অ. ১৭)

উদ্ধৃত অংশ রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের অন্তর্গত। মৃত গুরুচরণের উইল জাল করিয়া বরদাসুন্দরীর সহিত নবদ্বীপ ঘোরালো মামলা বাধাইয়াছে এবং প্রয়োজন পড়ায় নির্বাসিত পিতাকে কাশী হইতে বাড়ি আনাইয়াছে। একদিন না যাইতেই সাক্ষীর সমন পাইয়া রামকানাই যখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন তখন নবদ্বীপের মা কাঁদিয়া-কাটিয়া উদ্ধৃত বচনে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জাল উইলটাই অবশ্য সমস্ত গণ্ডগোলের মূল। নবদ্বীপের মা সেদিক দিয়া গেল না। পুত্রস্নেহের অন্ধ আবেগ জাগাইয়া রামকানাইয়ের ন্যায়বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করাই হইল তাহার উদ্দেশ্য। কাজেই নবদ্বীপের মা বরদাসুন্দরীকে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিল। নবদ্বীপের জ্যেঠা গুরুচরণ নবদ্বীপের প্রতি বড় স্নেহপরায়ণ ছিলেন। অতএব বিষয় তাহাকেই দিয়া যাইতেন যদি না এই বরদাসুন্দরীর গোপন চক্রান্ত থাকিত—নবদ্বীপের মা-র ভাবটা যেন এইরকম।

দ্বিতীয়তঃ, আইন ও নীতির দিক্ দিয়া যেন নবদ্বীপই ঐ সম্পত্তির একমাত্র মালিক। এই কথাটা বিতর্কের মতো না রাখিয়া স্বতঃসিদ্ধের মতো রাখা হইয়াছে। রামকানাই তত বুদ্ধিমান্ নহেন, হয়তো এইটাই তিনি স্বীকার করিয়া লইবেন—এমনও হয়তো নবদ্বীপের মা আশা করিয়াছিল। তাই সে ব্যাখ্যা করিতেছে যে বরদাসুন্দরী নবদ্বীপকে উক্ত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হইতেই বঞ্চিত করিতেছেন না, এখন আক্রোশভরে তাহাকে জেলে দিবারও চক্রান্ত করিয়াছেন। এইভাবে সুকৌশলে সমস্ত প্রস্তাবের ভূমিকা করা হইল। রামকানাই যদি স্নেহান্ধ পিতামাত্র হইতেন, তবে নবদ্বীপের মায়ের এই ফাঁদে একেবারেই আটকা পড়িতেন। পুত্রের বিষয়লাভ উপলক্ষে একটা মস্ত জাল মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন শেষ পর্যায়ে পিতা রামকানাই ইহার ভাগ্য নিরূপণ করিবেন। সুতরাং নবদ্বীপের মা চোখের জলে করুণ করিয়া রামকানাইয়ের মধ্যে স্নেহান্ধ পিতাটিকে জাগাইতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহার পরই আসল ঘটনা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

(৬) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া·········সর্ব্বনাশ করিয়াছিস" (অ. ১৮)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পে রামকানাইয়ের উক্তি। উইল জাল করিয়া নবদ্বীপ তাহার বিধবা জ্যেঠাইমার সহিত যে মামলা বাধাইয়া বসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া রামকানাই বিস্ময়ে ক্ষোভে হঠাৎ এইরূপ বলিয়া উঠেন।

গুরুচরণ মরিবার পূর্বে উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নিজের স্ত্রীকে দিয়া যান। সে উইল লেখেন স্বয়ং রামকানাই। ইহাতে রামকানাইয়ের পুত্র নবদ্বীপের মা বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও উত্তেজিত হয়। তারপর তাহারা উইল জাল করিয়া উক্ত বিষয় উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে রামকানাইকে তাহারা কৌশলে কাশী পাঠাইয়া দেয়, মামলা পাকিয়া উঠিলে রামকানাইয়ের ডাক পড়ে। রামকানাই সানন্দে বাড়ি ফিরেন, কিন্তু একদিন যাইতেই তাঁহার হাতে সাক্ষীর সমন আসে। নবদ্বীপের মা ইহার হেতু ব্যাখ্যা করিতে থাকে। ক্রমে রামকানাই ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন। সম্পত্তির লোভে তাঁহার স্ত্রীপুত্র এতটা নীচে নামিতে পারে ইহা রামকানাইয়ের কল্পনারও অতীত ছিল। তাই এই ঘোর অন্যায়, এই মিথ্যা জুয়াচুরিতে তিনি যারপরনাই আহত ও বিস্মিত বোধ করেন। ইহার মধ্যে চূড়ান্ত মিথ্যাচারই শুধু নয়, দুঃসাহসও প্রকাশ পাইয়াছে। রামকানাই ইহার ফল মুহূর্তে বুঝিয়া লন।

ইহাতে যে একপক্ষের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী তাহা তিনি বুঝেন। তাই অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া তিনি অকস্মাৎ এইরূপভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়াছেন।

(৭) বাই জোভ······ঠেসে ধরেছিলুম। (অ. ২৫)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পে বর্ণিত ব্যারিস্টার ভদ্রলোকটির উক্তি। রামকানাইয়ের সাক্ষ্য-সম্বন্ধে ব্যারিস্টার মহোদয় এইরূপে আত্মগৌরব প্রকাশ করেন।

রামকানাই ছিলেন নিজপুত্র নবদ্বীপ ও ভ্রাতৃবধূ বরদাসুন্দরীর মধ্যে মামলার প্রধান সাক্ষী। তিনি নিজহাতে গুরুচরণের উইলটি লিখিয়াছেন। নবদ্বীপ সেই উইল জাল করিয়া জ্যেঠার সম্পত্তিলাভের চক্রান্ত করিয়াছিল। বরদাসুন্দরীর ব্যারিস্টার রামকানাইকে জেরা শুরু করেন। কিন্তু রামকানাই অত আঁকাবাঁকা পথে না গিয়া বিচারকের নিকট সহজ সত্যকথাটি সংক্ষেপে নিবেদন করেন। তাঁহার সত্যপরায়ণতা এইভাবে বরদাসুন্দরীর জয় ঘটায়। এই লইয়া ব্যারিস্টারটির তখন বাহাদুরি আরম্ভ হয়। ব্যারিস্টার বলিতে চান যে, তাঁহার জেরার ফলেই রামকানাই সত্য বলিয়া পার পান। তিনি তাঁহাকে এমনভাবে ঠাসিয়া ধরেন যে সত্য না বলিয়া রামকানাইয়ের আর উপায়ই ছিল না। আসলে রামকানাই তাঁহার জেরার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে নারাজই হন। এ-সব বাঁকা পথ এড়াইয়া তিনি স্বেচ্ছায় সত্যকথা বলেন। ইহাতে ব্যারিস্টারের বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নাই। কিন্তু ব্যারিস্টার চিরকাল ধূর্ত ও বাহাদুর—এখানে একটু নির্লজ্জও বটে। ইংরেজী কায়দায় একটা শপথ উচ্চারণ করিয়া মিথ্যা আত্মগরিমা প্রচার করিতে তাঁহার একটুও বাধে না। আইন-ব্যবসায়ীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এখানে রবীন্দ্রনাথ একটু খোঁচা দিয়াছেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের মূল নামটি উল্লেখ কর এবং সেই নাম পরিবর্তন করা কতটুকু সঙ্গত হইয়াছে তাহা বিচার কর।

উ.। উৎস ও নামকরণ দেখ

প্র. ২। (ক) 'সাক্ষী' গল্পের রবীন্দ্রনাথ 'সাক্ষী' বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছেন? সেই ব্যক্তি কিরূপে, কিসের সাক্ষী? (খ) এই সাক্ষী বলিতে যাহাকে বুঝাইতেছে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনা লেখ।

উ.। (ক) 'সাক্ষী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ রামকানাইকে সাক্ষীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

রামকানাই তাঁহার অগ্রজ গুরুচরণের উইলের সাক্ষী। তিনি নিজের হাতে এই উইল লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে মুমূর্ষু গুরুচরণ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। গুরুচরণের স্বাক্ষর দুষ্পাঠ্য হইয়াছিল। এই কথা জানিয়া রামকানাইয়ের পুত্র উইলটি জাল করায় এবং উহাতে সুস্থ অবস্থায় গুরুচরণের স্বাভাবিক স্বাক্ষর অবিকল নকল করাইয়া লয়। এই লইয়া মামলা বাধিলে কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি জাল—সে-সম্বন্ধে রামকানাই সাক্ষী হন এবং সত্য সাক্ষ্য দিয়া আসল উইলকে জয়যুক্ত করেন।

(খ) সুতরাং রামকানাই উল্লিখিত সাক্ষী। তাঁহার চরিত্রই এই গল্পটির কেন্দ্র। রামকানাই নিত্যকালের সাধারণ সরল বাঙালী; তাঁহার সংসার-আসক্তি ও বিষয়চিন্তা সকলই সাধারণভাবে আছে। কিন্তু মিথ্যাচার, অপরকে প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষগুলি তাঁহার নাই। নিরীহ ভালোমানুষ বলিলেই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না; বলিষ্ঠ নীতিবোধই তাঁহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দিক।

স্ত্রীর প্রতি রামকানাইয়ের অনুরাগ ছিল। তবে স্ত্রীকে ভালোবাসার চেয়ে ভয়ই করিতেন রামকানাই বেশী। ইহার কারণ রামকানাইয়ের ভীরু স্বভাব নহে, তাহার স্ত্রীর ভয়ংকরী প্রকৃতি এবং তাঁহার নিজের শান্তিপ্রিয়তা। পুত্রের জন্যও তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ ও যত্ন ছিল না এমন নহে। বস্তুতঃ পুত্রের ভবিষ্যতের কথা তাঁহার মনেও ছিল। ছিল বলিয়াই দাদার বিষয়লাভের আশা তাঁহার মধ্যেও বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই আশায় যখন রামকানাই হতাশ হন, তখন তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠে। দাদার নির্দেশে উইল লিখিবার সময় তাঁহার কলমটি যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে, তাঁহার বড় আশা গুরুচরণ সব নবদ্বীপকেই দিয়া যাইবেন। সেইজন্যই মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া উইল লিখিতে বলিয়াছিলেন রামকানাই। বহু পূর্বে এই আশায় ভর করিয়াই রামকানাই পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অনিবার্য দুর্ভাগ্যের মতো উইলটি যখন তাঁহার একান্ত আশায় বাজ হানিল, তখন রামকানাই নীরবে তাহা সহ্য করিলেন। ইহার কারণ রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা নহে, সাধুতা।

রামকানাই আসলে নিরীহ ভালোমানুষ। স্ত্রী-পুত্রের তাড়নায় তাঁহার জীবন দুর্বিসহ হইয়াছিল। কিন্তু মজ্জাগত সততা তাঁহার অটুট রহিয়াছে। এইখানেই তাঁহার বলিষ্ঠতা। জাল-জুয়াচুরির সম্ভাবনা তিনি কখনও কল্পনা করিতে পারেন

নাই। সংসারের বিষময় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁহাকে যেন এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত করিতে পারে নাই। অবশেষে তাঁহারই ঘরে কিনা ঘৃণ্য প্রবঞ্চনার হীন ষড়যন্ত্র! রামকানাই যে এতটা ভাবিতে পারেন নাই সম্ভবতঃ এইটাই তাঁহার একমাত্র নির্বুদ্ধিতা। স্ত্রীপুত্রকেও তাঁহার ভালো করিয়াই জানা ছিল। জানা ছিল যে তাহাদের বিবেকের বালাই নাই, বিষয়ের লোভে দুনিয়ার অন্য অনেক চক্রান্তকারীর ন্যায় ইহারাও যে সবই করিতে পারে ইহা তাঁহার বুঝা উচিত ছিল। রামকানাই নির্বোধ, কিন্তু শুধু নির্বোধ নন—নির্বিরোধ। সাধু-প্রকৃতির। তাই জাল-উইলের মামলার সংবাদ জানিয়া রামকানাই স্তম্ভিত হইয়া যান। ইহার পর তাঁহার অন্নজল রোচে নাই। স্ত্রীপুত্রের জঘন্য মিথ্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করেন রামকানাই সাক্ষীর কাঠগড়ায়—সত্যকথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। কারণ বোধহয় এই যে, ইহার পরিণাম রামকানাই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। পুত্রের কারাবাস, সংসারে অশান্তি প্রভৃতি ভাবিয়াই বোধহয় তাঁহার চেতনা লোপ পায়।

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পে বর্ণিত 'নবদ্বীপের মা' চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। 'সাক্ষী' গল্পে মূল চরিত্র রামকানাই, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী নবদ্বীপের মা-ই সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও উপভোগ্য চরিত্র। রামকানাই তাঁহার কঠোর শাসনে নেহাত বশংবদ কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। এই করাল কঠোর রূপই নবদ্বীপের মা-র প্রধান পরিচয়।

সাধারণ বাঙালী ঘরণীর মতো স্বামী পুত্রের স্নেহমধুর সেবার ভাব তাহার মধ্যে ছিল না। স্বামীকে সে কতটা শ্রদ্ধা করিত জানা যায় না, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে যে যথেষ্ট অশ্রদ্ধা করিত, তাহার প্রমাণ আছে। রামকানাই ভালোমানুষ বলিয়াই তাহার নিকট অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন। বিষয়বুদ্ধি ছিল না বলিয়াই রামকানাই তাহার নিকট গঞ্জনা সহ্য করিতেন। এ-বিষয়ে পুত্রকে নবদ্বীপের মা অনেক বেশি মান্য করিত। ইহার মধ্যে নবদ্বীপের মা-র বিকৃত পুত্রস্নেহ আছে। নবদ্বীপ তাহার একমাত্র পুত্র, 'সোনার চাঁদ' না হইলেও সবেধন নীলমণি। কাজেই পুত্র-সম্বন্ধে তাহার দুর্বলতা অমার্জনীয় নয়। কিন্তু নবদ্বীপের মা-র বিষয়-লালসা অতিশয় উগ্র। ভাসুরের সম্পত্তি পুত্রের যে অনিবার্য প্রাপ্য একথা অবশ্য রামকানাই হইতে সকলেরই বহুকাল পূর্বে নিশ্চিত ধারণা ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে তাহা হইতে নবদ্বীপ বঞ্চিত হওয়ায় নবদ্বীপের মা-র ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষটার মধ্যে সততার

বালাই ছিল না। ছিল না বলিয়াই অপ্রত্যাশিত উইলটা তাহার মধ্যেকার লালসাকে কদর্যভাবে উগ্র করিয়া তোলে। রামকানাইকে এই লইয়া যখন নবদ্বীপের মা ঠেস দিতেছে, যখন বলিতেছে—'না, তুমি বড় ভালমানুষ' ইত্যাদি তখন তাহার মধ্যেকার ব্যবহারিক নীতিবোধটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গুরুচরণ নবদ্বীপকে সম্পত্তি দেন নাই বলিয়া তাহার নিকট মন্দ। আর রামকানাই সেই উইল লেখার সময় বরদাসুন্দরীর স্থলে নবদ্বীপের নাম না বসাইয়া দোষী। অতএব দুই ভাইকেই নবদ্বীপের মা নির্বোধ ভালোমানুষ অর্থাৎ খারাপ জ্ঞান করিল। একটু সংসারী হইলে রামকানাই পুত্রের স্বার্থ দেখিতেন। আর একটু দৃঢ় হইলে গুরুচরণ স্ত্রৈণতা পরিহার করিয়া তাঁহার বংশের একমাত্র প্রদীপ নবদ্বীপকে সব দিয়া যাইতেন। ইহাই বোধহয় নবদ্বীপের মা-র ধারণা।

নবদ্বীপের মা-র নীতিজ্ঞান এইভাবে স্বার্থবুদ্ধিরই নামান্তর। শোভনতাবোধও তাহার একেবারে নাই। মৃত ভাসুরের শবটার সংকারও যখন হয় নাই তখন তাঁহার উপর গালমন্দ করা অত্যন্ত কুৎসিত। তারপর রামকানাইকে কাশী পাঠাইয়া পুত্রের জাল-জুয়াচুরির সহায়তা করা তাহার মতো রমণীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু নবদ্বীপের মা নির্বোধ ছিল না। সে স্বামীকে মোকদ্দমার বিষয় বলিবার সময় চোখের জলে নাকের সুর ভিজাইয়া যেমনভাবে প্রসঙ্গ তুলিয়াছে তাহাতে বাহাদুরি আছে। রামকানাই নেহাত ভালোমানুষ। নইলে তাঁহার পিতৃহৃদয় তখনই পুত্রের স্বার্থচিন্তায় অন্ধ বাৎসল্যে সব ন্যায়বুদ্ধি পরিহার করিত। যখন তাহা করিল না, তখন কঠোর করালরূপে নবদ্বীপের মা স্বামীকে ব্যবহারিক নীতি শিখাইতে লাগিল। রামকানাই নেহাত দুর্বল সাধুব্যক্তি, তাই সব মাটি হইয়া গেল। নবদ্বীপের মা সেইজন্যই রামকানাইয়ের নামে পরিচিত হইবার যোগ্য নয়। সে রামকানাইয়ের পত্নী, কিন্তু সহধর্মিণী নয়। নবদ্বীপের সহিত তাহার প্রকৃতির সামঞ্জস্য। এইজন্য সে শুধু নবদ্বীপের মা। স্বামী নয় ধর্ম নয় নীতি নয়—মাত্র নবদ্বীপের স্বার্থই তাহার জীবনের ধ্রুবতারা। তাই সে শুধু নবদ্বীপের মা।

প্র. ৪। রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পে গুরুচরণের উইলের মর্ম জানিয়া কাহার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হইল ?

উ.। সংক্ষিপ্তসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

প্র. ৫। রবীন্দ্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের বিবরণ অনুসরণ করিয়া নবদ্বীপ ও বরদাসুন্দরীর মধ্যে মামলার আনুপূর্বিক কাহিনী লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ৬। 'সাক্ষী' গল্পের কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ৭। 'সাক্ষী' গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ.। সমালোচনা দেখ।

প্র. ৮। "কিন্তু উপস্থিত-মতো ইহা ছাড়া আর কোন প্রতিশোধের পথ ছিল না।"

(ক) এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ কি? (খ) এখানে কাহার প্রতি কাহার প্রতিশোধের কথা বলা হইয়াছে এবং কেনই বা প্রতিশোধের কথা উঠিয়াছে? (গ) 'উপস্থিতমতো' ক প্রতিশোধের ব্যবস্থ হইল? ইহাতে প্রতিশোধের পাত্র কি জব্দ হইবে বলিয়া তোমার মনে হয়?

উ.। (ক) উদ্ধৃত মন্তব্যটি 'সাক্ষী' গল্পে নবদ্বীপের শূন্য আস্ফালন-প্রসঙ্গে প্রযুক্ত। নবদ্বীপ তাহার মৃত জ্যেঠা গুরুচরণের মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধশান্তি করিবে না বলিয়া শাসাইল। এই শাসানির হেতু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেই লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

(খ) এখানে গুরুচরণের প্রতি নবদ্বীপের প্রতিশোধের কথাই বলা হইয়াছে। গুরুচরণের মরার পূর্বে উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বরদাসুন্দরীকে দিয়া যান। নবদ্বীপ তথা তাহার মাতা-পিতার একান্ত বিশ্বাস ছিল এ বিষয়টা গুরুচরণ তাহাকেই দিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ এজন্য রামকানাই তাহাকে বিবাহও করাইয়াছিলেন এবং ফলে পুত্রকন্যায় নবদ্বীপের সংসার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই সম্পত্তি হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া নবদ্বীপ জ্যেঠার উপর প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল।

(গ) কিন্তু গুরুচরণ তখন মৃত। তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার সাধারণ পথ ছিল না। তাই নবদ্বীপ ঠিক করিল সে জ্যেঠার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধশান্তি করিবে না। গোঁড়া হিন্দুসংস্কারে মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধশান্তির কামনা প্রত্যেক বৃদ্ধেরই থাকে। তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহাদের একপ্রকার শাস্তি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুচরণ এ সংসারের ধার ধারিতেন না। জীবৎকালে তিনি নাস্তিক ছিলেন। কাজেই মরিয়া মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধের অভাবে তিনি খুব শাস্তিভোগ করিবেন বা জব্দ হইবেন একথা মনে হয় না।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি ঃ পৃথগন্ন = পৃথক্ + অন্ন। মুখাগ্নি = মুখ + অগ্নি। সদ্যোমৃত = সদ্যঃ + মৃত। কারাবরুদ্ধ = কারা + অবরুদ্ধ।

সমাস ঃ ধর্মপত্নী—ধর্মের জন্ম পত্নী (সংস্কৃতমতে তাদর্থ্যে ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ, বাঙলামতে ৪র্থীতৎপুরুষ)। অপুত্রক—অবিদ্যমান অর্থাৎ নাই পুত্র যাহার (বহুব্রীহি), সে। উত্তরাধিকারী—উত্তর (=পরবর্তী) অধিকারী (কর্মধারয়)। পৃথগন্ন—পৃথক্ অন্ন যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা। নিস্ফল—নিঃ (=নাই) ফল যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা। মুখাগ্নি—মুখে অগ্নি—(৭মীতৎপুরুষ)। সদ্যোমৃত—সদ্যঃ মৃত (সুপ্‌সুপা)। যত্নপূর্বক—যত্ন পুর্বে যে কাজে (বহুব্রীহি), তাহা। নিরুপায়—নিঃ (= নাই) উপায় যাহার (বহুব্রীহি), সে। উইল-জালের—উইলের জাল (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার। যথাসময়ে—সময়কে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব), তাহাতে। হাড়জ্বালানী—হাড় জ্বালায় যে নারী (উপপদ-তৎপুরুষ)। স্নেহশীল—স্নেহ শীল অর্থাৎ স্বভাব যাহার (বহুব্রীহি), সে। চক্ষুস্থির—স্থির যে চক্ষু (কর্মধারয়—বিশেষণের পরনিপাত)। হতবুদ্ধি—হত হইয়াছে বুদ্ধি যাহার (বহুব্রীহি), সে। অশ্রুবিসর্জন—অশ্রুর বিসর্জন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। করাঘাত—করের দ্বারা আঘাত (৩য়াতৎপুরুষ)। পার্শ্ববর্তী—পার্শ্বে বর্তে অর্থাৎ থাকে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। কারাবরুদ্ধ—কারায় অবরুদ্ধ (৭মীতৎপুরুষ)। কর্মনাশা—কর্ম নাশ করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ (।

সমস্তপদ-গঠন ঃ অত্যন্ত দুর্বল = অতি দুর্বল।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ স্থাবর—স্থা+বরচ্। দুঃসাধ্য—দুর্—সাধ্+ণ্যৎ কর্মবাচ্যে। বক্তব্য—ব্রূ বা বচ্ + তব্য। স্থানান্তরিত—স্থানান্তর (বিশেষ্য) +ণিচ্ (নামধাতু)+ক্ত। মামাতো—মামা+তো। সাক্ষ্য—সাক্ষিন্+য। সাক্ষী—সাক্ষাৎ (অব্যয়)+ইন্। ন্যায্য—ন্যায়+য। মূর্চ্ছিত—মূর্চ্ছা+ইতচ্। এমনতরো—এমন+তরো।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ জবাব দিয়া গেল—এখানে 'জবাব দেওয়া'-র অর্থ বাঁচিবার কোন আশা নাই এই কথা জানানো, অতএব এটি বিশিষ্টার্থক।

কলম সরিতেছিল না—উৎসাহ হইতেছিল না—বিশিষ্টার্থক। এই ধরনের আরও প্রয়োগ : পা উঠা, হাত সরা ইত্যাদি।

শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া—আসল বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি হইল 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়া' (বা দিয়ে). অর্থ—শত্রুর সকল অশুভ কামনা ব্যর্থ করিয়া। রবীন্দ্রনাথ এখানে রসিকতার জন্য শব্দগুচ্ছটির সংস্কৃত রূপ দিয়াছেন।

সোনার চাঁদ=রূপবান্ তথা গুণবান্। রসিকতায় ক্ষেত্রে কুরূপ এবং গুণহীনকেও 'সোনার চাঁদ' বলা হয়।

জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে—এখানে 'কাল হওয়া'=মৃত্যু হওয়া। 'ঘোর বিপদের কারণ হওয়া' অর্থেও 'কাল হওয়া'-র প্রয়োগ হয় : 'কাল হ'ল তাঁতীর এঁড়ে গোরু কিনে'।

জিভ কাটিয়া=দাঁতের সাহায্যে প্রসারিত জিহ্বা চাপিয়া ধরিয়া, লজ্জিত হইয়া। দ্বিতীয় অর্থে বিশেষার্থক প্রয়োগ।

পেট চলিয়া যায়=উদরান্নের সংস্থান হয়। বিশিষ্টার্থক।

লইয়া পড়িলেন=বোঝাপড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল—এখানে 'পাকিয়া উঠা'র অর্থ 'পরিণতির নিকটবর্তী হওয়া'।

লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম—এখানে 'ঠেসে ধরা'-র অর্থ 'কথার সাহায্যে বেকায়দায় ফেলা, কথার জালে জড়ানো'।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই (নেতিবাচক)—বিবাহ সফল হইয়াছিল (অস্তিবাচক বা স্থাপনাত্মক)।

তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিও (জটিল)—তোমার বক্তব্য অবসরমতো আমাকে বলিও (সরল)।

গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না (নেতিবাচক)—গুরুচরণ লোকটা ছিল সব-কিছুতেই আস্থাহীন (অস্তিবাচক)।

নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে—নবদ্বীপের একটা সান্ত্বনা হইল যে লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে ('সান্ত্বনা'-কে কর্তৃপদ করিয়া)।

কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না—কিন্তু উপস্থিতমতো ইহাই ছিল প্রতিশোধের একমাত্র পথ (নঞর্থ পরিহার করিয়া)।

এ বিষয় আমিই পাইব (নিশ্চয়ার্থক)—এ বিষয় আমি ছাড়া আর কেহই পাইবে না (নেতিবাচক)।

সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষী জুটাইব"—সে দিদিকে অভয় দিয়া বলিল যে তাহার ভাবনা নাই, সে সাক্ষ্য দিবে এবং আরো সাক্ষী জুটাইবে (পরোক্ষ উক্তি)।

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন (জটিল)—ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিলে নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন (সরল)।

যাহা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই - বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া লই (বাক্য-সংক্ষেপে)।

আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা—আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রের দ্বারা যে উইল দাখিল করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা (বাচ্যান্তর)।

লোক কে চিনতে পারে। লোক কেউ চিনতে পারে না (নেতিবাচক)।

নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে—নিশ্চয়ই বৃদ্ধের দ্বারা ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলা হইয়াছে (বাচ্যান্তর)।

এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিয়া মিলে না—এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহরে অদ্বিতীয় (নঞর্থ পরিহার করিয়া)।

কারক ও বিভক্তি : আমার বিষয়সম্পত্তি শ্রীমতী 'বরদাসুন্দরীকে' দান করিলাম (সম্প্রদানে-কে)। গুরুচরণ নির্জীব 'হস্তে' সই করিলেন (করণে -এ)। লোহার 'সিন্দুকে' যত্নপূর্বক রাখিয়া দিও (অধিকরণে-এ)। 'আদালত হইতে' এক সাক্ষীর সমন পাইলেন (অপাদানে 'হইতে' বা ৫মী)। সে উইল আমি নিজ 'হস্তে' লিখিয়াছি (করণে -এ)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ : ধর্মপত্নী, অপুত্রক, সদ্যোমৃত, স্থানান্তরিত, তণ্ডুল, কর্মনাশা, অনুগত।

ব্যাকরণগত টীকা : স্থানান্তরিত—'প্রকৃতি-প্রত্যয়' অংশে দ্রষ্টব্য।

রামকানাইকে (ডাক পড়িল)—প্রয়োগটি একটু অদ্ভুত। 'রামকানাইকে' দেখিতে দ্বিতীয়ান্ত হইলেও আসলে ষষ্ঠ্যন্ত (রামকানাইয়ের), এবং এরূপ ক্ষেত্রে ষষ্ঠ্যন্ত করিয়া অনেকে লেখেনও। এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ('আমাকে বড় জ্বর হয়েছে'-র মতো) বীরভূমের উপভাষার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

শুষ্করসনা (বৃদ্ধ)—শুষ্ক রসনা যাহার সে = 'শুষ্করসন' (বহুব্রীহি সমাসে—যেমন 'কৃতবিদ্য') হওয়া উচিত, কারণ ইহা পুংলিঙ্গের 'বৃদ্ধ' পদের বিশেষণ। রবীন্দ্রনাথ অর্থের গোলযোগ এড়াইবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া 'রসনা' রাখিয়াছেন।

স্বর্গীয় (গুরুচরণ)—'ভারতবর্ষ' কাহিনীর 'ব্যাকরণগত টীকা' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন। "তিনি পঁচিশ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করিয়া শিক্ষাবিভাগে যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরল ভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্তমানেও বিস্ময় সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব তিনি জলের মতো বুঝাইয়া দিতেন। ...আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।...

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদ, রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্তিস্তম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে পরিষদ-মন্দিরের ইটের পর ইট গাঁথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ...বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু, বাঙ্গালার অবদান, এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতি চাদর পরিয়া রিপন কলেজের অধ্যক্ষতা করিতেন।" বাঙ্গালায় প্রবন্ধ পড়িবার রীতি ছিল না বলিয়া তিনি দুই-দুই বার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিডার' হইতে অস্বীকৃত হন। তৃতীয় বার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তিনি 'রিডার' নির্বাচিত হইয়া বাঙলায় প্রবন্ধপাঠের অনুমতি পান এবং বেদ-সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইদিনই প্রথম বাঙলা ভাষার স্থায়ী সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের আরো বিচিত্র কীর্তির কথা ও সাহিত্য সকল ছাত্রেরই বিশেষভাবে পড়ার যোগ্য।

উৎস ও নামকরণ—রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিতকথা' নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধটি আংশিকভাবে গৃহীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র-সমালোচনাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ইহার মধ্যে লেখক অক্ষয়কীর্তি বিদ্যাসাগরের একটি মহামহিম মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রবন্ধটির শীর্ষনাম এইজন্য সাধারণ অর্থ ছাড়াও বিশেষ তাৎপর্যে সার্থক।

সমালোচনা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই প্রবন্ধটি বোধ হয় বাঙলা-ভাষায় বিদ্যাসাগরচরিত্র সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিচার। প্রথমতঃ বস্তু ও যুক্তির গুরুত্বেই প্রবন্ধটি যে কোনো শ্রেষ্ঠ চরিত্র সমালোচনার সহিত সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে। তাহার উপর ভাষা ও ভাবের, উপমা তুলনা ও বিশ্লেষণের সৌন্দর্যে প্রবন্ধটির তুলনা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙালীত্ব লইয়া আলোচনাকালে লেখক যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেও ভাব ও ভাবনায় ছিলেন খাঁটী বাঙালী।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এযাবৎ বাঙালীমাত্রেই মাথায় স্থাপন করিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রমহিমা সকলে না হউক, কয়েকজন বুঝিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিদ্যাসাগর বিদ্যার আর দয়ার সাগর ছিলেন, তিনি বাঙলা গদ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন—এইটুকু সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সেই ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা সকলের সম্যক্ জানা নাই। এই প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই অভাব মটিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার অনন্য সুন্দর বিশ্লেষণভঙ্গীতে বিদ্যাসাগরের বিপুল মহত্ত্বের মূলে আলোকপাত করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, একটা অটল পৌরুষ। ইউরোপীয় চরিত্রের সহিত এইটুকুই বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য এবং এইখানেই সাধারণ বাঙালীর চরিত্রের সহিত তাঁহার প্রকাণ্ড বৈসাদৃশ্য। অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি বাঙালী। রামেন্দ্রসুন্দর তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এই বাঙালীত্ব স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের উগ্র জাতীয়তা-বোধও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই বাঙালীত্বের জন্য তাঁহার আবাল্য সংস্কার, পরিবেশ ও শিক্ষাই মাত্র দায়ী নহে—জন্মসূত্রে লব্ধ অন্য কতকগুলি গুণও বটে। এই গুণগুলির মধ্যে ছিল তাঁহার অসীম সমবেদনা, পরদুঃখে অদ্ভুত কাতরতা প্রভৃতি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই কাতরতা দুর্বলতা নহে, শক্তি এবং শক্তির আবরণে ছিল একটা কঠোর ব্যক্তিত্ব। মানুষটিকে এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের

সাধনায় প্রেরণা ও কৃতিত্ব চমৎকার বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে বিদ্যাসাগরকে আমাদের সম্মুখে তিনি প্রকৃতরূপে স্পষ্ট ও আরো মহান্ করিয়া তুলিয়াছেন। বিচারপন্থায় চরিত্রের এই যে রূপায়ণ—ইহার মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্রিয়া দেখি। বিচারের বিশ্লেষণে ভাঙা, আবার কল্পনার সংশ্লেষণে গড়া—এই দুই পদ্ধতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে এই প্রবন্ধে। অথচ রামেন্দ্রসুন্দরের স্বভাবসিদ্ধ সংযম ও প্রাঞ্জলতা কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নাই। এই প্রবন্ধে একটিও অবান্তর কথা নাই। বস্তুতঃ ইহার প্রতিটি বাক্য যেন হীরকের মতো উজ্জ্বল, দৃঢ় ও সারগর্ভ। এই কারণে অবশ্য প্রবন্ধটি পরিণত পাঠকের যোগ্য। তথাপি সকল বয়সের পাঠকের পক্ষেই ইহার উপভোগ্যতা রহিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার—বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার যন্ত্রস্বরূপ। তাঁহার তুলনায় বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিরাও নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং আমাদের বহুগর্বের বাঙালীত্ব অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। চতুর্দিকের এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ধবলগিরির ন্যায় উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। উহার সমকক্ষ হইবার বা উহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই।

যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরতা বিদ্যাসাগর-চরিত্রের প্রধান উপাদান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্ত অভাব। এইরূপ সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরতা প্রাণিজগতে দেখা যায় উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা ইহার অভাবে দুর্বল ও অনুন্নত। সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তিতে বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে তুলনাবিহীন। তিনি যেন এই শক্তি লইয়াই জন্মিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে দুর্বল বাঙালীজাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের ন্যায় একজন অসীমশক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। এমন দুর্দম ও অনমনীয় প্রকৃতি, সহস্র বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত পুরুষকার, অকুতোভয়তা ও সর্বদা আপনাকে ছলনাচাতুরীর ঊর্ধ্বে রাখিবার উপযুক্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি লইয়া বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে সকল জাতিকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অহরহঃ কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়, যাহারা আঘাত সহিতে ও প্রত্যাঘাত হানিতে জানে, তাহাদের মধ্যেই এইরূপ দুর্দমতা, কঠোরতা ও দুর্ধর্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্বল বাঙালীজাতির মধ্যে এইরূপ উদাহরণ কিরূপে মিলিল তাহা ভাবিবার কথা।

অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বহু গুণ ইউরোপীয়দের সহিত সংস্পর্শের ফলে বিকশিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দের চরিত্রে যে পুরুষকার দেখা যায়, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার অভাব, তাহা বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে ছিল। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জীবনই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। নিঃসন্দেহে এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি জন্মসূত্রে পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে এমন তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও শক্তিমত্তার অধিকারী হইয়াছিলেন যাহার ফলে সংগ্রামে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হন নাই। যেভাবে তিনি জীবনের দুর্গম পথে সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার উদাহরণ পৃথিবীতে, বিশেষতঃ বাঙালীর মধ্যে, দুর্লভ।

অথচ সাধারণ বাঙালীর সহিত এত পার্থক্য-সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি বাঙালী। জন্ম হইতে বাল্যকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। পরে অবশ্য ইউরোপীয় বহুলোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্যের কোনো প্রভাবই উঁহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। জন্ম হইতে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি বাঙালীই ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য এত প্রবল ছিল যে পরের গুণ অনুকরণ করিবার প্রয়োজন তাঁহার মোটেই হয় নাই। পাশ্চাত্ত্যজাতিসুলভ যে গুণ তাঁহার চরিত্রে দেখা যায়, তাহা হয় তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, না হয় জন্মসূত্রে লব্ধ পূর্বপুরুষের সম্পত্তি।

বাঙালীর মধ্যে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদের হীন অনুকরণস্পৃহার প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর স্বদেশী চটিজুতা ব্যবহার করিতেন। এই চটিজুতার সাহায্যেই তিনি সদর্পে তাঁহার বাঙালীত্ব জাহির করিতেন। পরের অনুকরণ দূরের কথা, তাঁহার প্রকৃতিতে এমন কয়েকটি গুণ ছিল যাহা পাশ্চাত্ত্যজাতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এইখানেই তাঁহার অসাধারণত্ব।

বিদ্যাসাগরের পরোপচিকীর্ষা সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাপার। ইহা যুক্তিবুদ্ধি বা শাস্ত্রনির্দেশের দ্বারা চালিত হইত না। এই পরোপচিকীর্ষার প্রেরণায় তিনি এমন কাজ করিয়াছেন যাহা আধুনিক সমাজতত্ত্ব অনুমোদন করিবে না। লোকের দুঃখ দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। দুঃখ দেখিলেই তিনি অভিভূত ও আত্মহারা হইতেন এবং ছুটিয়া যাইতেন তাহা মোচন করিতে। দুঃখী ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনোরূপ অনুসন্ধান বা বিচার-বিবেচনা করিবার অবসর তাঁহার হইত না।

রামায়ণ ও উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া তিনি 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নায়ক রামচন্দ্রের একটা অপবাদ আছে যে তিনি অতি তুচ্ছ কারণে কাঁদিয়া ভাসাইতেন। বিদ্যাসাগরের প্রকৃতিটাও এই রামচন্দ্রেরই তুল্য। ক্রন্দনপ্রবণতা ছিল তাঁহার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দুঃখের কথা শুনিলে, বালবিধবার ম্লানমুখ দেখিলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদে তিনি শিশুর মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িতেন।

(বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি ছিল কঠোরে-কোমলে গড়া। বাহিরটা বজ্রের মতো কঠোর হইলেও বহুনিন্দিত ক্রন্দনই ছিল তাঁহার কোমল হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। এইখানেই তাঁহার ভারতীয়ত্ব, তাঁহার অসাধারণত্ব। নিজের সুখদুঃখে তিনি থাকিতেন সম্পূর্ণ উদাসীন, অথচ পরের দুঃখে ক্রন্দন না করিযা পারিতেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানী সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিদের উপদেশ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিত না।

সমাজসংস্কারক-হিসাবে বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান কীর্তি বিধবাবিবাহ-প্রথার প্রবর্তন। কঠোরতা ও কোমলতায় মিশাইয়া তাঁহার চরিত্রের সমগ্র রূপটি এই আন্দোলনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। নিষ্ঠুর প্রকৃতির হাতে নানা ভাবে নির্যাতিত দুর্বল মানুষের উপর মানুষ তথা সমাজের অত্যাচার ছিল তাঁহার সহনাতীত। তাই বালবিধবার দুঃখ দেখিয়া বিগলিত তাঁহার হৃদয় হইতে মন্দাকিনীর পবিত্র ধারার ন্যায় করুণার প্রবল ধারা প্রবাহিত হইয়া ছিল ; দেশাচার, সমাজ— কাহারও সাধ্য নাই তাহাতে বাধা দেয়। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কঠোরতার ইহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।)

বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী নহেন এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। **অনুবীক্ষণ**—যে যন্ত্রের দ্বারা অতিসূক্ষ্ম বস্তু বা চক্ষুর অগোচর অণু-পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে microscope বলে। **পদার্থ বিদ্যা শাস্ত্রে**—বিজ্ঞানের যে শাখা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করে তাহার নাম পদার্থবিদ্যা (Physics)। পদার্থের ধর্ম এবং আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির (energy) প্রকাশ ও স্বরূপ

ইহার আলোচ্য বিষয়। **বড়ো জিনিসকে······নির্দিষ্ট থাকিলেও**—পদার্থ-বিদ্যার 'আলোক' (Light বা Optics)-শাখায় একপ্রকার lens বা কাচের উল্লেখ আছে যাহার দ্বারা বড় জিনিসকে ছোট দেখা যায়। ফটো তুলিবার ক্যামেরায় যে lens লাগানো থাকে, তাহা সবই এক ধরনের। ঐ উদ্দেশ্যে—বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র জীবনকথা, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব যে গ্রন্থে আলোচিত হয়। **যাহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত**—দৃঢ়তা, সত্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের জন্য যাঁহাদিগকে আমরা মহান্ বলিয়া মনে করি। **তাঁহারা সহসা অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন**—অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের বিপুল মহত্ত্বের তুলনায় তাঁহাদের মহত্ত্বকে নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। বড় ততক্ষণই বড় থাকে যতক্ষণ আরো বড়ো কিছু তাহার পাশে আসিয়া না দাঁড়ায়। বৃহত্তরের পাশে তাহার বড়ত্ব আর বড়ত্ব থাকে না, ক্ষুদ্রত্ব হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে যিনি যাহা, তিনি তাহাই থাকেন। অন্যের পাশে তাঁহার ক্ষুদ্রত্ব আপেক্ষিক **বাঙালীত্ব**- বঙ্গদেশবাসী জাতিগত বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, জীবন-যাত্রাপদ্ধতি ইত্যাদির সামগ্রিক রূপ। আমরা—বাঙালীরা। **অহোরাত্র**—দিনরাত। অহঃ এবং রাত্রি (দ্বন্দ্বসমাস)। আস্ফালন করিয়া থাকি সগর্ব দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকি। শীর্ণ - ক্ষীণ। কলেবর—শরীর, আকার। **এই যে বাঙালীত্ব···ধারণ করে** যে বাঙালীত্ব আমাদের পক্ষে গর্বের বস্তু, তাহারই একটা মহত্তর ও উন্নততর রূপ বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখি বলিয়া আমাদের বাঙালীত্ব তুলনায় নিতান্ত খর্ব হইয়া যায়। **চতুষ্পার্শ্বস্থ**—চারিদিকের। 'চতুঃপার্শ্বস্থ' পদও শুদ্ধ। মূর্তি- দেহ বা ব্যক্তিত্ব। **ধবলগিরি**—হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত উচ্চ শৃঙ্গগুলির অন্যতম। ইহা নেপালে অবস্থিত এবং উচ্চতায় ২৬,৮০০ ফুট। শীর্ষ মস্তক। **স্পর্শ করে**—নাগাল পায়।

অ. ২। **উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড**—মহৎ ও বলিষ্ঠ চরিত্রে যাহা প্রধান উপাদান। এখানে চরিত্রকে জীবদেহ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। **তাহার**--সেই মেরুদণ্ডের অর্থাৎ প্রধান উপাদানের। একান্তই অসদ্ভাব—নিতান্ত অভাব। **প্রাণিতত্ত্ববিদেরা** - জীববিদ্যাবিশারদেরা ; যাহারা নানা-জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি, দৈহিক গঠন, প্রজনন প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। মেরুদণ্ড দেখিয়া—অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব বা অভাব দেখিয়া। সমগ্র প্রাণি-সমষ্টিকে—জগতের সকল জীবকে। **উন্নত ও অনুন্নত**—উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর। যে সকল প্রাণী মেরুদণ্ডী তাহারা উন্নত, আর যাহার মেরুদণ্ডহীন, তাহারা অনুন্নত।

পর্যায়ে—ভাগে ; শ্রেণীতে। **মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে** ইত্যাদি—মেরুদণ্ডী প্রাণীরা মেরুদণ্ডের জোরেই সোজা হইয়া দাঁড়াইতে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারে ; অমেরুদণ্ডীরা তাহা পারে না। তাই মেরুদণ্ডী প্রাণীর পক্ষে মেরুদণ্ডই শক্তিসামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশীলতার উৎস। **লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন**—জন্মসূত্রেই লাভ করিয়াছেন, সংসার হইতে আহরণ করেন নাই। তাহার তুলনা মিলে না—তাহার একান্তই অভাব রহিয়াছে।

অ. ৩। এই জাতির মধ্যে—দুর্বলচরিত্র বাঙ্গালীদের মধ্যে। **কঠোর-কঙ্কাল-বিশিষ্ট**—চরিত্রের অসাধারণ বলিষ্ঠতাবিশিষ্ট। বিষম সমস্যার কথা—অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। দুর্দম—যাহাকে দমন করা কষ্টকর। প্রকৃতি—স্বভাব ; চরিত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। **ভাঙিতে……নোয়াইতে পারে নাই**—উপর্যুপরি কঠিন আঘাতে যাহা একেবারে নষ্ট হইতে পারিত কিন্তু কাহারও বশীভূত হইত না। তুলনীয় : "ভাঙে তো মচকায় না" (বাংলা প্রবাদ)। উগ্র—মহাতেজ। **পুরুষকার**—কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া সকল কাজে নিজশক্তি প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি। বিঘ্ন—বাধা। অব্যাহত—বাধাহীন ; নির্বাধ। ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট—শক্তিশালী ও ধনবান্ ব্যক্তির সম্মুখে। অবনত হয় নাই—বশ্যতা স্বীকার করে নাই। **উৎকটবেগবতী ইচ্ছা**—অদ্ভুত শক্তিমতী ইচ্ছা ; যে ইচ্ছা আপন দুর্বার শক্তিবলে অচিরেই সিদ্ধিকে লইয়া আসে। সর্ববিধ—সকল প্রকারের। **কপটাচার**—অসত্য ব্যবহার ; ছলনাময় আচরণ ; প্রকৃত মনোভাবের বিরোধী আচরণ। ঐতিহাসিক ঘটনা—ইতিহাসে স্থান পাইবার মতো বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উগ্রতা—অদ্ভুত শক্তিমত্তা। **অনম্যতা**—কাহারও কাছে নতি স্বীকার না করার উপযুক্ত মানসিক শক্তি। **দুর্ধর্ষ বেগমত্তা**—আক্রমণের অতীত গতিশীলতা। **কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া**—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কঠিন সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া। **দুই ঘা……খাইতে জানে**—সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারে তাহারাই যাহারা আঘাত সহ্য করিবার এবং প্রত্যাঘাত করিবার শক্তি ও সাহস রাখে। এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল—অর্থাৎ এইরূপ বলিষ্ঠচরিত্র মানুষের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল।

অ. ৪। পাশ্চাত্যজাতি-সুলভ ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়। বিকাশ—অভিব্যক্তি। **ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি-না**—ইউরোপের জীবনাদর্শ ও আমাদের জীবনাদর্শে মিল নাই। আমাদের নিজেদের আদর্শকে ভালো মনে করি বলিয়াই তাহাদেরটার নিন্দা

করি। তাহা ছাড়া, বিশেষ করিয়া ইংরেজদের নিন্দা আমরা করি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য, তাহাদের পররাজ্যলোলুপতার জন্য। **অনেক বিষয়ে** বিশেষ করিয়া সংকল্পের দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে। **খাঁটি মানুষ**—মনুষ্যোচিত গুণে ভূষিত। নিষ্প্রভ—ম্লান; দীপ্তিহীন; অনুজ্জ্বল।

অ. ৫। **পুরুষকারে**—আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতায়। পৌরুষ—পুরুষোচিত তেজ, শক্তি, দৃঢ়তা প্রভৃতি। **বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা** ইত্যাদি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দরিদ্র পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, নয় বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস কলিকাতায় সামান্য বেতনে চাকুরি করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় তাঁহার আরো দুইটি ছোট ভাই কলিকাতায় পড়িতে আসে। সুতরাং পাচক বা দাস-দাসীর অভাবে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকেই দুই বেলা বাসার সমস্ত কাজ করিয়া, রান্না করিয়া পিতা ও ভাই দুইটিকে খাওয়াইতে হইত। এত কাজের পর যেটুকু সময় পাইতেন তাহার মধ্যেই তাঁহাকে নিজের লেখাপড়া করিতে হইত। অতএব তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস। **তাঁহার সমগ্র জীবনকেই** ইত্যাদি—সরকারী চাকুরি করিবার সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজসংস্কারে ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে মন দেন। হিন্দু বালবিধবাদের পুনর্বিবাহপ্রথা প্রবর্তন করিতে গিয়া তাহাকে দেশময় তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়াও তাঁহাকে কম নিন্দাবিদ্রূপ সহ্য করিতে হয় নাই। ইহা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায়ও তাঁহাকে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই জীবনব্যাপী সংগ্রামকে পরের জন্য সংগ্রামই বলিতে পারা যায়। **আনুকূল্য**—সহায়তা। **এই সংগ্রাম সন্দেহ নাই**—এই সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে তাঁহার স্বভাবের সদ্‌গুণগুলি বিকশিত ও পরিণত হইয়া উঠিবার প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। **পিতা-পিতামহ হইতে**—ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহ (ঠাকুরদাদা) রামজয় তর্কভূষণ। তাঁহারা দুইজনেই দৃঢ়চরিত্র ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। **ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে**—দেহের সকল উপাদানে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতেও। **এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন**—এমন একটা বিশেষ গুণের অধিকারী তিনি হইয়াছিলেন। এই গুণ তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা প্রভৃতি। পিতা বা পূর্বপুরুষদের দোষগুণ জন্মসূত্রে বংশধরদিগের মধ্যেও

সঞ্চারিত হয় ইহা নৃতাত্ত্বিক সত্য। সমুদয় বিপত্তি সকল বাধা। **ভিন্ন**—বিদীর্ণ। সেই রণক্ষেত্রে—অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিজের ও পরের জন্য সংগ্রামে। **দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে**—জগতে অবিমিশ্র সুখ, অনেকে কেন, বোধহয় কেহই ভোগ করিতে পায় না, কম হউক বেশী হউক, দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। **বন্ধুর**—অসমতল, নতোন্নত। **কণ্টকসমাবেশে** - কাঁটা অর্থাৎ বাধাবিপত্তি থাকার জন্য। কাঁটা থাকলে যেমন পথচলা কষ্টকর, সেইরূপ জীবনের পথে বাধাবিপত্তি আসিলে সেপথ আরো দুর্গম হয়। **ছাঁটিয়া**—এখানে দূরে সরাইয়া বা তীব্রতা নষ্ট করিয়া। **দলিয়া**—পদদলিত করিয়া; সবলে মাড়াইয়া, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া। বিরল—দুর্লভ।

অ. ৬। এত প্রভেদ সত্ত্বেও—সাধারণ বাঙালীর চরিত্রের সহিত যথেষ্ট পার্থক্য থাক সত্ত্বেও। **খাঁটি বাঙালী**—বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ও জীবনধারণপদ্ধতি প্রভৃতির পরিপূর্ণ মূর্তি। **খাঁটি বাঙালী ঘরে**—এমন এক পরিবারে যাহার উপরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব এতটুকুও পড়ে নাই। **বাল্য-জীবনে ইউরোপীয় প্রভাব** ইত্যাদি - মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এই জন্মভূমিতেই থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় সেকালের প্রচলিত বাঙলা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তখনো পর্যন্ত বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসংস্কৃতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাই বাল্যজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর ইউরোপীয় প্রভাব মোটেই পড়ে নাই। **পরজীবনে**—বিশেষ করিয়া কলিকাতার শিক্ষাসমাপ্তির পর চাকুরিজীবনে। **পাশ্চাত্য শিক্ষা**—ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা। **পাশ্চাত্য দীক্ষা**—ইউরোপের চিন্তাধারা এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের সহিত পরিচয়। **পরজীবনে তিনি……অনেকটা পাইয়াছিলেন**—ঈশ্বরচন্দ্র যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতরূপে কাজ করিতে ছিলেন, তখন চাকুরির প্রয়োজনেই ইংরেজ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। **অনেক পাশ্চাত্য মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন**—ঈশ্বরচন্দ্র যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, তখন বিলাত হইতে আগত নূতন সিভিলিয়ান সাহেবরা এই কলেজে এদেশের ভাষা কিছু শিক্ষা করিয়া তবে নিজ নিজ পদে নিযুক্ত হইতেন। এই কারণে বিদ্যাসাগরকে সর্বদাই সাহেবদের সংশ্রবে আসিতে হইত। ইহা ছাড়া হ্যালিডে, মার্শাল বেথুন, গর্ডন, ইয়ং, ডেভিড হেয়ার, উড্রো প্রভৃতি

সাহেবের সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। **অনেক পদার্থের**—বহু গুণের। এই গুণগুলির মধ্যে কর্মনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রীতি, জ্ঞানলিপ্সা, দৃঢ়চিত্ততা প্রভৃতির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। **কিন্তু তাহা যে ইত্যাদি**—লেখকের ধারণা, ইউরোপীয় মানুষের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই বিদ্যাসাগরের চরিত্র পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল, কোনো ইউরোপীয়ের অনুকরণে সদ্গুণের অনুশীলন তাঁহাকে করিতে হয় নাই। **সম্যক্‌ভাবে**—সুষ্ঠু রূপে; সর্বতোভাবে; সবদিক দিয়া। **মালমসলা**—উপাদান। **ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন**—জন্মিয়াছিলেন। **নিজত্ব**—ব্যক্তিত্ব; স্বকীয় ভাব। **পরস্ব-গ্রহণের**—পরের গুণ আত্মসাৎ করিবার। অনুশীলনের দ্বারা পরের গুণ নিজের মধ্যে বিকশিত করিবার। **সময়ে সময়ে**—বিশেষ করিয়া কাহাকেও পরের হীন অনুকরণ করিতে দেখিলে। **উগ্রমূর্তি ধারণ করিত**—ভয়ংকর হইয়া উঠিত। **বলপূর্বক**—ইচ্ছাশক্তিতে ('গায়ের জোরে' নয়)। **এই পরস্বকে**—অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখে কাহারও দ্বারা কৃত পরানুকরণকে। **যে-কিছু সাদৃশ্য**—যাহা কিছু মিল। **পাশ্চাত্য চরিত্রের... দেখা যায়**—পাশ্চাত্য চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও ছিল। **নিজস্ব সম্পত্তি**—চরিত্রের মৌলিক গুণ। **পৈতৃক সম্পত্তি**—জন্মসূত্রে লব্ধ পূর্বপুরুষের গুণ।

অ. ৭। **চটিজুতা**—এখানে শুঁড়তোলা চটিজুতার কথা বলা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর এইরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নামই হইয়া গিয়াছে 'বিদ্যাসাগর চটি'। **আত্যন্তিক আসক্তি**—অতিশয় প্রীতি। **এমন নহে**—অর্থাৎ তাঁহার চটিজুতা ব্যবহারের কারণ চটিজুতার প্রতি বিশেষ প্রীতি না, অন্য কিছু। **চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি**—পাদুকার বেলায় (এবং পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও) ইউরোপের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। **তাহা দেখিয়াই যেন**—সম্ভবতঃ এই হীন অনুকরণ দেখিয়াই অর্থাৎ এই অনুকরণ যে মোটেই তাঁহার মনঃপূত নয় তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই। **উপলক্ষমাত্র করিয়া**—একটি তুচ্ছ কারণ করিয়া। **অভিমান**—নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করিবার ভাব। **নিতান্ত অনাবশ্যক হইলে**—মোটেই প্রয়োজন না থাকিলেও। **মুটের মাথা হইতে ইত্যাদি**—এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল বর্ধমান স্টেশনে, তবে সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া লন নাই, লইয়াছিলেন এক শ্রমকুণ্ঠ ভদ্রলোকের হাত হইতে। ভদ্রলোকটি বর্ধমানে নামিয়াই তাঁহার সামান্য একটি বোঝা লইয়া যাইবার জন্য কুলিকে হাঁক দিতে লাগিলেন, অথচ বোঝাটি নিজে বহিয়া লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই কষ্টকর ছিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আগাইয়া গেলেন এবং বোঝাটি বিনা পারিশ্রমিকে ভদ্রলোকের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমকুণ্ঠ ভদ্রলোককে স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া। পরে অবশ্য তিনি বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাইয়া বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলেন।

অ. ৮। **আচার-বিষয়ে** বাহ্যব্যবহারে অর্থাৎ বেশভূষা, চালচলন প্রভৃতিতে। এমন দুই-একটা পদার্থ—এমন কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ। যাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানব হইতে ইত্যাদি—যাহা একমাত্র তাঁহার মধ্যেই পাওয়া যাইত, কোনো ইউরোপীয়দের মধ্যে পাওয়া যাইত না। **প্রকৃতিগত পার্থক্য**—স্বাভাবিক বিশিষ্টতা। অসাধারণত্ব—অনন্যতা।

অ. ৯। লোকহিতৈষিতা লোকের উপকার করিবার প্রবৃত্তি। **সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার**—কেবলমাত্র পূর্বদেশীয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। **নীতিশাস্ত্র**—যে শাস্ত্রে মানুষের সকল কাজের নৈতিক মূল্য, তাহা ভালো কি মন্দ, আলোচনা করা হয় (Ethics)। **ধর্মশাস্ত্র**—যে শাস্ত্রে কোন্‌টা ধর্ম এবং কোন্‌টা অধর্ম তাহাই আলোচনীয় বিষয়। **অর্থশাস্ত্র**—যে শাস্ত্রে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও প্রয়োজন, অভাব-পূরণ, উৎপাদন, অনটন, অর্থ প্রভৃতির আলোচনা বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা হয় (Economics)। **সমাজশাস্ত্র**—মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্কের কার্য-কারণসূত্র আবিষ্কার করা এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য (Sociology)। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হার, বসতি, কাজের সময়, অবসর সময়ের ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয় ইহার আলোচনা-সীমার মধ্যে পড়ে। **ইহা কোনোরূপ……অপেক্ষা করিত না**—বিধি শাস্ত্রে কি নির্দেশ আছে না আছে তাহার দিকে মোটেই লক্ষ্য না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মানুষের উপকার করিতে ছুটিয়া যাইতেন; শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞান তাঁহাকে পরহিতে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিত না, আপন হৃদয়াবেগেই তিনি দুঃখীর দুঃখমোচন করিতেন। **তিনি হিতৈষণাবশে** ইত্যাদি—বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময় পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়াই মানুষকে সাহায্য করিয়াছেন। আধুনিক সমাজতত্ত্ব ইহাকে দোষের মনে করিবে, কারণ অপাত্রে দান করিলে তাহাতে পরোক্ষভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। **একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা** ইত্যাদি—আধুনিক সমাজশাস্ত্র, দুঃখ দেখিলেই তাহা দূর করিতে হইবে, এমন কথা সমর্থন করে না। ইহার মতে সেই উপকারই প্রকৃত উপকার

যাহার দ্বারা সমাজের কল্যাণ হয়। অসৎ লোকের দুঃখ দূর করিলে তাহাতে সমাজের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল হওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব আধুনিক সমাজতত্ত্বের বক্তব্য—বিশেষভাবে বিচার না করিয়া কাহারও উপকার করিতে নাই। তাহার কারণানুসন্ধানের—দুঃখের হেতু খুঁজিয়া বাহির করিবার। **অবসর পাইতেন না**—দুঃখ দেখিলে বিদ্যাসাগর স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাঁহার সমবেদনাদ্রব হৃদয় মস্তিষ্ককে পিছনে ফেলিয়া ছুটিয়া যাইত সে দুঃখ দূর করিতে। তাই বিচার-বিবেচনার সময় তাঁহার মোটেই হইত না। **লোকটা**—কোনো একটি লোক। **কুলশীলের**—বংশ ও চরিত্রের। হিতোপদেশের একটি শ্লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় (বা সাহায্য) না দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তুলনীয় : "অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।" **তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়**—তাহার অভাব বা দুঃখের প্রকৃত কারণ কি ; এই অভাব তাহার স্বভাবদোষে আসিয়াছে না অন্য কারণে। **তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে**—অসৎ লোকের অভাব দূর করিলে অনেক সময় তাহার অপকারই হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ —নেশাখোর লোকের পয়সার অভাব ঘটিলে সে মিথ্যা দুঃখের কাহিনী কাঁদিয়া লোকের কাছ হইতে পয়সা আদায়ের চেষ্টা করে এবং পাইলেই তাহা নেশায় অপব্যয় করে। ইহাতে তাহার কোনো উপকারই হয় না। **গৌণ সম্বন্ধে**—পরোক্ষভাবে। **নীতিতত্ত্বঘটিত**—নীতিশাস্ত্রসম্পর্কিত। **সমাজতত্ত্বঘটিত**—সমাজবিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। **অপিচ**—উপরন্তু। **তাঁহার ব্যক্তিত্ব……যাইত**—তিনি সমবেদনা ও সহানুভূতিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। **পরের মধ্যেই তাঁহার নিজত্ব** ইত্যাদি—তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া কিছু থাকিত না, দুঃখী আর তিনি যেন এক হইয়া যাইতেন।

অ. ১০। **রামায়ণ**—সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহর্ষি বাল্মীকির বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য। **উত্তরচরিত**—দাক্ষিণাত্যের কবি ভবভূতি রামচন্দ্রের উত্তর (পরবর্তী) জীবন অবলম্বন করিয়া 'উত্তররামচরিত' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। ইহা কাব্যরসিকগণের দ্বারা সমাদৃত। **সীতার বনবাস**—ইহার বিষয়বস্তু বেশিরভাগ 'উত্তররামচরিত' হইতে সংগৃহীত, এমনকি কতকগুলি স্থলের ভাষায় মূলের শব্দ এবং সন্ধি সমাস পর্যন্ত রহিয়াছে। **নায়কের**—প্রধান চরিত্র রামচন্দ্রের। **অপবাদ**—দুর্নাম ; নিন্দা। **ছল**—উপলক্ষ ; তুচ্ছ কারণ। **রামচন্দ্র কাঁদিয়া** ইত্যাদি—ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের পক্ষে এইরূপ ক্রন্দন

অশোভন। আবার একদিক দিয়া এই ক্রন্দন রামচন্দ্রের কোমল চিত্তের পরিচায়কও বটে। রোদনপ্রবণতা—পরের দুঃখ দেখিলে অতি সহজে কাঁদিয়া ফেলার স্বভাব। **কোনো বালিকা-বিধবার** ইত্যাদি—বালবিধবাদের জীবনের দুঃখ বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বালবিধবার ম্লানমুখ দেখিলেই তাঁহার হৃদয় কাঁদিত। **বক্ষঃস্থলে গঙ্গা বহমানা**—অর্থাৎ অশ্রুধারায় বুক ভাসাইতেন, অর্থাৎ হৃদয় বিগলিত হইয়া তাহা হইতে করুণার ধারা বহিত।

অ. ১১। বাহিরটাই—বাহ্য আচরণটাই। **বজ্রের মতো কঠিন**—তেজস্বিতায়, দৃঢ়তায় বজ্রের মতো। **পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল** - ফুলের চেয়েও নরম। **বজ্রের……কোমল**—এই অংশটি ভবভূতির উত্তররামচরিতের একটি শ্লোকার্ধের প্রতিধ্বনি। রামচন্দ্র-সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন : 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতু-মর্হতি।" গর্হিত কর্ম—নিন্দনীয় কাজ। রোদন-ব্যাপার……কর্ম—পুরুষের কান্না শোভা পায় না, কারণ ইহা তাহার মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক। **বিজ্ঞের নিকট……নিন্দিত**—তত্ত্বজ্ঞানী এবং সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিগণ সুখে উৎফুল্ল ও দুঃখে ব্যথিত হন না এবং হওয়া অনুচিত বলিয়া মনে করেন। তাই দুঃখে ক্রন্দন তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত। **প্রাচ্যত্ব**—পূর্বদেশের অর্থাৎ ভারতের বৈশিষ্ট্য। **প্রতীচ্য**—পাশ্চাত্ত্য। **প্রাচ্যদেশে রোদন-প্রবণতা** ইত্যাদি—ভারতের মানুষ নিজের বা পরের দুঃখে অতি সহজেই কাঁদিয়া ফেলে, কান্না যে নিরর্থক তাহা বুঝিয়াও না কাঁদিয়া পারে না। লেখক মনে করেন, এই সহজে কাঁদিয়া ফেলার বৈশিষ্ট্য প্রাচ্যের মানুষের স্বভাবেরই অঙ্গীভূত। **আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে** ইত্যাদি—নিজের সুখদুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন ; নিজের দুঃখকে তিনি দুঃখেই মনে করিতেন না। টলিত—অস্থির হইত ; ব্যাকুল হইয়া পড়িত। বান্ধবের—বন্ধু বা আত্মীয়ের। মরণ-শোকে—মৃত্যুজনিত শোকে। **জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ** ইত্যাদি—তত্ত্বজ্ঞানী এবং সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিরা সুখদুঃখে অবিচলিত থাকিবার যে উপদেশ দেন, এইরূপ সময়ে তাহা বিদ্যাসাগরের উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করিতে পারিত না, শত উপদেশেও তাঁহার ক্রন্দন থামাইতে পারিত না।

অ. ১২। **সমাজসংস্কারক**—সমাজের ক্ষতিকর প্রথা দূর করিয়া তিনি যুগোপযোগী সুপ্রথা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করেন। **বিধবাবিবাহে পথপ্রদর্শন**—বিধবাদের, বিশেষ করিয়া বালবিধবাদের দুঃখকৃচ্ছ্রময় জীবন সেকালে আরো দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল রক্ষণশীল সমাজপতিদের কঠোর শাসনে। তাহাদিগকে যেন মানুষ বলিয়াই গণ্য করা হইত না। এই অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ সহজেই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত করিয়াছিল। তাই তিনি বিধবাবিবাহের অনুকূলে নানা শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণের অবতারণা করিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ইহা প্রবর্তনের জন্য সক্রিয় আন্দোলন চালাইতে থাকেন। শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহ আইনের অনুমোদন লাভ করে। **সর্বপ্রধান সংকর্ম**—সমাজসংস্কারমূলক কাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। **সমগ্র মূর্তিটি**—পরিপূর্ণ রূপটি ; কঠোরে-কোমলে মিলাইয়া ব্যক্তিত্বের সমগ্র চেহারাটি। **বিধবাবিবাহ ব্যাপারে·········দেখিতে পাই**—বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনে বিদ্যাসাগর তাঁহার সমগ্র কর্মশক্তি লইয়া নামিয়াছিলেন। তখন জানিতে পারা গেল তিনি কত বড় কর্মী, তাঁহার সংকল্পে কত দৃঢ়তা এবং তাঁহার হৃদয়ে কত দয়া, ঐকান্তিকতা ও নির্ভীকতা। **কোমলতা ও কঠোরতা**—কোমলতা বিধবাদের দুঃখ অনুভব করিয়া, আর কঠোরতা রক্ষণশীল সমাজের সহিত ব্যবহারে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতি বিদ্যাসাগর এমন কঠোর হইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাণের উপরও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবদের মনে উপস্থিত হইয়াছিল। **প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্যাতন**—ভূমিকম্প, বন্যা, অনাবৃষ্টি; রোগ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকৃতি মানুষকে অশেষ কষ্ট দেয় ; ইহাদের সহিত বৈধব্যের তুলনা, কারণ বিবাহিত পুরুষের মৃত্যুও ঘটে প্রকৃতিরই নিষ্ঠুর বিধানে। **দুর্বল মানুষের**—বিজ্ঞানের বলে মানুষ প্রকৃতির উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও বৃহত্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখে সে নিতান্তই শক্তিহীন। **নিষ্করুণ**—নিষ্ঠুর ; নির্দয়। **হৃদয়ের মর্মস্থলে**—মনের কোমল প্রদেশে। **মনুষ্যবিহিত**—মানুষের দ্বারা কৃত। **সমাজ-বিহিত**—সমাজের দ্বারা কৃত। **মনুষ্যবিহিত সমাজবিহিত অত্যাচার**—বিদ্যাসাগরের সময়ে বালবিধবারা অত্যন্ত দুঃখের জীবন যাপন করিত। অথচ ইহার জন্য তাহাদের নিজেদের কোনো দোষ ছিল না। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় তাহারা স্বামী হারাইত, আর সমাজের উৎপীড়নে তাহারা জগতের সকল সুখে বঞ্চিত

হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিত। **বিধাতার কৃপায়**—ভগবানের দয়ায়। এখানে 'কৃপায়' কথাটি শ্লেষাত্মক—অর্থে ইহা ঠিক বিপরীত অর্থাৎ 'নিষ্ঠুরতায়'। **মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই**—দৈবের বিধানে পৃথিবীতে মানুষকে সহস্র দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে কোনো মানুষের নিস্তার নাই। **আপন দুঃখের**—নিজের দেওয়া দুঃখের; উৎপীড়ন-অত্যাচারের। **প্রস্রবণ**—ঝরনা। **করুণা-মন্দাকিনীর ধারা**—দয়ারূপ স্বর্গনদীর প্রবাহ। গঙ্গার তিনটি ধারার মধ্যে যেটি স্বর্গে প্রবাহিত, তাহার নাম মন্দাকিনী। **সেই বিগলিত …বহিল**—পুরাণকাহিনী অনুসারে মহাদেবের সংগীত শুনিয়া বিষ্ণুপদ বিগলিত হয়, সেই বিগলিত বিষ্ণুপদই গঙ্গা। সেইরূপ বিদ্যাসাগরের হৃদয় বালবিধবার দুঃখে গলিয়া করুণার ধারারূপে প্রবাহিত হইল। স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জল যেমন পবিত্র ও সঞ্জীবন, বিদ্যাসাগরের দয়ার স্পর্শও তেমনি। **সুরনদী**—স্বর্গের জলপ্রবাহ, দেবগণের নদী। **কার সাধ্য যে** ইত্যাদি—অর্থাৎ কাহারও সাধ্য নাই যে সেই প্রবাহ রুদ্ধ করে। গঙ্গার ধারা পৃথিবীতে নামিয়া আসিলে ইন্দ্রহস্তী ঐরাবত সে বেগ ধারণ করিবার স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই—প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। **দেশাচারের দারুণ বাঁধ**—দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত রীতি ও প্রথার তীব্র বাধা। বিধবার পুনর্বিবাহ হয় না, হইতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়—এইরূপ একটা সংস্কার দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর যখন ইহার বিরুদ্ধে গেলেন, তখন স্বভাবতঃই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর নিকট হইতে তীব্র বাধা আসিল। **সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে**—সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উষ্মা ও ভীতি প্রদর্শনে। **বিপরীত মুখে ফিরে নাই**—বাধা পাইয়া উৎসে ফিরিয়া যায় নাই। **জীবন্ত মনুষ্যত্ব**—সক্রিয় মনুষ্যত্ব; যে মনুষ্যত্ব জড়তা হইতে মুক্ত। **শেষ পর্যন্ত**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। **স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন**—সংকল্প হইতে এতটুকু বিচলিত হন নাই। **সেই মেরুদণ্ড নমিত করে**—সেই দুর্ধর্ষ চরিত্রকে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

অ. ১৩। **ছোটো-বড়ো**—অখ্যাত ও বিখ্যাত। **কোনো-না-কোনো প্রকারে**—হয় অর্থ পাইয়া, না হয় অন্য কোনোভাবে উপকার পাইয়া। **ঋণগ্রস্ত**—ঋণী। এই ঋণ প্রত্যক্ষভাবে টাকাপয়সার, পরোক্ষভাবে উপকারের।

বঙ্গদেশের মধ্যে……ঋণগ্রস্ত নহেন—বিদ্যাসাগর যাহা আয় করিতেন তাহার অধিকাংশই যাইত দানে। তিনি সত্যই মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। ১৮৬৬ ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুঃসময়ে তিনি জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া প্রায় ছয়মাস সহস্র অন্নপ্রার্থীকে অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দুই হাজার টাকার কাপড় কিনিয়া বস্ত্রহীনদিগকে দান করিয়াছিলেন। কত দুঃস্থ ভদ্রপরিবার যে গোপনে তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাতদিগের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের নাম করা যাইতে পারে। ফ্রান্সে অবস্থানকালে অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট নিজের দুর্দশার কথা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর পত্রপাঠ দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চিন্তার অগোচর—অচিন্তনীয় ; যাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

ব্যাখ্যা

✓ (১) **কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত…… নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ** (অ. ১)

এই অংশটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমুন্নত জীবনচরিত বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য মন্তব্য করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীসমাজে এক অতি আশ্চর্য বস্তু বলিয়াই মনে হইবে। নানাগুণে সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, মহৎ এই চরিত্রের তুলনায় বাঙালার আর সকল মানুষকে নিতান্ত খর্ব বোধ হয়। কথাটি বুঝাইবার জন্য ত্রিবেদী মহাশয় একটি উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। অণুবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায়। বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার সেইরূপ কোনো যন্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত যেন সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই জীবনচরিতের মধ্যে যে মহাপুরুষটি মূর্ত হইয়া আছেন, মহত্ত্বে ও বিশালত্বে তিনি এতই সমুন্নত যে তাঁহার তুলনায় অন্য সকল মানুষকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়। যাঁহারা আমাদের মধ্যে বড় বলিয়া পরিগণিত, বাঙালীচরিত্রের যে আদর্শ আমাদের চোখে অতিশয় গৌরবান্বিত—তাঁহারা ও তাহা বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতের পাশে নেহাত নগণ্য। বাঙালী লিলিপুটের মধ্যে এ যেন এক মহত্ত্বের গালিভার। বিদ্যাসাগরের এই মহৎ

জীবনচরিতের সহিত তুলনা না ঘটিলে কিন্তু এ সত্য ধরা পড়ে না। তাই যাঁহারা সত্যই তত বড় নন অথচ অতি বড় বলিয়া সম্মানিত, তাঁহাদের পরিমাপ নির্ভুলভাবে বুঝা যায় কেবল বিদ্যাসাগরের চরিতকথার সহিত তুলনার দ্বারাই। এই হিসাবে তথাকথিত বড়কে ছোট করিয়া দেখাইবার যন্ত্র বিদ্যাসাগরের জীবনকথা।

(২) এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার····· স্পর্শ করে। (অ ১)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মহত্ত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত রূপকটি ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঙালীসমাজে বিদ্যাসাগরের মতো উন্নতচরিত্র একটিও হন নাই। তাঁহার তুলনায় সকল বাঙালীই নেহাত খর্ব, নিতান্ত তুচ্ছ। অথচ এই বাঙালী-সমাজেই একদিন তিনি অটল হিমালয়-শিখরের মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চারিদিকে ছিল তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙালীচরিত্র। মধ্যস্থলে তিনি তাঁহার বিরাট মহত্ত্ব লইয়া অপূর্ব মহিমা প্রকাশ করিতেন। হিমালয়ের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আকাশচুম্বী ধবলগিরির শিখর। চারিদিকে ক্ষুদ্রতর শিখরগুলির তুলনায় তাহার উন্নতি পরমবিস্ময় উৎপাদন করে। তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙালীচরিত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিরাটত্ব আমাদের বিস্ময়াপ্লুত করে। ধবলগিরি যেমন, বিদ্যাসাগর-চরিত্রও তেমনি ছিল অনধিগম্য ও অনতিক্রম্য। কাহারও সাধ্য ছিল না মহত্ত্বে সে চরিত্রের উন্নতির কাছাকাছিও পৌঁছায়, দূরে থাকুক তাঁহার সমকক্ষ হওয়া।

(৩) আমাদের মতো দুর্বল ·····আলোচনার বিষয়। (অ. ৩)

এই অংশটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও অতুলনীয় পুরুষকারের বিচার-প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য মন্তব্য করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব হইল দৃঢ়তা। এই মানুষটির মেরুদণ্ড ছিল এতই শক্ত যে, তাহা ভাঙে তো মচকায় না। দেহের মেরুদণ্ডের মতো চরিত্রের যে বস্তুটা একান্ত আশ্রয়, সেই বস্তুটা তাঁহার যেন একটা বিরল ধাতুতে গঠিত ছিল। উহা কখনো অবনমিত হইত না, কখনো এলাইয়া পড়িত না। জীবনে তাঁহাকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অবস্থার নিদারুণ

চাপে সাধারণ বাঙালী যেখানে পিষিয়া যাইত, বিদ্যাসাগর সেখানে কঠোর ব্যক্তিত্ব লইয়া সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। কপটতা বা অসাধুতার আশ্রয় লইয়া অনেকে বিপদের সময় আত্মরক্ষা করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহা জানিতেন না। এই চরিত্রবল স্বভাবতঃই আমাদের পরম বিস্ময় জাগা। কারণ, বাঙালীর মতো পরাধীন জাতির মধ্যে এমন অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, এমন নিষ্কলুষ পৌরুষের কারণ সহসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্বাধীন জাতির স্বাধীন মানুষের মধ্যেই এমন চরিত্রবল তবু সম্ভব, কেননা তাহারা জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আঘাত সহিয়া আঘাত করিয়া সংগ্রামের মধ্যে স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠে। পরাধীন জাতির মধ্যে সেই শক্তি পুষ্ট হইবার কোনো সুযোগ নাই। তবু আমরা বাঙালীর মতো দুর্বল পরাধীন জাতির মধ্যে একটি বিদ্যাসাগর-চরিত্র পাইলাম। ইহার কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। লেখক তাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই দৃঢ়তার উৎস কোথায় তাহার অনুসন্ধান বিধেয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

(৪) কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলাকে……দেখা যায়। (অ. ৫)

এই অংশটি মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে যে পৌরুষ ব্যক্ত, তাহার উৎস ও কারণ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লেখক এই অংশের রূপকটি ব্যবহার করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের এই পৌরুষ ছিল বাঙালী-জীবনে অসাধারণ বস্তু। ইউরোপীয় চরিত্রেই মাত্র এই বস্তু বিশেষভাবে বর্তমান। বিদ্যাসাগর ইহা জন্মসূত্রেই পাইয়াছিলেন, এই পৌরুষ তাঁহার ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ হইতে সহজ উত্তরাধিকারের মতো তাঁহার রক্তে-মজ্জায় মিশিয়াছিল। সত্য বটে আবাল্য দুঃখের সহিত সংগ্রামও তাঁহার বীরত্বের অন্যতম পরিপোষক। কিন্তু উহা ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রগত স্বাভাবিক পৌরুষকেই পুষ্ট করিয়াছে। কেবল দুঃখের সহিত সংগ্রামই এ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না,—পুষ্ট করিতে পারে। অনেকের জীবনে এ-কথার সত্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়েও বেশি দুঃখের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। কাঁটায় ভরা উঁচুনীচু পথের মতো তাহাদের জীবনেও ছিল পদে পদে বাধা ও বেদনা। তাহার মধ্য দিয়া নিজেদের চালাইয়া লইয়া যাওয়া কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পথচলার সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পথচলার পার্থক্য আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র জীবনপথের কণ্টকস্বরূপ এই বাধা ও দুঃখগুলিকে পায়ের তলায় দলিয়া যেন মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন। তৃপ্ত পদভরে মহামহিম বিজয়ীর মতো তিনি জীবনে অগ্রসর হইয়াছেন। এইখানেই তাঁহার সত্যকার পৌরুষ। ইহা তাঁহার মজ্জাগত বস্তু। বাঙালী সমাজে ইহা বড়ই দুর্লভ।

(৫) পাশ্চাত্ত্যচরিত্রের সহিত . . . পৈতৃক সম্পত্তি। (অ. ৬)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো একজন খাঁটি বাঙালীর চরিত্রে একটি ইউরোপীয় গুণ কিরূপে আসিল তাহার আলোচনা-শেষেই লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তা বা পৌরুষ সাধারণ বাঙালীর মধ্যে অদৃশ্য। ইহা বিশেষভাবে ইউরোপীয় চরিত্রের গুণ। ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালী হইয়াও এই গুণ কোথা হইতে পাইলেন? তবে কি উহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে? লেখক বলেন, মোটেই তাহা নহে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইবার বহুপূর্বেই তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই ইহা তাঁহার পিতৃপিতামহের নিকট হইতেই তিনি পাইয়া থাকিবেন। বাঙালীর জাতিগত বিশেষত্বের মধ্যে এই পৌরুষ অবশ্যই পড়ে না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপুরুষদের মধ্যে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া এই গুণটি ছিল। আর ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই জন্মসূত্রে পাইয়াছিলেন। এই পৌরুষ এইভাবে তাঁহার উত্তরাধিকার—মহার্ঘ এক সম্পত্তিবিশেষ। ইউরোপীয় চরিত্রের শৌর্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা ইউরোপ হইতে শিক্ষার মাধ্যমে আমদানী-করা নয়। উহা ঈশ্বরচন্দ্রের সহজ অর্থাৎ জন্মগত গুণ। অথবা উহা একেবারেই ঈশ্বরচন্দ্রের স্বকীয় বিশেষত্ব। ইউরোপ থাকুক, পিতৃপিতামহও হয়তো ইহা তাঁহাকে দেন নাই, হয়তো উহা তাঁহার মধ্যে আশ্চর্যরূপে আপনা হইতেই বিকশিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

(৬) যে অভিমান ও দর্পের······ঠিক সেই দর্প। (অ. ৭)

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই মন্তব্য করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চটিজুতার প্রতি আসক্তির কারণ-বিশ্লেষণই ইহার প্রসঙ্গ।

ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদাই চটিজুতা পরিতেন। অন্যরকম জুতা তিনি ব্যবহার করিতেন না। ইহার কারণ এই নয় যে চটির প্রতি তাঁহার মোহ ছিল। অন্যেরা বুট পরে, বিদেশীর অনুকরণ করে। ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার জাতীয়তাবোধ

যেন বিদ্রোহ করিত। জাতীয় চটিজুতা তাই তিনি জেদ করিয়া ছাড়িতেন না। এই জেদের মধ্যে একরকম জাতীয়তার অভিমান ও দম্ভ আছে। একদিন বর্ধমান স্টেশনে এক শ্রমকুণ্ঠ ভদ্রলোক সামান্য একটা মাল বহিবার জন্য কুলি ডাকিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই মাল নিজের মাথায় করিয়া নিয়া ভদ্রলোককে লজ্জার সহিত শিক্ষাও দিয়াছিলেন। এই সামান্য মাল বহিতে এদেশের লোক লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে—এ সংকোচ বিজাতীয় শিক্ষার কু-প্রভাবে। ইহাতে যেন জাতীয় স্বভাবকে প্রকারান্তরে ছোট করা হয়। বিদ্যাসাগরের মধ্যে তাই সেদিন ইহার বিরুদ্ধে একটা জাতীয় অভিমান, একটা দম্ভ জাগিয়াছিল। সেজন্য দরকার না থাকিলেও কুলির মোট মাথায় লইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই। ঠিক সেইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া বিদ্যাসাগর চটি পরিতেন।

(৭) কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের……প্রাচ্যত্ব। (অ. ১১)

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কোমলতার আলোচনাই এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে ইউরোপীয় চরিত্রের ন্যায় প্রচুর পৌরুষ ও দৃঢ়তা ছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহার মধ্যে কোমলতাও ছিল অপরিমেয়। পরের দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজেই গলিয়া যাইতেন, কাঁদিয়া ফেলিতেন। লেখকের মতে এইখানেই তাঁহার সহিত ইউরোপীয় চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য। ইউরোপীয় চরিত্রে কেবল দৃঢ়তাই আছে, এমন অশ্রুসিক্ত নম্রতা নাই। বিদ্যাসাগরের মধ্যে দুই-ই আছে। নিজের দুঃখে তিনি দৃঢ়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বজ্র, কিন্তু পরের দুঃখে তিনি মমতার তরল প্রবাহ। প্রাচ্য চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। রামচন্দ্রের মতো বীরের পক্ষেও ক্রন্দনপরায়ণতা এই কথাই প্রমাণ করে। বিদ্যাসাগর-চরিত্র এই প্রাচ্য বিশেষত্বেরই অধুনাতন নিদর্শন। বাহিরটা ছিল তাঁহার বজ্রের মতো কঠোর, ভিতরটা ফুলের চেয়েও নরম। সেইজন্যই বিদ্যাসাগর সহজেই কাঁদিয়া ফেলিতেন। বিজ্ঞ ও বৈরাগীরা এই ক্রন্দনকে দুর্বলতা বা আবেগপ্রবণতা,—কাজেই লজ্জার বস্তু বলিয়া গণ্য করেন। লেখক বলেন, ইহা লজ্জার নহে, গৌরবের—এই বিচারে যে ইহা প্রাচ্য চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। বস্তুতঃ এই ক্রন্দনপ্রবণতাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রাচ্যের ছাপ মুদ্রিত করিয়াছে। নহিলে শুধু দৃঢ়তা তাঁহাকে ইউরোপীয় চরিত্রের সহিত অভিন্ন করিয়া রাখিত।

(৮) সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে···পথে দাঁড়াইতে পারে। (অ. ১২)

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত রূপকটি প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া, বিশেষভাবে বালিকা-বিধবাদের প্রতি দয়ার বর্ণনা-প্রসঙ্গেই এই অংশটির অবতারণা।

ভগীরথের তপস্যায় স্বর্গ হইতে মর্ত্যে গঙ্গাপ্রবাহ অবতরণ করে। তাহার প্রথম বেগে দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতও ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ সে বেগকে রোধ করা মর্ত্যে কাহারও সাধ্য হয় নাই। বিদ্যাসাগরের দয়াও ছিল এই বেগবান্ গঙ্গাপ্রবাহের মতো প্রচণ্ড। বাঙলার বালিকা-বিধবাদের দেখিয়া তাঁহার মধ্যে একবার এইরূপ প্রচণ্ড বেগবতী দয়ার সঞ্চার হইল এবং অচিরেই বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রয়াসে সেই দয়া যেন প্রবাহিত হইল। দেশাচার আর সমাজ তাহাকে বাধা দিল, কিন্তু সে বেগের মুখে এই ক্ষীণ বাধা তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়া গেল। বিধবাদিগের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া এইভাবে ভাগীরথীর সহিত তুলনীয়। আর বিষ্ণুপদ গলিয়া নাকি ভাগীরথীর সৃষ্টি, বিদ্যাসাগরের হৃদয় গলিয়াও তেমনি এই দয়ার সৃষ্টি। উহা কোনো বাধা কোনো প্রতিরোধ মানে নাই। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রমতে ও আইনে সিদ্ধ করিয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধটি অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র আলোচনা কর।

উ. **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধটি হইতে বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উ.। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধটির মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

(ক) বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সামগ্রিক মহিমা : এই চরিত্র এতই মহৎ এতই বিরাট যে, ইহার তুলনায় অন্য যে-কোনো বাঙালী-চরিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।

(খ) দৃঢ়তা : তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হইল দৃঢ়তা।

শক্তিশালী মেরুদণ্ড যেমন দেহটিকে উন্নত ও অবনমিত রাখে, তেমনি এই দৃঢ়তা বা চরিত্রবল বিদ্যাসাগরকে চিরকাল উন্নতশির রাখিয়াছিল। চরিত্রের এই দৃঢ়তা-বিষয়ে তাঁহার সহিত ইউরোপীয় চরিত্রের যেমন সাদৃশ্য আছে, সাধারণ বাঙালী-চরিত্রের তেমনি পার্থক্য রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর এই দৃঢ়তা জন্মসূত্রেই পাইয়াছিলেন। হয়তো তাহা তাঁহার পিতৃপিতামহের গুণ অথবা তাঁহারই মধ্যে বিকশিত এক স্বভাবদত্ত শক্তি। ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা পাইবার পূর্বেই তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহা বাহির হইতে আহৃত নহে, স্বীয় প্রকৃতির মধ্যে ছিল ইহার বীজ নিহিত। তাঁহার জীবন-সংগ্রাম ইহাকে হয়তো পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

(গ) খাঁটি বাঙালীত্ব : আচারে পোশাকে বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী। বাঙালীর প্রাচীন চটিজুতা ছাড়া তিনি অন্য জুতা পরিতেন না বাঙালীত্বেরই অভিমানে। কুলির মোট বহন করিয়া সাধারণ বাঙালীর স্বাভাবিক অভ্যাসটার গৌরবই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাঙালী আগে এরকম মোট-বহনে লজ্জা পাইত না ; এখন পায়, এইটাই লজ্জার। ইহার বিরুদ্ধে জাতীয় অভিমান তাঁহাকে মোট বহিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

(ঘ) অনুকরণ-হীনতা : বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো বিষয়ে কাহাকেও অনুকরণ করিতেন না। এইজন্যই তাঁহার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি এত স্পষ্ট।

(ঙ) পরার্থপরতা : পরের দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে গলিয়া পড়িতেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। দুঃখীর দুঃখ অভাবে বা স্বভাবে বা অন্য কি কারণে—এ-সব তিনি যাচাই করিতেন না। বিনা বিচারে তাহার উপকার করিয়াই চরিতার্থ বোধ করিতেন।

(চ) পরদুঃখে কাতরতা : পরদুঃখে বিদ্যাসাগরের ছিল অনন্ত কাতরতা। তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিতেন। নিজের শত দুঃখ তিনি বুক পাতিয়া সহিয়াছিলেন, কিন্তু পরের দুঃখে বুক না ভাসাইয়া পারিতেন না।

(ছ) কঠোরতা ও কোমলতায় প্রাচাত্ব : বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যত্র সর্বদাই দৃঢ় ছিলেন। নিজের দুঃখদুর্দশায় ও জীবন-সংগ্রামে তাঁহার মধ্যে দুর্বলতার লেশমাত্র ছিল না। বাহিরের সবটাই যেন তাঁহার বজ্র দিয়া গড়া ছিল। কিন্তু ভিতরে পরের জন্য কাতরতায় অশ্রুদ্রব ছিল তাঁহার অন্তর। এইখানেই তাঁহার

পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত পার্থক্য। পাশ্চাত্ত্য চরিত্র শুধু দৃঢ়, কিন্তু এমন কোমল নহে। এদেশের রামচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রের সহিত এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। এইখানেই বিদ্যাসাগরের প্রাচত্ব।

(জ) সমাজসংস্কারে নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতা: বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য অভূতপূর্ব সংগ্রাম বিদ্যাসাগরের সমাজের প্রতি নিষ্ঠা ব্যক্ত করে। ইহার মূলে ছিল তাঁহার সেই অফুরন্ত দয়া ও সমবেদনা। বালিকা-বিধবাদের জন্য তাঁহার গভীর বেদনাবোধ ছিল। তাই বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে তিনি তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রক্ষণশীল সমাজ ও যুগসঞ্চিত সংস্কার তাঁহাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। পরিণামে তিনিই জয়ী হন। ইহা তাঁহার নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেয়।

(ঝ) দয়া ও দাক্ষিণ্য: বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ারও সাগর, কিন্তু সে দয়া নিষ্ক্রিয় সমবেদনা মাত্র ছিল না। তাহা দাক্ষিণ্যে দানে ছিল ধন্য। বাঙলার কত লোক যে কত ভাবে তাঁহার নিকট ঋণী তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্র. ৩। "আমাদের মতো দুর্বল লোকদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।"—(ক) এখানে 'এই উদাহরণ' বলিতে কোন্ উদাহরণ বা কিসের উদাহরণ বুঝাইতেছে? (খ) উদ্ধৃত অংশটির বক্তব্যবিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উ.। (ক) এখানে 'এই উদাহরণ' বলিতে লেখক—কঠোরতা, উগ্রতা, দুর্দমতা, অনম্যতা ও দুর্ধর্ষ বেগবত্তার সমন্বয়ে যে অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি হয়, তাহার উদাহরণের কথাই বুঝাইতেছেন।

(খ) **৩নং ব্যাখ্যা** দেখ।

প্র. ৪। "বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।"—(ক) কিসের দৃষ্টান্তের কথা বলা হইতেছে? (খ) কাহাদের মধ্যে ইহার বহুলতা? (গ) এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ ও অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উ.। (ক) বিদ্যাসাগরের ন্যায় জীবনপথে বীরত্বের সহিত সব দুঃখ ও বাধা দলিয়া অগ্রসর হওয়ার যে দৃষ্টান্ত—এখানে সেই দৃষ্টান্তের কথা বলা হইতেছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে শৌর্যের দৃষ্টান্ত।

(খ) বাঙালীর মধ্যে এই দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পৌরুষ বিরল, কিন্তু ইউরোপীয় চরিত্রে ইহা প্রায় সাধারণ বিশেষত্ব।

(গ) **৪নং ব্যাখ্যা** দেখ।

প্র. ৫। "রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে।"--(ক) রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়ক কে? উত্তরচরিত-সম্বন্ধে কি জান? (খ) উল্লিখিত অপবাদটি কি? (গ) কোন্ প্রসঙ্গে এই অপবাদের কথা উঠিয়াছে? লেখক শেষপর্যন্ত কি ভাবে এই 'অপবাদ'কেই সাধুবাদ করিয়াছেন?

উ.। (ক) ও (খ) **টীকা** দেখ।

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র-সমালোচনা-প্রসঙ্গেই এই 'অপবাদের' কথা উঠিয়াছে। ইহার পর **৭নং ব্যাখ্যা** দেখিয়া লেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস ঃ অণুবীক্ষণ—অণু বীক্ষণ করা হয় অর্থাৎ লক্ষ্য করা হয় ইহার দ্বারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। অহোরাত্র—অহঃ অর্থাৎ দিন এবং রাত্রি (সমাহারদ্বন্দ্ব, বাঙলায় সাধারণ দ্বন্দ্ব)। অসদ্ভাব—সৎ-এর অর্থাৎ বিদ্যমানের ভাব (৬ষ্ঠী-তৎপুরুষ); নয় সদ্ভাব (নঞ্‌তৎ-পুরুষ) প্রাণিতত্ত্ববিদদের—প্রাণিবিষয়ক তত্ত্ব (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহা জানে (বিদ্=জানা) যাহার (উপপদ-তৎপুরুষ), তাহারা। আত্মনির্ভরশক্তির—আত্মাতে নির্ভর (৭মীতৎপুরুষ); তাহাই শক্তি (কর্মধারয়), তাহার। কঠোর-কঙ্কালবিশিষ্ট—কঠোর কঙ্কাল (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা বিশিষ্ট (৩য়াতৎপুরুষ)। সর্ববিধ—সর্ব বিধা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। পাশ্চাত্যজাতি-সুলভ—পাশ্চাত্য জাতিগুলি (কর্মধারয়); তাহাদের মধ্যে সুলভ (৭মীতৎপুরুষ)। নিষ্প্রভ—নিঃ (=নাই) প্রভা যাহার (নঞ্‌বহুব্রীহি), তাহা। পিতাপিতামহ—পিতা এবং পিতামহ (দ্বন্দ্ব)। ভূমিষ্ঠ—ভূমিতে থাকে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। প্রকৃতিগত—প্রকৃতিকে গত (২য়াতৎপুরুষ)। কারণানুসন্ধানের—কারণের অনুসন্ধান (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার। বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে—বিধবাদের বিবাহ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহাই ব্যাপার (কর্মধারয়), তাহাতে। নিষ্করুণ—নিঃ (=নাই) করুণা যাহার (নঞ্‌বহুব্রীহি), সে। ভ্রূকুটী-ভঙ্গিতে—ভ্রূর কুটী (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার ভঙ্গি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহাতে। ঋণগ্রস্ত—ঋণের দ্বারা গ্রস্ত (৩য়াতৎপুরুষ)।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ দণ্ডায়মান—দণ্ড+ক্যঙ্ (নামধাতু)+শানচ্। দুর্ধর্ষ—দুর্+ধৃষ্+খল্। পৈতৃক—পিতৃ+ঠঞ্ (ইক)। আত্যন্তিক—অত্যন্ত+ঠক্ (ইক)। লীন—লী+ক্ত। বিহিত—বি—ধা+ক্ত। নমিত—নম্+ণিচ+ক্ত। প্রতীয়মান—প্রতি—ই+শানচ্ (কর্মবাচ্যে)।

সমস্তপদ-গঠনঃ (ক) প্রশ্ন: 'পাশ্চাত্যজাতি-সুলভ' কথাটির অনুকরণে 'সুলভ'-কে উত্তরপদরূপে ব্যবহার করিয়া কয়েকটি সমস্তপদ গঠন কর।

উত্তর: স্ত্রীসুলভ, শিশুসুলভ, বালকসুলভ, বালিকাসুলভ, নারীসুলভ, বণিক্‌সুলভ, ব্রাহ্মণসুলভ, ক্ষত্রিয়সুলভ ইত্যাদি।

(খ) বজ্রের মতো কঠিন=বজ্রকঠিন। পরের জন্য=পরার্থে।

এক কথায় প্রকাশঃ অনুকরণের যোগ্য—অনুকরণীয়। আরও দুর্গম—দুর্গমতর।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগঃ কাঁদিয়া ভাসাইয়া ফেলেন—এখানে 'কাঁদিয়া ভাসানো'-র অর্থ—অতিরিক্ত অশ্রুবর্ষণ করা।

বক্ষঃস্থলে গঙ্গা বহমানা—এখানে 'গঙ্গা'=অশ্রুধারা।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তনঃ বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না (জটিল)—সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে বিদ্যাসাগরের সহজাত সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তির তুলনা মিলে না (সরল)।

বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল (অস্তিবাচক)—বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই প্রচুর নহে (নেতিবাচক)।

বালবিধবার দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল—বালবিধবার দুঃখ-দর্শন তাঁহার হৃদয় বিগলিত করিল ('দুঃখ-দর্শন'-কে কর্তৃপদে পরিবর্তিত করিয়া)—বাল্যেই যাহারা বিধবা হইয়াছে, তাহাদের দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল (জটিল)।

দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই (নেতিবাচক)—তাহা রোধ করা দেশাচারের দারুণ বাঁধের সাধ্যাতীত হইয়াছিল (অস্তিবোধক)।

ব্যাকরণগত টীকাঃ অণুবীক্ষণ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—সমাস দ্রষ্টব্য। লক্ষণীয় যে উপপদ-তৎপুরুষের ব্যাসবাক্যে সাধারণতঃ শেষ

পদটি 'যে' বা 'যাহা' (ক্ষেত্রবিশেষে বহুবচনও হইতে পারে) অর্থাৎ প্রথমান্ত হইলেও, এখানে শেষ পদ তৃতীয়ান্ত ('ইহার দ্বারা')। 'নামে' অব্যয়যোগে শূন্য বা ১মা বিভক্তি।

দণ্ডায়মান—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজাত বিশেষণের উদাহরণ।

বাক্য-রচনা অহোরাত্র : অহোরাত্র বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পড়িতে থাকিলে কঠিন পাষাণেরও ক্ষয় হয়।

অব্যাহত : বার্ধক্যেও তাঁহার যৌবনোচিত শক্তি অব্যাহত আছে।

নিষ্প্রভ : 'মহত্ত্ব যদি অসংখ্যগ্রন্থিসংযুক্ত জীর্ণাম্বর-পরিহিত রহে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়।'

আত্যন্তিক : মৃত্যু যে বিরহ আনে তাহা আত্যন্তিক।

কুলশীল : যাহার কুলশীল জানা নাই এমন লোককে বাড়ীতে স্থান দেওয়া বিপজ্জনক।

লীন : জীবাত্মা পরিণামে পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

ধৈর্যচ্যুতি : এত নির্যাতনেও যাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সে হয় অমানুষ, না হয় দেবতা।

ভরত

দীনেশচন্দ্র সেন

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্যমান প্রবন্ধটির উৎস লেখকের 'রামায়ণী কথা'-শীর্ষক গ্রন্থ। মূল প্রবন্ধটি দীর্ঘতর। মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের সংকলনে উহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে লেখক ভরতের জীবনকথা ও চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। পরম ধার্মিক এই রাজকুমার সকলের নিকট কিরূপ অন্যায় উক্তি, আচরণ ও সন্দেহ সহ্য করিয়াছেন—বিনা দোষে তাঁহার পূত জীবন কিরূপে বিড়ম্বনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—তাহার বিবরণ এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পিতার

মৃত্যুশোকের মধ্যে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন হইতে রামের দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষান্তে পুনরাগমন পর্যন্ত কাহিনীর মধ্যে ভরতের জীবন তথা রূপায়িত হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির বর্ণনা আছে, কাহিনী আছে, আবার চরিত্রসম্বন্ধে একটু আলোচনাও আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুখ্যভাবে আছে ভরতচরিত্রের প্রতি লেখকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ভরতই প্রবন্ধটির ভাবোচ্ছ্বাস ও আলোচনার লক্ষ্য। এইজন্যই ইহার শিরোনাম 'ভরত' হইয়াছে।

সমালোচনা—দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা'র প্রবন্ধগুলি সমালোচনা-প্রবন্ধ বলিয়াই স্বীকৃত। কিন্তু ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, এখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী নিছক সাহিত্যিক নহে। রামায়ণ মহাকাব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু রামাদি চরিত্র ভারতবাসীর পক্ষে ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং নৈতিক মানেই তাহাদের বিচার সঙ্গত। দীনেশবাবু তাই সাহিত্যসমালোচনার মানদণ্ডে ভরতের (অন্যান্য চরিত্রেরও) আলোচনা করেন নাই। ভারতের শাশ্বত নীতির আদর্শে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

এই কারণে বিশ্লেষণ অপেক্ষা বর্ণনাই আলোচ্যমান প্রবন্ধে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। ভরতের বিড়ম্বিত জীবনকথাটি হয়তো যুক্তিদ্বারা আরও সহজে প্রমাণ করা যাইত, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব আলেখ্যটি সে-পথে হৃদয়ের গভীরে জীবন্তভাবে অঙ্কিত করা যাইত না। বিবরণ পন্থায় দীনেশবাবু তাই যাহা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন তাহার আবেদন মস্তিষ্কে নহে, মর্মে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দীনেশচন্দ্র "কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া ...আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন।" কবির মতে "এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই...প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।" অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে।

দশরথের মৃত্যুর পর হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাসান্তে রামের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনীটিরই মধ্যে লেখক ভরতচরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহার মধ্যে হতশ্রী অযোধ্যার বর্ণনা, মাতা ও বিমাতাদের সন্নিধানে শোকবিধুর ভরতের বিবরণ প্রভৃতি কয়েকটি দৃশ্যে লেখকের অপূর্ব চিত্রক্ষমতা পরিস্ফুট। বিষয়বস্তুর সহিত আপনাকে মিলাইয়া দিবার একটা সহজ প্রবণতা যে লেখকের আছে—এগুলি তাহাই প্রমাণ করে।

প্রবন্ধটির ভাষা প্রাঞ্জল ও বেগবতী। রামায়ণের অনবদ্য রূপ রস সংগীত লেখকচিত্তে যে কাব্যরস সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহারই মধুস্বাদ আলোচ্যমান প্রবন্ধটিকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। মূল রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া প্রবন্ধটিকে impressionistic আলোচনা বলা যাইতে পারে অর্থাৎ রামায়ণ লেখকচিত্তে যে একটি সামগ্রিক আনন্দবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে, প্রবন্ধটি কতকটা তাহারই ব্যঞ্জনাময়ী মূর্তি।

সংক্ষিপ্তসার—যে ভরতকে দশরথ রামচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করিতেন, সেই সাধুশীল রাজকুমার পিতার নিকটও অবিচার পাইয়াছেন। তাঁহার মতো নির্দোষচরিত্র—শুধু নির্দোষ কেন, রামায়ণকাব্যের একমাত্র আদর্শ চরিত্রের ভাগ্যে যে সীমাহীন বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যই দুঃখের বিষয়। রামের বনগমনের পর প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অন্যায় কটাক্ষ করিয়া মহাশঙ্কায় নিজেদেরকে ঘাতকের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ পশুর সহিত তুলনা করিয়াছিল। যে রামচন্দ্র ভরতকে নিজপ্রাণের চেয়ে প্রিয়তর মনে করিতেন, তিনিও দুই একটি সন্দেহবাণ নিক্ষেপ করিয়া ভরতের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। ভরতের সম্মুখে সীতাকে স্বামীর প্রশংসা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ সম্পন্ন পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না।

ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই দশরথ রামচন্দ্রের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভরতের প্রতি যে অন্যায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অমার্জনীয়। রাম ভরতের চরিত্রমাহাত্ম্য ভালোভাবে বুঝিয়াও, বনবাসের শেষে ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার আগমনের সংবাদে ভ্রাতার মনোভাব কিরূপ হয় তাহাই লক্ষ্য করিবার জন্য। সম্পূর্ণ নিরপরাধের প্রতি এই দণ্ডের মার্জনা নাই। কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য শুনাইয়াছেন। সসৈন্যে রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনিতে গিয়া ভরত নিষাদাধিপতি গুহকের সন্দেহ-ভাজন হইয়াছেন, এমনকি সর্বজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজও প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন নিষ্পাপ রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার কোনো অসৎ অভিপ্রায় আছে কিনা।

ভরতকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তাঁহার মুখচ্ছবি বিষাদকালিমায় মলিন। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সদ্যোনিদ্রোত্থিত কুমারের মন অযোধ্যার অজ্ঞাত

বিপদের আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত। এমন সময় তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্ত অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। সকলের কুশল প্রশ্ন করিলে দূতগণও দ্ব্যর্থক কথায় কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিল, যাঁহাদের কুশল তাঁহার কাম্য তাঁহারা কুশলেই আছেন। ভরত ইহার মর্ম না বুঝিলেও, রাত্রির দুঃস্বপ্ন আর দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহাকে নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া দিল।

ভরত অযোধ্যায় ফিরিতেছিলেন। কিন্তু নিস্তব্ধ নগরীর শ্রীহীন রূপ, জনহীন রাজপথ, অরণ্যের রুক্ষ ভয়াবহতা লইয়া যেন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সত্যই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকের পূর্বে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রামচন্দ্র বনে গিয়াছেন; ত্যক্তভূষণা রাজবধূ সীতা আর দীর্ঘবাহু স্বর্ণকান্তি লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন; সমস্ত নগরী দেবপ্রতিম এই তিনজনের শোকে অশ্রুধারায় যেন স্নান করিতেছে। এই মহাশোকপুরীতে একমাত্র সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী পুত্রের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সুখস্বপ্নে বিভোর।

ভরত মাতার মুখে পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া গভীর শোকে হইয়া পড়িলেন এবং পিতার স্নেহময় স্পর্শের কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নির্বাসনের কথা শুনিয়া ক্ষণেকের জন্ত তিনি হতবাক্ হইয়া গেলেন। কৈকেয়ী আশা করিয়াছিলেন, পুত্র তাঁহার সকল কার্যকলাপ সমর্থন করিয়া প্রীতিপ্রকাশ করিবেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ভরত মাতার অভিসন্ধি ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিয়া তীব্র ভাষায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। অশ্বপতির বংশে রাক্ষসী তিনি—নরকেও তাঁহার স্থান হইবে না। ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কৌশল্যা সুমিত্রাকে দিয়া ডাকাইয়া কটূক্তিবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ ভরত জ্যেষ্ঠমাতাকে কেবল এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও তিনি জানিতেন না। শোকে, উত্তেজনায়, আত্মধিক্কারে তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

শোকবিহ্বল জড়বৎ ভরত বশিষ্ঠের চেষ্টায় কোনোপ্রকারে পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য সম্পন্ন করিলেন। প্রভাতে বন্দিগণের স্তবগান শুনিয়া তিনি পাগলের মতো তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। শ্রাদ্ধশান্তির পর মন্ত্রিগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি রামকে ফিরাইয়া আনিবার

ব্যক্ত করিলেন। বিফল হইলে তিনি নিজেই চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইবেন। অযোধ্যার সকল নরনারীকে সঙ্গে লইয়া ভরত চলিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ফিরাইয়া আনিতে। নিষাদাধিপতি গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াও পরে ভরতের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। ইঙ্গুদীমূলে রামের তৃণশয্যা আর সীতার উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণকণা দেখিয়া শোকে অধীর ভরত সংজ্ঞা হারাইলেন। প্রাসাদবাসী চিরসুখাভ্যস্ত রামচন্দ্র ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, আর কোন্ প্রাণে তিনি রাজবেশ পরিধান করিবেন? ভোগবিলাস সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবেন।

জটাবল্কলধারী ভরত ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গিয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন। ঋষিও তাঁহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারই নির্দেশে ভরত চিত্রকূটে চলিলেন। ঋষিবর রাণীদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ক্রমে কৌশল্যা ও সুমিত্রার পরিচয় দিয়া অবশেষে নিজ মাতাকে দেখাইয়া বলিলেন—এই পতিঘাতিনী রাজ্যকামুকাই সকল অনর্থের মূল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভরত মাতার প্রতি একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

চিত্রকূটে রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া ভরত অগ্রজের দুর্দশায় শিশুর মতো কাঁদিয়া উঠিলেন। আজ তাঁহারই জন্য রামচন্দ্রকে রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া এই অসহনীয় ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে। ধিক্ তাঁহার জীবনে!

চিত্রকূটের তপস্বিবেশী রাম-ভরতের মিলনদৃশ্যটি বড় করুণ। শুষ্কমুখ জটাজুটধারী কৃশাঙ্গ ভ্রাতাকে রামচন্দ্র অতিকষ্টে চিনিতে পারিয়া পদতল হইতে উঠাইলেন এবং বনে আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন; ভরত অগ্রজের চরণস্পর্শ করিয়া বার বার তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাম ফিরিবেন না। অবশেষে ভরত অনশন অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্রের কুটীরদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র তখন তাঁহাকে উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন; ভরত এই পাদুকা নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—চতুর্দশ বৎসরের জন্য এই পাদুকায় রাজ্যভার নিবেদন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ের শেষে অগ্রজকে না দেখিলে তিনি অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিবেন। রামের পাদুকা রাজমুকুটের ন্যায় ভরতকে অপূর্ব রাজশ্রী প্রদান করিল। রামহীন অযোধ্যায় না ফিরিয়া তিনি নিকটবর্তী নন্দিগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। রাজধানী

তো নয়—ঋষির আশ্রম। সন্ন্যাসিবেশী রাজার দেখাদেখি মন্ত্রিগণও মহার্ঘ বেশ ত্যাগ করিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করিলেন। ব্রত অনশনে কৃশতনু ত্যাগী রাজকুমার রামচন্দ্রের পাদুকার উপর ছত্রধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসর যোগ্যতার সহিত রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে ভরত স্বহস্তে ভ্রাতাকে পাদুকা পরাইয়া দিয়া রাজ্যভার ও দশগুণ-বর্ধিত রাজকোষ প্রত্যর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রামায়ণে একমাত্র ভরতের চরিত্রই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সীতা, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র, কৌশল্যা—সকলের চরিত্রেই অল্পাধিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ভরত-চরিত্র ত্রুটিলেশহীন নিখুঁত অনবদ্য। এই রাজর্ষির অনুপম চিত্র রামায়ণে অপূর্ব শুচিতার সৌন্দর্য সমাবেশ করিয়াছে। দশরথ যে তাঁহাকে রামের চেয়েও বেশী ধার্মিক মনে করিতেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এইরূপ সুপুত্রের জননী হওয়ায় কৈকেয়ীর সহস্র দোষও আমরা ক্ষমা করিতে পারি।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। কৈকেয়ী—দশরথের মধ্যমা পত্নী ভরতজননী। ধর্মতো বলবত্তরম্—ধর্মের দিক্ দিয়া অধিক শক্তিশালী অর্থাৎ অধিকতর ধর্মপরায়ণ। বিলক্ষণরূপ—খুবই ভালোভাবে। ত্যাজ্যপুত্র-পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত পুত্র। ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য—ঊর্ধ্বদেহসম্বন্ধীয় ক্রিয়া, মৃতের উদ্দেশ্যে করণীয় কার্য। বিড়ম্বনা—অবাঞ্ছিত ক্লেশভোগ। বাগ্‌বিতণ্ডা তর্কবিতর্ক। অন্যায় কটাক্ষপাত—অন্যায়ভাবে দোষারোপ। সৌনিক ঘাতক, পশুহন্তা, কসাই। নিতান্ত আত্মীয়গণ—মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণ। লাঞ্ছনা—অপমান। মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ—আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা—উন্নতি-প্রাপ্ত লোকেরা, সম্পন্ন মানুষেরা। **ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা· · · ভালোবাসেন না**—যাঁহারা উন্নতি লাভ করেন, নিজেদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে একটা গর্বের সঞ্চার হয় বলিয়া পরের প্রশংসা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। রামাভিষেকের উদ্‌যোগের সময়ে—রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য আয়োজন করিবার কালে। মাতুলালয়ে—মামার বাড়িতে। ভরতের মাতুলালয় কেকয়রাজ্যে। বিচলিত হইতে—ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া যাইতে। ইক্ষ্বাকুবংশে—সূর্যবংশীয় প্রথম নরপতি ইক্ষ্বাকুর বংশ। দশরথ ইক্ষ্বাকুর বংশধর। পুরাণ-

কাহিনী-অনুসারে হাঁচিবার সময় মনুর নাসিকা হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। **এমত অবস্থায় ধার্মিকাগ্রগণ্য ভরতের** ইত্যাদি—বংশের প্রথা অনুসারে অযোধ্যার সিংহাসন জ্যেষ্ঠ বলিয়া রামচন্দ্রেরই প্রাপ্য, ভরতের তাহাতে কোনো অধিকার বা দাবি থাকিতে পারে না। তাহা সত্ত্বেও দশরথ ভরত-সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন। **ধার্মিকাগ্রগণ্য**—ধার্মিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিবার যোগ্য, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। **ভরদ্বাজাশ্রম**—মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলে অবস্থিত। **প্রত্যাগমন-সংবাদ**—ফিরিবার খবর। **বিকৃতি**—পরিবর্তন। **আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া......লক্ষ্য করিও**—রামের অবর্তমানে ভরত রাজ্য চালাইতেছেন। রামের ফিরিয়া আসার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মুখে যদি অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করা যায় তবে বুঝিতে হইবে তিনি নিজেই রাজ্যাভিলাষী, রামের আগমন তাঁহার অনভিপ্রেত। **একান্ত অমার্জনীয়**—ক্ষমার একেবারে অযোগ্য। **নিরপরাধের দণ্ড**—নির্দোষের শাস্তি।

অ. ২। **ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে**—ফোড়ায় ছুঁচ ফুটাইলে। **দৈবচক্রে পড়িয়া**—দৈবনির্দিষ্ট ঘটনার আবর্তে পড়িয়া। **বাহিনী**—সৈন্যদল। **নিষাদাধিপতি গুহক**—রামচন্দ্রের সখা চণ্ডালরাজ। ভাগীরথীতীরে শৃঙ্গবেরপুরে ইহার আবাস ছিল। রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় ইঁহার আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিলেন। **লগুড় ধারণপূর্বক**—লাঠি লইয়া। **সেই নিষ্পাপ রাজপুত্র**—রামচন্দ্র। **কোনো পাপ অভিপ্রায়**—কোনো অসৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ রামচন্দ্রের অযোধ্যা-প্রত্যাগমনে সসৈন্যে বাধাদান। **কবিগুরু**—আদিকবি বাল্মীকি। মধুসূদন তাঁহাকে 'কবিগুরু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন: "নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে"। **যবনিকা উত্তোলন করেন**—পর্দা তুলিয়া ধরেন। ভরতের চিত্রটি যেন এতকাল যবনিকার অন্তরালে ছিল, তাঁহার বর্ণনা আরম্ভ হইলে যবনিকা সরিয়া যাওয়ায় লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। **বিষণ্নতাপূর্ণ**—বিষাদে ভরা, বিষাদের কালিমাচিহ্নিত। **প্রমোদের জন্য**—আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে। **ভারাক্রান্ত**—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। **অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বাভাস** ইত্যাদি—হয়তো অযোধ্যার কোনো অনিশ্চিত ঘোর বিপদের সম্ভাবনা পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া তাঁহার মন বিষাদের ভারে প্রপীড়িত হইয়াছে। অনেক সময় পূর্ব-ইঙ্গিত ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা করে। তুলনীয়: "Coming events cast their shadows before." **ব্যগ্রকণ্ঠে**—পরম উৎকণ্ঠিতের

ভাবায়। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—দুইপ্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে এইরূপ। **কুশলাস্তে মহাবাহো** ইত্যাদি—হে দীর্ঘবাহো! আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করেন তাঁহারা কুশলেই আছেন। ইহাই সাধারণ অর্থ। ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত-টুকু এই যে ভরত কৈকেয়ী প্রভৃতির কুশল কামনা করেন, তাঁহারা ভালোই আছেন; কিন্তু রাম প্রভৃতির কুশল তাঁহার কাম্য নয়। **গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন** ইত্যাদি—দূতমুখে যে কুশলসংবাদ তিনি শুনিলেন, তাহার সঠিক মর্ম না বুঝিলেও, আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। কিছু একটা অমঙ্গল যদি না-ই ঘটিয়া থাকিবে তবে তিনি দুঃস্বপ্নই বা দেখিবেন কেন, আর দূতগণই বা তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইতে ব্যগ্র হইবে কেন? কিন্তু কি সে অমঙ্গল তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন। এই দুই ঘটনা—দুঃস্বপ্ন এবং দূতগণের ব্যস্তত। দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া—একই দুশ্চিন্তার বিষয়ীভূত করিয়া।

অ. ৩। কান্তার—দুর্গম পথ, দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য। চিরশ্রুত তুমুল শব্দ—সর্বদাই যে বিষম কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়; অবিরাম কোলাহল। কার্যস্রোতে-প্রবাহিত নরনারী—দৈনন্দিন কর্মে ব্যস্ত নরনারী। হলহলাশব্দ—কোলাহল, কর্মব্যস্ততার শব্দ। প্রমোদোদ্যান—বাগানবাড়ি। জল-নিষেকে—জলের দ্বারা ভিজাইয়া। অসংযতকবাট—উন্মুক্তদ্বার। **এ যেন অযোধ্যার অরণ্য**—অযোধ্যা যেন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও কদর্যতা আসিয়া অযোধ্যাকে গ্রাস করিয়াছে। অন্তর্হিত—লুপ্ত। চাঁদের হাট ভাঙিয়া গিয়াছে—অযোধ্যার সে পূর্বতন শোভাসৌন্দর্য আর নাই।

অ. ৪। **ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি**—ত্রিভুবনে যাঁহার যশ বিস্তৃত হইয়াছে। অভিষেক-উৎসবে দীক্ষিত—অভিষিক্ত হইবার জন্য শাস্ত্রীয় সংস্কারপ্রাপ্ত। **বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া**—ভগবানের শাপের ফলে। রামচন্দ্রের প্রতি ভগবানের অভিশাপ ছিল না বটে, কিন্তু দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপ ছিল যে তিনি পুত্রশোকে প্রাণ হারাইবেন। এখানে দশরথের শাপের ইঙ্গিত আছে বলিয়াই মনে হয়। বলয় কঙ্কণকেয়ূর—বালা, কাঁকন ও অঙ্গদ। তিনটিই হাতের অলঙ্কার। অযোধ্যার রাজবধূ—অযোধ্যারাজের পুত্রবধূ সীতা। আয়ত ও সুবৃত্ত—দীর্ঘ ও সুডৌল। অঙ্গদ—বাজু। সুবর্ণচ্ছবি—স্বর্ণকান্তি। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—রাম ও সীতার অনুগমন

করিয়াছেন। উৎস—এখানে স্রোত অর্থে ব্যবহৃত। পণ্যগৃহ—দোকান। রাজপথ পরিত্যক্ত—রাজপথে লোকজন চলাফেরা বন্ধ করিয়াছে। সুমন্ত্র—অযোধ্যারাজের মন্ত্রী ও সারথি।

অ. ৫-৬। সদ্যোবিধবা—অল্পকাল পূর্বেই যে নারীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পতিঘাতিনী—স্বামিহন্ত্রী। কৈকেয়ীই রামকে নির্বাসিত করিয়া পরোক্ষভাবে দশরথের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। সর্বজীবের যে গতি—সকল প্রাণীই যে অবস্থা একদিন-না-একদিন প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ মৃত্যু। পরশুচ্ছিন্ন বনবৃক্ষের ন্যায় কুঠারের দ্বারা কাটা বন্য গাছের মতো। অক্লিষ্টকর্মা—অক্লান্তভাবে কর্মশীল। স্তম্ভিত—হতবুদ্ধি, নির্বাক্‌। রাজশ্রী-কামনায়—রাজ্যসম্পদ্‌ পাইবার আকাঙ্ক্ষায়। পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায়—সকল শুনিয়া ভরত প্রীত হইবেন এবং তাহা প্রকাশ করিবেন ইহার অপেক্ষায়।

অ. ৭। তাঁহার মহাদুর্গতি স্মরণ করিয়া—তিনি যে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার কথা চিন্তা করিয়া। অশ্বপতি—কেকয়রাজ, কৈকেয়ীর পিতা। ধর্মবৎসল—ধর্মপরায়ণ, ধর্ম যাঁহার নিকট একান্ত আদরণীয়। সুমিত্রা—দশরথের কনিষ্ঠা পত্নী, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা। কৃশাঙ্গী—তনুদেহা। নিষ্কণ্টক—শত্রুশূন্য। মর্মবিদ্ধ—মর্মাহত। বিন্দুবিসর্গও—সামান্য অংশও। নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাত বৃষ্টি ইত্যাদি—নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভরত মনে করিলেন, তাঁহার মাতা যখন তাঁহার মঙ্গলেরই জন্য এই অঘটন ঘটাইয়াছেন, তখন মাতার অপরাধ হয়তো তাঁহাকেও কলঙ্কিত করিয়াছে। করুণাময়ী অম্বা—স্নেহশীলা জননী।

অ. ৮-১১। ঔদাসীন্য—উদাসীনতা, সকল বিষয়ে স্পৃহা ও মনোযোগের অভাব। বশিষ্ঠ—দশরথের কুলগুরু। তাড়না করিতে করিতে—বার বার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিতে করিতে। শোকবিহ্বলতায়—শোকে অভিভূত হওয়ার জন্য। চেষ্টাশূন্য—নিষ্ক্রিয়। বন্দিগণ—স্তুতিপাঠকগণ। রাজমৃত্যুর চতুর্দশ দিবসে—দশরথ মরিবার চৌদ্দদিনের দিন অর্থাৎ তাঁহার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইলে। শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেলে—কুব্জপৃষ্ঠা দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী স্বামীর নিকট ভরতের জন্য রাজ্য চাহিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন ইহা জানিতে পারিয়া মন্থরাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ছুটিয়াছিলেন এবং কৈকেয়ীকেও কটূক্তি করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু ভরত তাঁহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করেন।

অ. ১২। **শৃঙ্গবের-পুরীতে**—নিষাদাধিপতি গুহকের ভাগীরথীতীরস্থ রাজধানীতে। ইঙ্গুদীমূলে—ইঙ্গুদীগাছের তলায়। পূর্বকালে ঋষিরা ইঙ্গুদীফলের তৈল ব্যবহার করিতেন। বিশালবাহুপীড়নে—দীর্ঘ ও সুপুষ্ট হস্তের চাপে। নিষ্পেষিত—দলিত। উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু—ওড়নায় যে সোনার কাজ ছিল তাহারই খসিয়া-পড়া দুই-একটি ছোট টুকরা। **মৌনী হইয়া**—নীরবে, নির্বাক্ হইয়া। 'মৌন হইয়া' ভুল হইলেও বহুপ্রচলিত। সংজ্ঞাশূন্য—অচেতন। চিরানুরঞ্জিত—সর্বদা শোভিত। শুক—টিয়াপাখী। বিহারভূমি—লীলাক্ষেত্র। গীতবাদিত্রশব্দে—গানবাজনার শব্দে। **কারুকার্যের আদর্শ**—কারুকার্যখচিত আয়না। **কাঞ্চনভিত্তি-সমূহের দ্বারা সুরক্ষিত**—সোনার ফ্রেম দিয়া বাঁধানো। গৃহপতি—ঘরের মালিক, গৃহের অধিকারী। **আমি কোন মুখে রাজ-পরিচ্ছদ** ইত্যাদি—রাজ্য যাহার প্রাপ্য সেই রামচন্দ্র যখন পথের ভিখারীর মতো জীবন যাপন করিতেছেন, তখন আমি কোন্ লজ্জায় রাজবেশে সজ্জিত হইব?

অ. ১৩। শোকবিমূঢ়—শোকের ফলে জ্ঞানশূন্য। **চিত্রকূট**—রামায়ণে বর্ণিত পর্বতবিশেষ, ভরদ্বাজ-আশ্রমের সাড়ে তিন যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। সৌম্যমূর্তি—প্রশান্ত-দর্শনা। বিমনা—অন্যমনস্ক। বনান্তরে—বনের মধ্যে। **শুষ্কপুষ্প** কর্ণিকার-তরুর ন্যায়—যে কর্ণিকার-বৃক্ষের ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে তাহার মতো। কর্ণিকার—সোঁদাল। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী—অযোধ্যারাজের সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বৃথা-প্রজ্ঞামানিনী—বৃথা জ্ঞানের অভিমান যাঁহার আছে। রাজ্যকামুকা—রাজ্য লাভ করিবার জন্য অন্যায়ভাবে আগ্রহশীলা।

অ. ১৪-১৫। রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে ইত্যাদি—পর্বতের উপর রথ আর চলে না, তাই পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন; দ্বিতীয় কথা, অগ্রজের নিকট বিনীতভাবে যাওয়াই অনুজের উচিত। শোকের জীবন্ত মূর্তি—মূর্তিমান্ শোকের মতো। দেবোপম—দেবতুল্য। হেমচ্ছত্র—সোনার ছাতা। রাজশ্রী-সমুজ্জ্বল—রাজোচিত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। অঙ্গ-রাগবিরহিত—অঙ্গরাগহীন। প্রকৃতিপুঞ্জ—প্রজাগণ। লোকগর্হিত—মনুষ্য-সমাজে নিন্দিত। চীরবাস—জীর্ণবসন, এখানে বল্কলবাস। বিবর্ণ—পাণ্ডুর। কষ্টে চিনিতে পারিলেন—ভরতের আকৃতি এতই পরিবর্তিত হইয়াছে যে সহজে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না। **মস্তকাঘ্রাণপূর্বক**—মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া। **স্নেহের জনকে এইরূপে অভ্যর্থনা করিবার রীতি এখনও প্রচলিত আছে।**

অ. ১৬। বিতণ্ডা—তর্কবিতর্ক। **কোনোরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া**—কৈকেয়ী রাজা দশরথকে দিয়া যাহা একবার করাইয়াছেন রামচন্দ্র কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে রাজী হইলেন না। পিতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কিছুতেই তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। যে শ্লোকে তিনি তাঁহার এই অটল প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ :

"লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥"

জটাভার শোভান্বিত করিয়া—রুক্ষ জটাজালকে সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়া। **ভ্রাতৃপদ রজ**—ভ্রাতার পদধূলিতে। **সিংহহীন গুহায়**—গুহার মধ্যে সিংহ না থাকিলে যেমন তাহা শ্রীহীন দেখায়, রামের অভাবে অযোধ্যারও সেই অবস্থা। **নন্দিগ্রাম**—অযোধ্যার নিকটস্থ একটি গ্রাম। **উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম**—রাজধানীতে রাজোচিত সকল বস্তুরই সমাবেশ থাকে; কিন্তু ভরতের রাজধানীতে তাহাদের একান্তই অভাব। ঋষির আশ্রমের সামান্য দুইচারিটি বস্তু ছাড়া সেখানে ভরত আর কিছুই রাখিলেন না। তপস্বীর উপযুক্ত জীবন যাপন করিয়া তিনি রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। **মহার্ঘ**—বহুমূল্য। **কাষায়বস্ত্র**—কষায়ের দ্বারা রঞ্জিত মুনিঋষিদের পরিধেয় গৈরিক বসন।

অ. ১৭। **চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ ইত্যাদি**—ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে রাজ্যরক্ষায় ভরতের বিলক্ষণ যোগ্যতা ছিল। বস্তুতঃ, ভরত নিজের শক্তিহীনতার কথা বলিয়া যখন রামচন্দ্রকে বার বার অযোধ্যায় ফিরিতে অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন :

"ভূশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি"—সমস্ত পৃথিবীরই আধিপত্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা তোমার আছে।

অ. ১৮। **সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন**—পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র মায়ামৃগরূপী মারীচের অনুসরণ করিলে মারীচ রামকণ্ঠের অনুকরণে 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া বিলাপ করিয়াছিল। তাহা শুনিয়া সীতা মনে করিলেন, রামচন্দ্র বিপন্ন। তিনি কুটীররক্ষী লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যাইতে অনুরোধ করিলে লক্ষ্মণ প্রথমে ইতস্ততঃ করেন। পরে সীতার কটূক্তি শুনিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। এই সুযোগে রাবণ আসিয়া সীতাকে হরণ করে।

রামচন্দ্রের বালীবধ—সুগ্রীবের অগ্রজ বালী রামচন্দ্রের কোনো অনিষ্ট করে নাই। কিন্তু সুগ্রীবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে বালীকে বধ করেন। **লক্ষ্মণের কথা অনেক সময়ে** ইত্যাদি—একবার ভরতের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন"। **রুক্ষ**—কর্কশ, রূঢ়। **দুর্বিনীত**—উদ্ধত। **কোনো কোনো জলজন্তু** ইত্যাদি—মাছ নাকি নিজের ডিম নিজেই খাইয়া ফেলে; তুমিও সেইরূপ নিজের সন্তানের সর্বনাশ নিজেই করিয়াছ। **খুঁত**—সামান্য ত্রুটি বা দোষ। **ক্ষমার্হ**—ক্ষমার যোগ্য। **গর্ভধারিণী**—জননী।

ব্যাখ্যা

(১) জগতে নিরপরাধের দণ্ড……দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। (অ. ১)

দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচ্যমান মন্তব্যটি তাঁহার 'ভরত' প্রবন্ধের অন্তর্গত। ভরতের প্রতি বিশ্বসুদ্ধ সকলের অন্যায়, অবিচার ও সন্দেহের আলোচনা করিয়া লেখক আলোচ্যমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

এ জগতে কেবল অপরাধীই যে শাস্তি পায় এমন নহে—আইনের ফাঁকে অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও অপরের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকে। রাবণ সীতাহরণ করে, সমুদ্রের হয় বন্ধন—এ তো আবহমান কালই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভরতের ন্যায় ব্যক্তির দণ্ডভোগ বড় একটা দেখা যায় না। কারণ ভরত শুধু নিরাপরাধই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্ববিদিত পরমধার্মিক। যে ব্যক্তি নির্দোষ, প্রমাণাভাবে তাঁহাকে দোষী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দোষ এবং অসংখ্য গুণের আকরস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে প্রমাণাভাব কছুতেই শাস্তির কারণ হইতে পারে না। তাঁহাকে দোষী করিতে হইলে প্রমাণ করিয়া লইতে হইবে—নতুবা প্রমাণের অভাবে তাঁহার দোষহীনতাই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ভরতের পক্ষেও এইরূপ হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাঁহার বেলায় এই নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাপারটা ঘটে নাই। সকলেই তাঁহাকে অকারণে সন্দেহ করিয়াছে, দোষী করিয়াছে এবং এরূপে কৈকেয়ীর দোষের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইজন্যই লেখক সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন যে, ভরতের ন্যায় ধার্মিক ও নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

(২) কিন্তু গতরাত্রের দুঃস্বপ্ন……একান্ত বিমর্ষ হইলেন। (অ. ২)

এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'ভরত' প্রবন্ধের অন্তর্গত। রামের বনগমন এবং দশথের মৃত্যুর পর অযোধ্যার দূতগণ রাজা অশ্বপতির গৃহ হইতে ভরতকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছেন—সেই সময়ে পিত্রালয়ের দারুণ বিপর্যয়ের কালো ছায়া ভরতকে কেমন বিষাদমলিন করিয়া দিয়াছে, আলোচ্যমান অংশে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন প্রভাতে ভরত বিগত রাত্রির একটা দুঃস্বপ্নের কথা ভাবিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। অযোধ্যায় ইতিমধ্যে যে কি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, ভরত এখনও তাহা জানেন না। মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রামের নির্বাসন চাহিয়াছেন এবং শপথবদ্ধ বৃদ্ধ দশরথ পুত্রের বনগমনের পর শোকে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই শোচনীয় বিপর্যয়গুলিই যেন দুঃস্বপ্ন হইয়া ভরতের মনে বিষাদের মেঘ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। অথচ অযোধ্যার সঠিক সংবাদ এখনও তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই। তাই এ স্বপ্নের যে কি অর্থ তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ভরত ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে যাঁহাদের কুশল তাঁহার কাম্য তাঁহারা সকলে কুশলেই আছেন। ভরত বুঝিলেন না যে ইহার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম শ্লেষ রহিয়াছে। কৈকেয়ীর পুত্রের যেন বৃদ্ধ দশরথ, শ্রীরাম বা অন্য কাহারও কুশল কাম্য হইতে পারে না; কৈকেয়ী ও মন্থরা—ইহারা কুশলে থাকিলেই হইল। ভরতের পক্ষে এরূপ কামনাই সম্ভব, এই ধারণাই যেন উপরোক্ত উত্তরটি অনুপ্রাণিত করিয়াছে। যেভাবেই হউক, নির্দোষ ভরত এই উত্তরের সহজ অর্থই বুঝিয়াছেন, বুঝিয়াছেন মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণ কুশলেই আছেন। তথাপি দূত তাঁহাকে ব্যগ্রতাসহকারে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছে। ইহারই বা কারণ কি? পূর্বরাত্রের দুঃস্বপ্নের সহিত এই ব্যগ্রতার যেন একটা যোগ আছে, উভয়ে মিলিয়া যেন একটা দারুণ অমঙ্গলেরই সূচনা করিতেছে। ঘটনা দুইটি ভরতের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে নানা শঙ্কা জাগাইয়াছে। কাজেই তিনি অত্যন্ত বিষাদ-মলিনভাবে অবস্থান করিতেছেন।

(৩) সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন…দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (অ. ৩)

এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'ভরত'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। কেকয়রাজ অশ্বপতির গৃহ হইতে প্রত্যাগমনপথে ভরতের নিকট অযোধ্যার দৃশ্য

কিরূপ হতশ্রী প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই বর্ণনা-প্রসঙ্গেই আলোচ্যমান অংশটি আসিয়াছে।

বহু পথ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার নিকটবর্তী হইলে ভরত দেখিলেন নগরীর পূর্বশ্রী একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। নাগরিকগণের কর্মচঞ্চল কোলাহল নাই, প্রমোদউদ্যানসমূহ রিক্ত, শূন্য। রাজপথগুলি মরুময়, তাহাতে রথাশ্ব, যানবাহন বা জনমানবের দেখা নাই। গৃহে গৃহে মুক্ত দ্বারগুলি যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। রম্য, কোলাহলমুখর নগরীর যে রূপ ভরত দেখিতে অভ্যস্ত, তখন সে রূপ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যেন একটা ভয়াবহ রিক্ততা ও রুক্ষতা সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। ভরত বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, অনুমানে বুঝিলেন অযোধ্যার ভাগ্যে হয়তে কোনো এক শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিয়াছে। শোকবিহ্বল নগরবাসীর অন্তর্ধান আজ সেই কারণেই। রাজপথ শূন্য, বিপণিসমূহ বন্ধ, গৃহে গৃহে হাহাকার। রামের বনগমনের পর দশরথের নিকট হতশ্রী অযোধ্যার বর্ণনাপ্রসঙ্গে সারথি সুমন্ত্রের পুত্রহারা কৌশল্যার সহিত অযোধ্যাপুরীর তুলনাটি সত্যই সার্থক। রামকে হারাইয়া মাতা কৌশল্যার যে রিক্ততা ও দুর্দশা, সমগ্র অযোধ্যানগরীরও ঠিক সেইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে।

(৪) আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি···এই দুর্ভাগার মাতা। (অ. ১৩)

এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'ভরত'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। ভরদ্বাজ মুনির নিকট পরিচয়প্রদানকালে ভরত তাঁহার জননী কৈকেয়ীর এইরূপ বর্ণনা করেন।

কৌশল্যার পার্শ্বে সুমিত্রা এবং তাঁহারই পার্শ্বে কৈকেয়ী দণ্ডায়মান ছিলেন। এই কৈকেয়ীই রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস কামনা করেন। রাজা দশরথ তাঁহার নিকট শপথবদ্ধ ছিলেন। কাজেই পিতৃসত্যরক্ষার্থে রাম স্বেচ্ছায় সীতা ও লক্ষ্মণ-সহ বনগমন করেন। এই দারুণ শোকে বৃদ্ধ দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং রাজ্যবাসী সকলে গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অযোধ্যার সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা রাজলক্ষ্মী সেদিন যেন সেই শোকান্ধ হতশ্রী নগরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কৈকেয়ীই ইহার কারণ। বস্তুতঃ প্রকারান্তরে তিনিই এই রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়াছেন। পতি দশরথের মৃত্যুর কারণও তিনিই। রামকে নির্বাসিত করিয়া তিনিই শোকের আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন বলা চলে। তারপর রামের বনগমন ও দশরথের মৃত্যু—এই দুইটি

নিদারুণ ঘটনার পর যে-সকল অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহার জন্যও তো কৈকেয়ীই দায়ী। ভরতের শুভ কল্পনা করিয়া তিনি যে এতসব চক্রান্ত ও বিপর্যয় ঘটাইয়া দিলেন, তাহার ফল তিনি কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারেন নাই। নিজের বুদ্ধিকে তিনি ভুলের বশে অতিশয় গুরুত্ব দিয়া ব্যর্থ অহঙ্কার তথা মূর্খতারই পরিচয় দিয়াছেন। রাজ্যলালসা করিয়া তিনি পুত্রের শুধু দুর্ভাগ্যের বোঝাই পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিয়াছেন। ভরত মাতার পরিচয়প্রসঙ্গে এই দুঃখময় সত্যটিকে অনুতাপের সুরে এখানে ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন।

(৫) অযোধ্যা আর প্রবেশ করিতে পারিব না। (অ. ২৫)

এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'ভরত' প্রবন্ধের অন্তর্গত। চিত্রকূট পর্বত হইতে রামের পাদুকা মস্তকে বহন করিয়া ভরত অযোধ্যার সমীপবর্তী হইলেন কিন্তু রামের অবর্তমানে আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনে তিনি সম্মত হইলেন না। এই অসম্মতি প্রকাশচ্ছলেই ভরত আলোচ্যমান উক্তি করিয়াছেন।

অযোধ্যা ছিল রামরাজ্যের রাজধানী। কিন্তু সেই রামই যখন বনবাসী, তখন এই অযোধ্যার কি-ই বা আর মর্যাদা রহিয়াছে? সিংহ থাকিলেই যেমন সিংহের গুহার বিশেষ মর্যাদা, রাম বর্তমানেই সেইরূপ অযোধ্যার গৌরব। আজ রাম সেখানে নাই, অতএব উহার বিশেষত্বও কিছুই নাই। সিংহ যেখানে নাই সেই গুহা শৃগালের গুহা হইতে ভিন্ন কিসে? আধার তাহার আধেয়ের গৌরবেই গৌরবান্বিত হইয়া থাকে। অযোধ্যার গৌরবও সেইরূপ রামের অধিষ্ঠানের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। ভরতের মনের এই ভাবটির মধ্যে অবশ্য একটা করুণ বিয়োগ-ব্যথাই অধিকতর স্পষ্ট। অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রামের অসংখ্য স্মৃতি দেখি। তিনি নিত্য ব্যথা পাইবেন—এই আশঙ্কাতেই তিনি সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। সেই দুঃখেই তিনি নন্দিগ্রামে আশ্রমের মধ্যে রাজধানী স্থাপন করিয়া রামের পাদুকা সিংহাসনাভিষিক্ত করেন এবং সেখানে থাকিয়াই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র ১। দীনেশচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া ভরত-চরিত্র নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

অথবা, "রামায়ণে যদি কোনো চরিত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র।"—আলোচনা কর।

উ.। রামায়ণে সকল চরিত্রের মধ্যে ভরতের নৈতিক উৎকর্ষ সর্বাধিক। রামাদি অন্যান্য চরিত্রে অশেষ গুণের সহিত দোষের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু ভরত-চরিত্র কেবল গুণেরই আকর—দোষত্রুটি ইহাতে কণামাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না—এই হিসাবেই ভরত-চরিত্র আদর্শ। রামায়ণে তাঁহার তুলনা নাই।

অথচ এই ভরতই শুধু অন্যায় অবিচার এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। সকলেই জানিত তাঁহার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ স্বয়ং রামও নহেন, তথাপি অকারণে তাঁহার প্রতি অবিচার করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইত না। রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে রাজা দশরথ ভরতের অনুপস্থিতিতে কার্যসমাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। ভরতকে রাম অপেক্ষা ধর্মতঃ শ্রেয়ঃ জানিয়াও তিনি সেদিন একটা অন্যায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার রাম বনগমন করিলে এই দশরথই ভরতকে ত্যাজ্যপুত্র এবং নিজের ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যে অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ দিয়া যান। প্রজাবৃন্দও সেদিন নির্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্যায়ভাবে বিরূপতা প্রদর্শন করে। রামের প্রতি ভালোবাসা তাহাদের আন্তরিক হইতে পারে, কিন্তু ভরতের অধীনে নিজদিগকে ঘাতকের সম্মুখে পশুর ন্যায় ভাবিবার তাহাদের কোনো হেতু ছিল না। ভরতকে এরূপ অবিচার রামচন্দ্রের নিকট হইতেও সহিতে হইয়াছে। সীতার প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গে একবার রাম বলিয়াছিলেন—"ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না—কারণ ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা অন্যের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।" অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক না, ভরতের ক্ষেত্রে যে ইহা প্রযোজ্য নহে, এ-কথা রামচন্দ্র নিশ্চয় জানিতেন। তথাপি তিনি এরূপ অকারণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভরদ্বাজ হইতে গুহক পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই ভরতকে প্রথমে অসন্দিগ্ধ-ভাবে দেখিতে পারেন নাই। কৈকেয়ীর সকল পাপের প্রতিক্রিয়াই হয়তো বিশ্বজনকে এরূপভাবে ভরতের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ভরত তাঁহার বিপুল সহিষ্ণুতা ও নৈতিক বলে সকলের সন্দিগ্ধ ও বিরুদ্ধ মনকে জয় করিয়া লইয়াছেন।

ভরতের এই সহিষ্ণুতা ও শক্তি যে কত মহৎ তাহা বুঝিতে হইলে আরও একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অবিচার সহ্য করা ছাড়া যেখানে গত্যন্তর নাই সেখানে

সহিষ্ণুতা এক জিনিস, আর প্রতিবিধানের সুযোগ সত্ত্বেও সহিষ্ণুতা আর এক জিনিস। ভরতের সহিষ্ণুতা এই দ্বিতীয় প্রকারের। মন্থরাকে শত্রুঘ্নের কোপ হইতে রক্ষা করা সেদিন কম ধৈর্যের বিষয় হয় নাই। ভরত যে জগতের যাবতীয় অন্যায় ও অন্যায়কারীকে এরূপ ক্ষমা করিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় বৌদ্ধ অহিংসাকেও ম্লান করিয়া দেয়।

ভরতের শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী আমরা আলোচ্যমান প্রবন্ধে পাই না। কিন্তু শাসনকার্যে দক্ষতা কখনও বিনা পরাক্রমে সম্ভব হয় না। চতুর্দশ বর্ষ শাসনকালে রাজকোষ যে ব্যক্তি দশগুণ বর্ধিত করিতে পারেন, তাঁহার সবল হস্ত দুইটির বিপুল শক্তি আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

কিন্তু বীরত্ব ও পরাক্রম নহে, সহিষ্ণুতা বা ধর্মনিষ্ঠাও নহে—শিশুসুলভ একটা উদার উলঙ্গ প্রাণই ভরত-চরিত্রে অনুপম মাধুর্য আনিয়া দিয়াছে। রামের বনগমনের পর হতশ্রী অযোধ্যায় ভরতের প্রত্যাগমন এইজন্যই এত করুণ হইয়া উঠিয়াছে। পিতার কোমল করস্পর্শ হইতে তিনি চিরতরে বঞ্চিত —এ কথা জানিয়া ভরত তাই সেদিন শোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামের নির্বাসন-সংবাদ আসিয়াছে বজ্রাঘাত লইয়া। ইহার পরও মাতা কৈকেয়ী যে তাঁহার চক্রান্তের কথা সোল্লাসে বিবৃত করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। স্নেহময় পিতা ও প্রাণাধিক ভ্রাতাকে হারাইয়া শোকবিহ্বল ভরত যে আরও কিছু বলেন নাই তাহাই বরং বিচিত্র। ভরতের জীবনের এই নির্মমতার মুহূর্তে কৌশল্যার একটি কটূক্তি এই সংযমের ও এই ধৈর্যের বাঁধ শেষে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভরত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তখন আবার মাতা কৌশল্যাই এই নির্দোষ পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে বিষজ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছেন। ভরত যে মাতাদের কত স্নেহের ধন, এই দৃশ্যটিই তাহার অনির্বচনীয় দৃষ্টান্ত।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তনের পরদিবস প্রাতে বন্দিগণের স্তবে তাঁহার যে চিত্তবিক্ষোভ দেখিতে পাই, তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয়। তারপর রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটাভিমুখে যাত্রা, পথে পথে ভ্রাতার দুঃখে অজস্র অশ্রুপাত ও বিলাপ, রামের কুটীরদ্বারে অনশন করিয়া সেই হত্যা দেওয়া—প্রত্যেকটি ঘটনা তুলনাহীন। প্রত্যেকটি

ভরতের অপূর্ব ভ্রাতৃভক্তিকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তোলে। অবশেষে রামের পাদুকা শিরে বহন করিয়া ভরত ফিরিয়া আসেন এবং নন্দিগ্রামের আশ্রমে সেই পাদুকা সিংহাসনাভিষিক্ত করেন। তখন হইতে ভরত সন্ন্যাসী, রাজপুত্র হইয়াও ঋষি। এত বড ত্যাগ, এত বড় নিষ্ঠা জগতে সত্যই বিরল। ভরত-চরিত্রের এই বিপুল মহিমা স্মরণ করিলে স্বভাবতঃই বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া যাইতে হয়। একটা আদর্শের পরিপূর্ণ নিখুঁত ও মূর্ত বিগ্রহ-রূপে ভরত-চরিত্রের উদ্দেশে আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে।

প্র. ২। "আমি আজ হইতে জটা-বল্কল পড়িয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনযাপন করিব।"

—কে, কখন এই সংকল্প গ্রহণ করেন? এই সংকল্পগ্রহণকালে তাঁহার মনে কি কি কথা উদিত হয়?

উ.। গুহকের রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার পর একস্থানে ভরত রামের তৃণশয্যা লক্ষ্য করেন। একটি ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিম্নে রামের বাহুপেষণে তৃণরাশি পিষ্ট হইয়াছিল এবং সীতার উত্তরীয় হইতে স্খলিত স্বর্ণবিন্দু সেই তৃণের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ভরত পরম বিষাদে মগ্ন হইলেন, কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার চেতনা লোপ পাইল। অবশেষে চেতনা পাইয়া তিনি গভীর বিলাপ করিলেন এবং সংকল্প করিলেন যে তখন হইতে জটা-বল্কল ধারণ করিবেন, ভূতলে শয়ন করিবেন এবং ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিবেন।

এই সময় তাঁহার মনে পূর্বের বহু কথাই উদিত হয়। রাম অযোধ্যাপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। আকাশচুম্বী রাজপ্রাসাদে চিরদিন ছিল তাঁহার বাস। তাঁহার কক্ষ ছিল কুসুমে-মাল্যে-চন্দনে-চিত্রে অতি মনোহর। সে কক্ষের ভিত্তি সোনার, সে ভিত্তিতে অপূর্ব কারুকার্য। সে গৃহের শীর্ষে নৃত্যপর শুক ও ময়ূরদল বিচরণ করিত। গীতবাদ্যের মধুর তানে মুখরিত থাকিত সেই গৃহ। শ্রীরামচন্দ্র আজ সেই আরাম ত্যাগ করিয়া ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিম্নে সামান্য তৃণশয্যায় শুইয়াছেন—এ কথা ভাবিতেও ভরতের মর্ম বিদীর্ণ হইল। এ কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার কষ্ট হইল—সবটাই যেন কেমন স্বপ্নের মতো অলীক মনে হইল। তবু ভরত কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন। রামের নিরাভরণ চিত্র মনে পড়ায় রাজপরিচ্ছদ পরিতে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন এবং সেইজন্যই উদ্ধৃত সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

প্র. ৩। "এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ।" —এই 'ত্যাগী মহাপুরুষদ্বয়' কাহারা? কোথায় তাঁহাদের মিলন হয়? এই মিলনদৃশ্যটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া উহার করুণতা পরিস্ফুট কর।

উ.। রামচন্দ্র ও ভরত—এই দুইজনেই উল্লিখিত ত্যাগী মহাপুরুষদ্বয়। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য চতুর্দশ বৎসর বনবাস করেন এবং এইভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসেন। ভরত পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াও ত্যাগ করেন এবং সেই সিংহাসনে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাদুকা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য-শাসন করেন। কিন্তু নিজে সর্বত্যাগী ঋষির ন্যায়ই জীবনযাপন করেন। রামচন্দ্র ও ভরত উভয়েই চরিত্রবল, শৌর্য ও অন্যান্য নানা গুণে মহাপুরুষ, এইজন্য ইঁহাদিগকে ত্যাগী মহাপুরুষ বলা হইয়াছে।

বনবাসকালে রাম যখন চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় ভরত সদলবলে রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হন। অতএব চিত্রকূট পর্বতই রামভরতের মিলনস্থল।

ভরত যখন উপস্থিত হইলেন তখন রামচন্দ্র তৃণের উপর আসীন ছিলেন। রামচন্দ্রকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং অশান্তভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে রামচন্দ্রের মাথার উপর সর্বদা স্বর্ণময় ছত্র বিরাজ করিত, যাঁহার শীর্ষ রাজমহিমায় উজ্জ্বল দেখাইত, সেই রামচন্দ্রের মাথায় আজ কিনা জটাভার! অগুরু-চন্দনের পরিবর্তে ধূলা ই হইয়াছে তাঁহার একমাত্র অঙ্গরাগ। সর্বজনপূজ্য রামচন্দ্রের এই শোচনীয় অবস্থা। ভরত ভাবিলেন, ইহার জন্য তিনিই দায়ী। গভীর আত্মধিক্কার-সহকারে করজোড়ে তিনি রামচন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভরতের মাথায়ও তখন জটা, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। বিবর্ণ, কৃশ, অতিশয় শোকার্ত এই ভরতকে রামচন্দ্র অতিকষ্টে চিনিলেন। হাত ধরিয়া তুলিয়া তিনি তাঁহার মস্তকের ঘ্রাণ লইলেন এবং অতি আদরে কোলে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন ভরতের কেন সেই বেশ। বলিলেন, এই বেশে বনে আসা তাঁহার উচিত হয় নাই। ভরত রামচন্দ্রের পায়ে পড়িয়া স্বরাজ্যে ফিরিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং এইভাবে জননী কৈকেয়ীকে নরকভোগ হইতে উদ্ধার করিতে বলিলেন। এখন দুই ভ্রাতায় অনেক নৈতিক তর্ক হইল। প্রত্যাবর্তনে কিছুতেই রামচন্দ্রকে সম্মত করিতে না পারিয়া, ভরত কুটীরসম্মুখে

শয়ান হইয়া অনশন আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র তাঁহাকে বুকে করিয়া তুলিলেন এবং নিজের পাদুকাদ্বয় দিয়া বিদায় দিলেন। ভরত চতুর্দশ বৎসর এই পাদুকা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যভার লইতে সম্মত হইলেন। ইহার পরও রামচন্দ্র যদি না ফিরেন তবে তিনি অগ্নিতে প্রাণ আহুতি দিবেন—এই সংকল্প জানাইয়া গেলেন। এইরূপে স্নেহের দ্বন্দ্বে, ত্যাগের প্রতিযোগিতায়—দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

প্র. ৪। **"সীতা** লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার অযোগ্য।"—সীতা কোন্ প্রসঙ্গে লক্ষ্মণকে কি কটূক্তি করিয়াছিলেন ?

উ.। পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র মায়ামৃগরূপী মারীচকে অনুসরণ করিয়া শরবিদ্ধ করেন। মরার সময় মারীচ রামচন্দ্রের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া 'হা সীতা' বলিয়া বিলাপ করিয়া উঠে। শুনিয়া সীতা লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের নিকট সত্বর যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু সীতাকে একা ফেলিয়া যাইতে লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করেন। তখন সীতা লক্ষ্মণকে এই কটূক্তি করেন :

'তুমি ভরতের গুপ্তচর, ছদ্মবেশী জ্ঞাতি-শত্রু, আমার প্রতি তোমার লোভ হইয়াছে, কিন্তু রামের কিছু হইলে আমি আগুনে প্রাণ দিব।'

প্র. ৫। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর হতশ্রী অযোধ্যার যে দৃশ্যটি ভরতের চোখে পড়ে, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

প্র. ৬। দীনেশচন্দ্র সেনের 'ভরত' প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি : উল্লেখ=উৎ+লেখ। বাগ্‌বিতণ্ডা=বাক্+বিতণ্ডা। উদ্‌যোগ =উৎ+যোগ। নিরপরাধ=নিঃ+অপরাধ। সদ্যোবিধবা=সদ্যঃ+বিধবা। পরশুছিন্ন=পরশু+ছিন্ন। সময়োপযোগী=সময়+উপযোগী। কটূক্তি=কটু +উক্তি। উচ্ছ্বসিত=উৎ+শ্বসিত। হেমচ্ছত্র=হেম+ছত্র। শিরোদেশ= শিরঃ+দেশ। রাজর্ষি=রাজা+ঋষি।

সমাস ঃ আদর্শচরিত্র—আদর্শ চরিত্র যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। রাম-বনবাসোপলক্ষে—বনে বাস (৭মীতৎপুরুষ) ; রামের বনবাস (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহার উপলক্ষ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। বাগ্‌বিতণ্ডা—বাক্ অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বিতণ্ডা (৩য়াতৎপুরুষ)। দুই-এক—দুই বা এক (বহুব্রীহি)। ধর্মপ্রাণ—ধর্ম প্রাণ যাহার (বহুব্রীহি), তিনি। ধার্মিকাগ্রগণ্য—অগ্রে গণ্য (৭মী-তৎপুরুষ); ধার্মিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য (৭মীতৎপুরুষ)। নিরপরাধের—নিঃ (=নাই) অপরাধ যাহার (বহুব্রীহি), তাহার। দেবতুল্যচরিত্র—দেবের তুল্য (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); সেইরূপ চরিত্র যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। লগুডধারণপূর্বক—লগুড়ের ধারণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ ; তাহা পূর্বে যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা। শ্রীহীন—শ্রী দ্বারা হীন (৩য়াতৎপুরুষ)। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—দুই অর্থ দ্ব্যর্থ (দ্বিগু) ; দ্ব্যর্থের ব্যঞ্জক (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। বেদপাঠনিরত—বেদের পাঠ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহাতে নিরত (৭মীতৎপুরুষ)। কার্যস্রোতে-প্রবাহিত—কার্যের স্রোত (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার দ্বারা প্রবাহিত (অলুক্ ৩য়াতৎপুরুষ)। প্রমোদোদ্যানসমূহে—প্রমোদের জন্য উদ্যান (৪র্থীতৎপুরুষ) ; তাহাদের সমূহ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহাতে। অসংযতকবাট—নয় সংযত (নঞ্‌তৎপুরুষ) ; অসংযত কবাট যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি—ত্রি (তিন) লোক (দ্বিগু), তাহাতে বা তাহার দ্বারা বিশ্রুত (৭মীতৎপুরুষ বা ৩য়াতৎপুরুষ), সেইরূপ কীর্তি যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। পুত্রশোকে—পুত্রের জন্য শোক (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। পাদোত্তোলনোদ্যত—পাদের উত্তোলন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ) ; তাহাতে উদ্যত (৭মীতৎপুরুষ)। বলয়কঙ্কণকেয়ূর—বলয় এবং কঙ্কণ এবং কেয়ূর (দ্বন্দ্ব)। সদ্যোবিধবা—সদ্যঃ বিধবা—(সুপ্‌সুপা)। পতিঘাতিনী—পতিকে হত্যা করিয়াছে যে নারী (উপপদ-তৎপুরুষ)। অক্লিষ্টকর্মা—নয় ক্লিষ্ট (নঞ্‌তৎপুরুষ), সেইরূপ কর্ম যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। ধর্মভীরু—ধর্ম হইতে ভীরু (৫মী তৎপুরুষ)। অশ্রুপূর্ণ-কাতরদৃষ্টি—অশ্রুর দ্বারা পূর্ণ (৩য়াতৎপুরুষ) ; কাতর যে দৃষ্টি (কর্মধারয়) ; অশ্রুপূর্ণ কাতরদৃষ্টি যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। অযোধ্যাবাসী—অযোধ্যায় বাস করে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। বিশালবাহুপীড়নে—বিশাল বাহু (কর্মধারয়) ; তাহার দ্বারা পীড়ন (৩য়াতৎপুরুষ), তাহাতে। সাশ্রুনেত্রে—অশ্রুর সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি), সাশ্রু নেত্র (কর্মধারয়), তাহাতে। আকাশস্পর্শী—আকাশকে স্পর্শ করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। কাঞ্চনভিত্তিসমূহ—কাঞ্চননির্মিত ভিত্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; তাহাদের সমূহ (৬ষ্ঠীতৎ-

পুরুষ)। শুষ্কপুষ্পকর্ণিকার তরুর—শুষ্ক হইয়াছে পুষ্প যাহার (বহুব্রীহি); কর্ণিকারনামক তরু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); শুষ্কপুষ্প কর্ণিকারতরু (কর্মধারয়), তাহার। বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী—বৃথা প্রজ্ঞা (সুপ্ সুপা), বৃথাপ্রজ্ঞা মানে যে নারী (উপপদ-তৎপুরুষ)। দেবোপম—দেব উপমা যাহার (বহুব্রীহি), তিনি। অঙ্গরাগ-বিরহিত—অঙ্গের রাগ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা বিরহিত (৩য়াতৎপুরুষ)। কৃতাঞ্জলি—কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যাঁহার দ্বারা (বহুব্রীহি), তিনি। মস্তকাঘ্রাণপূর্বক—মস্তকের আঘ্রাণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহা পূর্বে যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা। ভ্রাতৃপদরজে—পদের রজ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); ভ্রাতার পদরজ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। ফলমূলাহারী—ফল এবং মূল (দ্বন্দ্ব); তাহা আহার করেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ)। সচিববৃন্দ পরিবৃত—সচিবদের বৃন্দ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার দ্বারা পরিবৃত (৩য়াতৎপুরুষ)। ক্ষমার্হ—ক্ষমা অর্হণ করে অর্থাৎ ক্ষমার যোগ্য হয় যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। গর্ভধারিণী—গর্ভ ধারণ করিয়াছেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ)। নিষ্কণ্টক—নিঃ (=নাই) কণ্টক অর্থাৎ শত্রু যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা। কণ্ঠলগ্ন—কণ্ঠে লগ্ন (৭মীতৎপুরুষ)। অনশনকৃশ—নয় অশন (নঞ্ তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা কৃশ (৩য়াতৎপুরুষ)।

সমস্তপদ-গঠন : (ক) প্রশ্ন : 'পদাঙ্ক' শব্দটির অনুকরণে 'অঙ্ক' শেষে থাকে এমন কয়েকটি শব্দ গঠন কর।

উত্তর : শশাঙ্ক, হিমাঙ্ক, তাপাঙ্ক, মানসাঙ্ক, স্বাঙ্ক (=নিজের কোল)।

প্রশ্ন : 'অগ্রজ'-এর অনুকরণে '-জ' উত্তরপদরূপে শব্দ গঠন কর।

উত্তর : জলজ, পঙ্কজ, সহজ, সরোজ, মনোজ, বনজ, উদ্ভিজ্জ, আত্মজ।

প্রশ্ন : 'ক্ষমার্হ'-এর অনুকরণে '-অর্হ' উত্তরপদরূপে শব্দ গঠন কর।

উত্তর : দণ্ডার্হ, পূজার্হ, সম্মানার্হ, শ্রদ্ধার্হ, ঘৃণার্হ, নিন্দার্হ।

[এইরূপে গঠিত শব্দ লইয়া বাক্য-রচনা অভ্যাস করিতে হইবে।]

(খ) সন্দেহের বাণ=সন্দেহবাণ। সন্দেহের ভাজন=সন্দেহভাজন। দুশ্চিন্তার সূত্রে=দুশ্চিন্তাসূত্রে। বিধিশাপে অভিশপ্ত=বিধিশাভিশপ্ত। সর্বভূষণ ধারণের যোগ্য=সর্বভূষণধারণযোগ্য। গৃহে গৃহে=প্রতিগৃহে। পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ=পিতৃহস্তসুখস্পর্শ। শোক ও লজ্জায় অভিভূত=শোক-লজ্জাভিভূত। রাজ্যভার গ্রহণ করিতে=রাজ্যভারগ্রহণার্থ। শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা=শোকানশনক্ষীণদেহা।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ ত্যাজ্য—ত্যজ্ + ণ্যৎ। ঔর্ধ্বদৈহিক—উর্ধ্বদেহ + ঠক্ (ইক)। আতঙ্কিত—আতঙ্ক + ইতচ্। ফুল্লা—ফল্ + ক্ত কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রীলিঙ্গে আ। স্তম্ভিত—স্তম্ভ + ইতচ্। মুহ্যমান—মুহ্ (সংস্কৃত ধাতু) + মান (বাঙলা কৃৎ—সংস্কৃত 'শানচ্' নয়, কারণ 'মুহ্' ধাতু পরস্মৈপদী)। ঔদাসীন্য—উদাসীন + ষ্যঞ্। আতিথ্য—অতিথি + ণ্য। কাষায়—'কষায়ের দ্বারা রঞ্জিত' এই অর্থে কষায় + অণ।

এক কথায় প্রকাশঃ বন্যবৃক্ষের ন্যায়—বন্যবৃক্ষবৎ। স্বপ্নের ন্যায়—স্বপ্নবৎ। আরাধনার বস্তু—আরাধ্য। মুকুটের স্থানীয়—মুকুটস্থানীয়।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগঃ প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল = অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইতেছিল।

চাঁদের হাট = বহু রূপবান্ ও গুণবানের একত্র সমাবেশ।

বিন্দুবিসর্গ = সামান্যতম অংশ।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তনঃ ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না (সরল)—যে সকল পুরুষ ঋদ্ধিযুক্ত, তাঁহারা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না (জটিল)।

যদিও ভরত ধার্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ (জটিল)—ভরত ধার্মিক ও তোমার অনুগত হইলেও মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ (সরল)।

ধার্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই (নেতিবাচক)—ধার্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহ অমার্জনীয় (অস্তিবাচক)।

কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোনো খুঁত নাই—কিন্তু ভরতের চরিত্র নিখুঁত (বাক্য-সংক্ষেপ)।

জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মতো আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল (যৌগিক)—জগতের নিরপরাধের দণ্ড অনেকবার হইলেও ভরতের মতো আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল (সরল)।

সর্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন (জটিল)—তোমার পিতা সর্বজীবের গতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন (সরল)।

সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন তাহা ক্ষমার্হ নহে (জটিল)—লক্ষ্মণের প্রতি সীতার কটূক্তি ক্ষমার্হ নহে (সরল)। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন তাহা কি ক্ষমার্হ (প্রশ্নবোধক) ?

রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য সমর্থন করা যায় না—রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য সমর্থনযোগ্য নয় (বাক্য-সংক্ষেপ)।

ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই—ভোগবিলাসের দ্রব্য আমার কাজে লাগিবে না ('দ্রব্যে'-কে কর্তৃপদে রূপান্তরিত করিয়া)। ভোগবিলাসের দ্রব্য দিয়া আমি কি করিব (প্রশ্নবোধক)।

তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও—আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক (বাচ্যান্তর)

রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মতো বোধ হইল—রাজহীন রাজশয্যাকে তিনি চন্দ্রহীন আকাশের মতো বোধ করিলেন (বাচ্যান্তর)।

তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনো—তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনা হউক (বাচ্যান্তর)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ ও শব্দগুচ্ছ : বিড়ম্বনা, ধার্মিকাগ্রগণ্য, বিরল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া, পূর্বাভাস, চাঁদের হাট, নিষ্কণ্টক, বিন্দুবিসর্গ, ঔদাসীন্য, নিষ্পেষিত, ধূলিলুণ্ঠিত, কৃতাঞ্জলি।

ব্যাকরণগত টীকা : মুহ্যমান—'প্রকৃতি-প্রত্যয়' অংশে দ্রষ্টব্য।

পাগলিনী (-বেশে)—পুংলিঙ্গ 'পাগল'-এর বাঙলা স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ 'পাগলী' ; কিন্তু বাঙলায় ইনী-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ-সৃষ্টির একটা প্রবণতা আছে বলিয়া এখানে 'পাগলিনী' করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মধুর ঝংকার-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বহু খ্যাতনামা কবি এবং লেখক এইরূপ করিয়াছেন।

চলিত-ভাষায় রূপান্তর : প্রবন্ধটি আগাগোড়া সাধুভাষায় লিখিত বলিয়া ইহা হইতে যে-কোনো অংশ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

"শ্রীযুক্ত চৌধুরীর বঙ্গসাহিত্যে স্থান ঠিক তাঁহার রচনার উপর নির্ভর করে না—তিনি একজন সেই শ্রেণীর লেখক যাঁহার প্রভাবে লিখিত পুস্তককে অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। Paradox-এর খোঁচা দিয়া তিনি আমাদের সহজেই ভাবাবেশপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—খাঁটি সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতিষেধক উত্তেজনা-সঞ্চারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। আমাদিগকে ভাববিহ্বলতার মোহ হইতে সচেতন করিয়া তিনি আমাদের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।······আমাদের ভক্তিরসমদির ও আনুগত্যমন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসী-দেশ-সুলভ লঘুচপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাবিমুখতা, অথচ মার্জিতরুচি শ্লেষাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানী করিয়াছেন। অনেক নব্যতন্ত্রী লেখকের চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গী তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে এক বিশিষ্ট রচনারীতির প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার নিজ নাম অপেক্ষা ছদ্মনাম বীরবলের দ্বারাই অধিক সুপরিচিত। সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রবর্তনে তিনি পথপ্রদর্শক না হইলেও একজন উৎসাহশীল সমর্থক, এবং এই বিষয়ে যে তুমুল বাদানুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল সেই তর্কযুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়া সাহিত্যরাজ্যে কথিত ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ······এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার যুক্তি ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের পরবর্তী রচনায় কথিত ভাষার প্রচলন করিয়াছেন। ······তাঁহার মননশক্তির গুণাবলীর মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিস্তার ও মৌলিক গভীরতার অপেক্ষা ক্রীড়াশীল চাপল্যই অধিকতর লক্ষণীয়।"

উৎস ও নামকরণ—'মন্ত্রশক্তি' কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিখিত এবং 'ছোটদের বার্ষিকী'তে প্রকাশিত একটি গল্প। যোগ্যতর নামের অভাবেই মন্ত্রশক্তি নামটি প্রথমবাবু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজে ইহার অর্থ দিয়াছেন 'দেবতা'। কিন্তু 'দেবতা'কে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

তাহাতে ইহাকে প্রতিভার নামান্তর বলিয়াই বোধ হয়। তবু ইহা ঠিক প্রতিভাও নয়। গল্পটি আদ্যন্ত অভিনিবেশসহকারে অনুসরণ করিলে ধারণা হয় ইহা মানুষের জন্মসূত্রে লব্ধ এক অলৌকিক শক্তি, যাহা সকল সময়েই প্রকাশমান থাকে না, কিন্তু যোগ্যক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির যোগে সাধারণ মানুষকেও অসামান্য করিয়া তোলে।

সমালোচনা—আলোচ্য গল্পটির রচনারীতির পরিচ্ছন্নতা প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল কথাভাষা বলিয়াই নহে, লেখার এমন একটি উজ্জ্বল বেগবান্ ভঙ্গী ইহাতে সুস্পষ্ট যাহা এই ভাষাকে অনন্যতায় বিভূষিত করিয়াছে। প্রমথবাবুর লেখা-সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলিয়াছেন যে বর্ণনা উহাতে প্রধান নহে, 'স্ফূর্তি'ই উহাতে প্রধান। আলোচ্য গল্পেও এই মন্তব্যের সত্যতা-সম্বন্ধে প্রমাণ রহিয়াছে। এই কাহিনীটিতে বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে যখন আসিয়াছে তখন অবশ্য অতিশয় সংযত তুলিকাস্পর্শে লেখক চিত্ররচনায় দক্ষতারও যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। ঈশ্বর পাটনীর মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে দৈহিক রূপান্তর অথবা সড়কির ফলার অগ্রপশ্চাৎ গতির বর্ণনা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে পেন্সিল-চিত্রের (Pencil-sketch) ন্যায় বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন অগভীর রূপই ইহাতে ফুটিয়াছে।

লেখক গল্পের প্রারম্ভেই আবহাওয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য ব্রহ্মদৈত্য ও কবন্ধের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত আলোচ্য গল্পের কোনো সম্বন্ধ নাই। উল্লিখিত প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে উহা আসিয়াছে। কিন্তু সে প্রয়োজন সিদ্ধ হউক না হউক, উহা অবান্তরই বটে।

এ-সকলের মধ্যেই conscious art বা সচেতন কলাচাতুর্যের প্রতি লেখকের লক্ষ্য অধিক বলিয়া মনে হয়। খাঁটি শিল্পপ্রেরণা নিয়মনির্দিষ্ট গণ্ডী অপেক্ষা বৃহত্তর স্থান না পাইলে কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। ছোট গল্পের আকার তাই কখনও কখনও বেশ বৃহৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রমথবাবুর মতে ছোট গল্প ছোটও, গল্প তো বটেই। এই কারণে নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে তিনি কাহিনী সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তাহার জন্য তাঁহার স্বভাবজাত শিল্পচাতুর্যের আশ্রয় লইয়া থাকেন। প্রেরণা ও কলানৈপুণ্য—এই দুইয়ের পরবর্তীটিই তাঁহার রচনায় অধিকতর সুস্পষ্ট। আলোচ্য গল্পেও তাই তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং অপ্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের সাহায্য লইয়া কাহিনীটির একটি রূপ দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

গল্পটিতে ঈশ্বর পাটনীর একটা দিক সুন্দরভাবে বিকশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য অন্য। মন্ত্রশক্তির তত্ত্বটি প্রতিপন্ন করাই তাঁহার লক্ষ্য। ছোটদের গল্পে এরূপ একটা সারকথা নিঙড়াইয়া বাহির করা অবশ্য দোষাবহ নহে। তবে উহা যে শিল্পের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন রূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের ধারণা ছিল যে কখনও কখনও মানুষের উপর দেবতা ভর করেন। এই অবস্থার নাম তাহাদের ভাষায় entheos-mos (=to be possessed by God), যাহা ইংরেজী ভাষায় হইয়াছে enthusiasm বা অনুপ্রেরণা। ভূতে ভর করিলে যেমন, ঠিক তেমনি দেবতা ভর করিলে মানুষের মধ্যে পাগলামি বা উন্মাদনা দেখা দেয়। কিন্তু দেবতার জন্য উন্মাদনা বলিয়া উহাকে বলা হয় divine frenzy বা স্বর্গীয় উন্মাদনা। এই স্বর্গীয় উন্মাদনাই সকল কাব্যশিল্পের মূলীভূত কারণ—ইহাই একশ্রেণীর শিল্পের অদ্যাবধি অভিমত। এই মতের সহিত ইংরেজ কবি Shelley-র একটি মত স্মরণ করিলেই লেখকের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। Shelley-র মতে জগতের মহৎ ও বৃহৎ সব কিছুরই মধ্যে একটা order বা ভাব-সৌষম্য রহিয়াছে—তাহাও কাব্য এবং এসকলের মূলে রহিয়াছে প্রেরণা, অনুশীলন নহে। অতএব জগতের সকল খেলাতেই অপরাজেয় মহিমা তাঁহারই প্রাপ্য যিনি স্বর্গীয় উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত বা যাঁহার উপরে দেবতা ভর করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রের এই সুবিদিত তত্ত্বটি এই গল্পে ছায়াপাত করিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার—লেখক তাঁহার নায়েববাবু প্রভৃতির সহিত চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। চণ্ডীমণ্ডপের পূর্বদিকে দশবারোজন লাঠিয়াল জমায়েত হইয়াছিল। লাঠিখেলা দেখিবার জন্য জনসমাগমও কম হয় নাই। লাঠিয়ালদের সর্দার ছিল খ্যাতনামা লকড়িওয়ালা মনিরুদ্দি—সুন্দর চেহারা, গৌরবর্ণ, মাথায় ছ' ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁফ ছাঁটা। দর্শকদের মধ্যে ছিল ঈশ্বর পাটনী।

নায়েববাবুর পরামর্শে লেখক ঈশ্বরকে অনুরোধ করিলেন একহাত খেলা দেখাইতে। ঈশ্বর তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইল যে বিশ-পঁচিশ বৎসর যাবৎ সে লাঠি-সড়কিতে হাত দেয় নাই, অধিকন্তু খেলোয়াড়দের কাছে ঠাকুরের সম্মুখে দিব্য করিয়াছে যে লাঠি-সড়কি সে আর ছুঁইবে না। যৌবনে ইহাদেরই সহিত সে খেলা শিখিয়াছিল এবং সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের

ধারণা হইয়াছিল যে সে মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করে। ঈশ্বর তাহাদের পথের কণ্টক ছিল। কণ্টক অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে একদিন সকলে যুক্তি করিয়া কালীমন্দিরে লইয়া গিয়া তাহাকে বলি দিবার ব্যবস্থা করে। অবশেষে দেবীর সম্মুখে শপথ করাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। কাজেই সে শপথভঙ্গের অপরাধ করিতে পারিবে না। তবে ইহারা যদি অনুমতি দেয়, সে একহাত খেলিতে পারে।

অনুমতি মিলিল। কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার ফলে ঈশ্বরের চেহারার এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হইল যে, মনে হইল সে এক নূতন মানুষ।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে লকড়ি লইয়া আগাইয়া আসিল বিংশবর্ষীয় এক যুবক, মনিরুদ্দির পুত্র কামাল—সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি। এক মিনিটেই তাহার লকড়ি আসিল ঈশ্বরের হাতে এবং সে বোকার মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রুদ্ধ মনিরুদ্দি এবার স্বয়ং নামিল। কিন্তু পাঁচ মিনিটে তাহার লকড়ি শিবমন্দিরের দেওয়ালে উড়িয়া পড়িয়া গেল এবং মনিরুদ্দির গায়ে দেখা গেল লাল লাল দাগ।

পিতাপুত্রের পরাজয়ে আত্মহারা হইয়া হেদাৎউল্লা লাফাইয়া উঠিল। এবার সুরু হইল সড়কিখেলা। সে খেলা অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল হেদাৎউল্লার সড়কি মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার কব্জি হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে।

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখিয়া লাঠিয়ালদের মাথায় খুন চড়িয়া গেল। তাহারা একসঙ্গে ঈশ্বরকে আক্রমণ করিল। একখানা মাত্র লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া ঈশ্বর অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিল। লেখকের অনুরোধে লাঠিয়ালগণ আত্মসংবরণ করিল; তাহা ছাড়া তাহারা অনেকেই আহত হইয়াছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে ঈশ্বরের লাঠি তাহাদের কাহাকেও আঘাত করে নাই। সকলেই তখন বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে ঈশ্বর যাদু জানে। প্রতিবাদে ঈশ্বর জানাইল সে মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানে না। লাঠি-সড়কি ধরিলেই তাহার শরীরে কি যেন ভর করে; তাহার নিজস্ব কৃতিত্ব বা শক্তি কিছুই নাই, সবই সেই যিনি ভর করেন, তাঁহার।

এই শক্তিই লেখকের মন্ত্রশক্তি।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই শক্তির বলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে।

অথচ এই শক্তির সঠিক স্বরূপটি কি তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমনকি যাহাকে উপলক্ষ করিয়া শক্তির অপূর্ব ক্রিয়া প্রকাশ পায় সে-ও ইহার তত্ত্ব অবগত নহে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১-৪। মন্ত্রশক্তি—অতিপ্রাকৃত শক্তি, দৈবশক্তি। **চণ্ডীমণ্ডপ**—দুর্গাদি দেবতার পূজাগৃহ; মধ্যযুগে বঙ্গদেশে চণ্ডীপূজার প্রবর্তন হইলে উক্ত দেবীর পূজার জন্য যে মণ্ডপ নির্মিত হইত তাহারই নাম চণ্ডীমণ্ডপ। পরে অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। **লেঠেল**—লাঠিয়াল, যাহারা লাঠি চালাইতে পারে। **জমায়েত**—একত্র সম্মিলিত। কথাটি আরবী 'জমাঅৎ' হইতে জাত। ব্রহ্মদৈত্য—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। ধড়—দেহ। **কবন্ধ**—মস্তক-বিহীন কাল্পনিক রাক্ষসবিশেষ। [ব্রহ্মদৈত্য ও কবন্ধের বর্ণনা করিয়া পাঠককে পরবর্তী অলৌকিক একটাকিছু ঘটনার জন্য উন্মুখ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।] ধোঁয়ার মতো···মাথার জটা—জ্যোৎস্নারাত্রের আলো-আঁধারীতেই সাধারণতঃ লোকে ভূত দেখিয়া থাকে। গাছপালার ছায়াঘন অঞ্চলে ম্লান চন্দ্রকিরণ পড়িয়া যে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাহাকেই ভূতের দেহ এবং বৃক্ষশীর্ষের জমাট অন্ধকারকে তাহার ঘনকৃষ্ণ জটা বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সৈন্যসামন্ত—এস্থলে শিষ্য এবং পক্ষীয় লোকগণ। **লকড়িওয়ালা**—লাঠিয়াল।

অ. ৫-১১। নায়েব—জমিদারী কাছারির উচ্চ ও মফস্বল মহলের সর্বোচ্চ কর্মচারী। **পাটনি**—খেয়াঘাটের মাঝি। তুলনীয়: "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনি"—অন্নদামঙ্গল। **সড়কি**—বল্লম, বর্শা। অনুগত—বাধ্য। মাস—মাংস। জাত-ব্যবসা—জাতিগত উপজীবিকা, পিতৃকুলের পেশা। সেকালে জমিদারদিগের হস্তে দেশের শাসনভার অনেকখানি ন্যস্ত ছিল। সেই সময়ে তাঁহাদের অনেকে লাঠিয়াল মাহিনা দিয়া রাখিতেন। এই-সকল লাঠিয়াল আত্মরক্ষা, জমিদখল প্রভৃতি কাযে জমিদারের সহায়তা করিত। অনেক মুসলমান এবং বাগ্দী, গোয়ালা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সেকালে পুরুষানুক্রমে এই লাঠিয়ালের কাজ করিত এবং সেই হিসাবে ইহা একপ্রকার জাতিগত উপজীবিকায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দিব্যি—শপথ, অঙ্গীকার।

অ. ১২। এরা—সমবেত লাঠিয়ালগণ। কুড়িক—প্রায় কুড়ি। সেরা

—শ্রেষ্ঠ। হাড়কাঠ—পশু-বলিদানের জন্য কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রবিশেষ, যূপকাষ্ঠ। চড়াও—অনধিকার প্রবেশ। আষ্টেপৃষ্ঠে—সর্বাঙ্গে। উদ্‌যোগ—আয়োজন, উপক্রম।

অ. ১৩-১৮। **বেমালুম**—যাহা টের পাওয়া যায় না, অবলীলাক্রমে। গুলি—আফিঙমিশ্রিত একপ্রকার গুটিকা। ইহার ধূমপান করা হইয়া থাকে। **বুড়ো হাড়েও**—বৃদ্ধ দেহেও। [অংশের দ্বারা সমগ্রের প্রকাশ।]

অ. ১৯-২০। নজরবন্দী—দৃষ্টিপথে বন্দী; বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া শক্তিহীন করিয়া রাখা। 'নজরবন্দী' শব্দটি কড়া পাহারায় বন্দী করিয়া রাখার অর্থেও কোনো কোনো স্থানে ব্যবহৃত হয়। **বাপের বেটা**—পিতার উপযুক্ত পুত্র। তুলনীয়ঃ 'বাপকা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ ভী নেহি তো থোড়া থোড়া'—হিন্দী প্রবাদ।

অ. ২১-২৭। ডোরা—লম্বা দাগ। **খুনে**—মারাত্মক; যে রক্তপাত বা খুন করে। কাজিয়ে—ঝগড়া বিবাদ। আপোসে—পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া (ইংরেজী friendly)। **রক্ত যেমন আমার গায়ে** ইত্যাদি—অর্থাৎ আমার রক্তপাত করিলে আমিও তোমার দেহের রক্তপাত করিব। **ফিন্‌কি**—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বেগে কোনো দ্রব্যের নির্গমন। **মাথায় খুন চড়ে গেল**—মাথায় রক্ত বেগে চলিতে লাগিল অর্থাৎ প্রতিশোধ-গ্রহণের স্পৃহা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে অবস্থায় নরহত্যা করা খুবই স্বাভাবিক। 'মাথায় খুন চড়া' বাঙলা ইডিয়ম। সমস্বরে—মিলিত কণ্ঠে। **আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে** ইত্যাদি—লাঠিয়ালদের নিরস্ত হওয়ার আরও একটি কারণ—ঈশ্বরের লাঠি চালাইবার কৌশলে নিজেদেরই লাঠির আঘাতে তাহাদের অনেকেই জর্জরিত হইয়াছিল। লাঠিবৃষ্টি—দ্রুতপতনশীল লাঠির আঘাত। ঘন ঘন লাঠির আঘাত বৃষ্টির মতো বর্ষিত হইল। **জাদু**—ইন্দ্রজাল, ভেল্কী, মন্ত্রতন্ত্র। **মন্তরের সঙ্গে**—মন্ত্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে। কী যেন ভর করে—কোথা হইতে যেন একটা অজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাব ঘটে। পৃথিবীর সব খেলাতেই—পৃথিবীর সর্বপ্রকার কর্মেই। **সাহিত্যের খেলাতে**—সাহিত্যরচনায় নূতন নূতন রসসৃষ্টির ব্যাপারে। 'সাহিত্যের খেলা' প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, ইহা মানুষের কল্পনা-বিলাস মাত্র। **পলিটিক্সের খেলাতে**—রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে। রাজনীতিও লেখকের মতে খেলা।

ব্যাখ্যা

(১) পশ্চিমে শিবের মন্দির……সকলেই ভয় করতেন। (অ. ৩)

আলোচ্য অংশটি প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-নামক গল্পের অন্তর্গত। মন্ত্রশক্তির একটি কাহিনীর উপযোগী আবহাওয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য লেখক এই অলৌকিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

লেখক চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহারই সম্মুখে ঈশ্বর পাটনীর দেহে দেবতার ভর তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বারান্দার একপার্শ্বে শিবের মন্দিরসংলগ্ন একটি বেলগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। দাসী-চাকরানীদের এইরূপ বিশ্বাস এবং এরূপ জনশ্রুতিও ছিল যে, তাহাদের কেহ কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে সেই ব্রহ্মদৈত্যকে দেখিয়াছিল। তাহাদের দেহ ছিল ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট, স্পর্শের অতীত কোনো এক বস্তুতে নির্মিত। তাহার জটাজাল যেন কুয়াশায় রচিত। চণ্ডীমণ্ডপের দক্ষিণে পূজার মন্দিরের প্রাঙ্গণতলে এইরূপ আর একটি অলৌকিক জীব অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিত। সেটি হইল কবন্ধ। ইহা একপ্রকার মস্তকহীন কল্পিত রাক্ষস। বাস্তুজগতে ইহার অস্তিত্বের কথা শুনা যায় না। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, সে-বাড়ীর সকলেই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল। চোখে না দেখিলেও সকলে তাহাকে ভয় করিত। পূজার প্রাঙ্গণে লক্ষ বলি হইয়াছিল বলিয়াই এই কবন্ধের নিশ্চিত জন্মসম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

[কবন্ধ বা ব্রহ্মদৈত্যের সম্বন্ধে এই বৃত্তান্তের অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, লেখক লোকাতীত একটি জগতের প্রতি পাঠকের চিত্তকে উন্মুক্ত করিতে চাহেন। গল্পটি বিশেষ করিয়া বালকবালিকাদের জন্য লিখিত এবং সেজন্য ইহা ব্যর্থপ্রয়াসও নহে। সেই লোকাতীত জগৎ হইতে অলক্ষ্যে মানুষের উপর যেসকল প্রভাব আসিতেছে তাহা পৃথিবীর বড় কাজগুলির জন্য প্রেরণা ও শক্তি যোগায়—লেখক এই গল্পে তাহাই বলিতে যাইতেছেন।]

[কবন্ধ, ব্রহ্মদৈত্য ও চণ্ডীমণ্ডপ—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

(২) হুজুর, নেশায় শরীরে……আসল শক্তি। (অ. ১৭)

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-শীর্ষক গল্পে লেখকের প্রতি ঈশ্বর পাটনীর উক্তি। ঈশ্বরের বক্তব্য ইহাই যে বিদ্যা দৈহিক শক্তি-নিরপেক্ষ।

যৌবনের কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে ঈশ্বর লাঠিয়াল মিছু সর্দারের উল্লেখ করে। মিছু সর্দার গুলি খাইত, তথাপি লাঠিখেলায় তাহার সমকক্ষ ওস্তাদ ঐ অঞ্চলে দুইটি ছিল না। লেখকের তাই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে—কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছে? নেশা করিয়া মিছু সর্দার নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহার লাঠিখেলায় পারদর্শিতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উত্তরে ঈশ্বরের বক্তব্য এই যে, দৈহিক শক্তি এক বস্তু এবং বিদ্যার শক্তি আর এক বস্তু। দৈহিক শক্তির বলে কসরত করা চলে কিন্তু বিদ্যার অলৌকিক শক্তি ছাড়া তাহা কখনও অসাধারণত্ব দিতে পারে না। বিশেষতঃ, দেহের শক্তি ক্ষণস্থায়ী, নেশায় তাহার নাশ হয়, বার্ধক্যে তাহার বিলোপ ঘটে। কিন্তু বিদ্যার যে শক্তি তাহা দেহের ক্ষয়ক্ষতি-নিরপেক্ষ। অতএব তাহাই আসল বস্তু। নকল বস্তু যেমন কিছুদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, দেহের শক্তিও তেমন রোগশোকজরা প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষয় পাইয়া থাকে। খাঁটি যাহা তাহার এরূপ ক্ষয় নাই। সেজন্য বিদ্যার শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। নেশাখোর মিছু সর্দারের দুর্বল দেহেও তাই বিদ্যার শক্তি নষ্ট হয় নাই। লাঠিখেলায় এখনও তাহার পূর্বের ন্যায় পারদর্শিতা রহিয়াছে। ['গুলি' কথাটির অর্থ লেখ।]

(২) তারপর যখন সে……ইস্পাতের মতো। **(অ. ১৯)**

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-শীর্ষক গল্পের অন্তর্গত। লাঠিখেলার পূর্বে মন্ত্র বা ঐ ধরনের একটা প্রক্রিয়ার পর ঈশ্বরের দেহ যে রূপ ধারণ করিল এই অংশে তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে।

লাঠিয়ালদের সম্মতিক্রমে ঈশ্বর বহুদিন পরে লাঠিখেলায় রাজী হইয়াছিল। প্রথমে সে কোমরের কাপড় বুকে তুলিয়া বাঁধিল। তাহার পরে একমুষ্টি ধূলি লইয়া মাথায় ঘষিয়া ঝাঁকড়া চুল ফুলাইয়া লইল এবং যোড়াসনে বসিয়া পাঁচ মিনিট ধরিয়া কি যেন বিড়বিড় করিয়া বকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল। কোনো এক অলৌকিক শক্তির প্রভাব তাহাকে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ করিয়া দিল। শীর্ণ দেহটা তাহার ইস্পাতের মতো শক্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটি হইতে এক অভূতপূর্ব তেজস্বিতা প্রকাশ পাইল।

[যাহা ঈশ্বরের দেহের এই রূপান্তর ঘটাইয়াছিল তাহাকেই লেখক 'মন্ত্রশক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল বিষয়েই অনন্যসাধারণত্বের মূলে রহিয়াছে এই শক্তি—লেখকের ইহাই প্রতিপাদ্য।]

(৪) সড়কির সাপের ···· জিভ নয়, দাঁত (অ. ২২)

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-শীর্ষক গল্প হইতে উদ্ধৃত। এস্থলে হেদাৎউল্লার সহিত ঈশ্বরের সড়কিখেলার বর্ণনা রহিয়াছে।

সড়কির ফলাগুলি ক্ষুরধার ইস্পাতে নির্মিত। খেলার সময় দ্রুতগতিতে তাহারা যখন অগ্রপশ্চাৎ চলিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে সাপের কুটিল গতির ন্যায় একটা বক্র আন্দোলন দেখা যায়। সাপের জিভের মতোই ফলাগুলি সরু এবং সাপ যেমন ক্ষণিকের তরে জিভটা বাহিরে আনিয়া আবার মুখাভ্যন্তরে লইয়া যায়, এই ফলাগুলির অগ্রপশ্চাৎ গতিতেও তেমনই একটা রূপ রহিয়াছে। এজন্যই এ খেলার মধ্যে একটা ক্রূরতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা দেখিয়া একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা বা অনুরূপ একটা বর্ণনাতীত অনুভূতিতে দেহমন যেন কেমন করে। দ্বিতীয়তঃ সড়কির ফলার সহিত সাপের জিভের আপাতসাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সাপের দাঁতের সহিতই উহার তুলনা হওয়া সঙ্গত। কারণ, সাপের জিভ নির্বিষ, দাঁতেই তাহার বিষ। সড়কির ফলাও সাপের জিভের ন্যায় নির্বিষ নহে, তাহার দাঁতের ন্যায় বিষাক্ত। তাহার আঘাতে মানুষের জীবনসংশয় হইয়া উঠে। এজন্য ইহা দেখিয়া কেমন একটা শঙ্কা হয়।

(৫) হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর······সবশক্তি তাঁরই। (অ. ২৬)

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-নামক গল্পের অন্তর্গত। ঈশ্বর এইস্থলে লাঠি-সড়কি-চালনায় তাহার অপরিসীম কৃতিত্বের মূলীভূত কারণ কি তাহাই বলিতেছে।

লাঠি-সড়কিখেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিয়া ঈশ্বর যখন সমবেত লাঠিয়ালদের ক্রুদ্ধ লাঠিবৃষ্টি হইতে অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিল, তখন মিছু সর্দার বলিল যে ঈশ্বর জাদু জানে। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিবাদ করিয়া বলিল, জাদু বা মন্ত্রতন্ত্র সে কিছুই জানে না। লাঠি-সড়কি ধরিলে তাহার শরীরে কি যেন আসিয়া ভর করে। সে অনুভব করিতে পারে যে, এই শক্তির বলেই সে অপরাজেয়। কিন্তু ইহা যে কি, কেন যে তাহার মধ্যে ইহা সঞ্চারিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে সে অসমর্থ, তবে মন্ত্র বলিতে সচরাচর যাহা বুঝা যায় ইহা তাহাও নয়। মন্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় বা বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করা চলে। সাপকে তাহাদ্বারা বশীভূত করা যায় এবং নানা ভেল্কিবাজিও তাহাদ্বারা দেখানো সম্ভব। কিন্তু বিষয়ীর মধ্যে যাহা শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ

তাহা এক অলৌকিক প্রভাব। ঈশ্বর 'মন্তর-তন্তর' বলিতে প্রচলিত ধারণার ভেল্কিবাজি বা অনুরূপ কিছু বুঝিয়া থাকিবে। এইজন্যই তাহার উপর সেই প্রভাবকে মন্ত্রশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে যেন তাহার আপত্তি।

(৬) শুধু লাঠি খেলাতে নয়,····· তাঁরাও জানেন না। (অ. ২৭)

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-শীর্ষক গল্পের উপসংহার। লাঠি-সড়কি চালনায় ঈশ্বরের অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া এবং এই পারদর্শিতার মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের মত শুনিয়া লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এস্থলে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ঈশ্বর বলিয়াছে যে মন্ত্র-তন্ত্র সে কিছুই জানে না। তবে লাঠি-সড়কি ধরিলে তাহার শরীরে কি যেন আসিয়া ভর করে, উহার শক্তিতেই সে অপরাজেয়। সাধারণতঃ মন্ত্র বলিতে লোকে বুঝে সূত্রবদ্ধ বিশেষ কতকগুলি শব্দসমষ্টি। তাহারই প্রভাবে ভোজবাজি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়া থাকে—ইহাই লেখকের বিশ্বাস ; কিন্তু ঈশ্বর সেইরূপ কোনো মন্ত্র অবগত ছিল না। তাহা দ্বারা অন্যকে বশীভূত করিয়া নিজের শক্তিমহিমার প্রতিষ্ঠাও তাহার হয় নাই। অতএব মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাব তাহার এই পারদর্শিতা—এই কথা সে যেন স্বীকার করিতে রাজী নহে। কিন্তু লেখকের মতে ঈশ্বরের উপর যাহা ভর করে তাহাও মন্ত্রশক্তি বা দেবতা। জগতের সকল বিষয়ে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ এই অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই সম্ভব হইয়া থাকে। চেষ্টাদ্বারা মানুষ এত বড় কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। সাহিত্যক্ষেত্রেই হউক আর রাজনীতি-ক্ষেত্রেই হউক—সর্বত্রই মানুষ চর্চা ও অনুশীলন দ্বারা শক্তি অর্জন করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে মানুষ দিগ্‌বিজয়ী হইতে পারে না। অলৌকিক প্রভাব বস্তুটি যে কি তাহা যাহার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, অর্থাৎ যাহার শরীরে এ প্রভাব ভর করে না, সে জানে না ; যাহার শরীরে করে সে-ও তাহা অনুভব করে বটে কিন্তু তাহা যে কি সেকথা বিশদ-ভাবে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। তোমার পঠিত 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

উ. ১। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

✓প্র. ২। (ক) 'মন্ত্রশক্তি' বলিতে লেখক কি বুঝিয়াছেন? তোমার পঠিত গল্পের সাহায্যে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উ। লৌকিক ধারণায় মন্ত্র বিশেষ কতকগুলি শব্দসমষ্টি গঠিত এমন একটি গৎ যে উহা যে-কেহ আবৃত্তি করুক না কেন, একটা প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবেই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মানুষ কত ঝাড় ফুঁক, কত প্রক্রিয়া শিখিয়া লয়। কেহ বা ইহাদ্বারা বিষ ঝাড়ে, কেহ জল পড়িয়া দেয়। এইরূপ কত লোকে কতপ্রকার মন্ত্র জানে। ঈশ্বর পাটনী তেমন কোনো মন্ত্র জানিত না। তাহার দেহে একটা অলৌকিক শক্তি আসিয়া ভর করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে কি, সে তাহা বলিতে পারিত না। লেখকের মতে তাহাও মন্ত্রশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে এই মন্ত্রশক্তি প্রচলিত ধারণার কোনো মন্ত্র আওড়াইলেই লাভ করা সম্ভব নহে। প্রক্রিয়া একটা তাহারও অর্জনের জন্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। ঈশ্বর পাটনী যে ঝাঁকড়া চুলে ধূলা ঘষিয়া পাঁচ মিনিট ধরিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিত তাহা কেবল সেই শক্তির ধ্যান। সে জানিত ইহা পরের কাছে শেখা এমন কোনো তথাকথিত মন্ত্র বা গৎ নহে যাহার বলে যে-কোনো লোক সেই শক্তি লাভ করিতে পারে। সে ঐরূপ কেন করিত তাহার ব্যাখ্যা হয়তো সে নিজেও করিতে পারিত না। কেবল ইহাই সে বুঝিত যে এইভাবেই তাহার পক্ষে সেই অলৌকিক শক্তির ধ্যান করা সম্ভব এবং এইভাবেই তাহার মধ্যে সেই শক্তির প্রতিষ্ঠা হইত।

এই যে একটা শক্তির সঞ্চার, লেখক ইহাকেই মন্ত্রশক্তি বা দেবতা বলিয়াছেন। গ্রীকগণের বিশ্বাস ছিল যে কখনও কখনও কোনো কোনো শক্তিমান ব্যক্তির উপর দেবতা ভর করেন। তখন তাঁহার মধ্যে এক স্বর্গীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এই উন্মাদনার নাম enthusiasm বা অনুপ্রেরণা। [ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'দেবতার ভর'—to be possessed by God] এই অনুপ্রেরণাবলেই জগতের সকল বৃহৎ মহৎ কাজ সম্পাদিত হয়। আলোচ্য গল্পেও তাই ঈশ্বরের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তিপ্রভাব সঞ্চারিত হইত, তাহাকে লেখক দেবতা বা মন্ত্রশক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই গল্পে লেখকের ইহাই প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে হয় যে চেষ্টা বা অনুশীলন দ্বারা মানুষ একটা স্তর পর্যন্ত সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে, কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছে এই দৈব প্রেরণা।

(খ) "ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি"— এই কথার তাৎপর্য কি? যে ঘটনা হইতে লেখক ইহা প্রমাণিত করিতে চাহেন তাহা সবিস্তারে লেখ।

উ.। দ্বিতীয় প্রশ্ন (ক)-এর উত্তর দেখ। ইহার সহিত **সংক্ষিপ্তসার** যোগ কর। [এইরূপে আরম্ভ কর : লেখক যে ঘটনা হইতে ইহা প্রমাণিত করিতে চাহেন তাহা নিম্নরূপ।]

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি : কুড়িক=কুড়ি+এক (বাঙলা সন্ধি)। কখনো কখন+ও (ঐ)।

সমাস : দশ-বারো—দশ বা বারো (বহুব্রীহি)। ভগ্নাবশেষ—ভগ্ন হইতে অবশেষ (৫মীতৎপুরুষ)। রাত-দুপুরে—দুপুর রাত (কর্মধারয়, বিশেষণের পরনিপাত), তাহাতে (একই অর্থে 'দুপুর-রাতে' পদও হয়)। বিশ-পঁচিশ—বিশ বা পঁচিশ (বহুব্রীহি)। লাঠিখেলা—লাঠি দিয়া খেলা (৩য়াতৎপুরুষ)। লগিঠেলা—লগি দিয়া (জলতলের মাটিকে) ঠেলা (৩য়াতৎপুরুষ)। গুলিখোর—গুলি খায় যে (উপপদ-তৎপুরুষ) অথবা, গুলি+খোর (তদ্ধিত, কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে)। নজরবন্দী—নজরে বন্দী (৭মীতৎপুরুষ)। লকড়ি-হাতে—লকড়ি হাতে যাহার (ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি), সে। সমস্বরে—সম স্বর (কর্মধারয়), তাহাতে। আত্মরক্ষা—আত্মার অর্থাৎ নিজের রক্ষা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। লাঠিবৃষ্টির—লাঠির বৃষ্টি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার। দিগ্বিজয়ী—দিক্ বিজয় করেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ)। নিরস্ত্র—নিঃ (=নাই) অস্ত্র যাহার (নঞ্ বহুব্রীহি), সে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : লেঠেল—লাঠি+আল=লাঠিয়াল>লেঠেল (অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ফলে)। লকড়িওয়ালা—লকড়ি+ওয়ালা। লেঠেলি—লেঠেল+ই। মার—মার্+ই=মারি (আধুনিক উচ্চারণে এই ই-টি লুপ্ত)। চড়াও—চড়+আও। খুনে—খুন+ইয়া>এ।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : এক-হাত খেলা—এখানে 'এক-হাত'= একবারের মতো।

সে কথা ভাঙি কী করে ?—এখানে 'কথা ভাঙা=প্রতিশ্রুতি পালন না করা।

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে—'আষ্টেপৃষ্ঠে'=পিছমোড়া করিয়া।

পাকা লেঠেল—'পাকা'=নিপুণ, সুদক্ষ।

বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে—এখানে 'হাড়ে'=দেহে।

মাথায় খুন চড়ে গেল—এমন মানসিক উত্তেজনা হইল যাহাতে মানুষ খুন করাও সম্ভব।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন (যৌগিক)—এঁকে কেউ না দেখলেও সকলেই ভয় করতেন (সরল)।

রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ (যৌগিক)—রঙ তার কালো হলেও দেখতে সে সুপুরুষ (সরল)।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তা হলে তুমি লাঠি খেলতে জান না ?" (প্রত্যক্ষ উক্তি)—আমি জিজ্ঞেস করলুম তা হলে সে লাঠি খেলতে জানে কিনা (পরোক্ষ উক্তি)।

আমি জিজ্ঞেস করলুম "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে ?" (প্রত্যক্ষ উক্তি) —আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন সে এ রকম দিব্যি করেছিল (পরোক্ষ উক্তি)।

তুমি ঠাকুরের সমুখে দিব্যি করো যে আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব (মিশ্র)—তুমি ঠাকুরের সমুখে আর কখনো লাঠি না ছোঁবার দিব্যি করলে তোমাকে ছেড়ে দেব (সরল)।

সে 'হাঁ, না' কিছুই উত্তর করলে না (নেতিবাচক)—সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর রহিল (অস্তিবোধক)।

কাউকেও এক ঘা মারি নি (কর্তৃবাচ্য)—কাউকেও এক ঘা মারা হয় নি (কর্মবাচ্য)।

মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে (প্রশ্নবোধক) ?—মন্তরের সঙ্গে কেউ লড়তে পারবে না (প্রশ্ন পরিহার করিয়া ; নেতিবাচক)।

ব্যাকরণগত টীকা: সুমুখ—সম্মুখ>সুমুখ—অর্ধতৎসম শব্দ।

লেঠেল—বৃত্তি বুঝাইতে ই-প্রত্যয়যোগে (তদ্ধিত) শব্দটি নিষ্পন্ন।

মন্তর-তন্তর (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)—মন্ত্র-তন্ত্র>মন্তর-তন্তর—বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ। অর্ধতৎসম শব্দ।

দিব্যি—দিব্য>দিব্যি—বর্ণাগমের উদাহরণ।

এগোয়, পিছোয়—দুইটিই নামধাতুর উদাহরণ (আগ+আ+এ, পিছ+আ+এ)। আগায়, এগোয়—দুইটিই প্রচলিত, দ্বিতীয়টি বেশী চলে।

আইন কানুন—দ্বন্দ্ব-সমাসের উদাহরণ নয় (যদিও কেহ কেহ ইহাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলিয়া থাকেন), সমার্থক শব্দযুগ্মের উদাহরণ।

বাক্য-রচনা ঃ **ভগ্নাবশেষ :** সেখানে গেলে প্রাসাদটির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনুগত : ভৃত্য যে প্রভুর অনুগত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আষ্টেপৃষ্ঠে : দস্যুদল রাজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

বেমালুম : কাটা জিভ বেমালুম জুড়ে গেল দেখে দর্শকেরা সোৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠল।

কর্ণপাত : অসৎ লোক সদুপদেশে কর্ণপাত করে না।

আপোসে : ঝগড়াটা আপোসে মিটিয়ে নাও।

সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ গল্পটি আগাগোড়া চলিত-ভাষায় লেখা। সুতরাং ইহার যে-কোন অংশ সাধু-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে।

নতুন-দা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়—১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি তিনি ভাগলপুরে তাঁহার মাতুলালয়েই থাকিতেন এবং সেইখান হইতেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ. এ. পর্যন্ত পাঠ করেন। কিন্তু পরীক্ষার কিছু পূর্বে মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, বিশেষতঃ 'ফি'র জন্য ৩০৲ টাকা মাত্র সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। এতএব তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এখানেই সমাপ্ত হয়। তাহার পর শুরু হয় তাঁহার ছন্নছাড়া জীবনের বিচিত্র ধারা। চাকরির অন্বেষণে অবশেষে ভাসিতে ভাসিতে তিনি সুদূর ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হন এবং সেখানে একশত টাকা মাহিনায় একটি অস্থায়ী চাকরি পান।

কিন্তু তাঁহার স্থায়ী এবং গৌরবময় আসনটি ছিল অন্যত্র নির্দিষ্ট। এইবার সেই স্থান হইতে ডাক আসিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সেগুলির গুণাগুণ-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে না পারিয়া এ পর্যন্ত তিনি সেগুলি প্রকাশ করেন নাই। এই সময়ে তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্প বাঙলার কোনো এক মাসিকপত্রে বাহির হইতে লাগিল। ভাষার অভিনবত্বে, অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় এবং অনুভূতির নিবিড়তায় গল্পগুলি অচিরেই বাঙলা সাহিত্যে যেন যুগান্তর সূচনা করিল। এইবার শরৎচন্দ্র চাকরি ছাড়িয়া বাঙলায় ফিরিলেন এবং শীঘ্রই এমন এক সাহিত্য রচনা করিলেন যাহা বাঙালীর সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। ক্রমে যশ-খ্যাতি, সম্মান এবং ঐশ্বর্য শরৎচন্দ্র প্রভূত পরিমাণে লাভ করিলেন এবং বাংলায় সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হইয়া উঠিলেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের স্বরূপ—সাধারণভাবে শরৎ-সাহিত্যের উপজীব্য হইল বাঙালী-জীবনের অনুভূতিজটিল দ্বন্দ্বসংশয়পূর্ণ

বিষয়। স্নেহ-প্রেম-ঈর্ষা-সংস্কার প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি যখনই চিরাচরিত খাত ছাড়িয়া ব্যতিক্রমের পথে ধাবিত হয়, তখন রক্ষণশীল সমাজ এবং আবহমান সংস্কার তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রতিঘাতে হৃদয়বৃত্তির গতিতে যে আবর্ত সৃষ্টি হয় তাহা লইয়াই শরৎচন্দ্রের কারবার। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন—''জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংগঠিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।

সত্যই শরৎ-সাহিত্যে বাঙালী-জীবন একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ তাঁহার বাস্তব দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পে জীবনের 'বস্তু অংশ যতদূর সম্ভব ছাঁকিয়া ফেলিয়া রস-অংশটুকুকে ঘনীভূত' করিয়া তুলিয়াছেন। 'শরৎচন্দ্র কিন্তু এরূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে দেখেন নাই।' দেখিয়াছেন আরও নিকট হইতে অতি ঘনিষ্ঠভাবে, উহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন আরও নিবিড়ভাবে। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের হাতে জীবনের বাস্তব চরিত্রটি রসরূপে এত মধুর হইয়া ফুটিয়াছে।

শরৎ-সাহিত্যের মূল সুরটা হইল দুঃখের। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে শরৎচন্দ্র 'বাঙালী বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়াছেন।' শরৎচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন—'কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবনসমস্যায়—আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা পাতার পর পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি……।' বস্তুতঃ 'সমাজের সমস্ত নীচাশয়তা, হৃদয়হীনতা ও ক্ষুদ্রতার তিনি এমন একটি নির্মম চিত্র দিয়াছেন, যাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বিরল; এবং এই চারিদিককার সর্বব্যাপী কঠোরতার মধ্যে করুণা ও সমবেদনার যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত আছে, তাহাও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মর্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত বিবৃত হইয়াছে।… …এই অনাবৃত বাস্তবতার মধ্য দিয়া তিনি যে করুণরসের বেগবতীধারা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আর্টের দিক দিয়া তাঁহার বাস্তবতাকে সার্থকতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।'

কিন্তু শরৎচন্দ্র জীবনকে যতটা দেখিয়াছিলেন তাহার চেয়ে বেশী করিয়া

উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অনুভব করিয়াছিলেন হীন পতিতের অব্যক্ত বেদনা, লাঞ্ছিতের বিড়ম্বনা আর মনুষ্যত্বের অপরিসীম অবমাননা। এই রক্ষণশীল সমাজ ও তাহার গলিত সংস্কারের পুঞ্জপঙ্কে দাঁড়াইয়া তাই তিনি ঘোর প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে সে প্রতিবাদ কখনও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করে না। হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তাহা যেন কেমন একটা মরমী আবেগে আপনাতেই আপনি ঝিমাইয়া পড়ে। এক একটা সর্বহারা তাই বিদ্রোহী হইতে হয় না—ছন্নছাড়া ভাবাবেগে ভাসিয়া যায়।

উৎস ও নামকরণ—শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্ব সপ্তম পরিচ্ছেদ হইতে আলোচ্য অংশটি সংকলিত।

এই অংশে যে কাহিনীটি আছে তাহাতে ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই—এই তিনটি চরিত্রের বিবরণ আছে। ইন্দ্রনাথের উক্ত মাসতুত ভাইটিই 'নতুন-দা'। তাহার সহিত ইন্দ্র আর শ্রীকান্ত শীতের রাত্রিতে লুকাইয়া ডিঙি চড়িয়া থিয়েটার দেখিতে চলিয়াছে। পথে 'নতুন-দা'র সেবায় আর তাচ্ছিল্যভরা গাল-গল্প শুনিতে শুনিতে শ্রীকান্ত হয়রান; ইন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়াছে। 'নতুন-দা' কলিকাতার ব্যক্যবাগীশ একটি অদ্ভুত জীব। মুখে সে হাতীগণ্ডার মারে, কার্যক্ষেত্রে কুকুরের ভয়েই জলে ঝাঁপ দেয়। পোশাকের পারিপাট্যে সে 'ভয়ঙ্কর বাবু'। স্বার্থপরতায় সে অন্ধ, নির্লজ্জ। এই চরিত্রটিই এই গল্পাংশের কেন্দ্র। তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিতে গিয়া ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের যারপরনাই দুর্গতি এবং অবশেষে তাহার নিজেরই হাস্যকর দুর্ভোগ —এই সবই গল্পটির কথাবস্তু। আদ্যন্ত 'নতুন-দা'ই এইভাবে গল্পাংশটির মূল উপজীব্য। এইজন্য ইহার শিরোনামা সঙ্গত (বলা বাহুল্য, মূল উপন্যাসে এই অংশের এইরূপ কোনো নাম নাই)। ইহা সংকলয়িতার প্রদত্ত।

সমালোচনা—'নতুন-দা' গল্পটি বড় উপন্যাসের অংশ হইলেও একটি স্বতন্ত্র ছোটগল্প-হিসাবে গণ্য হইতে পারে। একটিমাত্র মূল ঘটনা এবং কেন্দ্রগত একটিমাত্র চরিত্রকে উপজীব্য করিয়া এখানে কাহিনীভাগ সুসংবদ্ধ ঐক্য লাভ করিয়াছে। কথাবস্তুর গতি ও পরিণতি এখানে স্বাভাবিক। কেবল শেষের দিকে তেমন একটা সাঙ্কেতিকতা ইহাতে নাই। মনে হয় গল্পটি সম্পূর্ণই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া ইহার উপভোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলা চলে না।

ডিঙিযোগে নৈশ অভিযান এমনিতেই একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। ইহার মধ্যে 'নতুন-দা'র মতো একটা জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলে অবশ্য ডিঙি-চালনার বিশদ বিবরণ গৌণ হইয়াছে। 'নতুন-দা' গল্পটি জুড়িয়া বসিয়াছে। এই চরিত্রটি রূপায়ণে শরৎচন্দ্র তাঁহার বাস্তব দৃষ্টির অপূর্ব মহিমা খুলিয়া ধরিয়াছেন। কলিকাতার দর্জিপাড়ার এইরূপ 'চালিয়াৎচন্দরের' সহিত আমরা অপরিচিত নই। তাহাদের কথার বহর বড লম্বা। মুখে তাহারা হাতী-গণ্ডার মারে, বুকে তাহাদের ইঁদুরের কলিজা। সবজান্তা, 'মুখেন মারিতং জগৎ' এইপ্রকার বাক্যবীর বাহাদুর বাবুদের বুলি আমরা প্রায়ই শুনি কিন্তু শুনিতে শুনিতে ভুলিয়া যাই। শরৎচন্দ্র এই গল্পের সংলাপে তাহা অভ্রান্তভাবে ধরিয়া দিয়াছেন।

'নতুন-দা' শহুরে বাবুর অতিশয় বিকৃত সংস্করণ সন্দেহ নাই। তাহার তুলনায় সহৃদয় দুইটি মফঃস্বলের ছেলের সাহস ও শক্তি, সহনশীলতা ও ভদ্রতাবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। হয়তো বা শহুরে কপট মানুষের প্রতি ইহা শরৎচন্দ্রের সঙ্গত ও সচেতন উপেক্ষা। এই উপেক্ষার মধ্যে শরৎচন্দ্রের কৌতুকহাস্যের তীক্ষ্ণতা ও চারুত্ব ধরা পড়িয়াছে। শরৎ-সাহিত্যে হাস্যকৌতুকের যোগান সুপ্রচুর নহে, কিন্তু যেটুকু আছে তাহা যে উচ্চাঙ্গের, তাহার পরিচয় এই গল্পে আছে। 'নতুন-দা' একটা serious ভাঁড়। সার্কাসের ভাঁড়টা কপট অভিনয় করে মাত্র; কিন্তু 'নতুন-দা'র যাবতীয় আচরণ তাহার দিক্ দিয়া অকপট ও তাহার চরিত্রের পক্ষে সঙ্গত। যে চাদরটায় বসিতেও তাহার পা-বমি করে তাহাই গায়ে জড়াইয়া উহারই নিন্দা—বিদ্ঘুটে অসঙ্গতি ও নিকৃষ্ট অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ। এই ধরনের বস্তু আমাদের সুস্থতাবোধকে জাগ্রত করিয়া হাস্যের উদ্রেক করে। 'নতুন-দা'র তাচ্ছিল্যভরা বক্তৃতার মধ্যে নিজেই সে হাসির পাত্র, তুচ্ছ ও অপদার্থ হইয়া উঠে। ব্যঙ্গচিত্রের ইহা একটি চমৎকার নিদর্শন।

এই গল্পটির আরও একটি বড় উপভোগ্যতা আছে। অনেকের মতে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শরৎচন্দ্রের ছদ্ম-জীবনী। ভাগলপুরে তাঁহার বাল্যকাহিনী যে এই গল্পে ছায়াপাত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংক্ষিপ্তসার—এক কনকনে শীতের সন্ধ্যায় ইন্দ্র হঠাৎ আসিয়া শ্রীকান্তের কাছে কোন একটি দূরবর্তী স্থানে থিয়েটার দেখিতে যাইবার প্রস্তাব

করিল এবং সম্মত থাকিলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া তাহাদের বাড়ীতে যাইতে বলিল। শ্রীকান্ত মহা-উৎসাহে একখানা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া ছুট দিল। তাহার ধারণা ছিল ট্রেনে করিয়া স্থানটিতে যাওয়া হইবে; কিন্তু যখন শুনিল যে কলিকাতা হইতে আগত ইন্দ্রের 'নতুন-দা' নদীপথে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন সে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। একে তো উজানে যাওয়া কষ্টকর, তাহার উপর সময়ও লাগিবে বেশী—হয়তো সময়মতো পৌঁছিতে পারা যাইবে না। কিন্তু ইন্দ্র তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, বাতাসের জোর আছে, পাল তুলিয়া গেলে দেরি হইবে না।

গঙ্গার ঘাটে দুই বন্ধুতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘকাল বসিয়া আছে, এমন সময় 'নতুন-দা' আসিলেন। চন্দ্রালোকে তাঁহার রূপ দেখিয়া শ্রীকান্তের ভয় হইল। তিনি কলিকাতার পুরাদস্তুর বাবু—আপাদমস্তক মূল্যবান্ পোশাকে আবৃত। ডিঙিখানার যথেচ্ছ নিন্দা করিতে করিতে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের চেষ্টায় জলকাদার স্পর্শ বাঁচাইয়া তিনি একেবারে নৌকার মাঝখানে আরাম করিয়া বসিলেন। তারপর শুরু হইল শ্রীকান্তের সহিত তাচ্ছিল্যের সুরে বাক্যালাপ। 'শ্রীকান্ত' নামটির 'শ্রী' তাঁহার মোটেই মনঃপূত নয়—শুধু 'কান্ত'ই যথেষ্ট। এইবার 'কান্তের' পতি তামাক সাজিবার হুকুম হইল। হুকুমের ভঙ্গিতে শ্রীকান্তের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তবু, ইন্দ্রের নিষেধ না শুনিয়াই, সে নীরবে তামাক সাজিতে লাগিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে বাবু শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোথায় থাকে। হঠাৎ তাহার গায়ের আলোয়ানখানার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িলে তিনি সেটার শ্রীহীনতা ও দুর্গন্ধের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করিলেন এবং শেষে সেইটাই চাহিলেন পাতিয়া বসবার জন্য, কারণ নৌকার নগ্ন কাঠের উপর বসিতে তাঁহার নাকি অসুবিধা হইতেছিল। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি নিজের আলোয়ানটা ছুঁড়িয়া দিলে তিনি তাহার উপর বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা পার হইতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। কিন্তু ওপারে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস পড়িয়া গেল। ইন্দ্র এই অসুবিধার কথা 'নতুন-দা'র গোচর করিলে তিনি শ্রীকান্তকে দিয়া দাঁড় টানাইবার পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র বলিল, প্রবল স্রোতে দাঁড় টানিয়া উজানে যাওয়া অসম্ভব, সুতরাং ফিরিয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই। শুনিয়া 'নতুন-দা' রাগে আগুন—তাঁহাকে যখন আনা হইয়াছে তখন যেমন করিয়াই হউক পৌঁছাইয়া দিতেই

হইবে। থিয়েটারে তাঁহাকে হারমোনিয়ম বাজাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছে, না বাজাইলে চলিবে না। ইন্দ্রর কোন কথাই তিনি শুনিবেন না। অগত্যা শ্রীকান্ত গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। শুনিয়া বাবু দাঁতমুখ খেঁচাইয়া ইতর ভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এতক্ষণ সে তাহা করে নাই কেন?

ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত বহুকষ্টে ধীরে ধীরে গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে নৌকা থামাইয়া বাবুকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতে হইল। অথচ তিনি একভাবে বসিয়া রহিলেন। একবার ইন্দ্রের বিশেষ অনুরোধসত্ত্বেও নিউমোনিয়া এবং দামী দস্তানা নষ্ট হইবার ভয়ে হাল ধরিতে সম্মত হইলেন না। অপরিসীম স্বার্থপর এই ব্যক্তিটি দুইটি কিশোরের এত কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না। একটু নড়া দূরে থাকুক, স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া তিনি নানাপ্রকারের হুকুম চালাইতে লাগিলেন।

এদিকে গঙ্গার বাতাসের গুণে বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল, আর অবিশ্রান্ত বকাবকিতে সে ক্ষুধা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। দুইটার আগে থিয়েটারে পৌঁছাইতে পারা যাইবে না শুনিয়া তিনি তো ক্ষেপিয়া গেলেন। রাত্রি এগারোটার সময় ক্ষুধার জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া বাবু ইন্দ্রকে বলিলেন খোট্টাদের কোন বস্তি হইতে মুড়ি-টুড়ি কিছু একটা সংগ্রহ করিতে। ইন্দ্র জানাইল, কাছেই এক বড় বস্তিতে সব জিনিস পাওয়া যায়।

অল্পকাল পরে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগানো হইল। ইন্দ্রের কাঁধে চড়িয়া নামিয়া 'নতুন-দা' পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাতটে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত দুইজনেই আহার্যের সন্ধানে যাইবার উদ্যোগ করিলে তিনি একা সেখানে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার মনের কথাটি বুঝিয়া বলিল যে একলা থাকিতে তাঁহার ভয় করিবে, তাহার চেয়ে তিনিও তাহাদের সঙ্গে চলুন। 'নতুন-দা' বিকৃত মুখে আস্ফালন করিয়া বলিলেন যে দর্জিপাড়ার ছেলে তিনি—যমকেও ভয় করেন না; কিন্তু ছোটলোকদের নোংরা বস্তির মধ্যে গিয়া রোগ বাধাইবার ইচ্ছাও তাঁহার নাই। ইন্দ্র ইঙ্গিতে শ্রীকান্তকে থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু বাবুটির ব্যবহারে সে এতই বিরক্ত হইয়াছিল যে কিছুতেই থাকিতে রাজী না হইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 'নতুন-দা' হাততালি দিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে গানের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শুনা গেল।

চলিতে চলিতে ইন্দ্র শ্রীকান্তের বিরক্তি কাটাইবার জন্য তাহার 'নতুন-দা'র বিদ্যাবুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা-সম্পর্কে অনেক কথাই বলিল। কিন্তু স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও নির্মমতার যে পরিচয় শ্রীকান্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যক্তিটির মধ্যে পাইয়াছিল, তাহার একটা স্থায়ী চিত্র তাহার মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। কিন্তু আশার কথা, এমন লোক সংসারে বড় বেশী দেখা যায় না।

যাহাই হউক, এমন উৎকট স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার শাস্তিও 'নতুন-দা'কে সেই রাত্রেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইন্দ্র পরিচিত এক মুড়ির দোকানে উপস্থিত হইয়া দোকানীকে জাগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার গভীর সুসুপ্তি ভাঙাইতে না পারিয়া আধঘণ্টা পরে খালিহাতে ফিরিয়া আসিল। ঘাটে আসিয়া দেখে সেখানে কেহ নাই। দুইজনে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া নতুন-দা'কে ডাকিল, কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তাহাদের ব্যাকুল কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। শীতকালে এই অঞ্চলে কখনও কখনও বাঘের উপদ্রবের কথা শুনা যায়। ইন্দ্রের ভয় হইল—'নতুন-দা'কে বাঘে নেয় নাই তো! হঠাৎ চন্দ্রালোকে ভিজা বালুর উপর কি একটা বস্তুকে চকচক করিতে দেখা গেল। কাছে গেলে বুঝা গেল তাহা 'নতুন-দা'রই বহুমূল্য 'পাম্প-শুর একপাটি। ইন্দ্রের আর সংশয় রহিল না যে তাঁহাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহারা যখন দোকানীকে জাগাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিল তখন গ্রামের কুকুরগুলি আর্ত চীৎকার করিয়া হয়তো এই দুর্ঘটনারই ইঙ্গিত দিতেছিল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। ইন্দ্রের মনে হইল, যেখানে নেকড়েগুলি তাহার 'নতুন-দা'কে লইয়া গিয়া খাইতেছে, তাহারই আশেপাশে থাকিয়া কুকুরগুলি তখনও চীৎকার করিতেছে।

হঠাৎ ইন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঘ মারিতে যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিল। তাহার হাতিয়ার হইল ডিঙির লগিটা আর একটা বড় ছুরি। শ্রীকান্তকে সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে চলিল। তাহার নির্দেশ রহিল, যদি সে না ফেরে তবে শ্রীকান্ত যেন একাই বাড়ীতে গিয়া সংবাদটা দেয়। শ্রীকান্ত জানিত ইন্দ্রনাথের সংকল্পের নড়চড় হয় না, তাহাকে নিরস্ত করার চেষ্টা বৃথা। তাই সেরূপ চেষ্টা না করিয়া একটা বাঁশ তুলিয়া সে-ও ইন্দ্রের সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল। ইন্দ্র শ্রীকান্তের হাত চাপিয়া ধরিয়া নিষেধ করিল, কারণ

শ্রীকান্তের কোন দোষ নাই। প্রত্যুত্তরে শ্রীকান্ত জানাইল যে ইন্দ্রেরও তো কোন দোষ নাই, তবে সে-ই বা একা যাইবে কেন? শ্রীকান্তের হাতের বাঁশটা ফেলিয়া দিয়া ইন্দ্র জানাইল যে দোষ তাহারও নাই বটে,—'নতুন-দা'র অনুরোধেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে, তবে 'নতুন-দা'কে না লইয়া সে একা বাড়ীতে ফিরিতে পারিবে না; তাই তাহাকে যাইতে হইবে। শ্রীকান্ত আবার বাঁশটা তুলিয়া লইল এবং নীরবে ইন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল। বালির উপর দৌড়াইবার চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়া ইন্দ্র শ্রীকান্তকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একটা বালির ঢিবি অতিক্রম করিলে দেখা গেল গোটা-পাঁচ-সাত কুকুর কি একটা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিতেছে, বাঘের নামগন্ধও নাই। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া 'নতুন-দা'কে ডাকিল। 'নতুন-দা' একগলা জলে দাঁড়াইয়া কান্নার স্বরে জবাব দিলেন—"এই যে আমি।" দুই বন্ধু অবিলম্বে ছুটিয়া গেল। ইন্দ্র জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অচেতনপ্রায় 'নতুন-দা'কে টানিয়া ডাঙায় তুলিল। একখানি পাম্প-শু বাদে তাঁহার সর্বাঙ্গের সাজপোশাক ঠিকই আছে, কিন্তু সব জলে ভিজিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। খুব সম্ভব গ্রামের কুকুরগুলি তাহার অপূর্ব সঙ্গীত ও অদ্ভুত বেশে বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়া করিতে করিতে জলের ধার পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছিল। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি সেই প্রচণ্ড শীতে জলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, সেই রাত্রিতে তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ডাঙায় উঠিয়া তিনি প্রথমেই তাঁহার একপাটি জুতার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। সেটিকে হস্তগত করিয়া তবে তিনি শান্ত হইলেন ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত জল হইতে উঠাইয়াই তাঁহার দেহের ভিজা পোশাক আশাক খুলিয়া মাটিতে রাখিয়াছিল। সেগুলির জন্য শোকের তাঁহার অবধি রহিল না এবং দেহ হইতে খুলিয়া কাদামাটি মাখাইয়া সেগুলি নষ্ট করার অপরাধে সে রাত্রে ইন্দ্রদের ভাগ্যে তিরস্কারও কম জুটিল না। অথচ যে দেহটার জন্য তাঁহার পরম শঙ্কা ও সাবধানতা ছিল, জামা-কাপড়ের শোকে সেই দেহটার কথাই ভুলিয়া গেলেন।

রাত্রি দুটার পর ডিঙি আসিয়া বাড়ীর ঘাটে লাগিল। ইন্দ্রের আলোয়ান-খানি পরিধান করিয়া এবং শ্রীকান্তের বহুনিন্দিত র‍্যাপারখানি গায়ে জড়াইয়া 'নতুন-দা' সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তিনি যে বাঘের মুখে

না পড়িয়া সশরীরে ফিরিতে পারিলেন, এই আনন্দেই শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ তাঁহার সকল তিরস্কার ও উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করিল এবং প্রচণ্ড শীতে কেবল পরনের কাপড়ের খানিকটা অংশ গায়ে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১-৪। পূর্ণচন্দ্র—পুর্ণিমার চাঁদ। "—তে"—লেখক ইচ্ছা করিয়াই জায়গাটির নাম উল্লেখ করেন নাই, কারণ পাঠকের পক্ষে জায়গাটির নামজানা-না-জানা দুই-ই সমান। মোট কথা, কাহিনীর পক্ষে এই নামটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। **লাফাইয়া উঠিলাম**—অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। র‍্যাপার—ইংরেজী wrapper কথাটির বাঙলা (প্রতিবর্ণীকৃত রূপ) গায়ের চাদর; আলোয়ান। উহাদের—ইন্দ্রদের। তাড়াতাড়ি—ব্যস্ততা; ত্বরা। শব্দটি এখানে বিশেষ্য। নিরুৎসাহ—উৎসাহহীন। উজান ঠেলিয়া—স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা চালাইয়া। সময়ে—অর্থাৎ থিয়েটার আরম্ভ হইবার পূর্বে। জোর হাওয়া আছে ইত্যাদি—অর্থাৎ পাল তুলিয়া যাওয়া চলিবে, তাহাতে নৌকা বাহিবার পরিশ্রমও কমিবে, তাড়াতাড়ি যাওয়াও যাইবে। ভয়ংকর বাবু—অতিমাত্রায় বাবু; যাহার বাবুয়ানা দর্শকের মনে ভয় উৎপন্ন করে। কথাটি এখানে দ্ব্যর্থক। গলাবন্ধ—গলায় জড়াইবার পশমী বস্ত্র; কম্ফর্টার। **দস্তানা**—হাতমোজা। **পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে**—কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটিতেছে বিহারের ভাগলপুরে, বঙ্গদেশের পশ্চিমে। সেখানকার শীত বঙ্গদেশের চেয়ে বেশী, অন্ততঃ কলিকাতার চেয়ে তো বটেই। **সাধের ডিঙিটাকে**—এই ডিঙিটার সাহায্যেই শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে; সুতরাং ইহার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাহার একটু মমত্ব জাগিয়াছে। **যাচ্ছেতাই**—অপদার্থ; অকেজো। জাঁকিয়া—আরাম করিয়া; গ্যাঁট হইয়া।

অ. ৫-১০। **তোর**—এইরূপ উল্লেখ অতিপরিচয়ে নহে, অবজ্ঞায়। **আবার শ্রী—কান্ত**—ভাবটি এই: মফঃস্বলের ছোট একটা ছেলে, তাহার এত নামের বাহারে প্রয়োজন কি? 'কান্ত' কথাটির অর্থ 'সুন্দর'; তাহাতে 'শ্রী' লাগাইয়া বেশী সুন্দর করিবার চেষ্টা কেন? তাহা ছাড়া 'শ্রীকান্ত' নামটা

উচ্চারণ করা একটু কঠিন, 'কান্ত' সহজ। কলিকাতার বাবুটি যেন এই উচ্চারণের কষ্টটুকুও স্বীকার করিতে নারাজ। **ছোঁড়াটাকে**-শ্রীকান্তের প্রতি তাচ্ছিল্যের পরিচায়ক। **শ্রীকান্তের বয়স তখন বছর-পনরো ছিল। অপ্রতিভ**—লজ্জিত। **তিনি ইন্দ্রের মাসতুত ভাই** ইত্যাদি—'নতুন-দা'র আদেশের ভঙ্গীটি একেবারেই মনঃপূত না হইলেও শ্রীকান্ত কতকটা ইন্দ্রনাথের খাতিরে এবং কতকটা কলিকাতাবাসী বাবুটির শিক্ষাদীক্ষার প্রতি স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধে সে হুকুম তামিল করিতে লাগিয়া গেল। **এল. এ.**—(L.A. ইংরেজী Licentiate of Arts-এর আগুক্ষর) এণ্ট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষার মধ্যবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার লৌকিক নাম। পরীক্ষাটির আসল নাম F. A. অর্থাৎ First Arts। ইহা বর্তমান I. A বা I. Sc. পরীক্ষার তুল্য। **বিগড়াইয়া গেল**—অপ্রসন্ন হইল; ক্ষুণ্ণ হইল। **ফুটছে** নৌকার অমসৃণ কাঠের উপর বসিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। **আমার শীত করচে না**—প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের শীত না লাগিবার কথা নয়, কিন্তু শ্রীকান্তকে বাঁচাইবার জন্যই সে এই কথা বলিতেছে।

অ. ১১-১৭। **পড়িয়া গেল**—বন্ধ হইল। **রেত** স্রোত। **অগ্নি-শর্মা**— অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। **তার**—থিয়েটারের উদ্যোক্তারা। **মেড়োর দেশের**—ঘটনার স্থান যে বিহারের ভাগলপুর, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। ভাগলপুর ঠিক 'মেড়ো' অর্থাৎ মাড়ওয়ারীর জায়গা না হইলেও সাধারণভাবে বঙ্গদেশের পশ্চিমে অবাঙালী যাহারা বাস করে তাহাদের 'মেড়ো' বা 'খোট্টা' বলা হয়। বলা বাহুল্য, শব্দটি তাচ্ছিল্যজ্ঞাপক। **সে কথার আর প্রয়োজন নাই**—ইঙ্গিতটি এই যে হারমোনিয়ম বাজনায় পারদর্শিতার বড়াই থাকিলেও ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষে মোটেই সুবাদক ছিলেন না।

অ. ১৮-২২। **ঠায়**—স্থির; একভাবে। **নিমোনিয়া**—(ইংরেজী Pneumonia)—শ্বাসযন্ত্র বা ফুসফুসের প্রদাহজনিত রোগবিশেষ। **অপদার্থ খেয়াল**—থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাইবার একটা মূল্যহীন শখ।

অ. ২৩-২৭। **রুচিকর**—স্বাস্থ্যপ্রদ; ক্ষুধাবর্ধক। **কাবু**—কাতর। **বাবু কাবু হইয়া বলিলেন**—বাবু ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন। 'বাবু' এবং 'কাবু'-র ধ্বনিসাদৃশ্য অথচ অর্থের বৈপরীত্য এখানে কৌতুকপ্রদ। **খোট্টামোট্টা, বস্তি-টস্তি, মুড়ি-টুড়ি**—বর্ণধ্বনিকে বিকৃত করিয়া শব্দদ্বৈতের

চমৎকার উদাহরণ। লাগা—নৌকা পারে লাগা। **জবাব দিলাম না**—কারণ জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনটাই তাহাদের ছিল না। **সংকীর্ণ জলে**—অগভীর জলে, যেখান হইতে স্রোতে নৌকা ভাসিয়া যাইতে পারে না। **হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম**—দুই অর্থেই ইহা সার্থক: গুণ টানিতে তাহাদের বেশ পরিশ্রম হইতেছিল, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর মিলিতেছিল না। এখন গুণটানা বন্ধ হওয়ায় তাহারা স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস লইতে পারিল। দ্বিতীয়তঃ, নতুন-দা'র উৎকট স্বার্থপরতা তাহাদিগকে পীড়া দিতেছিল। খাবারের খোঁজে গেলে এই ব্যক্তিটিরই সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যও যদি এড়ানো যায়, তাহাতেও স্বস্তি পাওয়া যাইবে। **নাবা**—নামা। কলিকাতায় (এবং চব্বিশ পরগনায়) সাধারণতঃ ম-কারকে ব-রূপে উচ্চারণ করা হয়। সৈকতে—বালুকাময় তীরভূমিতে। **সিকতা**—বালুকা।

অ. ২৮-৩১। **উদ্দেশে**—উদ্দেশ্যে (সম্ভবতঃ ছাপার ভুল)। **উদ্দেশ**=লক্ষ্য; উদ্দেশ্য—অভিপ্রায়। একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই—ভয়ই ইহার কারণ। সে অনিচ্ছা—একা থাকিতে অনিচ্ছা। **দর্জিপাড়া**—কলিকাতার বর্তমান কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলবিশেষ। আগে এখানকার গুণ্ডাদের বিশেষ দুর্নাম ছিল। dirty—নোংরা। **ব্যামো**—রোগ। আভাস দিলেও ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেও।

অ. ৩২-৪৪। ক্ষুব্ধ—অসন্তুষ্ট; অপ্রসন্ন। সুখ্যাতি—অখ্যাতি। হৃদয়ের প্রশস্ততা—চিত্তের উদারতা। সমবেদনার ব্যাপকতা—সহানুভূতির বিস্তৃতি। **জীবনের এই সময়টায়……কালে নয়**—যৌবনের ধর্মই এই যে, এই সময়ে মানুষে পরের হিতে অকাতরে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, পরের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে পারে। অন্য কোনো বয়সে এমনটি হয় না। **এতকালের ব্যবধানেও**—ঘটনাটি ঘটিয়াছে শ্রীকান্তের কৈশোরে, আর যখন সে তাহার বর্ণনা দিতেছে তখন সে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়াছে। **না হইলে**—অর্থাৎ 'নতুন-দা'র মতো উৎকট স্বার্থপর ও হৃদয়হীন ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে বেশী হইলে। **সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ-থানায়** ইত্যাদি—থানায় যেসব পুলিশ থাকে, সাধারণতঃ অপরাধী লইয়াই তাহাদের কারবার বলিয়া তাহাদিগকে আমরা নির্মম, হৃদয়হীন ও রূঢ়ভাষিরূপেই দেখিয়া থাকি। পুলিশের থানায় গিয়া নিতান্ত ভালো মানুষের পক্ষেও দয়ামায়া বা সহানুভূতি আশা করা ভুল।

সেইরূপ 'নতুন-দা'র মতো মানুষ পৃথিবীতে বেশী সংখ্যায় থাকিলে সংসার আর সংসার থাকিত না, পুলিশের থানার মতো নিষ্ঠুর এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের স্থানে পরিণত হইত।

অতলস্পর্শী—যাহার তলা স্পর্শ করিতে পারা যায় না; অপরিমেয়। **অম্লরোগী**—অম্বলের রোগগ্রস্ত। সাধারণতঃ নিষ্কর্মা বড়লোকেরাই এই রোগে ভুগিয়া থাকে। বহুভারাক্রান্ত—সংসারের নানা দায়িত্ব যাহাকে বহন করিতে হয়। **'চারপাই'**—চারিটি পায়াযুক্ত সাধারণ খাটিয়া। শব্দটি বাঙলা নয় (হিন্দী) বলিয়া উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হইয়াছে। সত্যবাদী—সত্যপ্রতিজ্ঞ; যাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনও নিষ্ফল হয় না। **অর্জুন**—মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব। **জয়দ্রথবধের পরিবর্তে** ইত্যাদি—সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের ভগিনীপতি। একবার ইনি দ্রৌপদীকে একা পাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ টের পাইলে তাঁহাদের হাতে তাঁহাকে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তারপর প্রতিশোধ-কামনায় তিনি কঠোর তপস্যায় তুষ্ট মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করিলেন যে, অর্জুন ভিন্ন অন্য কোন পাণ্ডব তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যুবধের দিন জয়দ্রথ কৌরবপক্ষের ব্যূহদ্বার রক্ষা করায় পাণ্ডবগণ কেহই ব্যূহভেদ করিয়া অভিমন্যুর সাহায্য করিতে পারিলেন না। অর্জুনও অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া জয়দ্রথের প্রাণবধ করেন। শ্রীকান্ত পশ্চিমের গ্রামবাসীদের নিদ্রার গভীরতা বুঝাইবার জন্য রসিকতা করিয়া বলিতেছেন যে, যে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি যদি প্রতিজ্ঞা করিতেন যে ঘরে আগুন না দিয়া শুধু ডাকাডাকি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া এই গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করিবেন, তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পূর্ণ হইত না এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে পাপী হইতে হইত; **রিক্তহস্তে**—খালিহাতে।

'দর্জিপাড়া'র—দর্জিপাড়ার বাবু। অস্পষ্ট হইয়া—প্রতিধ্বনি কখনও মূল ধ্বনির মতো স্পষ্ট হয় না। হুড়ারের জ্বালায়—নেকড়ে বাঘের উপদ্রবে। **কাঁটা দিয়া উঠিল**—রোমাঞ্চিত হইল। নিরতিশয়—অত্যন্ত। কুপিত—ক্রুদ্ধ। এতবড়ো অভিশাপ—অর্থাৎ বাঘের পেটে যাইবার অভিশাপ। **আমার**

মাসিমাও এসেছেন যে—অর্থাৎ 'নতুন-দা'কে বাঘের পেটে দিয়া মাসিমার নিকট কি জবাবদিহি করিব? বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া ছেলের এইরূপ অভাবনীয় মৃত্যুতে কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিব? পরিস্ফুট—স্পষ্ট। ব্যর্থপ্রয়াস—নিষ্ফল চেষ্টা। সমবেত আর্তচীৎকারে—একসঙ্গে অনেকগুলি ব্যাকুল ঘেউ ঘেউ শব্দে। এই দুর্ঘটনার সংবাদ—'নতুন-দা'কে বাঘে লইয়া যাইবার সংবাদ। গোচর করিবার—জানাইবার। জলের মতো—অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। সেগুলো—কুকুরগুলি।

আমি না এলে—আমাকেও বাঘের পেটে যাইতে হইলে। পাণ্ডুর—ফ্যাকাশে; নিষ্প্রভ। মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে—বাঘ মারিবে বলিয়া মিথ্যা আস্ফালন অচিরেই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে অর্থাৎ আর যাইতে চাহিবে না। ভয়ের সহিত যে চির অপরিচিত—ভয় কাহাকে বলে তাহা যে কোনোদিনই জানে না। হাতের বাঁশটা—এই বাঁশটা লইয়াই শ্রীকান্ত ইন্দ্রের সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। বাদবিতণ্ডা—তর্কবিতর্ক।

অ. ৪৫-৪৯। **একটা শৃগালও নাই**—অর্থাৎ ভয় করিবার মতো কোনো জন্তু-জানোয়ারই নাই, যদিও শিয়াল দেখিয়া কেহ ভয় পায় না। **কালোপানা** বস্তু—ওভারকোটে আবৃত 'নতুন-দা'। কিন্তু জলের মধ্যে থাকায় তখন আর তাঁহাকে ব্যক্তি বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। **ঢোল**—স্ফীত। 'ফুলিয়া ঢোল হওয়া' বাঙলা ইডিয়ম। **সংগীত-চর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া**—অপূর্ব গানের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া। কুকুরগুলিকে সঙ্গীতরসিক বলিয়া বর্ণনা করিয়া লেখক এখানে কৌতুক পরিবেশন করিয়াছেন। অশ্রুতপূর্ব—যাহা পূর্বে কখনও শুনা যায় নাই। অদৃষ্টপূর্ব—যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। বিভ্রান্ত হইয়া—ভুল করিয়া। এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে—লেখকের সূক্ষ্ম রসিকতা লক্ষণীয়। **তুষারশীতল**—বরফের মতো ঠাণ্ডা। তুষারের ন্যায় শীতল (উপমান-কর্মধারয়)। **পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন**—উৎকট স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার বশে কিছুকাল আগে দুইটি কিশোরকে এই শীতের রাত্রে যে দুর্ভোগ তিনি ভোগাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাপ হইয়াছিল। সেই পাপই তিনি ক্ষালন করিতেছিলেন যোগীঋষির মতো আকণ্ঠ জলে মগ্ন থাকিয়া। কিন্তু এ প্রায়শ্চিত্ত স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্র সাধনের নয়,

বাধ্য হইয়া। চাঙ্গা—সতেজ। মেহন্নত—পরিশ্রম। **কেন আমরা নির্বোধের মতো** ইত্যাদি—শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ ভিজা পোশাকগুলি 'নতুন-দা'র দেহ হইতে খুলিয়া নির্বোধের কাজ তো করেই নাই বরং বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছিল, কারণ সেই ভিজা পোশাকে থাকিলে পোশাক হয়তো রক্ষা পাইত কিন্তু বাবুকে নিউমোনিয়ার হাত হইতে বাঁচানো যাইত না। অথচ এইভাবে উপকার করিতে গিয়াই তাহারা তিরস্কৃত হইল। **সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন**—ভিজা জামাকাপড়ে থাকিলে দেহটাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া যে অসুখ-বিসুখ করিতে পারে, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেলেন। **উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও** ইত্যাদি—দেহের জন্যই পোশাক-পরিচ্ছদের যাহা-কিছু মূল্য এবং আদর। দেহটাই আসল, পোশাকটা গৌণ বা উপলক্ষ। এই লক্ষ্য দেহটার কথা ভুলিয়া উপলক্ষ পোশাকের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য থাকা উচিত নয়। অথচ 'নতুন-দা' দেহের পরিবর্তে পোশাকের প্রতি অত্যধিক মায়া দেখাইয়া এই কথা প্রমাণ করিলেন যে সময় সময় মূর্খ মানুষ লক্ষ্য ছাড়িয়া উপলক্ষকেই বহুগুণ বেশী মূল্য দেয়। ইহা যে বিকারের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নতুন-দা'র মতো ব্যক্তির সংসর্গে না আসিলে এই ব্যাপারটা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না।

বাবু ইতিপূর্বে মূর্ছিত হইতেছিলেন—শ্রীকান্তের র‍্যাপারের গন্ধে বাবুটির মূর্ছা হয় নাই সত্য, কিন্তু যেভাবে র‍্যাপারটির নিন্দা করিতেছিলেন তাহাতে মনে হয় মূর্ছিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ব্যাঘ্র কবলিত না হইয়া—বাঘের মুখে না পড়িয়া। **তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই**—প্রকৃতপক্ষে বাঘের মুখে না পড়িয়া সশরীরে ফিরিয়া আসা 'নতুন-দা'র অনুগ্রহে হয় নাই, হইয়াছে দৈবানুগ্রহে। শ্রীকান্ত রসিকতা করিয়া এই দৈবানুগ্রহকে 'নতুন-দা'রই অনুগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। এই অনুগ্রহ লাভ করিয়া যেন তাহারা ধন্য হইয়া গিয়াছে; **নৌকাচড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া**—ভবিষ্যতে আর নৌকায় না চড়িবার প্রতিজ্ঞা করিয়া। খুঁট—প্রান্ত। **কোঁচার খুঁট মাত্র অবলম্বন করিয়া**—কোঁচা দিবার জন্য কাপড়ের যে অংশটি থাকে কেবল সেইটুকুকেই গায়ে জড়াইয়া।

ব্যাখ্যা

(১) কিন্তু মনে হয় যেন······কী করিয়া? (অ. ৩৪)

এই অংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'নতুন-দা' শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত। এই গল্পে উল্লিখিত 'নতুন-দা'-সম্বন্ধেই ইহা শ্রীকান্তের মন্তব্য।

ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই 'নতুন-দা'টির সহিত শ্রীকান্ত ও ইন্দ্র ডিঙিযোগে থিয়েটার শুনিতে যাইতেছিল। রাস্তায় এই বাক্যবাগীশ নিষ্কর্মা লোকটির ব্যবহারে শ্রীকান্তের হাড়পিত্তি জ্বলিয়া গিয়াছিল। তবু এই কলিকাতার বাবুটির খেয়াল-মাফিক শ্রীকান্তদের এতক্ষণ প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত গুণ টানিয়া নৌকা চালাইতে হইয়াছে। এখন তাঁহারই ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাহারা নৌকা ছাড়িয়া মুড়িটুড়ি একটা-কিছু খাদ্যের খোঁজে বাহির হইয়াছে। পথে ইন্দ্রনাথ তাহার দাদার বিদ্যাবুদ্ধি ও ভবিষ্যতে ডেপুটি হইবার সম্ভাবনার কথা বলিল। সেই ঘটনার বহুকাল পরে কথাটা মনে পড়িতেই শ্রীকান্ত আলোচ্য কটু মন্তব্য করিয়াছে। বহু জায়গায় বাঙালী ডেপুটির অখ্যাতির কথা শুনা যায়। বাঙালীর মধ্যেই এই 'নতুন-দা'টির মতো মানুষ যদি ডেপুটি হয় তবে তাহার অখ্যাতি খুব বেশীই হওয়ার কথা। স্বার্থপর, নিন্দুক ও হৃদয়হীন এই 'নতুন-দা'। তবু তাঁহার ডেপুটি হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্দ্রনাথের এই অনুমান, বাঙালী ডেপুটির নিন্দা শুনিয়া, সত্য হইতে পারে বলিয়া শ্রীকান্ত বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার মুখে এখানে 'সুখ্যাতি' কথাটি 'অখ্যাতি' অর্থই তীব্রতর করিয়াছে।

(২) তবে ভাগ্যে এমন······পরিণত হইয়া যাইত। (অ. ৩৪)

এই অংশটি শরৎচন্দ্রের 'নতুন দা'-শীর্ষক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। এই কাহিনীর কেন্দ্রগত চরিত্র 'নতুন-দা' সম্বন্ধে ইহা শ্রীকান্তের মন্তব্য।

কলিকাতার দর্জিপাড়ার বাসিন্দা ও ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই এই 'নতুন-দা'টি ছিলেন ভয়ঙ্কর বাবু—অলস, হৃদয়হীন ও স্বার্থপর। তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে লইয়া তিনি ডিঙিযোগে দূরে এক জায়গায় থিয়েটার শুনিতে যাইতেছিলেন। পথে তাঁহার বায়নাক্কা আর গাল-মন্দ সহিয়া শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথের যারপরনাই হয়রানি হইয়াছে। পশ্চিমের দারুণ শীতে নিজে পা হইতে মাথা পর্যন্ত গরম পোশাকে আবৃত থাকিয়া ছুইটি

ছোট ছেলেকে হুকুম করিয়া নাকানিচোবানি খাওয়াইতে তাঁহার কিছুমাত্র বাধে নাই। তাহার উপর বাবুটির দর্জিপাড়ার লম্বা-চওড়া বুলিতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা আর নাক্‌সিঁট্‌কানি শ্রীকান্তের হাড়পিত্তি জ্বালাইয়া দিয়াছিল। অথচ লোকটার তখন যৌবনকাল। যৌবনে মানুষের হৃদয় উদার হয়, সমবেদনা সর্বাধিক প্রবল থাকে। এই যৌবনেই কিনা 'নতুন-দা'র এই নিরেট হৃদয়হীনতা। এমন লোক যদি সংসারে সংখ্যায় বেশী হইত, তবে সংসার থানার মতো একটা জায়গা হইয়া দাঁড়াইত। থানায় চোর-বাটপাড় প্রভৃতিরই ভিড় ;—পুলিশ সেখানে নির্মম ও কটুভাষী। নেহাত ভালো-মানুষকেও সেখানে গালমন্দ ধমক আর চোটপাট দেখিয়া নিতান্ত কাবু হইতে হয়। সারা পৃথিবীটা যদি এই রকম হইত তবে তাহা সৎলোকের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। ভাগ্যের কথা, পুলিশপ্রকৃতি অথবা তাহার চেয়েও হেয় এই 'নতুন-দা'র মতো লোক সংসারে অল্প। সেইজন্য সংসার এখনও সহনীয়। ইহাই শ্রীকান্তের বক্তব্য। এই বক্তব্যের মধ্যে 'নতুন-দা'র প্রতি তাহার তীব্র আক্রমণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

(৩) দিনের বেলা.........বলিতে পারা যায়। (অ. ৩৫)

আলোচ্য অংশটি শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা'-শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত। পশ্চিমের পরিশ্রমী সাধারণ গ্রামবাসীদের নিদ্রার গভীরতা বর্ণনা-প্রসঙ্গেই লেখক শ্রীকান্তের জবানীতে এই মন্তব্য করিয়াছেন।

একবার শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই 'নতুন-দা'কে লইয়া ডিঙি টানিয়া রাত এগারোটায় এক পশ্চিমা গ্রামের নিকটে পৌঁছিল। 'নতুন-দা'র ক্ষুধা মিটাইবার জন্য শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথ চলিল মুড়িটুড়ি কিছু কিনিয়া আনিতে। মুড়ির দোকানে তখন ঝাঁপ পড়িয়াছে। সেই দারুণ শীতে দরজা-জানালা আঁটিয়া দোকানী অঘোর ঘুমে অচেতন হইয়া আছে। শত ডাকা-ডাকি আর দরজা-নাড়ানাড়িতেও সাড়া পাওয়া গেল না। এই যে নিরেট ঘুম, ইহার কারণ খুব স্পষ্ট। এই সকল সাধারণ গ্রামবাসী কঠোর পরিশ্রম করে—তাই রাতে অঘোরে ঘুমাইতে জানে। অলস জমিদার অম্বলের চোঁয়া ঢেকুর তুলিয়া রাত জাগিয়া কাটায়। সোমত্ত মেয়ের বিবাহের চিন্তায় বাঙালী গৃহস্থেরও অনেক রাত্রিতে ঘুম হয় না। কিন্তু ইহারা তেমন নয়। তাই ইহাদের ঘুম নিরেট। একবার সামান্য একটা 'চারপাই'-এর উপর শরীরটা এলাইয়া

দিলেই হইল—মুহূর্তে অঘোর ঘুমে ইহারা তলাইয়া যায়। দরজা-নাড়া আর ডাক-হাঁকে সে ঘুম ভাঙানো অসম্ভব। অর্জুনের পক্ষে জয়দ্রথবধ ইহার চেয়ে অনেক সহজ। কাজেই অর্জুন যদি প্রতিজ্ঞা করিতেন যে ঘরে আগুন না দিয়া এমন ঘুম ভাঙাইবেন, তবে তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেন না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে তখন তাঁহাকে পাপের আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইত। শ্রীকান্ত কৌতুকচ্ছলে এইকথা শপথ করিয়া বলিয়াছে এবং ইহাদ্বারা পরিশ্রমী পশ্চিমা গ্রামবাসীর সুষুপ্তির গভীরতা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

(৪) উপলক্ষ যে আসল ......চোখে পড়ে না। (অ. ৪৯)

এই অংশটি শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা' শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত। এই কাহিনীর 'নতুন-দা'র চরিত্রটির সম্বন্ধেই শ্রীকান্তের এই মন্তব্য। ইহার প্রসঙ্গ জলে-ভেজা পোশাক সম্বন্ধে 'নতুন-দা'র শোক।

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ যখন মুড়ির খোঁজে দূরে গিয়াছে তখন দর্জিপাড়ার এই 'নতুন-দা' একটা গান ধরিয়াছিলেন। তাঁহার গানে পাশের কুকুরগুলি ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত পোশাকে-ঢাকা এই অদ্ভুত চেহারাটাকে তাহারা তাড়া করিয়াছিল। বীর পুরুষ তখন ভয়ে ছুটিতে ছুটিতে জলে ঝাঁপ দেন। বহুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্ধার করিলে তাঁহার জামা-কাপড়ের জন্য বড় শোক দেখা যায়। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত তাঁহার ভিজা জামাকাপড় খুলিয়া তাড়াতাড়ি নিজের চাদর দুইটায় 'নতুন দা'র দেহ ঢাকা করিয়া তোলে। এইটাই তাহাদের অপরাধ। এইজন্য তাহাদের অনেক গাল খাইতে হইল। এরকম ভিজা জিনিস গায়ে থাকিলে অসুখ অনিবার্য। 'নতুন-দা'র পক্ষে তো বটেই। আসিবার সময় দস্তানা খুলিয়া একটু ডিঙির হালটা ধরিতেও তিনি নারাজ ছিলেন, কেননা তাহাতে নিমোনিয়া নাকি নির্ঘাৎ। এখন দেখা গেল এমন সুখী দেহটার চেয়ে পোশাকের প্রতি মায়া তাঁহার বেশী। দেহের রক্ষার জন্যই তো পোশাক। পোশাক উপলক্ষ মাত্র, দেহটাই আসল। বিকৃতবুদ্ধি মানুষের কাছে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ যে বড় হয়—ইহা তাহারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই শ্রীকান্ত বলিয়াছে যে, এইরূপ লোকের সংসর্গে না আসিলে উল্লিখিত বিকারটা মানুষের মধ্যে যে আদৌ আছে এবং কত প্রবলভাবে আছে, তাহা সহসা চোখে পড়ে না।

(৫) যাই হউক, তিনি……হইয়া গিয়াছিলাম। **(অ. ৪৯)**

এই অংশটি শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা'-শীর্ষক কাহিনীর মধ্যে শ্রীকান্তের একটি মন্তব্য। 'নতুন-দা'-চরিত্রের স্বরূপবর্ণনার শেষে শ্রীকান্ত এই মন্তব্যে উপসংহার টানিয়াছে।

এই 'নতুন-দা'র সহিত শীতের রাতে ডিঙিভ্রমণে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের যারপরনাই হয়রানি হইয়াছে। এই ব্যক্তিটির ক্ষুধার খোরাক জুটাইতে তাহারা যখন দূরে গ্রামের দিকে গিয়াছিল, তখন কুকুরের তাড়ায় পলাইয়া তিনি জলে ঝাঁপ দেন এবং এক গলা জলে দাঁড়াইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করেন। ইন্দ্রনাথরা ফিরিয়া তাঁহার এই অন্তর্ধানে শঙ্কিত হয়। কে জানে হয়তো তাঁহাকে বাঘে খাইয়াছে। এই ভয়ে ইন্দ্রনাথ তো প্রথমে ভাঙিয়াই পড়ে। 'নতুন-দা' ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই, কলিকাতা হইতে তাহাদের বাড়ীতে মাসিমাও তখন বেড়াইতে আসিয়াছেন। কি মুখে ইন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে 'নতুন-দা'র এই সংবাদ দিবে সেই চিন্তা তাহাকে বিশেষ কাতর করে। অবশেষে 'নতুন-দা'র সন্ধান ও উদ্ধার হইল। ইন্দ্র আর শ্রীকান্তের চাদরে তাঁহার নধর তনু চাঙ্গা হইল। চূড়ান্ত নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ এই লোকটা তথাপি ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের উপর অজস্র কটুকথা বর্ষণ করিয়া চলিলেন। শ্রীকান্তরা তাহা গায়ে মাখিল না। অপদার্থ ও কাপুরুষ 'নতুন-দা'টি যে বাঘের পেটে যান নাই এইটাই তখন তাহাদের সান্ত্বনা ও আনন্দের কারণ হইয়াছে। এইটা যেন 'নতুন-দা'র দয়া। নচেৎ তিনি যেমন বীর, তাহাতে চেষ্টা করিলে যে যে-জায়গায় ছুটিয়া গিয়া বাঘের খপ্পরে পড়িতে না পারিতেন এমন বলা যায় না। সেই দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 'নতুন-দা' তাহাদের অনেক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ হইতে বাঁচাইয়াছেন। এইজন্যই এখন শ্রীকান্তরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ—এইজন্যই তাহাদের মন আনন্দে একেবারে পরিপূর্ণ।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা' গল্পের 'নতুন-দা' চরিত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উ.। শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা' চরিত্রটি একটি উপভোগ্য সৃষ্টি। ইহা 'দর্জি-পাড়ার ছেলে'র অতিশয় বিকৃত একটি সংস্করণ। চেহারাটা তাঁহার লেখক

খুলিয়া দেখান নাই। আপাদমস্তক পোশাকে আঁটা, কিম্ভূতকিমাকার প্রচণ্ড একটি বাবু ইনি। মাথায় টুপি, গলায় গলবন্ধ, হাতে দস্তানা—সর্বাঙ্গ কাপড়-কামিজে মোড়া। দেখিলে হঠাৎ ভয় হয়। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে কুকুরগুলি তাঁহাকে তাই বোধ হয় মনুষ্যেতর জীব ভাবিয়া তাড়া করিয়াছিল।

কিন্তু 'নতুন-দা'র প্রকৃতিটাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অতিশয় বাবু ও স্বার্থপর, পরনিন্দুক ও অহঙ্কারী এই যুবক যাহাকে বলে পুরাদস্তুর 'কাপ্তেন'। সম্ভবতঃ পরিচ্ছন্নতা সত্যই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তবু অপরিচ্ছন্নতার প্রতি নাকসিঁটকানিটা তাঁহার কপট ও আতিশয্যপূর্ণ। নহিলে যে র‍্যাপারখানার তেলের গন্ধে ভূত পালায় তাহা বাধ্য হইয়া গায়ে দেওয়ার পর 'নতুন-দা'র অন্ততঃ দুই-এক ঝলক বমি আশা করা যাইত। জানি না শীতের আতিশয্য উদ্গারের প্রতিষেধক কিনা। কিন্তু যে-শীতে অনবরত বকা যায় সে-শীতে অপরিচ্ছন্নতার প্রতি সত্যকার ঘৃণাটা একেবারে উপশম লাভ করার কথাতো নয়। দ্বিতীয়তঃ, পোশাকের শোকে যখন বাবু কাতর, তখন স্বদেহে পঙ্কিল জলের কর্দমলেপ সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নাই। সুতরাং এই পরিচ্ছন্নতার বড়াই তাঁহার সবটাই বাহ্য ও বহ্বাড়ম্বর—এই কথাই জোরের সহিত বলা যায়।

বাবু আবার এই বয়সেই তাম্রকূটবিলাসী। ইহাও কিন্তু পরিচ্ছন্ন বা প্রশংসনীয় স্বভাব নহে। ইহাতেই বুঝিতে পারি যে তিনি ইঁচড়ে পাকিয়াছেন। শহরের আড্ডাখানায় এই ধরনের পাকা ছেলে আর যা যা অভ্যাস করে তাহাতেও তিনি ওস্তাদ। তিনি হারমোনিয়ম বাজান, 'ঠুন-ঠুন-পেয়ালা' সঙ্গীত করেন। তবে বাজনায় বা গানে যে তাঁহার দক্ষতা নাই সে-কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইঁহার সঙ্গীতে কুকুরও উত্তেজিত হয়।

তবে বাবুটি আরাম করিতে জানেন এবং আরাম পাইলে তাঁহার কৃতজ্ঞতা মুখর হইয়া উঠে। অপরে সাজিয়া দিলে আরামে তামাক সেবন করিতে করিতে নিন্দাচর্চায় তাই তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। এইপ্রকার নিন্দাবাদে একপ্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে। মফঃস্বলের ছেলেরা মহানগরীর, বিশেষতঃ কলেজে-পড়া ছেলেদের প্রতি একটা সঙ্কুচিত সম্ভ্রমবোধ পোষণ করে। ইহারই সুযোগ লইয়া 'নতুন-দা' তাচ্ছিল্যপ্রকাশে এত উচ্ছ্বাস বোধ করেন। কিন্তু তাহার ধরনটা এতই ইতর যে তাহাতে মফঃস্বলের শ্রীকান্তেরও শ্রদ্ধা জাগার বদলে হাড়পিত্তি জ্বলিয়া যায় মাত্র।

লোকটা অত্যন্ত নির্লজ্জ ও স্বার্থপর। ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তিনি তাহাদের কাঁধে ভর করিয়া ঠুঁটো জগন্নাথ হইয়া বসিয়া থাকেন এবং বসিয়া বসিয়া লেজ নাড়েন, বচনে উপকারীর শ্রাদ্ধ করেন। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে একটু হালটা ধরিতে বলিয়াছিল। দস্তানা খুলিলে নিমো-নিয়ার ভয় এবং দস্তানা-সহ হাল ধরিলে দস্তানাটির ক্ষতির সম্ভাবনা—এইজন্য বাবু নারাজ হন। অথচ ঠিক সেই সময়ে কনিষ্ঠরা প্রায় নগ্নগাত্রেই তাঁহার ডিঙি গুণ টানিয়া চালাইতেছে। ইহার জন্য মৌখিক একটু সহানুভূতি প্রকাশও তাঁহার নাই। কেবল হাজারো বায়নাক্কা আর হুজ্জুতি-হুকুমে বালক দুইটিকে তিনি ওষ্ঠাগতপ্রাণ করিয়া তোলেন।

এই ঘৃণ্য চরিত্রের সর্বাপেক্ষা হাস্যকর বস্তু হইল কাপুরুষতা। মুখে দর্জিপাড়ার ছেলে বলিয়া খুব বড়াই আছে। যমকেও নাকি কর্তা ভয় করেন না। এতবড় বীরপুরুষ কিন্তু এতক্ষণ অখণ্ড আলস্যে কাটাইয়াও সবার আগে ক্ষুধায় পীড়িত হন। নিতান্ত হ্যাংলার মতো তখন তিনি ঐ খোট্টাদের বস্তি হইতেও কিছু মুড়িটুড়ি পাইলে খাইয়া বাঁচেন। অথচ খোট্টারা তাঁহার বিচারে এতই নোংরা যে তাহাদের গায়ের গন্ধেও নাকি তাঁহার মতো শহুরে বাবুর ব্যামো হয়। কিন্তু খাবার আনিতে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্র দুজনেই গেলে তিনি একা পড়েন। তাই তাঁহার মনে মনে অভিপ্রায় এই যে শ্রীকান্ত তাঁহার পাহারায় থাকুক, ইন্দ্র খাবার সংগ্রহে যাক। কিন্তু কাপুরুষ বলিয়া মুখ ফুটিয়া সে-কথা বলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব না, বিশেষতঃ ভয়ডরের কথা উঠার মুখে তাঁহাকে দর্প দেখাইতে হয়। সুতরাং সেই বিজন নদীতটে রাত্রিকালে তিনি একাকী পরিত্যক্ত হন এবং সঙ্গীতে কুকুর ডাকিয়া আনেন। কুকুরের ভয়ে ছুটিয়া গিয়া শেষে তিনি নদীর একগলা জলে দাঁড়াইয়া প্রাণ বাঁচান। ইন্দ্র বহুক্ষণ পরে ক্রন্দনপর এই বীরপুঙ্গবকে যেই উদ্ধার করিল অমনি কিন্তু বাবু স্বমূর্তি ধারণ করিলেন। প্রথম চিন্তা হইল তাঁহার হারানো পাম্প্-শুটির উদ্ধার। তারপর এইসব গ্লানি ও লজ্জাকর কাপুরুষতার কথা ভুলিতে তাঁহার মুহূর্তকালও লাগিল না।

যৌবনে মানুষ নাকি সর্বাপেক্ষা উদার হয়। 'নতুন-দা'র সদ্য যৌবনে যে রূপ দেখা যায় তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ কুৎসিত-পরিণতি কল্পনা করিতেও শঙ্কা হয়। বস্তুতঃ এই ধরনের মানুষ ভাগ্যে বেশী নাই। নহিলে সংসার বাসের অযোগ্য হইত। অল্প আছে বলিয়াই তাহারা আমাদের হাসির

খোরাক। তাহাদের চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, কল্পনাতীত বেহায়াপনা, হাস্যকর ভীরুতা-সত্ত্বেও মুখের বড়াই আমাদের হাসায়—এইটুকুই মাত্র এই ধরনের চরিত্রের উপযোগিতা।

প্র. ২। শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা' গল্পে ইন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ।

উ.। 'নতুন-দা গল্পে ইন্দ্রনাথের অতি সামান্য পরিচয়ই ফুটিয়াছে। **'শ্রীকান্ত'** উপন্যাসে এই বেপরোয়া পরার্থপর, নির্ভীক অথচ বখাটে ছেলেটির বলিষ্ঠ চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই গল্পেও চমকে ইঙ্গিতে তাহার এই পরিচয় এক-একবার ঝলসিয়া উঠিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী মানুষ। দুর্জয় মনোবল, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা ও অফুরন্ত শ্রমশীলতা—এইগুলি তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। রাত্রির অন্ধকারে উজান ঠেলিয়া নৌকা-চালানো সহজ শক্তি, সাহস ও নৈপুণ্যের কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস রাখে বলিয়াই মনে হয়। গঙ্গার আবহাওয়া তাহার নখদর্পণে। বাতাস পড়িয়া গেলে উজানে যাওয়া কেমন দুষ্কর, নেহাত যাইতে হইলে কত সময়ে কত পথ যাওয়া যায়—ঐ সব তাহার সুবিদিত। নৌকাচালনায় তাহার আরও দক্ষতার পরিচয় এখানে আছে। কিন্তু এই দক্ষতার চেয়ে তাহার সহিষ্ণুতার পরিচয় অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য। সেই শীতের রাতে নদীর কনকনে হাওয়ায় একেবারে খালি গায়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে। ইহাতে তাহার একটা সামান্য হাঁচিকাশিও দেখা যায় নাই। প্রকৃতির শিশু ইন্দ্রনাথ। শীত-গ্রীষ্মের অসম আক্রমণ তাহার অটুট দেহকে কাতর করিতে পারে না। দেহের সহিত মনটিও তাহার সমান বলিষ্ঠ। সঙ্কল্প তাহার বজ্রকঠোর, জেদ অনড়। 'নতুন-দা'র রহস্যজনক অন্তর্ধানে সে যখন একহাতে ছুরি আর এক-হাতে লগি লইয়া অভিযান করে, তখন তাহার সেই দৃঢ়চরিত্র আলোকমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীকান্ত জানে তাহাকে নিবৃত্ত করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। ইন্দ্রনাথ শূন্য আস্ফালন জানে না, মুখে আর কাজে তাহার এক। এই পুরুষকার, এই বীরত্বই শ্রীকান্তকে তাহার অনুগত করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের সাহস কিন্তু নির্বোধের দুঃসাহস নয়। সেই অঞ্চলের সব বিপদ্ তাহার সুবিদিত এবং এই বিপদ সম্বন্ধে তাহার সতর্কতাও লক্ষ্য করিবার বস্তু। নদীর

বালুচরে দাঁড়াইলে বালুতে পা ডুবিয়া যাইবার ভয়—রোখের মাথায় আগাইবার সময়েও এই সতর্কবাণী তাহার মুখে। তারপর 'নতুন-দা'র সন্ধান এবং আকণ্ঠ জল হইতে তাঁহার উদ্ধার—এই সবই ইন্দ্রনাথের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয়।

ইন্দ্র শক্ত ও শক্তিশালী, কিন্তু মনটা তাহার সর্বতোভাবে কঠোর নয়। উহাতে কতকগুলি কোমল ও কমনীয় গুণও আছে। উদাহরণস্বরূপ, এই বয়সেও আচরণের শোভনতা-সম্বন্ধে তাহার সুন্দর বোধ আছে। শ্রীকান্তের প্রতি 'নতুন-দা'র ইতর ব্যবহার তাই তাহাকে লজ্জা দিয়াছে। 'নতুন-দা' যখন শ্রীকান্তকে তামাক সাজিতে বলিয়াছেন ইন্দ্র তখনই নিজে সাজিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার উনি যখন পাতিয়া বসার জন্য শ্রীকান্তের র‍্যাপারখানা চাহিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ নিজের খানা দিয়া দিয়াছে। 'নতুন-দা' ইন্দ্রের আত্মীয়, শ্রীকান্তের কেহ নন। কাজেই শ্রীকান্তের উপর এই জুলুম অন্যায়। তাহাতে শ্রীকান্ত ক্ষুণ্ণ-বোধ করিতে পারে, অথচ ইন্দ্রের মুখ চাহিয়া র‍্যাপার বিছাইয়াও দিতে পারে। এই সম্ভাবনা এড়াইবার জন্যই ইন্দ্রনাথ আগে হইতেই নিজের র‍্যাপার ছুঁড়িয়া দিয়াছে। ইহার পরও অবশ্য নানা কথায় 'নতুন-দা' শ্রীকান্তের প্রতি প্রচুর তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্র আহত বন্ধুর মনে প্রলেপ দিবার জন্য তাই সলজ্জভাবে চেষ্টা করিয়াছে। 'নতুন-দা' শহুরে মানুষ, তাই জল-হাওয়া সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন না। এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ যেন প্রকারান্তরে শ্রীকান্তকে 'নতুন-দা'র অপরাধ ক্ষমা করার অনুরোধ করিয়াছে। তারপর 'নতুন-দা'র বিদ্যাবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা ও ভবিষ্যতে ডেপুটি হইবার সম্ভাবনা ফলাও করিয়া বলিয়া ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। উদ্দেশ্য যেন এই কথা বলা যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির একটু অত্যাচার সহ্য করিতে কোনো দোষ নাই। ইন্দ্রনাথ যে এখানে কপট তাহা নহে। সত্যই তাহার নিজেরই এইরূপ মনোভাব ছিল। নহিলে 'নতুন-দা'র এত অত্যাচার সহ্য করিবার পাত্র সে নয়। এক জায়গায় ইন্দ্র 'নতুন-দা'কে হালটা একটু ধরিতে বলিয়াছে। 'নতুন-দা' নারাজ হইয়াছেন এই অজুহাতে যে দস্তানাটি নষ্ট হইবে। ইন্দ্র তাহাই মানিয়া লইয়াছে, বোধ হয় এই কথা সত্য বুঝিয়াই।

নদীতীরে 'নতুন-দা'র অন্তর্ধানের সময় ইন্দ্রনাথের কাতরতা ও একেবারে ভাঙিয়া পড়া দুর্বলতার লক্ষণ নয়। ইহা এক প্রকার দায়িত্ববোধেরই

অভিব্যক্তি। 'নতুন-দা'কে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তাহারই। এখন সে একা কেমন করিয়া বাড়ী ফিরে? বিশেষ করিয়া 'নতুন-দা'র মা—ইন্দ্রনাথের মাসিমা—তখন তাহাদের বাড়ীতেই আছেন। তাঁহার কাছে ইন্দ্রনাথের মুখ থাকে কি করিয়া? সবচেয়ে বড় কথা, একজন সঙ্গীকে ফেলিয়া ফিরিয়া যাওয়ার মধ্যে যে কাপুরুষতা আছে সেইটা ইন্দ্রনাথ কিছুতেই সহিতে পারিবে না। এই সব ভাবিয়াই ইন্দ্রনাথের ক্ষণিক কাতরতা। কিন্তু পরমুহূর্তেই সংকল্পে তাহার চোখ কঠোর হইয়া উঠে। 'নতুন-দা'কে সে খুঁজিয়া বাহির করিবে, নহিলে সে-ও আর বাড়ী ফিরিবে না। এই সময় শ্রীকান্তও ইন্দ্রনাথের সঙ্গ লইল, ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিল না। শ্রীকান্ত যে 'নতুন-দা'র প্রতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করিত তাহা নহে, 'নতুন-দা'র মায়ের কাছেও তাহার জবাবদিহি বা অন্য কোনো লজ্জার কারণ ছিল না। তবু এই মরণপণ ভীষণ অভিযানে যে সে জোর করিয়া যাত্রী হইল তাহা ইন্দ্রের প্রতি গভীর অনুরাগ ও অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বেরই জন্য। ইন্দ্রনাথের বিবেচনা ও ব্যক্তিত্ব দুইয়েরই পরিচয় এই ঘটনাটির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্র. ৩। "বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি।"—কাহার সম্বন্ধে কে এই মন্তব্য করিয়াছে? এই 'অসজ্জন ব্যক্তি'টির স্বার্থপরতা ও অসজ্জনতার উদাহরণগুলি সংক্ষেপে লেখ।

উ.। ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই 'নতুন-দা'র সম্বন্ধে শ্রীকান্ত এই মন্তব্য করিয়াছে।

'নতুন-দা' ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত উভয়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তবু ছোটদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া নিজের ষোল আনা আরামের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার লজ্জা হয় নাই। ইন্দ্র ও শ্রীকান্তকে নিজের খেয়ালখুশিমতো তিনি যারপরনাই হয়রান করিয়াছেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি শ্রীকান্তের নাম লইয়া ব্যঙ্গ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তামাক সাজিবার হুকুম দেন। তারপর শ্রীকান্তের র‍্যাপারখানার নিন্দা, ইন্দ্রের-খানা পাতিয়া বসা ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে শুধু বাবুয়ানা নহে, প্রচুর স্বার্থপরতারও পরিচয় আছে। ছোটদের জন্য বড়র একটু ত্যাগ থাকাই সঙ্গত, অন্ততঃ তাহাদের পীড়িত করিয়া নিজের ভোগ পূর্ণ করার কথা কোনো সজ্জন ব্যক্তির কল্পনাতেও স্থান পায় না। 'নতুন-দা' সেই শীতে ইন্দ্রকে খালি-গা করাইয়া তাহার চাদরখানিকে আসন করিলেন—ইহার চেয়ে বিবেকরহিত আত্মপরতা আর কি হইতে পারে?

তারপর কোথায় কোন্ দূরে থিয়েটার হইবে, সেখানে বাবু হারমোনিয়ম বাজাইবেন এবং নৌকাযোগেই সেখানে যাইবেন। এই খেয়াল মিটাইবার জন্য শ্রীকান্তদের নাকানিচোবানির একশেষ হইয়াছে। হাওয়া পড়িয়া গেল, তবু উজান ঠেলিয়া যাইতেই হইবে। দুইটি বালকের উপর এই অন্যায় জিদের মূলেও আছে সেই স্বার্থপরতা। নিজে ঠুঁটো-জগন্নাথ হইয়া বসিয়া থাকিবেন আর অজস্র গালমন্দে শ্রীকান্তের শ্রাদ্ধ করিবেন, অথচ তাঁহার বায়নার শেষ নাই। শ্রীকান্ত গুণ টানিবার প্রস্তাব ভালোমনেই করিয়াছে, আর গুণ টানিবেও শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথই। তাহাতে বাবু কোথায় খুশি হইবেন, না, শ্রীকান্তের প্রতি ইতর ভাষায় খেঁকাইয়া উঠেন। ইহা চূড়ান্ত অসৎ প্রকৃতির উদাহরণ নয় কি? ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত—একজন গুণ টানে, একজন হাল ধরে। ইহারই মধ্যে বাবুকে আবার তামাক সাজিয়া দিতে হয়। একবার তাই ইন্দ্র দাদাকে একটু হাল ধরিতে বলে। দাদা মুখঝামটা দিয়া উত্তর করেন, দস্তানা খুলিয়া হাল ধরিলে তাঁহার নিমোনিয়া হইবে. দস্তানাসুদ্ধ ধরিলে দস্তানাটি নষ্ট হইবে। সুতরাং তিনি ঠায় বসিয়া কেবল গালিই দিতে পারেন। এই গালিবর্ষণ ও গঙ্গার হাওয়া—দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার ক্ষুধা বাড়াইয়া দিল। তখন একটু 'মুড়ি-টুড়ি'র জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা। ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত তাহাই সংগ্রহের জন্য সেই গভীর রাত্রে দূর বস্তিতে যাত্রা করিল। পরের উপর এত অত্যাচার এত অবিচার কাহারও সয় না, 'নতুন-দা'রও সয় নাই। কুকুরের তাড়নায় নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি একগলা জলে আধঘণ্টা কাটান। ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলে আবার তাঁহার সেই স্বার্থপর, কুৎসিৎ স্বরূপটি অতি-মাত্রায় উৎকট হইয়া উঠে। উপকারী ও প্রাণদাতার প্রতি একটা ভালো কথা তবু তাঁহার মুখে সরে না। নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞতা ও জঘন্য স্বার্থপরতা তখনও তাঁহার পাপমুখে টগবগ করিয়া ফোটে। এই সকল উদাহরণ এই 'নতুন-দা'টির অসাধুতা ও স্বার্থপরতা যে কি ভয়াবহ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

প্র. ৪। "কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক।"—কাহার উপর কি কারণে ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? উল্লিখিত 'খবরটা' সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উ.। ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই 'নতুন-দা'র উপর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ইহাই এখানে বক্তব্য। এই 'নতুন-দা'টি ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের সহিত নৌকাযোগে

ঘুরে এক জায়গায় থিয়েটারে চলিয়াছিলেন। পথে তাঁহার হাজার বায়নাক্কা হুকুমহুজ্জুতি আর গালমন্দে শ্রীকান্তদের হয়রানির একশেষ হইয়াছে। নিজের অন্যায় খেয়াল আর অলস আরামের জন্য তিনি চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, নীচ কৃতঘ্নতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাপের বোঝা পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার উপর ভগবান্ বোধ হয় কুপিত হইয়াছিলেন আর সেইজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ 'নতুন-দা'র দুর্ভোগের একশেষ হয়। ইহার পর লেখক 'নতুন-দা'র সেই দুর্ভোগের খবরটাই পরিবেশন করিয়াছেন।

খবরটা এই : [ইহার পর **সংক্ষিপ্তসার** হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।]

প্র. ৫। 'নতুন-দা' রচনাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও, শরৎচন্দ্র ইহাতে কি কৌশলে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন।

উ. । শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা' রচনাটি পড়িলে উপর হইতে প্রথমেই চোখে পড়ে কৌতুকরসের সাধারণ কতকগুলি উপকরণ। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যায় আবেগ-সঞ্চার ও সংস্থানে একটা অপূর্ব কৌশলই এই কৌতুকের উপাদানগুলিকে রসে পরিণত করিয়াছে।

'নতুন-দা'র হাস্যকর সাজসজ্জা তাহার আবির্ভাবমুহূর্ত হইতেই আমাদের বেশ কিছুটা কৌতুক এবং তাহার চেয়েও বেশী কৌতূহল জাগ্রত করে। আপাদ-মস্তক বিচিত্র পোশাকে মোড়া মানুষটা যেন হোঁদল-কুৎকুতের অভিনব এক সংস্করণ। রীতিমত একজন বাবুর স্বাভাবিক চেহারা ইহা নয়। ইহা বাবুগিরির মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যে হাস্যকর হইয়া গিয়াছে। বাবুটির মনের বিকার আরও প্রচণ্ড। কিন্তু তাহাতে হাসি পায় না, রাগই হয়। বস্তুতঃ সারা রাস্তা তাহার তামাক-সেবনের সহিত অবিশ্রান্ত গালিগালাজ আর অত্যাচার আমাদের মনও বিগড়াইয়া দেয়। মানুষটা ডাঙ্গায় উঠা পর্যন্ত অতিশয় কুৎসিত স্বার্থপর ও পরপীড়ক-রূপে পাঠকের মনে রীতিমতো জ্বালা ধরাইয়া দেয়। তখনও পর্যন্ত তাহার অসংখ্য অস্বাভাবিক আচরণ ও সজ্জার বিকার আমাদের হাসির পরিবর্তে প্রবল ঘৃণা ও ক্রোধেরই উদ্রেক করে।

আমরা জানি মানুষ চলায়-বলায়-চেহারায়-আচরণে যখনই অস্বাভাবিকতার একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তখনই সে সকলের কৌতুক-হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু একটা মতে হাসির আসরে আবেগের স্থান নাই। একথা যে সর্বৈব সত্য নয় তাহার চমৎকার প্রমাণ 'নতুন-দা'। নতুন-দার প্রতি

পাঠকমাত্রেরই একটা আবেগ আছে। তাহা ছাড়া এখানে আরও আবেগের খেলা আছে প্রচুর। তবু যে আমরা এই অদ্ভুত মানুষটাকে লইয়া পরম কৌতুকে হাসিতে পারিয়াছি তাহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যাইবে এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই কৌতুকরস-সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে আবেগের আরোহণ-অবরোহণ-লীলার অপূর্ব সংস্থানপটুতা।

প্রথমটায় দেখিলাম 'নতুন-দা'র প্রতি শ্রীকান্তের সহিত সকল পাঠকের মন একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই বাবু যখন ক্ষুধায় কাবু হইয়া উঠিয়াছে তখন একটু ভালই লাগে। ইহার পর যখন প্রকাশ্যে অকুতোভয় হৃষিপাড়ার বীরত্ব ফলাও করা সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিয়াছে, তখনও বেশ একটু রগড় লাগে। শ্রীকান্ত যে তাহার মনের ভাব বুঝিয়াও তাহাকে সঙ্গে নেয় নাই তাহাতে আমরা খুশী হই। কিন্তু এখনও আমাদের রাগ পড়ে নাই। কাজেই ঠিক ঠিক হাসাও চলে না।

খোট্টাদের বস্তিতে শ্রীকান্তদের ব্যর্থ অভিযানের ফাঁকে পাঠকের চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য ঐ বাবুর ক্রোধজনক শব্দ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সেই সুযোগে লেখক বিহারের গ্রামবাসীর নিরেট ঘুম বর্ণনা-প্রসঙ্গে একটু রসিকতা করিয়া পাঠকের মন হইতে বিরূপতার ভাব আর একটু লঘু করিয়া দিয়াছেন।

তারপর 'নতুন-দা'র অপ্রত্যাশিত অন্তর্ধান, অদূরে কুকুরের আর্তনাদ এবং সবার উপর বাবুর একপাটি পাম্প্-শু আবিষ্কারের কাহিনীটির মধ্যে আকস্মিকভাবে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে, আবেগের মোড় ফিরে। উৎকণ্ঠাময় নূতন একটা আবেগ আসিয়া জুড়িয়া বসে পাঠকের মনে। নতুন-দাকে বাঘে খাওয়ার সম্ভাবনায় ইন্দ্রনাথের বিপুল হতাশা আমাদের ব্যথিত করে। মাসিমার কাছে মুখ দেখাইতে তাহার অক্ষমতার কথার মধ্যে আমরা একটা আন্তরিকতার ও একটা স্বার্থলেশহীন চরিত্রের সন্ধান পাই। তাহার পর নিজের প্রাণকে পণ করিয়া তাহার সেই দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে পাই মহৎ পৌরুষ। শ্রীকান্তের সঙ্গে আমরাও তখন ইন্দ্রনাথের সামিল হই। অবশেষে নতুন-দাকে তাহারা উদ্ধার করায় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যায়। এতক্ষণে একটা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হওয়ামাত্র 'নতুন-দা' আমাদের নিকট নূতন রূপে দেখা দেয়। দেখা দেয় একটি কাঠের সিংহীরূপে। তাহার সকল আস্ফালন আরম্ভ শুনিতে বা ভাবিতেও তখন পরম কৌতুক বোধ হয়। ফিরিবার

পথেও যে সে বকিয়া যায় এবং বকিতে বকিতে যে জামাকাপড়ের জন্ত শোক ও গালমন্দ করে, তাহা আর কাহারও গায়ে লাগে না। আকণ্ঠ জল হইতে নিরাপদে উঠিয়াই বাবু যে পাম্প্-শুর জন্য খেদ করে তাহার চেয়ে হাস্তকর আর কি হইতে পারে? তাহার কণ্ঠে ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালার বিকৃত স্বর তখন স্মরণ করিতেও মজা লাগে। মজা লাগে ইন্দ্রের চাদর পরনে আর শ্রীকান্তের চাদর গায়ে তাহার আরেক মূর্তি কল্পনা করিতে। এমন অবস্থাতেও ঐ নির্লজ্জ কাপুরুষ মানুষটা যে স্বভাব ছাড়ে না, তাহাতে হাসি জমিয়া উঠে প্রচুর। এখন যেন তাহার সব অত্যাচারই সহ্য যায়। সে বাঘের পেটে যায় নাই—এত বড় যে একটা দয়া সে করিতে পারিয়াছে, তাহাতে শ্রীকান্তদের সঙ্গে সকল পাঠকই নিশ্চিন্তমনে তাহার সকল অস্বাভাবিক বচন ও আচরণ পরম আনন্দে উপভোগ করিতে পারে।

উপরের বিশ্লেষণ হইতে শরৎচন্দ্রের কৌতুকরস-সৃষ্টির কৌশলটি স্পষ্টই ধরা পড়ে; ইহার মধ্যে 'নতুন-দা'র চরিত্র ও সজ্জা, বচন ও আচরণ কৌতুকের স্থূল উপকরণগুলি জুটাইয়াছে। ঘটনাপরিকল্পনার নিপুণতায় ইহারা বিরুদ্ধ আবেগে জারিত হইয়া বিশুদ্ধ কৌতুকরসে পরিণত হইয়াছে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: যাচ্ছেতাই = যা + ইচ্ছা + তাই (বাংলা স্বরসন্ধি)।

সমাস: আগাগোড়া—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। হতভাগা—হত ভাগ অর্থাৎ ভাগ্য যাহার (বহুব্রীহি), সে। স্বার্থপর—স্ব অর্থাৎ নিজ অর্থ (কর্মধারয়); স্বার্থ পর অর্থাৎ প্রধান যাহার (বহুব্রীহি), সে। অসজ্জন—সৎজন (কর্মধারয়); নয় সজ্জন (নঞ্ তৎপুরুষ)। মনোগত—মনকে (মনঃ-কে) গত (২য়াতৎপুরুষ)। হাত-তালি—হাত দিয়া তালি (৩য়াতৎপুরুষ)। অতলস্পর্শী—তল স্পর্শ করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ); নয় তলস্পর্শী (নঞ্ তৎপুরুষ)। বহুভারাক্রান্ত—বহু ভার (কর্মধারয়); তাহার দ্বারা আক্রান্ত (৩য়াতৎপুরুষ)। কন্যাদায়গ্রস্ত—কন্যার দায় (কর্মধারয়) তাহার দ্বারা গ্রস্ত (৩য়াতৎপুরুষ)। মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে—মিথ্যা প্রতিজ্ঞা (সুপসুপা, বাংলামতে কর্মধারয়ও বলা যাইতে পারে); তজ্জনিত পাপ (মধ্য)

পদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। নিরর্থক—নিঃ (=নাই) অর্থ যাহার (নঞ্-বহুব্রীহি), তাহা (সমাসান্ত 'কপ্'যোগে)। অশ্রুতপূর্ব—পূর্বে শ্রুত (বাঙলামতে ৭মীতৎপুরুষ, সংস্কৃতমতে সুপ্‌সুপা) : নয় শ্রুতপূর্ব (নঞ্‌তৎপুরুষ)। অদৃষ্টপূর্ব—পূর্ববৎ। তুষারশীতল—তুষারের ন্যায় শীতল (উপমানকর্মধারয়)। আকণ্ঠ-নিমজ্জিত—কণ্ঠ পর্যন্ত আকণ্ঠ (অব্যয়ীভাব); আকণ্ঠ নিমজ্জিত (সুপ্‌ সুপা)।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : মাসতুত—মাসি+তুত (উচ্চারণে 'তুতো')। কালোপানা—কালো+পানা। একলা—এক+লা। নাকী—নাক+ঈ। মূর্ছিত—মূর্ছা+ইতচ্। কবলিত—কবল+ণিচ্ (নামধাতু) +ক্ত।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : অগ্নিশর্মা=অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন—এখানে 'জবাব দেওয়া'=উত্তর দেওয়া। এটি বাচ্যার্থে প্রয়োগ। কিন্তু বিশিষ্টার্থেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে; যথা—ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া জবাব দিয়া গেলেন (=বাঁচিবার কোনো আশা নাই, চিকিৎসার অতীত—এই কথা বলিয়া গেলেন)।

ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—এখানে 'কাঁটা দেওয়া'—রোমাঞ্চিত হওয়া লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠা।

জলের মত চোখে পড়িল—এখানে 'জলের মতো'=স্পষ্ট।

ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে—এখানে 'ফুলিয়া ঢোল হওয়া'=ফুলিয়া বৃহদায়তন বা ভারী হওয়া।

সঙ্গে-সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল—এখানে 'পড়িয়া যাওয়া'=স্তব্ধ হওয়া—বিশিষ্টার্থক। 'পড়া' ক্রিয়াটির এইরূপ আরও বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : দাম পড়া, ভাগে পড়া, আকাশ পড়া ইত্যাদি।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : জানোয়ারের মতো ব'সে থাকা হচ্ছে কেন ?—জানোয়ারের মতো ব'সে থাকছ কেন (বাচ্যান্তর) ?

ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায় তিনি জবাব দিলেন, "আমি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারব না।" (প্রত্যক্ষ উক্তি)—ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায় তিনি জবাব দিলেন যে তিনি দস্তানা খুলিয়া সেই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না (পরোক্ষ উক্তি)।

আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি (অস্তিবোধক) —আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে বেশী দেখি নাই (নেতিবাচক)।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তার জবাব দিলাম না (নেতিবাচক)—ইন্দ্র এবং আমি উভয়েই তাহাতে নিরুত্তর (বা, মৌনী) রহিলাম (অস্তিবোধক)।

ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। —ইন্দ্রের নিজেরও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জা ও ক্ষোভ হইয়াছিল ('ইন্দ্র'-কে সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহার করিয়া)। [উ. মা. ১৯৬০]

ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে (অস্তিবোধক)—ভাগ্যে এমন-সব নমুনা সবদা চোখে পড়ে না (নেতিবাচক)। [উ. মা. ১৯৬০]

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক (জটিল)—কিন্তু ভগবানেরও তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক (সরল)।

আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না—আমার আর কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাওয়া হবে না [বাচ্যান্তর (ভবিষ্যৎ দৃঢ়সঙ্কল্পবোধক)]।

বালির উপর দৌড়ানো যায় না—বালির উপর কেহ দৌড়াইতে পারে না (বাচ্যান্তর)। [উ. মা. ১৯৬০]

তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহন্নত করিতে হয় নাই (নেতিবাচক)—তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে সে রাত্রে আমাদিগকে যথেষ্ট মেহন্নত করিতে হইয়াছিল (নঞর্থ পরিহার করিয়া)।

হয়তো-বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না—হয়তো-বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারিব না (বাচ্যান্তর)।

এক কথায় প্রকাশ : বরফের মতো ঠাণ্ডা = তুষারশীতল।

ব্যাকরণগত টীকা : শীগ্‌গির—শীঘ্র > শীগ্‌গির : অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দের উদাহরণ।

ভিড়ি—দেশী শব্দ।

যাচ্ছেতাই (উ. মা. ১৯৬০)—সন্ধি দ্রষ্টব্য। লক্ষণীয় যে 'যা ইচ্ছা তাই' এবং 'যাচ্ছেতাই' অর্থের দিক্ দিয়া এক নয় ; যা ইচ্ছা তাই = যাহা খুশি তাহা, যাচ্ছেতাই = নিকৃষ্ট, কদর্য।

বস্তি-টস্তি, বুড়ি-টুড়ি—বর্ণধ্বনির বিকৃত অনুকরণমূলক শব্দদ্বৈতের উদাহরণ। অনুকারী অংশ (এক্ষেত্রে 'টস্তি' এবং 'টুড়ি') পূর্বাঙ্গের অর্থ কিছুটা সম্প্রসারিত করে (এখানে 'তজ্জাতীয় বস্তু' বুঝাইতেছে)। কোনো কোনো বৈয়াকরণ

এইরূপ ক্ষেত্রে 'ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্বসমাস' স্বীকার করেন। এইমত সঙ্গত নয়, কারণ সমাস ও শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক।

ব্যামো—মূল শব্দটি 'ব্যামোহ'; কিন্তু চলিত বাঙালায় উচ্চারণে হ-কারের লোপপ্রবণতার ফলে 'ব্যামো'। এইরূপ আরও উদাহরণ: ফলাহার>ফলার।

(ব্যাঘ্র-) কবলিত—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজ শব্দের উদাহরণ।

ইন্দ্রের খানি—'খানি' একটি নির্দেশবাচক প্রত্যয়। সাধারণতঃ নির্বিভক্তিক বিশেষ্যের সহিত ইহা যুক্ত হয়, ক্ষেত্রবিশেষে বিভক্তিযুক্ত সম্বন্ধপদের সহিতও খানি-র প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে ('ইন্দ্রের' ষষ্ঠ্যন্ত বিশেষ্য)। [মন্তব্য: 'খানি' যখন প্রত্যয়, তখন মূল শব্দের সহিত ইহা যুক্ত করিয়াই ছাপা উচিত ('ইন্দ্রেরখানি'); কিন্তু সংকলনে শব্দ এবং প্রত্যয়কে পৃথক্ করিয়া ছাপা হইয়াছে। ইহা উচিত হয় নাই বলিয়াই মনে করি। 'আমারটা', 'তোমারটা' প্রভৃতিতে 'টা'-কে যদি পৃথক্ না করা হয়, তবে 'খানি'-কেই বা পৃথক্ করা যায় কোন্ যুক্তিতে?]

বাক্য-রচনা: উদ্রেক: জলটুকু খাইবামাত্র রোগীর বমনের উদ্রেক হইল।

কথাপ্রসঙ্গে: কথাপ্রসঙ্গে অবনীশবাবু তাঁর বিলেতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন।

আদৌ: বর্ষাশেষে নদীটিতে আদৌ জল থাকে না।

ব্যাপকতা: তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাপকতাও যেমন, গভীরতাও তেমন।

রিক্তহস্ত: কন্যার বিবাহের পর দুর্গাদাসবাবু একেবারে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

নিরস্ত: ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতিজ্ঞা শূন্যগর্ভ আস্ফালন নয় বলিয়া, ভয় দেখাইয়াও তাহাকে নিরস্ত করা গেল না।

চলিত-ভাষায় রূপান্তর: কাহিনীটির বর্ণনা-অংশ সাধু-ভাষায় লিখিত বলিয়া ইহা হইতে যে কোন অংশ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে।

কৌরবসভায় কৃষ্ণ

রাজশেখর বসু

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

রাজশেখরবাবুর রীতিমত সাহিত্যচর্চা একটু অধিক বয়সেই আরম্ভ হয়। বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করিবার সময়ও অবশ্য বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা অন্যভাবে নিবেদন করেন। এইখানে হিসাব-পত্রে, বিভাগগুলির ও ঔষধপত্রের নামকরণে, বিজ্ঞাপন-রচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি বাঙলাভাষার সার্থক প্রবর্তন করেন। কাজেই রাজশেখরবাবুর দাবি: "বাল্যে কবিতারচনার কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ।" ইহা ছাড়া পার্শীবাগানে আরবিট্রারী ক্লাব বা উৎকেন্দ্র সঙ্ঘ নামে একটি সভায় রাজশেখরবাবু বাঙলার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যসেবীর সংস্পর্শে আসেন। অথবা এইখানেই বিখ্যাত অনেক সাহিত্যিক রাজশেখরের সংস্পর্শ ও শক্তির পরিচয় লাভ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎকেন্দ্র সভাতেই রাজশেখরবাবু তাঁহার বিখ্যাত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-নামক গল্পটি পাঠ করেন। গল্পটির অভিনবত্ব ও উৎকর্ষে মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন সুসাহিত্যিক জলধর সেন। তাঁহারই সনির্বন্ধতায় উহা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইল, 'পরশুরাম' ছদ্মনামে। রাজশেখরবাবু বলেন, এই ছদ্মনামটি জনৈক স্যাকরার প্রকৃত নাম। নেহাত খেয়ালবশেই নাকি তিনি এই নামটি নির্বাচন করেন। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশ পাইবার পর বাঙলার পাঠকসমাজ উহাকে বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করে এবং জলধরবাবুও পীড়াপীড়ি করিয়া রাজশেখরবাবুর নিকট হইতে নূতন নূতন লেখা আদায় করিতে থাকেন। এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও রাজশেখরবাবুর অপর একজন বিশেষ প্রেরণাদাতা। এইভাবে 'পরশুরাম' এক অভিনব রসসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ১৩৩২ সালে তাঁহার প্রথম গল্পসংগ্রহ 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হইল। সেই বৎসরই সবুজপত্রে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবং প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ উহার আলোচনা করেন। পরশুরামের খ্যাতি দেখিয়া আচার্য রায় ছদ্মনীতির ভাব জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথার মধ্যে একটি লেখেন এই—"আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের

এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" উত্তরকালে রাজশেখরবাবু এই কথার সত্যতা বিলক্ষণ প্রমাণ করিয়াছেন। গল্পকার হিসাবে তিনি পরশুরাম, কিন্তু অন্যত্র তিনি সত্যনামেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

রাজশেখরবাবু বহুকাল যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান-সংস্কার-সমিতির সভাপতিত্ব করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সমিতির সভাপতিও ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী পদক ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জগত্তারিণী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

সাহিত্যাদর্শ ও যুগবিচারে 'পরশুরাম' বা রাজশেখর বসুকে প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য ও 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্তর্গতই বলিতে হয়। তবে রচনাপদ্ধতিতে তিনি গতানুগতিক বা চৌধুরী মহাশয়ের পথ গ্রহণ না করিয়া মৌলিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অত্যন্ত সরলভাবে তিনি জীবনের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে অসঙ্গতিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। রাজশেখর বসুর হাস্যরসের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ নাই, মর্মভেদী জ্বালা নাই—আছে একটি প্রকৃত সহানুভূতিশীল নিপুণ জীবন-সমালোচনা। 'পরশুরাম' অপরকে ব্যঙ্গ করিতে বসেন নাই—তাহার জীবনের, মনের বা কার্যের অসামঞ্জস্যই দেখাইয়াছেন। রচনাভঙ্গির (Style) দিক দিয়া তিনি মোটামুটিভাবে কথ্যরীতি গ্রহণ করিলেও রচনার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ভাষার গাম্ভীর্য ও বেগ আনিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি প্রমথ চৌধুরীর ধারায় চলিয়াছেন। তবে চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় ভাষার ''মারপ্যাঁচ' তাঁহার রচনায় সুলভ নহে।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য কাহিনীটি রাজশেখরবাবুর মহাভারতের অনুবাদ হইতে সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কপট পাশায় পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির সপরিবারে বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করেন। ইহার পর পাণ্ডবদিগের রাজ্য ফিরিয়া পাওয়ার কথা। কিন্তু দুর্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হন। ইহাতে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠে। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় পাণ্ডবদিগের শান্তি-প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হন। গল্পটির বিষয়বস্তু কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণের দূতালিকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্য গল্পটির শীর্ষনাম 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ'। কৌরবসভায় কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করা কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং শিরোনাম যে খুব বিষয়সঙ্গত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

সমালোচনা—রাজশেখরবাবুকে আমরা সাধারণতঃ কৌতুকপ্রধান সাহিত্যের লেখকরূপেই জানি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা আরো ব্যাপক ও গভীর। মহাভারতের মূলানুগ অনুবাদ অনেক আছে। কিন্তু এইরকম উপভোগ্য এবং সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আজও হয় নাই বলা চলে। এই গল্পটির মধ্যেই আমরা এই নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। অনুবাদের সুর ইহার কোথাও নাই। সহজ মৌলিক রচনার গুণে ইহা সুমধুর। অথচ মূল মহাভারতের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণই ইহাতে আছে। পাণ্ডিত্যের সহিত সাহিত্য-প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে এইখানে।

কাহিনীটির ভাষা চলিত বলিতে হইবে। কিন্তু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে চলিতরূপ ছাড়া সর্বত্রই সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্যে ইহা সাধুভাষারই সামিল। বীরবলই (প্রমথ চৌধুরী) অবশ্য এই ধরনের চলিত ভাষার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথও এই ভাষায় লিখিয়াছেন। রাজশেখর এই ভঙ্গীকে নিজের সংযত সুন্দর ছাপটি দিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন।

বিষয়বস্তুর বিচারেও গল্পটির উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণের দৌত্য সুনিপুণ। শান্তির প্রস্তাব বিনীত প্রার্থনার আকারে তিনি রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে সাবধানবাণী, এমন কি একটা প্রচ্ছন্ন ধমকও আছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কোন্ কথা সহজে কার্যকরী হইবে কৃষ্ণ তাহা জানেন। অন্ধ পিতৃস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্তরেও অন্ধ। পুত্রের অধর্মকে তিনি প্রশ্রয় দিয়াই আসিয়াছেন। আরো প্রশ্রয় দিতেও হয়তো তিনি বাধ্য হইতেন, কিন্তু পুত্রের সমূহ বিনাশ-সম্ভাবনা তাঁহাকে বিচলিত করে। এইজন্য দুর্যোধনের প্রতি কৃষ্ণের কঠোর উক্তি সময়োচিত। দুর্যোধনের প্রত্যুত্তরও কূটবুদ্ধির পরিচয় দেয়। মোট কথা, এই গল্পে সমগ্র সংলাপের মধ্যেই একটি নাটকীয় গুণ রহিয়াছে। গান্ধারীর উক্তিই বোধ হয় এই গল্পে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। তাঁহার নিরপেক্ষ বিচার, প্রগাঢ় নীতিবোধ এবং পুত্রের প্রতি সারগর্ভ উপদেশ—স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্বকালের সর্বজনের চিত্ত সমৃদ্ধ করে। অথচ তিক্ত নীতি কথা বলিয়াই উহা কটু লাগে না—গল্পের কাঠামোর মধ্যে এই নীতি শিক্ষা এমনই একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য মূল মহাভারতেরই গৌরব। রাজশেখরবাবু যে সে গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

সংক্ষিপ্তসার—একদিন কৌরবসভায় কৃষ্ণ জলদগম্ভীর কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন যে তিনি কুরুপাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্ত এই শ্রেষ্ঠ রাজবংশে কোনো অন্যায় আচরণ হওয়া অনুচিত। তাঁহার দুর্যোধনাদি লোভী ও ধর্মহীন পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া কৌরবকুলের ঘোর বিপদ্ ডাকিয়া আনিতেছে। ধৃতরাষ্ট্র যদি পুত্রদের শাসন করিয়া সন্ধির চেষ্টা করেন, তবে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। মহাবীর পাণ্ডবগণকে স্বপক্ষে আনিতে পারিলে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার দুঃসাহস দেবগণেরও হইবে না—তিনি হইবেন পৃথিবীতে অজেয় রাজা। যুদ্ধে নিজপুত্র অথবা পাণ্ডবদের মৃত্যু হইলে তাঁহার কোনোই সুখ হইবে না। যুদ্ধ হইলে, যে সকল রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সৈন্য ধ্বংস করিবেন। ইহাতে প্রজাদের সর্বনাশ হইবে। ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘটিতে না দিলে এই রাজগণ শান্তভাবে এবং সানন্দে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাতা ও পালক পিতা। পাণ্ডবগণেরও এই মত যে, তাঁহারা যেমন বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্রও তেমন তাঁহাদিগকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ দিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন এবং পিতার কর্তব্য পালন করুন। তিনি যেন অন্যায় ও অধর্মের প্রশ্রয় না দিয়া সকলকে সৎপথে আনেন এবং নিজেও সৎপথে চলেন।

তারপর কৃষ্ণ সভাস্থ সকল রাজার সমর্থন চাহিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন ক্রোধের বশীভূত না হইতে। তাঁহার মতে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সর্বদা সদাচরণ করিয়াছেন, কখনো অবাধ্য হইয়া তাঁহার অসম্মান করেন নাই। নানারূপ দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নাই। পাণ্ডবগণ এখনো ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতে প্রস্তুত, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত। ধৃতরাষ্ট্র যাহা ভালো মনে করেন তাহাই করিতে পারেন।

উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের সব কথাই ধর্মসঙ্গত ও ন্যায় বলিয়া সমর্থন করিলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়, কারণ তাঁহার দুরাত্মা পুত্রগণ শুধু তাঁহারই নয়, সকল গুরুজনেরই অবাধ্য। অতএব কৃষ্ণই যেন দুর্যোধনকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

কৃষ্ণ মিষ্টকথায় দুর্যোধনের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পিতামাতার বাধ্য হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বক্তব্য—গুরুজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথায় যে কর্ণপাত করে না, সে ঘোর বিপদে পড়ে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সহিত দুর্ব্যবহার করিলেও তাঁহারা সব নীরবে সহ্য করিয়াছেন। তিনি যাঁহাদের সহায়তায় রাজৈশ্বর্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি

অর্জুনকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। যে অর্জুন দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ সকলকেই জয় করিয়াছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহার সহায়, তাঁহাকে পরাস্ত করিবার আশা দুরাশা। তাহার চেয়ে দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ এবং তাঁহাকে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে কৃষ্ণের পরামর্শ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। ইহা মানিলে সবদিক রক্ষা হইবে, অন্যথায় দুর্যোধনের পরাজয় সুনিশ্চিত। ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনকে যুদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতার অবসান ঘটাইবার উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহাকে মিলিত দেখিলে সমাগত সকল রাজা আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন।

দুর্যোধন বলিলেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী বলিয়া কেবল দুর্যোধনেরই নিন্দা করিতেছেন, পাণ্ডবদের দোষ দেখিতেছেন না। বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ—ইঁহারাও একই ভুল করিতেছেন। কিন্তু অনেক ভাবিয়াও তিনি নিজের কোনো দোষ দেখিতে পাইতেছেন না। পাণ্ডবগণ প্রথমবারে দ্যূতক্রীড়ায় হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বারে বনবাসে গিয়াছিলেন নিজেদেরই দোষে। তথাপি তাঁহারা কৌরবগণকে নির্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের আস্ফালনে দুর্যোধন ভীত হইবেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি যে পক্ষে রহিয়াছেন, সে পক্ষ যুদ্ধে দেবতাদেরও অপরাজেয়। আর শত্রুর নিকট নতি স্বীকার না করিয়া যদি যুদ্ধে বীরোচিত মৃত্যু বরণ করিতে হয়, তাহাতেও দুঃখের কিছু নাই। অতএব ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের যে অংশ পাণ্ডবদিগকে দিবার কথা পূর্বে বলিয়াছিলেন তাহা তো দূরের কথা, সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও দুর্যোধন ছাড়িবেন না।

কৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন যে দুর্যোধন এবং তাঁহার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করিবে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া দ্যূতসভার আয়োজন, সভায় ভ্রাতৃবধূর অপমান ও লাঞ্ছনা, বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা—সবই দুর্যোধনের অপরাধ। রাজ্যের অংশে পাণ্ডবদের ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষা করিলে পরিণামে দুর্যোধনকে সবই হারাইতে হইবে।

দুঃশাসন তখন দুর্যোধনকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ সেরূপ না করিলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের দুই ভাই ও কর্ণকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদের হাতে সমর্পণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া ক্রোধে ফুঁসিতে ফুঁসিতে দুর্যোধন

সভা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা এবং সমর্থকগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হইয়া বিদুরকে দিয়া গান্ধারীকে ডাকাইলেন এবং গান্ধারী আসিলে জানাইলেন যে তাঁহার দুর্বিনীত পুত্র দুর্যোধন প্রভুত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই হারাইতে বসিয়াছে, হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অশিষ্টের ন্যায় সভাস্থল ত্যাগ করিয়াছে।

গান্ধারী বলিলেন, অবিনীত ও অধার্মিক লোকের রাজ্যপ্রাপ্তি অনুচিত হইলেও দুর্যোধন পাইয়াছে এবং ইহার মূলে রহিয়াছে ধৃতরাষ্ট্রেরই স্নেহান্ধতা। দুর্বুদ্ধি লোভী পুত্রকে রাজ্য দেওয়ার ফল এখন ভোগ করিতেই হইবে।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর আবার দুর্যোধনকে সভায় আনিলেন। গান্ধারী বলিলেন, দুর্যোধনের উচিত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনদের উপদেশ মানিয়া লওয়া। রাজত্ব দুরাত্মাদের জন্য নয়। ক্রোধের বশে যে আত্মীয়দের সহিত দুর্ব্যবহার করে, কেহ তাহার সহায় হয় না। মহাবীর মহাজ্ঞানী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া চলিলে দুর্যোধন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিবেন। সত্যই কৃষ্ণার্জুন অজেয়। কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি দুইপক্ষেরই মঙ্গল করিবেন। যুদ্ধে অনিষ্ট ছাড়া কোনো ইষ্ট হয় না। তেরো বৎসর ধরিয়া দুর্যোধন পাণ্ডবদের যে অপকার করিয়াছেন, এখন তাহার উপশম করা উচিত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণের দুইপক্ষেরই সহিত স্নেহসম্বন্ধ থাকায় যুদ্ধে তাঁহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন না, ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে শত্রুরূপে দেখিতেও পারিবেন না। অপরিমিত লোভ ত্যাগ না করিলে দুর্যোধন সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবেন না।

মাতার কথায় উপেক্ষা দেখাইয়া দুর্যোধন সক্রোধে শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের নিকট চলিয়া গেলেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। **নিদাঘান্তে**—গ্রীষ্মশেষে ; গ্রীষ্মাবসানে। **মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর-কণ্ঠে**—মেঘমন্দ্রস্বরে (এক কথা)। **কৃষ্ণ**—বসুদেব ও দেবকীর পুত্র এবং মথুরার অধিপতি। ইনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত। ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। বিশেষতঃ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের গুণে মুগ্ধ

হইয়া ইনি তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করেন। **ধৃতরাষ্ট্র**—দুর্যোধনাদি শতপুত্রের পিতা হস্তিনাপুরের অন্ধ নরপতি। **ভারতনন্দন**—ভরতবংশের সন্তান। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত কুরুপাণ্ডবগণের একজন খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ। ইঁহার নাম অনুসারেই এই দেশের নাম হয় 'ভারতবর্ষ'। **আপনার নিমিত্ত**—আপনার বা আপনার আত্মীয় কাহারও স্বার্থরক্ষার জন্য। **দুর্যোধন**—ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। **অশিষ্ট**—অভদ্র। **মর্যাদাজ্ঞানশূন্য**—কোন্ বিষয়ে কতদূর যাইতে হইবে তাহার জ্ঞান যাহাদের নাই। **মর্যাদা**—সীমা। অথবা, সম্মানবোধহীন, কাহাকে কিরূপ সম্মান দেখানো উচিত তাহা যাহাদের জানা নাই। **নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের**—অর্থাৎ ভ্রাতা পাণ্ডবদের। **নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন**—তাঁহাদের সসম্মানে বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত সম্পত্তিও দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। **পৃথিবী**—সমগ্র কুরুরাজ্য। **ভীষ্ম**—শান্তনুনন্দন সত্যসন্ধ মহাবীর। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। **দ্রোণ**—কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রগুরু। ইনিও কৌরবপক্ষে ছিলেন। **কৃপ**—শরদ্বান্ মুনির পুত্র। মহারাজ শান্তনুর কৃপায় পালিত হন বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হয়। ইনি ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে কৌরবপক্ষে থাকিয়া সাধ্যমতো যুদ্ধ করেন। **কর্ণ**—কুন্তীর কন্যাকালের পুত্র। দুর্যোধন ইঁহাকে অঙ্গদেশের রাজা করিয়া দেন। কৌরবপক্ষের প্রধান বীরগণের অন্যতম ইনি। **সাত্যকি**—যদুবংশীয় সত্যক নামে কোনো ব্যক্তির পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন। অর্জুনের নিকট ইনি অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। ইনি পাণ্ডবদের পক্ষে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রসমরে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। ইনি কৃষ্ণের সারথিও ছিলেন। ইঁহার অপর নাম 'যুযুধান'। **দুর্বুদ্ধি**—মূর্খ। **এই প্রজাবর্গকে**—যে সকল প্রজা সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবে তাহাদিগকে। **প্রকৃতিস্থ**—স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত। **সুহৃৎ**—বন্ধু। **মহাভয় থেকে**—সর্বনাশ হইতে **পিতৃহীন পাণ্ডবগণ ইত্যাদি**—পাণ্ডুর বনবাসকালে বনেই তাঁহার পাচ পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে এই পিতৃহীন পুত্রগণের লালনপালনের ভার ধৃতরাষ্ট্র গ্রহণ করেন। **আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ইত্যাদি**—শকুনির চক্রান্তে দ্বিতীয়বার কপট পাশাখেলায় হারিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ছাড়িয়া বারো বৎসর বনবাস এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিতে হইয়াছিল। **তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি**—যে চুক্তি করিয়া যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার পাশাখেলায় সম্মত

হইয়াছিলেন, হারিয়া যাইবার পর তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। **পিতা**—পালনকর্তা। **আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন**—বারো বৎসর বনবাস এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিলে রাজ্যের ন্যায্য অংশ পাণ্ডবগণকে দেওয়া হইবে, ইহাই ছিল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি। **বিপথে**—অর্থাৎ ভ্রাতৃবিরোধ ও যুদ্ধের পথে। **নিজেও সৎপথে থাকুন**—স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই অধর্মের পথে চলিতেছিলেন ; তাই তাঁহাদের অনুরোধ।

অ. ২। মহীপাল—রাজা। অর্থকর—অর্থযুক্ত। মৃত্যুপাশ—মৃত্যুর বন্ধন। যুদ্ধ হইলে ক্ষত্রিয়গণকে দলে দলে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। **অজাতশত্রু**—যাঁহার শত্রু জন্মে নাই। **জতুগৃহদাহ**—পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বারণাবতে জতু অর্থাৎ লাক্ষা দিয়া একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে পাণ্ডবগণ সেখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অবশেষে ধর্মাত্মা বিদুরের পরামর্শে তাঁহারা দুর্যোধনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহ হইতে নদীতীর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং একদিন গভীর রাত্রিতে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সুড়ঙ্গপথে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এই ঘটনাই মহাভারতে 'জতুগৃহদাহ' নামে খ্যাত। **জতুগৃহদাহের পর তিনি আপনার আশ্রয়েই** ইত্যাদি—পাণ্ডবদের হস্তিনায় ফিরিয়া আসা জতুগৃহদাহের অব্যবহিত পরেই হয় নাই ; এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে হিড়িম্ব-বধ, বকরাক্ষস-বধ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি অনেক ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। অবশেষে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সৎপরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে অর্ধেক রাজ্য গ্রহণ ক'রতে আহ্বান করায় তাঁহারা হস্তিনায় আসিয়াছেন। **আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন**—ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, দুর্যোধনের নিকট হইতে দূরে থাকিলে গোলযোগের কোনোই সম্ভাবনা থাকিবে না। **তিনি সকল রাজাকে বশে এনে** ইত্যাদি—যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ করিতে হইলে পৃথিবীর সকল রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিতে হয়। কেহ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কর আদায় করিতে হয়। যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রেরই শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মান ক্ষুণ্ণ করেন নাই। **শকুনি কপট দ্যূতে** ইত্যাদি—ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের

শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া দুর্যোধনের ঈর্ষা জাগে। তিনি মাতুল শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশায় হারাইয়া দিয়া তাঁহার সর্বস্ব অধিকার করিতে মনস্থ করেন। নির্দিষ্ট দিনে খেলা আরম্ভ হয়। একদিকে যুধিষ্ঠির অন্যদিকে দুর্যোধনের হইয়া শকুনি। শকুনির চালে যুধিষ্ঠির একে একে দাস-দাসী, ধন-দৌলত, রাজ্যসম্পদ, এমন কি শেষে দ্রৌপদীকে পর্যন্ত হারাইলেন। **দ্রৌপদীর নিগ্রহ**—পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইলে, দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'দাসী' 'দাসী' বলিয়া টানিতে টানিতে রাজসভায় লইয়া আসেন এবং গুরুজনদের সম্মুখেই তাঁহাকে বিবস্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। বিপদ্‌ভঞ্জন, লজ্জানিবারণ শ্রীকৃষ্ণ সেদিন অদ্ভুত উপায়ে দ্রৌপদীর লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা করেন। ক্রোধে, দুঃখে ও অপমানে ভীম ও অর্জুন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। একবার যুধিষ্ঠিরের আদেশ পাইলে তাঁহারা এই কৌরব বর্বরগণকে উচিত শিক্ষা দিয়া দেন। কিন্তু পরমসহিষ্ণু ও ধর্মশীল যুধিষ্ঠিরের নিকট সে আদেশ পাওয়া গেল না। ইহাতে দুর্যোধনের সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি নিজের নগ্ন উরু দেখাইয়া দ্রৌপদীকে অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

অ. ৩। আমি স্বাধীন নই—আমার ইচ্ছায়ই যে সব হইবে এমন নহে। **গান্ধারী**—ধৃতরাষ্ট্রের পরম ধর্মশীলা পত্নী। **বিদুর**—ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইনি পরম ধার্মিক ও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

অ. ৪। **মহাপ্রাজ্ঞ বংশে**—যে বংশে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশে। সর্বগুণান্বিত—সকল গুণে ভূষিত। **বশবর্তী** আজ্ঞাবহ; বাধ্য। **হীন মন্ত্রণাদাতাদের মতে**—অর্থাৎ বিশেষ করিয়া শকুনির মতে। **পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন**—যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলে তাঁহারা চারি ভ্রাতা মগধ, চেদী, পাঞ্চাল, কোশল, অযোধ্যা, কুলিন্দ, কালকূট, মদ্র, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি বহু রাজ্য জয় করিয়া যজ্ঞের জন্য কর এবং নানা উপকরণ আনিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির একে একে সর্বস্ব হারান। **ধনঞ্জয়**—অর্জুনের এক নাম। ইনি বহু জনপদ জয় করিয়া অপরিমেয় ধনরত্ন লাভ করিয়াছেন বলিয়া এই নাম পাইয়াছেন। মহাভারতের অর্জুন নিজেই এই নামের ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

"জিত্বা জনপদান্ সর্বান্ বিত্তমাদায় কেবলম্।
মধ্যে ধনস্য বসামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্॥"

খাণ্ডবপ্রস্থ—ইন্দ্রপ্রস্থের এক নাম। **খাণ্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব ইত্যাদি**—অর্জুন খাণ্ডববন দহন করিতে উদ্যত হইলে সেই বনের রক্ষক তক্ষক এবং তাঁহার বন্ধু ইন্দ্র তাহাতে বাধা দেন, কিন্তু একক অর্জুন সকলকে পরাস্ত করেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন এবং 'ময়' নামে এক দানব ব্যতীত বনবাসী যক্ষ-রক্ষ কেহই অব্যাহতি পাইল না। **বিরাটনগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ** ইত্যাদি—একবৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং দ্রৌপদীকে লইয়া বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত হন এবং উর্বশীর শাপে নপুংসকভাবে সেখানে বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া বিরাট-রাজের কন্যা উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিরাটরাজের গোধন হরণ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন সসৈন্যে উত্তর গোগৃহে আসিলে তিনি রাজপুত্র উত্তরের সারথিরূপে যুদ্ধে গমন করেন। কুরুসৈন্য দেখিয়া উত্তর ভীত হইলে অর্জুন স্বয়ং একাকী যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতিকে পরাস্ত করেন এবং গোধন মোচন করেন। এই যুদ্ধে অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রমের প্রতি কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিতেছেন। **যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন**—দিব্যাস্ত্র লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের পরামর্শে অর্জুন মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করেন। চারিমাস কঠোর তপস্যার পর মহাদেব কিরাতের বেশে অর্জুনকে দেখা দিলেন। একটা শিকার লইয়া এই কিরাত আর অর্জুনে মহা যুদ্ধ বাধিল। অর্জুন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে পরাস্ত হইলেন। তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব নিজ পরিচয় দিলেন এবং তাহাকে 'পাশুপত' নামে এক ভয়ংকর অস্ত্র প্রদান করিলেন। **নষ্টকীর্তি**—যাহার কীর্তি লোপ পাইয়াছে। **কুলঘ্ন**—বংশনাশকারী।

অ. ৫। অলব্ধ—যাহা লাভ করা হয় নাই। পরাভূত—পরাজিত। দক্ষিণ বাহু—ডান হাত। **দক্ষিণ বাহু তোমার স্কন্ধে রাখুন**—অর্থাৎ তোমার সকল দোষ ভুলিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করুন। আনন্দাশ্রু মোচন করুন—আনন্দে চোখের জল ফেলুন।

অ. ৬। পিতামহ—ভীষ্ম। দ্যূতক্রীড়া—পাশাখেলা। **শকুনি**—দুর্যোধনের মাতুল ও প্রধান পরামর্শদাতা মন্ত্রী। বীরশয্যা লাভ করি—বীরোচিত মৃত্যুবরণ করি; সম্মুখযুদ্ধে নিহত হই। কেশব—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। **আমার পিতা পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ** ইত্যাদি—দ্বিতীয়বার পাশাখেলায় পণ ছিল রাজ্যত্যাগ করিয়া দ্বাদশবৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস। ধৃতরাষ্ট্র

প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই তেরো বৎসর পরে পাণ্ডবগণ রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন। **সূচী**—ছুঁচ। **তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে** ইত্যাদি—তুলনীয়: 'সূচ্যগ্র প্রমিতাং ভূমিং ন দাস্যামি রণং বিনা'।

অ. ৭। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ইত্যাদি—প্রথমবার পাশাখেলার আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের সর্বস্ব গ্রাস করা। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখিয়া দুর্যোধন হিংসায় জ্বলিতেছিলেন। **ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে** ইত্যাদি—দ্বিতীয়বারের পাশাখেলায় সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতি ইঙ্গিত। **জায়া**—স্ত্রী, বধূ। **বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে** ইত্যাদি—জতুগৃহদাহের প্রতি ইঙ্গিত। **ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত**—রাজ্যচ্যুত ও নিহত।

অ. ৮। মহানাগের ন্যায়—প্রকাণ্ড সাপের মতো।

অ. ৯। দূরদর্শিনী—যিনি দূর ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা আগে হইতেই বুঝিতে পারেন।

অ. ১০। অবিনীত—উদ্ধত। স্নেহবশে—পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া। মূঢ়—মোহান্ধ, মূর্খ।

অ. ১১-১২। রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব—রাজত্ব কেবল সিংহাসন এবং ভোগবিলাস নয়, ইহার গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। **মহাপ্রাজ্ঞ**—মহাজ্ঞানী। **পৃথিবী**—(এখানে) রাজ্য। **তোমার কামনা আর ক্রোধের** ইত্যাদি—তোমার অপরিমেয় রাজ্যলিপ্সা এবং পাণ্ডবদের প্রতি শত্রুতার ফলে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্গতি আরো বাড়িয়া গিয়াছে। **অনাদর**—উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য।

ব্যাখ্যা

(১) যে সভায় অধর্ম ধর্মকে……বিনষ্ট হন। (অ. ১)

এই মন্তব্যটি রাজশেখর বসুর 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ'-নামক মহাভারতের উপাখ্যানের অন্তর্গত। পাণ্ডবদিগের দূতরূপে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সভায় এই উক্তি করেন।

দীর্ঘ বনবাসের পর পাণ্ডবগণ নিজেদের রাজ্য ফিরিয়া পাইতে চাহিলেন। দুর্যোধন তাহাতে অসম্মত হইলে দুইপক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ হইতে শেষবারের মতো কৌরবদিগের সুবুদ্ধির প্রতি আবেদন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার সভাসদগণকে তিনি পাণ্ডবদের ন্যায্য দাবি ও শান্তিকামনা বিশদভাবে জ্ঞাপন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ভ্রাতা। তাঁহাদের মধ্যে এই কলহ-সংঘাত বাঞ্ছনীয় নয়। বস্তুতঃ উহার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ অসৎ পথ। ধৃতরাষ্ট্র উভয়পক্ষের পিতৃতুল্য। অতএব তাঁহার একান্ত কর্তব্য এই যুদ্ধের কারণগুলি দূর করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করা। ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদগণ এই বিষয়ে সুপরামর্শ দিবেন—ইহাই পাণ্ডবদিগের বিনীত নিবেদন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে একটি চরম জাগতিক সত্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। সভাসদগণের কাজ রাজাকে অধর্ম ও অসত্যকে দমন করার পরামর্শ দেওয়া। নিরপেক্ষ দর্শকের মতো অধর্মের অত্যাচার আর অসত্যের প্রাদুর্ভাব মুখ বুজিয়া সহ্য করা তাঁহাদের পক্ষেও মারাত্মক, কেননা, অন্যায় করা আর অন্যায়কে এইভাবে প্রশ্রয় দেওয়া সমান দোষের। আর সেই দোষের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস। উপস্থিত ক্ষেত্রে দুর্যোধন যে অন্যায় করিতেছেন তাহাতে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য এবং ফলে কুরুকুলসহ সভাসদগণেরও সমূহ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই সাবধানবাণীটুকু উদ্ধৃত নীতির উচ্চারণে এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

(২) শুনেছি বিরাটনগরে……উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ। (অ. ৪)

রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ'-শীর্ষক মহাভারতের উপাখ্যানটি হইতে এই উক্তিটি উদ্ধৃত। অর্জুনের দুর্জয় পরাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এই উক্তি করেন।

দীর্ঘকাল বনবাসভোগ করার পর পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না। এই লইয়া কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে মহাযুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন কুরুসভায় পাণ্ডবদিগের শেষ আবেদন লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার সভাসদগণের নিকট অনুরোধ করিলেন। দুর্যোধনকে অনর্থক শক্তিদম্ভ পরিহার করিয়া শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন। দুর্যোধনের পক্ষে অন্যায় তো ছিলই, তাহা ছাড়া জয়ের আশাও ছিল তাঁহার একেবারে মিথ্যা। কারণ একা অর্জুনের সমকক্ষ বীর কুরুকুলে কেহ ছিল না। খাণ্ডবপ্রস্থে একবার দেবতা ও গান্ধর্বদিগের সহিত অর্জুন একা যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। দেবতারাও যাঁহার নিকট পরাজিত, মানুষ তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না তাহা তো অতিশয় সহজ অনুমান। শ্রীকৃষ্ণ এই

উক্তির সমর্থনে আর একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিলেন। পাণ্ডবগণ একবৎসর অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজের গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় বিরাটরাজের গোসম্পদ্ অপহরণের জন্য দুর্যোধন প্রয়াসী হন। এই লইয়া যুদ্ধ বাধে। অর্জুন তখন ছদ্মবেশে বৃহন্নলা নামে বিরাটরাজের আশ্রিত। তিনি সেই বেশেই দুর্যোধন ও সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। কৃষ্ণ এখানে বহুজনের সহিত একজনের এই আশ্চর্য যুদ্ধের কথাই বলিতেছেন। বলিতেছেন যে অর্জুন শুধু দেবতা ও গন্ধর্বকেই নহে, স্বয়ং ও সসৈন্যে দুর্যোধনকেও একা পরাস্ত করিয়া তাঁহার অজেয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই অবস্থায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। ইহা বুঝিয়া দুর্যোধন মানে মানে শান্তিস্থাপন করুন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মর্ম।

(৬) উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে……নত হয় না। (অ. ৬)

এই অংশটি রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ' শীর্ষক মহাভারতের কাহিনীর অন্তর্গত। ইহা কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের সদম্ভ উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। দুর্যোধন যে অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদিগের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে চাহেন এবং এই কারণে একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন, তাহার পরিণাম ভয়ংকর। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পরাক্রম স্মরণ করাইয়া দিলেন, যুদ্ধে কুরুকুলের সমূহ বিনাশ-সম্ভাবনা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাহাতে প্রশমিত হইলেন না। উপদেশ মূর্খের নিকট ক্রোধের কারণই হয়; মদান্ধ দুর্যোধনের পক্ষেও তাহাই হইল। তিনি নিজের কাজ সুকৌশলে সমর্থন করিলেন। পাণ্ডবগণ সাধ করিয়া পাশা খেলিয়াছিলেন এবং ফলে বনবাস বরণ করিয়াছেন। ইহার জন্য দুর্যোধন নিজেকে নিরপরাধ মনে করেন। কিন্তু নির্দিষ্টকাল বনবাসের পরে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়া পাওয়ার কথা। দুর্যোধন সে কথা এড়াইয়া গিয়া কৃষ্ণের সাবধানবাণীর কদর্থ করিলেন। এই কড়া কথা ও ভয়ংকর সংগ্রামকে তিনি ভয় পান না। এইসব যেন প্রচ্ছন্ন ধমক এবং ইহাতে নতি-স্বীকার করিতে যেন বীর দুর্যোধন অপমানিত বোধ করেন। পাণ্ডবগণ দূরে থাকুক, স্বয়ং ইন্দ্রও যদি এই ধরনের কড়া কথায় ও তীব্র আক্রমণাদির ধমকে তাঁহাকে বশীভূত করিতে চাহেন, তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইরূপে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সকল মীমাংসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুরাত্মার যে ছলের অভাব হয় না, এই কথা তাহারই প্রমাণ।

(৪) মহারাজ, তুমিই দোষী,……ফল ভোগ করছ। (অ. ১০)

এই অংশটি রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ' নামক কাহিনীর অন্তর্গত। ইহা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর উক্তি। পাণ্ডবদিগের সহিত অন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য কৃষ্ণের অনুরোধ ও সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়া দুর্যোধন ক্রোধভরে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তাঁহার এই দুর্বিনীত আচরণ এবং আসন্ন সর্বনাশে শঙ্কিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে ডাকিয়া পাঠান দুর্যোধনকে অনুরোধ করিবার জন্য।

গান্ধারী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অনুযোগ দিলেন। দুর্যোধন অভদ্র, উদ্ধত ও ধর্মদ্রোহী ধৃতরাষ্ট্র একথা বিলক্ষণ জানিতেন। তবু পুত্রস্নেহে বিবেকরহিত হইয়া সেই দুর্যোধনকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি দুর্যোধনকে সর্বদা প্রশ্রয় দিয়াই আসিয়াছেন। 'দুর্যোধন মূর্খ ও নীতিজ্ঞানহীন দুরাত্মা, তাঁহার সঙ্গিগণ সকলেই দুষ্ট'—একথা ধৃতরাষ্ট্রের জানা ছিল। অন্যায় অবিচার আর পাপের দিকেই ছিল দুর্যোধনের মতি। এই সকল পাপের ফল, বিনাশ—ইহা মূর্খ দুর্যোধন না বুঝিতে পারেন, ধৃতরাষ্ট্রের বুঝা উচিত ছিল। বস্তুতঃ ধৃতরাষ্ট্র সব বুঝিয়াও পুত্রের মতেই মত দিয়া চলিতেন। ইহাতেই দুর্যোধন আশ্রয়পুষ্ট হইয়া এমন দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র আজ সে পুত্রের তথা স্ববংশের সমূহ বিনাশ-সম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন পুত্রের অভদ্র উদ্ধত আচরণে তিনি ক্ষুব্ধবোধ করিতেছেন —ইহা তাঁহার নিজের দোষেরই ফল। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে সেই অন্যায় একদিন প্রশ্রয়দাতাকেও রেহাই দেয় না। ধৃতরাষ্ট্রেরও হইল তাহাই। তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য ও যাতনার বীজ তিনি স্বহস্তে দুর্যোধনের মধ্যে উপ্ত ও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তাহারই বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

(৫) রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব……সহায় হয় না। (অ. ১১)

এই অংশটি রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ'-নামক মহাভারতের কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। ইহা দুর্যোধনের প্রতি গান্ধারীর উপদেশ।

কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরকে হারাইয়া দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে তেরো বৎসরের জন্য নির্বাসিত করিয়াছিলেন। এই তের বৎসর পরেও তিনি পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে সম্মত হইলেন না। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কৃষ্ণাদি সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্যোধন কেবল বল প্রয়োগে পাণ্ডবরাজ্য গ্রাস করিয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর। গান্ধারী দুর্যোধনকে এই

অন্যায় জেদ ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি প্রকৃত রাজমহিমা কি তাহাই বুঝাইয়াছেন। রাজার শক্তি মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, বর্বর পশুশক্তির দ্বারা সেই রাজগৌরব পাওয়া যায় না, তাহার দ্বারা রাজপদেও বেশিদিন অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি রাজার প্রভুত্ব শক্তিপ্রয়োগে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু পারে না। কারণ, এই শক্তিও বহু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার মধ্যেই নিহিত। অতএব বহুজনের অন্তর জয় করিবার মতো মহত্ত্ব থাকা চাই। কেবল নিজের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা আর দুর্নিবার লোভের বশে চলিলে অন্যে কেন সহায় হইবে? তাহার উপর এইরূপ লোভপরায়ণ মদান্ধ রাজা স্বজন ও সাধারণের উপর যদি অন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তাঁহার ভরাডুবি হইতে বিলম্ব হয় না। দুর্যোধনকে গান্ধারী তাই সকলের সুপরামর্শ লইতে উপদেশ দিতেছেন। দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সৎপথে পাণ্ডবদিগের সহিত মীমাংসা করাই তাঁহার একান্ত কর্তব্য। গান্ধারীর বক্তব্যের ইহাই মুখ্য লক্ষ্য।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। "ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।"—(ক) এখানে বক্তা কে? ভরতনন্দন বলিতে কাহাকে বুঝাইতেছে? (খ) কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে এই শান্তির প্রার্থনা কখন প্রয়োজন হইয়াছে? (গ) উক্ত প্রার্থনাটি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উ.। (ক) এখানে বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং 'ভরতনন্দন' রাজা ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর। এইজন্য তাঁহাকে ভরতনন্দন বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

(খ) শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যখন এই প্রার্থনা স্থাপন করেন তখন কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে একটা ঘোর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। দুর্যোধন শকুনির সহায়তায় যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশায় পরাস্ত করিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্বাসিত করেন। দীর্ঘ তেরো বৎসর নির্বাসন ভোগ করার পর পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য ন্যায্যভাবেই ফিরিয়া পাইতে চাহেন। দুর্যোধন তাহাতে সম্মত হন না। ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। এইভাবে কৌরব ও

পাণ্ডবদিগের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঠিক সেই সময়েই শান্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই প্রার্থনার প্রয়োজন ঘটে।

(গ) সংক্ষিপ্তসারের প্রথমাংশ দেখ।

প্র. ১। "আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের সৎপথে আনুন, নিজেও সৎপথে থাকুন।"—(ক) কাহাদের এই উক্তি, কখন, কি প্রসঙ্গে এবং কিরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। (খ) উল্লিখিত 'বিপথ'টি কি এবং কি অর্থে তাহা 'বিপথ'? কি কি ঘটনা ও কারণে বক্তাগণ সেই পথে চালিত হইতেছেন? (গ) 'পিতা' বলিতে এখানে কাহাকে বুঝায়? কি অর্থে তিনি বক্তাগণের পিতা এবং কেমন করিয়া তিনি সকলকে সৎপথে আনিতে এবং নিজেও সৎপথে থাকিতে পারেন?

উ.। (ক) এই উক্তিটি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাণ্ডবদিগের আবেদন। তেরো বৎসর নির্বাসনের পর দুর্যোধন যখন তাঁহাদের হৃতরাজ্য ফিরাইয়া দিতে অসম্মত হন, তখন উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। পাণ্ডবগণ তখন শ্রীকৃষ্ণকে দূতরূপে কুরুসভায় প্রেরণ করেন এবং তাঁহার মুখে উল্লিখিত নিবেদনটি ধৃতরাষ্ট্রের গোচর করেন। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা জানান এবং সেই প্রার্থনার সপক্ষে বিশদ যুক্তিরও প্রদর্শন করেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি পাণ্ডবদিগের উদ্ধৃত আবেদনটি উচ্চারণ করেন।

(খ) উদ্ধৃত অংশে **বিপথ** বলিতে যুদ্ধকেই বুঝাইতেছে। যুদ্ধ এই অর্থে বিপথ যে, তাহাতে সত্যকার মঙ্গল নাই। অন্যায়, লোভ, অপহরণ ইত্যাদি পাপের জন্যই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রেও দুর্যোধন পাণ্ডবরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া লওয়াতে যুদ্ধের পথে পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য-উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু তাহা সৎপথ নয়। বহুমানবের রক্তস্নানে সে পথ হয় কলঙ্কিত। তাই এই পথ বা উপায়টি অত্যন্ত অশুভ। এই অর্থেই এখানে যুদ্ধকে 'বিপথ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(গ) 'পিতা' বলিতে এখানে ধৃতরাষ্ট্রকেই বুঝায়। ধৃতরাষ্ট্র কৌরবদিগের জন্মদাতা পিতা। পাণ্ডবদিগের তিনি জ্যেষ্ঠতাত (জ্যেঠা)। কিন্তু সংস্কৃতে 'পিতা' শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক। বস্তুতঃ, পিতা পাঁচপ্রকারের বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হয়। 'পিতা' শব্দের একটি অর্থ পালক বা রক্ষাকর্তা। এই অর্থে

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগেরও পিতা, কারণ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র এই পঞ্চপাণ্ডবকে প্রতিপালিত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে শাসন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত মীমাংসায় বাধা করিতে পারেন। তাহা হইলে আর যুদ্ধ হয় না। কৌরব বা পাণ্ডবগণ তখন ধর্মের পথে নীতি ও ন্যায় রক্ষা করিয়া রাজ্যভোগ করিতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্রও তখন অন্যায় যুদ্ধের জন্য দায়ী হন না। যুদ্ধ হইলে তিনিই মূলতঃ দায়ী হন, এই হিসাবে তিনিও নীতিভ্রষ্ট বা বিপথগামী হন। যুদ্ধ না হইলেই তিনি সৎপথে, নীতিনির্দিষ্ট পথে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। সুতরাং পাণ্ডবদিগকে বিনাযুদ্ধে রাজ্য ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেই তিনি ও সকলে সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পারেন।

প্র. ৩। ক্রোধচঞ্চল নয়নে হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, "তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে।"—(ক) কৃষ্ণ কোন্ প্রসঙ্গে কখন এই উক্তি করেন? তাহার ক্রোধের কারণ কি? (খ) 'বীরশয্যা' কাহাকে বলে? এই ভবিষ্যদ্বাণীর সপক্ষে তিনি আর কি বলিয়াছিলেন?

উ.। (ক) কৃষ্ণ দুর্যোধনের উদ্ধত ও অন্যায় উত্তর শুনিয়া এইরূপ উক্তি করেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কৃষ্ণ শান্তিস্থাপনের জন্যই আবেদন করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্যোধন প্রভৃতির অন্যায় অত্যাচার এবং অর্জুনের বিপুল পরাক্রমের ইতিহাস উল্লেখ করিয়াছেন। একে ধর্ম, তাহার উপর অর্জুনাদি পাণ্ডবদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শৌর্য। সুতরাং যুদ্ধ বাধিলে কৌরবদিগের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে কৃষ্ণ সুমিষ্ট বচনে দুর্যোধনকেও একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাহাতে প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তেজিতই হইলেন। বলিলেন, স্বেচ্ছায় পাশাখেলায় হারিয়া পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহারাই দায়ী, দুর্যোধন নহেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে যে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞতা ও ভয়ের কাজ। দুর্যোধনের বাল্যকালেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। এখন তিনি সূচ্যগ্র ভূমিও বিনাযুদ্ধে দিবেন না। এমন কি, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিতে হইলেও তিনি সংকল্প হইতে এক তিল বিচলিত হইবেন না।

এই কথা শুনিয়াই কৃষ্ণের ক্রোধ হয়। দুর্যোধনের উত্তর শুধু উদ্ধতই হয় নাই, উহা চরম অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছে। সেই কারণেও কৃষ্ণের ক্রোধ।

(খ) বীরশয্যা-র অর্থ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু। নির্ভীকভাবে আমরণ যুদ্ধ করাই বীরের আদর্শ। যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুকে বীর আত্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মনে করেন। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যাই বীরের যথোপযুক্ত শয্যা—উহাই প্রকৃষ্ট বীরশয্যা।

দুর্যোধনের মুখে বীরশয্যার উল্লেখকে কৃষ্ণ ঈষৎ শ্লেষ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সত্যই তাঁহার সদলে মৃত্যু হইবে। পাণ্ডবদের গৌরবে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাই শকুনির সহায়তায় দুর্যোধন কপট পাশার আয়োজন করিয়াছিলেন। দুর্যোধন ছোট ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীকে সভামধ্যে অপমান ও যারপরনাই উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। তিনিই বারণাবতে জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ নৃশংস আচরণের পরও পাণ্ডবগণ অন্যায় কিছু চাহেন নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহাদের পৈতৃক অংশই দাবী করিয়াছেন। উহাও দিতে অসম্মত হওয়ায় দুর্যোধনের পাপের পসরা পূর্ণ হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে দুর্যোধন সমস্ত ঐশ্বর্য হারাইয়া নিজে নিহত হইবেন। ইহাই কৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী।

প্র. ৪। (ক) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর উক্তি ও দুর্যোধনের প্রতি উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত কর। (খ) ইহার মধ্যে গান্ধারী-চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

উ.। (ক) **সংক্ষিপ্তসারের** শেষাংশ দেখ।

(খ) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর সংক্ষিপ্ত একটি উক্তির মধ্যে তাঁহার প্রগাঢ় ন্যায়পরায়ণতা, দূরদৃষ্টি ও ধর্মবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা হইয়া পুত্রের এইরূপ নিরপেক্ষ বিচার অতিশয় মহীয়সী নারীর পক্ষেই সম্ভব। গান্ধারী ভারতীয় নারীত্বের যে একটি অত্যুজ্জ্বল আদর্শ—ইহা তাহারই প্রমাণ। ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে-বাহিরে ছিলেন অন্ধ। পুত্রস্নেহের অন্ধ দুর্বলতায় তিনি দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। অবাধ্য দুর্যোধনের সঙ্গী খারাপ, সে মূর্খ পাপিষ্ঠ, কু-দিকে তাহার মনের গতি। ধৃতরাষ্ট্র এসকল জানিয়াও দুর্যোধনকে রাজ্য দিয়াছিলেন। সেইজন্য কৌরবদিগের সমূহ বিনাশ সম্ভাবনা উপস্থিত এবং ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে উদ্বিগ্ন। এই যে জ্বালা, ইহার জন্য ধৃতরাষ্ট্র নিজেই দায়ী। গান্ধারীর দৃষ্টি কিরূপ স্বচ্ছ এইকথা তাহার প্রমাণ দেয়। ধৃতরাষ্ট্র সত্যই বলিয়াছেন যে গান্ধারী দূরদর্শিনী।

দুর্যোধনের প্রতি উপদেশের মধ্যে গান্ধারীর ব্যবহারিক জ্ঞান, নীতিবুদ্ধি ও যুক্তিশীলতার চমৎকার পরিচয় আছে। রাজত্বের অর্থ যে মহৎ প্রভুত্ব—এই শিক্ষা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। লোভ বা ক্রোধে অন্ধ হইয়া আত্মীয়-বিরোধ আত্মঘাতী। এই সত্যটি গান্ধারী সুন্দর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়, তাহাদের বন্ধুত্ব পাইলে দুর্যোধন নিশ্চিন্তে রাজত্ব করিতে পারেন। অন্যায় করিয়া তাঁহাদের শত্রু করিলে দুর্যোধনের বিনাশ নিশ্চিত।

প্র. ৫। কৌরবসভায় কৃষ্ণের দৌত্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার চরিত্র বিচার কর।

উ.। কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য আধুনিকযুগের শ্রেষ্ঠ কূটনীতিকেও নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব বাচনভঙ্গী সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দৌত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল পাণ্ডবদিগের হৃতরাজ্য উদ্ধার। সম্ভব হইলে শান্তির মধ্য দিয়া, নচেৎ রক্তস্রাবী যুদ্ধের সাহায্যেই এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় উপস্থিত। কিন্তু যুদ্ধের পথ অনাদিকাল হইতে কণ্টকাকীর্ণ, তাহা ছাড়া উহা অনিশ্চিত ও বীভৎসও বটে। অতএব শান্তির মধ্য দিয়াই কার্যসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে মনোযোগী। তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁহার দীর্ঘ ভাষণের প্রতি ছত্রে তিনি পাণ্ডবদিগের শান্তিকামনা তো ব্যক্ত করিয়াছেনই, সেই সঙ্গে শান্তির মহিমা ও অশেষ কল্যাণকারিতাও বিবৃত করিয়াছেন নিপুণ বিচার-দ্বারা। ইহার মধ্যে ন্যায়ধর্মের প্রতি পাণ্ডবদিগের নিষ্ঠার কথাও সুকৌশলে প্রচারিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন ধৃতরাষ্ট্র নিজে অধার্মিক বা অন্যায়কারী ছিলেন না। ন্যায়ধর্মের আবেদন তাই তাঁহার নিকট নিষ্ফল হইবে না। কিন্তু একথাও শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না যে পুত্রস্নেহে নিতান্ত দুর্বল রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের ক্রীড়নক মাত্র। কাজেই প্রশ্ন উঠে, এত বিস্তারিতভাবে পাণ্ডবদিগের আনুগত্য সহনশীলতা ও দুর্ভোগের বিবরণ দিয়া ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ উদ্রেক করার চেষ্টার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে বৈকি; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়ভাবে মনস্তাত্ত্বিক। ইহার মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ একদিকে কৌরবসভাস্থ রাজন্যবর্গের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন পাণ্ডবদিগের প্রতি, অপরদিকে দুর্যোধনকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সহায়স্থল হইতে মনের দিক দিয়া পৃথক করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তেজনাহীন শান্তসুন্দর শান্তির দৌত্যের

মধ্যে উপস্থিত রাজন্যবর্গের প্রতি প্রশস্তি সকলের জন্য মঙ্গলকামনাও সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে ঐসকল রাজার মনে পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সমস্ত বিক্ষোভ ও উত্তেজনা-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রথম হইতেই অসম্ভব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ অনিবার্য হইলে এই রাজন্যবৃন্দের সংগ্রাম যাহাতে প্রেরণাহীন ও তীব্রতাবর্জিত হয়—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। কৌরবসভার প্রধানগণের প্রতিক্রিয়ায় আমরা বলিতে পারি শ্রীকৃষ্ণের এই উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। শান্তির আবেদন অনেক সময় আবেদনকারীর দুর্বলতা-প্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য প্রথম হইতেই পাণ্ডবদিগের শৌর্য বীর্যের কথা দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়াছেন। অবশেষে দুর্যোধনের প্রতি উক্তিতে তিনি তাহা একটা প্রকাশ্য ধমকের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার ফল দুর্যোধনের উপর কিছুই হয় নাই বটে, কিন্তু আর সকলের মনে যে ইহার আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে তাহা স্পষ্ট।

আবেদন ও ধমক ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ শান্তির জন্য আরও কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকচরিত্র-জ্ঞান যে কত সুগভীর তাহার পরিচয় এইগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন পাণ্ডবদিগের সহিত সখ্যের অর্থ রাজ্যকে সুদৃঢ় করাই নহে, রাজ্যের বৃদ্ধি ও নিরাপদ ভোগের পথ উন্মুক্ত করা। ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে ইহাতে রঙ ধরিয়াছে তাহা তাঁহার উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়। দুর্যোধনের অভিমানক্ষুব্ধ অনুযোগের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর বেশ একটু তীব্র। কিন্তু তাহারও দুটি প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ, পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত তাহার প্রচার প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ, শান্তিকামী পাণ্ডবপক্ষের দুর্জয় বলিষ্ঠতার কথা কঠোর ভীতি প্রদর্শনের আকারে প্রকাশ করিয়া তিনি সভার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ব্যাপারটা তিনি এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্য যাবতীয় দায়িত্ব চাপিয়াছে দুর্যোধনেরই উপর।

শ্রীকৃষ্ণের মনস্তত্ত্বজ্ঞান সুগভীর। অপরূপ বাচনভঙ্গী ও সুনিপুণ কূটনীতি এইভাবে কৌরবসভায় দৌত্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণচরিত্রের অন্যতম মহিমমণ্ডিত দিকগুলি এখানে অবশ্যই আলোকিত হয় নাই। ইহার মধ্য দিয়া আমরা পরমজ্ঞানী ও সর্বগুণান্বিত বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকেই বিশেষভাবে দেখিতে পাই।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস : মর্যাদাজ্ঞানশূন্য—মর্যাদার জ্ঞান (ষষ্ঠিতৎপুরুষ) : তাহার দ্বারা শূন্য (৩য়াতৎপুরুষ)। পঞ্চপাণ্ডব—পঞ্চ পাণ্ডব (কর্মধারয়—সংজ্ঞাবাচক, দ্বিগু নয়)। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিতে থাকেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ)। নিরপরাধ—নিঃ (=নাই) অপরাধ যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা লজ্জাশীল—লজ্জা শীল যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা। পিতৃহীন—পিতার দ্বারা হীন (৩য়াতৎপুরুষ)। দ্বাদশ—দ্বি অধিক দশ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অজ্ঞাতবাসে—নয় জ্ঞাত (নঞ্ তৎপুরুষ); অজ্ঞাত যে বাস (কর্মধারয়), তাহাতে। ধর্মজ্ঞ—ধর্ম জানেন যাঁহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। মহীপাল—মহীকে পালন করেন যাঁহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। মৃত্যুপাশ—মৃত্যুরূপ পাশ (রূপক-কর্মধারয়)। অজাতশত্রু—নয় জাত (নঞতৎপুরুষ); অজাত শত্রু যাঁহার (বহুব্রীহি), তিনি। জতুগৃহদাহের—জতুনির্মিত গৃহ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার দাহ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহার। ধৈর্যচ্যুত—ধৈর্য হইতে চ্যুত (৫মীতৎপুরুষ)। সর্বগুণান্বিত—সর্ব গুণ (কর্মধারয়)। তাহার দ্বারা অন্বিত (৩য়াতৎপুরুষ)। আজন্ম—জন্ম হইতে (অব্যয়ীভাব)। নষ্টকীর্তি—নষ্ট কীর্তি যাহার (বহুব্রীহি), সে কুলঘ্ন—কুলকে হনন করিয়াছে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। আনন্দাশ্রু—আনন্দজনিত অশ্রু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অল্পবয়স্ক—অল্প বয়ঃ (=বয়স) যাহার (বহুব্রীহি), সে। শরণাপন্ন—শরণকে আপন্ন (২য়াতৎপুরুষ)।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্র—জ্ঞা+ক। বশীভূত—বশ+(অভূত-তদ্ভাবে), চি+ভূ+ক্ত। ন্যায্য—ন্যায়+যৎ। পৈতৃক—পিতৃ+ঠঞ্ (ইক)। নিপাতিত—নি—পত+ণিচ্+ক্ত।

তদ্ধিতান্ত পদ গঠন : ভরতনন্দন=ভারত। পুত্রের ন্যায় [উ. মা. ১৯৬০]=পুত্রবৎ। অধিকতর ধর্মশীল=ধর্মশীলতর। পৃথিবীর অধিপতি=পার্থিব।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : আপনি ইচ্ছা করিলেই এই বিপদ নিবারিত হতে পারে (সরল)—আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবেই এই বিপদ নিবারিত হতে পারে (জটিল বা মিশ্র)।

আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবী ধ্বংস হইবে (জটিল)—আপনি উপেক্ষা করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে (সরল)।

ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না—ইন্দ্রেরও আপনি অজেয় হবেন ('আপনাকে'-কে প্রথমান্ত করিয়া)।

কোন্ দুর্বুদ্ধি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? (প্রশ্নবাচক)—কোনো দুর্বুদ্ধি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে না (প্রশ্ন পরিহার; নেতিবাচক)।

তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি (কর্তৃবাচ্য)—তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়নি (কর্মবাচ্য)।

দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হন নি—দ্রৌপদীকে নিগৃহীত দেখেও যুধিষ্ঠিরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি ('নিগ্রহ' এবং ধৈর্যচ্যুত' পদের পদ-পরিবর্তন করিয়া)।

আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন (কর্তৃবাচ্য)—আপনার দ্বারা যা হিতকর মনে করা হয় তাই করা হ'ক (কর্মবাচ্য)।

পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ (জটিল)—পাণ্ডবদের (বা, পাণ্ডবদের দ্বারা) জিত রাজ্য এখন তুমি ভোগ করছ (সরল)।

কোন মানুষ তাঁর সমকক্ষ? প্রশ্নবাচক (—কোনো মানুষ তাঁর সমকক্ষ নয় (প্রশ্ন পরিহার; নঞর্থক)।

পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়া ভালবাসের সেইজন্য আমাদের সভায় এসেছিলেন (যৌগিক)—পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়া ভালবাসেন বলেই আমাদের সভায় এসেছিলেন (জটিল)।

বিজিত ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল (কর্মবাচ্য)—বিজিত ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম (কর্তৃবাচ্য)।

তাতেও আমাদের অপরাধ হয় নি—তাতেও আমরা অপরাধী হয় নি ('আমাদের'-কে প্রথমান্ত করিয়া)।

"সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও" আমি ছাড়ব না (উ. মা. ১৯৬০)—সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও আমি ছাড়ব না (চিহ্নিত অংশের পরিবর্তে সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়া)।

কৃষ্ণ বললেন, "তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে" (প্রত্যক্ষ উক্তি)—কৃষ্ণ বললেন যে সে (দুর্যোধন) আর তার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে (পরোক্ষ উক্তি)।

তুমি ভিন্ন আর কে ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে নির্যাতন করতে পারে? (প্রশ্নবাচক)—তুমি ভিন্ন আর কেউ ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে নির্যাতন করতে পারে না (প্রশ্ন পরিহার; নঞর্থক)।

দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না (যৌগিক)—দুরাত্মারা এই পদ কামনা করলেও রাখতে পারে না (সরল)।

কেবল লোভ করলে সম্পত্তিলাভ হয় না—কেবল লোভ করলে কেউ সম্পত্তিলাভ করে না। (বাচ্যান্তর)।

ব্যাকরণগত টীকা: (পৃথিবী) ধ্বংস হবে—'ধ্বংস' পদটি বিশেষণ নয়, বিশেষ্য; কিন্তু এখানে বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত, যদিও এইরূপ প্রয়োগ সঙ্গত নয়। একটি বিশেষ্যরূপী বিশেষণ এবং একটি ক্রিয়া মিলিয়া মিশ্র ক্রিয়া।

বশীভূত—প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। গতি-সমাসের উদাহরণ।

আনিয়ে—আন্+আ=আনা (প্রেরণার্থক ধাতু); আনা+ইয়া=আনাইয়া >আনিয়ে (প্রেরণার্থক ক্রিয়া)।

(সর্বস্ব) হরণ করেছিলেন—মিশ্র ক্রিয়া।

বাক্য-রচনা: প্রকৃতিস্থ: সন্ধ্যার পর জমিদারবাবু প্রায়ই প্রকৃতিস্থ থাকেন না।

প্রত্যাখ্যান: তোমার এই দান আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

উপশম: ঔষধ সেবনে রোগীর যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হইল।

সাধু-ভাষায় রূপান্তর: বিবরণটি আগাগোড়া চলিত-ভাষায় লেখা সুতরাং ইহা হইতে যে-কোন অংশ সাধুভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে।

লুই পাস্তুর

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আধুনিককালে বিজ্ঞান-বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ বিজ্ঞানকে ইতিপূর্বেই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের উপর বালকদের পাঠ্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান রাখিয়া সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ করা সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়ে সম্ভবতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের তুলনা নাই। এ যুগে রামেন্দ্রসুন্দরের আদর্শকে সরলতার দিক দিয়া চারুচন্দ্রই সার্থকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। চারুচন্দ্রের ভাষা সহজ চলিত ভাষা; রচনার ভঙ্গীটিও সুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখার মধ্যে যেমন একটা শিক্ষণরীতিসম্মত বৈজ্ঞানিক ধারা আছে, চারুচন্দ্রের লেখায় তাহা নাই। তবু বক্তব্যকে তিনি স্পষ্ট ও উপভোগ্য করিতে পারিয়াছেন। দুরূহ বিষয়কে এমন অবাস্তরতা-বর্জিতভাবে বুঝাইবার জন্য ভাষার উপর বেশ দখল থাকা চাই। চারুচন্দ্রের সেই অধিকার অবিসংবাদিত। বিশ্বভারতীর সহিত দীর্ঘ সংযোগ তাঁহার এই শক্তির পুষ্টি ঘটাইয়াছে।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য প্রবন্ধটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী'-নামক পুস্তক হইতে সংকলিত।

এই প্রবন্ধে লেখক বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের জীবনকথা ও আবিষ্কার-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। লুই পাস্তুর বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যেই তাঁহার সত্যকার পরিচয়। কাজেই আবিষ্কার-কথার আলোকে লেখক তাঁহার জীবনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মোট কথা, লুই পাস্তুর—বৈজ্ঞানিক পাস্তুরই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু। এইজন্য ইহার শিরোনামও শুধু 'লুই পাস্তুর'।

সমালোচনা—'লুই পাস্তুর' প্রবন্ধটি জীবনী। উৎকৃষ্ট জীবনীর কাজ মানুষটিকে ফুটাইয়া তোলা। জীবনের ঘটনাপঞ্জীকে অনর্থক প্রাধান্য দিয়া সবলময় মানুষের চিত্র সঠিকভাবে গড়িয়া তোলা যায় না। বরং ঘটনার বাহুল্যে

অনেক সময় মানুষটিই ঢাকা পড়িয়া যায়, যেমন কারুকার্যের বাহুল্যে আসল ছবিটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। জীবনী-রচনা তাই নিপুণ শিল্পীর কাজ। জীবনী-রচনায়, যে-সকল ঘটনা ও বিবরণ একটা মানুষের সত্যকার স্বরূপের উপর আলোকপাত করে, তাহা প্রথমে নির্বাচন করিতে হয়। তাহার পর ঘটনাকে আংশিকভাবে বর্জন, এমন কি পরিবর্তন পর্যন্ত করিয়াও একটা জীবনের আলেখ্য অঙ্কন করিতে হয়। লুই পাস্তরের জীবনকথায় লেখক অনেকটা সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি সন-তারিখের আত্যন্তিক উল্লেখে প্রবন্ধটিকে কণ্টকিত করেন নাই। কর্মের মধ্য দিয়াই কর্মীর পরিচয়। চারুচন্দ্র পাস্তরকে তাঁহার কৃতির আলোকেই রূপায়িত করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রবন্ধটির আরম্ভ পাস্তরের জন্মবৃত্তান্ত দিয়া নয়, তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের বিবরণ দিয়াই। লেখক পাস্তরের জন্ম, পিতৃপরিচয় ও শিক্ষার বিবরণ সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। জীবনের সকল দিকের সকল বিবরণ পুঞ্জীভূত করিয়া তিনি পাস্তরকে অস্পষ্ট করিয়া তোলেন নাই। পাস্তর ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক, বস্তুসত্যের একান্ত উপাসক। কিন্তু সবার উপর ছিলেন তিনি মানবপ্রেমিক। এই স্বরূপটিই লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পাস্তরের অমায়িকতা, নিরহংকার আত্মভোলা ভাবটি কী এক মহত্ত্বে যেন মণ্ডিত। সংসারের যাবতীয় কলরব আর সম্মানের মুখর উৎসব এড়াইয়া তিনি নিভৃত গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। লণ্ডনের চিকিৎসাবিদ্যা-কংগ্রেসে যোগদানকালে তাঁহার ছোট্ট একটি কথার মধ্যে তাহা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

চারুচন্দ্রের এই চরিত্ররূপায়ণে যেটুকু নৈপুণ্য তাহার সবটাই অযত্নসাধিত। তাঁহার বিবরণে পরিকল্পনার অভাব আছে, সামান্য পুনরাবৃত্তি এবং বিন্যাসে কিছুটা শিথিলতাও আছে। তথাপি সর্বাবয়বে প্রবন্ধটি সার্থক। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত একটি মাধুর্য এই প্রবন্ধে লুই পাস্তরের জীবনচরিত্রটিকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। চারুচন্দ্রের উচ্ছ্বাস নাই, ইঙ্গিত আছে, আর আছে দুই একটি সারগর্ভ মন্তব্য। সর্বশেষে লুই পাস্তরের সমাধি-বর্ণনায় যে সাংকেতিকতা আছে তাহা সুচারু। চারুচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইয়াও যে চারুত্বের উপাসক, ইহা তাহারই প্রমাণ।

সংক্ষিপ্তসার—যোশেফ মিস্টার নামে একটি স্কুলের ছেলেকে পাগলা কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক ডাক্তারের কাছে আনা হইলে তিনি

ছেলেটিকে লুই পাস্তুরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পাস্তুরের দ্বারা জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। পাস্তুর ছেলেটির দেহে তাঁহার নবাবিষ্কৃত জলাতঙ্ক রোগ-নিবারণের সিরাম ইন্‌জেক্‌শন করিতে লাগিলেন, ছেলেটির আর জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিল না।

এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে দূর দূর দেশ হইতেও জলাতঙ্ক রোগী সিরাম ইন্‌জেক্‌শন লইবার জন্য পাস্তুরের পরীক্ষাগারে আসিতে লাগিল। দূর-দেশের রোগীদের সুবিধার জন্য তিনি পৃথিবীর নানা স্থানে এইরূপ চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপন করাইলেন। ইহার ফলে পৃথিবীতে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু তো দূর হইলই, রোগীটিও প্রায় বিদায় লইল। জলাতঙ্কের চিকিৎসাপদ্ধতি পাস্তুরের পরিণত বয়সের আবিষ্কার।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাস্তুর ফ্রান্সের এক চর্মব্যবসায়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বাল্যকাল হইতেই তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। রসায়নবিদ্যা ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়। কিছুদিন পরে রসায়নবিদ্যায় কয়েকটি মৌলিক গবেষণার ফলে তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

এইসময় পাউসেট নামে একজন বৈজ্ঞানিক একটি পরীক্ষা করিলেন। তিনি এক ফ্লাস্ক ফুটন্ত জল পারদের উপর উল্টাইয়া, ফ্লাস্কের মধ্যে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও একটুকরা খড় প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ফ্লাস্কের জলে জীবাণু প্রবেশের সকল সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ হইল। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে জল ঘোলা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে জীবাণু রহিয়াছে। জীবাণুশূন্য জলে জীবাণুর উৎপত্তি হইল মনে করিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে কেবল জীব হইতেই জীবের জন্ম হয় না, জীব আপনা-আপনিও জন্মিতে পারে।

পাস্তুর পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ করিবার জন্য পরীক্ষাটি আবার করিলেন। তীব্র আলোকে পারার উপর অসংখ্য ধূলিকণা দেখা গেল। ধূলিকণার মধ্যে রহিয়াছে জীবাণু এবং তথাকথিত জীবাণুশূন্য খড়ের উপরেও এইসব জীবাণুই সংখ্যায় বাড়িয়া ফ্লাস্কের জল ঘোলা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, বাতাসে সর্বত্র এইরূপ জীবাণু আছে কোথাও বেশী, কোথাও কম। বহু পরীক্ষার দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বদ্ধ শয়নঘরে জীবাণুর সংখ্যা বেশি, পর্বতের উপরিভাগের বাতাসে খুব কম।

এক ভদ্রলোক বিট হইতে কোহল তৈয়ারি করিতেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে

পাস্তুরকে জানাইলেন যে তাঁহার কোহল তাড়াতাড়ি খারাপ হইয়া যায়। পাস্তুর লক্ষ্য করিলেন, জীবাণু থাকার ফলে চিনির গাঁজিয়া-ওঠাই কোহল-তৈয়ারির মূলকথা। দুধ টকিয়া যায় এবং মাখনের উপর ছাতা পড়ে একই কারণে। অনুসন্ধানের ফলে তিনি দেখিলেন, লম্বাটে ধরনের একপ্রকার জীবাণু কোহলকে খারাপ করে। ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া তিনি কোহলকে আর খারাপ হইতে দিলেন না।

সেইসময় গুটিপোকার চাষ ও রেশম-ব্যবসা ছিল ফ্রান্সের বহু লোকের জীবিকার্জনের উপায়। ১৮৬৫ সালে গুটিপোকার মড়ক লাগিয়া রেশম-ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইহার প্রতিকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পাস্তুর পরীক্ষার ফলে বুঝিলেন যে এক বিশিষ্ট-রকমের জীবাণু এই মড়কের কারণ। এই জীবাণুর প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া তিনি মড়ক বন্ধ করিলেন এবং রেশম-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিলেন।

তখনকার দিনে অ্যানথ্রাক্স রোগ ছিল বহু জন্তু-জানোয়ারের মৃত্যুর কারণ। কখ্ নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই রোগে মৃত একটি পশুর রক্তে বিশেষ একপ্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করিলেন। সেই জীবাণু ইঁদুর ও খরগোসের দেহে ইন্‌জেকশন করিলে তাহাদেরও অ্যানথ্রাক্স রোগ হইল। পাস্তুর এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিলেন যে, এই রোগের মৃদু জীবাণু কোনও পশুর দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে এই রোগের মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। লোকে তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তিনি পঞ্চাশটি ভেড়ার মধ্যে পঁচিশটিকে এইভাবে টিকা দিয়া, পরে তীব্র অ্যানথ্রাক্স-জীবাণু পঞ্চাশটির দেহেই ইন্‌জেকশন্ করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইলেন যে টিকা-দেওয়া ভেড়াগুলি সুস্থ রহিল, বাকিগুলি মরিল। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাস্তুরের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল।

ইহার পর পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও নিবারণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া সমস্ত জগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

পাস্তুর চিকিৎসাবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও বহু রোগের কারণ ও প্রতিকারের উপায় জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন। একবার ফরাসীদেশের অধিবাসীরা বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁহাকেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হইয়াও পাস্তুর ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির। ১৮৮২ সালে লণ্ডন শহরে যে চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, তাহাতে তিনি ফ্রান্সের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাগৃহে প্রবেশের পথে দর্শনলাভেচ্ছু অসংখ্য লোক বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। তিনি বিব্রতবোধ করিয়া পুত্র ও জামাতাকে বলেন যে বোধহয় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সকে লক্ষ্য করিয়াই এই হর্ষধ্বনি। সম্মেলনের সভাপতি তাঁহার পাশেই ছিলেন। তিনি জানাইলেন যে দর্শকমণ্ডলী পাস্তুরকেই অভিনন্দিত করিতেছে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর পাস্তুর ইহলীলা সংবরণ করেন। পাস্তুর ইনষ্টিটিউটেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। এই গবেষণাকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে স্থাপিত একটি কুকুর ও তাহাকে বাধাদানরত একটি মেষপালক বালকের মর্মরমূর্তি তাঁহারই কীর্তির প্রতীক হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে পাস্তুর অন্যতম। তিনিই সম্ভবতঃ মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। ক্ষতবিক্ষত হল—কাটিয়া-ছিঁড়িয়া গেল। **জলাতঙ্ক রোগ**—যে রোগে রোগী জল দেখিলেই ভয় পায়। অতিসূক্ষ্ম একপ্রকার জীবাণু দেহে প্রবেশের ফলে কতকগুলি স্তন্যপায়ী জীবের, বিশেষ করিয়া কুকুর, শৃগাল প্রভৃতির এই রোগ হয় এবং ইহার ফলে আক্রান্ত জীবের মধ্যে ভয়ংকর রকমের পাগলামি দেখা দেয়। সাধারণতঃ কুকুরেরই এই রোগ সবচেয়ে বেশি হয়। জলাতঙ্কগ্রস্ত জীব মানুষকে কামড়াইলে তাহার লালার মধ্য দিয়া রোগজীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং এক হইতে ছয়মাসের মধ্যে মানুষের দেহে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইংরেজীতে এই রোগের নাম Hydrophobia বা Rabies। অনিবার্য—যাহা নিবারণ করা যায় না; অবধারিত; নিশ্চিত। **তাতে মৃত্যু অনিবার্য**—যতদিন পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগীকে কিছুতেই বাঁচানো যাইত না। তাঁর আবিষ্কারের কথা—তিনি যে জলাতঙ্ক রোগ নিবারণ করিবার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার কথা। **সিরাম**—রক্ত জমিয়া গেলে তাহার মধ্যে যে স্বচ্ছ তরল জলীয় অংশ থাকে তাহা পৃথক্

হইয়া পড়ে। ইহাকেই সাধারণতঃ সিরাম (Serum) বলা হয়। এখানে কথাটির অর্থ—সিরাম হইতে প্রস্তুত রোগনিবারক ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ রোগীর দেহে ইন্‌জেকশন করিয়া প্রবেশ করানো হয়। কার উপর ওটা প্রয়োগ করবেন—পাস্তুরের প্রস্তুত সিরামটির কার্যকারিতার পরীক্ষা তখনও হয় নাই, কারণ পাগলা-কুকুরে কামড়ানো রোগী পাওয়া যায় নাই। সুবিধা হয়ে গেল—অর্থাৎ ঔষধটি পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত রোগী পাওয়া গেল।

অ. ২। **শুধু ফ্রান্স নয়**—অর্থাৎ কেবল পাস্তুরের স্বদেশে নয়। প্রতিষেধক—নিবারক। **পাস্তুরের পরীক্ষাগারে**—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের অর্থে প্যারিসে পাস্তুর একটি গবেষণা ও চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপিত করেন, ইহার নাম 'পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট'। **চিকিৎসার বিভিন্ন কেন্দ্র পৃথিবীর বহু স্থানে** ইত্যাদি—পাস্তুরের সহায়তায় ভারতবর্ষেও কসৌলী-নামক স্থানে এইরূপ একটি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। পরিণত বয়সের—বেশি বয়সের।

অ. ৩। **লুই পাস্তুর ১৮২২ সালে** ইত্যাদি—Louis Pasteur ফ্রান্সের Dole-নামক স্থানে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। চামড়ার ব্যবসা ছিল—ব্যবসায়ী সাধারণতঃ নিজের পুত্রকে ব্যবসাই শিখাইতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু পাস্তুরের পিতার এইরূপ ইচ্ছা ছিল না। তিনি চাহিলেন পুত্রকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে। যথাযথ—যেমনটি উচিত তেমন। **ফ্রান্সের সব চেয়ে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান** ইত্যাদি—পাস্তুর প্রথমে Besancon এবং পরে Paris-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। Paris-এ তিনি বিখ্যাত Ecole Normale নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। **রসায়নবিদ্যা**—Chemistry; যে বিদ্যা মৌলিক পদার্থসমূহের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগে কিরূপ ক্রিয়া ঘটে বা নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহা আলোচনা করে। এই বিদ্যা চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান নির্ভর। **অবধি**—সীমা। **মৌলিক গবেষণা**—অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এমন তত্ত্ব বা তথ্যের আবিষ্কার যাহা পূর্বে কেহ কখনও জানিত না। (Doctor)—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি। মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য এই উপাধি দেওয়া হয়।

অ. ৪। **ফ্লাস্ক**—তরল পদার্থ রাখিবার জন্য সরু-গলাবিশিষ্ট কাচের পাত্র (flask)। ফুটন্ত জলে—যাহাতে জলে কোনরূপ জীবাণু জীবিত অবস্থায় না থাকিতে পারে। রসায়নিক পদ্ধতিতে—রাসায়নশাস্ত্রে নির্দিষ্ট উপায়ে।

অক্সিজেন—বায়ুর প্রধান উপাদান। এই অক্সিজেন বাতাসে সামান্য গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। অক্সিজেন না হইলে কোনো জীব বাঁচিতে পারে না। রসায়নাগারে (laboratory) অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয় একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে পটাসিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডকে একসঙ্গে উত্তপ্ত করিয়া। **কিছু জল বেরিয়ে এল**—অক্সিজেনের জল অপেক্ষা হালকা বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং উপরে সঞ্চিত অক্সিজেনের চাপে খানিকটা জল বাহির হইয়া আসিল। ভিতরে অক্সিজেন দেওয়ার উদ্দেশ্য, সেখানে কোনও জীবাণুর আবির্ভাব ঘটিলে তাহাকে বাঁচিতে সাহায্য করা। **গরম চিম্‌টে**—চিম্‌টেটিকেও গরম করিয়া জীবাণুহীন করা হইল। **জীবাণুশূন্য খড়**—খড়টিকে জীবাণুশূন্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল; খড়ের উপর যে জীবাণু থাকিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই। **অণুবীক্ষণে**—খালি চোখে দেখা যায় না এমন অতিসূক্ষ্ম পদার্থ ও জীবাণুকে বড় করিয়া দেখিবার যন্ত্র (Microscope)। **জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি ইত্যাদি**—জীবের প্রজননের ফলেই নূতন জীবের জন্ম হয়, জীব না থাকিলে সেই জাতীয় নূতন জীবের সৃষ্টি অসম্ভব। ইহাই বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত। **আপনা হতে**—অর্থাৎ কোনও জীবাণু না থাকিলেও। বস্তুতঃ আপনা হইতে কোনও জীবের জন্ম হইতে পারে না। তবে জগতে প্রথম জীবের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল তাহা বৈজ্ঞানিকগণ এখনও নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

অ. ৫। সিদ্ধান্ত—নির্ধারণ; নির্ধারিত বিষয়। **পাউসেটের সিদ্ধান্ত**—অর্থাৎ জীব ছাড়াই জীবের জন্ম হইতে পারে। **উজ্জল আলো ফেললেন**—যাহাতে সেই আলোকে ধূলিকণাগুলি দেখা যায়। **বদ্ধ শয়নঘরে**—যে শয়নঘরে আলো-বাতাস বড় একটা প্রবেশ করিতে পায় না।

অ. ৬। বিট—একজাতীয় উদ্ভিদ্ যাহার শিকড় হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ইউরোপ এবং জার্মানীতে ইহার প্রচুর চাষ হয়। **কোহল**—সুরাজাতীয় পদার্থের যে অংশ সহজেই বাষ্প হইয়া যায়; সুরাসার। বিশুদ্ধ কোহল alcohol নামে পরিচিত। **চিনির গেঁজে-ওঠা**—যে মিষ্ট তরল পদার্থের মধ্যে শর্করাজাতীয় উপাদান আছে, কয়েকদিন রাখিয়া দিলেই তাহা হইতে ফেনা উঠিতে থাকে। ইহাকেই বলে গাঁজিয়া-ওঠা বা fermentation। **চিনির······মূলকথা**—শর্করাজাতীয় তরল পদার্থ হইতে যে কোহল বা সুরা প্রস্তুত হয়, তাহার আসল ব্যাপারটি চিনির গাঁজিয়া-ওঠা। চিনিই গাঁজিয়া-ওঠার

কোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়—কার্বন ডাই-অক্সাইড উড়িয়া যায়, পড়িয়া থাকে অপরিষ্কৃত কোহল। এই কোহলকে পাতনের (distillation) দ্বারা শুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। **চিনিকে গাঁজিয়ে তোলে জীবাণু**—ঈস্ট (Yeast) নামে একপ্রকার অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ থাকার ফলে চিনি গাঁজিয়া ওঠে। লেখক ইহাকেই জীবাণু বলিয়াছেন। ওই ;) পার—অর্থাৎ জীবাণুর অস্তিত্ব **লম্বাটে ধরনের**—অণুবীক্ষণে দেখিলে যাহাকে লম্বাগোছের মনে হয়।

অ. ৭। **গুটিপোকা**—রেশমকীট। এই পোকার চারিদিকে তন্তুময় আবরণ হইতেই রেশম প্রস্তুত হয় এবং রেশমের জন্যই গুটিপোকার চাষ হয়। **গুটিপোকার মড়ক**—গুটিপোকার মধ্যে কোনও সংক্রামক রোগের প্রসারের ফলে দলে দলে তাদের মৃত্যু। **রেশমের ব্যবসা একেবারে ইত্যাদি**—গুটিপোকাই রেশম-শিল্পের নির্ভর; সেই পোকার ব্যাপক মৃত্যুর ফলে শিল্প অচল হইবার উপক্রম হইল। **প্রাণিতত্ত্ববিশারদদের যে কাজ**—যাঁহারা প্রাণী অর্থাৎ জীব-জন্তুর শ্রেণীবিভাগ, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা প্রাণিতত্ত্ব-বিশারদ বা zoologist। কোনও প্রাণীর কি কারণে ব্যাপক মৃত্যু ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করাও তাঁহাদের কাজ। **একজন রসায়ণবিদ্‌কে**—যিনি (তাহাদের বিচারে) প্রাণীদের সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই রাখেন না। **এই উৎপাত**—গুটিপোকার মড়ক-রূপ উপদ্রব। **চাষীদের চেনালেন**—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাষীদেরও দেখাইয়া দিলেন। **হক্সলি**—Julian Sorell Huxley, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। ইঁহার জন্ম হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। ইনি ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক Aldous Huxley-র অগ্রজ। লণ্ডনের King's College-এ ইনি Zoology-র অধ্যাপক ছিলেন। প্রাণিতত্ত্ব-সম্বন্ধে ইঁহার অমূল্য গবেষণা আছে। **মন্তব্য:** নীচের উক্তিটি এই জুলিয়ান হক্সলিরও হইতে পারে, আবার ইঁহার পিতামহ বিখ্যাত বায়োলজিস্ট Henry Huxley-রও (১৮২৫-১৯১৫ খ্রীঃ) হইতে পারে। শুধু উপাধি না দিয়া নাম দিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না। **১৮৭০ সালে জার্মানির সঙ্গে ইত্যাদি**—ফ্রান্স এবং প্রুশিয়ার মধ্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এক যুদ্ধ হইয়াছিল। একজন জার্মান-রাজকুমারকে স্পেনের রাজা মনোনীত করা হইলে ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন আপত্তি করেন। ইহাতে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। বিসমার্কের উস্কানিতে ফ্রান্স অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। ব্যাভেরিয়া এবং

অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্র প্রুশিয়ার পক্ষে যোগদান করে। তাহাদের সম্মিলিত আক্রমণে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। অবশেষে ফ্রান্স আলসেস্-লোরেন সমর্পণ করিয়াও প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। **খেসারত**—ক্ষতিপূরণ। **তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা** ইত্যাদি—পাস্তুর গুটিপোকার মড়ক-নিবারণের উপায় আবিষ্কার করায় রেশম-ব্যবসায়ে ফ্রান্সের প্রচুর লাভ হইল, সে লাভের পরিমাণ পূর্বোক্ত যুদ্ধে দেয় ক্ষতিপূরণের চেয়ে অনেক বেশী।

অ. ৮। **অ্যানথ্রাক্স**—সাধারণতঃ গোরু, ভেড়া, শূকর প্রভৃতির মধ্যে এক রকমের সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ (Anthrax)। ইহার আক্রমণ হয় আকস্মিক এবং ইহাতে পশু মরেও অতি অল্পসময়ের মধ্যে। যে-সকল মানুষ আক্রান্ত জন্তুর লোম বা চামড়ার সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরও এই রোগ হইতে পারে। **কখ্**—Robert Koch, একজন বিখ্যাত জার্মান ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক। ইহার জন্ম ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। ডাক্তারি ব্যবসা ছাড়িয়া ইনি প্রধানতঃ গবেষণাকার্যেই আত্মনিয়োগ করেন এবং যক্ষ্মা ও কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করেন ; পশুরোগ-সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুকাল ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎসাক্ষেত্রে মৌলিক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। **পশুশাস্ত্রবিদেরা**—পশুদের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় যাঁহারা জানেন তাঁহারা। **প্রচলিত সংস্কার**—যে অহেতুক বিশ্বাস লোকের মনে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বাসটি এই যে, জীবাণু পশুর দেহে ইন্‌জেকশন করা হইলে সে মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে না। **মন্তব্য :** যে বিশ্বাস পুরুষানুক্রমে মানুষের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই নাম সংস্কার ; এখানে অবস্থা তাহা নহে। পাস্তুরের মতটিকে পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ইহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইহাকে প্রচলিত সংস্কার বলা বলা ঠিক নয়। **পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত**—বহু পরীক্ষার ফলে যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। **সাংবাদিক**—সংবাদ সংগ্রহ এবং পত্রিকা মারফত প্রচার করা যাঁহাদের কাজ। **মৃদু টিকা**—রোগবিশেষের জীবাণু অল্প পরিমাণে দেহে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে সেই রোগের মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। **পাস্তুরের জয়ধ্বনি করল**—অর্থাৎ পাস্তুরের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তাহা আনন্দধ্বনিসহকারে মানিয়া লইল।

অ. ৯-১০। **কৃতজ্ঞতাভাজন**—কৃতজ্ঞতার পাত্র। **তার দূরীকরণের**

উপায়—সেই ব্যাধি দূর করার পদ্ধতি। **নেপোলিয়ন**—জগদ্বিখ্যাত বীর ও ফরাসী সম্রাট Napoleon Bonaparte (১৭৬৯-১৮২১ খ্রীঃ)। বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি সমগ্র ইউরোপের ত্রাস হইয়া উঠেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইনি বন্দী হন এবং পরে সেণ্ট হেলেনা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্বাসিত হন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সময়ে ফরাসী-দেশ গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল। **ভিক্টর হুগো**—Victor Hugo, বিখ্যাত ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে ইনি কবিতা ও গল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর কয়েকখানি নাটক লেখেন। Notre Dame de Paris ও Les Miserables বই দুইখানি তাঁহার জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। রাজনীতিতে যোগদান করিয়া শেষ জীবন ইঁহাকে স্বদেশ হইতে নির্বাসনে কাটাইতে হইয়াছিল।

অ. ১১। অমায়িক—নম্র ও মিষ্টস্বভাব। **চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় এক সর্বদেশীয় কংগ্রেস**—এক সম্মেলন বা সভা যাহাতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। **প্রতিনিধি**—কোনও দেশের পক্ষে কথা বলিবার অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি; মুখপাত্র। **হল লোকে লোকারণ্য**—সম্মেলনের সুবৃহৎ কক্ষে (hall) প্রচুর জনসমাগম হইয়াছে, আর তিলধারণের স্থান নাই। বহুলোকের ভীড় বুঝাইতে 'লোকে লোকারণ্য' বাঙলা ইডিয়ম। **দর্শকমণ্ডলী**—যাহারা কেবল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদিগকে দেখিবার জন্যই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। **অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে**—পাস্তুর ভাবিয়াছিলেন হয়তো তাঁহাদের আসিতে দেরি হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই তিনি অস্বস্তিবোধ করিলেন। তাহা ছাড়া, এই বিপুল অভিনন্দন যে তাঁহার প্রাপ্য, এমন দম্ভ তাঁহার মধ্যে কখনও স্থান পায় নাই। তথাপি লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিতেছে কেন তাহা না বুঝিয়াই তিনি বিব্রতবোধ করিলেন। **প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স**—Prince of Wales বা ওয়েল্‌সের রাজকুমার। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ওয়েল্‌স জয় করিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে এই উপাধি দান করেন। সেই হইতে ইংলণ্ডেশ্বর বা ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র এই উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স তিনটি উটপাখির পালক-সমন্বিত একটি ছোট মুকুট চিহ্নরূপে ধারণ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার

জ্যেষ্ঠ পুত্র, পরবর্তী কালের সপ্তম এডওয়ার্ড ছিলেন তখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স।

অ. ১২-১৩। **তাঁর নামে যে গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়**—জনসাধারণের চাঁদায় প্যারিসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পাস্তুর ইনস্টিটিউট' গবেষণা-কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। মর্মরমূর্তি—মার্বেল পাথরে গড়া মূর্তি। **একটা কুকুর, এক মেষপালক** ইত্যাদি—পাস্তুর যে কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া জগদ্বাসীকে এই রোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহারই প্রতীক এই মূর্তিটি; কুকুর জলাতঙ্ক রোগ আর বাধাদানকারী বালক এই রোগের প্রতিষেধক।

ব্যাখ্যা

(১) তাই তো হক্সলি বলেছিলেন…এক আবিষ্কার থেকে। (অ. ৭)

এই অংশটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'লুই পাস্তুর' প্রবন্ধের অন্তর্গত। রেশম-কীটের মড়ক বন্ধ করিবার জন্য পাস্তুর যে আবিষ্কার করেন, তাহার মূল্যনিরূপণ-প্রসঙ্গে লেখক এইকথা লিখিয়াছেন।

দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রধান উপজীব্য ছিল রেশমের চাষ। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রেশমকীটের ভয়ংকর মড়ক দেখা দেয়। ফলে রেশমের ব্যবসা সেখানে একেবারে অচল হইবার উপক্রম হয়। ফরাসী সরকার তখন পাস্তুরের শরণাপন্ন হন। পাস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই মড়কের হেতু নির্ণয় করিলেন। একপ্রকার জীবাণু রেশমকীটকে আক্রমণ করিলেই এই মড়ক দেখা দেয়। পাস্তুর এই জীবাণুর প্রতিষেধক আবিষ্কার করিলেন, এবং চাষীদের হাতে-কলমে শিখাইলেন কি করিয়া এই প্রতিষেধক প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলে রেশমকীটের মড়ক অচিরেই বন্ধ হইল। আবার রেশমের ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি হইল। ফ্রান্সের প্রচুর আয় হইতে লাগিল। খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় হয়। পরাজিত ফ্রান্স জার্মানীকে প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড খেসারত দেয়। কিন্তু পাস্তুরের কৃপায় ফ্রান্স রেশম-ব্যবসায়ে এই কুড়ি কোটি পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী আয় করিল। বিজ্ঞানকে কল্যাণকর্মে নিয়োগ করিয়া পাস্তুর সেদিন ফরাসীদেশের যে মঙ্গল করিলেন তাহার তুলনা নাই। লেখক এই সত্যের সমর্থনে সমসাময়িক বিখ্যাত ইংরেজ

জীববিদ্যা-বিশারদ হক্সলির এই মর্মে একটি উক্তির উল্লেখ করিয়া পাস্তুরের সেই অবদানের মহিমায় বিবৃত করিয়াছেন।

(২) ১৮৮১ সালের ২রা জুন……কিসের জয় হবে! (অ. ৮.)

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'লুই পাস্তুর' প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। পাস্তুর একটি ভয়ংকর পশু-রোগের প্রতিকারপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেই স্মরণীয় আবিষ্কার বর্ণনাপ্রসঙ্গেই লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

পশুদের পক্ষে মারাত্মক রোগটির নাম অ্যানথ্রাক্স। সেকালে ইহার প্রকোপে প্রতিবৎসর অসংখ্য পশু মারা যাইত। জার্মান বৈজ্ঞানিক কখ্ (Koch) এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত একটি পশুর রক্তে এই বিশেষ ধরনের জীবাণু দেখিতে পান। পাস্তুর এই সূত্র ধরিয়া রোগটির প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এই সত্য আবিষ্কার করিলেন যে অল্প পরিমাণ অ্যানথ্রাক্স জীবাণু সুস্থ পশুর রক্তে মিশাইয়া দিলে আর মারাত্মক আক্রমণ হয় না। পাস্তুরের এই কথা পশুতত্ত্ব-বিদ্‌গণ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। শেষে পাস্তুরকে পরীক্ষার দ্বারা তাহার আবিষ্কার প্রমাণ করিতে ডাকিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন সেই পরীক্ষা হইল। অ্যান্থ্রাক্সের জীবাণু দিয়াই অ্যানথ্রাক্স-রোগের প্রতিকার সম্ভব এই কথা পশুশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ, এইদিন পাস্তুর দেখাইলেন তাঁহার পরীক্ষালব্ধ আবিষ্কারই সত্য, এবং পশুতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা ও বিশ্বাস মিথ্যা। ইহাতে নব বিজ্ঞানই জয়ী হইল। পাস্তুর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে অল্পপরিমাণ অ্যান্থ্রাক্স-জীবাণু রক্তে মিশাইয়া পশুদের টিকা দিলে আর অ্যান্থ্রাক্স-রোগ তাহাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করে না। বিজ্ঞানের তথা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এইদিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) গণনায়……তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। (অ. ১০.)

এই পঙ্‌ক্তিটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'লুই পাস্তুর'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। লুই পাস্তুর যে স্বদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া সমাদৃত হইতেন, লেখক তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশ সেই দৃষ্টান্তেরই অন্তর্ভুক্ত।

লুই পাস্তুর তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় মানুষের অপরিসীম উপকার করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে রসায়নশাস্ত্রেই ছিল তাঁহার অধিকার।

কিন্তু তিনি রসায়নের বিদ্যাকে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন। অসংখ্য ব্যাধির প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়া তিনি মানুষের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ফরাসী দেশে নেপোলিয়ন ও ভিক্টর হুগোর সম্মানই কম নয়। একবার তাই ফরাসীদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে সেই প্রশ্নে গণভোট করা হয়। এই ভোট পরীক্ষায় পাস্তুরই প্রথম স্থান অধিকার করেন। জগদ্বিখ্যাত দুর্ধর্ষ নেপোলিয়ন হইলেন দ্বিতীয়, আর বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো হইলেন তৃতীয়। এই ভোটযুদ্ধে পাস্তুরের মহিমা ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার প্রতিভা ও অবদানের কথা শুধু পণ্ডিতদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, একটা সমগ্র জাতিকে তিনি আপন মাহাত্ম্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

(৪) **আর সমগ্র মানবজাতির……কথাই বলতে হবে।** (অ.১০)

এই অংশটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'লুই পাস্তুর'-নামক জীবনকথা হইতে উদ্ধৃত। পাস্তুরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত মন্তব্যে উপসংহার টানিয়াছেন।

লুই পাস্তুর জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি জীবাণুতত্ত্বের ভিত্তি পাকা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জলাতঙ্ক, অ্যানথ্রাক্স প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সম্ভব করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার অসংখ্য আবিষ্কার ও গবেষণা বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। এই সকল কারণে জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের মধ্যেও আবার এক হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহার আবিষ্কারগুলি মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত হইয়াছে। অন্যদের বড় বড় আবিষ্কার অন্যদিকে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানবকল্যাণে পাস্তুরের আবিষ্কারের তুলনায় সকল বৈজ্ঞানিকই ছোট। শুধু বৈজ্ঞানিকই বা কেন, ব্যবহারিক জগতে আর কোনও ব্যক্তি পাস্তুরের মতো মানুষের মঙ্গলসাধন করেন নাই—ইহাই লেখকের সুনিশ্চিত অভিমত।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। লুই পাস্তুরের জীবনকথা সংক্ষেপে লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ।

প্র. ২। "শুধু এই আবিষ্কারটির জন্যেই তিনি সমগ্র জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে থাকবেন।"—এখানে কাহার কোন্ আবিষ্কারের কথা

বলা হইয়াছে? আবিষ্কারটির বিবরণ উল্লেখ করিয়া উদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

উ.। উদ্ধৃত অংশে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কথা বলা হইয়াছে।

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে এই জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। এককালে এই মারাত্মক রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না। তখন কত মানুষ যে এই রোগে বীভৎস যন্ত্রণার মধ্য দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই মানবপ্রেমিক পাস্তুর এই ভয়ংকর রোগের প্রতিকারচিন্তায় মগ্ন হইলেন। বহু গবেষণার ফলে তিনি ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কারও করিয়া ফেলিলেন। এখন তাহার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করা বাকি ছিল। ঘটনাক্রমে সুযোগও মিলিয়া গেল। যোশেফ মিস্টার নামে একটি স্কুল-ফেরতা বালককে পাগলা কুকুরে কামড়াইলে, সে পাস্তুরের নিকট গেল। পাস্তুর তাঁহার সদ্যআবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শেষপর্যন্ত বালকটি সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। সংবাদটি চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে রোগী আসিতে লাগিল। পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের ধন্বন্তরি হইয়া উঠিলেন। জগদ্বাসীর সুবিধার জন্য তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে এই রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফলে পৃথিবী হইতে জলাতঙ্ক রোগের ভয়ানক আতঙ্ক দূর হইল। পাস্তুর এইভাবে মানুষের পরম উপকার সাধন করিলেন। জলাতঙ্ক রোগের ভয়াবহতা ভাবিলে, পাস্তুরের আবিষ্কারের অতুলনীয় গুরুত্ব ধরা পড়ে। এই একটিমাত্র আবিষ্কারে পৃথিবীবাসীর যে উপকার হইল, তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। এইজন্য স্বভাবতঃই জগদ্বাসী এই মহান্ বৈজ্ঞানিকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ; এইজন্যই তিনি মানুষের নিকট অবিস্মরণীয়।

প্র. ৩। (ক) লুই পাস্তুরের প্রধান প্রধান আবিষ্কারগুলির উল্লেখ কর। (খ) ইহাদের মধ্যে কোন্ আবিষ্কারটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্?

উ.। (ক) সংক্ষিপ্তসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

(খ) ২নং প্রশ্নের উত্তর সাজাইয়া লেখ।

প্র. ৪। "এই গবেষণাকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে—একটা কুকুর এক মেষপালক বালককে আক্রমণ করছে, ছেলেটি

বাধা দিচ্ছে।"—কোন্ গবেষণাকেন্দ্রে কেন এই মর্মরমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে?

উ.। লুই পাস্তরের জীবৎকালে ফরাসীদেশে পাস্তরের নামে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার (পাস্তর ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সেই গবেষণাগারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাস্তর জীবনে অনেক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষভাবে তাহাদের প্রত্যেকটির গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু জলাতঙ্ক-ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কারই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। পাগলা কুকুরের কামড় হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। পাস্তর-প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে যে মর্মর মূর্তি আছে, তাহা একটা কুকুর ও একটি বালকের,—কুকুরটি বালকটিকে আক্রমণ করিতেছে ও বালকটি তাহাকে বাধা দিতেছে। কুকুরের কামড়াইবার চেষ্টার মধ্য দিয়া জলাতঙ্কের রোগের এবং বালকটির বাধা দেওয়ার ভিতর দিয়া পাস্তর-আবিষ্কৃত জলাতঙ্কের প্রতিষেধকের কথা বুঝানো হইয়াছে। পাস্তরের জীবনের সহিত জলাতঙ্কের প্রতিকার-ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। এইজন্য তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ এই আবিষ্কারটিকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: জলাতঙ্ক = জল + আতঙ্ক। আবিষ্কার = আবিঃ + কার। গবেষণা = গো + এষণা। পুনরুজ্জীবিত = পুনঃ + উজ্জীবিত। জগদ্‌বাসী = জগৎ + বাসী। জগদ্বিখ্যাত = জগৎ + বিখ্যাত।

সমাস: ক্ষতবিক্ষত—যাহা ক্ষত তাহাই বিক্ষত (কর্মধারয়)। জলাতঙ্ক—জল হইতে আতঙ্ক (৫মীতৎপুরুষ)। জলাতঙ্ক-রোগ-নিবারণের—জল হইতে আতঙ্ক (৫মীতৎপুরুষ): জলাতঙ্ক-নামক রোগ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার নিবারণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহার। পরীক্ষাগারে—পরীক্ষার জন্য আগার (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। যথাযথ—যথা যথা (দুই অব্যয়ের অব্যয়ীভাব)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে—শিক্ষাদায়ক প্রতিষ্ঠানে (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। জীবাণুযুক্ত—জীবের অণু (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা যুক্ত (৩য়াতৎপুরুষ)। অণুবীক্ষণে—অণু বীক্ষণ করা হয় অর্থাৎ বিশেষভাবে

দেখা হয় ইহার দ্বারা (উপপদ তৎপুরুষ), তাহাতে। শয়নঘরে—শয়নের জন্য ঘর (৪র্থী তৎপুরুষ), তাহাতে। প্রাণিতত্ত্ববিশারদের—প্রাণিবিষয়ক তত্ত্ব (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহাতে বিশারদ (৭মী তৎপুরুষ), তাহাদের। রসায়নবিদ্‌কে—রসায়ন জানেন ('বেত্তি' = জানেন) যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ) তাঁহাকে। পুনরুজ্জীবিত—পুনঃ উজ্জীবিত (সুপসুপা), অথবা, পদটিতে কোনো সমাস নাই, শুধু সন্ধি আছে। মারাত্মক—মার (= মৃত্যু) আত্মা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। পশুশাস্ত্রবিদেরা—পশুবিষয়ক শাস্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহা জানেন যাঁহারা (উপপদ-তৎপুরুষ)। পরীক্ষালব্ধ—পরীক্ষার দ্বারা লব্ধ (৩য়াতৎপুরুষ); জগদ্‌বাসীর—জগতে বাস করে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ), তাহাদের। বহুসংখ্যক—বহু সংখ্যা যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা। জগদ্‌বিখ্যাত—জগতে বিখ্যাত (৭মীতৎপুরুষ)। হর্ষধ্বনির—হর্ষসূচক ধ্বনি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহার; মর্মরমূর্তি—মর্মরনির্মিত মূর্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

সমস্তপদ-গঠন ঃ দিনের পর দিন = প্রতিদিন। জীবের উৎপত্তি = জীবোৎপত্তি। প্রতিকারের উপায় = প্রতিকারোপায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে = বিজ্ঞানেতিহাসে। নিবারণের পদ্ধতি = নিবারণ পদ্ধতি।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ মৌলিক—মূল + ঠক্ (ইক)। ফুটন্ত—ফুট + অন্ত। ঘোলাটে—ঘোল + টিয়া > টে। লম্বাটে—লম্বা + টিয়া > টে। মড়ক—মড়া + ক। জানোয়ার—জান + ওয়ার। সমবেত—সম্ + অব – ই + ক্ত। সাংবাদিক—সংবাদ + ঠক্ ইক)। শীর্ষস্থানীয়—শীর্ষ + স্থানীয়। দূরীকরণ—দূর + চ্বি (অভূততদ্ভাবে) + কৃ + ল্যুট (অন)। চামড়া—চাম (> চর্ম) + ড়া (স্বার্থে)।

এককথায় প্রকাশ ঃ সব চেয়ে প্রিয় = প্রিয়তম। সব সময় = সর্বদা। রেশমের জিনিষ তৈরির কাজে = রেশমশিল্পে। এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু = জীবাণুবিশেষ।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ পাস্তুরের কথা উপহাস করে উড়িয়ে দিল—এখানে 'উড়িয়ে দিল' = অগ্রাহ্য করিল, আমলেই আনিল না। অন্য অর্থেও এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ হয়: বাপের মৃত্যুর পর বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি সে তিন বছরের মধ্যেই উড়িয়ে দিল (= নিঃশেষ করিল)।

লোকে লোকারণ্য = বিপুল জনতায় পূর্ণ—বিশিষ্টার্থক। 'লোকারণ্য'-র অনুকরণে 'জনারণ্য'ও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : 'আনন্দের অবধি রইল না' বাক্যাংশটির পরিবর্তে বিশিষ্টার্থক শব্দ-গুচ্ছ ব্যবহার কর।

উত্তর : আনন্দ আর ধরল না।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : ভদ্রলোক অবিলম্বে ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠালেন (অস্তিবোধক)—ভদ্রলোক ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠাতে বিলম্ব করলেন না (নেতিবাচক)।

তাঁর পিতার চামড়ার ব্যবসা ছিল—তাঁর পিতা চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন ('পিতার'-কে কর্তৃপদে রূপান্তরিত করিয়া)।

তাঁর পিতার আনন্দের অবধি রহিল না যখন কয়েকটি মৌলিক গবেষণার জন্য পাস্তুর ডক্টর উপাধি লাভ করিলেন (জটিল)—কয়েকটি মৌলিক গবেষণার জন্য পাস্তুর ডক্টর উপাধি লাভ করলে তাঁর পিতার আনন্দের অবধি রইল না (সরল)।

কোনো রকমে কোনো পথ দিয়ে ওর ভিতরে জীবাণু ঢুকতে পারে না (নেতিবাচক)—কোনো রকমে কোন পথ দিয়ে ওর ভিতর জীবাণু (বা, জীবাণুর) ঢোকা অসম্ভব (অস্তিবাচক বা স্থাপনাত্মক)।

অণুবীক্ষণে ওই জলে বহু জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল (সরল)—অণুবীক্ষণে সন্ধান পাওয়া গেল যে ওই জলে বহু জীবাণু আছে (জটিল)।

বহু পরীক্ষা থেকে তিনি এ-সব সিদ্ধান্তে এলেন—বহু পরীক্ষা তাঁকে এ-সব সিদ্ধান্তে নিয়ে এল ('পরীক্ষা'-কে কর্তৃপদ করিয়া)।

এর পর পাস্তুর জলাতঙ্ক-রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি নির্ণয় করলেন—এর পর পাস্তুরের দ্বারা জলাতঙ্ক-রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি নির্ণয় করা হল (বাচ্যান্তর)।

তাঁর নামে যে গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেইখানেই তাঁর সমাধি রক্ষিত আছে (জটিল)—তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাকেন্দ্রেই তাঁর সমাধি রক্ষিত আছে (সরল)।

আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জন বিজ্ঞানীর নাম করা হয়, তবে নিশ্চয়ই পাস্তুরের নাম তার মধ্যে থাকবে—আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জন বিজ্ঞানীর নাম কেউ করে, তবে পাস্তুরের নাম (বা, নামকে) তার মধ্যে থাকতেই হবে (বাচ্যান্তর)।

অর্থগত পার্থক্য : পাত্রস্থিত—পাত্রে অবস্থিত ; পাত্রস্থ—পাত্রে অবস্থিত, যোগ্য বরে প্রদত্ত ('কন্যা পাত্রস্থ করা')। বীজাণু—অতিক্ষুদ্র প্রাণী যাহারা সাধারণতঃ রোগ জন্মায় ; জীবাণু—অতিক্ষুদ্র বীজ যাহা হইতে উদ্ভিদের জন্ম হয়। মড়ক—সংক্রামক রোগে বহু মানুষ বা প্রাণীর মৃত্যু ; মোড়ক—পুরিয়া। টিকা—প্রতিষেধক হিসাবে মৃদু রোগজীবাণু রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া ; টীকা—ভাষ্য, টিপ্পনী।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ ও শব্দগুচ্ছ : সৌভাগ্যক্রমে, অনুশীলন, মৌলিক, পুনরুজ্জীবিত, খেসারত, লোকে লোকারণ্য, অমায়িক।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য : শীগ্‌গির—কথাটি 'শীঘ্র' এই তৎসম শব্দের উচ্চারণ বিকৃতির ফল বলিয়া অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দের উদাহরণ।

(দুধ যে) টকে (যায়)— টক' শব্দটি বিশেষণ অর্থাৎ নাম ; এই 'টক'-ই বিনা প্রত্যয়ে ধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে : টক>টক্ ; টক্+ইয়া=টকিয়া, চলিত ভাষায় 'টকে'। অতএব এটি নামধাতুর উদাহরণ।

(তিনটি) যায়-যায় (অবস্থায়)—আসন্নতা বুঝাইতে এখানে 'যায়' ক্রিয়া পদটির দ্বিত্ব হইয়াছে ; দ্বিত্বপ্রাপ্ত রূপটি বিশেষণ।

সাধুভাষায় রূপান্তর : প্রবন্ধটি চলিত ভাষায় লিখিত বলিয়া ইহা হইতে যে-কোনো অংশ সাধুভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে।

স্বাধীনতা-লাভের পরে

কালিদাস রায়

লেখক পরিচয়—'ত্রিরত্ন' কবিতার ভূমিকা দেখ।

উৎস ও নামকরণ—প্রবন্ধটি লেখকের কোনো প্রবন্ধসংকলনে স্থান পায় নাই। বোর্ড প্রকাশিত 'পাঠ-সংকলনে'ই ইহার প্রথম প্রকাশ।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত জাতিগঠনের কাজ সমাপ্ত হয় নাই। লেখক এই প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে সেই জাতিগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই আমরা পাইয়াছি কিন্তু দেহমনে, আচার-ব্যবহারে দেশবাসী এখনও স্বাধীন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সুতরাং স্বাধীনতা-লাভের পরে আমাদের কর্তব্য বহুপরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। লেখক যেন আমাদিগকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে চান, স্মরণ করাইয়া দিতে চান আমাদের অসংখ্য ত্রুটি ও তাহার আশু প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা। এককথায় স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতবাসীর করণীয় কি, তাহাই এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। আলোচনা অনেকটা বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী হইলেও লক্ষ্য এক। প্রবন্ধটির শীর্ষনামের মধ্যে স্থিরনির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু সূচিত হয় না মনে হয় লেখক ইচ্ছা করিয়াই বিষয়ের সীমার মধ্যে ধরা দেন নাই, এইজন্যই প্রবন্ধটির শীর্ষনাম এইরূপ।

সমালোচনা—জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যকতা ও উপায়-সম্বন্ধে আলোচনাই প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য বলা যায়। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু তাহার অসংখ্য দুঃখ ঘুচে নাই। লেখকের মতে, ইহার জন্য আমাদের সমাজ ও চরিত্রই দায়ী। লেখকের মতে ভারতবাসী এখনও মনেপ্রাণে আচারে-আচরণে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। এই কথার নজির হিসাবে লেখক ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবন ও চরিত্র হইতে অসংখ্য দোষ-ত্রুটির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। উপসংহারে এই সকল ত্রুটি হইতে মুক্ত হইয়া জাতি আবার আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হইবে এবং সেই চরিত্রবলে স্বাধীনতার শুভফল ভোগ করিবে—এইরূপ একটা আশা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রবন্ধটির ইহাই সারকথা।

এইজাতীয় প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে বিশ্লেষণ ও বিচারের নৈপুণ্যে। কবিশেখর কিন্তু বিশ্লেষণ অপেক্ষা বিবরণকেই অধিক স্থান দিয়াছেন। ফলে সময় সময় বিবরণগুলি অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ হইয়া ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে যুক্তির বন্ধন ও পারম্পর্য রক্ষা করিয়া চলে না। একটা হইতে আর একটা আলোচ্য বস্তু তাই অনেকটা বিচ্ছিন্ন। ছাত্রদের হাতে নীতিপ্রবন্ধ রচনার মতো তথ্যবাহুল্যের দিকে ঝোঁকটা যেন এখানে বেশি। ইংরাজী সাহিত্যে প্রাচীন লেখকদের মধ্যে কার্লাইল, রাস্কিন প্রভৃতি মনীষিগণ এককালে নীতিপ্রবন্ধ রচনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন, কবিশেখরের উপর তাহার প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু ঐ সকল লেখকের বাক্‌সংযম ও মর্যাদাময় গাম্ভীর্য এই প্রবন্ধে নাই। ইহার মধ্যে লেখক ভাব ও ভাষার তারতম্য সর্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, দীর্ঘপরাধীনতার গ্লানি লেখকের অবচেতনায় যেন পুঞ্জীভূত এবং তাহারই ফলে তাঁহার আত্মধিক্কারের মাত্রাটা একটু বেশি। একটা জাতির পুনর্গঠন ব্যাপারে যে জাতীয়তা-বোধের প্রয়োজন, যাহার কথা লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল শুষ্ক নীতিকথায় ও আত্মনিন্দায় উদ্দীপ্ত হইতে পারে না। অতীতের সত্যমিথ্যা একটা গর্ববোধ ও উহার প্রেরণা জুটাইতে পারে। তাহা ছাড়াও অন্যতর কোনো প্রেরণা কিছু আছে কিনা এই প্রবন্ধে অন্ততঃ আমরা সে সংবাদ পাই না। মোট কথা প্রবন্ধটির অধিকাংশ আমাদিগকে আর যাহাই করুক, উদ্দীপ্ত করে না।

গণতন্ত্র-ব্যাখ্যায় লেখক উহার গুরুত্ব ও মহিমা যথেষ্ট বুঝাইয়াছেন। কিন্তু যে শিক্ষা গণতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া কথিত সেই শিক্ষার কাজ যেন লেখক এই প্রবন্ধেই সমাপ্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ লেখক জাতিগঠনের যতগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কার্যতঃ সার্থক করিতে গেলে শিক্ষামূলক একটা কর্মসূচী চাই। জাতীয়তাবোধই হউক, শৃঙ্খলা, সময়নিষ্ঠতা বা জাতীয়-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য-গৌরবই হউক, কোনটাই একদিনের দীর্ঘ বক্তৃতায় সঞ্চারিত হয় না। তাহার জন্য চাই দীর্ঘদিনের সুপরিকল্পিত শিক্ষা। লেখক আজীবন শিক্ষক হইয়াও এই কথাটি একেবারেই স্পর্শ করেন নাই।

প্রবন্ধটির মধ্যে অবশ্য কয়েকটি চমৎকার অংশ রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দুই-একটি ছত্রে লেখক মনোজ্ঞ রূপকে ভাবকে মোহিনী বাণী দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্রতঃ ভাষায় সামঞ্জস্য এখানে নাই। নেহাত গুরুচণ্ডালী না হইলেও গুরু-লঘুর মিশ্রণে প্রবন্ধটির ভাষা স্থানে স্থানে পীড়াদায়কও হইয়াছে। তাহা ছাড়া

'ভোজে'র সহিত 'রোজ', 'রচনা'র সহিত রসনা'র কষ্টকৃত মিল ঠিক অনুপ্রাস হইয়াছে বলিতে পারি না। এইরূপ গিল্টির গহনা ভাষার সৌন্দর্য বাড়াইয়াছে বলিতে পারি না।

লেখক প্রবীণ—বয়সেও বটে, জ্ঞানেও বটে, অভিজ্ঞতাও তাঁহার প্রচুর, অধিকন্তু তিনি কবি। তাই প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কেই প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। এইভাবে দেখলে উহার মধ্যে চিন্তার বস্তু পাওয়া যাইবে। আধুনিক মনে এই প্রবন্ধের অনেক মন্তব্য ও মত সম্বন্ধে সংশয় ও জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে। সেই সূত্রেও আলোচনা ও চিন্তার সুযোগ ঘটাইয়া প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ সার্থকতা দাবি করিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার - স্বাধীনতা-লাভের পর অনেকে ধারণা হইয়াছে যে সংগ্রাম তথা কর্তব্যেরও শেষ হইয়াছে, এখন হইতে নেতৃবৃন্দ ও সরকারই সুশাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন। কিন্তু খাদ্যলাভের পর উহার স্বাদগ্রহণ, এমন কি গলাধঃকরণ করিলেও যেমন তাহা অঙ্গীভূত হয় না, রাজনৈতিক স্বাধীনতা করায়ত্ত হইলেও তেমনই প্রকৃত স্বাধীনতা জাতির মজ্জাগত হয় না; আমাদেরও হয় নাই। খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগে তেমনি স্বাধীন জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত করিয়া তুলিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসে। সেই প্রয়োজনেই জাতীয় জীবনের যাবতীয় দুর্বলতা ও শৈথিল্য, অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত সংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এখনও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইবে। দেহমনে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বাধীনতার উপভোগ ও দায়িত্বভার বহনের শক্তি অর্জন করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বিপুল লোকক্ষয়ের পাপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির অবসাদ-গ্রস্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে এই বলিয়া রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত করান যে বহিঃশত্রুর বিনাশ হইলেও নির্বেদ, মোহ, দৈন্য, ভ্রান্তসংস্কার ও অহংবুদ্ধি প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শত্রুর সহিত সংগ্রাম বাকি রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই কথার মর্ম এই যে ধার্মিককে রাজপদে অধিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিলেই ধর্মরাজ্যের পত্তন হয়। গণতন্ত্রের যুগে সমগ্র জাতিই রাজ-শক্তির আধার। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বাণী এখন সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য।

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যুগপৎ জাতিগঠন ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরি-চালনা করিতেছিলেন। ঘটনাচক্রে সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে ভারতবর্ষ

ইতিমধ্যে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জাতিগঠনের কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। এই কাজ সুসম্পন্ন না হইলে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা অলীক ভ্রমে পর্যবসিত হইবে।

কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই জাতি যদি দেহমনে সুগঠিত না হয় তবে সেই জাতির প্রতিনিধিশাসিত গণতন্ত্র কখনই কল্যাণপ্রদ হইবে না। যেমন গাছ তেমনি ফুল, যেমন খনি তেমনি হয় মণি। সেইরূপ যেমন জাতি তাহার শাসক-প্রতিনিধিও তেমনি হইবে। অতএব জাতীয় চরিত্রের সম্যক্ উৎকর্ষসাধন অবিলম্বে প্রয়োজন।

এই দিক্ দিয়া কাজ হইল দেশবাসীর মধ্যে প্রকৃতি গণতান্ত্রিক-বোধ সঞ্চার করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার রহিয়াছে। এই অধিকারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল ও তাহার নিম্নতর ভৃত্যের মর্যাদা সমান। স্পষ্টতঃ, এই ভোটাধিকারের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিলক্ষণ। এই অধিকার প্রয়োগেই ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল নিহিত। ইহার অপব্যবহার তাই মূর্খতা। ধনী দরিদ্র শিক্ষিত-মূর্খ জাতি ধর্মনির্বিশেষে গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই সমান অধিকার, সকলেই সমান, সকলেই আপন—এই ভাবই গণতান্ত্রিক মনোভাব। এদেশে স্বামী বিবেকানন্দ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটা ধর্মসংস্কারকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন যে মানুষমাত্রেই ভগবানের অধিষ্ঠান। এই পথে আমরা প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাব সহজে গড়িয়া তুলিতে পারি।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সভ্যেরই নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেই মনোভাবসহকারে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ ও তাঁহাদের প্রণীত আইনসমূহের শাসন স্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত। প্রত্যেক সভ্যদেশে নির্বাচনে যাহারা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে তাহাদের প্রতি এইরূপ আনুগত্য স্বীকৃত হয়। অপরপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি যথারীতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। মানসিংহ পরাজিত ঈশা খাঁকে বীরত্বে নিজেরই সমকক্ষ ভাবিতেন। সেইরূপ নির্বাচনকালীন বৈরিভাব ভুলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির পক্ষে পরস্পরকে মিত্র ও সহযোগী জ্ঞান করাই সঙ্গত। বিশেষ করিয়া সমাজ বা জাতির কল্যাণকর্মে সকলেরই সহযোগিতা একান্ত কাম্য। প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ লাগিয়াই

থাকিত। কিন্তু বহিঃশক্রর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিত। আমাদেরও সেইরূপ অন্নাভাব, অনটন, ব্যাধি ও কুসংস্কার প্রভৃতি জাতির সাধারণ শত্রুগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কর্তব্য।

বিভিন্ন প্রদেশ, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম এমনকি জেলাগুলির মধ্যে পর্যন্ত ভেদবুদ্ধির প্রাদুর্ভাবই এই দেশকে চিরকাল দুর্বল ও ইংরাজের পদানত করিয়া রাখিয়াছিল। এই ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া সংহতির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হইবে। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে একটা জাতি দূরে থাকুক, প্রস্তররচিত তাজমহলও স্থায়ী হয় না।

তারপর চাই জাতীয়তাবোধের পুষ্টি। ইতিপূর্বে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগ ও প্রেরণা দেশময় যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, স্বাধীনতা-লাভের পর একটা নিশ্চিন্ত ভাব ও স্বার্থসংঘাত তাহাকে স্তিমিত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ ইংরাজ-বিদ্বেষ বা অতীত স্মৃতির মিথ্যা দম্ভ নয়। অতীত গৌরবের স্মৃতি স্বপ্নঘোর মাত্র। মাতৃভূমি আমাদের জননী, আমরা সেই একমায়ের সন্তান, ভাইবোন। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরস্পরের কল্যাণে প্রবৃত্তি এবং অকল্যাণে নিবৃত্তিই প্রকৃত জাতীয়তাবোধের সারকথা।

পাড়াগাঁয়ে রাস্তার দুইধারে মাটির পাঁচিলগুলি ক্রমাগত আগাইয়া আসিয়া রাস্তাটিকে গ্রাস করে। পানীয় জলের আধার পুষ্করিণীটিকে লোকে নানাভাবে দূষিত করে। এদেশের রেলের কামরা, স্টেশনের প্লাটফরম, আর শহরের ফুটপাতগুলি নোঙরায় ভর্তি থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ হাটে বাজারে রোগ-সংক্রমণ করিয়া বেড়ায়। এভাবে অপর সকলের অমঙ্গল তথা সমাজের অনিষ্ট করার অভ্যাস জাতীয়তাবোধের অভাব হইতে জাত। অপরের অসুবিধার প্রতি উদাসীনতা শহরে আরও প্রকট। হোলী, দেওয়ালী, সর্বজনীন পূজা ও প্রতিমানিরঞ্জন উপলক্ষে লাউডস্পীকারের কর্ণবিদারী চীৎকার ও অন্যান্য অসংখ্য উপদ্রব। রাস্তায় রাস্তায় ময়লা আর ভাঙা কাচ-বর্ষণের সময় নগ্নপদ মানুষগুলির অসুবিধার কথা কেহ ভাবে না। কেহ কেহ ট্রেন-ট্রাম বা বাসে একবার উঠিতে পারিলে অন্যের পথরোধ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। লাইব্রেরীর বই হইতে মূল্যবান্ অংশ ছিঁড়িয়া লইতে অথবা অন্যভাবে বইগুলির ক্ষতি করিতে কাহারও কাহারও বাধে না। এদেশের অত্যাচারী বরযাত্রীদের মতো ছেলেদের মধ্যেও একটা তছনছ করার দিকে ঝোঁক বড় বেশি। স্কুলে বেঞ্চিগুলি কাটিয়া, লিখিয়া, কালি বা পানের পিকে নষ্ট করা তাহাদের স্বভাব।

তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য পরীক্ষাদির ফল কাচের আধারের মধ্যে প্রাচীরে ঝুলাইতে হয়। এই জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাব বড়দের মধ্যেও সমান। খাদ্য ও ঔষধ-ব্যবসায়ীদের ভেজাল সরবরাহ ইহার একটি কুৎসিত দৃষ্টান্ত। এসকলের মূলে আছে আত্মস্বার্থের নীচ লালসা। অথচ জাতির স্বার্থে আত্মস্বার্থ-বিসর্জনই জাতীয়তাবোধের মর্মকথা।

জাতীয়তাবোধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ। ইহার মূল জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে নিহিত। সভ্য জাতিমাত্রই এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে গর্বের সহিত রক্ষা করে, কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা এই সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা অধিকতর মূল্যবান্। জাতির আচার ও সংস্কারের ত্রুটি অবশ্যই বর্জনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষা, ভূষা, ব্যবহারে অকারণে পরজাতির অনুকরণ মার্জনীয় নয়। পরপুষ্ট পরগাছা বা নদীর জলে পুষ্ট খালটির মতো পরানুকারীও চিরকাল পরাধীন।

জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার অত্যন্ত গুরুত্ব। শৃঙ্খলার শক্তিতে বিদেশীরা সংখ্যাল্প হইয়াও বার বার এদেশে জয়ী হইয়াছে। অপরপক্ষে শৃঙ্খলার অভাবে সংখ্যায় বেশি হইয়াও ভারতবাসী বহুবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে শৃঙ্খলার অভাবে সৈন্যদলও অসংহত জনতায় পরিণত হয় এবং সেই জনতা নিজেই নিজের পরাভবের কারণ হয়। ভারতের ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। ইউরোপের জাতিগুলি বড় হইয়াছে এই শৃঙ্খলারই গুণে। তাহাদের জীবনের সর্ববিষয়ে,—পড়াশুনা, খেলাধুলা, প্রার্থনা বা ভোজসভা, এমনকি শবযাত্রার মধ্যেও নিখুঁত শৃঙ্খলাবোধ দেখা যায়। শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহাদের হাসপাতাল হইতে হাটে মাঠে সর্বত্র। এইরূপ পরিবেশে মানুষ হয় বলিয়াই সেখানকার মানুষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যতিরেকেও শৃঙ্খলাপরায়ণ হইয়া উঠে। শৃঙ্খলা তাহাদের নিকট বন্ধন নয়, জীবনের অঙ্গীভূত সহজ বস্তু। আমাদের দেশে কিন্তু ঘরে বাইরে, সামাজিক জীবনে আর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এই বস্তুটার একান্ত অভাব। রোগীর গৃহে অনর্থক ভিড়, শ্মশানযাত্রায় বিশৃঙ্খল জনতা, সভা-সমিতিতে গণ্ডগোল, শ্রাদ্ধের কীর্তনে শ্রোতৃবৃন্দের গল্প আর ধূমপান—এইটাই সাধারণ দৃশ্য। সেইজন্য এদেশে ব্যবসা বেশিদিন টিকে না। ট্রামে বাসে এইজন্য কত দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যক্তিজীবনেও এ-শৃঙ্খলার অভাবে আমাদের অপচয়ের সীমা নাই। অনেক সংসারে দারিদ্র্য এই কারণে।

এদেশের শৃঙ্খলাপূর্ণ বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষার ফল ভালো। বাস্তবিক পাঠকক্ষে শৃঙ্খলার অভাব ঘটিলে মহাপণ্ডিত শিক্ষকও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সুতরাং জাতীয় জীবনে সর্বত্র শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কারণ শৃঙ্খলা শুধু প্রয়োজনীয় নয়, উহা সুন্দরও বটে। শৃঙ্খলাহীন বস্তু, ব্যবহার বা বিষয়, জীবদেহের খণ্ডিত অংশের মতো সামঞ্জস্যবিহীন, অতএব কুৎসিত। পথচারী মাতাল অসুন্দর, কেননা তাহার অবিন্যস্ত পদক্ষেপ শৃঙ্খলাবর্জিত। সেইরূপ আচরণে বা বাক্যে রীতিনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘন করিলেই মানুষ অসুন্দর হইয়া পড়ে।

শৃঙ্খলাবোধ হইতে আসে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা। ইহার অভাবেই রোজ হাজিরায় বিলম্ব হয়, দেখা-সাক্ষাতের সময় ঠিক থাকে না, ট্রেন ফেল হয়, সভা বসে না ঠিক সময়। তাহা ছাড়া জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাহেন্দ্রক্ষণকে আমরা সময়ানুবর্তিতার অভাবে কাজে লাগাইতে পারি না। ফলে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। রেডিও, ট্রেন বা পরীক্ষার সময়-সূচী আমাদের সম্মুখে যে সময়ানুবর্তিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা হইতে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

শৃঙ্খলা স্মৃতিশক্তির সহায়ক; শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তু সহজে মনে রাখা যায়। শেষ কথা, শৃঙ্খলাই এই জগৎ ও সৃষ্টির অমোঘ ভিত্তি—উহা মানবধর্মেরও অঙ্গীভূত। বিদ্যার প্রয়োজন বিনয়ে অর্থাৎ শৃঙ্খলা-বোধসঞ্চারে, কেননা এই বিনয় বা শৃঙ্খলা-নিষ্ঠাই মানুষের যোগ্যতার নিদর্শন।

অতএব ছাত্রের সাধনায় শৃঙ্খলানিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য। ভবিষ্যতের উচ্চ লক্ষ্যে একাগ্র মনোযোগ সহকারে বিদ্যা বা দেহচর্চা বা খেলাধুলায় নিয়মানুগ হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা একটা তপস্যা এবং সেই তপস্যার কাম্য চরিত্রবল। এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র ও ধনিসন্তানও গুরুগৃহে শিক্ষাকালে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দৈহিক শ্রম স্বীকার করিয়া বিলাস-বর্জিত জীবন যাপন করিত। এ যুগেও আমাদের দেশে সেই আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষার উপাদান ও পরিবেশ বদলাইয়াছে সন্দেহ নাই, তবু আবহমানকাল প্রচলিত শিক্ষার মূলনীতি হইতে ভ্রষ্ট হওয়া আমাদের সঙ্গত নয়। চরিত্রগঠনই এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সেই নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইলে ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনে শুচিতা, দৃঢ়তা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির অভাব দেখা দিবে। ফলে জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন এবং রাষ্ট্রশক্তির শৈথিল্য ও দুর্বলতা অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষের অপর একটি উপাদান হইল পৌরুষ-চৈতন্য বা ক্ষাত্রমনোভাব। সভ্যদেশের মানুষ ইহারই চরিতার্থতার জন্য স্বেচ্ছায় দুরূহ অভিযানে জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহারই প্রেরণায় তাহারা নিঃস্বার্থভাবে বিপন্ন ও দুর্বলের জন্য প্রাণপাত করিতেও বিমুখ হয় না। ইহারই অনুশীলন ঘটে তাহাদের খেলার মাঠে, সেখানে ইহাকেই বলে sportsmanlike spirit। তাই ওয়েলিংটন বলিয়াছেন যে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় হইয়াছিল ইটনের খেলার মাঠে। আমাদের দেশেও যে এই ক্ষাত্রভাব নাই বা ছিল না তাহা নহে; ইহা যাঁহার আছে তিনি দেহশ্রম বা দীনদরিদ্রের সেবাকে হীন মনে করেন না। নেপোলিয়ান একবার এক বৃদ্ধার মাথায় মোট তুলিয়া দিয়াছিলেন; অন্যেরা এই কাজ মানহানিকর বিবেচনায় বৃদ্ধাকে তিরস্কারই করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ও একদিন বৌবাজারের পথে এক মুটের মাথায় মাল তুলিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এক বিলাসী যুবককে লজ্জা দিবার জন্য নিজেই মোট বহিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া রাস্তার রোগীকে কোলে করিয়া বাড়ি আনিয়াও তিনি সেবা করিতেন। মুর্শিদাবাদের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট লী-সাহেব একবার ক্লান্ত একদল কৃষকের সহিত আধঘণ্টা কাল কোদাল চালাইয়াছিলেন। এইগুলিই পৌরুষ-চৈতন্যের উদাহরণ। ইহা যাঁহার আছে সেই ব্যক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, স্বার্থত্যাগ করেন ন্যায়ের জন্য। তিনি ধৈর্যশীল, নীরবকর্মী, তাঁহার নিকট কথার চাইতে কাজ বড়। তিনি কষ্টকে ভয় করেন না, বাধা সৃষ্টি করেন না কাহারও অগ্রগমনে, দুর্বলকে ঠেলিয়া দেন না পিছনে। কেবল দুর্গম পথেই থাকেন তিনি সবার পুরোভাগে।

স্বাধীনতার দায়িত্ববোধ হইতে শৃঙ্খলানিষ্ঠতা, জাতীয়তাবোধ, ক্ষাত্রমনোভাব ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত হইলেই জাতি প্রকৃত চরিত্রবল লাভ করিবে। আইন-কানুনে তাহা হইবার নয়। আশা করা যায়, দেশের বহু পতিত জমিতে যেমন শস্য-উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি দেশবাসীর মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলীর বিকাশ সম্ভব হইবে। দামোদরের অদম্য জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শস্য ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনে নিয়োগ করা হইয়াছে। দেশের বিপুল জনতাকে তেমনি গণশক্তির অভ্যুদয় ও কল্যাণকর্মে নিশ্চয় নিয়োগ করা যাইবে। ঘুমের পর ঘোর কাটিতে একটু দেরি হয়। পরাধীনতার আবেশ কাটিতে সেইরূপ একটু বিলম্ব হইতেছে—তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই।

শব্দার্থ ও পদটীকা প্রভৃতি

অনুচ্ছেদ ১। মুক্তি-সংগ্রামের—রাজনৈতিক স্বাধীনতা-যুদ্ধের; বিদেশীর শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য আন্দোলনের। **মুক্তি-সংগ্রামের অবসান হইয়াছে**—ব্রিটিশরাজের শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছিল তাহা ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে শেষ হইল। সেইদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। **স্বাধীনতা পাইয়া অনেকে……দায়ী থাকিবেন**—স্বাধীনতা-লাভের পূর্বপর্যন্ত বহু দেশবাসী স্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। বহু লোক কারাবরণ, নির্যাতন-ভোগ, এমনকি মৃত্যুবরণও করিয়াছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে সেই প্রেরণা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন দেশের শাসনভার দেশের লোকের দ্বারাই গঠিত সরকারের হাতে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দও রহিয়াছেন। কাজেই সাধারণ মানুষ তাঁহাদের উপর নিশ্চিন্তে আস্থা স্থাপন করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ধারণা তাহাদের কর্তব্য শেষ। **মন্তব্য ঃ** ইহার কারণ অবশ্য দেশবাসীর অজ্ঞতাই নয়, নেতৃবৃন্দের অপরাধও বটে। তাঁহারা দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধানের জন্য সাধারণের সম্মুখে কোনো কার্যসূচী রাখিতে পারেন নাই, পারেন নাই দেশগঠনের সর্বব্যাপক একটা উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে। ফলে দিশাহারা সাধারণ মানুষ হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে। স্বায়ত্ত—নিজের আয়ত্ত; সম্পূর্ণভাবে নিজের করিয়া লওয়া। আত্মসাৎ—আত্ম বা নিজের মধ্যে নিঃশেষে গ্রহণ করা। গলাধঃকরণ—গিলিয়া ফেলা। **পরিপাক করিয়া……পরমপ্রাপ্তি**—খাদ্যকে হজম করিয়া তাহা হইতে দেহের উপাদান সংগ্রহ করা হয়। এইভাবেই খাদ্য দেহের মধ্যে মিশিয়া যায়। এইটাই খাদ্য-গ্রহণের চরম পর্যায় এবং সত্যকার উপযোগিতা। লেখকের বক্তব্য, স্বাধীনতাকেও এইভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের অবিভাজ্য উপাদান করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ তাহা সম্ভব না হয় ততক্ষণ স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে ভাবা ভুল।

অ. ২। বাহিরের সংগ্রামের—বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকে লেখক বাহিরের সংগ্রাম বলিয়াছেন। ইংরেজ বিদেশী, প্রথমে তাহাদের বিদায় করিয়া পরে জাতীয় জীবনের দোষত্রুটির সংস্কার করা যাইবে এমনই ছিল সেই সংগ্রামের লক্ষ্য। মোট কথা, দেশের মধ্যে বা দেশবাসীর ভিতর কোথায় কি সংস্কার প্রয়োজন, তখন সেদিকে কাহারও তেমন একটা

লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল শুধু বিদেশীর হাত হইতে শাসনভার দেশের লোকের করায়ত্ত করারই দিকে। এই হিসাবে উহা বাহিরের সংগ্রাম। উহা দেশের অভ্যন্তরের বা জাতীয় জীবনের অসংখ্য গলদ দূর করার দিকে চালিত হয় নাই। সর্ববিধ—সকল রকমের; সকল প্রকার। মূঢ়তা—মূর্খতা। **ভ্রান্ত-সংস্কার**—ভুল ধারণা ও বিশ্বাস। **প্রকৃতিস্থ**—অবিকৃত ও স্বাভাবিক অবস্থাসম্পন্ন; বিকারহীন অবস্থাসম্পন্ন।

অ. ৩। **বহুপ্রাণহানিজনিত পাপের**—(কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে) বহু লোক হত্যার জন্য যে পাপ সেই পাপের। অবসাদগ্রস্ত—ক্লান্তি ও বিষাদে ভগ্নোদ্যম। ধর্মরাজ—যুধিষ্ঠির; যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক ছিলেন; সেইজন্য এই নামে অভিহিত হইতেন। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন ধর্মপুত্র, ধর্মরূপ যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। **নির্বেদ**—খেদ, বৈরাগ্য। মোহ—মিথ্যার ঘোর। দৈন্য—দারিদ্র্য। **অহংবুদ্ধি**—অহংকার; আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা। **ধর্মরাজ্য**—শ্রীকৃষ্ণের মতে যাহার দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম। সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যই ধর্মরাজ্য। **ধর্মানুমত ব্যবস্থা**—ধর্মসম্মত ব্যবস্থা; যে ব্যবস্থায় প্রাণিগণের স্থিতি বা রক্ষা সম্ভব হয় সেই ব্যবস্থা। **বিধিবদ্ধ**—নিয়ম বা আইনের অন্তর্ভুক্ত। **'কেবল ধার্মিকের রাজা…বিধিবদ্ধ করাও চাই'**—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ হইতে অংশটি উদ্ধৃত। অংশটি সম্পূর্ণভাবে এইরূপ: "কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধার্মিক ধর্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এইজন্য ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা চাই। রণজয় রাজ্য-স্থাপনের প্রথম কার্যমাত্র, তাহার শাসনের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রধান কার্য।"—ইহার অর্থ মোটামুটিভাবে এই যে ব্যক্তিবিশেষের সাধুতার উপর একটা কল্যাণরাষ্ট্র স্থাপিত হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই কতকগুলি কল্যাণকর স্থায়ী বিধান। **মন্তব্য**: আলোচ্য প্রসঙ্গে লেখক যেন ধরিয়া লইতেছেন যে আপাততঃ কয়েকজন ধার্মিক বা জনহিতৈষী ব্যক্তি রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের উত্তরাধিকারী তেমন না-ও হইতে পারেন। কাজেই ভারতরাষ্ট্রকে স্থায়িভাবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কতকগুলি সুদৃঢ় বিধি বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। **গণতন্ত্রশাসনে**—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

শাসনব্যবস্থায়। ইদানীন্তন—আধুনিক; আজকালকার। অনুকল্প—বদল বা substitute। **রাজার ইদানীন্তন অনুকল্প**—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আজকালকার সমগ্র জাতিকেই রাজার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ জাতিই রাজা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। **শাশ্বতী**—সনাতন, চিরকালের। 'উক্তি'-শব্দের বিশেষণ বলিয়া শাশ্বত স্ত্রীলিঙ্গে শাশ্বতী হইয়াছে। **ভাগবতী**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কথিত। **গণতন্ত্র-শাসনে···প্রযোজ্য**—আজকাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র জাতিই রাজার স্থলাভিষিক্ত। কাজেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেও বলা যাইতে পারে। উক্তিটির আলোকে এই অংশের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ : ধর্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইলে একজন ধার্মিককে রাজা করিলেই হইল না। কারণ সেই রাজার উত্তরাধিকারী ধার্মিক না-ও হইতে পারেন। কাজেই প্রথম প্রয়োজন ধর্মসঙ্গত এমন ব্যবস্থা প্রচলন, যাহা সকল রাজাকেই মান্য করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এইরূপ ব্যবস্থার সমান প্রয়োজন। গণতন্ত্রে জনগণ তথা জাতিই সত্যকার রাজা। সেই রাজা প্রতিনিধিদের দ্বারা রাজ্য শাসন করেন। এখন এই প্রতিনিধি সব সময় সমান হইতে পারে না। সকলেই জাতির সেবায় একনিষ্ঠ না-ও থাকিতে পারে। কাজেই সুদৃঢ় বিধিব্যবস্থার বন্ধনে তাহাদের পথ বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। এই অর্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ আজকাল সকল গণতান্ত্রিক জাতির প্রতিই প্রযোজ্য।

অ. ৪। **সব্যসাচী**—ডান বাম দুই হাত যাহার সমান চলে। **মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ···সংগ্রাম করিতেছিলেন**—মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধেই এই কথা বিশেষভাবে সত্য। গান্ধীজির আন্দোলনের মধ্যে নৈতিক ও রাজনৈতিক এই দুইটি ধারাই বিদ্যমান ছিল। একদিকে সামাজিক সংস্কার, অপরদিকে সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজের সহিত সংগ্রাম—এই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। কাজেই এই দুইদিকেই তিনি একসঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন। **ঘটনাচক্রের উদ্‌বর্তনে**—ঘটনারূপ চাকাটির ঘূর্ণনে; ঘটনাক্রমে। রাহুগ্রাস—পৌরাণিক মতে—সমুদ্র-মন্থনের পর দেবতাগণের সহিত ছদ্মবেশী কেতু নামক অসুর অমৃত পান করে। কিন্তু অমৃত তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত যাইতে না যাইতেই টের পাইয়া বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে তাহার শিরশ্ছেদ করেন। অমৃতপানের ফলে কেতুর মাথাটি অমর হয়। রাহুনামে উহাই সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে। **রাহুগ্রাস হইতে···মুক্তি হয় নাই**—সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত

হই নাই। সূর্য ও চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিলে গ্রহণ হয়। তখন বিশ্বচরাচর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ব্রিটিশরাজ রাহুর মতোই ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল এইভাবে পরাধীন ভারতে জমাট বাঁধিয়া ছিল দুঃখদৈন্যের অন্ধকার। দ্বিতীয়ত, গ্রহণের সময় হিন্দুরা একপ্রকার অশৌচ পালন করিয়া থাকে। সেই সময় আহারাদি বন্ধ থাকে। গ্রহণের পর অর্থাৎ রাহুগ্রাস হইতে সূর্য বা চন্দ্রের মুক্তির পরই স্নানাদি সারিয়া মানুষ শুদ্ধ হয়। সেইরূপ সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেই মাত্র ভারতবাসীর অশৌচ কাটিবে। লেখকের মতে ইংরেজ-শাসন শেষ হইলেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও আসে নাই। বাস্তবিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা কলাকৌশলে ইংরেজ জাতি এখনও ভারতবর্ষকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ এখনও কমনওয়েলথ (Commonwealth)-ভুক্ত। এই হিসাবে ব্রিটিশরাজের কবল-স্বরূপ রাহুগ্রাস হইতে এখনও ভারতের পূর্ণমুক্তি হয় নাই, অতএব অশৌচ এখনও কাটে নাই।

শরদভ্রচ্ছায়া, সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ—দুইটি কথাই 'স্বাধীনতা'-র বিশেষণ। কেমন স্বাধীনতা? শরৎকালের অভ্রের মতো, সন্ধ্যাকালীন অভ্রের বিলমের মতো। অভ্র=মেঘ (অপ্ অর্থাৎ জলকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে যে এই অর্থে অপ্= √ভৃ+কর্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয়=অভ্র); বিভ্রম=বিশেষভাবের শোভা বা সৌন্দর্য; বিভ্রমের অর্থ এখানে বিভ্রান্তি নয়। এখানে 'ছায়া' ও 'নিভ' দুইটি শব্দই সাদৃশ্যবাচক। **স্বাধীনতা……সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ**—জাতি যদি দেহে মনে প্রকৃতিস্থ ও শক্তিমান হইয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে যে স্বাধীনতা আজ আমরা দীর্ঘকাল পরে লাভ করিয়াছি, তাহা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইবে, তাহার কোনও ফলই আমরা ভোগ করিতে পারিব না। শরতের মেঘে বৃষ্টি হয় না, যদি বা হয় তাহা এত অল্প যে শস্যের তাহাতে কোনও উপকার হয় না; অথচ সে মেঘ আসে কত ঘটা করিয়া—তাহার যত রূপ, তত গর্জন; কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহাকে আকাশের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের এই স্বাধীনতার যতই ঘটা, যতই সমারোহ, যতই মহিমা থাকুক না কেন, ইহাকে আমরা হারাইব, যদি ইহাকে রক্ষার যোগ্য আমরা না হই—অযোগ্য অপাত্রের স্বাধীনতা আকাশের মেঘের মতো ব্যর্থ হইতে বাধ্য। দুর্বলের স্বাধীনতা সন্ধ্যার মেঘের বিচিত্রবর্ণবিলাসের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

অ. ৫। **আমাদের এই স্বাধীন…গণতন্ত্রীয়**—আমাদের (ভারতবর্ষের) শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার গণতান্ত্রিক, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দই এই সরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন। স্থায়ী কর্মচারিগণ তাঁহাদের অনুগত হইয়াই কাজ করে। এইভাবে জনসাধারণই তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশের শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়াই উক্ত শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত হয়। **গাণপত্য**—গণপতির উপাসক এই অর্থে গণপতি+ষ্যঞ্ = গাণপত্য। গণপতি বলিতে লেখক জনসাধারণকে বুঝাইতেছেন। অতুল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'গণেশ'-প্রবন্ধে জনসাধারণকে গণেশ অর্থাৎ গণপতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যে গণ বা সাধারণ সে-ই পতি বা রাজা—এই অর্থে গণপতি এবং তাঁহার অনুগত প্রতিটি দেশবাসী গাণপত্য। **"আমরা এখন গাণপত্য" কথাটার সহজ অর্থ এই যে আমরা এখন গণতন্ত্রে (Democracy) বিশ্বাসী। ভাগ্যবিধাতা**—জীবনের শুভাশুভ, সার্থকতা বা সুখদুঃখ—এক-কথায় সমগ্র জীবন যে শক্তির দ্বারা নিয়মিত তাহারই নাম ভাগ্য। এই ভাগ্যকেও বহুলাংশে গঠন করে একটা রাষ্ট্র। অন্তিমে জনসাধারণই রাষ্ট্র। কাজেই জনগণই ব্যক্তিজীবনের নিয়ামক ও গঠনকর্তা। এখানে সেই অর্থে জনগণকে ব্যক্তিজীবনের ভাগ্যবিধাতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। **প্রতিনিধি-বর্গও তদনুরূপ হইবে**—জাতীয় জীবনের সাধারণ দোষগুণ হইতে ব্যক্তি-বিশেষ প্রায়ই মুক্ত হইতে পারে না। দুই-একজন লোকোত্তর পুরুষের কথা বাদ দিলে, এ কথা বলা যায় সাধারণ মানুষ তাহার পরিবেশের দাস। কাজেই সমগ্র জাতির চরিত্রবল উন্নত না হইলে তাহার প্রতিনিধিবর্গও উন্নতচরিত্র হইতে পারে না। জাতি যদি গাছ হয়, ব্যক্তি তাহার ফল। যেমন গাছ ফলও তেমনই হইবে। **পদ্মরাগ**—পদ্মের মতো রক্তাভবর্ণযুক্ত মণিবিশেষ। আকর—খনি। পদ্মের আকরে…জন্মে না—পদ্মরাগ মণি খনিতে জন্মায়, কিন্তু কাচ খনিজ নহে। কাচ তৈরী হয় কৃত্রিম উপায়ে, কারখানায়। **কাচের আকরেও**—কাচের কোনো আকর বা খনি হয় না। এক্ষেত্রে লেখক একটু অসতর্ক।

অ. ৬। **এজন্য**—জাতীয় চরিত্রের সর্বতোমুখী সংস্কারের জন্য। আবিষ্ট—পূর্ণ। **বহুশতবর্ষ যে জাতি……হইতে হইবে**—ভারতবর্ষের পরাধীনতা মুসলমান যুগ হইতে আরম্ভ। তাহার পরও দুই শত বৎসর ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন ছিল। পরাধীনতা যেন ঘন অন্ধকার। এই অবস্থায় মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি

লোপ পায়, দেশ অজ্ঞতায় মগ্ন থাকে, কাজে কাজেই পরাধীনতা অন্ধকার। বহুকাল অন্ধকারে থাকিলে চক্ষু সহসা আলোক সহ্য করিতে পারে না। ধীরে ধীরে মানাইয়া লইবার পরই মাত্র চক্ষু আলোক-গ্রহণে সমর্থ হয়। পরাধীনতার পর স্বাধীনতারূপ আলোক-গ্রহণে সেইরূপ ভারতবাসীর আপাততঃ অসুবিধা হইতেছে। স্বাধীন দেশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার—দেশের শাসক-প্রতিনিধি বা জনসাধারণ কাহারও ঠিক ধাতস্থ হয় নাই। সেইজন্যই স্বাধীনতা-লাভের পর আমরা নানাদিকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছি। ক্রমে স্বাধীনতার তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হইবে; দেশবাসী স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে—ইহাই লেখকের বিশ্বাস। শাসন-বিধানে—শাসনতন্ত্রে, সংবিধানে। মূল্যমর্যাদা—দর ও কদর অর্থাৎ গুরুত্ব। **এইখানেই···ব্যক্তিগত স্বাধীনতা**—লেখক এখানে ভোটাধিকারের কথা বলিতেছেন। ভোটাধিকারে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন। কাহাকে ভোট দিবে বা দিবে না, ইহা তাহার ব্যক্তিগত বিচারের ব্যাপার। এখানে অন্য কেহ হাত দিতে পারে না। আলোচ্য অংশটি পড়িলে মনে হয় নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা যেন ভোটাধি-কারেই সীমাবদ্ধ, কারণ, 'এইখানেই' কথাটার মধ্যে 'অন্যত্র নয়' এমন একটা অর্থ অনিবার্য; কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। **মন্তব্য**ঃ লেখক একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। যে দেশে ভোটের অধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর প্রতি শতে নব্বই জনের বেশী নিরক্ষর, সে দেশে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', 'অধিকার', 'মর্যাদা', 'এত বড় মর্যাদা', 'দায়িত্ব' প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির অর্থবোধ এবং তদনুসারে কর্তব্যপালন লেখক মহাশয় কাহাদের কাছে প্রত্যাশা করিতেছেন? **কোনো ক্ষেত্রে, কোনো প্রয়োজনে···বিধানের প্রধান কথা**—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কাহারও প্রতি কোনোপ্রকার দুর্বলতা বা অন্য ব্যক্তি ও অবস্থার চাপে, ভয়ে বা নির্বাচনপ্রার্থীর নিকট কার্যসিদ্ধি—প্রভৃতি কোনো কারণেই ভোট দেওয়া সঙ্গত নয়। ভোট দিবার সময় জাতীয় স্বার্থ ই সবচাইতে বড় হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের গোড়ার কথা এইটাই। **ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রীয় মনোভাব**—গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান অধিকার। এই কথা মনেপ্রাণে মানিয়া লইলে ভেদবুদ্ধি লোপ পায় এবং দেশবাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই, স্বজাতি ও সমান মর্যাদার পাত্র, এই ভাব বদ্ধমূল হয়। এইরূপ সাম্যবোধকেই সত্যকার গণতান্ত্রিক মনোভাব বলা হয়।

অ. ৭। **ভেদবুদ্ধিতে মোহাচ্ছন্ন······কথা নয়**—ভারতবাসীর মধ্যে

ভেদজ্ঞান নানাপ্রকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, এমনকি প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়াও এখানে ভেদসৃষ্টি হইয়াছে। এই ভেদবুদ্ধি একটা মোহ এবং ইহার আবেশে দেশবাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান, এই কথা সহজে বুঝিতে পারে না। বহু যুগের ভেদাভেদ একদিনে কাটে না। কাজেই দেশবাসীর পক্ষে প্রকৃত গণ-তান্ত্রিক মনোভাব গড়া সহজ কথা নয়। **"মানুষের প্রাণের ঠাকুর"**—মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠিত ভগবান্। রবীন্দ্রনাথের 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতা হইতে অংশটি উদ্ধৃত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান্ বিদ্যমান ;—রবীন্দ্রনাথ সেই ভগবান্‌কেই মানুষের প্রাণের ঠাকুর বলিয়াছেন। **এই আধ্যাত্মিক ধর্মবুদ্ধিকে ...করিতে হইবে**—সাধারণ ভারতবাসীর একটা ধর্মসংস্কার আছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান্ রহিয়াছেন। এই সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক মানুষকেই আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ভাবিতে পারি। এইভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। **স্বামী বিবেকানন্দ......উদাত্ত আবেদন**—স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ— বহুবার বহুপ্রকারে সাম্যের মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে বলিয়াছেন আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকল ভারতবাসী ভাই-ভাই। গান্ধীজি তাঁহার হরিজন আন্দোলন প্রসঙ্গে বার বার বলিয়াছেন যে জাতিভেদ পাপ, দেশবাসী সকলেই সমান। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন :

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

জাতির প্রতি বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ সকলেরই মূল আবেদন এই যে ভেদবুদ্ধি তাহারা বর্জন করুক। দেশের সকলেই সমান, সকলেই ভাই—এই জ্ঞান তাহাদের মধ্যে দৃঢ় হউক ; ইহাই ছিল তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

অ. ৮। বশ্যতা—বাধ্যতা। **কেবল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান......গণতন্ত্র-বিরোধী**—রাষ্ট্র বা অন্য যে-কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক সংস্থার সভ্যবৃন্দের পক্ষে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শন একান্ত কর্তব্য। গণতান্ত্রিক বিধানে গরিষ্ঠ দলই কর্তৃত্ব করে এবং নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। সেইগুলিকে সংখ্যা-ধিক্যের ভোটে যতক্ষণ নাকচ করা না যায় ততক্ষণ প্রত্যেক সভ্যকে সেই আইন-কানুন মানিতে হয়। এইগুলি না মানার অর্থ গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা।

অ. ৯। **প্রতিপক্ষ যে প্রায় সমকক্ষ** ইত্যাদি—গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে, কিন্তু বিরোধী দলকে নিজেদের সমান মর্যাদাই দিয়া থাকে। কারণ বিরোধী দল সরকারপক্ষের প্রায় সমান

অধিকারই রাখে এবং সময় সময় তাহারাও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করে। এই হিসাবে বিরোধী দল সরকারপক্ষের সমানই বটে। এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নয়।

অ. ১০। **মানসিংহ**—অম্বররাজ রাজপুতবীর। ইনি আকবরের শ্যালক এবং অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। আকবরের বাংলা অভিযানে তিনিই নেতৃত্ব করেন এবং বাংলার সুবাদার হিসাবে বাংলাবিজয় সম্পূর্ণ করেন। **ঈশা খাঁ**—ইনি বাংলার বারভুঁইঞার একজন বীর। ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের তিনি অধিপতি ছিলেন। মানসিংহ ঈশা খাঁকে শেষপর্যন্ত পর্যুদস্ত করেন কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত শৌর্যকে মর্যাদা দিতে ভুলেন না। যোদ্ধা হিসাবে কোনো অংশে ঈশা খাঁ যে মানসিংহের তুলনায় হীন ছিলেন না, এ কথা মানসিংহ কখনও ভুলেন নাই।

অ. ১১-১২। **প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি**—প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে বিখ্যাত কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। ইহারা আয়তনে ছিল নেহাত ছোট। ইহাদের শাসনতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদের অন্ত ছিল না। স্পার্টা, এথেন্স প্রভৃতি এইরূপ গ্রীক্ রাষ্ট্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। পারস্যের দরায়ুস ও অন্যান্য দ্বারা গ্রীস বহুবার আক্রান্ত হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় গ্রীক্ রাষ্ট্রগুলি অন্তর্বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইত। এইভাবেই বহিঃশত্রুর প্রতিরোধে গ্রীস অমরকাহিনী রচনা করিয়াছে। **এই সকল শত্রুর···আদর্শই অনুসরণীয়**—প্রাচীনকালে গ্রীক্ নগররাষ্ট্রগুলি প্রায়ই পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকিত। কিন্তু বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিলে সকল বিরোধ ভুলিয়া তাহারা একযোগে দেশ রক্ষা করিত। এই ঐক্যের আদর্শ ভারতবর্ষের অনুসরণ করা উচিত। বাহিরের শত্রু না থাকিলেও দেশের ভিতরে ভারতবাসীর অসংখ্য শত্রু। অন্ন ও স্বাস্থ্যের অভাব, রোগ দুঃখ অজ্ঞানতা প্রভৃতি এই শত্রুর দল—ইহাদের বিরুদ্ধে জাতিকে সংগ্রাম করিতে হইবে। লেখকের মত, এই ব্যাপারে অন্তত, গ্রীসদেশের ন্যায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

অ. ১৩-১৬। **ভিত্তি দৃঢ় না হইলে···হইত না**—তাজমহল বহু যুগ অক্ষয় সৌন্দর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা পাথরে গড়া। কিন্তু পাথর যত কঠিন হউক না কেন, পাথরের সৌধ স্থায়ী হয় কেবল উহার ভিতটির গাঁথুনির জন্য—পাথরের জন্য নয়। লেখক এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া এই কথাই বলিতে

চাহেন যে ভারতরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্যও একটা দৃঢ় সংহতির ভিত্তি প্রয়োজন। **জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধন**—স্বদেশী মনোভাবের জাগরণ। **উদাত্ত**—সমুচ্চ। মন্দীভূত—স্তিমিত; দুর্বল। **"অতীতের স্মৃতি……নাহি তাতে প্রয়োজন"** —এই অংশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে অতীতের স্মৃতি লইয়া মগ্ন থাকা তথা তাহারই স্বপ্ন দেখার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা মাত্র। এ যেন ইচ্ছা করিয়া ঘুমের আয়োজন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন-দেখার মধ্যে একটা সুখ নিশ্চয় আছে। কিন্তু উহা সুখের মায়া, প্রকৃত সুখ নয়। জাগিলেই সেই মায়া-সুখ মিথ্যা হইয়া যায়। তাহা ছাড়া এই অতীতের গৌরবকে লইয়া মগ্ন থাকিলে বাস্তব জীবনের প্রয়োজন উপেক্ষিত হইতে বাধ্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথ বিগত স্মৃতির মোহ ত্যাগ করারই নির্দেশ দিয়াছেন। নূতন ভারতের সৃষ্টির পথে এইরূপ মোহ শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকরও বটে। **বলেন্দ্রনাথ**—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। বলেন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু এই অল্পপরিসর জীবনেই তিনি একজন শক্তিশালী লেখক বলিয়া বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। **"অতীত স্মৃতির……পূজা করিতে হইবে।"**—অংশটি বলেন্দ্রনাথের 'স্বদেশমন্ত্র'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। অতীতদিনের গৌরবময় ইতিহাস লইয়া নিজেদের মধ্যে জল্পনা নিরর্থক। বলেন্দ্রনাথের মতে কাজ করাই বড কথা। দেশকে তিনি মাতৃরূপে দেখিয়াছেন, কাজেই মায়ের পূজা বলিতে তিনি দেশসেবা বুঝাইয়াছেন। দেশ-সেবাই এখন বড় কাজ—ইহাই অংশটির মূল বক্তব্য।

অ. ১৭-২২। সার্বজনীন—সাধারণ; বারোয়ারী। **গানকে বাণে** ইত্যাদি—গানের শব্দতরঙ্গ কানে আঘাত করে; তাহাতে সুখ হয়। কিন্তু লাউডস্পীকার দ্বারা সেই শব্দ যখন বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়, তখন উহা যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। বাণ যদি কানের পর্দায় বিঁধে তবে যেমন যন্ত্রণা হয়, তাহাতে যেমন শ্রবণশক্তি লোপ পায়, এই লাউডস্পীকারের গান তেমনি হইয়া উঠে। **পাদুকায়ুধ**—পাদুকা যাহার আয়ুধ বা অস্ত্র বা বর্ম অর্থাৎ জুতা-পরা। **বই-গুলিকে…হাসপাতালে পাঠাইতে হয়**—অর্থাৎ দপ্তরীবাড়ি পাঠাইতে হয়। হাসপাতালে যেমন মানুষ শরীরের রোগ সারাইয়া আসে, দপ্তরীবাড়িতে তেমনি বইগুলি বাঁধাই হইয়া যেন নূতন স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আসে। **যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ**—**'গল্পগুচ্ছ'র অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প। গল্পটি সংক্ষেপে এই: যজ্ঞেশ্বর এককালে সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এখন দরিদ্র ও বিপত্নীক। তাঁহার**

একমাত্র কন্যা কমলাকে তাঁহার জ্যাঠাইমা বড়ঘরে বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারই চাপে যজ্ঞেশ্বর পাত্রের সন্ধানে রাজশাহিতে জনৈক উকিল আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। উকিলের চেষ্টায় একটি 'চলনসই' পাত্র ঠিক হইল। উকিলবাবুর মক্কেল জমিদার গৌরসুন্দরের পুত্র বিভূতিভূষণ তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া কলেজে পড়িত। পাত্রপক্ষ যেদিন কমলাকে পছন্দ করিয়া গেল সেইদিন সন্ধ্যায় উকিলবাবু বিভূতিভূষণের এক পত্র পাইলেন, বিভূতি কমলাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক—ইহাই পত্রের মর্ম। উকিল জমিদারের ভয়ে বিবাহ-তারিখ আগাইয়া দিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাড়িতে আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় একদিন বিভূতি গিয়া সেখানে কমলাকে বিবাহের প্রস্তাব করিল। অচিরেই সব ঠিক হইল। গৌরসুন্দর শিক্ষিত পুত্রের জিদ মানিতে বাধ্য হইলেন। বিবাহের দিনে বরযাত্রীর দল জলকাদায় রাস্তা ভাঙিতে একটু নাজেহাল হইল। খাইবার সময় তাহারা ইহার শোধ লইল। সেদিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি; যজ্ঞেশ্বরের সব আয়োজন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল পার্শ্ববর্তী গ্রামের গোয়ালাদের কৃপায় প্রচুর ছানার যোগাড় আছে। খাইতে বসিয়া বরযাত্রীর দল ছানা ছুঁড়িয়া ফেলে, আবার চায়। যজ্ঞেশ্বর তো ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল। শেষ-পর্যন্ত বাড়ির ভিতর হইতে স্বয়ং বিভূতিভূষণ আসিয়া পরিবেশনে লাগিল। পিতাকে অনুরোধ করিয়া পাতে বসাইল এবং গোয়ালাদের নির্দেশ দিল কেহ যদি ছানা আবার কাদায় ফেলে, তবে তাহা তুলিয়া সেই পাতে দিতে হইবে। বরযাত্রীরা এইবার শায়েস্তা হইল। **যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে……আভাস পাওয়া যাইবে**—বাংলাদেশের বরযাত্রীদলের অত্যাচার কতটা যাইতে পারে তাহার খানিকটা পরিচয় 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পটিতে পাওয়া যায়। জিনিস নির্বিচারে নষ্ট করিয়া কন্যাপক্ষকে জব্দ করা—এই তাহাদের আনন্দ। লেখক কীর্তি বলিতে এখানে তাহাদের কদর্য ব্যবহারই বুঝাইতেছেন। **জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধ**—প্রত্যেক জাতির আচার-অনুষ্ঠানে চরিত্রগত বিশেষত্ব ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া একটা অনন্যসাধারণ রূপ আছে। এই রূপটি অন্যজাতি হইতে ভিন্ন, কাজেই প্রত্যেক জাতিই অপর প্রত্যেক জাতি হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। এখানে জাতিগত এই স্বাতন্ত্র্যবোধের কথাই বলা হইয়াছে। **পরগাছার কোনো……পারে না**—পরগাছা অন্য গাছের উপর জন্মে এবং সেই গাছের রস গ্রহণ করিয়াই প্রাণধারণ করে। এইরূপ গাছ যথারীতি গাছ বলিয়া স্বীকৃত হয় না, হইলেও বৃহৎ গাছের মর্যাদা লাভ করে না। সেইরূপ পরজাতির অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া কোনো জাতি সম্মান লাভ করে না। এইরূপ

জাতি ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মতো বরং নিন্দিত। **নদী হইতে কাটা…করে না**—নদী হইতে কাটা খালে নদীর মতোই জল থাকে, এমনকি জোয়ার-ভাঁটাও খেলে। তবু খালকে কেহ নদীর সম্মান দেয় না। তেমনি অন্যজাতির নিকট সকল বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করিয়া কোনো জাতি গৌরব লাভ করে না, বস্তুতঃ এমন জাতিকে স্বকীয়তা-সম্পন্ন জাতি বলিয়া গণ্য করা চলে না। **ঐতিহাসিকগণ বলেন** ইত্যাদি—পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের নিকট পরাজয় এই সত্যের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতের ইতিহাসে এইরূপ অনেক ঘটনা আছে যাহা শৃঙ্খলার অভাবে কিরূপ শোচনীয় পরাজয় হয় তাহা প্রমাণ করে। **সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ……চালনা করাই কঠিন**—সৈন্যদল শৃঙ্খলাবদ্ধ। আদেশমাত্র তাহারা আগাইয়া চলে বা পিছাইয়া যায়, আবার মুহূর্তে থামিয়াও যাইতে পারে। কাজেই তাহাদের লইয়া যুদ্ধ করা সম্ভব হয়। জনতা কিন্তু সেইরূপ শৃঙ্খলা মানে না। আগাইতে আগাইতে তাহারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাদের গতিমুখও দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাহাদের চালনা করা কঠিন। বিশৃঙ্খলার ফলে পদে পদে তাহারা নিজেরাই নিজেদের গতি রুদ্ধ করে। **আবেষ্টনী**—পরিবেশ। **শৃঙ্খলা-শ্রী**—শৃঙ্খলা হইতে জাত সৌন্দর্য অথবা শৃঙ্খলারূপ সৌন্দর্য। **শৃঙ্খল মনে করে না**—বন্ধন বা পায়ের বেড়ি মনে করে না। **কর্ণের কবচ-কুণ্ডল**—মহাভারত কাব্যের অন্যতম, প্রধান বীর কর্ণ ছিলেন কুন্তীর পুত্র। জন্মাবধি তাঁহার কানে ছিল একপ্রকার আভরণ বা কুণ্ডল। এই কুণ্ডল যতক্ষণ তাঁহার দেহ হইতে বিচ্যুত না হইবে, ততক্ষণ তাঁহার মৃত্যু ছিল না। এইভাবে কর্ণের কুণ্ডলই ছিল অমোঘ কবচ বা বর্ম। কবচ-কুণ্ডল কথার সার্থকতা ইহাই। **কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতোই…সহজাত**—মহাভারতের কর্ণ যেমন কানের কবচ-কুণ্ডল লইয়াই জন্মিয়াছিলেন, উহা যেমন তাঁহার দেহের অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছিল, ইউরোপের মানুষের নিকটও সেইরূপ শৃঙ্খলা জন্মসূত্রে লব্ধ ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। **সহজাত**—মানুষ জন্মের সঙ্গেই যাহা লাভ করে অর্থাৎ যে গুণ লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। **অবাঞ্ছিত লোকে ভরিয়া যায়**—রোগীর ঘরে ডাক্তার, নার্স বা ঐ ধরনের দুই-চারিজনই বাঞ্ছিত। অন্য সকলে একহিসাবে অবাঞ্ছিত। আমাদের দেশে রুগ্নকে দেখিতে লোকে অনর্থক ভিড় করে এবং রোগীর বিরক্তি ও অস্বস্তির কারণ হয়। **পাঠনা-কক্ষে**—পড়াইবার ঘরে, ক্লাসে। শুধু **পাঠ-কক্ষে** বলিলে পড়িবার ঘর বুঝায়। **মহামহোপাধ্যায়**—সংস্কৃত শাস্ত্রে সর্বোচ্চ উপাধিবিশেষ। এখানে মহাপণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত।

অ. ২৩-২৭। প্রসুপ্ত—গভীর ঘুমে ঘুমন্ত। প্রবুদ্ধ—জাগ্রত। **শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইলে…বস্তুই কদর্য**—জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত থাকে, সমগ্র দেহের মধ্যে তাই প্রত্যেকটি অঙ্গ যথাস্থানে যথাযথ ও সুন্দর দেখায়। কিন্তু সেই দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে দেহের অংশটি কুৎসিত দেখায়। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে শৃঙ্খলা বা বিন্যাসের জন্যই বস্তুর একপ্রকার সৌন্দর্য আছে। কাজেই যে বস্তু শৃঙ্খলার গুণে সুন্দর তাহা যদি শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হয়, তবে তাহা অত্যন্ত কুৎসিত হইয়া পড়ে। **একজন পথচারী মাতাল…অসুন্দর**—প্রত্যেক সমাজেই মানুষের আচরণ-সম্বন্ধে একটা প্রথা আছে। সেই প্রথাকে মান্য করিয়া লোক সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে। কেহ যদি এই প্রথার বাহিরে যায়, তবে তাহাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অপরাধী জ্ঞান করা হয়, তাহার আচরণ তখন লোকচক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় চলার ভব্যতা-সঙ্গত পদ্ধতি-সম্বন্ধে আমাদের একটা স্থিরনির্দিষ্ট ধারণা আছে। মাতাল সেই সভ্যতা-সম্মত বিধি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না ; তাহার অসমান পদক্ষেপ ও অসংযত অঙ্গভঙ্গি সেই বিধিনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হয়। কাজে কাজেই মাতাল আমাদের চোখে এত কুৎসিত ঠেকে। **এই সমস্ত ঘটে…সৌন্দর্য-বোধের অভাবে**—আচরণ-ঘটিত ক্রটি, শৃঙ্খলাই যে সৌন্দর্য এই বোধের অভাবে ঘটিয়া থাকে। ব্যবহারের শৃঙ্খলা ভব্যতা-সম্মত প্রথার মধ্যে নিহিত। এই প্রথার মধ্যে একটা সুকুমার মাধুর্য আছে বলিয়াই আমরা উহার প্রতি প্রশংসমান। এই প্রথামত সংযম ও বিন্যস্ত আচরণের সৌন্দর্য যাহারা বুঝে না তাহারাই উহার ব্যতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। **সময়নিষ্ঠতার…'হায় হায়' ধ্বনি শুনিতে পাই**—যে সময়নিষ্ঠ নহে, সে যথাসময়ে কর্তব্যসম্পাদনের সুযোগ হারাইতে বাধ্য। ফলে তাহার ভাগ্যে আসে ব্যর্থতা। সুযোগ তাহার হাতের মুঠা হইতে গলিয়া যায়। তখন সময় তথা সুযোগ হারাইয়া ব্যর্থতার গ্লানিতে সে হাহাকার করিয়া উঠে। এই অর্থে সময়নিষ্ঠতার মধ্যে দুঃখের আর্তনাদ নিহিত। আমরা কল্পনার সাহায্যে এই আর্তনাদ বা "হায় হায়" ধ্বনি শুনিতে পাই।

অ. ২৮। **শৃঙ্খলা…শাসন করে**—সমস্ত রীতিনীতির মধ্যে শৃঙ্খলা আছে ; বস্তুতঃ রীতির অর্থই শৃঙ্খলাবদ্ধ কোনো প্রথা বা নিয়ম। এই নিয়মের শৃঙ্খলা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই রীতিভঙ্গ হয়। কাজেই সমস্ত রীতিনীতি শৃঙ্খলার শাসনে নির্দিষ্ট। **কিন্তু স্মৃতির দাসত্ব করে**—শৃঙ্খলা সমস্ত রীতিনীতির প্রভু হইলেও স্মৃতির ভৃত্য। ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা ও সহায়তা করে, শৃঙ্খলাও

সেইরূপ স্মৃতির সহায়ক। শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়বস্তু তাই সহজে মনে রাখা যায়। **বিনয় দান করে···সার্থকতা**—বিদ্যা বিনয় দান করে এই কথা লোকপ্রসিদ্ধ। তুলনীয় :

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং
বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি
ধনাদ্ ধর্মস্ততঃ সুখম্ ॥"

বিনয় অর্থে সাধারণতঃ আমরা সুশীল নম্রতা বুঝি। লেখক এখানে বিনয়ের অন্যতর ও প্রকৃষ্ট অর্থটি প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা আমাদিগকে শাসন করিয়া, সংযত ও সুশৃঙ্খল করে তাহাই বিনয়। বিনয় শৃঙ্খলার নামান্তর। বিদ্যা আমাদের চিন্তায় ও আচরণে এই শৃঙ্খলার অভ্যাস দান করে। সেইজন্য উহার উপযোগিতা।

অ. ২৯। বিষয়ান্তরের—অন্য বিষয়ের (এখানে শিক্ষার বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের)। বিক্ষিপ্তচিত্ত—অস্থিরমনা। একনিষ্ঠভাবে—একাগ্রতার সহিত। বিধিবিধান—নিয়মকানুন। নির্বিলাস—বিলাসবর্জিত ; সাদাসিধে।

অ. ৩০-৩৫। উপাদান, উপকরণ—মালমসলা। **পরিবেষ্টনী**—পরিবেশ ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা। **ব্যত্যয়**—ব্যতিক্রম। **এই শিক্ষাধারার**—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী চরিত্রগঠনের জন্য যে অনাড়ম্বর শিক্ষাধারা তাহার। **কি রচনায় কি রসনায়**—কথায় বা লেখায়। রসনার (জিহ্বার) অন্যতম কাজ কথা বলা। **পৌরুষ-চৈতন্য**—বীরত্বের চেতনা ; বীরের নিকট কোনো বাধাই দুর্জয় নয়, বীরের কর্তব্যই মহৎ কর্ম, অন্যায়ের দমন—এমনতর একটা আদর্শ। লেখক সম্ভবতঃ ইংরেজী chivalry (শৌর্য) কথাটির ব্যাপক অর্থ বুঝাইতেই পৌরুষ-চৈতন্য কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। মধ্যযুগে এই chivalryর মন্ত্রে দীক্ষিত নাইট্‌গণ (Knight) চিরকুমার থাকিতেন এবং অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা পীড়িতের পক্ষে, দুর্বলের ত্রাণে ও কুমারীর মর্যাদা-রক্ষায় প্রয়োগ করিতেন। এই মহৎ কর্মেই তাঁহারা একপ্রকার চরিতার্থতা লাভ করিতেন। ইহা ছিল তাঁহাদের একপ্রকার ব্রত। লেখক পরবর্তী পঙ্‌ক্তি কয়টির মধ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই chivalryর আদর্শ ই পরিস্ফুট।

ডিউক অব ওয়েলিংটন—ইনি আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ। ইহার জন্ম ৬ই জুন ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই

অক্টোবর। ইনি ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির ভ্রাতা এবং ইঁহার প্রকৃত নামই হইল আর্থার ওয়েলেস্‌লি। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতীয় সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন এবং আসাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করিয়া ইনি বিশ্ববিখ্যাত হন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শীর্ষসীমায় আরোহণ করেন।

এটন (Eton)—টেম্‌স্‌ নদীর উপরিস্থিত বিখ্যাত নগর। বাকিংহামশায়ার-এর উইণ্ডসর শহরের বিপরীত পারে এই নগর অবস্থিত। Eton-এর বিদ্যায়তন পৃথিবী-বিখ্যাত। এইখানে যে-সকল ইংরেজ বীর ও রাজনীতিবিদ্‌ শিক্ষালাভ করেন তাঁহাদের অন্যতম ডিউক অব ওয়েলিংটন। রাজা ও ষষ্ঠ হেনরী কর্তৃক এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

গীতায় যাহাকে লোকসংগ্রহ বলা হইয়াছে—গীতায় একস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন :

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তুমর্হসি।"

অর্থাৎ 'জনকাদি ঋষিগণ' কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকসংগ্রহের (বা লোকশিক্ষার) দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাদেরও কাজ করা উচিত।

লেখক এখানে গীতার উপরি-উক্ত অংশটিতে উল্লিখিত লোকসংগ্রহ কথাটির কথাই বলিয়াছেন।

সকলে পথ ছাড়িয়া দেয়—অর্থাৎ কাহারও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে না। **দুর্বলকে ঠেলিয়া আগে যায় না**—প্রকৃত বীরপুরুষ দুর্বলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, তাহাদের বরং সহায়তা করিয়া আগাইয়া দেয়। কারণ, দুর্বলকে পিছে ঠেলিয়া আগাইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো বীরত্ব নাই, বরং তাহা কাপুরুষতারই নামান্তর।

অ. ৩৬-৩৭। মানব-জমিন—মানুষ-রূপ কৃষিক্ষেত্র। মাটিতে জমিতে যেমন নানা ফসল উৎপন্ন হয় তেমনি মানুষের মধ্যেও নানারকম গুণের বিকাশ হইতে পারে। ব্যক্তিজীবনে তো বটেই, সমাজজীবনেও এইরূপ গুণের বিকাশ হয় এবং এইভাবে একটা সমাজের মানুষ নানাদিকে উন্নতিলাভ করিতে

পারে। 'মানব-জমিন' কথাটি রামপ্রসাদের একখানি গান হইতে লওয়া হইয়াছে :

"মন, তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন **মানব-জমিন** রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা ॥"

দামোদরের দুর্দম……কল্যাণপ্রসূ হইয়াছে—দামোদর নদ প্রতি বর্ষায় প্রচণ্ড হইয়া উঠে। উহার প্রচণ্ড জলপ্রবাহ ইতিপূর্বে প্রায়ই বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টি করিত। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় দামোদরের উদ্‌বৃত্ত জলকে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং প্রয়োজনমত অসংখ্য খালের মধ্য দিয়া সেই জলকে সেচের কার্যে সরবরাহ করা হইতেছে। এইভাবে দামোদরের জলকে একদিকে নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত করা হইয়াছে, অন্যদিকে উহার প্রবাহকে নিয়মের মধ্যে আনা হইয়াছে; ফলে প্লাবন বন্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিস্তীর্ণ ভূভাগে জলসেচের ব্যবস্থা হওয়ায় শস্য-উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, দামোদরের এই সংরক্ষিত জলধারার বেগে বিপুল বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এইভাবে দামোদরের সর্বধ্বংসী জলধারাকে মানুষের উপকারে নিয়োজিত করা গিয়াছে। **দেশের প্রকৃতিস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে**—স্বাধীনতা-লাভের পরে এখনও দেশের মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই—ইহাই যেন লেখকের মত। খাদ্য-বস্ত্রের সমস্যা, জীবনের অভাব অনটন ব্যাধি প্রভৃতি অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন জাতির স্বাভাবিক অবস্থা নাই, এ কথা সত্য। তাহা ছাড়া চিন্তা ও আচরণেও বর্তমানে বহু বিকার রহিয়া গিয়াছে। এইসকল দূর হইয়া যেদিন দেশে একটা নিশ্চিত ধারা প্রবর্তিত হইবে তখনই ফিরিবে আগের স্বাভাবিক দিন। **কল্লোলিত বিক্ষুব্ধ…কল্যাণাভিমুখী হইবে**—জীবনের অসংখ্য সমস্যা ও অভাবের তাড়নায় বিপুলসংখ্যক ভারতবাসী তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দামোদরের মতো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দামোদরকে যেমন কল্যাণপ্রদ করা গিয়াছে, এই বিপুল জনসংখ্যাকেও নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধিয়া কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করা যাইবে। ইহাই লেখকের বিশ্বাস। **নিরবচ্ছিন্ন জলধারা হইতেও বৈদ্যুতিক শক্তি** ইত্যাদি—এখানে জাতির কল্যাণকার্যে নিয়োজিত শক্তিকেই বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, লেখকের কল্পনায় নদীর জলধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন বা বিরামহীন বেগে প্রবাহিত, তেমনি দেশের জনগণেরও অগ্রগতি বিরামহীন। **আবেশ**—ঘোর।

ব্যাখ্যা

(১) খাদ্যবস্তু হাতে পাওয়া……করাই পরমপ্রাপ্তি। (অ. ১)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। পুরাদস্তুর স্বাধীনতা-লাভ কিরূপে হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রসঙ্গেই লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। লেখকের মতে এই স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনও মজ্জাগত হয় নাই। ইংরেজশাসনই মাত্র দূর হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া মনে-প্রাণে আমরা এখনও স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যেদিন স্বাধীনতা আমাদের জীবনের অংশ হইয়া যাইবে, মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া যাইবে, সেইদিনই হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভ। লেখক এই কথাটি একটি তুলনার সাহায্যে স্পষ্ট করিয়াছেন। খাদ্যবস্তু হাতে পাইলে একপ্রকার পাওয়া হয়, কিন্তু উহার স্বাদ গ্রহণ করা, এমনকি উহাকে উদরস্থ করিলেও ঐ খাদ্যকে যথার্থভাবে পাওয়া যায় না। উহাকে যখন জীর্ণ করিয়া দেহের মধ্যে মিশাইয়া লওয়া হয়, তখন খাদ্যকে আমরা পূর্ণরূপে পাই। খাদ্য তখন আমাদের অঙ্গের মধ্যে লীন হয়। উহাকেই বলে খাদ্যের পরমপ্রাপ্তি। সেইরূপ স্বাধীনতাকেও যখন আমরা জীবনের অংশ করিয়া লইতে পারিব, যখন স্বাধীন জাতির সমস্ত চরিত্রগত বিশেষত্বগুলি আমরা নিজেদের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই হইবে স্বাধীনতা লাভের চরম পর্যায়। এইরূপ স্বাধীনতা-লাভ আমাদের এখনও হয় নাই। ইহাই লেখকের বক্তব্য।

(২) গণতন্ত্র শাসনে রাজার……উক্তি প্রযোজ্য। (অ. ৩)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা-লাভের পথনির্দেশ-প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য মন্তব্য করিয়াছেন। লেখকের মতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি পর্যায় মাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কার দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সত্য ও কল্যাণপ্রদ করিবার জন্য এখনও বৃহত্তর একটা সংগ্রাম বাকি আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ সংগ্রামেরই জন্য। বাহিরের যুদ্ধ শেষ হইলেই কল্যাণরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় না, তাহার জন্য চাই আভ্যন্তরীণ সংস্কারের নিরবচ্ছিন্ন তপস্যা। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ

দিয়াছিলেন যে ধার্মিককে রাজা করিলে কর্তব্য শেষ হয় না, ন্যায়সঙ্গত বিধি সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেও হয়। নহিলে কল্যাণধর্মে সে-রাজ্য স্থায়ী হয় না। এ-যুগে রাজার স্থান অধিকার করিয়াছে জনসাধারণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই রাজার প্রতি উপরি-উক্ত উপদেশ সমগ্র গণতান্ত্রিক জাতির প্রতিই খাটে। গণতান্ত্রিক জাতির কর্তব্য শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভেই সমাপ্ত হয় না। সেই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্থায়ী ও সাধারণের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিবার জন্য চাই আভ্যন্তরীণ সংস্কার। চাই সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে বহুমুখী উৎকর্ষ এবং সেইজন্যই চাই শৃঙ্খলাদি নানা গুণের বিকাশের জন্য অবিরাম সাধনা। তবেই প্রকৃত স্বাধীনতা জাতির চিরস্থায়ী অধিকারে আসে।

(৩) এখনো আমাদের রাহুগ্রাসজনিত······সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ।

(অ. ৪)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত। স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতবাসীর গুরুতর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ-প্রসঙ্গেই লেখক আলোচ্য অংশের অবতারণা করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। রাহু যেমন খানিক সময় সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া রাখে, ইংরেজও তেমনি ভারতবর্ষকে কবলিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাহুর গ্রাসে গ্রহণ হয়, গ্রহণের সময় হিন্দুগণ একপ্রকার অশৌচ পালন করিয়া থাকে। তখন আহারাদি সব-কিছুই নিষিদ্ধ। গ্রহণের শেষে স্নানাদির পর সেই অশৌচ ভঙ্গ হয়। লেখকের মতে ইংরেজ-কবল হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হইলেও এখনও জাতির সম্পূর্ণ শুচিতা আসে নাই। দেহমনে এখনও তাহার পরাধীনতার অশুচি সংস্কার বর্তমান। জাতিকে ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই স্বাধীনতা তাহার নিকট বাস্তব সত্য হইয়া উঠিবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অন্তরলোকের পরাধীনতা ঘুচে না। গান্ধী-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি জাতিগঠনের কর্মসূচীকেও সমান গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে স্বাধীনতা আগেই আসিয়া গিয়াছে। জাতিগঠনের কাজ এখনও অসমাপ্ত। এই ব্রত সম্পূর্ণ না হইলে জাতি পাপমুক্ত হইবে না, হইবে না সুস্থ সবল প্রগতিশীল। ফলে আজিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা শরতের মেঘের মতো সুদৃশ্য মায়াই সৃষ্টি করিবে, জল দিয়া ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিবে না।

অথবা অস্তরাগে রঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘমালা যেমন বিচিত্র বর্ণের লীলাবিলাস দেখাইয়া ক্ষণপরে মিলাইয়া যায়, আমাদের এই বিচিত্র স্বাধীনতাও তেমনি ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথায় হারাইয়া যাইবে। আসল জিনিস কখনও আমাদের করায়ত্ত হইবে না। সেইজন্যই লেখক জাতিগঠনের গুরুদায়িত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

(৪) শৃঙ্খলাকে তাহারা……অঙ্গীভূত ও সহজাত। (অ. ২৪)

আলোচ্য উদ্ধৃতিটুকু কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। ইউরোপীয় জীবনে শৃঙ্খলা বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য মন্তব্য করিয়াছেন।

ইউরোপের জাতিগুলির আচারে ব্যবহারে, রীতিনীতি আর সামাজিক অনুষ্ঠানে সর্বত্র সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐসকল দেশে শৃঙ্খলা-পরায়ণতা একটি আবহমানকাল-প্রচলিত ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে এই ঐতিহ্য ও পরিবেশে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে সে আপনা হইতেই শৃঙ্খলানিষ্ঠ হইয়া উঠে। এই শৃঙ্খলানিষ্ঠা যেন পরের কাছে তাহার শিখিয়া লইতে হয় না। উহা যেন তাহার জন্মসূত্রে লব্ধ অন্যতম গুণেরই মতো। কথিত আছে মহাবীর কর্ণ তাঁহার কানের কবচ-কুণ্ডল লইয়া জন্মিয়াছিলেন। উহা তাঁহার অঙ্গের অংশ হইয়া গিয়াছিল। সেইরূপ ইউরোপীয় শিশুর অঙ্গের অংশরূপেই শৃঙ্খলানিষ্ঠা জন্মাবধি বিকশিত দেখা যায়। কাজে কাজেই উহাতে সে বাধ-বাধ বোধ করে না। শরীরের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন মানব-শিশুর বাধা নয়, শক্তির কেন্দ্র মাত্র, সেইরূপ এই শৃঙ্খলানিষ্ঠা হয় তাহাদের সহজ বস্তু, শক্তির উপাদান। শৃঙ্খল অর্থ শিকল বা বেড়ি, শৃঙ্খলা এক-হিসাবে তাহাই। কেননা উহা মানুষকে সংযত করে, যদৃচ্ছ ব্যবহারে বাধা দেয়। তবু শৃঙ্খলাকে ইউরোপীয় শিশু বাধা মনে করে না। জন্মাবধি উহাতে অভ্যস্ত বলিয়া শৃঙ্খলার অভাবেই বরং সে অস্বস্তি বোধ করে। এমনই সহজ ও স্বাভাবিক হয় তাহার শৃঙ্খলানিষ্ঠা।

(৫) শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইলে……বলিয়াই অসুন্দর। (অ. ২৬)

আলোচ্য অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-শীর্ষক প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি। জাতীয় চরিত্রে শৃঙ্খলার উপযোগিতা আলোচনা-প্রসঙ্গে

লেখক এখানে সৌন্দর্যের হেতু ও উপাদান হিসাবে শৃঙ্খলার মহিমা বর্ণনা করিতেছেন।

শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সুকুমার সৌন্দর্য আছে এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে প্রত্যেক সুন্দর জিনিসের মধ্যেই একটি শৃঙ্খলা আছে। ইহা বিন্যাসের শৃঙ্খলা, ইহা সামঞ্জস্যের ব্যাপার। জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথানির্দিষ্ট স্থান আছে। সেগুলি যথাস্থান হইতে চ্যুত হইলে কুশ্রী হইয়া পড়ে। কমনীয় দেহলতার মধ্যে সুডৌল একখানি বাহু কতই না সুন্দর! কিন্তু সেই বাহু যদি দেহচ্যুত হয় তখন তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। আমাদের আজন্ম-অভ্যস্ত ধারণাকে উহা অতিশয় পীড়া দেয়। আমাদের ধারণায় মানুষের দেহ হইতে আচরণ পর্যন্ত সকল বিষয়েই একটা স্থিরনির্দিষ্ট ধারণা আছে। সেই ধারণার সংযমেই আমরা কথা-বলা হইতে পথ-চলা পর্যন্ত সকল ব্যাপারে বিধিবদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ আদর্শ মানিয়া চলি। মাতাল যখন জ্ঞান হারায় তখন পথ-চলায় তাহার সেই রীতিনির্দিষ্ট তাল থাকে না। এলোমেলো এখানে-ওখানে অবিন্যস্ত হয় তাহার পদক্ষেপ, অঙ্গভঙ্গিও হয় সামঞ্জস্যহীন। এইভাবে পথ-চলায় তাহার শৃঙ্খলা অবলুপ্ত হয় এবং সেই কারণে তাহাকে আমাদের কুৎসিত লাগে। এই দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণভাবে বলা যায় যে শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইলেই সৌন্দর্যহানি হয়।

(৬) আশা করা যায়, দামোদরের……কল্যাণাভিমুখী হইবে।

(অ. ৩৬)

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। লেখক এই অংশে ভারতবর্ষের বিপুল জনশক্তির শুভ-সম্ভাবনার কথাই একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ বিরাট্ দেশ, বিপুল তাহার জনসংখ্যা। কিন্তু শতাব্দীর পরাধীনতায় এত বড় একটা জাতির চরিত্র নানাদিকে নানাভাবে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় চরিত্রে আবার সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন করিতেই হইবে। লেখক মনে করেন তাহা সম্ভব। তাহা সম্ভব করিয়াই জাতির বিপুল জনশক্তিকে কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করা হইবে—ইহাও লেখকের আশা। এককালে দামোদরের খাত মজিয়া আসিয়াছিল, ফলে উহার অপরিসীম জলরাশি প্রতিবর্ষায় দুইপার্শ্বে প্রবল বন্যা ও বীভৎস ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করিত। কিন্তু সম্প্রতি বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দামোদরের জলরাশিকে ধরিয়া

রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং প্রয়োজনমত দিকে দিকে খালপথে সে জলকে চালিত করিয়া সেচব্যবস্থা সার্থক হইয়াছে। ফলে হাজার হাজার একর ভূমি শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ধর্ষ দামোদর মানুষের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়া বিনাশকার্য ভুলিয়াছে, উহা এখন কল্যাণকর্মে আমাদের নিকট পরম আশীর্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে ভারতবাসীর চরিত্রকে যদি দোষত্রুটিমুক্ত করিয়া, স্বাধীন জাতির সকল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়া তোলা যায়, তবে এই দেশের বিপুল জনসংখ্যা আর উদ্বেগের বস্তু থাকিবে না। বরং উহাই হইবে আমাদের পরম সম্পদ্ এবং এই জনসম্পদ্‌কে ব্যবহার করিয়া দেশের কল্যাণশ্রী বহুগুণে বহুদিকে বিকশিত করিয়া তোলা যাইবে। আজিকার দিনে সমস্যাপীড়িত বিশৃঙ্খল ভারতবাসী নানা বিক্ষোভে নানাভাবে করাল রূপ গ্রহণ করে। লেখকের ইঙ্গিত, কখনও কখনও তাহা পূর্বতন দামোদরের মতোই সর্বধ্বংসী হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার কারণ, জাতিগঠনের কাজ এখনও অসমাপ্ত। যেদিন জাতীয় চরিত্র সুগঠিত হইয়া যাইবে, শাসক-শাসিতের বিভেদ ঘুচিয়া যেদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে সত্যকার গণতন্ত্র, সেদিন এই দেশের বিপুল গণশক্তি কল্যাণের পথে চালিত হইবে। দেশের সেই শুভসম্ভাবনায় লেখকের আন্তরিক বিশ্বাসই এই অংশে ব্যক্ত।

(৭) দামোদরের জলধারা……নিয়োজিত হইবে। (অ. ৩৭)

আলোচ্য অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'স্বাধীনতা-লাভের পরে'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। এই অংশে লেখক ভারতীয় জনশক্তি-সম্বন্ধে একটি পরম আশার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

লেখক পূর্বতন দামোদর নদের সহিত ভারতের জনপ্রবাহের তুলনা করিতেছেন। এই সেদিনও দামোদর ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ধর্ষ। মানুষের সমাজে প্লাবন মহামারী সহ উহা বর্ষায় বর্ষায় অবর্ণনীয় অভিশাপরূপে দেখা দিত। আজ উহা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—দামোদর-বাঁধ-পরিকল্পনায়। দেশের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচে ব্যবহৃত হইতেছে উহার জলসম্পদ্। তাহা ছাড়া এই জলরাশি হইতে বিপুল পরিমাণ জল-বিদ্যুৎও উৎপন্ন হইতেছে মানুষের সেবায়। লেখকের বিশ্বাস, একদিন ভারতবর্ষের জনশক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শতগুণে গুণান্বিত করিয়া দেশের মঙ্গলে নিয়োজিত করা যাইবে। এইভাবে দেশের জনশক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিলে তাহাদের মধ্য হইতে এমন সব নূতনতর গুণের বিকাশ

হইবে যাহাকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত তুলনা করা যায়। একপুরুষেই হয়তো তাহা হইবে না। কিন্তু জনতার প্রবাহ তো আর বসিয়া নাই। অবিরাম চলিতেছে জনগণের অগ্রগতি। কেবল সংগঠন সংশোধন হইলেই কালক্রমে এই বিপুল জাতির অগণ্য মানুষের মধ্য হইতে অভাবনীয় শক্তির উদ্ভব হইবে, আর সেই শক্তিবলে ভারত সারা জগতের শীর্ষচূড়ায় আপনার গৌরবের আসন অর্জন করিয়া লইবে। ইহাই লেখকের আন্তরিক বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আশা।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সমাপ্ত হইয়াছে কি? এ সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায়ের অভিমত ব্যক্ত কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসারের ১ম হইতে ৩য় অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ২। "অতএব সুশাসন লাভ করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের অবিলম্বে প্রয়োজন।"—**যেসকল যুক্তির ভিত্তিতে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।**

উ.। কবিশেখর কালিদাস রায় জাতির যাবতীয় দুঃখদৈন্য ও অনিশ্চয়তার হেতু-নির্দেশ-প্রসঙ্গে জাতীয় চরিত্রের ত্রুটিকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। শাসনের ভালোমন্দ নির্ভর করে শাসকের চরিত্রের উপর। তাই এই শাসকগণের নির্বাচন সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একটা অধঃপতিত জাতির মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব ঘটে। তাহা ছাড়া অশিক্ষিত ও অজ্ঞান জনসাধারণ লোক চিনিবার ক্ষমতাও রাখে না। ফলে যোগ্য লোক নির্বাচিত হইতে পারে না। অযোগ্যের শাসনে তাই দেশকে ভুগিতে হয়।

সুতরাং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে জাতীয় চরিত্রের সর্বতোমুখী সংস্কার প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা ও চরিত্রবল মোটেই দৈব ঘটনা নয়। ব্যক্তিচরিত্র তাহার পরিবেশের দ্বারাই বহুল পরিমাণে প্রভাবিত ও গঠিত হইয়া থাকে। জাতির গুণাগুণ বা দোষত্রুটি হইতে ব্যক্তিবিশেষ দূরে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ জাতি যেন গাছ, ব্যক্তি তাহারই ফল। গাছটার প্রকৃতি ও

স্বাস্থ্যের উপর উহার ফলের স্বরূপ নির্ভর করে। সেইরূপ একটা জাতির আদর্শ, জীবনধারা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ব্যক্তিচরিত্রে যেরূপ ছাঁচ গড়িয়া উঠে, তাহাতেই বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র রূপায়িত হয়। জাতিকে আবার একটা খনির সঙ্গেও তুলনা করা যায়। সিজুগাছে যেমন চাঁপা ফুল ফোটে না, পদ্মরাগমণির খনিতে তেমনি হীরা পাওয়া যায় না। তেমনি অধঃপতিত জাতির মধ্যে উন্নতচরিত্র মানুষ দুর্লভ। সেইজন্যই সমগ্র জাতির মধ্যে একটা উৎকর্ষের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হয়। দেশব্যাপী সকল মানুষের মধ্যেই কতকগুলি গুণের বিকাশ ঘটিলে সমগ্র জাতির চরিত্রই উন্নতিলাভ করে। তখন নির্বাচক জনসাধারণ ও নির্বাচিত শাসক প্রতিনিধি উভয়েই যোগ্য হয়। কাজে কাজেই দেশের শাসনব্যবস্থাও সুষ্ঠু হইয়া উঠে। কবিশেখর এইভাবে দেশের সুশাসনের জন্য জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষবিধানের অপরিহার্য প্রয়োজন দৃঢ় যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

প্র. ৩। কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনা অনুসরণ করিয়া জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য কি কি কর্তব্য তাহা সংক্ষেপে লেখ।

উ.। জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মনোভাব গঠন। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক মানুষের অধিকার সমান। নির্বাচনের সময় প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছা ও বিচার অনুযায়ী ভোট দিতে পারে। এই অধিকারের গুরুত্ব অনেক বেশি। কাজেই স্বার্থ বা অন্যতর কোনো প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এই অধিকারের অপব্যবহার যে অন্যায়, এই জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমান; সুতরাং দেশে সকল মানুষই সমান। এইরূপ সাম্যবাদের উপর দাঁড়াইয়া দেশবাসীর প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে ভাই জ্ঞান করা উচিত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান্ আছেন—অতএব কেহ কাহারও ছোট নয়। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—সকলেই বার বার এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এই সংস্কার পুষ্ট হইলে গণতান্ত্রিক মনোভাবের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনের প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শন গণতান্ত্রিক মনোভাবের অঙ্গীভূত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষেও বিরোধীপক্ষকে যথোচিত মর্যাদা দিয়া সহযোগী বিবেচনা করাই গণতন্ত্রের নীতি। বিশেষ করিয়া

জাতিগঠনের বেলায় সর্বদলে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অপরিহার্য। চতুর্থতঃ, প্রাদেশিকতা বা সর্বপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতা গণতান্ত্রিক মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই-সকল ভেদবুদ্ধি এককালে আমাদের পরাধীনতা ও সকল বিষয়ে দুর্বলতার হেতু ছিল। আজ সেইসব বিসর্জন দিলেই জাতীয় ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হইতে পারে।

এই গণতান্ত্রিক ঐক্যকে আরও স্থায়ী ও সক্রিয় করিবার জন্য চাই জাতীয়তাবোধ। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইহা দেশময় ব্যাপ্ত ছিল। স্বাধীনতা-লাভের পরে তাহা নানা কারণে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। আবার সেই জাতীয়তাবোধের জ্বলন্ত প্রেরণা জাগ্রত করিতে হইবে। ইংরেজ-বিদ্বেষ নয়, অতীতের গৌরবকথার চর্বিত-চর্বণও নয়—মাতৃভূমি মায়ের মতো, আর দেশবাসী সব ভাইবোন—অন্তরের আবেগে এই বোধই জাতীয়তাবোধ। ইহা দেশবাসীর মঙ্গলকর্মে আমাদেঁর প্রবৃত্তি দেয়, নিবৃত্ত করে তাহাদের অনিষ্ট হইতে।

আমাদের দেশে এই জিনিসটার বাস্তবিক অভাব। গ্রামাঞ্চলে জনস্বার্থ উপেক্ষা করিতে দুইদিক্ হইতে বাড়ীগুলি আগাইয়া আগাইয়া রাস্তাগুলিকে গ্রাস করে। পানীয় জলের পুকুরগুলি লোকে নানাভাবে দূষিত করে। পথঘাট ও রেলগাড়ীর কামরাগুলি নোংরা আর থুথু-কাশিতে ভর্তি থাকে। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোক জনবহুল যানবাহন ও হাটবাজারে রোগ ছড়াইয়া বেড়ায়। এইগুলি নাগরিকতা বোধের অভাব প্রমাণ করে। শহরে শহরে দেখি পূজাপার্বণ উপলক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা আর লাউডস্পীকারের অত্যাচার, রাস্তায় রাস্তায় কাচকুচি আব ময়লা, যানবাহনে উচ্ছৃঙ্খল ঠেলাঠেলি ও পথরোধ। ছেলেদের মধ্যে দেখি সাধারণ পাঠাগারের বইয়ের পাতা নষ্ট করা, বিদ্যালয়ে বেঞ্চি-কাটা প্রভৃতি অসংখ্য বদ অভ্যাস। আর বড়দের কেহ কেহ ভেজাল বেচিয়া দেশের সর্বনাশ করে। এ সকলই জাতীয়তাবিরোধী। কাজেই ইহাদের আমূল উৎপাটন করিয়া প্রকৃত জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করা চাই।

এইজন্য জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে একটি গভীর উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। যুগপ্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি-সহকারে প্রত্যেক জাতিই অপর সকল জাতি হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তোলে। ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখার মধ্যে একটা গৌরব আছে। সেইজন্য পরের অনুকরণ নিন্দনীয়। জাতির দোষত্রুটি ও কুসংস্কারগুলি অবশ্যই সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ময়ূরপুচ্ছ

ধারণ করিয়া ময়ূর সাজিবার মতো প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা ভালো নয়। পরের রসে পুষ্ট পরগাছা বা নদীর জলে সমৃদ্ধ খালটির কোনো মর্যাদা নাই। তেমনি পরজাতির অনুকারী দেশকে কেহ সম্মান দেয় না। সুতরাং জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা প্রয়োজন এবং এই পথেই উন্নতির প্রয়াস কাম্য। ইহাতেই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। ইহাতেই জাতিগঠনের গোড়া-পত্তন হয় দৃঢ়। তাহার পর শৃঙ্খলানিষ্ঠা, ক্ষাত্রমনোভাব প্রভৃতি আরও কয়েকটি গুণের বিকাশও অপরিহার্য। শৃঙ্খলানিষ্ঠা বহুতর গুণের আকর। উহার মধ্যে একটি সৌষ্ঠবশ্রীও আছে। ক্ষাত্রমনোভাব তেমনি বহু সদ্‌গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মত্যাগ, পরোপকার, বীরত্ব প্রভৃতি বহুগুণে গুণান্বিত অকুতোভয় মানুষই অজানা দুর্গম পথে বিপদের মুখে অভিযান করে। তাহারাই আবিষ্কারক, তাহারাই জনসেবক। এইরূপে অসংখ্য গুণের যুগপৎ বিকাশসাধন দ্বারা আমরা জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারি। কবিশেখরের মতে আপাততঃ এই সাধনাই জাতির প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

প্র. ৪। 'গণতন্ত্রীয় মনোভাব' বলিতে কবিশেখর কালিদাস রায় কি বুঝাইয়াছেন? ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য সংক্ষেপে লেখ।

উ.। সংক্ষিপ্তসারের ৪ হইতে ৭ অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ৫। জাতীয়তাবোধ বলিতে কি বুঝায়? আমাদের দেশে কোথায় কোথায় ইহার অভাব দেখা যায়?

উ.। সংক্ষিপ্তসারের ৮ হইতে ৯ অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ৬। কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনা অনুসরণ করিয়া জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব বিচার কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসারের ১১ হইতে ১২ অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র ৭। 'পৌরুষ চৈতন্য' বলিতে কবিশেখর কালিদাস রায় যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা উদাহরণসহ স্পষ্ট কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসারের ১৩ অনুচ্ছেদ দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: বিপজ্জনক = বিপদ্ + জনক। উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল। ব্যত্যয় = বি + অতি + অয়।

সমাস: মুক্তিসংগ্রামের—মুক্তির জন্য সংগ্রাম (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহার। নিশ্চিন্ত—নিঃ (= নাই) চিন্তা যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা। কর্তৃপক্ষ—কর্তাদের পক্ষ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। গলাধঃকরণ—গলের বা গলার অধঃ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার করণ (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। সর্ববিধ—সর্ব বিধ যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। দায়িত্বভারবহনে—দায়িত্বের ভার (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার বহন (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিতে থাকে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। বহুপ্রাণহানিজনিত—বহু প্রাণ (কর্মধারয়); তাহাদের হানি (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা জনিত (৩য়াতৎপুরুষ)। অবসাদগ্রস্ত—অবসাদের দ্বারা গ্রস্ত (৩য়াতৎপুরুষ)। রাহুগ্রাসজনিত—রাহুর দ্বারা গ্রাস (৩য়াতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা জনিত (৩য়াতৎপুরুষ)। শরদভ্রচ্ছায়া—শরৎকালীন অভ্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার ছায়া (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ)। শৃঙ্খলানিষ্ঠ—শৃঙ্খলায় নিষ্ঠা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। প্রাপ্তবয়স্ক—প্রাপ্ত হইয়াছে বয়স (বয়ঃ) যাহার দ্বারা (বহুব্রীহি), সে। যথাযোগ্য—যথা যোগ্য (সুপ্সুপা)। দ্বেষাদ্বেষি—পরস্পর দ্বেষ যাহাতে (ব্যতিহার-বহুব্রীহি), তাহা। অন্নকষ্ট—অন্নের জন্য কষ্ট (৪র্থীতৎপুরুষ)। পাথরে-গড়া—পাথরে (= পাথর দিয়া) গড়া (অলুক্ ৩য়াতৎপুরুষ)। কল্যাণপ্রসূ—কল্যাণ প্রসব করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। ভেদাত্মিকা—ভেদ আত্মা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। কানাকানি—কানে কানে কথা যেখানে (ব্যতিহার-বহুব্রীহি)। উচ্ছৃঙ্খল—শৃঙ্খলাকে উৎক্রান্ত (প্রাদিতৎপুরুষ)। অম্লানবদনে—নয় ম্লান (নঞ্‌তৎপুরুষ); অম্লান বদন (কর্মধারয়), তাহাতে। পাদুকায়ুধ—পাদুকা আয়ুধ যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা। রাষ্ট্রগত—রাষ্ট্রকে গত (২য়াতৎপুরুষ)। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন—আত্মার মর্যাদা (৬ষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা সম্পন্ন (৩য়াতৎপুরুষ)। অল্পসংখ্যক—অল্প সংখ্যা যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। অকালমৃত্যু—নয় কাল (নঞ্‌তৎপুরুষ); অকালে মৃত্যু (৭মীতৎপুরুষ)। বিক্ষিপ্তচিত্ত—বিক্ষিপ্ত চিত্ত যাহার (বহুব্রীহি), সে। মানব-জমিন—মানবরূপ জমিন (রূপক-কর্মধারয়)।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ঃ আত্মসাৎ—আত্মন্+সাতিচ্। অঙ্গীভূত—অঙ্গ+চ্বি (অভূততদ্ভাবে)+ভূ+ক্ত। শৈথিল্য—শিথিল+ষ্যঞ্। সংস্থাপিত—সম্-স্থা+ণিচ্+ক্ত। শাশ্বতী—শশ্বৎ+অণ্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। ইদানীন্তন—ইদম্+দানীম্=ইদানীম্; ইদানীম্+তন। ভাগবতী—ভগবৎ+অণ্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। সর্বাঙ্গীণ—সর্বাঙ্গ+খ (=ঈন)। বাহ্য—বহিঃ+ঞ্য। কবলিত—কবল+ণিচ্ (নামধাতু)+ক্ত। মন্দীভূত—মন্দ+চ্বি-ভূ+ক্ত। সার্বজনীন—সর্বজন+খঞ্ (=ঈন)। গৃহিণীপনা—গৃহিণী+পনা। পাঠনা—পঠ্+ণিচ্+যুচ্ স্ত্রীলিঙ্গে। ইয়ত্তা—ইয়ৎ+তল্ (=তা)। কুণ্ঠিত—কুণ্ঠা+ইতচ্। বলীয়ান্—বলবৎ+ঈয়সুন্। আভ্যন্তরিক—অভ্যন্তর+ঠক্ (=ইক)। বিশ্বজনীন—বিশ্বজন+খ (=ঈন)। মতন—মত+ন (স্বার্থে)। গার্হস্থ্য—গৃহস্থ+ষ্যঞ্। গাণপত্য—গণপতি+ঞ্য।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তনঃ মুক্তিসংগ্রামের অবসান হইয়াছে—মুক্তিসংগ্রাম অবসিত হইয়াছে ('মুক্তিসংগ্রামের'-কে কর্তৃপদে পরিণত করিয়া)।

সত্যই কি সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হইয়াছে? (প্রশ্নবোধক)—সত্যই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয় নাই (প্রশ্ন-পরিহার)।

বাহিরের সংগ্রামের অবসানে জাতীয় সংগ্রাম সমাপ্ত হয় নাই (সরল)—যদিও বাহিরের সংগ্রামের অবসান হইয়াছে তবু জাতীয় সংগ্রাম সমাপ্ত হয় নাই (জটিল)।

কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না (সরল)—যদি কেবল ধার্মিককে রাজা করা হয় তবেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না (জটিল)।

জাতিগঠনের ব্রত অসমাপ্ত হইয়া আছে (অস্ত্যর্থক)—জাতিগঠনের ব্রত সমাপ্ত হয় নাই (নঞর্থক)।

রাহুগ্রাস হইতে জাতির পূর্ণ মুক্তি হয় নাই (নঞর্থক)—রাহুগ্রাস হইতে জাতির আংশিক মুক্তি হইয়াছে (অস্ত্যর্থক)।

জাতি যদি প্রকৃতিস্থ হইয়া না উঠে, তবে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গও তদনুরূপ হইবে (জটিল)—জাতি প্রকৃতিস্থ হইয়া না উঠিলে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গও তদনুরূপই হইবে (সরল)।

সিজু গাছে কখনও কি চাঁপাফুল ফুটে ? (প্রশ্নবোধক)—সিজু গাছে কখনও চাঁপাফুল ফুটে না (প্রশ্ন-পরিহার)।

সুশাসন লাভ করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের অবিলম্বে প্রয়োজন (সরল)—যদি সুশাসন লাভ করিতে হয়, তবে জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের অবিলম্বে প্রয়োজন (জটিল)।

বহুশতবর্ষ যে জাতি পরাধীনতার অন্ধকারে আবদ্ধ ছিল তাহাকে ক্রমে স্বাধীনতার আলোকে অভ্যস্ত হইতে হইবে (জটিল)—বহুশতবর্ষ পরাধীনতার অন্ধকারে আবদ্ধ জাতিকে ক্রমে স্বাধীনতার আলোকে অভ্যস্ত হইতে হইবে (সরল)।

এই অধিকারের মূল্য মর্যাদা ও দায়িত্ব যে কত তাহা উপলব্ধি করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য (জটিল)—এই অধিকারের মূল্য মর্যাদা ও দায়িত্বের পরিমাণ উপলব্ধি করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য (সরল)।

এত বড়ো মর্যাদা কোনো দিন কি দেশবাসী পাইয়াছিল ? (প্রশ্নবোধক)—এত বড়ো মর্যাদা কোনো দিন দেশবাসী পায় নাই (প্রশ্ন-পরিহার)।

এই মর্যাদার অপব্যবহার করার মতো মূঢ়তা আর নাই (নঞর্থক)—এই মর্যাদার অপব্যবহার করা চরম মূঢ়তা (অস্ত্যর্থক)।

প্রতিপক্ষ যে প্রায় সমকক্ষ তাহা ভুলিলে চলিবে না (নঞর্থক)—প্রতিপক্ষ যে প্রায় সমকক্ষ তাহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে ('না'-পরিহার)।

সমাজের বা জাতির যাহাতে মঙ্গল হয় এমন সকল কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় (জটিল)—সমাজের বা জাতির মঙ্গলজনক সকল কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় (সরল)।

যখন সমগ্র দেশ বহিরাক্রমণে বিপন্ন হইত তখন তাহারা দ্বেষাদ্বেষি ভুলিয়া দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিত (জটিল)—সমগ্র দেশ বহিরাক্রমণে বিপন্ন হইলে তাহারা দ্বেষাদ্বেষি ভুলিয়া দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিত (সরল)।

এই ভেদবুদ্ধি বিদূরিত না হইলে জাতীয় সংহতির কোনো আশা নাই (সরল)—এই ভেদবুদ্ধি যদি বিদূরিত না হয় তবে জাতীয় সংহতির কোনো আশা নাই (জটিল)।

ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে-গড়া তাজমহলও এত কাল স্থায়ী হইত না (নঞর্থক)—ভিত্তি দৃঢ় বলিয়াই পাথরে-গড়া তাজমহলও এত কাল স্থায়ী হইয়াছে (অস্ত্যর্থক)।

যে পুষ্করিণীর জল সারা গ্রামের লোক পান করে, লোকে তাহার জল নানাভাবে দূষিত করিতেছে (জটিল)—সারা গ্রামের পানীয় পুষ্করিণীর জল লোকে নানাভাবে দূষিত করিতেছে (সরল)।

রবীন্দ্রনাথের যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে তাহাদের কীর্তির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে—রবীন্দ্রনাথের যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে তাহাদের কীর্তির কিছু আভাস আমরা পাইব (বাচ্যান্তর)।

সেই বরযাত্রীর মনোভাব এখনও অনেক ছেলের আছে (অস্ত্যর্থক)—সেই বরযাত্রীর মনোভাব এখনও কম ছেলের নাই (নঞর্থক)।

ছেলেদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—ছেলেদের কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল (বাচ্যান্তর)।

কেবল রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাই পুরা স্বাধীনতা নয় (নঞর্থক)—কেবল রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা আংশিক স্বাধীনতা মাত্র (অস্ত্যর্থক)।

জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা শৃঙ্খলাবোধ (অস্ত্যর্থক)—জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলাবোধের চেয়ে বড়ো কথা আর নাই (নঞর্থক)।

তবু আমাদের শিক্ষা হয় না—তবু আমরা শিক্ষা পাই না ('আমাদের' পদটিকে কর্তৃপদে পরিণত করিয়া)।

যাহাতে শৃঙ্খলা নাই তাহা আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি না (জটিল) —শৃঙ্খলাহীন বস্তু আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি না (সরল)।

তাহাতেই আমাদের চরিত্রও গঠিত হইতে পারিত—তাহাই তাহাদের চরিত্রও গঠিত (বা, গঠন) করিত ('তাহাতেই' পদটিকে কর্তৃপদে পরিণত করিয়া)।

বাক্য-রচনা ঃ **প্রকৃতিস্থ ঃ** সন্ধ্যার পর জমিদারবাবু প্রায়ই প্রকৃতিস্থ থাকেন না।

নির্বেদ ঃ পুত্র না হওয়ায় রাজা নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া তপোবনে চলিয়া গেলেন।

বিধিবদ্ধ ঃ বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই।

অনুকল্প : মাতৃহীন শিশুটির কাছে দিদিই মাতার অনুকল্প।

সব্যসাচী : সব্যসাচী বঙ্কিম একহাতে সৃষ্টি ও অন্যহাতে বিনাশের কার্যে ব্রত হইলেন।

সর্বাঙ্গীণ : আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।

প্রাপ্তবয়স্ক : মনু বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরও মাতৃসান্নিধ্যে বেশীক্ষণ থাকিতে নাই।

অপব্যবহার : স্বার্থপর মানুষ যদি বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে, তবে তাহা বিজ্ঞানের অপরাধ নয়।

অপচার : স্বাধীনতা যদি কেবল ধনীই ভোগ করে, তবে তাহা স্বাধীনতার অপচার।

উদাত্ত : নেতাজীর উদাত্ত আহ্বান আর কি আমাদের দেশে ধ্বনিত হইবে ?

যথাযোগ্য : যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও আশীর্বাদ জানাইবে।

আতিশয্য : কোনো ব্যাপারেই আতিশয্য ভালো নয়।

অম্লানবদনে : এত তিরস্কার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষিত হইল সে অম্লানবদনে ভাত খাইতে বসিল।

প্রতিহত : সে-আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে এমন কোনো রাষ্ট্র ইউরোপে তখন ছিল না।

আবেষ্টনী : সৌন্দর্য অনেকাংশে বস্তুর আবেষ্টনীর উপর নির্ভর করে।

ঐতিহ্য : ভারতবাসী এক মহান্ ঐতিহ্যের অধিকারী।

ইয়ত্তা : পণপ্রথা যে কত পিতার সর্বনাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিশ্বজনীন : যে কাব্যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে, তাহাই সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়।

ব্যত্যয় : প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই।

ব্যাকরণগত টীকা : গড়িয়া তুলিতে—দুইটি ক্রিয়ার যোগে একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ। এইরূপ ক্রিয়ার মূল অর্থ থাকে পূর্বাঙ্গে, উত্তরাঙ্গ পূর্বাঙ্গের অর্থসম্পূর্ণতা ঘটায়।

দ্বেষাদ্বেষি—'সমাস' দ্রষ্টব্য।

কবলিত—'প্রকৃতি-প্রত্যয়' দ্রষ্টব্য।

কানাকানি—'সমাস' দ্রষ্টব্য।

অনুশীলন—এই কথাটিতে 'অনু' উপসর্গ কিনা তাহাই বিচার্য। প্র, পরা প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপসর্গই সংস্কৃত ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে যে 'শীল' ধাতুর পূর্বে 'অনু' উপসর্গটি যুক্ত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত ধাতু নয়, বাঙলা ধাতু; সুতরাং সংস্কৃতপন্থায় চলিলে 'অনু'-কে ঠিক উপসর্গ বলা যায় না। অ-সংস্কৃত ধাতুর সহিত এইরূপ উপসর্গের যোগ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

নিরবচ্ছিন্ন—'অবচ্ছিন্ন' (অব – ছিদ্+ক্ত) কথাটি বিশেষণ। বিশেষণকে লইয়া নঞ্ বহুব্রীহি সমাস হয় না, হয় বিশেষ্যকে লইয়া। অতএব 'নিঃ নাই অবচ্ছেদ যাহাতে তাহা' এই ব্যাসবাক্যে 'নিরবচ্ছেদ' পদই শুদ্ধ। কিন্তু 'নিরবচ্ছেদ'-এর অর্থ বুঝাইতে ভুল 'নিরবচ্ছিন্ন' কথাটি অনেকেই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। সেই হিসাবে ইহাকে প্রয়োগসিদ্ধ বলা চলে।

চলিত-ভাষায় রূপান্তর: সমগ্র প্রবন্ধটি সাধু-ভাষায় রচিত বলিয়া ইহা হইতে যে-কোনো অংশ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে।

ভারতবর্ষ

এস্. ওয়াজেদ আলি

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস—লেখকের "মাশুকের দরবার" নামক গল্পসংকলন হইতে আলোচ্য গল্পটি গৃহীত হইয়াছে।

নামকরণ—লেখক এই গল্পে ভারতবর্ষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সংবলিত একটি ভাবচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষ বলিতে অনেকেই মানচিত্রের ত্রিভুজাকৃতি একটা বিশাল ভূখণ্ড বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু উহা সত্যকার

ভারতবর্ষ নহে। উদাহরণস্বরূপ, মানচিত্রের গায়ে যাহা একটি বিন্দু ব্যতীত অন্য কিছুই নয় সেই বারাণসীর মঠমন্দিরশোভিত, বহুস্মৃতিবিজড়িত, মন্ত্রপূত অপর এক চিত্র মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে। উহাই স্থানটির প্রকৃত রূপ—মানচিত্রের অবস্থান নহে। সমগ্র ভারতবর্ষেরও তেমনি একটা রূপ আছে। উহা যে সঠিক কিরূপ তাহা কেবল অনুভূতিগম্য। লেখক দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই রূপটি দেখিয়াছেন, এবং এই গল্পের মধ্য দিয়া আমাদের সম্মুখে প্রকৃত ভারতবর্ষের আলেখ্যটি ধরিয়াছেন।

শতাব্দীর পরিবর্তনস্রোতে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শহর-বন্দরে ছাইয়া গিয়াছে। প্রাসাদ-অট্টালিকায় শহরগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, আরও কত দিকে কত প্রকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এ-সকলের মধ্যে খাঁটি ভারতীয় ভাস্কর্যের বা অন্য কিছুরই স্বাভাবিক পরিপুষ্টি দেখিতে পাই না। উহারা, মূলতঃ বৈদেশিক উপাদানে গঠিত। কিন্তু আজিকার দিনেও ভারতের নগণ্য কুটীরটি খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতেই নির্মিত হয়। উহার অভ্যন্তরের শাটকোটহীন নগ্নদেহ ভারতবাসীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আবহমানপ্রচলিত ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের সত্যকার রূপ নিহিত রহিয়াছে। যুগে যুগে সেই একই সুরে একই ভঙ্গিতে এবং একই পরিবেশের মধ্যে রামায়ণ-পাঠ—দৃশ্যটি নেহাত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেই সমগ্র ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপটি অনুভূতি-লোকে ফুটিয়া উঠে। লেখক এই গল্পে তাহাই দেখাইয়াছেন এবং সেই কারণে গল্পটির 'ভারতবর্ষ' নাম সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং সার্থক হইয়াছে।

সমালোচনা—এই গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার ন্যায় উপভোগ্য। লেখকের একটুকরা নিগূঢ় অভিজ্ঞতাই ইহার উপজীব্য। এতই সহজ এবং সরল ভঙ্গিতে ইহা বিবৃত হইয়াছে যে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় পাঠকের অনুভূতি-লোকে অচিরেই সঞ্চারিত হয়।

এ-যুগে একটিমাত্র অতিশয় ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে গল্প-কণিকারূপে লিখিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই এমন একটা রূপকার্থ নিহিত থাকে, যাহা অনভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে প্রায়ই দুরধিগম্য। তাহাদের সহিত আলোচ্য গল্পটির পরিসরের দিক্ দিয়া তফাত বড় বেশী কিছু নাই। তফাত শুধু সহজ সরল প্রকাশভঙ্গির নিপুণতায়। পঁচিশ বৎসর আগে এবং পরে

সামান্য এক মুদির দোকানে লেখক যে একটি চিত্র অপরিবর্তিতরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল এবং খাঁটি ভারতের একটি মানসচিত্র তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। গল্পটি পড়িলে পাঠকেরও দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং সেই মুদির দোকানের ক্ষুদ্র চিত্রটি প্রসারিত হইয়া প্রকৃত ভারতবর্ষের আলেখ্যটি ফুটিয়া উঠে। এইখানেই লেখকের প্রধান কৃতিত্ব।

সংক্ষিপ্তসার—পঁচিশ বৎসর পূর্বে দশ-এগারো বৎসর বয়সে লেখক একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসার নিকটে একটা মুদিখানার পাশ দিয়াই ছিল যাতায়াতের পথ। লেখক দেখিতেন, এই মুদিখানার গদীতে বসিয়া এক বিরলকেশ শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য গম্ভীরদর্শন বৃদ্ধ একখানা প্রকাণ্ড বই লইয়া সাপ-খেলানো সুরে কি যেন পড়িত। তাহার শ্রোতা ছিল লেখকেরই সমবয়স্ক একটি বালক, দুইটি মেয়ে আর একজন মধ্যবয়স্ক লোক, যে ক্রেতা আসিলে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া গিয়া তাহাদের দেখাশুনা করিত। শ্রোতাদের হাবভাব দেখিয়া মনে হইত তাহারা পাঠের বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করিতেছে।

কৌতূহলের বশে লেখক একদিন দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। পড়া হইতেছিল রামায়ণ—বানরসেনার সাহায্যে কি করিয়া রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধিয়াছিলেন তাহারই কাহিনী। অন্যান্য শ্রোতার ন্যায় লেখকও তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল বলিয়া সেতুবন্ধনের পরবর্তী ঘটনা আর তাঁহার শোনা হইল না।

ইহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল। কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে মহানগরীর রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল। লেখকের স্মৃতিপট হইতেও অন্য বহুতর বস্তুর সহিত মুদিখানার ছবিটি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল। হঠাৎ একদিন পথ চলিতে চলিতে তাঁহার চোখ পড়িল সেই পুরাতন মুদিখানাটির উপর। ইহার বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হইলেও ভিতরের দৃশ্য তাঁহাকে স্তম্ভিত করিল। গদীতে বসিয়া এক বৃদ্ধ রামায়ণপাঠে রত, আর তাহার শ্রোতা পূর্বের ন্যায় একটি মধ্যবয়স্ক লোক এবং গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে। বৃদ্ধ পড়িতেছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা—পঁচিশ বৎসর পূর্বে লেখক যাহা শুনিয়াছিলেন।

অতীতের এই নিখুঁত পুনরাবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইল তাহা জানিবার কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিলে লেখক সোজাসুজি বৃদ্ধকে গিয়া প্রশ্ন করিলেন। বৃদ্ধের উত্তরে তিনি জানিলেন, পঁচিশ বৎসর পূর্বে সেই দোকানে যে বৃদ্ধকে তিনি রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন সে বর্তমান বৃদ্ধের পরলোকগত পিতা। বর্তমান বৃদ্ধের ছেলেমেয়েরাই রামায়ণ-পাঠ শুনিত, আর এখন তাহাদের পরিবর্তে শুনিতেছে তাহারই নাতিনাত্‌নীরা। তাহার ছেলেটিও বর্তমানে লেখকের সমবয়স্ক। দোকানে থাকিয়া সে ক্রেতাদের দেখাশুনা করে। বৃদ্ধের হাতের বইখানির দিকে ইঙ্গিত করা হইলে সে সহাস্যে বলিল ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ—তাহার ঠাকুরদাদা বটতলায় এখানি কিনিয়াছিলেন।

বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া লেখক চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠিল প্রকৃত ভারতবর্ষের একটি নিখুঁত ছবি—বাহিরের শত পরিবর্তনেও যাহার এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই।

মর্মার্থ—নদনদী-গিরিকান্তার-পরিশোভিত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ সংবলিত যেমন একটি চিত্র রহিয়াছে, তেমন তাহার আবহমান-প্রচলিত ঐতিহ্যসহকারে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অপর একটি চিত্রও রহিয়াছে। শতাব্দীর বিবর্তনে ভারতবর্ষের বহিরঙ্গের নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনযাত্রার সেই ভাবচিত্রটির বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। আলোচ্য গল্পে নগণ্য এক মুদির দোকান এবং তাহার অভ্যন্তরে এক বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে নাতিনাত্‌নী-পরিবৃত বৃদ্ধের একই সুরে একই ভঙ্গিতে যুগে যুগে একই প্রকারের রামায়ণ-পাঠের মধ্যে যে আলেখ্যটি ফুটিয়া উঠে তাহাই প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত চিত্র। ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ, নিতান্ত আড়ম্বরহীন যুগ-প্রাচীন তাহার জীবন-যাত্রার আদর্শ। এদেশের লোক বার্ধক্যে কর্মভার পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নাতিনাত্‌নীর আসর গড়িয়া তোলে এবং রামায়ণ বা মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যের কোনো একটি লইয়া তাহার অবসরপ্রাপ্ত দিনগুলি ভরিয়া তোলে। পুত্র পিতার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সংসারের দায়িত্ব বহন করে, আর বৃদ্ধ সংসারের মধ্যেই একপ্রকার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। এই ধারাটি যুগে যুগে ভারতবর্ষে অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার মধ্যেই প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত চিত্র নিহিত রহিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১-২। **পঁচিশ বৎসর পূর্বে**—লেখক যখন প্রবন্ধটি লেখেন তখন তাঁহার বয়স ৩৫ কিংবা ৩৬। সেই হিসাবে ঘটনাটির সময় ১৯০০ কিংবা ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ বলা চলে। অবশ্য ইহা গল্পের কথা, লেখকের আত্মজীবনের সত্যকাহিনীর সহিত ইহার হুবহু মিল না-ও থাকিতে পারে। মুদিখানা—চাল, ডাল, তেল, লবণ প্রভৃতির দোকান। **গদি**—মহাজনদিগের কারবারের স্থান। এইরূপ স্থানে সাধারণতঃ তোশক পাতিয়া তাহার উপর ফরাশ এবং তাকিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই এইরূপ নাম। এখানে বসিয়া দোকানের হিসাব-পত্র রাখা হয়। বিপুলকায়—বিরাট্ আকারের, প্রকাণ্ড। **সাপ-খেলানো সুর**—সাপুড়িয়ারা যেরূপ সুরে গান করিয়া এবং কথা বলিয়া সাপের খেলা দেখায়। **চাঁদি**—খাঁটি রূপা। শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য—দাড়ি-গোঁফহীন। বিষয়টি—রামায়ণের যে বিশেষ অংশটি পড়া হইতেছিল তাহা। উপভোগ করছে—বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে আনন্দ অনুভব করিতেছে। কৌতূহল—আগ্রহ। কপিসেনা—বানরসৈন্য। সেতু—বাঁধ, পুল। ক্রিয়াকাণ্ড—কার্যকলাপ। 'কাণ্ড' কথাটি 'সমূহ' অর্থে ব্যবহৃত। **তন্ময়**—নিবিষ্টচিত্ত, বিভোর।

অ. ৩। দেশে—লেখকের জন্মভূমি হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে। **মনের কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল**—বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইল, একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

অ. ৪-৬। **ম্যান্‌শন** (mansion)—অট্টালিকা, হর্ম্য। রিক্শ—মানুষে-টানা দুইচাকার গাড়ী। শব্দটি জাপানী। **অবশ্যম্ভাবী**—যাহা হইবেই হইবে। মায়ামন্ত্র-বলে—ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের প্রভাবে। **কোনো মায়ামন্ত্র-বলে সেই সুদূর** ইত্যাদি—লেখক যাহা দেখিলেন তাহাতে নিজের চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কালের প্রভাবে সবকিছুরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্বের মুদিখানার সেই বিস্মৃতপ্রায় চিত্রটি আজ পঁচিশ বৎসর পরে লেখকেরই চক্ষুর সম্মুখে অবিকল দেখা দিল কিরূপে? তাই তিনি কল্পনা করিয়াছেন—কোনো শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক যেন জাদুমন্ত্রের প্রভাবে সেই অতীতের চিত্র অপরিবর্তিতরূপে বর্তমানে আনিয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ ঘটনাধারায় ইহা অসম্ভব।

অ. ৭-৮। থাকতে পারলুম না—কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

রামচন্দ্র কি এখনও ইত্যাদি—লেখক পঁচিশ বৎসর পূর্বে মুদিখানায় রামায়ণে বর্ণিত সেতুবন্ধনের কাহিনী পড়িতে শুনিয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর পরেও ঠিক সেতুবন্ধনের কাহিনীটিই পড়িতে শুনিয়া কৌতূহলী হইয়াছেন—ইহা কি আর শেষ হয় না! লেখকের সূক্ষ্ম কৌতুক লক্ষণীয়। একালের ধারণা-অনুসারে পঁচিশ বৎসরে একটি কেন, অনেক সেতুই নির্মিত হইতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র সেতু নির্মাণের জন্য রামচন্দ্রের মতো কর্মীর পক্ষে এই পঁচিশ বৎসরও কি যথেষ্ট নয়? খুঁট—প্রান্ত। গ্লাস—(glass) চশমার কাচ। **আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলে**—পা হইতে মাথা পর্যন্ত দেখিয়া লইল। ইহাদ্বারা বৃদ্ধটি লেখকের বয়স অনুমান করিতেছিল নিশ্চয়। পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই ব্যক্তির পক্ষে তাহার পিতার রামায়ণ-পাঠ শোনা সম্ভব কিনা বৃদ্ধ হয়তো তাহাই দেখিয়া লইল। ঘরকন্না করছে—গৃহস্থধর্ম পালন করিতেছে। **স্মিত**—সহাস্য, হাসিমাখা। এ হাসির অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, বৃদ্ধ বইখানির প্রাচীনত্ব এবং জীর্ণ অবস্থার প্রতি লেখকের ইঙ্গিত বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে। **আস্যে**—মুখে; **বি. দ্র.**—'আস্য' কথাটির প্রয়োগ সাধুভাষায় থাকিলেও (তুলনীয়: "সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য"—রবীন্দ্রনাথ) চলিত-ভাষায় নাই। আমাদের বিবেচনায় এই একটি কথাই প্রবন্ধটির ভাষাগত সরলতা নষ্ট করিয়াছে। 'মুখে' লিখিলে কোনো ক্ষতি তো হইতই না বরং লাভই হইত। কৃত্তিবাস—বাংলাভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি। **বটতলা**—সেকালে উত্তর কলিকাতার চিৎপুর অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এই স্থান হইতে বাঙলা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইত। অভিবাদন—নমস্কার। **দিব্যচক্ষু**—দৃষ্টি, যে দৃষ্টির নিকট বস্তুর বাহ্য রূপের অন্তরালে সত্যকার রূপ ধরা পড়ে। **প্রকৃত ভারতবর্ষ**—লেখকের মতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা কেবল বাহিরের। অভ্যন্তরটি বাহ্য শত পরিবর্তনেও অবিকৃত থাকিয়া গিয়াছে। অতএব এই অভ্যন্তর রূপটিই ভারতবর্ষের সত্যকার রূপ, ইহাই প্রকৃত ভারতবর্ষ। নিখুঁত—অপরিবর্তিত, অবিকৃত, যথাযথ। Tradition—সুপ্রাচীন ভাবধারা, জীবনযাত্রার চিরাচরিত পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা

(১) তারপর কোথা থেকে……ভুলে যাচ্ছি। (অ. ৩)

এই অংশটি এস্. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধের অন্তর্গত। লেখক

এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের পঁচিশ বৎসরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাড়ীর নিকটে মুদিখানায় বৃদ্ধের রামায়ণ-পাঠ আংশিকভাবে শুনিবার পর লেখককে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাহার পরবর্তী সকল ঘটনা তাঁহার স্মরণ নাই—কোন্ প্রয়োজনে কোথা হইতে কবে কোথায় গেলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিতে পারেন না। সেই ঘটনার পর তাঁহার জীবনের পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—পূর্বে তিনি দশ-এগারো বৎসরের কিশোর ছিলেন, এখন হইয়াছেন পূর্ণবয়স্ক যুবক। ইহা ছাড়া আরও নানারূপ পরিবর্তন তাঁহার জীবনে আসিয়াছে। নদীস্রোত যেমন চলার পথে উভয় তীরকে কখনও ভাঙে কখনও গড়ে, কখনও বা শস্যশ্যামলা করিয়া তোলে, এই দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসরও সেইরূপ তাঁহাকে বিচিত্র পরিবর্তন এবং পরিণতি দান করিয়াছে। পরিবর্তন-প্রবাহ যেন নদীধারার ন্যায়, লেখক উহার খাত। বহুতর নূতন অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে লেখক পুরাতন পরিচিত বহু জিনিসকে ভুলিয়া গিয়াছেন। মানুষের স্মৃতিরাজ্য বড়ই অদ্ভুত। যাহা স্মরণের যোগ্য আমরা হয়তো শত চেষ্টা করিয়াও তাহা মনে রাখিতে পারি না; আবার যাহা তুচ্ছ নগণ্য তাহাই হয়তো স্মৃতিপটে গভীর রেখাপাত করিয়া যায়। বাল্যে দেখা মুদিখানার চিত্রটি—সেই পলিতকেশ বৃদ্ধ, তাহার পুত্রপৌত্রাদিপরিবৃত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আলেখ্য—লেখকের অন্তরে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইল। কোনো-কালে সেরূপ দৃশ্য যে তিনি দেখিয়াছেন তাহাই তিনি ভুলিয়া গেলেন।

(২) কোনো মায়ামন্ত্র-বলে……যা শুনেছিলুম। (অ. ৬)

আলোচ্য অংশটি এস্. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ব্যবধানেও বাল্যে দেখা মুদিদোকানের ছবিটি অপরিবর্তিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া লেখকের যে মনোভাব হইয়াছিল তাহাই এই অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে।

দশ-এগারো বৎসর বয়সে কলিকাতার এক নগণ্য পল্লীতে একটি মুদিখানায় নাতিনাত্‌নী-পরিবৃত রামায়ণ-পাঠরত এক বৃদ্ধের যে চিত্রটি লেখক দেখিয়া-ছিলেন, পঁচিশ বৎসর পরেও সেই চিত্রটির অবিকল পুনরাবৃত্তি দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একে তো মহানগরীর বাহ্য শত পরিবর্তনের মধ্যেও এই মুদিখানাটি প্রায় অপরিবর্তিতই থাকিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ভিতরের দৃশ্য যে আরও

বিস্ময়কর। দোকানের গদীতে বসিয়া সেই পূর্বের মতো এক বৃদ্ধ রামায়ণপাঠে রত, তাহার শ্রোতা পূর্বেরই মতো গুটিদুই-চার ছেলেমেয়ে। পাঠের বিষয়ও রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কাহিনী, যাহা লেখক পঁচিশ বৎসর পূর্বেও শুনিয়াছিলেন। যাহা অতীত তাহা অতীতই—তাহা কখনও ফিরিয়া আসিতে পারে না। পরিবর্তনই সাধারণ নিয়ম। অথচ এই মুদিদোকানটি ভিতরে-বাহিরে কোনো দিক্ দিয়াই পরিবর্তনের প্রভাব এতটুকুও অনুভব করে নাই—ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? জাদুমন্ত্রের বলেই এই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। লেখকের বিশ্বাস হইল—কোনো শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক যেন জাদুমন্ত্রের প্রভাবে সেই অতীতের চিত্র নিখুঁত এবং অপরিবর্তিত আকারে বর্তমানে আনিয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ ঘটনাধারায় ইহা অসম্ভব।

(৩) "আমি আর……ব্যস্ত আছেন?" (অ. ৭, ক. বি. ১৯৪০)

'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধের লেখক এস্. ওয়াজেদ আলি এই অংশটিতে পঁচিশ বৎসরেও কলিকাতার একটি নগণ্য মুদিখানার অবিকৃত অপরিবর্তিত রূপ দেখিয়া কিরূপে তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত করিলেন তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন।

মুদিখানার চিত্রটির অবিকল পুনরাবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইল ইহা জানিবার জন্য লেখকের কৌতূহল দুর্নিবার হইয়া উঠিল। তাই কোনোরূপ দ্বিধা না করিয়া তিনি সোজাসুজি গদীতে উপবিষ্ট বৃদ্ধের নিকটে গিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে তিনি বৃদ্ধকে এই ছেলেদের সম্মুখে এই বইখানি পড়িতে দেখিয়াছিলেন। এই পঁচিশ বৎসর সময় তো মানুষের দৈহিক পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বৃদ্ধ ও রামায়ণপাঠের শ্রোতা এই ছেলে-মেয়েদের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইল কিরূপে? অর্থাৎ কালক্রমে শিশু যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়—ইহাই স্বাভাবিক। অথচ দোকানের প্রাণী কয়টি পূর্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি রহিয়া গিয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব? তাহা ছাড়া, পঁচিশ বৎসর পূর্বে রামায়ণে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনীই পড়া হইতেছিল, এখনও তাহাই পড়া হইতেছে। রামচন্দ্র কি এতকাল বসিয়া সেতুবন্ধনই করিতেছেন? পঁচিশ বৎসরে একটি কেন, অনেক সেতুই তো নির্মিত হইতে পারে। একটি সেতু-নির্মাণের জন্য রামচন্দ্রের ন্যায় কর্মীর পক্ষে এই পঁচিশ বৎসর যথেষ্ট নয় কি?

(৪) মনে হলো,……পরিবর্তন ঘটেনি। (অ. ৮; ক. বি. ১৯৪৩)

এই অংশটি এস্. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধের উপসংহার।

কলিকাতার এক নগণ্য পল্লীতে সামান্য একটি মুদিখানা হইতে লেখকের যে পরম অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

দোকানে উপবিষ্ট রামায়ণপাঠরত বৃদ্ধের নিকট প্রশ্ন করিয়া লেখক যাহা জানিতে পারিলেন তাহাতে তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইল, কিরূপে পঁচিশ বৎসরের পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় ছবিটি তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অপরিবর্তিত আকারে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই এক পরম সত্য তাঁহার নিকট স্পষ্টভাবে ধরা পড়িল। তাঁহার মনে হইল, তিনি দৈব বা অনুরূপ কোনো শক্তিবলে এমন এক দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন যাহার দ্বারাই কেবল বস্তুর সত্যকার রূপদর্শন সম্ভব। ক্ষুদ্র মুদিদোকানটি এবং বৃদ্ধ দোকানীর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে লেখক সমগ্র ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার একটি অনুকল্প চিত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ভারতের এবং ভারতবাসীর জীবনধারার যাহা বৈশিষ্ট্য তাহার সবকিছুই এই ক্ষুদ্র দোকানটিতে পাওয়া যাইবে। রামায়ণ-মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ, নিতান্ত আড়ম্বরহীন যুগ-প্রাচীন তাহার জীবনযাত্রার আদর্শ। এদেশের লোক বার্ধক্যে সংসারভার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া নাতিনাত্‌নী-পরিবৃত হইয়া সংসারের মধ্যেই এক-প্রকার অনাসক্ত অবসরময় জীবন যাপন করে। পুত্র পিতার বৃত্তি এবং সংসারের দায়িত্ব যেন অপরিবর্তনীয় বিধানরূপেই গ্রহণ করে। বাহিরের শত পরিবর্তনের মধ্যেও এই ধারাটি, জীবনযাত্রার এই চিরাচরিত পদ্ধতিটি, ভারতবর্ষে আবহ-মানকাল অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাই প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত রূপ। [দিব্যচক্ষু, tradition—ইহাদের উপর টীকা লেখ।]

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। তোমাদের নিজের ভাষায় এস্. ওয়াজেদ আলি-লিখিত 'ভারতবর্ষে'র কাহিনী এবং উহার মর্মার্থটি বিবৃত কর। (ক. বি. ১৯৩৫)

উ.। সংক্ষিপ্তসার ও মর্মার্থ দেখ।

প্র. ২। "সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি।"—লেখক ইহাদ্বারা কিসের কথা বলিতেছেন? প্রাসঙ্গিক গল্পের মূল ভাবটি নিজের ভাষায় বিশদভাবে সম্প্রসারিত কর।

উ.। লেখক পঁচিশ বৎসর পূর্বে এবং পরে কলিকাতায় কোনো এক পথিপার্শ্বে নগণ্য মুদিদোকানের চিত্র অপরিবর্তিত এবং অবিকৃতরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই দোকানে বসিয়া এক বৃদ্ধ রামায়ণ পড়িত, পাশে নাতি-নাতনীরা বসিয়া শুনিত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্তবড় এক টাক। তার চারিপাশে ছিল সাদা-পাকা চুল। নাকের উপর তাহার মস্ত চাঁদির চশমা থাকিত। দাড়িগোঁফহীন মুখে তাহার বেশ একটি গম্ভীর বিজ্ঞ ভাব ফুটিয়া উঠিত। মধ্যবয়সের অপর একটি লোক তাহার নিকট বসিয়া মাঝে মাঝে পাঠ শুনিত আবার ক্রেতা আসিলে উঠিয়া গিয়া বেচাকেনা করিত। লেখক এই দৃশ্য প্রথম দেখেন যখন তাঁহার বয়স দশ-এগারো। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। কালের অমোঘ পরিবর্তনে শহরের রূপ প্রায় আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই দৃশ্যটি কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় না। সেই বৃদ্ধ সেই তার টাক আর সাদা চুল ও চাঁদির চশমা, তাহার নাতিনাতনী আর সেই মধ্যবয়স্ক লোকটি ঠিক একই রূপে পঁচিশ বৎসর পরেও দেখা যায়। এমন-কি দোকানের কেরোসিনের বাতিটি পর্যন্ত স্থানভ্রষ্ট হয় না।

দৃশ্যটি দেখিয়া লোকের অনুভূতিলোকে প্রকৃত ভারতবর্ষের একটি নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠে। তিনি দেখিতে পান ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার একটা বিশিষ্ট ধারা কালের সকল বাহ্য পরিবর্তনকে উপেক্ষা করিয়া অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে। উদ্ধৃত মন্তব্যে তিনি এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য গল্পের মূল ভাবটি ভারতবর্ষের একটি ভাবচিত্রের উপর আলোক-সম্পাত করে। প্রত্যেক বস্তুরই দুইটি রূপ আছে—একটি তাহার বহিরঙ্গের, অপরটি আভ্যন্তরীণ; একটি পরিবর্তনশীল, অপরটি নিত্য। ভারতবর্ষেরও সেইরূপ একটি নিত্য রূপ রহিয়াছে এবং সেই রূপটি হইল তাহার বিশিষ্ট জীবনধারার অনাড়ম্বর ভাবচিত্র। এই রামায়ণ-মহাভারতের দেশে বহিরঙ্গের দিক্ দিয়া কতই না পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কত শহর গড়িয়াছে, কত প্রকারের কত প্রাসাদ উঠিয়াছে। পথঘাট দোকানপাটের রূপ ক্রমেই একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে। এ-সকল বাহ্য পরিবর্তন জীবনযাত্রার উপরেও যে প্রভাব বিস্তার করে নাই তাহা নহে। পোশাক-পরিচ্ছদ আহার-বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই দুর্নিবার বিবর্তনের ছাপ আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-সকল যাবতীয় পরিবর্তন তো খাঁটি ভারতীয় বস্তুর স্বাভাবিক বিবর্তন নয়। এগুলির অধিকাংশই

বাহিরের আরোপের ন্যায় খাঁটি ভারতীয় সারের উপর খোলসের পরিবর্তন। অতএব নিখুঁত ভারতীয় চিত্র এ-সকলের মধ্যে মিলিবে না। এখানে-ওখানে আজিকার দিনেও কখনও জীর্ণ পুরাতন চিত্রের মধ্যে প্রকৃত ভারতবর্ষের চিত্রটি ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া ওঠে। আলোচ্য গল্পে এই যে মুদির দোকানের চিত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই তাহার নিদর্শন। সাধারণ ভারতবাসিমাত্রই মুদি নহে এবং তাহার জীবনযাত্রাপদ্ধতিও হুবহু মুদির ন্যায় নহে। কিন্তু তথাপি ইহার সহিত তাহার জীবনযাত্রার ধারাটির বহুলাংশে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। একটা বিশেষ বয়সে যেই শিরোদেশে ইন্দ্রলুপ্ত প্রসারলাভ করিল, অমনি পক্কেশ ভারতীয় বৃদ্ধ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের হস্তে সংসারভার ন্যস্ত করিয়া সংসারের মধ্যেই একপ্রকার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যকর কোনো শৈলাবাসে সুদের টাকায় নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিবার পরিবর্তে বৃদ্ধ তখন নাতিনাত্‌নী লইয়া ঠাকুরদাদার আসর জমাইয়া বসেন। রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় কোনো একটা পরপারের পথপ্রদর্শক সুখপাঠ্য বস্তু লইয়া তাঁহার অবশিষ্ট অবসরময় দিনগুলি ভরিয়া উঠে। অথবা নিরক্ষর হইলে, বৃদ্ধ কেবল কানে-শোনা মুখে-বলা রূপকথার রাজ্যে তরী বাঁধিয়া লন। পাথেয় হিসাবে এ-যুগের দেওয়া বড় বেশি তাহার থাকে না, জোর চাঁদির চশমাটি। এদিকে পুত্র তাহার বংশ-পরম্পরাগত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংসার চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহাই ভারতের রীতি। যুগে যুগে এই ধারাটিই অপরিবর্তিতরূপে বহিয়া আসিতেছে। লেখক এই গল্পে ভারতের এই নিখুঁত রূপটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস ঃ দশ-এগারো—দশও হইতে পারে এগারোও হইতে পারে (বহুব্রীহি)। যাওয়া-আসা—যাওয়া এবং আসা (দ্বন্দ্ব)। বিপুলকায়—বিপুল কায় যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। সাপ-খেলানো—সাপ খেলায় যাহা দ্বারা (বহুব্রীহি), তাহা। শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য—শ্মশ্রু এবং গুম্ফ (দ্বন্দ্ব); তাহাদের দ্বারা শূন্য (৩য়াতৎপুরুষ)। খালিগায়ে—খালি গা (কর্মধারয়), তাহাতে। লঙ্কাদ্বীপে—লঙ্কা-নামক দ্বীপ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। নিরীহ—নিঃ (= নাই) ঈহা যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা। দৈবক্রমে—দৈবের

ক্রম (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। মধ্যবয়স্ক—মধ্য বয়ঃ যাহার (বহুব্রীহি), সে। মায়া-মন্ত্রবলে—মায়াসাধ্য বা মায়াজনক মন্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার বল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), তাহাতে। আপাদমস্তক—পাদ (পা) হইতে মস্তক পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। দিব্যচক্ষু—দিব্য যে চক্ষু (কর্মধারয়)। নিখুঁত—নি (=নাই) খুঁত যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা।

সমস্তপদ-গঠন : মাঝারি বয়সের = মধ্যবয়স্ক। আগ্রহের সঙ্গে = সাগ্রহে। আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল = আনন্দাগ্রহোৎসাহোজ্জ্বল। শান্ত জীবনের ছবিটি = শান্তজীবনচ্ছবিটি। ঘোড়ার গাড়ি = ঘোড়গাড়ি। ভগবানের ইচ্ছায় = ভগবদিচ্ছায়।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : মুদিখানা—মুদি + খানা। মাঝারি—মাঝ (< মধ্য) + আরি। অস্তিত্ব—অস্তি (সংস্কৃত ক্রিয়া) + ত্ব। খদ্দের—খরিদ + দার—খরিদ্দার > খদ্দের। অভিবাদন—অভি – বদ্ – ণিচ্ + ল্যুট্ (অন) ভাববাচ্যে।

পদ-পরিবর্তন (বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং তাহার বিপরীত) **:** টাক—টেকো। উপভোগ—উপভুক্ত। তন্ময়—তন্ময়তা। পরিবর্তন—পরিবর্তিত। স্তম্ভিত—স্তম্ভ। দীর্ঘ—দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা, দীর্ঘত্ব। স্মিত—স্ময় (অপ্রচলিত)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল (জটিল)—বুড়োর পাঠের বিষয় জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল (সরল)।

তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম (অস্তিবোধক)—তাদের অস্তিত্বের কথা আমার মনে রইল না (অপোহনাত্মক বা নেতিবাচক)।

এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে—এখন ইলেকট্রিক আলো দিয়ে স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রাখা হয়েছে (বাচ্যান্তর)।

আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর (যৌগিক)—কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাববার সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর (সরল)।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে (সরল)—ভিতরকার দৃশ্য যখন দেখলুম তখন কিন্তু আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম (জটিল)।

কোনো মায়ামন্ত্র-বলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি—কোনো মায়ামন্ত্র-বল সেই সুদূর অতীতকে আবার ফিরিয়ে আনল নাকি ('মায়ামন্ত্র-বলে'-কে কর্তৃপদে রূপান্তরিত করিয়া)।

আমি আর থাকতে পারলুম না—আমার আর থাকতে পারা গেল না (বাচ্যান্তর—রূপটি অবশ্য সুন্দর নয়)।

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, "এই বইটি কবেকার ?"—বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলুম ঐ বইটি কবেকার (পরোক্ষ উক্তি)।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য : ক্রিয়াকাণ্ড—ক্রিয়ার কাণ্ড (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। এখানে 'কাণ্ড' কথাটি বহুবচন বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

মিটমিট ক'রে—ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের অনুকরণে গঠিত অধ্বনিবাচক ক্রিয়া। প্রয়োগে 'জ্বলন্ত' ক্রিয়ার বিশেষণ।

স্বর্গীয়—'স্বর্গেজাত' এই অর্থে স্বর্গ+ছ (=ঈয়)=স্বর্গীয়। কিন্তু 'পিতা-মহাশয়' তো স্বর্গে জাত হইতে পারেন না। অতএব পদটির শুদ্ধরূপ হওয়া উচিত 'স্বর্গত' বা 'স্বর্গগত'। কিন্তু 'স্বর্গগত' অর্থে 'স্বর্গীয়' শব্দটি বাঙলায় বহু-প্রচলিত।

ভিতরকার—ভিতর+ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'কার'। বৈকল্পিক রূপ—'ভিতরে'। স্থানবাচক শব্দের সহিত 'কার' বিভক্তি।

সম্বন্ধপদের প্রকার : পাঠের বিষয়—কর্ম-সম্বন্ধ। পরিবর্তনের স্রোত—অভেদ বা রূপক-সম্বন্ধ। গ্যাসের বাতি—কারণ-কার্য-সম্বন্ধ। আমার পিতা মহাশয়—জন্য-জনক-সম্বন্ধ। ভগবানের ইচ্ছা—কর্তৃ-সম্বন্ধ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ—কৃতি-কারক-সম্বন্ধ। তার পরিবর্তন—কর্তৃ-সম্বন্ধ।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ : বিপুলকায়, শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য, কৌতূহল, দৈবক্রমে, অবশ্যম্ভাবী, স্তম্ভিত, আপাদমস্তক, নিখুঁত।

সাধু-ভাষায় রূপান্তর : রচনাটি চলিত-ভাষায় বলিয়া ইহা হইতে যে-কোনো অংশ সাধু-ভাষায় রূপান্তরিত করিবার জন্য দেওয়া হইতে পারে।

রুপো কাকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়-পঞ্জী' দেখ।

বিভূতিভূষণের রচনাশৈলী—বিভূতিভূষণ তাঁহার বিশিষ্ট রচনাশৈলীর জন্যই অধিকতর প্রসিদ্ধ। তাঁহার উপন্যাস বাঙলাসাহিত্যে যে নূতন সম্ভাবনা ও আশার সঞ্চার করিয়াছে তাহা এখনও পূর্ণতালাভ করে নাই। কিন্তু তাঁহার অভিনব রচনাকৌশল ইতিমধ্যেই সকল চিত্ত জয় করিয়াছে। "তাঁহার দৃষ্টি যেমন, তাঁহার স্টাইলও তেমনি মৌলিক। এই মৌলিকতার কারণ দুইটি; প্রথমতঃ আমাদের রসপিপাসাকে তিনি একটা ভিন্নমুখে ফিরাইয়াছেন—পূর্ববর্তীগণের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) মতো জীবনের অন্তঃস্রোত বা বহিঃস্রোতে অবগাহন করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিতে চাহেন নাই; তিনি তীরে বসিয়া তটশোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, জীবনের দুর্গম গহনে প্রবেশ না করিয়া আপনার মানসযন্ত্রে, তাহার প্রসারিত পটদৃশ্যের ছবি তুলিয়াছেন। জীবন তাঁহার নিকট একটা স্থির শান্ত গতিহীন ও প্রায় সুসজ্জিত চিত্রশালা। তাঁহার চোখ দুইটির পিছনে একটি যে ভাবরসগ্রাহী মন আছে, তাহার রসায়নাগারে বাহিরের যতকিছু—মানুষ, পশু, পক্ষী, মাঠ, বন, নদী ও আকাশ—কেবল একটি রসরূপে পরিণত হয়; প্রাণ যেন বলে,—এই তো! ইহার অধিক কি চাই? তুচ্ছতম বনলতায় ও তৃণপুষ্পে, কুটিরবাসী মানুষের অতি ক্ষুদ্র জঠরের ক্ষুদ্র ক্ষুধার খুদকুঁড়াতেও কি অমৃত রহিয়াছে! চাই কেবল সেই স্বল্পে তুষ্ট তুচ্ছলব্ধ, যাহা-পাই-তাহাতেই ধন্য রসভিখারী মন, তাহা হইলেই জীবনের ধুলামাটিও পরম পদার্থ হইয়া উঠিবে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমনোভাব এমনই বটে। কিন্তু কবিশিল্পী হিসাবে তাঁহার মৌলিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ—তিনি এই কাঙালসুলভ পিপাসাকে সাহিত্যে একটি অভিনব স্টাইলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। এই স্টাইল জীবনের বন্ধগভীর, রহস্যঘোর, বিরাট্‌-বিপুল অথবা সূক্ষ্ম-জটিল শক্তিমহিমার স্টাইল নয়, তথাপি তাহা good art বা নিছক রসসৃষ্টির স্টাইল বটে।...তাঁহার কল্পনা লিরিক্‌-

কবির মতোই আত্মকেন্দ্রিক, তাই তাহা অতিশয় সংকীর্ণ—তিনি কেবল তাঁহার নিজেরই ভাবানুভূতির লিপিকার।”

উৎস ও নামকরণ—‘রুপো কাকা’ গল্পটির মূল নাম ‘রুপো বাঙাল’ বিভূতিভূষণের ‘অসাধারণ’-নামক গল্পসংকলন হইতে ইহা গৃহীত।

পাঠ-সংকলনে ‘রুপো বাঙাল’ নাম পরিবর্তন করিয়া ‘রুপো কাকা’ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পরিবর্তন রুচির খাতিরেই করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে রুচির প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয়। লেখকের নিজস্ব নামকরণেও হস্তক্ষেপ সবসময় সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ‘রুপো বাঙাল’ অপেক্ষা ‘রুপো কাকা’ নামটি কয়েকটি দিক্ দিয়াই সমর্থন করা যায়। ‘রুপো বাঙাল’ বলিতে লেখক যে চরিত্রটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহার বাঙাল হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রমাধুর্য কি অপূর্ব—সেইটাই শিরোনামের ব্যঞ্জনা। কিন্তু ‘বাঙাল’-শব্দের আঞ্চলিক অর্থ আছে এবং ছাত্রদের সংস্কারে এই কদর্থের স্থান দেওয়া সঙ্গত নয়। সেইজন্য ‘বাঙাল’-এর স্থলে ‘কাকা’ কথাটির প্রথম উপযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ, সেই গল্পের বক্তা ‘রুপো’-নামক ব্যক্তিটিকে কাকা বলিয়াই ডাকিত। তাহার বিবরণে একটি গ্রাম্য কৃষাণ শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় সত্যকার কাকার চেয়েও গৌরবান্বিত হইয়াছে। বর্ণনার মধ্যে অবশ্য রুপো-কে কথকের পিতার দাদাস্থানীয় বলিয়াই দেখা যায়। কাজেই রুপো-র কাকা না হইয়া জ্যেঠা হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু মনিব ছোট হইয়াও বড়। ভৃত্য দাদা হইয়াও ছোট ভাইয়ের পর্যায়ে গণ্য হয়। এই লৌকিক সত্য লেখক অজ্ঞাতসারে মানিয়া লইয়াছেন। ইহার মধ্যে যদি-বা কিছু বিরোধ থাকে তবে সে-বিচার এখানে উঠে না। গল্পের মধ্যে গল্পের মুখপাত্র রুপো-কে কাকা বলিয়াই ডাকিত এবং এই ‘রুপো কাকা’ই গল্পটির কেন্দ্র। সুতরাং তাহার নামেই এই গল্পের নাম।

সমালোচনা—বিভূতিভূষণের ‘রুপো কাকা’ গল্পটির মধ্যে একটি প্রাচীন ভৃত্যের বিশ্বস্ততা সাধুতা ও বাৎসল্য অপূর্ব মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। গল্পটি অবয়বে ও প্রকৃতির দিক্ দিয়া সর্বপ্রকারেই ছোট। ইহার বস্তু ও সমস্যা সরল, চরিত্রবর্ণনা সাধারণ। বাঙালীর ঘরে পুরাতন ভৃত্য একটা অবর্ণনীয় সম্পর্ক পাতাইয়া হৃদয়ে হৃদয় জড়াইয়া এমন আপন হইয়া যায় যে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত অতি আপনজনও তেমন হয় না। এই পুরাতন ভৃত্যের সাধুতা,

বিশ্বস্ত সেবা ও হৃদয়রসের উৎস কোনও স্বার্থ বা উচ্চ আদর্শবাদ নহে। নিছক মমতা ও স্নেহের নিবিড় বন্ধন হইতেই এই অপূর্ব বস্তুর উদ্ভব। এইশ্রেণীর পুরাতন ভৃত্যের মধ্যে অবশ্য সরলতাও সহজাত। তাহার একমাত্র আত্মস্বার্থ প্রায় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া প্রভুপরিবারের মঙ্গলসাধনের মধ্যে চরম চরিতার্থতা বোধ করে। রবীন্দ্রনাথের রাইচরণ এই ধরনের মানুষেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিভূতিভূষণ অবশ্য ভৃত্যকে আরও একটু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ভৃত্যকে তিনি প্রভুত্ব দিয়াও একনিষ্ঠ সেবকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অতিরঞ্জন নয়। রূপো কাকার অস্তিত্ব আমাদের সমাজে বোধহয় আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

গল্পটির কেন্দ্রগত চরিত্রটি তাহা হইলে বাস্তব। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সংস্কারে এই ধরনের চরিত্রের শুধু পরিচয় নয়, ইহাদের সহিত একটা আবেগমধুর উপভোগ্য ভাবানুষঙ্গও সঞ্চিত আছে। তাই রূপো কাকার প্রথম আবির্ভাবেই আমাদের মন একটা অবর্ণনীয় আনন্দে সাড়া দিয়া উঠে। গল্পটির মর্মমূলে এই আনন্দের আবেদনই সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বস্তু। কিন্তু নিছক সাহিত্যের বিচারে এই গল্পের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসবোধ করার কিছুই নাই। ইহার ঘটনা-পরিকল্পনা শিথিল, এমনকি অবিন্যস্তও বলা চলে। ইহার মধ্যে সংঘাত নাই, সমস্যা নাই, নাটকীয় পরিসমাপ্তিরও একান্ত অভাব। সব দিক্ বিচার করিয়া ইহাকে একটি বিবরণ মাত্র বলা যায়, ঠিক ছোট গল্পের সম্মান দেওয়া চলে না। রূপো কাকা সৎ ও সেবাপরায়ণ—একটা পরিবারের উপর তাহার হৃদয়-প্রভাব অসাধারণ। ইহাই তাহাকে পরিবারের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়াছে। কর্তা সীতানাথের অবর্তমানে তো বটেই, সাক্ষাতেও এই কর্তৃত্ব তাহার আরও উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিয়াছে। সীতানাথ তাঁহার টনটনে সম্মানবোধে অন্ধ হইয়া 'রূপো'কে শাসন করিতে গিয়া নিতান্ত বিপন্নই হন। শেষে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া রূপো কাকার সহিত রফা করিয়া তাহার হাতেই সকল প্রভুত্ব ও দায়িত্ব দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হন। এই বিবরণটির প্রারম্ভে যে হৃদয়-সংঘাতের বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহাকে লেখক অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়াছেন। ইহার পর গল্পের মধ্যে আর কোথাও সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই। বাকি অংশে রূপো কাকার জীবনীর খণ্ডাংশই গল্পের আকারে বিবৃত হইয়াছে, এইমাত্র। তবু বিবরণটি আমাদের ভালো লাগে,—গল্প-হিসাবে না হউক, বিবরণ-হিসাবে। ইহার কারণ. কিছুটা বর্ণনাভঙ্গি ও জীবন্ত

সংলাপ, কিন্তু প্রধান কারণ, রুপো কাকার পরার্থপরতা ও সৎস্বভাব। যুগপ্রভাবে এখন এই সাধুতার অভাব এতই নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে যে, গল্পের মধ্যেও এই ধরনের মানুষের কথা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তাই লেখকের মতো আমাদেরও—"এইসব চোরা-বাজারের দিনে, জুয়াচুরির দিনে, মিথ্যে-কথার দিনে, বড্ড বেশি ক'রে রুপো কাকার কথা মনে পড়ে।" এইখানেই গল্পটির উপভোগ্যতা।

সংক্ষিপ্তসার—গল্পের বক্তা তাঁহার বাল্যে একদিন দেরি করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া অগ্রজের সহিত প্রতিদিনকার অভ্যাসমত চণ্ডীমণ্ডপে হীরু মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইতেছেন। চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রুপো এই দেরির জন্য তীব্র ভাষায় তাঁহাদিগকে ধমকাইতে আরম্ভ করিল। দেরির প্রকৃত কারণ যে পিতা সীতানাথের আগমনে বেশি রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকা তাহা না বলিয়া, ছারপোকার কামড়ের মিথ্যা অজুহাত দিয়া সে-যাত্রা তাঁহারা বাঁচিলেন।

সীতানাথের ছেলেমেয়েরা 'রুপো'-কে 'রুপো-কাকা' বলিয়া ডাকিত। সে জাতিতে মুসলমান। কি কারণে জানা যায় না, কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে সে দক্ষিণ দেশ হইতে নিরাশ্রয় অবস্থায় এক সাজিমাটির নৌকায় করিয়া সীতানাথের গ্রামে আসে। বক্তার ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্তী দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে গ্রামে আশ্রয় দেন। হরিরামের পুত্র সীতানাথকে সে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সীতানাথ বড় হইয়া পিতার চেষ্টায় জমিদারের নায়েবের পদ লাভ করিয়া মরেলডাঙা কাছারিতে কাজ করিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রচুর বিষয়সম্পত্তির, ধান ও অন্যান্য ফসলের গোলা, প্রজা ও খাতকদের দেখাশুনার ভার পড়িয়াছে রুপোর উপর। মাসিক সাড়ে তিন টাকা বেতনে সে বাড়ির সামান্য কৃষাণ মাত্র। ইহা ছাড়া সে গ্রামের চৌকিদারের কাজও করে। কিন্তু এই অশিক্ষিত লোকটির উপর সব দেখাশুনার ভার দিয়া সীতানাথ নিশ্চিন্ত।

সীতানাথকে গ্রামের সকলে ভয় করিলেও রুপো করিত না। তিনি দুই মাস অন্তর দুই-তিন দিনের জন্য বাড়ি আসিতেন। তখন রুপো আসিয়া কোন্ খাতককে কি শস্য কি পরিমাণ কর্জ দেওয়া হইয়াছে, কত আদায় উশুল হইয়াছে এইসব মুখে মুখে বলিয়া যাইত আর সীতানাথ মহাজনী খাতায় তাহা লিখিয়া লইতেন। সবই থাকিত রুপোর নখদর্পণে।

একবার সীতানাথ ময়েলডাঙা হইতে বাড়ি ফিরিয়া রুপোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রুপো জানাইল যে জ্বরে শয্যাগত বলিয়া সে আসিতে পারিবে না, এবং সীতানাথ নিজে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা না করার জন্য অনুযোগও দিল। সংবাদ পাইয়া বাবু সীতানাথ তো রাগিয়াই আগুন। তিনি তখনকার মতো কিছুই বলিলেন না। দিনকয়েক পরে জ্বর সারিলে রুপো যখন আসিল, তখন তিনি অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে প্রভুকে তাহার বাড়িতে গিয়া দেখা করার কথা বলা তাহার অত্যন্ত স্পর্ধার কাজ হইয়াছে। রুপোও সমান ঝাঁজালো গলায় প্রভুকে মনে করাইয়া দিল যে আজ বড় এবং মানী লোক হইলেও তিনি ছেলেবেলায় রুপোর কোলেই মানুষ হইয়াছেন। আহত অভিমানে রুপো হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রুপোর কান্না শুনিয়া সীতানাথের মাতা ঘটনাস্থলে আসিয়া পুত্রকে যথেষ্ট গালমন্দ করিলেন। সীতানাথ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তভাবে রুপোর কাছে অপরাধ স্বীকার করিলেন। কিন্তু রুপোর ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হয় না। সে গোলার চাবির থোকা ছুঁড়িয়া সামনে ফেলিয়া দিয়া জানায় আর এ বাড়িতে চাকুরি সে করিবে না। সীতানাথও অভিমানভরে পুত্রকন্যা ও সংসারের যাবতীয় ভার রুপোর উপর দিয়া গৃহত্যাগী হইবার সংকল্প প্রকাশ করেন। বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুপো তাঁহাকে শান্ত করিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেরা এই দুই বয়স্কের হাত ধরাধরি করিয়া কান্না আড়াল হইতে কৌতুকভরে দেখিতে লাগিল। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত ঐখানেই মিটিয়া গেল —আর বেশিদূর গড়াইল না।

রুপো রাত্রিতে চৌকিদারি করিত। গভীর রাত্রে কখনও কখনও সীতানাথের মাতা এবং চণ্ডীমণ্ডপের নিদ্রিত সন্ন্যাসী ঘোষ ও হীরু মাস্টারকে জাগাইয়া গোলাগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিত। সীতানাথের সম্পত্তি-রক্ষার গুরু দায়িত্ব কাঁধে লইয়া সে চোরের ভয়ে রাত জাগিয়া কাটাইত। রাত্রির নিদ্রা তাহার ঘুচিয়া গিয়াছিল। কেহ ঘুমাইবার পরামর্শ দিলে সে তার গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। এ-বোঝা যে বৃদ্ধবয়সে তাহার পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে এমন কথাও প্রায়ই তাহার মুখ হইতে শোনা যাইত, অথচ এই বোঝা জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তাহাকে বহিতে হইয়াছে।

বৃদ্ধবয়সে রুপো একবার জ্বরে পড়িল। তৃতীয় দিনে সীতানাথ আসিয়া ছেলেদের সঙ্গে লইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন। ছোট চালাঘরে পুরাতন

মাদুর বিছাইয়া ছেঁড়া কাঁথা গায়ে রুপো পড়িয়া আছে। সীতানাথের ব্যগ্র আহ্বানে সে সাড়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন খাতককে কি শস্য কতটা কর্জ দেওয়া হইয়াছে এবং সে নিজেও চিঁড়া খাইবার জন্য কতটা ধান লইয়াছে তাহার হিসাব মুখে মুখে দিয়া নীরব হইল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মৃত্যু আসিয়া সকল দায়িত্ব হইতে তাহাকে চিরতরে মুক্তি দিল।

এই বিশ্বস্ততা কি রুপোর স্বর্গের পথ সুগম করে নাই? বর্তমানে মানুষের মিথ্যাচার, জালজুয়াচুরি অসাধুতা দেখিয়া আজীবন বিশ্বস্ত রুপোর কথা বক্তার খুব বেশি করিয়াই মনে পড়ে।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

পৃ. ১৬৪। **চণ্ডীমণ্ডপ**—দুর্গাদি দেবতার পূজাগৃহ। মধ্যযুগে চণ্ডী-পূজার প্রবর্তন হইলে চণ্ডীর পূজাগৃহকেই 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলা হইত। পরে অর্থের প্রসার ঘটিয়া যে-কোনো দেবতার পূজাগৃহকেই বুঝাইতে থাকে। **হীরু**—'হীরেন্দ্র' বা 'হীরালাল' নামের অতিপরিচয়বাচক রূপ। মরেলডাঙা কাছারি—দূরের কোনো জমিদারী কাছারি, যেখানে সীতানাথ নায়েবের চাকুরি করিতেন। কী কী আনলেন—প্রবাসী পিতা অনেকদিন পরে গৃহে ফিরিয়াছেন; তাই ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি নানা জিনিস সঙ্গে আনিয়াছেন। রাজপুৎতুর-সব—ধনীর ছেলেরা সব (বিদ্রূপার্থে)। **চাবালি**—চোয়াল। **এমনি যায়**—এমন বাঁকা হইয়া যায়। **ক'রে খাবা**—করিয়া খাইবা; জীবিকা অর্জন করিবে। 'ক'রে খাওয়া' বাঙলা ইডিয়ম। **চষতি**—চষিতে; চাষ করিতে। রুপোর মুখে লেখক যে ভাষা দিয়াছেন তাহা খুলনা-যশোহর অঞ্চলের কথ্যভাষা। অসমাপিকার '-তে' (-ইতে) -কে -'তি' এবং 'লে' (-ইলে)-কে '-লি' এবং সাধারণভাবে 'এ'-কে 'ই' করিয়া লওয়া ইহার বৈশিষ্ট্য। তুলনীয়: 'নাতি-খাতি'=নাইতে-খাইতে। বামুনের……যা—ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে হাল-গরু লইয়া চাষ করা অমর্যাদাকর। **চোখ রাঙাবে**—শাসন-তর্জন করিবে। **গোমস্তা**—খাজনা-আদায়কারী কর্মচারী।

পৃ. ১৬৫। **নায়েব**—জমিদার-সরকারের উচ্চতম কর্মচারী। **হিন্দু পর্যন্ত নয়**—অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। কৃষাণ—কৃষিকার্যে সাহায্যকারী মজুর। **সাজিমাটি**—ক্ষারমাটি। ইহার মধ্যে অপরিষ্কৃত অবস্থায় সোডা থাকে।

কাপড়চোপড় পরিষ্কার করিবার জন্য আগে সোডা-সাবানের পরিবর্তে এই সাজিমাটির ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে এখনও ইহার ব্যবহার কিছু কিছু আছে। **সাজিমাটির নৌকা**—সেকালে ব্যাপারীরা নদীপথে নৌকায় করিয়া গ্রামাঞ্চলে সাজিমাটি বিক্রয় করিত। **দক্ষিণ-দেশ**—খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবন অঞ্চল। **কৃষাণগিরি**—কৃষাণের কার্য। **আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে** ইত্যাদি—কোনও শিশুকে কোলে করিয়া মানুষ করিতে হইলে যে মানুষ করিবে তাহাকে শিশুটির চেয়ে বয়সে অন্ততঃ আট-দশ বছরের বড় হইতে হইবে, অথচ রূপোকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না তাহার বয়স সীতানাথের চেয়ে বেশি। গাড়ু হাতে—গ্রামাঞ্চলে পুরুষেরা সাধারণতঃ ঝোপ-জঙ্গলে বা মাঠে মলত্যাগ করিতে যায় এবং সঙ্গে লইয়া যায় গাড়ু শৌচক্রিয়ার জন্য। **জমিদারবাবুকে ব'লে ক'য়ে**—সম্ভবতঃ হরিরাম চক্রবর্তীও এই জমিদারের নায়েব ছিলেন, তাই জমিদারবাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। **খাতকপত্র**—মহাজনের নিকট ঋণকারীরা। 'পত্র' এখানে বহুত্ববাচক।

পৃ. ১৬৬। মুর্খ—অশিক্ষিত। বাড়িতি—বাড়িতে। এতডা—এতটা। **হাতীর পাঁচ-পা দেখেছ নাকি?**—অর্থাৎ তোমার অতিরিক্ত দুঃসাহস হইয়াছে যাহার ফলে যাহা খুশী তাহাই করিতেছ। 'সাপের পাঁচ-পা দেখা' এই অর্থে বাংলা ইডিয়ম। অশিক্ষিত রূপো সাপকে হাতী করিয়া ফেলিয়াছে। অথবা, দূর হইতে দেখিলে হাতীর শুঁড়টিকেও একটি পা বলিয়া মনে হয়, কাছে আসিলে এই ভ্রম দূর হয়। সীতানাথ দূরে দূরে থাকিয়া নিজের সংসারের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন—হাতীর পাঁচ-পা দেখিতেছেন। কলাই—মাষকলাই, মুগ, মটর প্রভৃতি। কর্জ—ধার। প্রবীণা—বয়োবৃদ্ধা। মহাজনী খাতা—মহাজন বা দেনদার যে খাতায় খাতকের ঋণের হিসাব রাখে কাঠা—ধান প্রভৃতি শস্য মাপিবার পাত্র, রেক। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রায় ১৮½ সের ধানের মাপকে কাঠা বলা হয়। **বীজ মুগ**—ক্ষেতে বুনিবার উপযুক্ত মুগ। **বাড়ি**—পরে সবৃদ্ধি পরিশোধ করা হইবে বলিয়া যে ধান অগ্রিম লওয়া হয়। বিশ—ধান্যের পরিমাপ-বিশেষ। কুড়ি পালি বা আড়িতে এক বিশ হয়, **মন্তব্য:** কাঠা, বিশ, সলি—এই কথাগুলি ধান-চাউলের মাপ বুঝাইতে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বিভিন্ন জেলায় কথাগুলির অর্থ বিভিন্ন।

পৃ. ১৬৭। অনর্গল—অবাধে ; অবিরাম। খোলো—খোকা ; ছড়া। **যেত্তি**—যাইতে। পায়ে পায়ে—পদব্রজে ; ধীরে ধীর হাঁটিয়া। **নতুন বাবু**—সবে বাবুয়ানা আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া একটু অতিরিক্ত রকমের বাবু। **তেলে-বেগুনে উঠলেন জ্বলে**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ; ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন। ফুটন্ত তেলে বেগুন ফেলিয়া দিলে তাহা চড়বড় চড়বড় করিয়া শব্দ করিতে থাকে। আসল বাঙলা ইডিয়মটি কিন্তু 'তেলে-আগুনে জ্বলে উঠা' ; কেমন করিয়া জানি না, আগুন বেগুন হইয়া গিয়াছে। **গুম হয়ে**—ক্রোধে নিঃশব্দে মুখ ভার করিয়া।

পৃ. ১৬৮। আস্পর্ধা—স্পর্ধা ; দুঃসাহস। **তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি** ইত্যাদি—অর্থাৎ শাস্তির কোনোরূপ ভয় না রাখিয়াই তোমাকে খুন করিয়া ফেলিতে পারি। আমাকে তুমি যেমন-তেমন লোক পাইয়াছ? গুণবন্ত—গুণী। **'তুমি' ছেড়ে** ইত্যাদি—সাধারণতঃ 'তুমি' পরিচিত সমবয়স্কের সহিত কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, আর 'তুই' অনাদর বা অতিপরিচয় বুঝাইতে। রুপো সাধারণ সম্বোধন ছাড়িয়া এখন অনাদরবোধক সম্বোধনই আরম্ভ করিল। **যা যা বকিস নে**—শিশুকালে সীতানাথ যে রুপোর কোলে-পিঠে চড়িয়াই বড় হইয়াছে এবং সেই দাবিতে রুপো যে তাকে 'তুই' বলিয়া উল্লেখ করিতে পারে, এই ব্যাপারটা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় সীতানাথ একটু বিব্রতবোধ করিলেন। রুপোর উক্তির পর তাঁহার উষ্মাটা নিতান্ত অশোভন হইয়া পড়ে, অথচ উষ্মা একবার প্রকাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নরম হইয়া গেলে সকলের সামনে মান থাকে না। তাই অসুবিধাজনক প্রসঙ্গটা এড়াইবার জন্য তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। **তালেবর**—ধনী বা গণ্যমান্য ব্যক্তি ; শব্দটি আরবী। **হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে**—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ কান্না অভিমানেরই কান্না। সীতানাথের বেতনভোগী ভৃত্য হইলেও রুপো হৃদয়-সম্পর্কের দাবিতে নিজেকে সীতানাথের অগ্রজ বলিয়া মনে করিত এবং সেই কারণে সীতানাথকে তাহার বাড়িতে আসিয়া দেখা করার কথা বলা অন্যায় মনে করে নাই। কিন্তু সীতানাথ যখন এই হৃদয়-সম্পর্ক ও বিশ্বাসের কিছুমাত্র মর্যাদা না দিয়া অত্যন্ত রূঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন যে তিনি রুপোর প্রভু ও দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, তখন আহত অভিমানে রুপো শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। **কাণ্ডজ্ঞান**—সাধারণ জ্ঞান।

পৃ. ১৬৯। **মুই**—আমি। **পোয়াত্তি**—পোহাইতে ; সহ্য করিতে।

কাচ্চা-বাচ্চা—ছোট ছেলেমেয়ে। **কেডা**—কে। **তুমি আমায় এমন ক'রে বললে শেষকালে?**—অর্থাৎ আমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তোমার কাছে দোষ স্বীকার করিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও তুমি আমার চাবিছড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমার মুখের উপর বলিয়া দিলে যে তুমি আর আমার ঝামেলা পোহাইতে পারিবে না। **হব, হব, হব**—দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিবার জন্য একই কথা তিনবার বলা হইয়া থাকে—ইহাকেই বলে 'তিন সত্য করা'। **বাবা ফেললেন কেঁদে**—এ কান্নাও অভিমানের কান্না, রূপোর নিকট ক্ষমা চাহিয়া না পাওয়ার আঘাতের কান্না। **দুজনেরই কান্না**—এ কান্না আনন্দের কান্না, পরস্পর ভুল-বোঝাবুঝির আর আঘাত-প্রত্যাঘাতের অবসান হইল ভাবিয়া স্বস্তির কান্না। **অবাক হয়ে** ইত্যাদি—বয়স্কদের সাধারণতঃ কাঁদিতে দেখা যায় না। তাই ছোট ছেলেদের কাছে বয়স্কদেব কান্না একটা অভাবনীয় বিস্ময়কর ও দর্শনীয় ব্যাপার।

পৃ. ১৭০। চৌকিদারি—চৌকিদার বা গ্রামেব পাহারাদারদের কাজ। **জাগন**—জাগ্রত। রাত খারাপ—অর্থাৎ এমন রাতেই চুরি-ডাকাতির আশঙ্কা থাকে। **নাক ডাকিয়ে**—গভীরভাবে। পৈঠা—সিঁড়ি, ধাপ। **ঘুমুলি**—ঘুমাইলে। **মোর তো···চলবে না**—আমার উপর যে গুরু দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে, রাত্রিতে ঘুমাইলে তাহা পালন করা চলে না। তাই গোলা পাহারা দিতে আমাকে রাত জাগিয়া কাটাইতে হয়। এলি—আসিলে। খোলসা—মুক্ত।

পৃ. ১৭১। **নিশ্চিন্দি**—নিশ্চিন্ত। **চাঙা হয়ে**—অর্থাৎ নির্ভাবনায়, আরামে। **গোলার দায়িত্ব নামিয়ে**—গোলারক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া। **সাদা-দাড়ি**—বৃদ্ধ রূপোর দাড়ি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল। সাদা দাড়ি যাহার (বহুব্রীহি সমাস), সে। **খাতার মুড়োয়**—মহাজনী খাতার এক-প্রান্তে বা মাথায়। **বেনামুড়ি ধান**—একরকমের মোটা ধান। **ইদিকি**—এদিকে; আগে। **দায়িত্বের শেষ**—অর্থাৎ এই কর্জগুলি মালিকের খাতায় লেখাইয়া সে তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করিল; এইটুকু বলিবার জন্য যেন তাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যাইতে দেরি করিতেছিল।

পৃ. ১৭২। **বিশ্বস্ত লোকদের জন্যে** ইত্যাদি—লেখক শুনিয়াছেন যে সৎকর্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; কিন্তু কোন্ সৎকর্মে শাস্ত্রোক্ত সপ্তস্বর্গের কোন্‌টিতে

যাওয়া যায় তাহা তিনি জানেন না। তবে তাঁহার ধারণা—বিশ্বাসী লোকদের জন্য কোনো স্বর্গ নির্দিষ্ট থাকিলে রুপোর অবশ্যই সেখানে স্থান হইবে। **এইসব চোরাবাজারের দিনে** ইত্যাদি—বর্তমানে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের মধ্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অসাধুতার দৃষ্টান্ত এত বেশি দেখা যায় যে, সংসারে সংলোক থাকিতে পারে বা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণেই রুপোর জীবনব্যাপী সাধুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেখকের বেশি করিয়া মনে পড়ে।

ব্যাখ্যা

(১) বলি ও বাবু, ...সংসারডা চলবে কিসি? (পৃ. ১৬৬)

এই অংশটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুপো কাকা' গল্পের অন্তর্গত। ইহা সীতানাথ চক্রবর্তীর প্রতি তাঁহার সাড়ে তিন টাকা মাহিনার কৃষাণ 'রুপো'র উক্তি।

সীতানাথ গ্রামান্তরে দূর কাছারিতে কাজ করিতেন এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় সেইখানেই থাকিতেন। বাড়ির বিষয়সম্পত্তি দেখিবার ভার ছিল এই কৃষাণ রুপোরই উপর। রুপো নিরক্ষর কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সীতানাথকেও সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এখন সীতানাথের সমগ্র পরিবারের দায়িত্বই তাহার উপর। সীতানাথ এ-বিষয়ে এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে রীতিমত বাড়ি আসার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিতেন না। রুপো সেইজন্য এখানে সীতানাথকে কঠোর ভাষায় দোষারোপ করিতেছে। সীতানাথ বিষয়ের খবর রাখেন না, আদায়পত্রে সাহায্য করেন না—সেইজন্য সে-বৎসর টাকাপয়সার আমদানি ভালো হয় নাই। এই অবস্থায় সীতানাথের এতবড় সংসারটার ব্যয়সংকুলান করা সহজ কথা নয়। সীতানাথ তবু নির্বিকার। যেন তিনি একটা ভুলের মোহে আচ্ছন্ন আছেন, নিজের বিষয়-সম্বন্ধে দূর হইতে একটা ভুল ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন। বিষয় হইতে সত্যসত্যই কত আয় হয়, কি করিয়া সংসার চলে—এসব ব্যাপারে তাই তাঁহার দুশ্চিন্তা নাই। রুপো কৃষাণের অভিযোগের ইহাই মূল মর্ম।

(২) আমরা ছেলেমানুষ......বড়ো লোকের কান্না। (পৃ. ১৬৯)

এই অংশটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুপো কাকা' গল্পের অন্তর্গত।

রূপো কাকার সহিত সীতানাথবাবুর মান-অভিমান-বর্ণনাপ্রসঙ্গে গল্পের মুখপাত্র এই উক্তি করিয়াছে।

সীতানাথবাবু একবার বাড়ি আসিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত কৃষাণ রূপোকে খবর দেন। রূপো জ্বরে শয্যাশায়ী থাকায় সীতানাথবাবুকেই দুই পা হাঁটিয়া তাহার বাড়িতে আসার কথা বলে। ইহাতে সীতানাথবাবু কুপিত হন। রূপো সুস্থ হইয়া ফিরিলে তিনি তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলার ধমক দেন। ইহাতে পুরাতন ভৃত্য রূপো দুরন্ত অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সে সীতানাথবাবুকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। এখনও একনিষ্ঠ সেবায় তাঁহার সমগ্র পরিবারটির সকল ঝক্কি সে-ই পোহাইতেছে। সীতানাথবাবুর ধমক তাহার প্রাণে বড় বেশি বাজিল। সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইল। সীতানাথবাবু এইজন্য তাঁহার মাতার দ্বারা তিরস্কৃত হইলেন, নিজেও অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু রূপোকে শত অনুরোধেও বাগ মানাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারও অভিমান হইল। তিনি অভিমানভরে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান আর কি! তখন দুইজনেই কাঁদিয়া-কাটিয়া আবার সব মিটাইয়া লইলেন। দূর হইতে সীতানাথের পুত্রগণ এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে লাগিল। সীতানাথবাবু ও রূপো দুইজনেই পরিণতবয়স্ক। তাঁহাদের পক্ষে এমনভাবে আবেগে কাঁদিয়া ফেলা—অসাধারণ ঘটনা। এই-জন্যই পরম বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সীতানাথের পুত্রগণ এই ঘটনাটি দেখিতে লাগিল। ইহার মর্ম তাহারা সম্পূর্ণ অবশ্যই বুঝিল না। বুঝিল না বলিয়াই তাহারা বিশেষভাবে অবাক্ হইয়া গেল।

(৩) বিশ্বস্ত লোকদের জন্য……আছে সেখানে। (পৃ. ১১২)

বিভূতিভূষণের 'রূপো কাকা' গল্প হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। রূপোর মৃত্যু-বর্ণনা-প্রসঙ্গে গল্পের মুখপাত্র এই মন্তব্য করিয়াছে।

রূপো ছিল নিরক্ষর সাড়ে তিন টাকা মাহিনার কৃষাণ। সীতানাথ চক্রবর্তীকে কোলে-পিঠে করিয়া সে মানুষ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে

সীতানাথবাবুর পরিবারটির সব ভার পড়ে তাহারই উপর। লোকটি যেরূপ সততার সহিত সারা জীবন এই পরিবারটির স্বার্থরক্ষা করিয়া যায় তাহার তুলনা হয় না। তাহার পরার্থে নিষ্ঠা, নির্লোভ সেবা ও অপূর্ব বিশ্বস্ততার কোনো ঐহিক পুরস্কার নাই। এইপ্রকার মানুষের সত্যকার পুরস্কার অক্ষয় স্বর্গবাস। লেখক জানেন না ইহাদের জন্য কোনো স্বর্গ আছে কিনা। যদি থাকে, তবে রুপোর জন্য সেখানে গৌরবান্বিত স্থান নিশ্চয় নির্দিষ্ট থাকিবে। গল্পের মুখপাত্রের মুখে লেখক এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়া প্রকারান্তরে রুপোর প্রতি আপন শ্রদ্ধাই নিবেদন করিয়াছেন।

(৪) এই সব চোরাবাজারের··· কথা মনে পড়ে। (পৃ. ১৭২)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুপো কাকা' গল্পটি হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। রুপো-নামক বিশ্বস্ত কৃষাণটির সততা-সম্বন্ধেই এই মন্তব্য।

রুপো ছিল নিরক্ষর কৃষাণ। কিন্তু তাহার সততা ছিল অতুলনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশময় দুর্নীতির স্রোত বহিয়া যায়। মানুষের মধ্যে তখন সততার শোচনীয় অভাব দেখা দেয়। চোরাকারবার, জুয়াচুরি আর অহর্নিশ মিথ্যাকথা বলা হয় মানুষের জীবিকার একমাত্র সম্বল। এমন দিনে সততার নিজস্ব মূল্য ছাড়া আরও একটা মূল্য দেখা যায়। তাহা দুষ্প্রাপ্যতার মূল্য। এই দুর্নীতি ও অসাধুতার দিনে তাই রুপোর সততা বড় হইয়া দেখা দেয়। লেখকের মনে সেইজন্যই তাহার কথা বিশেষভাবে জাগে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বর্ণিত রুপো কাকার চরিত্রটি নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উ.। রুপো একজন সামান্য মুসলমান কৃষাণ। বহুদিন আগে এক সাজিমাটির নৌকাতে সে দেশ ছাড়িয়া আসে। তাহার অত্যন্ত দীনহীন অবস্থা দেখিয়া সীতানাথ চক্রবর্তীর পিতা হরিরাম চক্রবর্তী তাহাকে আশ্রয় দেন। রুপো

আপন সততা ও বিশ্বস্ততায় চক্রবর্তী-পরিবারটির সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। সীতানাথ চক্রবর্তীকে সে-ই কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করে। তারপর হরিরাম চক্রবর্তীর কাল হইলে সীতানাথ গেলেন মরেলডাঙায় কাছারিতে চাকুরি করিতে। এদিককার সব বিষয়-আশয়ের ভার পড়িল রুপোর উপর। রুপো মাসিক সাড়ে তিন টাকা মাহিনার কৃষাণ মাত্র। কিন্তু বিশ্বস্ততা ও সাধুতা তাহার অমূল্য। একাগ্র নিষ্ঠায় প্রাণ দিয়া সে চক্রবর্তী-পরিবারটির শুভ দেখিত। গ্রামের সে চৌকিদারও বটে। রাতে পাহারা দেওয়ার সময় কিন্তু ঘুরিয়া-ফিরিয়া চক্রবর্তী-বাড়ির চারিদিকেই সে নজর দিত সবচেয়ে বেশি, বস্তুতঃ চোর-ডাকাতের উৎপাত বাড়িলে রাত্রে তাহার একপলক ঘুম হইত না। সারারাত জাগিয়া সে চক্রবর্তী-বাড়ি পাহারা দিত। তারপর জমিজমার বিলিব্যবস্থা, ফসলপাতির হিসাবনিকাশ সব সে কড়ায় গণ্ডায় ঠিকঠাক রাখিত। ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ভুল হইত না। কয়েক মাস অন্তর সীতানাথ যখন বাড়ি আসিতেন, রুপো তখন অপূর্ব স্মৃতি হইতে একের পর এক সব খুঁটিনাটি হিসাব খাতায় লেখাইয়া দিত। ইহার মধ্যে রুপোর অদ্ভুত স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে প্রকাশ পায় তাহার অভূতপূর্ব সততা। রুপো ঠিক মাহিনার কেনা গোলাম নহে। সে-ই প্রকৃতপক্ষে চক্রবর্তী-পরিবারের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। কিসের গুণে? অন্তরের অফুরন্ত স্নেহ-প্রভাবে। এই স্নেহমমতার মায়াতেই সে সীতানাথ ও সীতানাথের সমস্ত পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। সীতানাথের বিষয়-আশয় তাহার নিকট পবিত্র গচ্ছিত সম্পদের মতো। তাহার একচুল এদিক-ওদিক হয় ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সেইজন্য বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত সে রাত্রির নিদ্রা পরিহার করিয়া আর দিবসে অকুণ্ঠ পরিশ্রম দ্বারা চক্রবর্তীর সংসারের সহস্র ঝক্কি-ঝকমারি পোহাইত। চক্রবর্তী-পরিবারও যেন এইজন্য একটা অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতায় তাহার নিকট ঋণী বোধ করিত। সেই বোধ হইতেই রুপোর সকলের উপর অপ্রতিহত শাসনক্ষমতা জন্মিয়া থাকিবে। রুপো, সীতানাথের পুত্রদের তো কথাই নাই, স্বয়ং সীতানাথ,

এমনকি তাঁহার মাকেও শাসন করিত। শাসনের সময় তাহার কঠোর ভৎর্সনাও সকলে মাথা পাতিয়া লইত। কিন্তু এইসব ভৎর্সনার মধ্যে ফল্গুধারার মতো একটা স্বচ্ছ স্নেহ সর্বদাই স্নিগ্ধস্পর্শ রাখিয়া যাইত। সীতানাথের পুত্রগণ সকালে একটু বিলম্বে উঠায় একদিন গালি খাইয়াছে, কিন্তু ছারপোকার যন্ত্রণায় তাহাদের রাত্রে ঘুম হয় নাই—এই কথা শুনিবামাত্র তাহার কণ্ঠ স্নেহে দ্রবীভূত হইয়া আসিয়াছে। গালির সুর অমনি ক্ষমায় স্নেহে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। সীতানাথের প্রতি ভৎর্সনার মধ্যেও সীতানাথের বিষয়-সম্বন্ধে অমনোযোগের প্রতি যেমন তীব্র আক্রমণ আছে, তেমনি আছে তাঁহার পরিবারটির জন্য গভীর উৎকণ্ঠা। রূপোর মনপ্রাণ এই উৎকণ্ঠাতেই অহর্নিশ পরিবারটির মঙ্গলসাধনে একাগ্র ছিল। ইহা হইতেই তাহার একটা প্রবল অধিকার ও প্রবলতর অভিমান জাগ্রত হইয়াছিল। সীতানাথ একদিন মনিবের ব্যর্থ অহংকারে স্ফীত হইয়া রূপোকে ধমক দিয়াছিলেন। ইহার ফলে রূপোর সেই বিক্ষুব্ধ অভিমানের আকাশ-প্রমাণ তরঙ্গ আমরা দেখিয়াছি। কিছুতেই তাহা শান্ত হয় না। সীতানাথের সংসারের দায়িত্ব ও চাবিছড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেই যে সে বাঁকিয়া বসিল আর তাহাকে রাগ মানানো যায় না। শেষে সীতানাথও যখন সমান অভিমানে কাঁদিয়া-কাটিয়া সংসার ছাড়িতে উদ্যত হন, তখন রূপোর সকল অভিমান জল হইয়া যায়। সীতানাথ নিজের সংসার ছাড়িয়া গেলেও-বা যাইতে পারেন। কিন্তু রূপো তো এই শিশুসন্তানসহ অসহায় পরিবারটিকে জলে ভাসাইয়া যাইবার কথা ভাবিতে পারে না। এই সম্ভাবনা দেখিলে সে স্থির থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, সীতানাথের চোখের জল তাহার বুকে তপ্ত জ্বালা সৃষ্টি করে। এই একটি ছোট ঘটনার মধ্যে চক্রবর্তী-পরিবারের প্রতি রূপোর অপরিসীম ভালোবাসা আর তাহার প্রতি সেই পরিবারের অগাধ আস্থা, নির্ভর ও ভালোবাসা ব্যক্ত হইয়াছে। রূপোর জীবনে এইটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। ইহাকেই একান্ত সম্বল করিয়া সে নিজের জীবন বিলাইয়া দিয়াছে প্রভু-পরিবারের সেবায়। তাহার সততা ও বিশ্বস্ততা, তাহার সরলতা ও দায়িত্বজ্ঞান, তাহার সেবাপরায়ণতা ও মহত্ত্ব—এ-যুগে দুর্লভ। তাই ঘোর

অন্ধকারে প্রোজ্জ্বল আলোকশিখার মতো এই চরিত্রটির স্বর্গীয় মহিমা আমাদিগকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

প্র. ২। "আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম দুই বড়ো লোকের কান্না।"—উল্লিখিত 'দুই বড়ো লোক' কাহারা? কোন্ ঘটনা উপলক্ষে তাহাদের এই কান্না দেখা যায়? কাহারা অবাক হইয়া তাহা দেখিতে থাকে?

উ.। উদ্ধৃত অংশে 'দুই বড়ো লোক' বলিতে বিভূতিভূষণের গল্পে বর্ণিত সীতানাথ চক্রবর্তী ও রুপো কৃষাণকে বুঝাইতেছে।

[ইহার পর **সংক্ষিপ্তসার**-এর চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখ।]

প্র. ৩। বিভূতিভূষণের 'রুপো কাকা' গল্পটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ।

উ.। **সমালোচনা** দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: নিরাশ্রয় = নিঃ + আশ্রয়। কদ্দিন = কত + দিন। (বাঙলা সন্ধি—ডবল)।

সমাস: চণ্ডীমণ্ডপ—চণ্ডী (পূজা)-র জন্য মণ্ডপ (৪র্থীতৎপুরুষ)। কুড়ি-বাইশ—কুড়ি বা বাইশ (বহুব্রীহি)। নিশ্চিন্ত—নিঃ (=নাই) চিন্তা যাহার (বহুব্রীহি), সে। ছেলেমানুষ—ছেলে অর্থাৎ অল্পবয়স্ক যে মানুষ (কর্মধারয়)। অনর্গল—নাই অর্গল যাহাতে (বহুব্রীহি), তাহা। রুপো-বাঁধানো—রুপো দিয়ে বাঁধানো (৩য়াতৎপুরুষ)। কোলেপিঠে—কোলে এবং পিঠে (অলুক্-দ্বন্দ্ব)। গৃহত্যাগী—গৃহ ত্যাগ করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ) সাদাদাড়ি—সাদা দাড়ি যাহার (বহুব্রীহি), সে।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: হীরু—হীরা (লাল) + উ (আদরে)। চৌকিদার—চৌকি + দার। কৃষাণগিরি—কৃষাণ + গিরি। গুণবন্ত—গুণ + বন্ত (বাঙলা

তদ্ধিত)। চৌকিদারি—চৌকিদার+ই (কার্য অর্থে)। জাগন—জাগ্ + অন ('অন্ত' প্রত্যয়ের অর্থে—বিশেষণ)।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগঃ হাতীর পাঁচ-পা দেখেছ নাকি ?—এখানে 'হাতীর পাঁচ-পা দেখা' = অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।

সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে ?—এখানে 'পায়ে পায়ে' = ধীরে ধীরে হাঁটিয়া।

বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জলে—এখানে 'তেলে-বেগুনে জলে ওঠা' = হঠাৎ বিষম ক্রুদ্ধ হওয়া। **মন্তব্য**ঃ আসল বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি কিন্তু 'তেলে-আগুনে জলে ওঠা', 'আগুন' যে কেমন করিয়া 'বেগুন' হইয়া গিয়াছে বলা দুষ্কর।

…চোখ রাঙাবে ?—এখানে 'চোখ রাঙানো' = ক্রোধ প্রকাশ করা, তর্জন করা।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তনঃ বাবা বাড়ি থাকতেও কি রুপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে (প্রশ্নবোধক) ?—বাবা বাড়ি থাকতেও আমাদের চোখ রাঙানো রুপো কাকার পক্ষে অশোভন (প্রশ্ন-পরিহার)।

কেন এসেছিস তা শুনি নি (জটিল)—আসার কারণ শুনি নি (সরল)।

নিজের দরকার হ'লে নিজেও নিত (সরল)—যখন দরকার হ'ত তখন নিজেও নিত (জটিল)।

না, আমি আর থাকব না—না, আমার আর থাকা হবে না (বাচ্যান্তর)।

বাবাও দেশত্যাগী হলেন না, রুপো কাকাও চাকরি ছাড়লে না—বাবারও দেশত্যাগী হওয়া হল না, রুপো কাকারও চাকরি ছাড়া হল না (বাচ্যান্তর)।

কিন্তু নিজের ইচ্ছাতে তার ছাড়তে হয় নি—কিন্তু নিজের ইচ্ছাতে সে ছাড়ে নি (বাচ্যান্তর)।

বিশ্বস্ত লোকদের জন্মে কি কোনো স্বর্গ আছে (প্রশ্নবোধক)?—বিশ্বস্ত লোকদের জন্মে কোনো স্বর্গ আছে কিনা জানি না (প্রশ্ন-পরিহার)।

অর্থগত পার্থক্যঃ চৌকিদারি—চৌকিদারের কার্য ; চৌকিদারী—চৌকিদারের ব্যবহার্য। খাতক—অধমর্ণ, যে ঋণ গ্রহণ করে ; খাদক—যে খায়। মহাজনী—মহাজনদের ব্যবহার্য ; মহাজনি—মহাজনের কার্য অর্থাৎ সুদে ঋণ দেওয়া এবং আদায়। থোলো—থোকা, গোছা ; থেলো—থ্যাবড়া (থেলো হুঁকো)।

কারক ও বিভক্তিঃ যেতাম 'হীরু মাস্টারের কাছে' পড়তে (অপাদানে ৫মী)। পিসিমার 'মুখে' শুনেছি (অপাদানে -এ)। সবার 'মুখেতে' শুনে এসেছি (অপাদানে -তে)। কর্জ দিয়েছে 'যাকে' যতটা জিনিস (কর্মে [সম্প্রদানে নয়] -কে)। পারি না বুড়ো বয়সে 'রাত' জাগতি (অধিকরণে শূন্য বিভক্তি)। বাবা 'বাড়ি' থাকতেও (অধিকরণে শূন্য বিভক্তি)। 'কনুইএর' গুঁতো মেরে (করণে -এর)।

বাক্য-রচনার জন্য শব্দ ও শব্দগুচ্ছঃ চোখ রাঙানো, হাতীর পাঁচ-পা দেখা, অনর্গল, তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা, গুম হয়ে থাকা, তালেবর, ঝক্কি, কাণ্ডজ্ঞান।

ব্যাকরণগত টীকাঃ রাজপুৎতুর—তৎসম 'রাজপুত্র' শব্দের উচ্চারণবিকৃতির ফল বলিয়া অর্ধতৎসম শব্দ। তাহা ছাড়া পুত্র > পুৎতুর—উ-কার আগমের ফলে ইহা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তিও বটে।

ব'লে-ক'য়ে—'বলা' এবং কওয়া' দুইটি ক্রিয়ারই এক অর্থ। অথচ দুইটির যোগে একটি যুগ্মক্রিয়া গঠিত হওয়ায় অর্থটি সম্প্রসারিত হইয়াছে। 'ব'লে এবং ক'য়ে' এইরূপ ব্যাসবাক্যে ইহা দ্বন্দ্বসমাসের উদাহরণ নয়।

প্রজাপত্র (সর্বদা আসছে)—এখানে 'পত্র' শব্দটির ঠিক কোনো অর্থ নাই, কেবল বহুত্ব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

(একটা) ঘটনা (ঘটল)—বাক্যটিতে ক্রিয়া 'ঘটল' এবং তাহার কর্তা 'ঘটনা' একই 'ঘট' ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া 'ঘটনা' সমধাতুজ কর্তার উদাহরণ।

জিগ্যেস—অর্ধতৎসম শব্দ (তৎসম রূপ 'জিজ্ঞাসা')।

মুণ্ড—তৎসম শব্দ 'মুণ্ড', পূর্ববর্তী উ-কারের প্রভাবে পরবর্তী অ উ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এটি স্বরসঙ্গতির উদাহরণ।

বেরুচ্ছি—'বাহির'-এর চলিত-রূপ 'বের', 'বের হওয়া' অর্থে 'বের' শব্দটিই ধাতু হইয়া ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এটি নামধাতুর উদাহরণ।

বিপরীতার্থক শব্দ: নিরাশ্রয়—আশ্রয় (অপ্রচলিত)। বহাল—বরখাস্ত। ছেলেমানুষ—বুড়োমানুষ। প্রবীণা—নবীনা। কড়া—নরম, মিঠে।

সাধুভাষায় রূপান্তর: গল্পটি চলিত-ভাষায় লিখিত বলিয়া ইহা হইতে যে-কোনো অংশ সাধুভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে। এমনকি উপভাষা বর্জন করিয়া শুদ্ধ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্যও কোনো অংশ দেওয়া হইতে পারে।

———

বসন্তের কোকিল

কমলাকান্তের

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' ও এই পুস্তকের 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার' নামক পাঠ্যাংশের ভূমিকা দেখ।

উৎস ও নামকরণ—আলোচ্য রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'কমলাকান্তের দপ্তর' হইতে সংকলিত। ইহা ঐ গ্রন্থের সপ্তম প্রসঙ্গ বা রচনা। মূল রচনার কিছু কিছু অংশ পাঠ-সংকলনে বর্জিত হইয়াছে।

এই রচনাটির ভাববস্তু একটি কাল্পনিক কোকিলের সহিত কথোপকথনের ভঙ্গীতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বক্তা এখানে কমলাকান্তের বয়ানে স্বয়ং লেখক। কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার ভাবকল্পনায় স্বচ্ছন্দবিহার করিয়াছেন। কোকিল অবশ্যই কথা কহে নাই, উহা নেহাত উপলক্ষ্য মাত্র। তবে উহাকে কেন্দ্র করিয়াই লেখকের ভাব ও কল্পনার জাগরণ ও বিস্তার ঘটিয়াছে। কোকিল বসন্তের সহচর, মানবসমাজের সুখের পায়রা। এই স্বরূপেই কোকিল প্রথমটায় বঙ্কিমের বিদ্রূপ-ব্যঙ্গকে রসাইয়া তুলিয়াছে। শেষে বসন্তের কোকিলরূপেই আবার তাঁহাকে সে গভীর একটা উপলব্ধির মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। বসন্তকালেই কোকিলের পঞ্চমস্বর অমিয়ধারা বর্ষণ করে। কবিচিত্তের নিকট সেইটাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। বসন্তের কোকিলের এই দিক্‌টা বঙ্কিমের নিভৃত হৃদয়ে যেন রসালোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি যেন 'রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সহৃদয় পাঠককে অন্তরঙ্গভাবে আকর্ষণ' করিয়াছেন। সুতরাং বসন্তের কোকিলই রচনাটির প্রধান উপলক্ষ্য এবং সেই জন্যই উহার শিরোনাম সার্থক।

অবশ্য এই ধরনের রচনার এমন কোনো শিরোনাম হইতে পারে না যাহাতে উহার ভাববস্তুর সবটা ধরা পড়িতে পারে। সহজ কথোপকথনের ভঙ্গীতে বলায় কথাটি এখানে আপনা আপনি গড়িয়া উঠে। 'লেখক কি বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন আগে যেন কিছুই ভাবিয়া রাখেন নাই; একটি রসের আবেদনে সমগ্র প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তিনি তাহাকেই ভাষা দিতে বসিয়াছেন—ভাষা ও গঠনরীতি আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের

বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ-আলোচনা আমরা সাধারণতঃ চপল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়াই জমাইয়া তুলি, একটু একটু করিয়া হাস্য পরিহাসের পাতলা যবনিকা টানিয়া ফেলিয়া আমরা মনের অজ্ঞাতেই যেন হৃদয়ের গভীরে চলিয়া যাই…।' বসন্তের কোকিলের ঢঙটি ঠিক সেইরকম। সুতরাং যে বস্তু কথার লক্ষ্য, ভাবের উদ্দীপক, তাহারই মাত্র এখানে এককথায় উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং তাহার ভাবানুষঙ্গ-হিসাবে সমগ্র রচনাটিকে নির্দেশ করা চলে। এইভাবে বিচার করিলেও আলোচ্য রচনাটির শিরোনাম সার্থক।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ঃ 'বসন্তের কোকিলে'র ন্যায় কয়েকটি রস-রচনার সমষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তর'। কমলাকান্ত চক্রবর্তী-নামক এক আফিমনেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভীষ্মদেব খোসনবীশ-নামক ব্যক্তির সম্পাদনায় টীকাভাষ্যসহকারে উহা গ্রন্থাকারে বাহির হয়—উহাই 'কমলাকান্তের দপ্তর'। কমলাকান্ত ও ভীষ্মদেব দুইজনেই বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত ব্যক্তি। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রই কমলাকান্তের বয়ানে এই দপ্তর রচনা করিয়াছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। "বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল প্রবন্ধে তিনি যে চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু রচনা-সাহিত্যে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। এদিক হইতে 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমের মনস্বিতা, চিন্তাশীলতা বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় যে খুব অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে, কিন্তু উহা অনেকখানিই আমাদের উপরি পাওনা, আসল পাওনা সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া সাহিত্যস্রষ্টার গভীর স্পর্শ। গদ্য-রচনাও যে একটা সাহিত্যিক সৃষ্টির কতখানি উচ্চস্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই কথাটাই আমাদিগকে প্রথম সচকিত করিয়া দিয়াছে।…

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তি-পুরুষটি যেমন করিয়া আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তেমন আর কোথাও নহে। গদ্যলেখার ভিতর দিয়া লেখকের সহিত এমনতর পরিচয় বাঙলা-সাহিত্যে বিরল।…

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে একটি কবি-প্রাণ ছিল, একটি চিন্তাশীল দার্শনিক ছিল, একটি অকপট স্বদেশভক্ত ছিল, আর ছিল একটি শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরসিক— একটি অপরাধ-অসহিষ্ণু বীর্যশালী শাসক। এই সকল সত্তা একত্রিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল যে একটি অখণ্ড সত্তা, তাহারই পরিচয় পাই 'কমলাকান্তের দপ্তরে'।...

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কতকগুলি রচনার ভিতরে রচনা-রীতির একটি বিশেষ ঢঙ দেখিতে পাই। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী রচনা-সাহিত্যেও এই বিশেষ ঢঙটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।... এই ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য এই, ইহার বিষয়বস্তু যে কি হইতে পারে এবং কি না হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনোই বিধি-নিষেধ নাই। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র —একান্ত অকিঞ্চিৎকর কোনো একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ ধরিয়া লেখক কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তারপর একটু একটু করিয়া তাহার ভিতরে আসিয়া পড়ে বহু সত্য ও তথ্য—বহু গম্ভীর আলোচনা ; কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে তিনি গভীরে চলিয়া যান।· আসল কথা, রচনা-সাহিত্যের যাহা প্রাণবস্তু তাহা প্রধানতঃ লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পন্দন ও তাহার ভিতর দিয়া আমাদের সহিত তাঁহার নিকটতম পরিচয়। স্বভাবতঃই রচনা-সাহিত্যে প্রাণ অনেকখানি বিষয়-নিরপেক্ষ।... বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনেকগুলি রচনার ভিতরেও দেখিতে পাই এই ঢঙ।· ·'আমার মন' (পঞ্চম সংখ্যা), 'বসন্তের কোকিল' (সপ্তম সংখ্যা) 'ফুলের বিবাহ' (নবম সংখ্যা), 'ঢেঁকি' (চতুর্দশ-সংখ্যা) প্রভৃতি রচনাগুলির ভিতরে এই আকৃতি-প্রকৃতি দেখিতে পাই।

'কমলাকান্তের দপ্তর' হাস্যরসের খনি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিম সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না।" 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র যে হাস্যরসের সঞ্চার করিয়াছেন তাহা এই কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র উপর কিছু কিছু ইংরেজী প্রভাব আছে সন্দেহ নাই। কমলাকান্তের প্রাতরূপ এডিসনের 'রোজার ডি কভার্লি,' ভীষ্মদেব খোসনবীশ স্কটের 'জেডেডিয়া ক্লেইশ বোথাম'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। আর কমলাকান্তের আফিমের নেশার দিবা-স্বপ্ন, ডি কুইন্সির 'দি কনফেশনস

অব অ্যান্ ইংলিশ ওপিয়াম-ঈটার'-নামক গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বহন করে। এসকল ছাড়া আরও নানা দিক্ দিয়া হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে মত মিলাইয়া বলা যায় যে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র "ভিতরে যে একটা অনুভূতির তীব্রতা, ভাবের প্রবল আবেগ, চিন্তার গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির সরসতা লক্ষ্য করিতে পারি,…পাশ্চাত্য লেখকগণের লেখায় তাহা দুর্লভ।"…

সমালোচনা—'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; 'বসন্তের কোকিল' তাহারই অন্তর্গত একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এই রচনাটির মধ্যে কমলাকান্তের বিশিষ্ট ঢঙটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্ত কোকিলকে লইয়া কথা বলিতে শুরু করিয়াছেন কিন্তু কথা কি তাহার কোনো পূর্বপরিকল্পনা নাই। কথা তাহার আপন আনন্দে আপন ছন্দে উৎসারিত হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে কমলাকান্তের মন কোকিলের প্রতি বিরাগ হইতে অনুরাগে, অনুরাগ হইতে ভক্তকবির মরমী আবেগে রসগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল এখানে কখনও লক্ষ্য, কখনও উপলক্ষ্য মাত্র। কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া কোকিলের বিশিষ্ট প্রকৃতির বিশ্লেষণের সময় কমলাকান্ত দার্শনিক, আবার তাহার সাদৃশ্যযুক্ত একশ্রেণীর মানুষের স্বভাব আলোচনার সময় তিনি কঠোর শাসক, সমাজ সংস্কারক। কিন্তু কোকিলের কুহুস্বর লইয়া কমলাকান্তের কবিত্বের অন্ত নাই। এই কবিত্ব ক্রমে বিশ্বসৌন্দর্যে সানন্দ বিহার করিয়া শেষে যেন সকল সৌন্দর্যের মূল সেই চিরসুন্দর পরমেশ্বরের চিন্তায় গিয়া একাগ্র হইয়াছে। এখানে কমলাকান্ত (অর্থাৎ কমলাকান্তের জবানীতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই) ভক্ত দার্শনিক, আবার মরমী কবিও বটেন। কি কথাটি যেন তাঁহার বলিবার আছে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিতে পারেন না, করিতে জানেনও না।

রচনাটির বস্তু-বিশ্লেষণ করিলে প্রথমে দেখি কোকিলের প্রসঙ্গে কমলাকান্তের কিঞ্চিৎ বিরাগ। কোকিল বসন্তের সহচর, সুখের পায়রা। সুতরাং সুখের দুলাল বসন্তের কোকিলের উপর তাঁহার বিরূপতা জাগে। কিন্তু মুহূর্তে কমলাকান্তের মনে পড়ে যে মানুষের মধ্যেও তো এই ধরনের সুদিনের বন্ধু আছে। তাহারা সুখের সাথী, দুঃখের সময় কেহ নহে। মানুষেরই মধ্যে যদি এরূপ প্রকৃতি থাকিতে পারে তবে সামান্য পাখী কোকিলের আর এমন কি একটা দোষ? এই চিন্তায় কমলাকান্তের মন আবার কোকিল-মুখী হয়। এবার

প্রথমে লক্ষ্য পড়ে তাঁহার কোকিলের কু-স্বরের প্রতি। স্বরটা তখন গৌণ থাকিয়া ধ্বনিটার অর্থই মুখ্যভাবে কমলাকান্তের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোকিল যেন উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া এ দুনিয়ার সব-কিছুকেই 'কু' বলে। কমলাকান্ত ইহাকে কোকিলের হীনম্মন্যতার অভিব্যক্তি জ্ঞান করে। কোকিল নিজের হীনতায় দুনিয়ার সব-কিছুরই যেন কদর্থ করে, সব কিছুকে কু-আখ্যা দেয়। কমলাকান্ত প্রখর ব্যঙ্গে তাহার এই মনোবৃত্তিকে যখন এক হাত লন, তখন কিন্তু কোকিলের ধ্বনিটার অর্থ ক্রমে গৌণ হইয়া সুরমাধুর্যটা মুখ্য হইয়া উঠে। কোকিলের পঞ্চমস্বর কখন অলক্ষ্যে কেবল স্বরমাহাত্ম্যেই তাঁহার চিত্ত জয় করে। কমলাকান্ত ভাবিয়া দেখেন, সত্যই তো জগতে স্বরমাহাত্ম্যই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তখন কোকিলের কু-স্বরকে হৃদয় ভরিয়া বরণ করিতে আর তাঁহার বাধা থাকে না; তাহা ছাড়া কমলাকান্ত সহসা ইহাও উপলব্ধি করিয়া ফেলেন যে দুনিয়ার অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ কিছু নাই। সকল ভালো-র সহিত কিছুটা মন্দও মিশিয়া আছে। কোকিলের স্পষ্টবাদিতা মানিয়া লইতে তখন আর তাঁহার কোনো অসুবিধা হয় না। এই ভাবে কোকিলের প্রতি বিরাগের পরিবর্তে অনুরাগে কমলাকান্ত পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। তাহার পঞ্চমস্বরের মধ্যে কমলাকান্ত পরমসুন্দর ভগবানের প্রতি একটা মরমী আহ্বান শুনিতে পান। কমলাকান্ত নিজেও অন্তরে অন্তরে সেই পরমপুরুষকে যেন কি বলিতে চাহেন, কিন্তু বলিতে পারেন না। তাই কোকিলের কণ্ঠে তাঁহার প্রাণের কথা তিনি আন্তরিক অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিতে চাহেন।

কমলাকান্তের কথার মধ্যে ভাবকল্পনার ইহাই রস-সূত্র। আপাতদৃষ্টিতে ইহা যতটা বিচ্ছিন্ন ও গ্রন্থিসঙ্কুল মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। ইহার সূক্ষ্ম বুননের মধ্যে রসচেতনার একটা সুসমঞ্জস বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মার্গসঙ্গীতের যেমন কথা অপেক্ষা সুরের লীলাটাই অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী, এখানেও তেমনি ভাবকল্পনার সারবস্তু অপেক্ষা কবিত্বের লীলা-বিস্তারই অনেক বেশী উপভোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে রূপপিপাসু একটি কবিমন ছিল, তাহারই অভিব্যক্তি আছে 'বসন্তের কোকিলে'। বস্তুতঃ এই রচনায় বঙ্কিমমনের বসন্তের কোকিলটিই উপলব্ধির মধু-উপভোগে লীলাছন্দে পঞ্চমতানের লহরী তুলিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার—বসন্তের কোকিলকে সম্বোধন করিয়া কমলাকান্ত অনুযোগ করিতেছেন যে, কেবল সুসময়েই তাহাকে দেখা যায়, তাহার ডাক

শুনা যায়। স্নিগ্ধসুন্দর বসন্ত-ঋতুতে তাহার আবির্ভাব। দারুণ শীতে ও প্রবল বর্ষার দিনে আত্মসুখী কোকিলকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না।

মানুষের মধ্যেও কোকিল প্রকৃতি অনেকে আছে। নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসিলে তাঁহার বৈঠকখানা অনেক সুদিনের সঙ্গী ও স্তাবকের সমাগমে মুখর হয়। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইলে তাঁহার বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে। তাহারা ভদ্রলোকের পয়সায় যথেচ্ছ খায় দায় স্ফূর্তি করে। বাগান-বাড়ীতে যাইবার সময় দলে দলে লোক তাঁহার সঙ্গী হয়। কিন্তু এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে যখন তাঁহার পুত্রটির অকালমৃত্যু ঘটিল, তখন কেহই আসিল না—সকলেই কোনো না-কোনো অজুহাত দেখাইল। আসল কথা, নসীবাবুর তখন দুর্দিন ; দুর্দিনে সুদিনের সঙ্গীরা আসিবে কেন ?

কোকিলেরই বা দোষ কি ? ফুলপাতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে কু—উঃ বলিয়া ডাকে। এই ডাকটি কমলাকান্তের বড় প্রিয়। কোকিল কালো কুৎসিত, পরান্ন-প্রতিপালিত ; তাই তাহার চোখে সবই কু। তাহার প্রতি কমলাকান্তের উপদেশ—যখনই পৃথিবীতে সুন্দর কিছু দেখিয়া তাহার মনে ঈর্ষা জাগিবে, যখন সান্ধ্য বাতাসে ভাসিবে বিকশিত পুষ্পরাশির সৌরভ, গন্ধরাজগুলি আপন গন্ধে বিহ্বল হইয়া পরস্পর ঢলাঢলি করিবে, যখন বকুলের সুশ্যাম পথাপ্ত পত্রগুচ্ছের মধ্যে অসংখ্য কুসুম ফুটিয়া সুঘ্রাণে আকাশ মাতাইবে, যখন স্ফুটমান নবমল্লিকার রূপে মুগ্ধ ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে মধুরকণ্ঠে প্রেম নিবেদন করিবে, তখনই যেন সে কু—উঃ বলিয়া ডাকিয়া তাহার মনের জ্বালা জুড়ায়।

এই পঞ্চমস্বর আছে বলিয়াই—এই গলার জোরেই কোকিল সকলকে জয় করিয়াছে, নহিলে তাহার ডাক কেহ শুনিত না, কেহ তাহার কদর্য কালো রূপের আদর করিত না। প্রকৃতির মহাসভায় দাঁড়াইয়া সে একবার মধুর পঞ্চম-স্বরে ডাকুক—বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিবে। তাহার কণ্ঠ 'কু' 'সু' যাহা বলিবে, লোকে তাহাই মানিবে। সংসারে কু আছে বৈকি—যাহা কিছু সুন্দর তাহার মধ্যে কদর্যতাও আছে। কিন্তু শুধু কু বলিলেই হইবে না—মধুরস্বরে বলিতে হইবে। মাধুর্য না থাকিলে শুধু গলাবাজিতে সংসারকে জয় করা যাইবে না।

কমলাকান্তের বড় ইচ্ছা পাখীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া তিনিও পঞ্চমস্বরে গান ধরেন। পাখী আর তিনি—দুজনেরই সমান অবস্থা, সমান সুখ-দুঃখ। কোকিল মনের আনন্দে কুঞ্জে কুঞ্জে গাহিয়া বেড়ায় ; তিনি আপনার আনন্দে দপ্তর

লেখেন। কোকিলের সম্বল তাহার কণ্ঠ, কমলাকান্তের সম্বল আফিম। পঞ্চমস্বর উভয়েরই প্রিয়। কিন্তু পাখীর প্রতি কমলাকান্তের প্রশ্ন—সে কাহাকে ডাকে, তিনিই বা কাহাকে ডাকেন?

কমলাকান্ত ডাকেন সত্য-শিব-সুন্দরকে, অনন্ত রহস্যে ভরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে—সৃষ্টিদেহে যিনি আত্মারূপে বিরাজমান তাঁহাকে। কোকিলও তাঁহাকেই ডাকে কিন্তু না জানিযা। কমলাকান্তও কি সত্যই জানেন? জানিয়া ডাকা, না জানিযা ডাকা—দুই-ই সমান। ভগবানের সর্বশব্দগ্রাহী কানে সব ডাকই গিয়া পৌঁছিবে।

কমলাকান্তের দুঃখ, তাঁহার কোকিলের মত মধুর কণ্ঠ নাই। তাই তিনি মনের ভাব কখনও প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কোকিল যেন তাহার বিশ্ববিমোহন কণ্ঠে তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। নিজের মুখে মনের কথা বলা তাঁহার এ জন্মে আর হইল না। কোকিলের সুকণ্ঠ, অমানুষী ভাষা আর নক্ষত্ররাজিকে শ্রোতারূপে পাইলে তিনি আপন মনের অপার্থিব ভাবরাশি প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাহা যখন হইবে না, তখন কোকিলই তাঁহার হইয়া ডাকুক।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। **বসন্তের কোকিল**—কোকিলের আবির্ভাব হয় বসন্তে অর্থাৎ বৎসরের সবচেয়ে মনোরম ঋতুতে। **বেশ লোক**—কোকিল লোক নয়, পাখী মাত্র, কমলাকান্ত রসিকতার জন্য তাহাকে 'লোক' বলিয়াছেন—অবশ্য পাখী-কোকিল এখানে উপলক্ষ্যমাত্র, আসল লক্ষ্য কোকিলের প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ (মানুষ-কোকিল)। 'বেশ' কথাটি সাধারণতঃ ভালো বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে শ্লেষাত্মক বলিয়া বিপরীত অর্থ। **ফুল…বহে**—অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব হয়। **এ সংসার সুখের** ইত্যাদি—বসন্তসমাগমে সমগ্র প্রকৃতি ও জীবলোকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, সে আনন্দের অনুভূতি সকলেরই দেহে যেন ঢেউ খেলায়। **রসিকতা**—কৌতুক; ঠাট্টাতামাশা। কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠে জীব, বিশেষ করিয়া মানুষ, আকৃষ্ট হয়, আনমনা হয়। সে কাজ ফেলিয়া তাহার গান শুনিতে থাকে। এইভাবে কর্মব্যস্ত মানুষকে লইয়া কোকিল যেন রসিকতা করে। **থরহরি কম্প লাগে**—প্রবল কাঁপুনি আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ

'থরহরি কম্প' ভয়ের কাঁপুনিকেই বোঝায়। **বাপু**—মৃদু তিরস্কারবোধক সম্বোধন। **আমার চালাঘরে নদী বহে**—আমার কুটীরখানির ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল স্রোতের আকারে বহিতে থাকে। **ভিজিয়া গোময় হয়**—আপাদ-মস্তক সিক্ত হইয়া জড়বস্তুর মতো নিশ্চল হয়। 'ভিজিয়া গোবর হওয়া' বাঙলা ইডিয়ম, রসিকতার জন্য 'গোবর'কে সংস্কৃত করিয়া 'গোময়' করা হইয়াছে। রসিকতার জন্য এইরূপ শব্দসংস্কৃতির আরও উদাহরণ: কদলী-প্রদর্শন (কলা-দেখানো), অশ্বডিম্ব (ঘোড়ার ডিম), কর্ণমর্দন (কানমলা) ইত্যাদি। **দুলালী ধরনের শরীরখানি**—ধনীর আদুরে মেয়ের মতো নধর চিক্কণ দেহখানি। **শীত-বর্ষার কেহ নও**—শীত ও বর্ষা মানুষের পক্ষে এবং অন্যান্য জীবের পক্ষে দুঃসময়। কোকিল সুসময়ের আগন্তুক, দুঃসময়ের কেহ নয়।

অ. ২। আমাদের মাঝখানে—মানুষের মধ্যে। **নসীবাবু**—জনৈক কাল্পনিক তালুকদার। তালুক—জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত-লওয়া ভূসম্পত্তি। **তালুকের খাজনা আসে**—অর্থাৎ হাতে যখন প্রচুর পয়সা থাকে ; সুসময়ে। **গৃহকুঞ্জ**—কোকিল থাকে কুঞ্জে ; মানুষরূপ কোকিল যে গৃহে ভিড় করে তাহাকেও তাই কুঞ্জ বলা হইয়াছে। টিকি, ফোঁটা, টেড়ি, চশমা—এইসব উপলক্ষণবিশিষ্ট মানুষ। ইহাদের মধ্যে টিকি ও ফোঁটাওয়ালা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব আর টেড়ি ও চশমাধারীরা আধুনিক বাবু। হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজী—হাটে-মাঠে অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোকের কথাবার্তায় ব্যবহৃত ইংরেজী। বলা বাহুল্য যে এইরূপ ইংরেজী শুদ্ধ নহে। **চোরা ইংরেজী**—প্রকৃতপক্ষে কোনো ইংরেজ লেখকের রচনা হইতে গৃহীত অথচ নিজের নামে চালাইয়া-দেওয়া ইংরেজী। ছেঁড়া ইংরেজী—বিভিন্ন লেখকের লেখার কিছু কিছু জোড়াতালি দিয়া যে ইংরেজী, কমলাকান্ত হয়তো তাহাকেই ছেঁড়া ইংরেজী বলিয়াছেন। **পারাবতকাকলীসংকুল**—পায়রার কূজনে গুঞ্জনে পূর্ণ। গৃহসৌধবৎ—ঘরের দালানের মতো। **কত কবিতা…মুখরিত হইয়া উঠে**—নসীবাবুর বৈঠকখানায় স্তাবকের দল সবসময় ভিড় করে এবং নানা কথায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করে। পর্ব—পূজা বা অন্য কোনো উৎসবানুষ্ঠান। **মানুষ-কোকিল**—মানুষরূপী কোকিল ; সুসময়ের সঙ্গী। **ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তুলে**—এত বেশী সংখ্যায় আসে যে তাহাতে বাড়ী যেন অরণ্যের মতো অন্ধকার হইয়া যায়। কেহ খায়—নসীবাবুর পয়সায় সুখাদ্য খাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। **কেহ যাত্রা চড়ায়**—পরের পয়সা পাইয়া

কেহ অতিরিক্ত নেশা করে। **কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়**—কেহ অত্যধিক নেশা করার ফলে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতেই পড়িয়া থাকে। বাগানে—বাগান-বাড়ীতে। বাগান-বাড়ীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যই আমোদ-স্ফূর্তি করা। **পিঁপিড়ার সারি দেয়**—মিষ্টির গন্ধে আকৃষ্ট পিঁপিড়ার মতো কাতারে কাতারে সঙ্গে চলে। **কাহারও সমস্ত রাত্রি** ইত্যাদি—নিদ্রা না হইলে আসাটা বরং সহজ, তবু আসিতে পারিল না। ইহাতেই বুঝা যায় যে অসুখ, সুখ, অনিদ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি না আসার কারণ নয়; আসল কারণ অনিচ্ছা। **সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে**—নসীবাবুর সেদিন ঘোর দুঃসময়ই, সুসময় নয়। তাই সুখের দিনের সঙ্গীরা তাঁহার দুর্দিনে আসিবে কেন? **বসন্তের কোকিল**—সুসময়ে সুখের ভাগী, অসময়ে কেহ নয়।

অ. ৩-৪। **তোমার দোষ নাই**—কমলাকান্ত কোকিলের নিন্দনীয় স্বভাবের একটু যুক্তিসংগত কারণ অনুমান করিয়া তাহার উপর কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছেন, তাই আর তাহাকে দোষ দিতে চান না। **জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত** ইত্যাদি—গনগনে লাল আগুনের মধ্যে পোড়া বেগুনটিকে যেমন কালো দেখায়। কোকিল কালো, কুৎসিত; কিন্তু লাল অশোকফুলের পাশে তাহার কৃষ্ণত্ব আরও বেশী প্রকট। 'আগুন' ও 'বেগুন'-এর ধ্বনিসাদৃশ্য লক্ষণীয়। **পঞ্চমস্বরে**—ষড়্‌জ, ঋষভ ইত্যাদি সাতটি স্বরের পঞ্চমটিতে অর্থাৎ 'পা' স্বরে। এই স্বর কোকিলের কণ্ঠেরই অনুরূপ। **তোমায় ঐ··· ···ভালোবাসি**—কোকিলের স্বভাবের দোষ থাকিলেও কমলাকান্ত তাহার কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। **পরান্ন-প্রতিপালিত**—কাক চিনিতে না পারা পর্যন্ত কোকিলের ডিম ও শাবক কাকের বাসায়ই থাকে, শাবকগুলি কাকের প্রদত্ত খাদ্যেই বাঁচিয়া থাকে। এই কারণে কোকিল পরান্ন-প্রতিপালিত। সকলই 'কু'—সবই খারাপ। সামগ্রী—জিনিস · বস্তু। **তোমার দ্বেষ হিংসা ঈর্ষার উদয় হয়**—কোকিল নিজে কুৎসিত বলিয়া সুন্দর জিনিস দেখিলেই তাহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়, তাই সে 'কু'-ডাক ডাকে—এমনই একটি কল্পনা কমলাকান্ত করিয়াছেন। **উপর্যুপরি-বিন্যস্ত পুষ্পস্তবক**—একটির উপর একটি সাজানো ফুলের গোছা। **এক কালে**—একসঙ্গে। **আপনাদিগের গন্ধে···চলিয়া পড়িতেছে**—এখানে গন্ধবাজ ফুলগুলিতে মাতালের কল্পনা। **মধুরশ্যামল**—সুন্দর সবুজ। **স্নিগ্ধোজ্জ্বল**—কমনীয় অথচ

চক্‌চকে। প্রস্ফুট—বিকশিত। তাহারই আশ্রয়ে—সেই বকুল-কুঞ্জেই। **শুভ্রমুখী**—সাদা মুখ যাহার। শুদ্ধশরীরা—নিষ্কলঙ্কদেহা। **সুন্দরী নবমল্লিকা**—এখানে নবমল্লিকা ফুলে নারীকল্পনা। নবমল্লিকা-জাতীয় সাতটি পাপড়িবিশিষ্ট সুগন্ধি ফুল। আলোক প্রাখর্যের হ্রাস দেখিযা—দিনের প্রখর সূর্যকিরণ স্তিমিত হইয়াছে দেখিয়া। দলরাজি—পাপড়িগুলি। **শুভ্রমুখী… উপক্রম করিতেছে**—নবমল্লিকা যেন এখানে একটি অসূর্যম্পশ্যা সুন্দরী নারী, সূর্যাস্ত না হইলে ঘোমটা খোলে না। **'আদরেতে আগুসারি'**—প্রেমভরে অগ্রসর হইয়া। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদকর্তা গোবিন্দদাসের "আদরে আগুসারি, রাই হৃদয়ে ধরি" ইত্যাদি পদ হইতে গৃহীত। লক্ষণীয় যে মূলপদে 'আদরে আগুসারি' আছে, 'আদরেতে আগুসারি' নয়। **কণ্ঠ ভরা ঢালিয়া দিতেছে**—ফুলের কাছে গিয়া মধুরকণ্ঠে গুন্ গুন্ স্বরে প্রেম-নিবেদন করিতেছে। ভ্রমর এখানে নবমল্লিকার প্রণয়ীরূপে কল্পিত। **কালামুখ**—কোকিলের বর্ণ কালো এবং স্বভাব হিংসুটে, তাই দুই অর্থেই সে 'কালামুখ'—(১) কালা মুখ যাহার; (২) নিন্দার যোগ্য।

অ. ৫-৬। **ঐটি তোমার জিত** ইত্যাদি—তোমার স্বভাব এত নিন্দনীয় হইলেও লোকের মন যে তুমি জয় করিতে পার তাহার কারণ তোমার কণ্ঠনিঃসৃত ঐ মধুর পঞ্চমস্বর। **গ্লাডস্টোন**—William Edward Gladstone (১৮০৯-১৮৯৮), বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ও বাগ্মী। ইনি বিভিন্ন সময়ে চারিবার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন (Home Rule) প্রবর্তন করিবার চেষ্টায় ইঁহাকে কয়েকবার বিফল হইতে হয়, এমনকি পদ-ত্যাগও করিতে হয়। ইনি একজন অক্লান্ত-কর্মী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। **ডিস্রেলি**—ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ Benjamin Disraeli (১৮০৪-১৮৮১ খ্রীঃ)। ইনি দুইবার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং সুবক্তা ছিলেন। ইঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি-গ্রহণ। গলাবাজীতে—গলার জোরে, কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে। **হাঁড়িচাঁচা**—একজাতীয় পাখী। ইহাদের চঞ্চু, গলা এবং লেজের প্রান্তভাগ কালো, বাকি ধূসরবর্ণ, মাথার রঙ দারুচিনির মতো। ডানা ছোট; পুচ্ছ সুদীর্ঘ। **এ পৃথিবীতে… হাঁড়িচাঁচা ভালো**—জগতে বক্তৃতাশক্তির দ্বারা যেমন গ্লাডস্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ

করিয়াছেন, তেমনি কোকিলও মানুষের প্রিয় হইয়াছে তাহার মধুর কণ্ঠের গুণে। এই গলা না থাকিলে অমন কৃষ্ণবর্ণ পাখীকে কেহই সমাদর করিত না। **প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেণ্ট**--ইংলণ্ডের আইন-পরিষদকে পার্লিয়ামেণ্ট বলা হয়। সেখানে বক্তৃতা করা এবং শোনাই সভ্যদের কাজ। ইহার চেয়ে বড় পার্লিয়ামেণ্ট বা আইন-সভা-রূপে কল্পনা করিয়াছেন কমলাকান্ত প্রকৃতির বিস্তৃত রাজ্যকে। **নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত**—(আকাশরূপ) নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা। **গিরিনদা-নগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুশোভিত**—পার্লিয়ামেণ্টে সভ্যদের বসিবার জন্য বেঞ্চ থাকে; প্রকৃতির মহাপার্লিয়ামেণ্টে এই বেঞ্চ বা আসনের কাজ করে পাহাড়-পর্বত, নদী, নগর, অরণ্য প্রভৃতি। **সিংহাসন হইতে হেস্টিংস পর্যন্ত**—আক্ষরিক অর্থে: বৃটিশরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত সকলে। 'মন্তব্য' দেখ। 'হেস্টিংস' বলিতে লেখক খুব সম্ভবতঃ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। **মনে হয়,** অত্যাচারী ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্টের (Impeachment) সময় পার্লামেণ্ট সভায় এড্‌মণ্ড্‌ বার্কের বক্তৃতার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ইঙ্গিত করিয়াছেন। **মন্তব্য:** এখানে অবশ্য 'হস্টিংস্' সত্যকার ওয়ারেন হেস্টিংস্ নয়, বৃটিশকর্তৃক ভারতে নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধিদের প্রতীকরূপে কথাটা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রয়োগ করিয়াছেন--'কাঁপিয়া উঠুক' এই অনুজ্ঞা প্রয়োগ হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে। সত্যকার হেস্টিংস্ কমলাকান্তের প্রায় একশত বৎসর পূর্বেকার লোক। কলকণ্ঠে—মধুর স্বরে। কু বলিতে ইত্যাদি—খারাপ ভালো যা বলিবে তাহাই মানিয়া লইব। সু=ভালো। সব কু—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সব ভালো জিনিসের মধ্যেই খারাপ কিছু-না-কিছু আছে। **রূপ বিকৃত হয়**—রোগে জরায় রূপবানও কুৎসিত হইয়া পড়ে। কুঁকড়ো বাবাজি—মোরগ। **নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি** ইত্যাদি—মোরগের 'কু কু কু' ডাকে প্রত্যূষে কমলাকান্তের ঘুম ভাঙিয়া যায়। ঐ ডাক কর্কশ বলিয়া তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করে। তাই তাঁহার সুখের প্রভাতনিদ্রাকে মোরগ যদি কু বলে, তবে তিনি তাহা মানিতে প্রস্তুত নন। গলা নাই—কণ্ঠস্বরে মাধুর্য নাই। গলাবাজিতে—চীৎকার ও আস্ফালনে। **শব্দমন্ত্রে**—কণ্ঠস্বররূপ মন্ত্রের দ্বারা। তোমার—পাঠকের। **পঞ্চম লাগে**—পঞ্চমস্বরের মাধুর্য থাকে।

অ. ৭। পুষ্পকাননে—ফুলের বনে। **আপনার আনন্দে গাহিয়া বেড়াস**—লক্ষণীয় যে কমলাকান্ত পূর্বে বলিয়াছেন কোকিল ঈর্ষ্যাবশেই 'কু—উঃ' ডাক ডাকে, এখানে বলিতেছেন 'আনন্দে'। **মন্তব্যঃ** এই অনুচ্ছেদে কমলাকান্তের চিন্তা যে স্তরে পৌঁছিয়াছে, কোকিল সেখানে আর বাহিরের বস্তু নাই, কমলাকান্তের একান্ত আত্মীয় হইয়া গিয়াছে—'তুমি' সহসা 'তুই'-এ পরিণত হইয়াছে। দুইজনে এখন অভিন্নহৃদয়; দুইজনই সাধক এবং সাধনার ধন আনন্দময় পরব্রহ্ম। সংসারকাননে—সংসাররূপ বনে। **এই দপ্তর**—কমলাকান্তের দপ্তর। এই দপ্তরটি কমলাকান্ত তাঁহার আশ্রয়দাতা ভীষ্মদেব খোসনবীশকে (কাল্পনিক) দিয়া নিরুদ্দেশ হন। **আমার কেহ নাই**—বঙ্কিমের কমলাকান্ত অকৃতদার, সংসারে তাঁহার কেহ নাই। পুঁজিপাটা—একমাত্র সম্বল। **আফিমের ডেলা**—কমলাকান্ত আফিমখোর, রোজ আধ ভরি না হইলে তাঁহার চলে না। বলা বাহুল্য, আফিমের নেশা এখানে ভাবের ঘোর।

অ. ৮। **যে সুন্দর** ইত্যাদি—কমলাকান্ত মনে-প্রাণে যাঁহাকে ডাকেন, তিনি শুধু সুন্দরই নন, শিবও। সত্য-শিব-সুন্দর-পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্যই তাঁহার মনের আকুতি। **এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড** ইত্যাদি—অনন্ত রহস্যের আধার এই যে সৃষ্ট জগৎ, ইহা কোন্ মহাশক্তির লীলা তাহা তিনি জানেন না। সেই অজ্ঞাত মহাশক্তিকেই তিনি ডাকেন। **জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা**—পরিদৃশ্যমান জগৎ রূপ দেহের মধ্যে যিনি অদৃশ্য আত্মারূপে বিরাজ করেন। জীবদেহের মধ্যে যেমন জীবাত্মার অধিষ্ঠান, তেমনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। তোর ও ডাক পৌঁছিলে ইত্যাদি—পরমাত্মাকে যেমন ভাবেই ডাকা হউক, তিনি সে ডাক শুনিতে পাইবেন। সর্বশব্দগ্রাহী—সকল শব্দ গ্রহণ করিতে বা শুনিতে পারে যাহা। ইঙ্গিতটি ভগবানের প্রতি—ভগবান্ সর্বজ্ঞ। মিলে মিশে—চলিতভাষার ক্রিয়াপদ। এখানে 'গুরুচণ্ডালিয়া দোষ' এ দোষের জন্যই বঙ্কিম এবং তাঁহার সমর্থকদের 'শবপোড়া-মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করা হইত।

অ. ৯। কুহুরবে-সাধা গলা—কোকিল কুহুরব করিতে অভ্যস্ত। তাহার কণ্ঠস্বরের যে সিদ্ধি, তাহা এই অভ্যাসের ফলে হইয়াছে। **কণ্ঠ নাই বলিয়া** ইত্যাদি—কমলাকান্তের আক্ষেপ যে কোকিলের মতো মিষ্টকণ্ঠের অভাবে, অর্থাৎ

উপযুক্ত মধুর ভাষার অভাবে, তিনি নিজের মনের কোনো ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। **ভুবন-ভুলানো**—জগৎকে মুগ্ধ করিতে পারে এমন। **বলিতে জানি না**—কেমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয় জানি না। **অমানুষী ভাষা**—যে ভাষা মানুষের প্রয়োজন ও পরিচিত ভাবের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। **অমানুষী ভাষা পাই**—কমলাকান্তের মনে যে ভাবরাশির উদয় হয়, তাহা অপার্থিব, মানুষের শৃঙ্খলিত ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। তাই তিনি অমানুষী ভাষা পাইবার কামনা ব্যক্ত করিয়াছেন। **নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই**—সেই অপার্থিব ভাষায় কথা বলিলে পার্থিব মানুষ তাহা বুঝিবে না; তাই তাহার শ্রোতাও চাই অপার্থিব মহাশূন্যের তারকা। **নীলাম্বরমধ্যে**—নীল আকাশের মধ্যে। **নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে...পাইব না?**—এখানে কমলাকান্ত কোকিলের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, মনের অব্যক্ত ভাবরাশিকে ভাষা দিতে হইলে তাঁহাকেও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে উড়িয়া কুহু কুহু রবে ডাকিতে হইবে।

ব্যাখ্যা

(১) আসল কথা, সেদিন বর্ষা...আসিবে কেন? (অ. ২)

এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল'-শীর্ষক রচনার অন্তর্গত। মানবসমাজে সুখের সাথী, দুঃখে সঙ্গত্যাগী একশ্রেণীর মানুষ-সম্বন্ধে ইহা কমলাকান্তের উক্তি।

মানুষের মধ্যেও একশ্রেণীর লোক বসন্তের কোকিলের মতো কেবল সুদিনের সাথী। নসীবাবু যেন একজন ধনাঢ্য ভূস্বামী। তাঁহার যখন আদায়ের মরশুম, খাজনার টাকায় যখন তাঁহার থলিযা পুষ্ট হইয়া উঠে, তখন বহু স্বার্থান্বেষী আসিয়া তাঁহার চারিদিকে ভিড় করে। ফোঁটা-কাটা টিকিধারী ব্রাহ্মণ আর টেড়িকাটা চশমাধারী নব্যবাবুর দল—সকল রকম স্তাবক ও চাটুকার, সুখপিয়াসী ও স্বার্থসন্ধানী—সকলে আসিয়া নসীবাবুর বৈঠকখানায় বাজার জমাইয়া বসে। তাহারা শ্লোকে সঙ্গীতে কবিতায় আর প্রাকৃত-ইংরেজীর সস্তা বচনে নসীবাবুর মন জয় করিতে থাকে এবং নসীবাবুর অর্থে নাচগান, যাত্রা ও উৎসবে বাড়ীটাকে নন্দনকানন করিয়া তোলে। নসীবাবু যখন বাগানবাড়ীতে আমোদ করিতে যান, তখন ইহারা শর্করালুব্ধ পিপীলিকার

মতো মিছিল করিয়া পিছু লয়। মোট কথা, যতক্ষণ নসীবাবুর মধ্যে রস থাকে ততক্ষণ এই মক্ষিকার দল চাক বাঁধিয়া নসীবাবুকে শোষণ করিতে থাকে। কিন্তু নসীবাবুর যদি সহসা পুত্রবিয়োগ হয় তখন ডাক দিলে কাহাকেও পাওয়া যায় না। কেহ অসুখের জন্য, কেহ অনিদ্রার জন্য, কেহ নাতির জন্মের অছিলায়—নানা অজুহাতে দুর্দিনে তাহারা দূরে সরিয়া থাকে। ইহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। ইহারা বসন্তের কোকিলের তুল্য। মধুমাসে দক্ষিণের মন্দ-পবন-সেবিত ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্পকুঞ্জেই বসন্তের কোকিল আসিয়া জড় হয়। শীতবর্ষার দুর্যোগে কোকিলের টিকিটিও দেখা যায় না। সেইরূপে এই সুখের পায়রাগণও সম্পদের বসন্তসময়ে দলে দলে ভিড় করে, বর্ষারাত্রির দুর্যোগের মতো দুঃখের দিনে তাহাদের কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(২) তুমি নিজে কালো, ·ডাকিয়া বলো "কু—উঃ" (অ. ৩)

এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল'-এর অন্তর্গত। কোকিলের কু রবের অর্থ ও হেতু ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহা কমলাকান্তের উক্তি।

কোকিল যে শুধু বসন্তের সহচর তাহাই নহে; তাহার নিকট দুনিয়ার সব-কিছুই মন্দ। দুনিয়াটা মন্দে ভর্তি,—এই কথাটাই যেন সে অহর্নিশ উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করে; তাই সে ডাকে 'কু'। কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ইহার একটা ব্যাখ্যা দিতেছেন। কোকিল নিজে মন্দ বলিয়াই জগৎকে মন্দ দেখে। রূপে সে কালো। অশোকের রাঙা ফুলের রাশির মধ্যে বসিয়া যখন সে ডাকে তখন আগুনের মধ্যে পোড়া বেগুনটার মতো কালোরূপ তাহার রীতিমতো কুশ্রী হইয়া উঠে। কোকিল তাহার গানের আসরটির সৌন্দর্য এবং তুলনায় নিজের কুরূপ বুঝিয়াই বোধ হয় সব জিনিসকে কু-আখ্যা দেয়। শুধু রূপেই নহে, স্বভাবেও কোকিল নিন্দনীয়। কাকের কৃপায় অণ্ড হইতে তাহার জন্ম হয় এবং কাকেরই প্রদত্ত অন্নে সে বড় হইয়া উঠে। পরান্নে এইভাবে যে পালিত সে জন্মাবধিই হীন। হীন বলিয়াই তাহার নিকট দুনিয়াটা খারাপ। মানুষের মধ্যেও এইরূপ কোকিল-প্রকৃতির লোক রহিয়াছে। তাহারা পরের খাইয়া মানুষ অথচ পরের নিন্দাই তাহাদের ধর্ম। ইহাকে বলে হীনম্মন্যতার লক্ষণ। অপরকে ছোট না করিলে, ছোটর ছোটত্ব অত্যন্ত হীন দেখায়। হীন ব্যক্তি তাই কু-স্বরে দুনিয়ার নিন্দা করে। এইভাবে সকলের লেজ কাটিয়া সে নিজের ছিন্নলাঙ্গুলের গ্লানি ও অগৌরব ঢাকিতে চায়। তাহা ছাড়া মানুষ তাহার

নিজের প্রকৃতি দিয়াই অন্যকে বিচার করে। যে নিজে খারাপ সে তো অন্যকে খারাপ দেখিবেই। কোকিল নিজে খারাপ বলিয়াই দুনিয়াটাকে খারাপ বলিয়া যেন নিত্য ঘোষণা করে। কোকিলের রূপকের সাহায্যে অবশ্য মানুষের একটা দোষের দিকেই বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষ করিয়াছেন। নহিলে কোকিলের কু-স্বরের অর্থ যে ঠিক কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহা ছাড়া কালো বলিয়াই কোকিল কুশ্রীও নয়।

(৩) এ পৃথিবীতে গ্লাডস্টোন…হাঁড়িচাঁচা ভালো। (অ. ৫)

এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল'-শীর্ষক রস-রচনার অন্তর্গত। কোকিলের পঞ্চমস্বরের মাহাত্ম্য-কীর্তন-প্রসঙ্গে কমলাকান্ত উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

কোকিলকে কমলাকান্ত এ পর্যন্ত কুশ্রী ও কুৎসিতস্বভাব বলিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। কোকিল যেন কু-স্বরে দুনিয়াটাকে কু বলিয়া প্রচার করে। ইহা তাহার হীনতার প্রমাণ কিন্তু কোকিলের স্বরটি ভারি মিষ্ট। এই মধুর স্বরেই সে তাহার চিত্ত জয় করিয়া আসিয়াছে। রূপ নাই, গুণ নাই,—পরনিন্দুক কোকিল তবু যে জগতে আদৃত হয় তাহা কেবল তাহার পঞ্চমস্বরেরই জাদুবলে। কমলাকান্ত স্বীকার করিতেছেন, এইখানে সত্যই কোকিলের জিত। ইংলণ্ডের দুইজন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন ও ডিস্রেলি এবং এমন আরও বহু লোক কণ্ঠের শক্তিতেই বড় হইয়া গিয়াছেন। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য সত্যই একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি। বক্তাদের মধ্যে দেখা যায়, যাহারা শুধু চীৎকার করিতে অভ্যস্ত তাহাদের কথা কেহ শুনিতে চাহে না। কিন্তু যাঁহাদের কণ্ঠে অমিয়-লহরী, তাঁহাদের কথায় একটা জাদু আছে, সেই মধুরভাষণে শ্রোতার চিত্ত আপনা হইতেই বশীভূত হইয়া যায়। গ্লাডস্টোন ও ডিস্রেলি হইতে পৃথিবীর অনেক বড় লোকই প্রধানতঃ এই গুণেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অন্য বহুতর গুণও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু সেই সকল গুণ প্রয়োগ করিবার সুযোগও হইত না, যদি না তাঁহারা কণ্ঠগুণে উচ্চপদে নির্বাচিত হইতেন। কমলাকান্ত এইভাবে কোকিলের পঞ্চমস্বর কেন বিশ্ববিজয়ী তাহা বুঝিয়াছেন। কোকিল অতিশয় কালো, রূপের দিক্ দিয়া হাঁড়িচাঁচা পাখীরাও তাহার চেয়ে ভালো। তবু যে কোকিল পাখীর সমাজে তথা মানুষের সমাজে সগৌরবে বিরাজ করে তাহার কারণ তাহার সেই মধুর পঞ্চমস্বর।

(৪) কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চমস্বরে……আমি মানিব না। (অ. ৬)

এই পঙ্‌ক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল'-শীর্ষক রস-রচনার অংশ। কোকিলের কু-স্বরে যে ঘোষণাটি আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইবার সময় কমলাকান্ত উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

কোকিল 'কু—উ'-রবে যেন দুনিয়ার সব-কিছুকেই কু বা খারাপ বলে। কমলাকান্ত বহু জল্পনার পর একথার সত্যতা মানিতে রাজী হইয়াছেন। কারণ, কোকিলের মধুর স্বর তাঁহার চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে। পঞ্চমস্বরে অমিয়মাখা সে তানে কি যেন এক জাদুপ্রভাব আছে। মোহিত কমলাকান্ত হৃদয় ভরিয়া তাহা গ্রহণ করেন—সে মাধুর্য উপভোগ করেন। তখন তিনি যেন এই নূতন উপলব্ধি লাভ করেন যে এ জগতে অবিমিশ্র ভালো কিছুই নাই। সকল ভালো জিনিসেই কিছু-না-কিছু মন্দ মিশিয়া আছে। কোকিল স্পষ্টভাষায় সেকথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। কাজেই কমলাকান্ত তাহা মানিয়া লন। সত্যকে সত্য বলিয়াই কিন্তু সব সময় মানা যায় না। সত্য যখন মিষ্ট হয় তখনই আমরা তাহা অন্তর দিয়া গ্রহণ করি। কটুকণ্ঠে তারস্বরে ঘোষণা করিলেও কেহ সত্যের প্রতি কর্ণপাত করে না, বরং তাহাতে বিরক্তি বোধ করে। তাই প্রভাতে কুক্কুটের শব্দ যখন নিদ্রাভঙ্গ করে তখন বিরক্তিই জন্মায়। অথচ কোকিলের মধুর স্বর বৈতালিকের প্রভাতীর মতো সোনার কাঠির স্পর্শ আনে—মানুষকে জাগাইয়া দেয়। কোকিলও বলে 'কুঃ, কুক্কুটও বলে 'কু-কু কু'। কিন্তু একজন বলে পঞ্চমস্বরে সঙ্গীতময় তানে, আর একজন যেন তোতলাইয়া সেই কথাটাকেই বিকট কর্কশ শব্দে প্রকাশ করে। সেইজন্যই কোকিলের ঘোষণা হৃদয়গ্রাহী, কুক্কুটের শব্দ বিরক্তিজনক। দুনিয়া আজ গলার জোরেই বশ কিন্তু গলার প্রকৃত জোর চীৎকারে নহে, মাধুর্যে। কোকিলের কণ্ঠে সেই মাধুর্যই প্রচুর, সেইজন্য কমলাকান্ত তাহার কথা সানন্দে মানিয়া লইতে রাজী।

(৫) যে সুন্দর, তাকেই… তুইও ডাকিস। (অ. ৮)

এই পঙ্‌ক্তিকয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল'-শীর্ষক রস-রচনা হইতে উদ্ধৃত। বসন্তের কোকিল এবং কমলাকান্ত—উভয়েই আনন্দ-সাধনায় রত। সেই সাধনার অন্তিম লক্ষ্য কি, সেই কথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই কমলাকান্ত উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন।

কোকিলের আনন্দ পঞ্চমস্বরে গান গাওয়া—কমলাকান্তের আনন্দ আফিমের নেশায় এই সুন্দর জগতের অনুধ্যান করা। কোকিলের পক্ষে তাহার পঞ্চমস্বরই নেশা; কমলাকান্তের পক্ষে আফিম। উভয়েই যে সাধনার কারণস্বরূপ এই নেশায় বিভোর হইয়া বিশেষ আনন্দ-স্বাদ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করে। এই যে উপভোগ, ইহার মধ্য দিয়া যেন উভয়েই অতৃপ্ত আকূতিসহকারে আরও আনন্দ আরও সুন্দরের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিযাছে। এই দুর্নিবার অভিযানে তাহাদের চিত্ত চির-আনন্দের শুদ্ধস্বরূপ সেই পরমেশ্বরের সাধনা করিতেছে। কমলাকান্তের হৃদয় মরমী আবেগে তাঁহাকেই ডাকে, কোকিলের কণ্ঠ তাঁহাকেই খোঁজে। কিন্তু তিনি কোথায়? এই অপরূপ জগৎ অন্তরে বাহিরে অফুরন্ত সৌন্দর্য বিকশিত করিয়া নিত্য বিরাজমান; তাহার অসীম বৈচিত্র্য আর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত কমলাকান্ত ভাবে তন্ময় হইয়া আছেন। ইহারই আত্মাস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিই সকল সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মূল। বর্ণে-গন্ধে, সঙ্গীতে-সৌন্দর্যে যে আনন্দের অমিযধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহা এই পরমানন্দ পরমেশ্বরেরই মধ্য হইতে উৎসারিত। বস্তুতঃ আনন্দস্বরূপ ভগবানই সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্যে আপনাকে আপনিই আস্বাদ করিয়া নিত্য আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। কমলাকান্ত এবং কোকিল তাই অজ্ঞাতসারে সেই আনন্দেরই অন্তিম উৎসের সাধক। তাহারা ভগবানকেই ডাকিতেছে।

(৬) জানিয়া ডাকি……দুই জনে পঞ্চমস্বরে ডাকি। (অ. ৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল'-শীর্ষক রচনা হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। কমলাকান্ত তাঁহার নিজের ও কোকিলের আনন্দ-সাধনার মর্ম বিবরণ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অংশটির অবতারণা করিয়াছেন।

কমলাকান্ত আফিমের নেশায় একাগ্র হইয়া আনন্দ-ধ্যানে মগ্ন থাকেন। বসন্তে পিককাকলীতে সেই আনন্দেরই আর একপ্রকারের সাধনা ব্যক্ত হয়। কোকিলের পঞ্চমস্বরে মুগ্ধ কমলাকান্তের মর্মমূলে আজ এই আনন্দ-সাধনার স্বরূপ কি তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল যেমন, তিনিও তেমন আনন্দস্বরূপ ভগবানেরই সাধক। সকল আনন্দের একমাত্র উৎস ভগবান, কারণ ভগবান আনন্দময়—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" (উপনিষৎ); সকল সৌন্দর্যের মূল তিনিই। কমলাকান্ত অতৃপ্ত বাসনাসহকারে সেই অপার অনন্ত আনন্দের শাশ্বত প্রস্রবণ ঈশ্বরেরই মধ্যে লীন হইতে চাহেন।

কোকিলেরও আকাঙ্ক্ষা তাহাই। কিন্তু উভয়েই হয়তো সজ্ঞানে সে সাধনায় মগ্ন নহে। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর; তাঁহার স্বরূপচিন্তা, তাঁহার সম্যক্ সাধনা সম্ভবও নয়। কাজেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আনন্দের এই যে 'আরও চাই', 'আরও চাই' বলিয়া অপার আর্তি—ইহা পরমেশ্বরেরই প্রতি পরোক্ষ আহ্বান। কারণ, একমাত্র তাঁহাকে পাইলেই, তাঁহাতে মিশিলেই অনন্ত অশেষ আনন্দকে পাওয়া হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান, ইহা কি ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবে? কমলাকান্তের বিশ্বাস নিশ্চয়ই পৌঁছিবে; কারণ, ভগবান যে সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী—তাঁহার কানে বিশ্বের শ্রুত অশ্রুত সকল শব্দই পৌঁছায়। অতএব কোকিলের কুহুরব যেমন, কমলাকান্তের হৃদয়কুহরে অনুরণিত আনন্দগুঞ্জনও তেমনি ভগবানের গোচরীভূত হইবে নিশ্চয়। তাই আজ হইতে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে কোকিলের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া কমলাকান্ত ভগবানকে ডাকিবেন।

(৭) কমলাকান্তের মনের কথা····· ডাক্ দেখি রে! (অ. ৯)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের রস-রচনা 'বসন্তের কোকিল' হইতে গৃহীত। কমলাকান্ত তাঁহার মনের কথাটিকে ভাষা দিয়া ভগবানকে নিবেদন করিতে পারেন না। সেই আক্ষেপেই আলোচ্য অংশটিতে তিনি অন্তর্গূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কমলাকান্তের কবিহৃদয় কখনও কখনও এক মরমী আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভগবানকে কি যে একটা বলিবার জন্য তাঁহার আকুলতা জন্মে। কিন্তু সে ভাব অনির্বচনীয়। তাহাকে প্রকাশ করিবার মতো মানুষের ভাষা নাই। কমলাকান্ত যদি কোকিলের মতো গাহিতে পারিতেন, তবে সুরের লীলায় হয়তো তাঁহার মনের কথাটি ছন্দিত হইয়া উঠিতে পারিত। গানের কথা বস্তু গৌণ, সুরটারই মধ্যে আনন্দ অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটে সর্বাপেক্ষা সার্থকরূপে। এই যে সুরের ভাষায় মনের ভাবকে মুক্তি দেওয়া, তাহা কেবল কোকিলের জানা আছে, কমলাকান্তের জানা নাই। কমলাকান্তের ভাষা মানুষের ভাষা—উহা জগৎসীমায় আবদ্ধ খণ্ডিত অভিজ্ঞতা ও অর্থ দিয়া ঘেরা। গানের সুরের মতো মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দলীলায় উহা বিহার করে না, নিগূঢ় মনের কথাকে উহা তাই ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। কমলাকান্ত সেইজন্যই নিজের কথাটি বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিলেন না, সে-কথা বলিবার কোনো ভাষা বা ব্যক্ত করিবার

মতো কোনো মাধ্যমও পাইলেন না। নীল আকাশে তারকার দেশে কোকিলের অমিয়মাখা যে তান একটা মূর্ছনা সৃষ্টি করে—আহা, কমলাকান্ত যদি সেই তান পাইতেন! পাইলে আকাশে উড়িয়া তারাদের সভায় তিনি প্রাণের কথাটি গানের সুরে ঢালিয়া দিতেন। কিন্তু তাহা তো এ জীবনে আর হইবার নয়। তাই কোকিলই কমলাকান্তের হইয়া 'কুহু'রবে গাহিয়া উঠুক—তাহার পঞ্চমস্বরের লীলায়িত ছন্দে মূর্তি দিক কমলাকান্তের হৃদয়তলের নিগূঢ় কথাটিকে। কমলাকান্ত সেই আকাঙ্ক্ষাতেই কোকিলের প্রতি আকুল আবেদন জানাইয়াছেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। 'বসন্তের কোকিল'-কে উপলক্ষ্য করিয়া কমলাকান্তের মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে কমলাকান্তের ভাবধারার ঘন ঘন পরিবর্তন বর্ণনা করিয়া উহার রস-সূত্রটি পরিস্ফুট কর।

উ.। **সমালোচনার** ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদ দেখ।

প্র. ৩। 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানবচরিত্রের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উ.। 'বসন্তের কোকিল'-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানীতে কথা বলিয়াছেন। প্রথমেই তিনি কোকিলকে সুখের দিনের সাথী, দুঃখে সঙ্গত্যাগী বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে মানবচরিত্রের একটা দিক্ তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যেও একশ্রেণীর লোক বসন্তের কোকিলের মতো কেবল সুখের সাথী। দুঃখের সময় তাহাদের কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চাকে যখন মধু থাকে তখন মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া জড় হয়; মধু ফুরাইলেই তাহারা কোথায় উড়িয়া যায়। সুখের দিনে সেইরূপ সম্পন্ন ব্যক্তির চারিদিকে শর্করালুব্ধ পিপীলিকাশ্রেণীর মতো স্বার্থপর মানুষের ভিড় হয়। তাহারা সঙ্গীতে, শ্লোকে আর অজস্র স্তুতিবাদে ধনাঢ্যের প্রসাদ নিঙড়াইয়া লয়। অথচ এই ধনাঢ্য ব্যক্তিটিরই যখন দুর্দিন উপস্থিত হয় তখন

তাহার পাশে তাহারই কৃপাপুষ্ট একজন সুখের পায়রাও আসিয়া দাঁড়ায় না। কমলাকান্তের বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদেরই মানবসমাজের বসন্তের কোকিল বলিয়াছেন। বসন্তের কোকিল মধুমাসে প্রকৃতির পুষ্পসৌরভ আর মধুসঞ্চয় ভোগ করিতেই আসে। শীতে বা বর্ষায় প্রকৃতির যখন দৈন্য, তখন কোকিলের দেখা পাওয়া যায় না। প্রকৃতির রাজ্যে কোকিল তাই সুখলিপ্সু, কৃতঘ্ন পাখী। মানুষের মধ্যেও এই প্রকৃতির অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর সুখসন্ধানী আছে। বসন্তের কোকিলের নিন্দাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তীব্র ব্যঙ্গে তিনি তাহাদের নির্লজ্জ ঘৃণ্য স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

কোকিল-প্রকৃতির বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মানবচরিত্রের আর একটি দোষেরও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। পরের অন্নে যাহারা পালিত তাহারা শুধু কৃতঘ্নই নহে, তাহারা পরশ্রীকাতর বিশ্বনিন্দকও বটে। দুনিয়ার ভালোটা তাহাদের চোখে পড়ে না। বাছিয়া বাছিয়া পরের ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা-রটনাই তাহাদের ধর্ম। যাহারা নীচ তাহারা সব-কিছুকেই হীনচক্ষুতে দেখে। কুৎসিত মানুষের দৃষ্টিটাও কুৎসিত—তাহাদের চোখে সবই খারাপ। ইহার মূলে আছে ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতা। যাহারা কুৎসিত তাহারা সুন্দরকে সহিতে পারে না। বিশ্বময় ফুলে ফুলে লতাপল্লবে শ্যামচিক্কণ সৌন্দর্যের হিল্লোল মলয়-পবনে লহরীচঞ্চল। ঘনশ্যাম স্নিগ্ধচ্ছায়ে লাবণ্যের অজস্র উৎসার—বকুলের পুষ্পবর্ষণে, গন্ধরাজের বিকচ হাস্যে লীলায়িত হয় সৌরভতরঙ্গ। শিশিরসিক্ত নবমল্লিকা গুণ্ঠন মোচন করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ করে; ভ্রমর মধুরগুঞ্জনে তাহার বরণোৎসব করে। বিশ্বে সৌন্দর্যের অপার স্রোত বাহিয়া যাইতেছে, তবু কোকিল ডাকিয়া বলিতেছে কু—পৃথিবীর সব-কিছু খারাপ। ইহার কারণ কোকিল নিজে কালো, নিজে খারাপ। কাকের বাসায় তাহার জন্ম, কাকের অন্নে সে পুষ্ট। এইরূপ পরান্নভোজী বিশ্বনিন্দক ও পরশ্রীকাতর মানুষেরও একই স্বভাব। তাহারা ভালো দেখে না, ভালো দেখিবার শক্তি রাখে না। সৌন্দর্য ও নির্মল আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা হইতে তাহারা বঞ্চিত।

কোকিলের পঞ্চমস্বর তবু মধুর। বস্তুতঃ এর স্বরমাহাত্ম্যেই কোকিলবিশ্বচিত্ত জয় করিয়া আসিয়াছে। কণ্ঠের মাধুর্য সত্যই মস্ত গুণ—ইহার জাদুপ্রভাবে

মানুষের মধ্যেও অনেকে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছে। জগৎটা আসলে গলার জোরেরই বশ। কিন্তু গলার সেই জোর চীৎকারে নহে, মাধুর্যে। গ্লাডষ্টোন আর ডিস্রেলী হইতে জগতের অসংখ্য সুকণ্ঠ বাগ্মী প্রধানতঃ এই কারণেই বড় হইয়া গিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে পৃথিবীতে সত্যের চেয়ে সঙ্গীত বেশী প্রভাবশালী। কটুকণ্ঠে প্রচারিত পরম সত্যও প্রতিষ্ঠা পায় না। মধুর ভাষণে অল্প সত্য, এমন কি সারবস্তুহীন কথাও জনচিত্ত অধিকার করিয়া বসে। মানুষ যে সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের ভক্ত ইহা তাহারই পরিচয়। মানবচরিত্রের এই দিকটা আশারই কথা। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের এই ধর্মটিও পরোক্ষভাবে এখানে খুলিয়া ধরিয়াছেন।

প্র. ৪। "যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই, অমানুষী ভাষা পাই...তবে মনের কথা বলি।" —কমলাকান্ত এখানে যে আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও। কেন তিনি 'কোকিলের কণ্ঠ' ও 'অমানুষী ভাষা' পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন?

উ.। ৭নং ব্যাখ্যা দেখ।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: উপর্যুপরি = উপরি + উপরি।

সমাস: মানুষ-কোকিলে—মানুষরূপ কোকিল (রূপক কর্মধারয়), তাহাতে। পারাবতকাকলীসংকুল—পারাবতদিগের কাকলী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); তাহার দ্বারা সংকুল (তয়াতৎপুরুষ)। পরান্ন-প্রতিপালিত—পরের অন্ন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ); তাহার দ্বারা প্রতিপালিত (তয়াতৎপুরুষ)। সৌন্দর্যশূন্য—সৌন্দর্যের দ্বারা শূন্য (তয়াতৎপুরুষ)। উপর্যুপরি-বিন্যস্ত—উপরি উপরি (দুই অব্যয়ের অব্যয়ীভাবে); উপর্যুপরি বিন্যস্ত (সুপ্ সুপা)। অসংখ্য—অবিদ্যমান সংখ্যা যাহাদের (নঞ্-বহুব্রীহি), তাহারা। ঘনবিন্যস্ত—ঘনভাবে (ক্রিয়া-বিশেষণ) বিন্যস্ত (সুপ্ সুপা)। মধুরশ্যামল—যাহা মধুর তাহাই শ্যামল (কর্মধারয়)। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—যাহা স্নিগ্ধ তাহাই উজ্জ্বল (কর্মধারয়)। শুদ্ধশরীরা—শুদ্ধ শরীর যাহার (বহুব্রীহি), সে (স্ত্রীলিঙ্গে)। সন্ধ্যাশিশিরে—সন্ধ্যা-কালীন শিশির (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। অকলঙ্ক—অবিদ্যমান কলঙ্ক যাহাতে (নঞ্-বহুব্রীহি), তাহা। নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত—নীল যে চন্দ্রাতপ

(কর্মধারয়), তাহার দ্বারা মণ্ডিত (তৃতীয়াতৎপুরুষ)। ভুবন-ভুলানো—ভুবনকে ভুলায় যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। সর্বশব্দগ্রাহী—সর্ব শব্দ (কর্মধারয়), তাহা গ্রহণ করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। কালামুখ—কালা মুখ যাহার (বহুব্রীহি), সে। প্রভাতনিদ্রাকে—প্রকৃষ্টরূপে ভাত প্রভাত (প্রাদি-তৎপুরুষ); প্রভাত-কালীন নিদ্রা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাকে। নীলাম্বর-মধ্যে—নীল অম্বর (কর্মধারয়), তাহার মধ্য (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তাহাতে। দক্ষিণ-বাতাস—দক্ষিণ হইতে আগত বাতাস (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মধ্যগত—মধ্যকে গত (দ্বযাতৎপুরুষ)।

সমস্তপদ-গঠন : সুখের স্পর্শে—সুখস্পর্শে। প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে—প্রস্ফুটকুসুমগন্ধে। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত—ঘোরনিদ্রাভিভূত। অকালে মৃত্যু—অকালমৃত্যু।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : হেটো, মেঠো—হাট, মাঠ+উয়া>ও। বৈঠক-খানা—বৈঠক+খানা। মুখরিত—মুখর+নিচ (নামধাতু)+ক্ত। জলন্ত—জ্বল্ (সংস্কৃত ধাতু)+অন্ত (বাঙলা কৃৎ)। জিত, ডাক্—জিত, ডাক+অ (উচ্চারণে এই অ-টি লুপ্ত)। গলাবাজি —গলা+বাজ=গলাবাজ, গলাবাজ +ই। প্রাখর্য—প্রখর+ষ্যঞ (য)।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন : যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপিড়ার সারি দেয় (জটিল)—নসীবাবু বাগানে যাইবার সময় মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপিড়ার সারি দেয় (সরল)।

নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল—নসীবাবুর পুত্রটি অকালে মারা গেল বা মরিল ('পুত্রটির' পদটিকে কর্তৃপদরূপে পরিবর্তন করিয়া)।

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি (জটিল)—সুন্দরকেই ডাকি (সরল)।

যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি (জটিল)—আমার ডাকের শ্রোতাকেই ডাকি (সরল)।

যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোনো কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন (জটিল)?—সর্বশব্দগ্রাহী কোনো কর্ণ থাকিলে, তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন (সরল)?—যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোনো কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক অবশ্যই পৌঁছিবে (নঞর্থ পরিহার করিয়া)।

আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না—আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারা গেল না (বাচ্যান্তর)।

যদি তোর এ ভুবন-ভুলানো স্বর পাইতাম তো বলিতাম (জটিল) - তোর এ ভুবন-ভুলানো স্বর পাইলে বলিতাম (সরল)।

কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে অকথিতই রহিয়া গেল ('না' বর্জন করিয়া)।

[উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০]

ব্যাকরণগত টীকা: শিহরিয়া -শিহর নামশব্দ, বিনা প্রত্যয়ে ইহাই নামধাতু + ইয়া)। বাঙলা নামধাতুজ ক্রিয়ার উদাহরণ।

কালো কালো—ঈষদর্থে বিশেষণের দ্বিত্ব হইয়াছে।

মুখরিত —প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজ বিশেষণের উদাহরণ।

গলাবাজিতে (উ মা ১৯৬০) প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। লক্ষণীয় যে শব্দটিতে পর পর বিভিন্ন অর্থে দুইটি তদ্ধিত-প্রত্যয়ের যোগ আছে—একটি বিদেশী 'বাজ', অপরটি বাংলা 'ই'। করণকারকে 'তে' বিভক্তি।

শাসিত—শাস + ক্ত = (সংস্কৃতে) শিষ্ট। কিন্তু বাংলায়, ভুল হইলেও, 'শাসিত' শব্দটি বহুপ্রচলিত। অথবা, শাস্ + ণিচ্ + ক্ত = শাসিত।

কারে—'রে' বিভক্তিচিহ্নটি বর্তমানে সাধু গদ্যে ব্যবহৃত হয় না, হয় পদ্যে। কিন্তু বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম প্রভৃতির যুগে অর্থাৎ বাঙলা গদ্যের গঠনের যুগে গদ্যে 'র' বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ দোষের বলিয়া ধরা হইত না।

বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ: ভিজিয়া গোময় হয়—চলিত ভাষায় ইহাই 'ভিজে গোবর হয়' এবং এইটিই বাঙলা ইডিয়াম। লেখক রসিকতার জন্য ইডিয়মটিকে সংস্কৃত রূপ দিয়াছেন। ইহার অর্থ—সর্বাঙ্গ-সিক্ত হওয়া।

থরহরি কম্প—ভয়ে বা শীতে দেহের যে কম্পন হয়, তাহা বুঝাইতে এই বিশিষ্টার্থক অংশের প্রয়োগ হয়।

বাক্য-রচনা দুলালী: ধনীর দুলালী দরিদ্রের ঘরের বধূ হইলে তাহার অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে

মুখরিত: দেশের আকাশ-বাতাস তখন লক্ষ কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত।

অবিশ্রান্ত: তিন দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হইল।

বিভোর: সদ্যবিবাহিতা বধূটি এখন দাম্পত্যসুখের স্বপ্নে বিভোর।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল : ঘরে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্নপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাজকন্যা নিদ্রা যাইতেছিলেন।

কলঙ্ক : বালিবধ রামচন্দ্রের অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে।

পূর্ণযৌবনা : দুষ্মন্ত যখন মৃগের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, শকুন্তলা তখন পূর্ণযৌবনা।

গলাবাজি : সভায় কাজের কাজ কিছুই হল না, হল শুধু ঘণ্টাতিনেক ধরে গলাবাজি।

তোতা-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

উৎস ও রচনা বিবরণ—'তোতা-কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গ্রন্থ হইতে সংকলিত। রচনাটি প্রথমে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্রে'র মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'লিপিকা' গ্রন্থে উহা স্থান পায়।

'তোতা-কাহিনী' রচনার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিখ্যাত স্যাড্‌লার কমিশনের (Sadler Commission) সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এ-সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তখন পর্যন্ত কেন, আজও শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত সমুচিত মর্যাদা লাভ করে নাই। 'তোতা-কাহিনী' লিখিবার অব্যবহিত প্রেরণা বোধ হয় স্যাড্‌লার কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎকারের কিছু পূর্বে দেশের মনীষিবৃন্দের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার চিন্তা আবার জাগিয়াছে। এনি বেসান্ত মাদ্রাজের আদেয়ারেতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার প্রেসিডেন্ট হইলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ, চ্যান্সেলার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মোট কথা, এই সময়টায় শিক্ষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়াছে তাহাই যেন তখন শিক্ষাক্ষেত্রেও কিছুটা মুখ ফিরাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইদিনেই প্রচলিত

শিক্ষার প্রহসনটিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন—এই 'তোতা-কাহিনী'র মাধ্যমে। তিনি স্যাড্‌লার কমিশনকে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই : শিক্ষার লক্ষ্য থাকা উচিত কি করিয়া জাতির চরিত্রগত বিশেষ শক্তি ও গুণগুলির বিকাশ সাধন করা যায়। বিশেষ করিয়া আবৃত্তি ও মুখে বলা গল্পের প্রতি আকর্ষণ, সঙ্গীতের প্রতিভা, এবং তাহার অতি উপেক্ষিত সেই হাতের কাজের মাধ্যমে ভাবকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা, তাহার কল্পনাশক্তি ও আবেগস্পন্দনের ক্ষিপ্রতা —এইগুলির পুষ্টির প্রতিই শিক্ষার একান্ত লক্ষ্য থাকা উচিত।

ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার মধ্যে এই আদর্শের নিতান্ত অভাবকেই রবীন্দ্রনাথ 'তোতা-কাহিনী'তে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

নামকরণ—'তোতা-কাহিনী'র কাহিনীটি হইল—একটা তোতাপাখির উদ্ভট শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাহার ফলে পাখিটার অপমৃত্যু। তোতাপাখি পরের বুলি না বুঝিয়া আওড়ায়। আমাদের দেশের ছাত্রগণও সেইরূপ নানা বিষয়ে পরের কথা আবৃত্তি করিতে শেখে। সেই সকল বিষয়কে যথারীতি আয়ত্ত করিয়া জীর্ণ করা তাহাদের সাধ্য হয় না। ইহার জন্য ছাত্রগণ দায়ী নহে, দায়ী সরকার ও সরকারী উদ্ভট শিক্ষাব্যবস্থা। তোতাপাখির সহিত সাদৃশ্যটাও ছাত্রদের অগৌরবের নহে। মুক্ত অবস্থায় তোতাপাখি গান গায়, আকাশে উড়িয়া স্বচ্ছন্দভাবে বাড়িয়া উঠে। স্বচ্ছন্দ শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররাও তেমনি বিকশিত হইতে পারিত। কিন্তু তোতা পাখিটিকে পুষিতে গিয়াই আমরা উহার আনন্দ ও বিকাশ একেবারে নষ্ট করিয়া দিই। এই গল্পের রাজার পোষা তোতাপাখিটার অপমৃত্যুতে এই সাধারণ সত্যেরই চরম পরিণতি দেখিতে পাই। আমাদের ছাত্রগণকেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তথা সরকার এমনিভাবে পোষা তোতা বানাইয়া হত্যা করিতেছে। অদ্ভুত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত মানুষ আত্মিক অপমৃত্যু বরণ করে। বস্তুতঃ একটা জীবন্ত তোতার অবস্থাও আর তাহাদের থাকে না—মনে-প্রাণে তাহারা সর্বৈব মৃত হইয়া যায়। তখন মরা তোতাটার মতো পেটে তাহাদের অজীর্ণ কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যা গজগজ করে। এই কথাটাই এই গল্পের বক্তব্য। গল্পটির শিরোনামের সঙ্গতি এইখানেই। শেখানো কথা না বুঝিয়া আবৃত্তি করে এমন পাখি একাধিক আছে। কিন্তু তোতা তাহাদের আদর্শ। মোট কথা, তোতা আর নির্বোধ মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি —একই অর্থ বহন করে। সেইজন্যই এই গল্পের শিরোনাম বিশেষভাবে ব্যঞ্জনাময়।

সমালোচনা—'তোতা-কাহিনী' কাহিনী-হিসাবে রূপকথার ছাঁচে ঢালা। কিন্তু রূপকথা শুধু ঐ ছাঁচ পর্যন্ত, বস্তুর দিক দিয়া ইহা একেবারেই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে না। প্রকৃত রূপকথা কল্পনালোকেরই কথা। উহা বাস্তব জগৎ হইতে কল্পনার পক্ষিরাজে চড়িয়া সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে গিয়া লীলাখেলা করে। রূপার কাঠির স্পর্শে উহা আমাদের বাস্তববোধকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। সেই অবস্থায় আমাদের পুঞ্জীভূত কামনা কল্পনালোকের স্বপ্নাবেশে যেন একপ্রকার পরোক্ষ তৃপ্তি লাভ করে। রূপকথায় তাই বিচ্ছেদ-বিয়োগের স্থান নাই। সহস্র বাধাবিপদের বেড়াজাল এড়াইয়া রাজপুত্তুর যেখানে রাজকন্যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিলনসুখে মগ্ন হয়। 'তোতা-কাহিনী' কিন্তু কঠোর বাস্তব। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার চরম ট্রাজেডিটাই এখানে ব্যক্ত। এই বাস্তব মূল্য ও এই বেদনা-বিধুরতা—দুইটাই—রূপকথার লক্ষণ-বহির্ভূত। 'তোতা-কাহিনী' তাই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে না।

আসলে ইহা অভিনব একটি ব্যঙ্গরচনা। ইহা রূপকথা নহে—রূপক। রূপক বলিয়া শিক্ষার অভিন্নমুখী বিচিত্র সমস্যার কথা তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে জটিলতার সৃষ্টি করেন নাই।

রূপকের আবরণে রবীন্দ্রনাথ এদেশে প্রবর্তিত বিলাতী শিক্ষাকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদগুলিকেই ব্যঙ্গের খোঁচায় আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই ব্যঙ্গের বস্তু-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই সমগ্র সমস্যাটাকে দেখিয়াছেন। এইজন্য এই ব্যঙ্গ-রূপকটি Political satire বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

রচনাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে বিশদভাবে উহার বস্তু-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহার প্রথম স্তবকে আছে—এদেশে বিলাতী শিক্ষা-প্রবর্তনে ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, সেই কথা। (১) "এমন পাখি তো কাজে লাগে না", ২) "বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়"—একটি বাক্যেরই এই দুইটি অংশে শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত ধরা পড়িয়াছে। আমরা জানি কয়েকটি মৌলিক নীতির দিক দিয়া লর্ড মেকলের বিখ্যাত Minute এবং চার্লস্ উড্-এর শিক্ষা বিষয়কDespatch—এই দুইটিই হইল ব্রিটিশরাজের শিক্ষানীতি ভিত্তিস্তম্ভস্বরূপ।

মেকলের বিবরণে আছে যে এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী করিবার জন্য এবং সুলভে সরকারী কর্মচারী পাইবার জন্য বিলাতী শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ ছাত্রের পূর্ণ বিকাশ নহে, তাহাকে কাজের উপযোগী করাই হইল এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। উড-এর বিবরণেও ইহার সমর্থন আছে। দ্বিতীয়তঃ, মেকলে বলিয়াছেন, উক্ত শিক্ষার দ্বারা ভারতবাসীকে বর্ণ ও রক্ত ভিন্ন নীতি, বুদ্ধি, মত ও রুচির দিক দিয়া ইংরেজে পরিণত করাই উদ্দেশ্য। উড্-এর বিবরণে এই উদ্দেশ্যের আবার আসল কারণ বিবৃত আছে। উহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, এই শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে বিলাতী মালের প্রায় অফুরন্ত চাহিদা হইবে। অর্থাৎ 'রাজহাটে' 'লোকসান' দূরের কথা, লাভ হইবে অপরিমেয়। সুতরাং বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে দেশবাসীকে ক্রমে জয় করিয়া তাহাদিগের মধ্যে দাসত্ব মজ্জাগত করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের রুচি পরিবর্তন করিয়া বিলাতী মালের প্রতি আকৃষ্ট করা--ইহাই হয় সরকারী দৃষ্টিকোণ হইতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উপযোগিতা। প্রথম স্তবকের ছদ্ম বিবরণে এই ইতিহাসটিই সংক্ষেপে প্রচ্ছন্ন দেখি।

দ্বিতীয় স্তবকে দুইটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। বিলাতী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এই কাজের ভার প্রথমে একটি কমিটি, পরে একজন শিক্ষা-অধিকর্তার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। প্রথম অবস্থায় এই ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইত তাঁহারা প্রায়ই শিক্ষাবিদ্ হইতেন না। কেবল ইংরেজ অর্থাৎ রাজার জাত বা ভাগিনা—সেই সুবাদেই যেন তাঁহারা শিক্ষার কর্তাকর্তা হইতেন। দ্বিতীয়তঃ, এই স্তবকে ব্রিটিশ আমলে এদেশের শিক্ষা-সম্বন্ধে অসংখ্য অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ ও তাহাদের সিদ্ধান্তের সারবস্তুটি বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধান্তটা হয় এই যে শিক্ষার কাঠামো ও পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা-সম্বন্ধে আজও একটা মত প্রচলিত আছে যে ইংরেজী পরিবেশ ব্যতীত যথার্থ ইংরেজীশিক্ষা হয় না। সুতরাং বাহিরের দিক দিয়া অন্ততঃ বিলাতী ঢঙে ইমারত ও পরিবেশ গড়িয়া শিক্ষার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিকে কৃত্রিম করিয়া তোলা হইল। দেশী চালায় আর শিক্ষা চলিল না। এই প্রসঙ্গে সরকারী শিক্ষাবিভাগের পক্ষ হইতে স্কুলবাড়ীর নমুনা-সম্পর্কে শর্তগুলি স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী বস্তুতঃ উহাই এককালে ভারতীয় ধারা ছিল এবং ভারতীয় জীবনের

সহিত একমাত্র উহাই ছিল নবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু বিলাতী শিক্ষা-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতির ছেদ পড়িল। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই পাখিকে বাসা হইতে আনিয়া খাঁচায় বন্দী করিবার পরিকল্পনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথ এই বিদেশী শিক্ষার একমাত্র উপকরণ অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহ-সম্বন্ধে বিবরণ দিয়াছেন। এই পাঠ্যপুস্তকগুলি হইতে বিলাতী বইয়ের নকলের নকল, তস্য নকল। আর তাহাদের পরিমাণ এত বেশী হইত যে ছাত্রের পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যা দুষ্পাচ্য হইয়া উঠিত। প্রথমে এই পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করিত দেশী স্কুল বুক সোসাইটিগুলি; পরে করিত শিক্ষাদপ্তরের গ্রন্থবিভাগগুলি। স্কুল বুক সোসাইটিগুলি কিছু কিছু সরকারী সাহায্য পাইত বটে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশ অর্থ জুটিত দেশের ব্যক্তিদের দান হইতে। যাহারা পুস্তক প্রণয়ন করিত, তাহারা ছিল নিছক নকলবিদ্যা-বিশারদ, অথচ পারিশ্রমিক বা পুরস্কার ছিল তাহাদের প্রচুর।

শিক্ষার খাতে সরকারী বরাদ্দ টাকাটা কিভাবে ব্যয় করা হইত তাহার বিবরণও এই স্তবকে আছে। এই ভাবে এই দিক দিয়া সরকার শিক্ষার নামে যথেষ্ট অপব্যয় করিত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার বাহ্য ও কৃত্রিম প্রয়োজন মিটাইতেও অজস্র টাকার শ্রাদ্ধ হইত। ইহাই—spending on bricks and mortar, বা ইট ও রাবিশের জন্য ব্যয়—বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ স্তবকে দেশবাসিকর্তৃক এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধ সমালোচনায় ব্রিটিশরাজের টনক নড়ায়, কিন্তু অচিরেই শিক্ষাবিভাগের উস্তরে আত্মতুষ্টির ভাব বিবৃত হইয়াছে।

পঞ্চম স্তবকে শিক্ষা-পরিদর্শনের প্রহসনটি বিবৃত হইয়াছে। এখানে স্বয়ং রাজারই প্রত্যক্ষ পরিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রাজার চক্ষু ও কর্ণ অনেক, রাজকর্মচারীরাই তাঁহার চক্ষুকর্ণ। সুতরাং পরিদর্শকদের মাধ্যমেই সরকার এই শিক্ষাকার্যের পরিদর্শন করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। অথবা ইহা সমাবর্তন উৎসব প্রভৃতি ব্যাপারে রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিদর্শনকেও বুঝাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বাহ্য আড়ম্বর ও সোরগোলটা এত বেশী হয় যে শিক্ষার্থীকে দেখা কখনো সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ একথা ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সরকার সত্যই শিক্ষার্থীদের প্রকৃতবিকাশ চাহে নাই।

এদেশের জীবন্ত ছাত্রগুলি যে মুখস্থবিদ্যার বস্তামাত্র হইয়া উঠিতেছে, ইহা সরকারের জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছানুযায়ীই ঘটিয়াছে। এই সত্যেরই ইঙ্গিত রাজার পাখিটাকে এবং তাহার শিক্ষার কায়দাটাকে দেখার মধ্যে নিহিত।

ষষ্ঠ স্তবকে শিক্ষার শেষ স্তরটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কৃত্রিম শিক্ষার ফলে মানুষের মধ্যে মুক্তিকামনার শেষ চেষ্টাকে কেমন করিয়া পিষিয়া মারা হয় তাহার বিবরণ পাই। স্বদেশী যুগের একটা সময়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ ও আন্দোলন দেখা দেয়। ব্রিটিশরাজ নির্মমভাবে তাহা দমন করে। এই প্রসঙ্গে কুখ্যাত 'রিজলী সার্কুলার' স্মরণীয়। ইহাতে একদিকে পুলিশ এবং অপরদিকে শিক্ষকবেশী খয়েরখাঁরা হয় সহায়।

সপ্তম স্তবকে শিক্ষার সমাধি। তোতা-পাখিরূপী ছাত্রদের নৈতিক মৃত্যুই এই শিক্ষার সবশেষ ফলশ্রুতি—ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

উপরের বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে 'তোতা-কাহিনী' একটা তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গ।

ইহার মধ্যে শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণাটিও কিছু কিছু ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সহজ শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ-সাধন। পাখি উড়িবার আগে গান গাহিবার শক্তি লইয়াই জন্মায়। পাখির পাখিত্ব পূর্ণবিকশিত হইবে তখন, যখন শক্তিগুলির যুগপৎ ও সম্যক্ স্ফুরণ ঘটিবে। সেইরূপ মানবশিশু কতকগুলি বিশেষ শক্তি লইয়া জন্মায়। বিশেষ দেশের বিশেষ কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ঝোঁকও তাহার মধ্যে ক্রমে গড়িয়া উঠে। এইগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হইল প্রকৃত শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার পরিবেশ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে প্রকৃতির মুক্তক্রোড়ই শিক্ষাকার্যের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ। অবশ্য ইহা দ্বারা তিনি মনুষ্যসমাজ-বহির্ভূত যে প্রকৃতি তাহাই বুঝিতেন না; পূর্বকালের আশ্রমের মতো, যে পরিবেশ স্বাভাবিক সুন্দর ও সমাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইটাই বুঝিতেন। পাখির পক্ষে খড়কুটার বাসাটি যেমন, পর্ণকুটীরবাসী সাধারণ ভারতীয়েরও তেমনি গাছের তলা আর চালার ছায়া শিক্ষার যোগ্যতম স্থান। ইহার সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের যোগ থাকে অথচ আনন্দও নষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের মতে যাহা চিন্তা ও কল্পনাকে স্বাধীনভাবে সক্রিয় হইতে সাহায্য করে তাহাই শিক্ষা। যে শিক্ষা মুখস্থবিদ্যার পরিপোষক,

সে শিক্ষা তোতার বুলি-শিক্ষারই তুল্য। উহা শিক্ষার বিকার এবং উহার ফল নৈতিক মৃত্যু।

চতুর্থতঃ, শিক্ষাব্যবস্থার শাসনতন্ত্র পুলিশতন্ত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সঙ্গত। ছাত্রের মনকে স্বাধীনভাবে মুক্তির আবহাওয়ায় সানন্দে বিহার করিতে দিলেই উহার পুষ্টি সম্ভব। এ বিষয়ে বাধা-আরোপ, শৃঙ্খলার নামে শিকলের শাসন-প্রবর্তন মারাত্মক বস্তু। শিক্ষা-জগতে শাস্তি নহে, একমাত্র অনুতাপের বিধি প্রচলিত করাই সঙ্গত। কিন্তু তাহার জন্য চাই শিক্ষকের তথা শিক্ষার সমস্ত ব্যবহারটার মধ্যে একটা নৈতিক শক্তির সঞ্চার। পুলিশের সহযোগিতায় যে সকল খয়েরখাঁ শিক্ষক স্বদেশী আন্দোলন দমন করে তাহাদের দ্বারা একাজ হইবার নয়। মোট কথা, শিক্ষা-জগতে সড়কির স্থান নাই, কলমের মাহাত্ম্যেই সেখানে ছাত্রশাসন সমাধা করিতে হইবে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষা অদ্যাবধি অতিরিক্ত ও বিকৃত শাসনে ছাত্রদের আধমরা নির্বিরোধ ভদ্রলোক করিয়া তোলে। ইহা শিক্ষা নয়, শিক্ষার নামে নর-হত্যারই নামান্তর। শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মোটামুটি এই কয়টা ধারণাই এই রচনায় পরোক্ষভাবে ধরা পড়ে।

সর্বশেষে রচনাটির ভাষা-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'তোতা-কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র অন্তর্গত। 'লিপিকা'র লেখাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'তোতা-কাহিনীর ভাষাতেও আমরা একথার সমর্থন পাই। ইহাতে মিল নাই, কিন্তু একটা অপূর্ব গদ্যছন্দ আছে। তাহা ছাড়া বিবরণের সাংকেতিকতা, সংযত ব্যঞ্জনা ও রস প্রাচুর্য ইহাকে কাব্য-আখ্যার সম্পূর্ণ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ব্যঙ্গ তীব্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির করুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমাদের মনের আকাশ আকুলিত করিয়া দেয়। ব্যঙ্গ প্রধানতঃ বুদ্ধির নিকট আবেদন বহন করে; উহা যখন হৃদয়কেও স্পর্শ করে, তখনই উহার চরম উৎকর্ষ সূচিত হয়। 'তোতা-কাহিনী' তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সংক্ষিপ্তসার—এক মূর্খ পাখি গান গাহিত, লাফাইত, উড়িত, কিন্তু শাস্ত্র পড়িত না এবং সভ্যতা-ভব্যতাও জানিত না। এমন পাখি কোনো কাজে লাগে না দেখিয়া রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন পাখির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে। শিক্ষা দেওয়ার ভার পড়িল রাজার ভাগিনাদের উপর। পণ্ডিতরা অনেক

বিচার বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভালো খাঁচা না হইলে পাখির অবিদ্যা ঘুচিবে না। স্যাকরা আসিয়া এক আশ্চর্য সোনার খাঁচা বানাইল। দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিল তাহা দেখিতে। শিক্ষার এই চূড়ান্ত ব্যবস্থায় তাহারা যারপরনাই সন্তোষ-প্রকাশ করিল। পণ্ডিত পাখিকে পড়াইতে বসিয়াই বলিলেন, অল্প পুঁথিতে চলিবে না। তখন পুঁথি লিখিবার জন্য লিপিকরেরা আসিল এবং পুঁথি নকল করিয়া স্তূপাকার করিল। খাঁচা মেরামত এবং তদ্বির-তদারকের জন্য বহু লোক, এবং তাহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য আরো বহু লোক লাগানো হইল। প্রচুর পারিশ্রমিক পাইয়া সকলেরই অবস্থা সচ্ছল হইল। দর্শকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে পাখির শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে।

নিন্দকেরা প্রচার করিল যে উন্নতি যাহা হইতেছে তাহা খাঁচার; পাখিটার খবরও কেহ রাখে না। কথাটার সত্যাসত্য জানিবার জন্য রাজা ভাগিনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাগিনা বুঝাইয়া দিল যে কথাটা আগাগোড়াই মিথ্যা; নিন্দকেরা খাইতে পায় না বলিয়াই মিথ্যা নিন্দা রটায়। সত্য কথাটা পণ্ডিত স্যাকরা, লিপিকর প্রভৃতিকে ডাকিলেই জানা যাইবে।

রাজা একদিন পাখির শিক্ষা দেখিবার জন্য পাত্র-মিত্র সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল, রাজানুগ্রহে পুষ্ট মিস্ত্রী-মজুর-স্যাকরা প্রভৃতির দল তুলিল জয়ধ্বনি। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে হাতিতে উঠিয়া যাইবেন এমন সময় নিন্দক জিজ্ঞাসা করিল, রাজামহাশয় পাখিটাকে দেখিয়াছেন কিনা। তাঁহার চৈতন্য হইল। ফিরিয়া তিনি পণ্ডিতকে শিক্ষাদানের কায়দাটা দেখাইতে বলিলেন। দেখিয়া খুশী হইলেন। কায়দাটা এত বড় যে পাখিটা তাহার মধ্যে গৌণ। দানাপানিহীন খাঁচায় রাশি রাশি পুঁথির পাতা কলমের ডগায় পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে; ফলে তাহার গান চীৎকার সবই বন্ধ হইয়াছে। খুশি হইয়া রাজা নিন্দকের কান মলিয়া দেওয়ার আদেশ দিলেন।

খাঁচার মধ্যে পাখিটা ক্রমে নিস্তেজ হইতে হইতে আধমরা হইল। তবুও সে মাঝে মাঝে প্রভাতের আলো দেখিলে ছটফট করে, শীর্ণ ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টা করে। এই বেয়াদবি ও অকৃতজ্ঞতা কোতোয়ালের বরদাস্ত হইল না। তাহার আদেশে পাখির ডানা কাটা গেল, পায়ে পড়িল শৃঙ্খল।

পণ্ডিত তখন এক হাতে কলম ও অন্য হাতে সড়কি লইয়া শিক্ষার মতো শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সকলের অজ্ঞাতসারে পাখিটা একদিন মরিল। নিন্দক কথাটা প্রচার করিয়া দিল রাজা ভাগিনাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাগিনা জানাইল যে, পাখিটার শিক্ষা এতদিনে সম্পূর্ণ হইযাছে—তাহার লাফানি, ওড়া, গান, দানাপানি না পাইলে চীৎকার, সবই বন্ধ হইয়াছে। রাজার আদেশে পাখিটাকে আনা হইল। তিনি টিপিযা দেখিলেন—পাখি কোনো সাড়াশব্দ করিল না; কেবল তাহার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস করিতে লাগিল। বাহিরের বসন্তের বনপ্রকৃতি যেন পত্রমর্মরে পাখির অপমৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করিল।

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

এক যে ছিল পাখি—পাখি বলিতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারতীয় ছাত্রকে বুঝাইতেছেন। রূপকথার ভঙ্গীতে তিনি কাহিনী আরম্ভ করিযাছেন। মূর্খ অর্থাৎ লেখাপড়া জানিত না। 'মূর্খ' শব্দের অর্থ বোকা। লেখাপড়া জানা লোকও মূর্খ হয, আবার লেখাপডা না-জানা লোকের মধ্যেও বুদ্ধিমানের অভাব নাই। কিন্তু মূর্খ আর অশিক্ষিত এখন সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই পাখিটা লেখাপড়া শেখে নাই, এই অর্থে সে ছিল মূর্খ। **সে গান গাহিত… পড়িত না**—পাখির পক্ষে গান গাহিতে পারা পরম শিক্ষা, শাস্ত্রপড়া তাহার কাজ নয়। যে পণ্ডিত শাস্ত্র পড়ে তাহার পক্ষে সঙ্গীতশিক্ষার দাবি কেহ করে না। তেমনি গাযকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞান আশা করা সঙ্গত নয়। সুতরাং পাখিকে শাস্ত্র পড়িতে হইবে এ দাবি হাস্যকর। ইহার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিতে চান যে, ছাত্রের চরিত্রগত বিশেষ শক্তিগুলির বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পাখিকে গান ভুলাইয়া শাস্ত্র পড়ানো আর ভারতীয ছাত্রকে বিদেশী বুলি মুখস্থ করানো—শিক্ষার বিপরীত পন্থা। **লাফাইত উড়িত** ইত্যাদি—গান গাওয়ার মতো লাফানো আর উড়িয়া বেড়ানোর মধ্যেই পাখির স্বাভাবিক বিকাশ। ভারতীয় ছাত্রের মধ্যেও এককালে তাহার প্রকৃতিগত গুণগুলির এইভাবে বিকাশ ঘটিত। বিলাতী সংস্কৃতি অনুযায়ী রীতিনীতি বা আচরণের কায়দাকানুন তখন তাহাদের জানা

ছিল না। **রাজা বলিলেন**—রাজা ব্রিটিশ শাসক ; এই "রাজা" কোম্পানীর আমল হইতে ইংলণ্ডের রাজার আমল পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারকে বুঝাইতেছেন। পরবর্তী অংশে রাজার মুখ দিয়া যে কথা বলানো হইয়াছে উহা প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষানীতির প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছে। **এমন পাখি তো কাজে লাগে না**—অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কোনো কাজে লাগে না। 'এমন পাখি' কৃত্রিম শিক্ষায় বঞ্চিত স্বাভাবিক পাখি অর্থাৎ ভারতবাসীকে বুঝাইতেছে। এই অংশটির মধ্যে কোন্ প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করেন তাহার ইঙ্গিত আছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলের এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্ সাহেবের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণীতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, স্বল্প বেতনে দেশী কর্মচারী-সৃষ্টিই ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং সরকারী কাজের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন হইল, ছাত্রের বিকাশের জন্য নহে। এখানে 'কাজে লাগে না' কথাটির তাৎপর্য স্পষ্ট। **অথচ বনের ফল খাইয়া… লোকসান ঘটায়**—মুক্ত অবস্থায় পাখি বনের ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। সেইরূপ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব-বিস্তারের পূর্বে ভারতবাসী নিজেদের দেশের মধ্য হইতেই ভাত-কাপড়ের অভাব মোচন করিত। তখন এদেশে ব্রিটিশ মালের তেমন একটা চাহিদা ছিল না। 'রাজহাটের ফল' এই ব্রিটিশ মাল। এই অংশটির মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্ সাহেবের শিক্ষা-বিষয়ক ডেসপাচ্ বা বিবরণীতে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এই শিক্ষা ব্রিটিশ মালের জন্য একটা অফুরন্ত চাহিদা গড়িয়া তুলিবে ("will secure to us...an almost inexhaustible demand for the produce of British labour")।

মন্ত্রী—কথাটি সম্ভবতঃ এদেশের বড়লাটকেই বুঝাইতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিলাত হইতে উড সাহেবের শিক্ষা-বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণী আসে তাহাই প্রায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত করে। উহাকে আমরা ব্রিটিশরাজ্যের (কোম্পানী) আদেশ বলিয়া গণ্য করিতে পারি এবং এই আদেশের উদ্দিষ্ট মন্ত্রী হইলেন ভারতের বড়লাট।

২। **রাজার ভাগিনাদের উপর ইত্যাদি**—শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ভার যাহাদের উপর পড়িল তাহাদের রাজার ভাগিনা বলার সার্থকতা আছে।

কোম্পানীর আমলে (১৮১৩-১৮৫৩ খ্রীঃ) শিক্ষা-বিষয়ে পরামর্শদাতা ও পরিচালক সমিতিগুলির মধ্যে প্রায়ই শিক্ষাবিদ্ থাকিতেন না, থাকিতেন সামরিক ও সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-দপ্তর-সৃষ্টির পরও শিক্ষক-অধিকর্তারূপে কদাচিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি আসিয়াছেন। তবে কোম্পানীর আমল মহারাণীর আমল—সকল সময়েই ইংরেজমাত্রই যেন শিক্ষার হর্তাকর্তা হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতেন। ইংরেজমাত্রই রাজার জাত। তাহাদের রাজার ভাগিনা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন ব্যঙ্গ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভাগিনারা প্রায়ই মামার সম্পত্তির অপচয় করে -এইরূপ একটা অপবাদ আছে। শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকার যাঁহারা অজস্র শ্রাদ্ধ করিতেন, তাঁহাদের রাজার ভাগিনা বলার ইহাও আর একটা তাৎপর্য হইতে পারে। **পণ্ডিতেরা**—পণ্ডিত বলিতে এখানে অধ্যাপক বা শিক্ষক বুঝাইতেছে না। ইঁহারা শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষা-সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের বিদ্রূপ করিয়াই 'পণ্ডিত' আখ্যা দিয়াছেন। **অনেক বিচার করিলেন**—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক নির্দেশ (Wood's Educational Despatch) প্রকাশের পরও ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান হয়। ভারত সরকার বিশেষ কর্মচারী ও শিক্ষা-তদন্ত সমিতির মারফত এই সকল অনুসন্ধান করাইতেন। এইগুলিকেই দীর্ঘকালব্যাপী 'অনেক বিচার' বলা হইতেছে। **উক্ত জীবের**—অর্থাৎ তোতা পাখিটার। ভারতীয় ছাত্র বা ভারতবাসীর প্রতীকরূপেই এই পাখিটি কল্পিত। **অবিদ্যা**—বিদ্যাহীনতা। দার্শনিক ভাষায় 'অবিদ্যা' কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে, উহা সেক্ষেত্রে সকল অজ্ঞানতাকেই বুঝায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে বিলাতী বিদ্যার অভাব অর্থেই কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। বিলাতী বিদ্যার অভাবে ভারতবাসী অজ্ঞান ছিল, একথা সত্য নয়। **খড়কুটা দিয়া পাখি ধরে না**—খড়কুটায় তৈরী বাসাটাই পাখির স্বাভাবিক আবাস, তেমনি ভারতবাসীর সাদাসিধা চালাঘর আর গাছের তলা—এইসবই ছিল শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্তনের সময় এই স্বাভাবিক পরিবেশ। উপযুক্ত বিবেচিত হইল না। ইহাই অংশটির অন্তর্নিহিত অর্থ। অংশটির মধ্যে দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি পাশ্চাত্যবাদীদের সেই ঐতিহাসিক অবজ্ঞার কথাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে এই লইয়া তুমুল মতবিরোধ চলে। মেকলের তীব্র আক্রমণ ও অর্থ-নৈতিক নানা কারণে ক্রমে প্রাচ্যবাদীরা ভাঙিয়া পড়েন। ইহার পর

শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে মোটামুটিভাবে দেশীয় শিক্ষা অবহেলিত হইয়াই আসিয়াছে। সেই অবহেলার কথাই এই অংশে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। **খাঁচা**—বিলাতী শিক্ষার কৃত্রিম পরিবেশ। পাখির পক্ষে খাঁচাটা কৃত্রিম বাসস্থান,—উহা তাহার নিকট কারাগার। ছাত্রের পক্ষে বিদেশী ছাঁচে গড়া বিদ্যায়তন-গুলিও সেইরূপ কৃত্রিম এবং জেলখানাস্বরূপ। **দক্ষিণা**—এখানে পারিশ্রমিক' পণ্ডিতদের বেলায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য দক্ষিণা বলা হইয়াছে।

৩। **স্যাকরা বসিল** ইত্যাদি—সোনার খাঁচা বানানো সাধারণ কামারের কাজ নয়, তাই স্যাকরার ডাক পড়িল। স্যাকরা বলিতে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সেকালের বড় বড় বিলাতী রাজমিস্ত্রী কোম্পানীকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ হইতে অসংখ্য কলেজ ও বিখ্যাত বিখ্যাত বিদ্যালয়গৃহগুলি তাহারাই নির্মাণ করে। তাদের নাকি স্যাকরার মতো নিপুণ কারিগরী। **খাঁচাটা হইল···ঝুঁকিয়া পড়িল**—শিক্ষায়তনগুলি ভাস্কর্যে ও কারুকার্যে বাহিরে এমন সুদৃশ্য হইল যে দেশবিদেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ব্রিটিশ-রাজ এই সব দিয়া ফলাও করিয়া তাহাদের সৎকাজের প্রচার করিতে লাগিল, তাহাতেই ভিন্ন দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। **হদ্দমুদ্দ**—একেবারে চূড়ান্ত। **শিক্ষা যদি নাও হয়** ইত্যাদি—পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তনকালে শিক্ষায়তনগুলির চেহারা বদলাইয়া গেল। বাহিরের দিক দিয়া তাহাদের সৌষ্ঠব যেন স্বর্ণময় হইয়া উঠিল। ইহাতে একদল লোক শিক্ষাব্যবস্থার খুব প্রশংসা করিলেন, অন্য আর একদল কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা ফ্রেম দেখিয়া ছবির বাহবা দিলেন না। আসল শিক্ষা কতদূর হইতেছে তাহাতে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল। তবু শিক্ষায়তনগুলির এই বাহ্য সৌষ্ঠবকে তাঁহারা প্রশংসা করিলেন। আর কিছু না হউক—ভালো বাড়ি ভালো আসবাব—এগুলি পাওয়াও ছাত্রদের ভাগ্য। এইটুকু অন্ততঃ তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইল। **পাড়ি দিল বাড়ির দিকে**—স্যাকরারূপী গৃহ নির্মাণকারীরা এত টাকা রোজগার করিল যে জীবনে আর যেন রুচি-রোজগারের প্রয়োজন থাকিল না। সুতরাং প্রচুর টাকা লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল। 'পাড়ি দিল' কথাটির মধ্যে সাগরপাড়ির যেন ইঙ্গিত আছে। বিলাতী কোম্পানীগুলিও কিভাবে টাকা লুটিয়া দেশে লইয়া গেল—এখানে তাহারই ইঙ্গিত। সরকার প্রকৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় না করিয়া এইভাবে তাহাদের উদরপূর্তি করিত। **অল্প পুঁথির কর্ম নয়**—দুইচারিখানা

বইয়ের নূতন শিক্ষার কাজ চলে না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তনে ছাত্রদের উপর যে অসম্ভব বইয়ের চাপ পড়ে, সেই শিক্ষা যে গ্রন্থসর্বস্ব হইয়া উঠে—এখানে তাহার প্রতি কটাক্ষ। পুঁথি-লেখকদের—যাহারা পুঁথি নকল করিয়া লেখে, তাহাদের। ইহারা গ্রন্থকার নয়। **পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া**—নূতন শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত হইতে থাকে—এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত। এগুলি ছিল মৌলিকতাহীন, ইংরেজী বইয়ের নকল মাত্র। এই কথার প্রমাণ পাই ঐতিহাসিক এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে: "In keeping with the aims of the new educational system the earliest books published were translations of well-known English books or treatises on subjects like history, algebra, geometry etc., that were being taught in the new system of schools............After 1855 the work was continued............by Government Book depots that come to be organised under the Education Departments." **বিদ্যা আর ধরে না**—বিদ্যার আর সীমা নাই। বইয়ের স্তূপ যত বড় বিদ্যাও তত বেশি—এইরূপ ধারণা যাহাদের তাহারাই এইরূপ বলিল। **পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া**—ইংরেজী বই নকল করিয়া যাহারা বই লিখিল তাহারা লিপিকর মাত্র, গ্রন্থকার নয়। কাজেই তাহাদের পারিশ্রমিক এত বেশী হওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু কার্যতঃ এই পারিশ্রমিক এত বেশি হইল যে বলদে বোঝাই করিয়া লইতে হইল। সরকারী অপচয়ের ইহা একটি উদাহরণ। দ্বিতীয়তঃ, পারিতোষিক বা পুরস্কার কথাটি পারিশ্রমিক অপেক্ষা সম্মানজনক। কিন্তু লিপিকর সে সম্মানের যোগ্য নয়। একথাটা সরকারী শিক্ষাবিভাগ না বুঝিয়া গ্রন্থকারজ্ঞানে নকলবিদ্যাবিশারদ-দিগকে প্রচুর অর্থে পুরস্কৃত করিত। 'বলদ বোঝাই করিয়া' কথাটির মধ্যে আরো একটা তীব্রতর আক্রমণও আবিষ্কার করা যায়। আমরা জানি এই সকল লিপিকর যেসব বই লিখিত তাহা সরকারী গ্রন্থবিভাগে জমা হইত। এগুলি তো বই নয়, কেবল কাগজের বস্তা, আর তাহা গ্রন্থবিভাগরূপ বলদের স্কন্ধে চাপিত। লিপিকারগণ এই বলদের পিঠে মাল বোঝাই করিয়াই খালাস। তারপর পুরস্কার লইয়া দিত চম্পট। কারণ, এই বইগুলি বড় একটা বিক্রী হইত না, তাহাতে সরকারের লোকসান হইত। সুতরাং এই লইয়া আবার জবাবদিহি করিতে বা অন্য কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, এই রকম একটা ভয়ে

যেন লিপিকারগণ ঘরের দিকে দৌড় দিত। অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ইত্যাদি—শিক্ষাবিভাগের পর্যবেক্ষণের কাজ কেবল বিদ্যায়তনগুলির বাড়িঘর শর্তমাফিক করিবার জন্য খবরদারিতে পরিণত হইল। বস্তুতঃ এজন্য সরকারী তহবিল হইতে খরচও হইত যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এগুলিকে অপব্যয় বলিয়াছেন। প্রকৃত শিক্ষাকার্যে এই টাকাটা ব্যয় হইত না। একথার ঐতিহাসিক নজির এই : "In England, where the inclemencies and uncertainties of weather are so great that a school cannot even start without a building of its own, the construction of school building was greatly emphasised............This emphasis was transferred to India also and the Education Departments spent large amounts in providing buildings for primary schools." লোক লাগিল বিস্তর ইত্যাদি—বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ ও তত্ত্বাবধারক প্রভৃতি কাজের জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হইল। তন্খা—তঙ্কা অর্থাৎ টাকা; বেতন। **তারা এবং তাদের মামাতো**···ইত্যাদি—শিক্ষাবিভাগের টাকা বিদ্যালয়সমূহের বাড়িঘর তৈয়ারির জন্য জলের মতো খরচ হইতে লাগিল। এই সকল কাজের নামে সরকারী কর্মচারীদের আত্মীয়পোষণ। (অর্থাৎ মামাতো পিসতুতো ভাইদের পোষণব্যবস্থা) সহজ হইল। সরকারী টাকায় তাহারা দোতালা কোঠাবাড়ি এবং তাহার মধ্যে গদিপাতা ফরাশ বিছাইয়া খুব জাঁকাইয়া বসিল।

৪। নিন্দুক আছে যথেষ্ট—নিন্দকের অভাব নাই—সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধ সমালোচকদিগকেই নিন্দক বলা যাইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাতীয়-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কংগ্রেসও শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি দাবি তুলিয়াছে। অন্যদিকে প্রচলিত শিক্ষার প্রতি অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে কয়েকটি নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার মধ্যে। **খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে···রাখে না**—বড়বড় বিদ্যালয় কলেজ প্রভৃতি গড়িতে থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে ছাত্রদের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে কিনা সে-খবর কেহ রাখিল না। বাহিরে বাড়িঘর পুঁথিপত্র প্রভৃতির আড়ম্বরই হইল সার, ছেলেদের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব হইল না। এই সমালোচনা সত্যই এককালে সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিল। **ভাগিনাকে ডাকিয়া**···

কথা শুনি—সরকার শিক্ষা-বিভাগের নিকট এই সমালোচনা-সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য জানিতে চাহিল। **মহারাজ, সত্য কথা যদি…মন্দ কথা বলে**—শিক্ষা-বিভাগ তাহাদের কৃপাপুষ্ট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্যনজির হাজির করিয়া সরকারকে বুঝাইয়া দিল যে সমালোচনাটা ভিত্তিহীন। তাহাদের মতে যাহারা সমালোচনা করে তাহারা নেহাত সরকার তথা শিক্ষা বিভাগের নিকট হইতে কোনো কৃপালাভ করে না বলিযাই মিথ্যা অপবাদ করে। এই প্রসঙ্গে লর্ড কর্জনের কথা স্মরণীয়। তিনি সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদিগকে একদল অকর্মণ্য বক্তৃতাপটু প্রস্তাব-রচনা-বিশারদ ব্যক্তি বলিযাই ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি তাঁহার শিক্ষিত প্রতিপক্ষকে সরকারী উচ্চপদ বা ব্যবস্থাপক সভার সভাপদের জন্য লালায়িত বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। ইঙ্গিতে তিনি এই কথাই বলিতেন যে, এই সকল সমালোচককে পদ বা অর্থের বিনিময়ে যখন ইচ্ছা কেনা যায়। **অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন**—শিক্ষা-বিভাগের উত্তরটা ব্রিটিশ সরকারের মনোমত হইত। শিক্ষা-সমালোচকদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করায় সরকার খুশি হইল। ভাগিনার গলায় হার চড়িল—অর্থাৎ, শিক্ষা-অধিকর্তাদের পদ ও খেতাব বাড়িল।

৫। **শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে**—শিক্ষা প্রক্রিয়াটি এক অর্থে বিকাশ বুঝায়। গাছপালা যেমন তেজের সহিত বাড়িয়া উঠে তেমনি শিক্ষা-কার্যও যেন অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। রাজার স্বয়ং দেখিবেন—ব্রিটিশরাজ স্বয়ং শিক্ষাকার্য পরিদর্শন করিয়াছেন, এমন ঐতিহাসিক নাজির নাই। এই অংশে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার আশ্রয় লইযাছেন। তবে একথা সত্য যে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লীদরবারে উপস্থিত হন এবং শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি ঘোষণাও করেন। মোটামুটিভাবে কমিশন কমিটি প্রভৃতির মারফতেই এই রাজকীয় পরিদর্শন ঘটিল—এইরূপ বুঝিতে হইবে। কর্জনের আমল হইতে এদেশে যে প্রবল শিক্ষা-আন্দোলন গড়িয়া উঠে, তাহার প্রভাবে ব্রিটিশরাজ শিক্ষাব্যবস্থা-সম্বন্ধে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের প্রযোজন বোধ করেন। ইহাই রাজার স্বচক্ষে শিক্ষাব্যবস্থা দেখার আগ্রহ বলা যাইতে পারে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, রাজকর্মচারীরাই রাজার চক্ষুকর্ণ। তাহাদের দ্বারা তিনি শিক্ষা পরিদর্শন করিবেন। **দেউড়ির কাছে**—প্রধান দরজার কাছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশাল শিক্ষায়তন কল্পনা করিয়াছেন। তাহারই সদর দরজার নিকটে দেউড়ির কাছে **জয়ধ্বনি তুলিল**—সরকারী

বিদ্যালয় পরিদর্শনের একটি আদর্শ চিত্র এখানে আছে। এই ব্যাপারে বাহ্য সমারোহটাই হয় বিপুল। বাদ্যভাণ্ড, আবৃত্তি, কোলাহল প্রভৃতির দ্বারা পরিদর্শককে একেবারে মোহিত করিয়া দেওয়া হয়। 'মন্ত্রপাঠ' কথাটির মধ্যে যেন মানবপত্রপাঠের ইঙ্গিত আছে। এগুলির মধ্যে প্রশস্তির উচ্ছ্বাস এত বেশী যে মন্ত্রের মতো পরিদর্শককে বশীভূত করে। **কাণ্ডটা**—ভাগিনারূপী শিক্ষা-অধিকর্তা কাণ্ডটা বলিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বুঝাইতেছেন। **শব্দ কম নয়**—রাজকীয় পরিদর্শক তাঁহার আগমন উপলক্ষে সমারোহের কাণ্ডটা লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিতেছেন। সেই সমারোহে শূন্যকুম্ভের বজ্রনাদের মতো শব্দই অর্থাৎ বাদ্যধ্বনি, বক্তৃতা ও জয়জয়কার প্রভৃতি হয় বেশী। **পিছনে অর্থও কম নয়**—শিক্ষা-বিভাগ এই শব্দকে অর্থহীন মনে করেন না। শব্দের গৌরব তাহার অর্থে। সেইরূপ পরিদর্শন উপলক্ষে এই যে শোরগোল ইহারও তাৎপর্য মহান্। দ্বিতীয় অর্থে, এই শব্দের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। ভাগিনারূপী শিক্ষা-অধিকর্তা যেন নিবোধ। শূন্যগর্ভ শোরগোলকে শিক্ষার প্রমাণ বলিয়া সে আত্মতুষ্ট। সুতরাং শব্দটা রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র সে পরম পরিতোষের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে. এজন্য প্রচুর ব্যয়ও হইয়াছে। ব্যয়ের মাত্রা বাড়িলেই শিক্ষারও সার্থকতা সেই পরিমাণে—এমনই যেন তাহার মনোভাব। **পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?**—উল্লিখিত রাজকীয় বা সরকারী পরিদর্শন-ব্যাপারে ছাত্রগণকে কেহ দেখে না। বাহিরের আড়ম্বর ও-ঘটাটা দেখাইতেই পরিদর্শনের কাজ সমাপ্ত হয়। সরকারী কমিশনগুলি অন্ততঃ ছাত্রদের প্রত্যেক সংবাদ লওয়ার কথা কখনো মনে রাখেন না। উদ্ধৃত প্রশ্নটির ইহাই ইঙ্গিত। **পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও·· দেখা চাই**—সরকার ছাত্রদের কতটা উন্নতি বা অবনতি হইতেছে তাহা কখনো দেখে না। সরকার পরিদর্শনের এই মৌলিক গলদ-সম্বন্ধে সমালোচনা হইলে কর্তৃপক্ষ কথাটাকে গুরুত্ব দিবার ভান মাত্র করেন। তাই পাখিরূপী ছাত্র নয়, পাখিকে (ছাত্রকে) কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেইটাই দেখিবার জন্য মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন। **কায়দাটা**—অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতিটা। **রাজা বুঝিলেন……ত্রুটি নাই**—সরকার বাহ্য ভড়ংটা বজায় রাখিতে আগ্রহশীল। সেদিক দিয়া আয়োজনের ত্রুটি নাই—এই দেখিয়াই সরকার তুষ্ট। কারণ, ছাত্রদের প্রকৃত উন্নতি কখনো ব্রিটিশ সরকারের ঈপ্সিত ছিল না। বাহিরের ঘটা-পটা দ্বারা যেটুকু রাজপ্রচার চলে, যেটুকু হইলে সস্তায় কর্মচারী আর মেকী ইংরেজ গড়িয়া তোলা যায়,

সেইটুকু মাত্র সরকার চায়। সুতরাং সেদিকে আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই দেখিয়াই সরকার খুশি। **খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই**—আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেহমনের পুষ্টির খোরাক নাই। পাখির পুষ্টির তথা জীবনের জন্য যেমন দানাপানি প্রয়োজন, ছাত্রের বিকাশ ও প্রাণশক্তির স্ফুরণের জন্য তেমন চাই উপযুক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় তাহার সর্বৈব অভাব। **কেবল রাশি রাশি···· ঠাসা হইতেছে**—এই অংশে এদেশের পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার প্রতি তীব্র কটাক্ষ রহিয়াছে। এই শিক্ষায় ছাত্রদের কেবল মুখস্থ করিতেই বাধ্য করা হয়। পাখির মুখে কাগজ-ঠাসা আর ছাত্রদের মুখে মুখস্থের উপকরণ বও ঠাসিয়া দেওয়া অর্থাৎ তাহাদের কেবল মুখস্থ করানো—এক কথা। এ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষায় এই মুখস্থ করাই হইয়াছে সারকথা। চিন্তায় কল্পনায় মননে আবিষ্কারে ছাত্রদের বিকাশ ঘটানো এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। **গান তো বন্ধই······রোমাঞ্চ হয়**—অতিরিক্ত মুখস্থবিদ্যার চাপে ছাত্রদের যে শোচনীয় অবস্থা তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে। পাখির মুখে কাগজ ঠাসিতে থাকিলে তাহার গান করার তো উপায় থাকেই না, এমন কি ইহাতে দম আটকাইয়া আসার উপক্রম হইলেও সে চীৎকার করিয়া যাতনাটা ব্যক্ত করিতে পারে না। ইহা দেখিলে ভয়ে গা কাঁটা দিয়া উঠে। ছাত্রদের অবস্থাটা এমনই বিভীষিকাময়। পরীক্ষাপাসের জন্য মুখস্থের চাপে তাহাদের সহজ আনন্দ (গান যাহার অভিব্যক্তি) নষ্ট হইয়াছে, ক্রমে তাহাদের জীবনান্ত দশা উপস্থিত হইযাছে। **কানমলা-সর্দারকে···· মলিযা দেওয়া হয়**—শাস্তির জন্য যাহারা অপরাধীর কান মলিয়া দেয় তাহাদের সর্দার অর্থাৎ শাসন-বিভাগকে সরকারশিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধসমালোচকদিগকে দাবাইয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন।

৬। **ভদ্র দস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল**—বিকৃত শিক্ষার প্রভাবে তোতাপাখিরূপী ছাত্রগণ প্রায় মরার মতো হইয়া আসিল। নিরীহ ও গোবেচারী এই আধ-মরা অবস্থাটাকে এদেশে তখন ভদ্রতা বলা হইত। অন্যায়ের যে প্রতিবাদ করে না, যাতনায় যে নড়ে না, কেবল মুখ বুজিয়া সব সহিয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হইত অতিশয় ভদ্রলোক। দাস মনোভাবকেই এভাবে ভদ্রতা আখ্যা দেওয়া হইত। **স্বভাবদোষে সকাল বেলার আলোর দিকে··· · ঝটপট করে**—প্রাতের আলোকে উড়িয়া যাইবার জন্য পাখির মধ্যে একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তিই তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি। কাজেই

প্রতিদিন প্রভাতে আলো দেখিলেই পাখি ডানা নাড়িয়া উড়িতে চাহিত। কর্জনের আমলে এই পাখিরূপী ছাত্রদলের প্রাণেও স্বদেশী যুগের প্রথম আলো স্পন্দন জাগায়। বয়সের ধর্মে তাহারা সাড়া দিয়া উঠে, আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়। এখানে এই কথাটারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। **রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার** ইত্যাদি—খাঁচায় বদ্ধ তোতাপাখিটা দানাপানি না পাইয়া আধ-মরা হইয়া আসিয়াছে। তবু প্রভাতের আলোক দেখিয়া একদিন সে খাঁচায় শলা কাটিয়া আকাশে উড়িতে চেষ্টা করিল। এই এই বিবরণের মধ্যে কর্জনী আমলে ছাত্রদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কাহিনী উহ্য আছে। খাঁচারূপ কৃত্রিম শিক্ষার কারাগার ভাঙিয়া ফেলায় উদ্যম একদিন সত্যই আমাদের হইয়াছিল। সত্যই একদিন তাহারা শিক্ষায়তনের বাহিরে আসিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। **কোতোয়াল বলিল,... ...বেয়াদবি**—এই বিবরণের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশের উপদ্রবকাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে। কোতোয়াল পুলিশ-বিভাগেরই কর্তা। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ কোতোয়াল বলিতে এখানে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রিজলী সাহেবকেই বুঝাইতেছে। ইনি তাঁহার কুখ্যাত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এই নির্দেশ দেন যে, ছাত্ররা যেন সভাসমিতিতে যোগ না দেয়. দিলে কড়া শাসন করা হইবে। ইতিহাসে এই বিজ্ঞপ্তি 'রিজলী সার্কুলার' নামে পরিচিত। ছাত্ররা যে আন্দোলন করে, খাঁচায় বদ্ধ পাখিটার উড়িবার প্রয়াস তাহারই সূচক। ইহাতে রিজলী তথা সরকার বেয়াদবি মনে করিলেন। **লোহার শিকল তৈরী হইল**—লোহার শিকল বলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বুঝাইতেছে। কর্জনের আমলে এই সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কড়া হইয়া উঠিল, কারণ ব্রিটিশরাজ ভাবিয়াছিল যে—"the men and women who came out of English Schools and Colleges would ever remain grateful and loyal to England...... ...But what they now found was that the average educated man became a discontented critic of British Rule. They suggested, therefore, that government should control *them* (schools) rigidly and improve their discipline and the character of their students." **ডানাও গেল কাটা**—ডানা কাটিলে পাখির উড়িবার ক্ষমতা নষ্ট হয়। তেমনি ছাত্রের তারুণ্য ও সকল স্বাধীনতা বোধ করিয়া

তাহার পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অসাধ্য করিয়া তোলা হইল। **রাজার সম্বন্ধীরা**—এদেশের খয়েরখাঁদিগকে সম্বন্ধী বলিয়া প্রকারান্তরে গালি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সম্বন্ধীরা যে খয়েরখাঁ তাহা তাহাদের পরবর্তী অন্ধ রাজভক্তিমূলক মন্তব্যেই প্রকাশ।

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম···শিক্ষা—একদল শিক্ষক তখন কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। শিক্ষকের হাতে কলমই শোভা পায় অর্থাৎ লেখাপড়া করা ও করানো এইটাই তাঁহাদের কাজ। ।কন্তু সরকারের গোপন নির্দেশে কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদমনে লিপ্ত হইলেন, অর্থাৎ কিছুটা পুলিশের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। ঢাল বল্লম আর সড়কি প্রহরীর হাতে থাকে। শিক্ষকও এক হাতে সেইরূপ সড়কি লইয়া রাজদ্রোহী ছাত্রদের দমনকার্যে লাগিয়া গেলেন। এইভাবে একদিকে শিক্ষকের কাজ আর একদিকে পুলিশের কাজ করিয়া তাঁহারা যেরূপ শিক্ষাকার্য করিতে লাগিলেন তাহা শিক্ষার চূড়ান্ত বিকার। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। **কামার**—নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিব্যবস্থা-রচয়িতা। কোতোয়াল—এখানে পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা। কামারের পসার······শিরোপা দিলেন—শিক্ষাবিভাগের কড়া নিয়ম-রচয়িতা ব্যক্তিগণ ও পুলিশের কর্তারা ছাত্রদমনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় নানাভাবে পুরস্কৃত হইলেন। শিক্ষা-বিভাগের পক্ষে বিকৃত নিয়ম-শৃঙ্খলার কড়াকড়ি যাহারা উদ্ভাবন করিল অন্য সময় তাহাদের উপযোগিতা ছিল না। এইবার তাহাদের আদর হইল, পসার বাড়িল। রুজি রোজগারও তাহাদের বাড়িয়া গেল, কাজেই তাহাদের গিন্নিদের গহনা বাড়িল। অন্যদিকে পুলিসের কর্তারা অর্থের দিক দিয়া না হউক, খেতাব ও সম্মানের দিক দিয়া প্রচুর লাভবান হইলেন।

৭। **পাখিটা মরিল**—পাখীরূপী ভারতীয় ছাত্রের আত্মিক মৃত্যু ঘটিল। **পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে**—পাখিরূপী ছাত্রের আত্মিক মৃত্যুকে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার পূর্ণতা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল। কারণ, এদেশে ব্রিটিশ সরকারের কাম্য ছিল নৈতিক দিক দিয়া ছাত্র-বধ, ছাত্রের কায়মনে বিকাশ নহে। শিক্ষা-বিভাগ সেই উদ্দেশ্যই সাধন করিল কৃত্রিম শিক্ষা ও ছাত্রশাসনে অস্বাভাবিক দমননীতির দ্বারা। কাজেই সমালোচকরা যাহাকে মৃত্যু বলিল, শিক্ষা-বিভাগ তাহাকেই শিক্ষার পূর্ণতা বলিল। **রাজা শুধাইলেন, 'ও কি**

আর লাফায়' ইত্যাদি—রাজার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী উদ্দেশ্যটি ধরা পড়িয়াছে। লাফানো, উড়া, গান গাওয়া, দানাপানির জন্য চীৎকার করা—পাখির এই চারিটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মৃত্যু হইলেই নষ্ট হয় ছাত্রের মধ্যেও স্বাধীনভাবে নাচিয়া-খেলিয়া বেড়ানো, তারুণ্যের আদর্শবাদিতায় মুক্তির জন্য উড়িয়া চলা, প্রাণের আনন্দে গাহিয়া উঠা আর কায়মনে বিকাশের জন্য পুষ্টির দাবি করা—এগুলি আত্মিক মৃত্যু হইলেই নষ্ট হইয়া যায়। বিকৃত শিক্ষার দ্বারা সরকার ছাত্রদের সেই মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দিয়াছে। ফলে ছাত্ররা আনন্দ ও আন্দোলন ভুলিয়াছে—এককথায় সর্বদিকে নৈতিক মৃত্যুবরণ করিয়াছে। এই কথাটাই রাজা ও তাঁহার ভাগিনার মধ্যে প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত।

কিশলয়গুলি—কচি কচি পাতাগুলি। **মুকুলিত বনের আকাশ**—বসন্তকালে বনের গাছে গাছে নূতন পাতা আর ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়াছে। সমগ্র বনটি এইভাবে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। **বাহিরে নববসন্তের…আকুল করিয়া দিল**—ছাত্রের অপমৃত্যুতে কেবল বন-প্রকৃতির কচিপাতাগুলি মলয়-শিহরণে পত্রমর্মরে যেন গভীর দুঃখ ব্যক্ত করিল। ছাত্রগণ মানবশিশু, কচিপাতা বনপ্রকৃতির শিশু। মানুষ ও বনপ্রকৃতি—সবে মিলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি। ইহার মধ্যে নানাজাতীয় নানা শিশুরা যেন খেলার দোসর। তাই একজনের বিয়োগে অন্যের ব্যথা। কিন্তু মানুষ ছাত্রমৃত্যুর এই করুণ ট্র্যাজেডিটা লক্ষ্য করিল না।

ব্যাখ্যা

(১) রাজা বলিলেন, "এমন পাখি…লোকসান ঘটায়।" (অ. ১)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'র অন্তর্গত। এই অংশে রবীন্দ্রনাথ এদেশে বিলাতী শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে প্রথমে কি প্রেরণা ছিল তাহাই রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কবি একটি তোতাপাখিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মুক্ত অবস্থায় তোতাপাখি খুশিমতো লাফাইয়া উড়িয়া বেড়ায়, স্বচ্ছন্দভাবে মনের আনন্দে গান করে, আর বনের ফল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এইরকম স্বাধীন পাখি দিয়া চাকরের কাজ করানো যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বনের ফল খাইলে সাজানো বাগানের ফল বাজারে বিকায় না। রূপক ভাঙিয়া বলিলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে, বিলাতী শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত এদেশের মানুষ ছিল স্বাধীনচিত্ত;

পরের চাকুরী করার স্পৃহা বা যোগ্যতা কোনোটাই তাহাদের ছিল না। দ্বিতীয় কথা, তাহারা তাহাদের সাবেকী প্রয়োজন দেশের মধ্য হইতেই আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত, বিদেশী মালের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র নজর থাকিত না। এই দুইদিক দিয়া ব্রিটিশরাজের অসুবিধা হইল। বিলাতী শিক্ষা দ্বারা তাই সরকার এদেশের একটা শ্রেণীকে বিলাতীভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে দেশের লোক মেকী ইংরেজ বনিয়া চাকুরী করিতে শিখিবে, দাসত্ব তাহাদের মজ্জাগত হইয়া যাইবে। তারপর বিলাতী শিক্ষায় বিলাতী রুচি গড়িবে এবং সেই রুচির তাগিদে লোকে বিলাতী বাজারে পণ্য ক্রয় করিবে। এই দুই প্রয়োজনে ব্রিটিশরাজের পক্ষে এদেশে বিলাতী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রেরণা জাগে। রবীন্দ্রনাথ তোতার কাহিনীতে সেই ঐতিহাসিক সত্যটিই এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন।

(২) সিদ্ধান্ত হইল, ...খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। (অ. ২)

রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' হইতে অংশটি উদ্ধৃত। বিলাতী শিক্ষা প্রবর্তনের সময় ব্রিটিশরাজের বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ অনুসন্ধানের পর শিক্ষার পরিবেশ-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এই অংশে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ব্রিটিশ শাসন তথা ব্রিটিশ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদেশে প্রথমে বিলাতী শিক্ষার প্রবর্তন হইল। শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথ একটি তোতাপাখিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তোতাপাখি খড়কুটা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে এবং সেখানে বাস করিয়া নৃত্য গান আর মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দবিহার শিক্ষা করে। তোতাপাখির জীবনে ইহার অধিক আর শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে রাজার হুকুমে তাহাকে যেন ভিন্নভাবে তৈয়ারি করার প্রয়োজন হইল। তাহাকে মুখস্থ বুলি আওড়াইতে হইবে, মানুষের মন যোগাইয়া দাসত্ব করিতে হইবে। সুতরাং তাহার শিক্ষায় এবং বহু অনুসন্ধানের পর সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম সোপান-হিসাবে পাখিটাকে খাঁচায় বন্ধ করা আবশ্যক বোধ হইল। রূপক ভাঙিয়া বলিলে ব্যাপারটার অর্থ এই হয়: দেশের চালাঘর আর গাছের ছায়ায় টোল, চতুষ্পাঠী আর চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালা—এই ছিল এককালে শিক্ষা পরিবেশ। এদেশের ছেলেরা সেইখানেই বাড়িয়া উঠিত, সেইখানেই শিক্ষা পাইত। ইহাতে তাহাদের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকিত। কাজেই

তাহাদের শিক্ষা, আর যাহাই হউক, কৃত্রিম হইত না। এইবার ব্রিটিশরাজের বিশেষজ্ঞরা সর্বপ্রথম ছাত্রদের এই পরিবেশ হইতে ছিনিয়া আনিয়া বিলাতী ইমারতের কৃত্রিম পরিবেশে আটকানো প্রয়োজন বোধ করিলেন—ভারতবাসী শিশু-শিক্ষার্থীকে তাঁহারা গোড়া হইতেই একটা বিলাতী আবহাওয়ায় ময়ূরপুচ্ছ-ধারী কাক তৈয়ারি করিতে প্রয়াসী হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষার উপকরণ বা প্রকরণের প্রথা প্রথমে মনে পড়িল না। মনোযোগ পড়িল পরিবেশটাকে আমূল বদলাইয়া দেওয়ার দিকে। তাঁহাদের পরিকল্পিত এই বিদেশী পরিবেশ স্বভাবতই কৃত্রিম খাঁচার মতো, তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দলীলার ক্ষেত্র সীমবদ্ধ। এইপ্রকার পরিবেশ-রচনার অজুহাতও এতটা জটিল এই যে, বিলাতী কায়দায় বাড়িঘর না হইলে আধুনিক বিজ্ঞানাদি বহু বিদ্যার অধ্যাপনা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সাবেকী ধরণের শিক্ষায়তনে নূতন ও বিস্তর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া চলে না। সুতরাং শিক্ষায়তন অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশটা বদলানোই সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া সাব্যস্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ রূপকচ্ছলে এখানে এই কথাটাই বুঝাইতেছেন।

(৩) লিপিকরের দল ...ঘরের দিকে দৌড় দিল। (অ. ৩)

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'র অংশ। এদেশে বিলাতী শিক্ষার প্রথম পর্বে যে সকল পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন হয় তাহাদের রচয়িতাদিগের প্রতিই এই অংশের ব্যঙ্গটি উদ্দিষ্ট।

বিলাতী আদর্শে নূতন শিক্ষার যখন প্রবর্তন হইল, তখন রাশিরাশি পুস্তকের প্রয়োজন দেখা দিল। এই কথাটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম একটা শ্লেষ আছে। বিলাতী শিক্ষা পুঁথিসর্বস্ব, মনন ও কল্পনার পুষ্টি তাহার লক্ষ্য নহে। মানুষকে কায়মনোবাক্যে বিকশিত করিতে হইলে শুধু পুঁথিতে হয় না। তাহার জন্য খেলাধুলা হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি নানা কাজের আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু বিলাতী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের ছাত্রকে মুখস্থবিদ্যার বস্তায় পরিণত করা। সুতরাং বহু পুঁথির প্রয়োজন। এই সকল পুঁথি-পুস্তক প্রস্তুতের ভার লইল যাহারা তাহারা কেবল বিলাতী বইয়ের নকলের নকল, তস্য নকল করিয়া কাজ সারিল। ইহাতেই সরকার তুষ্ট। এই গ্রন্থকারদের সরকার প্রচুর পুরস্কার দিলেন,—এত দিলেন যে বলদে বোঝাই করিয়া তাহাদের সেই পুরস্কারের টাকা বাড়ি লইয়া যাইতে হইল। রবীন্দ্রনাথ

ইহাদের লিপিকর মাত্র বলিয়াছেন। আসলে তাহারা নকলকারীই বটে। নকলের এত পারিশ্রমিক হয় না। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ তাহাদের গ্রন্থকার জ্ঞানে, পারিশ্রমিক নহে, দক্ষিণা (পারিতোষিক) দিতেন অকৃপণ হস্তে।

উদ্ধৃত অংশটির অন্য একটি অর্থ হয়। এখানে প্রথম বাক্যের প্রথম অংশে আছে—'লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল,' দ্বিতীয় অংশে আছে—'বলদ বোঝাই করিয়া'। এই দ্বিতীয় অংশের অর্থ 'বলদ বোঝাই করিবার জন্য' (• করিয়াও)—এইরূপ হয়। শিক্ষা-দপ্তরের গ্রন্থবিভাগটি এই বলদ, তাহাতে এই পুঁথির বস্তা বোঝাই করা হইত এবং তাহাদের বিনিময়ে লিপিকরেরা প্রচুর অর্থ পাইত। তারপর—অর্থ পাওয়ামাত্র—তাহারা উধাও হইত। কারণ এই বইগুলি তো বই নয়, নকল-করা কাগজের বস্তামাত্র, কাজেই প্রায়ই এগুলি বিক্রি হইত না। শিক্ষা-দপ্তরের গ্রন্থবিভাগে সেগুলি জমিয়া থাকিত, অর্থাৎ ঐ গ্রন্থবিভাগরূপ বলদটি এই আবর্জনার বোঝা বহিয়া মরিত। কাছে থাকিলে শিক্ষা-বিভাগ পাছে আবার এই লিপিকারদের কোনো ঝঞ্ঝাটে ফেলে এই ভয়ে তাহারা যে যার ঘরে সরিয়া পড়িত।

(৪) জবাব শুনিয়া রাজা··· সোনার হার চড়িল। (অ ৪)

এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী'র অংশ। সেকালে নবপ্রবর্তি • বিলাতী শিক্ষার বিরুদ্ধ-সমালোচনার কিরূপভাবে কণ্ঠরোধ করিয়া দেওয়া হইত সেই বর্ণনা-প্রসঙ্গেই বাক্যটি প্রযুক্ত।

ব্রিটিশরাজকে মামা কল্পনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাদিগকে ভাগিনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কারণ, মামার ধন অপচয় করিবার সর্বাপেক্ষা এই অগ্রাধিকার ভাগিনাদের। একথাই এদেশের লোক-প্রসিদ্ধি। এই ভাগিনারূপী শিক্ষা-অধিকরণের কর্তাদের তত্ত্বাবধানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে না—একদা এইরূপ একটা সমালোচনা ব্রিটিশরাজের কর্ণগোচর হয়। সমালোচকদের অভিযোগ এই যে শিক্ষার বাহ্য আড়ম্বর যতটা, শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উপকার তাহার তুলনায় নগণ্য। ব্রিটিশ-রাজের ধারণায় সেই উপকারটা যেমন হওয়া সঙ্গত—সে বিষয়ে হয়তো সমালোচকরা ভিন্নমতই পোষণ করিত। মোটের উপর সমালোচনাটি কড়া ও অপব্যয়-সংক্রান্তও বটে। সুতরাং সরকার তখনি শিক্ষার অধিকর্তাদের নিকট খোঁজ নিলেন। অধিকর্তা (সরকারী ভাগিনা) জবাব দিলেন, অভিযোগটা

একবারে মিথ্যা। অভিযোগকারীরা এইরূপ ধুয়া তুলিয়া আন্দোলন করে—নেহাত খাইতে পায় না বলিয়া। ইহার অর্থ এই যে এই সকল সমালোচক যেন সরকারের কৃপাবঞ্চিত বলিয়াই মিথ্যা চেঁচামেচি করে। কিছু কৃপা পরিবেশন করিলেই যেন তাঁহাদের মাথা কিনিয়া শান্ত করা যায়। এই জবাবে ব্রিটিশরাজ স্বভাবতঃই তুষ্ট হইলেন। কেননা 'নেটিভ' বা এদেশীয় লোকদের সম্বন্ধে ব্রিটিশরাজের ইহার চেয়ে উচ্চ ধারণা ছিল না। বিশেষতঃ শিক্ষা-অধিকরণ সাক্ষী-হিসাবে তাহাদেরই কৃপাপুষ্ট শিক্ষক, গ্রন্থকার, ইমারত-প্রস্তুতকারী প্রভৃতিকে দাঁড় করায়। এক হিসাবে তাহারাই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী, কেননা তাহারা শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ইহার পর ব্রিটিশ সরকার ইহাই স্পষ্ট বুঝিয়া লয় যে, সমালোচকরাই দোষী; শিক্ষা-অধিকরণ প্রশংসার কাজ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে খেতাব, উচ্চতর পদ প্রভৃতির প্রতীক সোনার হার পুরস্কার হিসাবে চড়ে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার গলায়। রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণের মধ্যে কোনো বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত করেন নাই। ইহার মধ্য দিয়া তিনি সর্বনাশা শিক্ষা-বিভাগের প্রতি সরকারী বদান্যতার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

(৫) খাঁচায় দানা নাই……ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা (অ. ৫)

এই অংশটি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'তোতা-কাহিনী'র অন্তর্গত। এদেশে কৃত্রিম শিক্ষার প্রাণান্তকর চাপে ছাত্রদের মুমূর্ষু অবস্থাই অংশটির প্রকৃত বর্ণনার বিষয়। রূপকের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষার শোচনীয় পরিণতিটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ব্রিটিশরাজ যেন তাঁহার তোতাপাখিটার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে আসিয়াছেন। তোতাপাখিটা হইল এদেশের ছাত্রদের প্রতীক। উহার শিক্ষার জন্য বাহ্য সমারোহের অন্ত নাই। তাহার সোনার খাঁচা হইয়াছে, খাঁচার মধ্যে দানাপানির বদলে রাশি রাশি বইয়ের পাতা জমিয়াছে। তোতার শিক্ষকেরা কলমের ডগা দিয়া পাখির মধ্যে সেই বইয়ের পাতা ঠাসিয়া দিতেছে। ফলে পাখিটার আর বাহির হইবারও জো নাই, গান তো দূরের কথা। মুখের মধ্যে এমনভাবে কাগজ ঠাসিয়া দেওয়ায় পাখিটার দম আটকাইয়া আসার কথা। কাজেই যাতনায় যে সে একটু চীৎকার করিবে সে উপায়ও নাই। রূপক মোচন করিলে এই বিবরণের মধ্যে দেখিতে পাই, উল্লিখিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের কেবল cramming শিখাইয়াছে। কোনো রকমে মুখস্থ

করিয়া পাস করাই এই শিক্ষার সর্বার্থসার। ছাত্রদিগের অন্যের লেখা অন্যের কথা বইয়ের পাতা হইতে প্রাণপণে মুখস্থ করিতে বাধ্য করা আর বইয়ের পাতা তাহাদের মুখের মধ্যে ঠাসিয়া দম আটকাইয়া দেওয়া—একই কথা। উভয়ই মৃত্যুর কারণ। তোতাপাখির পুষ্টির পক্ষে দানাপানির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাহার আনন্দলীলার। গান গাওয়া আর উড়িয়া বেড়ানো বন্ধ করিয়া দিলে তাহার অর্ধেক প্রাণ মরিয়া যায়। দানাপানির বদলে বইয়ের শুকনা পাতা তোতার খোরাক হইতে পারে না, তাহাতে পাখিটার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি ছাত্রমনের সহজ আনন্দ ও স্বাভাবিক পুষ্টির ব্যবস্থা না থাকিলে তাহারও মৃত্যু অনিবার্য। সেই আনন্দ সেই পুষ্টি আছে স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনায়—দেহমনের সবকয়টা বৃত্তির স্বাভাবিক লীলায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষার কেবল স্মৃতিশক্তির উপরই চাপ অর্থাৎ মুখস্থবিদ্যার প্রকোপ। ফলে ছাত্রদের মুমূর্ষু দশা। রবীন্দ্রনাথ রূপকচ্ছলে দেশের ছাত্রদের এই যে শোচনীয় চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

(৬) তবু স্বভাবদোষে সকাল···চেষ্টায় আছে। (অ. ৬)

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' হইতে উদ্ধৃত। ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রবৃন্দের দেহের প্রাণশক্তি কিরূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া আনিল, সেই বর্ণনা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশের রূপকটির প্রয়োগ করিয়াছেন।

এদেশের ছাত্রদের প্রতীক তোতাপাখিটা বহুকাল কৃত্রিম শিক্ষার ফলে আধমরা হইয়া আছে। নির্জীব নির্বিরোধ গোবেচারী ভাবকে তখন ভদ্রতা বলা হইত। বস্তুতঃ এই ভদ্রতা দুর্বলতারই নামান্তর। তোতাপাখিটার সেই পোষমানা ভাব, দাসশাস্ত্রে যাহা ভদ্রতা বলিয়া আখ্যাত, তাহা ক্রমে পূর্ণ হইতে চলিল। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে সকালের আলোক দেখিলে তাহার মধ্যে সহজাত উড়িবার প্রবৃত্তিটি মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। তখন সে পাখা নাড়িত মুক্তির চেষ্টা করত। কদাচিৎ এমনও হইয়াছে যে, সে তাহার দুর্বল ঠোঁটে খাঁচার শলা কাটার চেষ্টাও করিয়াছে। পাখিটা জন্মসূত্রে যে সকল প্রবৃত্তি পাইয়াছিল তাহা একেবারে মরিয়া যায় নাই,—এত শিক্ষার পরও সেগুলির ক্ষীণ অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। উপরের ঘটনাটি তাহারই প্রমাণ। তোতা-পাখিটা আসলে এদেশের ছাত্রদের প্রতীক মাত্র। বেন্টিঙ্কের কাল হইতে

কর্জনের কাল পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত শিক্ষায় দেশের ছাত্রমন সম্পূর্ণ বিজিত হয় নাই। তাই মাঝে মাঝে এদেশের ছাত্ররা মুক্তির জন্য জাতীয় শিক্ষার ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিত। সত্য বটে, বহুকাল কু শিক্ষার ফলে ছাত্রমন অনেকটা আধমরা হইয়া গিয়াছিল, তথাপি প্রভাতের আলোর মতো স্বদেশী যুগের প্রভাব তাহাদের তরুণচিত্তে সাড়া জাগাইত, আর সেই সাড়াতেই তাহারা ক্ষীণ হইলেও মুক্তির প্রয়াস করিত। ইহা তরুণের স্বাভাবিক ধর্মেরই অভিব্যক্তি। শিক্ষার চাপে এই ধর্ম তখনও মরিয়া যায় নাই। এককালে সেইজন্য সরকারের ছাত্রদলননীতি উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এইসব ঐতিহাসিক সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ রূপকের আবরণে এখানে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

(৭) তখন পণ্ডিতেরা……যাকে বলে শিক্ষা পৃ. ৬

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' হইতে উদ্ধৃত। রূপক-বিবরণের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রিটিশরাজ কর্তৃক কুখ্যাত ছাত্রদলননীতির কথাটিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কর্জনের আমলের আগে-পরে এদেশের ইতিহাসে একটা নবজাগরণের সাড়া পড়ে। কর্জনের শিক্ষা-সংস্কার এবং তৎপরে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের ছাত্ররা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এই রূপক-কাহিনীতে ছাত্রদের প্রতীক তোতাপাখিটার খাঁচার শলা কাটিবার প্রয়াস—সেই কথাটাই বুঝাইতেছে। ছাত্রদের এই আন্দোলন সরকারকে বেশ বিচলিত করে। তখন শৃঙ্খলার নামে তাহাদের পায়ে কড়া নিয়মের শিকল পরাইবার চেষ্টা হয়। শিক্ষায়তনের মধ্যে স্বাধীন আলোচনা প্রায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই সর্বতো-মুখীন ছাত্রদলের সহায় হয় এদেশেরই কতকগুলি খয়েরখাঁ, আর দেশী-বিদেশী একশ্রেণীর শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ এই খয়েরখাঁদের ব্রিটিশরাজের সম্বন্ধী বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। উহাদের রাজভক্তি যতটা না থাকুক, তোষামুদি ল্যাজ-নাড়াটা ছিল প্রচুর। তাই সরকারী নীতির সমর্থন করিয়া তাহারা বলে—ব্রিটিশরাজ এদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, কোনপ্রকার আন্দোলন সঙ্গত নয়। সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাত রিজলি সার্কুলার বাহির হয়। শিক্ষকরা কার্যতঃ গোয়েন্দাগিরি ও পুলিশের কাজে নিযুক্ত হয়। এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে তীব্র ব্যঙ্গ

করিয়াছেন। শিক্ষকের কাজ কলম-চালানো, আর পুলিশের বা কোটালের কাজ ঢাল-সড়কি লইয়া শাসন ও দমন করা। শিক্ষকরা একহাতে কলম আর একহাতে সড়কি লইয়া তাই যেন যুগপৎ শিক্ষার ও পুলিশের কাজ আরম্ভ করিল। এইপ্রকার শিক্ষক যে-শিক্ষার বাহক, তাহাকে ব্রিটিশরাজ যথার্থ শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা শিক্ষার শোচনীয় বিকার। ছাত্রশাসনের এই পুলিশতন্ত্র বাস্তবিক ঘৃণ্য এবং বিগত দিনে যাহারা ইহার সহায় হইয়াছিল, তাহারা ঘৃণ্যতর। ইহাই এখানে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ বক্তব্য।

(৮) বাহিরে নববসন্তের·········আকুল করিয়া দিল। (অ. ৭)

এই পঙ্‌ক্তি-কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'র অন্ত্য অংশ। ব্রিটিশরাজ-প্রবর্তিত কৃত্রিম শিক্ষার সুদীর্ঘ প্রকোপে দেশের ছাত্রদের শেষ পর্যন্ত নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহা দেশবাসী যেন অনুভব করে নাই। কেবল প্রকৃতির ক্রোড়ে বসন্তের কিশলয় ও মুকুলগুলিই যেন এই মর্মন্তুদ ঘটনায় বেদনায় মর্মবিত হইয়াছে।

এদেশের ছাত্রদের প্রতীক তোতাপাখিটা সহজ আনন্দ ও অত্যাবশ্যক পুষ্টির অভাবে মারা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুবর্ণনার মধ্য দিয়া দেশের ছাত্রদের সমূহ নৈতিক মৃত্যুই ঘোষণা করিয়াছেন। এত বড় একটা ট্র্যাজেডি চোখের সামনে ঘটিয়া যাইতেছে দেখিয়াও কিন্তু দেশবাসীর মূঢ় চেতনায় আঘাত লাগে নাই। এই কথাটাই এখানে তিনি পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। ছাত্রগণ মানবজীবনের তরুণ কিশলয় ও বসন্তের মুকুলস্বরূপ। প্রকৃতির রাজ্যে বসন্তের সমারোহে গাছের কচিপাতাটি আর ফুলের-কাঁচা কুঁড়িটির মতো এই মানবশিশুগুলিও আনন্দের উপকরণ। উহাদের নিরাপদ নিষ্ঠুর জীবনাবসান তাই বৃক্ষশিশুদের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। খেলার সাথীর মৃত্যুতে যেমন একটা অশ্রু-উচ্ছ্বাস ব্যথায় গুমরিয়া উঠে, তেমনি একটা বেদনায় বাসন্তী কচিপাতাগুলি তাহাদের খেলার দোসর এই মানবশিশুগুলির অপমৃত্যুতে যেন কাঁদিয়া উঠিল। দখিনা-বাতাস তাহাদের হৃদয়ের গভীর হইতে সেই রুদ্ধ ক্রন্দনকে বাহির করিয়া পত্রমর্মরে আর শূন্য নিঃস্বনে যেন ছড়াইয়া দিল। বনতরুর শাখায় প্রশাখায় পর্বে পর্বে মুকুল বাহির হইয়াছে বসন্তের শুভাগমনের; সেই সুন্দর বন আর তাহার উপরে মুক্ত আকাশ—সবসুদ্ধ প্রকৃতি যেন সেই করুণ দীর্ঘশ্বাসের গভীর ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিল।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'টি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

উ.। **সংক্ষিপ্তসার** দেখ।

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'-শীর্ষক রচনাটির শিরোনামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উ.। **নামকরণ** দেখ।

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'র বস্তু-বিশ্লেষণ করিয়া রচনাটি যে ব্যঙ্গরচনা, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উ.। **সমালোচনা**-র তৃতীয় অনুচ্ছেদ হইতে শেষের দুই অনুচ্ছেদ বাদে সবটুক লেখ।

প্র. ৪। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'টি কি রূপকথা? রচনাটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত উল্লেখ করিয়া মন্তব্য কর।

উ.। **সমালোচনা**-র প্রথম ও দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি লেখ।

প্র. ৫। 'তোতা-কাহিনী'র মধ্যে শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি কি ধারণা ও মতের পরিচয় পাওয়া যায়? আলোচনা কর।

উ.। **সমালোচনার**-র সর্বশেষের পূর্ব অনুচ্ছেদটি দেখ।

প্র. ৬। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'টির রূপক মোচন করিয়া উহার অর্থটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উ.। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'র তোতাপাখিটা এদেশের ছাত্রের প্রতীক বা প্রতিনিধি। এদেশে ব্রিটিশরাজ-কর্তৃক বিলাতী শিক্ষাব্যবস্থা, 'তোতা কাহিনী' লিখিবার সময় হইতে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে প্রবর্তিত হয়। এই শিক্ষার নিষ্পেষণযন্ত্রে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার ছাত্রগণ বংশ-পরম্পরায় হীনবল হইয়া অবশেষে কিরূপভাবে নৈতিক মৃত্যু বরণ করে, তাহাই তোতা-পাখিটার মৃত্যুর মধ্যে দেখানো হইয়াছে।

সরকারী দৃষ্টিকোণ হইতে এই শিক্ষা-প্রবর্তনের তাগিদ আসে শাসনকার্য-চালনার সুবিধার জন্য। সরকার দেখিল, 'দেশের লোককে ইংরেজী শিখাইতে

পারিলে সস্তা বেতনে কর্মচারী পাওয়ার সমস্যাটাও মিটিবে, আর এই ইংরেজী-শিক্ষিত দেশী লোকদের সাহায্যে দেশে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধাও হইবে।'* এই সত্যটাই তোতা-কাহিনীর প্রথম স্তবকের বিবরণে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। রাজা বলিলেন, এমন পাখি তো কাজে লাগে না। অতএব তাহাকে শিক্ষা দাও। দ্বিতীয়তঃ, দেশী লোকের রুচি না বদলাইলে বিলাতী পণ্য বিকায় না। তাই রাজা বলেন, পাখিটা 'বনের ফল খাইয়া রাজহাটের ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়'। কাজেই শিক্ষার সাহায্যে তাহাদের রুচি বদলাইতে হইবে—ইহাও বিলাতী শিক্ষা-প্রবর্তনের দ্বিতীয় প্রেরণা। বেণ্টিঙ্কের আমলে মেকলে স্পষ্টই এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসী শুধু নামে আর রঙেই ভারতবাসী হইবে, কিন্তু মনেপ্রাণে ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহারা হইবে ইংরেজ।'

দ্বিতীয় স্তবকের মূল বক্তব্য হইল এই যে, পাকাপাকিভাবে ইংরেজী-শিক্ষার পত্তনের সময় সরকার প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন এবং নূতনভাবে বিলাতী ছাঁচে শিক্ষার পরিবেশটি রচিত হইল। খড়কুটায় তৈয়ারী বাসাটা যুগপ্রাচীন দেশী পদ্ধতিকেই বুঝাইতেছে। খাঁচাটাই হইল নূতন শিক্ষার পরিবেশ। ইহাকে খাঁচা বলার সার্থকতা এই যে, এই ব্যবস্থায় ভারতীয় ছাত্রগণ স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে সরিয়া আসিয়া খাঁচার মতো কৃত্রিম পরিবেশে বাঁধা পড়িল, তাহাদের স্বাধীন বিকাশ রুদ্ধ হইল, সমাজ ও জীবনের সহিত যোগ হইল ছিন্ন। এই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, তাহার উদ্ভাবনের জন্য বহু অনুসন্ধান-কমিটি ও কমিশন বসিয়াছিল। সেই কথাটাই পণ্ডিতদের অনেক বিচার করার বিবরণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, এই শিক্ষা-পরিচালনার ভার পড়িল অমিতব্যয়ী ও শিক্ষাবিষয়ে অপটু ব্যক্তিদেরই উপর। রাজার ভাগিনা তাহারাই। ভাগিনামাত্রই এদেশে মাতুলসম্পত্তির অপচয়ের অপবাদ রাখে। এখানে তাই রাজকীয় ভাগিনারাও যে সরকারী অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল সেই সত্যটার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তৃতীয় স্তবকের প্রথম ভাগে বিলাতী শিক্ষার যোগ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা বিবৃত হইয়াছে। এখানে সম্ভবতঃ সেকালের স্কুল বুক সোসাইটিগুলি ও সরকারী গ্রন্থবিভাগগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ আছে। সোসাইটিগুলি

* আমাদের শিক্ষা—শ্রীঅনাথনাথ বসু।

ও গ্রন্থবিভাগগুলির গ্রন্থপ্রণেতারা বিলাতী পুস্তকের নকলের নকল করিয়াই পুস্তকপ্রণয়নের কর্তব্য শেষ করিতেন। ইহার জন্ত তাঁহারা মোটা পুরস্কার পাইতেন। এই স্তবকের দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থের অপচয়ের নমুনা বিবৃত হইয়াছে। আসল শিক্ষাকাযের জন্য নহে, যতসব বাজে তত্ত্বাবধারক আর ইট কাঠ ইমারতের জন্যই সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ হইত, আজও হয়। এই কথাটাই এই অংশে ধরা পড়ে।

চতুর্থ স্তবকে উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাকে কেমন করিয়া মুখচাপা দেওয়া হইত, তাহার নমুনা পাই। শিক্ষা-অধিকরণ এইরূপ সমালোচনার উত্তরে তাঁহাদেরই কৃপাপুষ্ট শিক্ষক, গ্রন্থকার প্রভৃতির সাক্ষ্য হাজির করিতেন। ইহারা শিক্ষার সহিত যেমন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, শিক্ষা-অধিকরণের নিকটও তেমনি প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। কাজেই সত্যকথাটা তাহাদের সাক্ষ্যে থাকিত না। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ সমালোচকদের কৃপাবঞ্চিত ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারী বলিয়া নিন্দা করিত। 'খাইতে পাই না বলিয়াই মন্দ কথা বলে'—এই কথাটার অর্থ এই যে খাইতে দিলেই সমালোচকদের কেনা যায়, তাহাদের মুখ বন্ধ করা যায়। ব্রিটিশ সরকার 'নেটিভ'দের সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বেশি ভাল ধারণা পোষণ করিত না। কাজেই সরকারী শিক্ষা-বিভাগের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের অধিকতর পুরস্কৃত করিত, অর্থাৎ ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়াইত।

পঞ্চম স্তবকে যে শিক্ষার পরিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে উহার সহিত ইতিহাসের কোনো বিশেষ ঘটনার যোগ নাই। সাধারণভাবে স্কুল-পরিদর্শনরীতির একটা নমুনা ইহাতে আছে। এই পরিদর্শনের সময় বাহ্য সমারোহে পরিদর্শনের আসল বস্তু ছাত্রটিই ঢাকা পড়ে। আর ছাত্র যে দেখার মতো অবস্থায় নাই সেই কথাটাও এই স্তবকে ব্যক্ত। বিলাতী ও বিজাতীয় শিক্ষায় মুখস্থবিদ্যাই হয় পরীক্ষাপাসের একমাত্র সহায়। মুখস্থ করিয়া ছাত্ররা, মুখে বইয়ের পাতাঠাসা তোতাপাখিটার মতো শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছায়। পাসের তাগিদে তাহাদের এই যাতনাকর অবস্থা মানিয়া লইতে হয়। ইহার বিরুদ্ধে রা-টি করিবারও তাহাদের উপায় থাকে না।

ষষ্ঠ স্তবকে দেখানো হইয়াছে বিকৃত শিক্ষার প্রকোপে ছাত্রদের প্রাণশক্তি কেমন লোপ পাইয়া আসে। ছাত্ররাই আধমরা তোতাপাখিটা। এই নিষ্প্রাণ দুর্বলতাকে সরকারী সংজ্ঞায় ভদ্রতা বলা হইত। দেশের অভিভাবকরাও তাহা

মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী যুগের প্রভাব প্রভাতের আলোকচটার মতো তরুণের প্রাণে একদিন দিল নাড়া—তোতাপাখিটার প্রভাতী আলোর প্রেরণায় পাখার ঝটপট ও খাঁচার শলাকা ভাঙার উদ্যমে এই কথাটারই ইঙ্গিত। শিক্ষা তখনও তরুণের বয়োধর্মকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই তাহারা আন্দোলনের পথে পা বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের স্বৈরাচার দেখা দিল শিক্ষায়তনে। শৃঙ্খলার কড়া নিয়ম পরাইয়া দেওয়া হইল তাহাদের পায়ে পায়ে। নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে তাহাদের ডানার ঝটপট অর্থাৎ মুক্তির জন্য ক্ষীণ প্রয়াস করিবার শক্তিটুকুকে পর্যন্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই উদ্দেশ্যে কর্জনী আমলে সরকারের সচিব বিজ্‌লীর কুখ্যাত ঘোষণাটি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। ইহার দ্বারা সরকার শিক্ষকদের কলমপেষার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের খবরদারিতেও নিযুক্ত করিল। 'পণ্ডিতেরা একহাতে কলম আর একহাতে সড়কি লইয়া' শিক্ষাকার্য চালাইলেন। ইহার চেয়ে লজ্জার আর কিছু হইতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদলের এই কুৎসিত কাহিনীটির বীভৎসতাই এই স্তবকের মূল বর্ণনীয়।

সপ্তম স্তবকে ব্রিটিশরাজ-প্রবর্তিত শিক্ষার ইপ্সিত ফল কল্পিত হইয়াছে। এই শিক্ষায় ছাত্রদের নৈতিক মৃত্যুই তোতাপাখিটার অপমৃত্যুতে বর্ণিত হইয়াছে। পাখিটার শিক্ষা তখনই পুরা হইয়াছে যখন সে আর লাফায় না, উড়ে না, গান গায় না এবং দানাপানির জন্য চীৎকার করে না, অর্থাৎ যখন উহার মৃত্যু হইয়াছে। ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার পূর্ণতাও তখন, যখন তাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া, মনন ও কল্পনায়, এককথায় নৈতিক বিকাশের জন্য সকল ক্ষুধা বিসর্জন দিয়া মুখস্থবিদ্যার নির্জীব বস্তায় পরিণত হইবে। ইহাই এদেশে প্রবর্তিত বিলাতী শিক্ষার সর্বশেষ পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ এই স্তবকের শেষে একটিমাত্র বাক্যে এই পরিণতির শোচনীয়তা অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। মানবশিশু এই ছাত্রদল প্রকৃতির রাজ্যের শ্যাম কিশলয়ের মতো অন্যতম সম্পদ। কৃত্রিম শিক্ষার প্রকোপে তাহাদের যে অপমৃত্যু হইতেছে ইহাতে আমাদের দেশবাসীর হুঁশ নাই, কিন্তু প্রকৃতি এই দুর্বিষহ ও মর্মন্তুদ ঘটনায় যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসে মর্মরিত হইয়া উঠে।

তোতা-কাহিনীর রূপক মোচন করিলে মোটামুটি এই অর্থই ব্যক্ত হয়।

ব্যাকরণ ও রচনা

সন্ধি: ঘোড়সওয়ার=ঘোড়া+সওয়ার (বাংলা সন্ধি)।

সমাস: কায়দাকানুন—কায়দা এবং কানুন (দ্বন্দ্ব)। পর্বতপ্রমাণ—পর্বত প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণ যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। লিপিকরের—লিপি করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ), তাহার। শিক্ষাশালায়—শিক্ষার জন্য শালা অর্থাৎ গৃহ (৪র্থীতৎপুরুষ), তাহাতে। মৃদঙ্গ—মৃৎ অর্থাৎ মাটির অঙ্গ যাহার (বহুব্রীহি), তাহা [খোল এর দেহটি মাটি দিয়া তৈয়ারী হয়]। কান-মলা-সদার—কান মলে যাহারা (উপপদ-তৎপুরুষ), তাহাদের সদার (৬ষ্ঠীতৎ-পুরুষ)। আশাজনক—আশা জন্মায় যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। লক্ষ্মীছাড়া—লক্ষ্মীর দ্বারা ছাড়া (৩য়াতৎপুরুষ)। দক্ষিণ-হাওয়ায়—দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত হাওয়া (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। জয়ধ্বনি—জয়সূচক ধ্বনি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

প্রকৃতি প্রত্যয়: খবরদারি—খবর+দার=খবরদার, খবরদার+ই =খবরদারি। মামাতো—মামা+তো। খুড়তুতো, মাসতুতো—খুড়া, মাসি+তুতো। বালাখানা—বালা+খানা। অমাত্য—অমা+ত্যপ্। তদারক নবিশ—তদারক+নবিশ। পিসতুতো—পিসি+তুতো। নিন্দক—নিন্দ্ (সংস্কৃত ধাতু)+উক (বাংলা কৃৎ ; সংস্কৃতে 'নিন্দুক' হয় না, হয় 'নিন্দক')। বেয়াদবি—বেয়াদপ+ই। পিটানি—পিট্+আনি। মুকুলিত—মুকুল+ইতচ্।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: পাখিটাকে শিক্ষা দাও (কর্তৃবাচ্য)—পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়া হউক (কর্মবাচ্য)।

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার—রাজার ভাগিনারা ভার পাইল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার ('ভাগিনাদের উপর'-কে কর্তৃপদে রূপান্তরিত করিয়া)।

সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসার বিদ্যা বেশি ধরে না (জটিল)—সামান্য খড়কুটা দিয়া বাঁধা পাখির বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না (সরল)।

পাখির কী কপাল (উচ্ছ্বাসাত্মক)। —পাখির কপাল সত্যই খুব ভালো, (সাধারণ বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক)।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই (নেতিবাচক)—অনেক দামের খাচাটার জন্য ভাগিনাদের অসীম খবরদারির (অস্তিবোধক)।

খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না। (যৌগিক)—খাঁচাটার উন্নতি হইলেও পাখিটার খবর কেহ রাখে না (সরল)

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন?" (প্রত্যক্ষ উক্তি)—ভাগিনা মহারাজকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তিনি কাণ্ডটা দেখিতেছেন কি না (পরোক্ষ উক্তি)।

রাজা ভাগিনাকে বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।" (প্রত্যক্ষ উক্তি)—রাজা ভাগিনাকে দেখিবার জন্য পাখিটাকে একবার আনিতে বলিলেন (পরোক্ষ উক্তি)। [উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০]

ব্যাকরণগত টীকা: সাবাস্!—কথাটি অব্যয়, এবং বাক্যের অন্য কোনো পদের সহিত ইহার ব্যাকরণগত সম্পর্ক না থাকায় এটি অনন্বয়ী অব্যয়।

টানাটানি—'পরস্পর টানা' অর্থে 'টানাটানি' কথাটি বিশেষ্য; কিন্তু এখানে ইহার বিশেষ অর্থ 'অভাব' এই অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয় না।

সম্বন্ধীরা—সম্বন্ধ+ইন্=সম্বন্ধী। ইহার অর্থ হওয়া উচিত 'যাহার সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মীয়তা আছে'; কিন্তু বাঙলায় কথাটি একমাত্র 'শ্যালক' অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া এটি যোগারূঢ় শব্দের উদাহরণ।

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ: মুখ হাঁড়ি করিয়া—এখানে 'হাঁড়ি' কথাটির অর্থ 'ভার'।

বাক্য-রচনা: পর্বতপ্রমাণ: বহ্নিসংযোগের পূর্বে বিলাতী বস্ত্রের স্তূপ পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল।

খবরদারি: এক ধরনের লোক আছে যারা বড় কাজে অনাহূতভাবেই খবরদারি করতে আসে।

জয়ধ্বনি: তুমুল জয়ধ্বনি শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে মহামান্য অতিথিবৃন্দ আসিয়া পড়িয়াছেন।

আশাজনক: অঙ্ক-পরীক্ষাটা যেমন দিয়েছি তাতে আমার অবস্থাটা খুব আশাজনক মনে হয় না।

ভাগ্যবিচার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচয়—পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যক্ষেত্রে একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী। তাঁহার 'বাগেশ্বরী-শিল্প-প্রবন্ধাবলী' বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। এইগুলি শিল্প-সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যবচনে পূর্ণ হইয়াও শিল্পগুণসম্পন্ন। আলোচনার বিষয়ও এইভাবে অবনীন্দ্রের হাতে নূতন ও অপরূপ সৃষ্টি হইয়া উঠে। অবনীন্দ্রের মধ্যে ছিল একটি আজীবন শিল্পী। তাহারই আত্মপ্রকাশে "একটি স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্ব ভঙ্গী আছে; সেই ভঙ্গীর চারুত্ব বক্তব্যকে সাহিত্যের রসব্যঞ্জনা দান করিয়াছে।...শিল্প-সম্বন্ধে নানা আলোচনার ভিতর দিয়া এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ নিজের শিল্পী-মনেরই নানাভাবে পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয়ের ভিতর শিল্পীর সকল স্বপ্নের রং লাগিয়াছে। তাঁহার লেখার ভিতরে সমঝদারের নৈপুণ্য রহিয়াছে—পাণ্ডিত্যের দার্ঢ্য কম। শিল্প শিল্পীর অন্তর্নিহিত কথা-গুলিকে তিনি যতটা পারিয়াছেন সহজভঙ্গীতে নিজের অনুভূতি মিশাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বের এবং ইহার একটি বিশেষ ছন্দ রহিয়াছে। গদ্যের ভিতরে ছন্দকে এতখানি প্রধান করিয়া তোলার ভিতরে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৃতিত্ব রহিয়াছে। এই গদ্যছন্দের নিপুণ পরিচালনায় লেখক গদ্যপদ্যের ভেদরেখাকে অনেকখানি অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয় এবং ভঙ্গী উভয় দিক হইতেই তাঁহার লেখা কাব্যধর্মী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার সবজাতীয় লেখায়ই রূপকথার ভঙ্গীটিকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।" ইহাও তাঁহার রচনামাধুর্যের অপর একটি কারণ।

উৎস—লেখকের 'রাজকাহিনী'-নামক গ্রন্থের 'বাপ্পাদিত্য'-শীর্ষক গল্প হইতে 'ভাগ্যবিচার' গৃহীত হইয়াছে।

নামকরণ—পাঠ্যাংশে রানা রায়মলের তিন পুত্র ও সুরজমলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজ, জয়মল, সঙ্গ ও সুরজমল—ইহাদের মধ্যে চিতোরের সিংহাসন লইয়া প্রবল প্রতিযোগিতা। কে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবেন,

কাহার ভাগ্যে চিতোরের রানাপদ জুটিবে—এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে রাজকুমারগণ জনৈক যোগিনীর নিকট যান। যোগিনী রূপকে ও গল্পে রাজকুমারদের ভাগ্য বিচার করেন। গল্পের আরম্ভ এইখানে। তারপর বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া যোগিনীর ভবিষ্যৎ গণনা ফলিতে থাকে। তারাবাইকে অপহরণের অপচেষ্টায় জয়মলের প্রাণান্ত হয়। পৃথ্বীরাজ আপন শৌর্যে শুধু তারাবাইকে জয়ই করেন না, রানারও সুনজরে পড়েন। তাঁহারই বিক্রমে সুরজমল বিতাড়িত হন এবং দেউলগড়ে গিয়া মরণ পর্যন্ত নির্জীব অস্তিত্ব রক্ষা করেন। তারপর শিরোহিপতি পৃথ্বীরাজকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা করেন। পৃথ্বীরাজ যখন মারা যান, তখন সঙ্গ শ্রীনগরের রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছেন। এইরূপে রানা রায়মলের একমাত্র উত্তরাধিকারী হন সঙ্গ। যোগিনীর ভাগ্যবিচার বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। গল্পের কথাবস্তু এইরূপ বলিয়াই মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের সংকলয়িতা পাঠ্যাংশের শীর্ষনাম 'ভাগ্যবিচার' দিয়াছেন। মূলে ইহা 'বাপ্পাদিত্য'-শীর্ষক কাহিনীরই অংশ।

প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যের বিচারটাই কাহিনীটির মুখ্যবস্তু নহে। পৃথ্বীরাজ, জয়মল, সুরজমল ও সঙ্গের মধ্যে সঙ্গ কেমন করিয়া রানা হইলেন, সেই বৃত্তান্তই পাঠ্যাংশের মূলকথা। তবে সঙ্গের রানাপদলাভের মধ্যেই দৈবের খেলা আছে। বিচিত্র ঘটনা ও দুর্দৈবের মধ্য দিয়া জয়মল্ল, সুরজমল ও পৃথ্বীরাজ একে একে পথ ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গের পক্ষে চিতোরের সিংহাসনলাভ সুগম করিয়া দেন। ভাগ্যের এই লীলাই বিবৃত হইয়াছে আলোচ্যমান কাহিনীতে। কাজেই 'ভাগ্যবিচার' না হইয়া গল্পটির শীর্ষনাম শুধু 'ভাগ্য' বা 'ভাগ্যলীলা' হইলে আরও সঙ্গত হইত।

সমালোচনা—পাঠ্যাংশটি অবনীন্দ্রনাথের রচনামাধুর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রূপকের ভাষায় ও নাটকীয় উপস্থাপনায় ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা এখানে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটির কথাবস্তু সুপরিচিত। চিতোরের রানা রায়মলের তিন পুত্র—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল। শেষ পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে সঙ্গের ভাগ্যই প্রসন্ন হইল। কেমন করিয়া? তাহাই এই গল্পের কথাবস্তু।

এই কথাবস্তু বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে ইহার নাটকীয় উপস্থাপনা। নাহরামুংরার এক পাহাড়, ব্যাঘ্রমেরু তাহার নাম। সেইখানে চারণীমন্দিরে যোগিনী কর্তৃক ভাগ্যবিচার হইল রূপক কাহিনী ও ব্যাখ্যানের

মধ্য দিয়া। অমনি নিরাশ রাজকুমারগণ সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন সঙ্গ। গল্পের গতিসঞ্চার হইল। বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া পড়িল 'বিদা'র কাহিনী, তাঁহার অপূর্ব বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগ। ব্যাঘ্রমেরুর ঘটনার শাস্তিস্বরূপ সুরজমল ও পৃথ্বীরাজের চিতোর হইতে বহিষ্কার ঘটিল। শুরু হইল পৃথ্বীরাজের জয়যাত্রা। এদিকে বিদার গৃহ হইতে জয়মলের পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটিল বেদনোরে, তারাবাইকে অপহরণের প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণে। এই ঘটনারই আকর্ষণে আবার পৃথ্বীরাজের বেদনোরে গমন, তারাবাইয়ের সহিত প্রণয় এবং কৌশলে টোডারাজ্য উদ্ধার করার পর তারাবাইয়ের সহিত পরিণয়, একের পর এক ঘটনা অনিবার্য বেগে ঘটিয়া গেল এবং তাহারই ফলে বিক্রমের পুরস্কারস্বরূপ মহারানার প্রসাদ লাভ করিলেন পৃথ্বীরাজ। তারপর সারংদেব ও সুরজমলের বিদ্রোহ দমন করিয়া পৃথ্বীরাজ চিতোরের সিংহাসন প্রায় করতলগত করিলেন। সুরজমলের ভাগ্য চিরতরে রাহুগ্রস্থ হইল। বাকী রহিলেন শুধু সঙ্গ সংবাদ আসিল শ্রীনগরের রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। পথের একমাত্র কণ্টক সঙ্গকে দূর করিতে বাহির হইলেন পৃথ্বীরাজ। কিন্তু শিরোহি হইতে ছোট ভগিনীর লাঞ্ছনা অপমানের সংবাদ পাওয়ার পর তাঁহার গতি ফিরিল ভিন্নমুখে। শিরোহিপতি পৃথ্বীরাজের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইলেন তিনি পৃথ্বীরাজকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া। সঙ্গের ভাগ্য এইভাবে প্রসন্ন হইল। চিতোরের রাজলক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইবার অপেক্ষায় রহিল।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় ঘটনা বিবরণের পারম্পর্য এবং একটি হইতে আর একটি ঘটনার অনিবার্য উৎসার। এসবই ইতিহাসের কথা বটে কিন্তু ইহাদের উপস্থাপনায় যে পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা তাহাই শিল্পকর্ম। ব্যাঘ্রমেরুর ঘটনাটি যেন একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ। তাহার ফলে রাজকুমার চতুষ্টয় যেন ছিটকাইয়া পড়েন এবং দৈবস্রোতের বিচিত্র লীলায় লাভ করেন আপনাদের অন্তিম ভাগ্য। দ্বিতীয়তঃ শুধু ঘটনার কথায় ইতিহাস হয়, সাহিত্য হয় না। লেখক, তাই গল্প, কথা ও সংলাপ যোজনা করিয়া কাহিনীটিকে রসঘন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে রাজপুত চরিত্রের কয়েকটি মহিমময় দিক ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে, এবং সেই কারণে গল্পটির উপভোগ্যতাও প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, কাহিনীটির রচনাভঙ্গীও বিশেষ মনোজ্ঞ, রূপকথার যে ভঙ্গীটি অবনীন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, তাহা এইখানে কাহিনীটির অতিশয় প্রকৃতিসঙ্গত। রাজপুত ইতিহাসের সেই অপূর্ব শৌর্য ও মহত্ত্ব বাস্তবিকই যেন রূপকথার ন্যায় আমাদের কল্পনায় অনির্বচনীয় ভাব সৃষ্টি করে। তাই রূপকথার ভাষায় ও ভঙ্গীতে সেই কাহিনী স্বভাবতঃই অধিকতর আবেদন বহন করে। তাহা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে একটা কাব্যচ্ছন্দও রহিয়াছে; গদ্যকে ছন্দমিলনবর্জ্জিত রাখিয়াও যে কাব্যের চন্দরূপে রসোত্তীর্ণ করা যায়, তাহার অনুপম দৃষ্টান্ত পাই আলোচ্যমান কাহিনীতে। মোটামুটি এই সকল কারণেই অবনীন্দ্রনাথের 'ভাগ্যবিচার' আমাদের নিকট এত উপভোগ্য হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার—নাহরামুংবা ব্যাঘ্রমেরু পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় চারণীমন্দির। এই মন্দিরবাসিনী সিদ্ধিকরী যোগিনীর নিকট ভাগ্য-গণনার জন্য অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন মেবারের তিন রাজপুত্র—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল এবং তাঁহাদের পিতৃব্য সুরজমল। যোগিনী মন্দিরে ছিলেন না। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়মল সিদ্ধিকারীর খাটিয়ায় ছেঁড়া কাঁথার উপর বসিলেন, সঙ্গ বসিলেন একটা বাঘছালে আর সুরজমল তাঁহার পাশে তপ্ত মেঝেটার উপর বসিয়া পড়িলেন। (অ. ১)

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সিদ্ধিকরী প্রদীপ হস্তে গুহায় প্রবেশ করিলে জয়মল ব্যতীত আর সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। জয়মল তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন চিতোরের সিংহাসন কাহার ভাগ্যে আছে তাহাই গনিয়া বলিয়া দিতে। সিদ্ধিকরীকে নিরুত্তর দেখিয়া পৃথ্বীরাজ তাগিদ দিলেন বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর দিতে। (অ. ২)

তখন সিদ্ধিকরী রাজপুত্রদের গৃহীত আসনের সাহায্যেই কুমারদের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিলেন। বাঘছালে বীরাসনে উপবিষ্ট সঙ্গ রাজা হইবেন; সুরজমল মাটিতে বসিয়াছেন, তাই তিনি মন্ত্রী, সদার অথবা জমিদার হইবেন; কিন্তু ছেঁড়া কাঁথায় উপবিষ্ট জয়মল ও পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টে কিছুই নাই। বিচার শুনিয়া পৃথ্বীরাজ আপন তরবারি লইয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। তরবারির আঘাতে সঙ্গের একটি চক্ষু কাটিয়া গেল এবং তিনি প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটাইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। অন্য রাজকুমারেরা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। (অ. ৩)

ক্ষতচক্ষু রক্তাক্তদেহ শ্রান্ত সঙ্গ পথে বাঠোর-সদার বিদার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ ও সুরজমল ক্ষত দেহে পথে পড়িয়া আছেন, জয়মল তখনও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছেন। (অ. ৪)

রাজভক্ত বিদা সঙ্গকে নিজের নূতন ঘোড়ায় চড়াইয়া বিদায় দিলেন। জয়মল আসিলে তিনি তিন ঘণ্টা তাঁহার পথরোধ করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিয়া জয়মল যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, ততক্ষণে সঙ্গ সদারের ঘোড়ায় করিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

সকাল হইতে অজানা এক গ্রামের কৃষকেরা পৃথ্বীরাজ ও সুরজমলকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে লইয়া গেল। মহারানার লোকজনও তাঁহাদের অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত। পৃথ্বীরাজ ও সুরজমলকে চিতোরে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা সেবার সুস্থ হইয়া উঠিলেন। (অ. ৬)

মহারানা একদিন পৃথ্বীরাজকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া চিতোর হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং বলিলেন যে, যদি বিক্রম দেখাতে হয় তবে তাহা ভাইয়ের বিরুদ্ধে না দেখাইয়া মেবারের শত্রুদের সহিত যুদ্ধেই দেখানো হউক। সুরজমলকে চিতোরের বাহিরে সারংদেবের আশ্রয়ে নির্বাসিত করা হইল। (অ. ৭)

পৃথ্বীরাজ রাজধানী ছাড়িয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। (অ. ৯)

গদাওয়ারের শাসনকর্তা দুর্ধর্ষ মীনা-সদার মীনারায় মহারানাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আহেরিয়া-পরবের দিন মীনারায় যখন তাড়ি খাইয়া উৎসবে মত্ত, সেই সুযোগে পৃথ্বীরাজ নিজের অনুচরদের লইয়া গদাওয়ারকে আক্রমণ করিলেন। মীনারায় যুদ্ধে নিহত হইল, তাহার রাজ্য পৃথ্বীরাজের করতলগত হইল। (অ. ৯)

এদিকে জয়মল ঘুরিতে ঘুরিতে বেদনোরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে টোডারাজ শূরতান সিং পাঠানদের আক্রমণে হৃতরাজ্য হইয়া পরমাসুন্দরী কন্যা তারাবাইকে লইয়া মহারানার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। তারাবাইয়ের প্রতিজ্ঞা—পিতার সিংহাসন যে উদ্ধার করিয়া দিবে, তাহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। জয়মল তারাবাইয়ের অনুপম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার আশায় শূরতানের নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন। শূরতান আদর করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে স্থান দিলেন। কিন্তু জয়মল প্রতিজ্ঞা-পালনের

চেষ্টামাত্র না করিয়া একদিন রাত্রিকালে সুরতানকে হত্যা করিয়া তারাবাইকে অন্দর হইতে অপহরণ করিবার চেষ্টায় ধরা পড়িলেন এবং তারাবাইয়ের ছুরিকায় গুরুতর আহত হইয়া সুরতানের হাতে ছিন্নমুণ্ড হইলেন। মহারানার অপদার্থ পুত্রের অপকর্মের উচিত শাস্তি হইয়াছে মনে করিয়া সুরতানকে কিছুই বলিলেন না—বরং বেদনোর রাজ্য তাহাকে উপহার দিলেন। (অ. ১০)

সংবাদ শুনিয়া লজ্জায় ক্রোধে আরক্ত পৃথ্বীরাজ বেদনোরে উপস্থিত হইলেন। তারাবাইয়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইবামাত্র উভয়ে উভয়কে ভালোবাসিয়া ফেলিলেন। অসি স্পর্শ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিবার শপথ করিয়া পৃথ্বীরাজ সেইদিনই ছদ্মবেশে তারাবাইয়ের সহিত পাঠান সুলতানের রাজ্যের দিকে রওনা হইলেন। পিছনে চলিল তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদল এবং রাজপুত সৈন্য। রাজপুত সৈন্য ও পাঠানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করিলেন। পৃথ্বীরাজের এই বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মহারানার মন গলিল। তিনি পৃথ্বীরাজের সহিত তারাবাইয়ের বিবাহ দিয়া উভয়কে কমলমীর দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। (অ. ১১)

কিছুদিন পরে সারংদেব আর সুরজমল বিদ্রোহী হইলেন। তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণে মহারানার সৈন্য পিছু হটিতে লাগিল। এমন সময় কমলমীর হইতে এক হাজার রাজপুত যোদ্ধা লইয়া পৃথ্বীরাজ রণস্থলে আসিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যায় যুদ্ধ স্থগিত হইলে পৃথ্বীরাজ শত্রু-শিবিরে গিয়া পিতৃব্য সুরজমলের সহিত দেখা করিলেন এবং গল্প-হাসির মধ্যে দিনের শত্রুতা সাময়িকভাবে ভুলিয়া এক থালায় সুরজমলের সহিত জলযোগ করিলেন। কথা হইল—রাত্রির মধ্যে বিশ্রাম করিয়া পরের দিন প্রাতে যুদ্ধ নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে। (অ. ১২)

পরের দিন যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জয়ী হইলেন। সুরজমল সারংদেবের সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া একে একে সকল পরগণা বিদ্রোহীদের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। সুরজমল চিতোরের বাহিরে নির্জন দেওলগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে তাহার ভাগ্যলিপি ফলিল। (অ. ১৩)

পৃথ্বীরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির পথে এখন বাধা একমাত্র সঙ্গই অবশিষ্ট। একদিন কমলমীরে সংবাদ পৌঁছিল—সঙ্গ জীবিত আছেন এবং শ্রীনগরের রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। পৃথ্বীরাজ সঙ্গের

সন্ধানে বাহির হইবেন, এমন সময় শিরোহি হইতে তাঁহার ছোট বোনের একখানি করুণ পত্র পাইলেন। সে লিখিয়াছে—মহারানার জামাতা মত্তপ শিরোহিপতির অত্যাচার, অপমান ও নিষ্ঠুরতায় তাহার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। দাদা আসিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ না লইলে তাহার মৃত্যু ভিন্ন পথ থাকিবে না। পত্র পাইয়া পৃথ্বীরাজ শ্রীনগর যাওয়া স্থগিত করিলেন, নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে লইয়া চলিল শিরোহির অভিমুখে। (অ. ১৪)

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীরাজ দেখেন, একদিকে সোনার পালঙ্কে নেশার ঘোরে শিরোহিপতি অচৈতন্য, অন্যদিকে তাঁহার ভগিনী ভূমিশয্যায় ক্রন্দনরত। তৎক্ষণাৎ তিনি রাজাকে লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। শিরোহিপতি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তিনি প্রসন্ন না হইয়া বলিলেন ভগিনীর জুতাজোড়া মাথায় করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে। রাজাকে তাহাই করিতে উদ্যত দেখিয়া রানী বলিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, আজ আর প্রয়োজন নাই। রানীর অনুরোধে রাজা পৃথ্বীরাজের জলযোগের আয়োজন করিলেন—সোনার থালায় করিয়া গোটাকতক শিরোহির বিখ্যাত লাড়ু। পৃথ্বীরাজ জলযোগ সারিয়া কমলমীরের দিকে চলিলেন। কিন্তু লাড়ুর সহিত মিশ্রিত সেঁকোবিষ আর হীরাচুরের ক্রিয়াব কমলমীরে পৌঁছানো আর তাহার হইল না। (অ. ১৫)

রাত্রির অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। দূর হইতে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যায়। এমন সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কমলমীরের দুর্গের দিকে চাহিয়া তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঠিক সেই সময় শ্রীনগরের নহবতখানায় প্রভাতী রাগিণী প্রভাতের আগমন সূচনা করিল।
(অ. ১৬)

শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি

অ. ১। **উদয়পুর**—রানা উদয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত মেবারের রাজধানী। উদয়সিংহের নাম অনুসারে ইহার নাম উদয়পুর হইয়াছে। ব্রাহ্মমেরু—মেবারের একটি পাহাড়ের নাম। চারণীমন্দির—চারণ বা ভ্রাম্যমাণ গায়কদিগের আরাধ্য কোনো দেবীর মন্দির। সিদ্ধিকরী যোগিনী—যোগ সাধনায় সিদ্ধা তাপসী। দেউল—মন্দির ('দেবকুল' হইতে)। **রাজপুত্রেরা**—মহারানা রায়মলের তিন পুত্র—সঙ্গ, জয়মল ও পৃথ্বীরাজ, এবং তাঁহার ভ্রাতা সুরজমল। দুরন্ত গরমে—

রাজপুতনা মরুভূমির দেশ; তাই গরম সেখানে অত্যধিক। সন্ধ্যাপূজা—সন্ধ্যাকালীন অর্চনা। সুরজমল—মহারানা রায়মলের ভ্রাতা, রাজপুত্রদের খুল্লতাত। খাটিয়া—ছোট খাট।

অ. ২। ভর-সন্ধ্যেয়—ভর সাঁঝে; গোধূলির অবসানে। চার মূর্তি—তিন রাজপুত্র এবং সুরজমল। **সাষ্টাঙ্গ**—জানু, পদ, বক্ষ, হস্ত, দৃষ্টি, বুদ্ধি বা মন ও বাক্য। প্রণাম করিবার সময় এই অঙ্গগুলি ব্যবহার করা হইলে সেরূপ প্রণামই বুঝায়। **চিতোর**—মেবারের প্রাচীন রাজধানী। মোগল বাদশাহ আকবরের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য রানা উদয়সিংহ উদয়পুর নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গেরুয়া-কাপড—তপস্বিনীর গৈরিক বসন। খুঁট—প্রান্ত।

অ. ৩। বীরাসনে—বীরের ন্যায় আসন বা অঙ্গসংস্থান করিয়া; একপ্রকার যোগাসনে। **ছেড়া কাঁথায় শুয়ে** ইত্যাদি—ছেডা কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিলে তেমন স্বপ্ন সত্য হয় না, তেমনি পৃথ্বীরাজ ও জয়মলের সিংহাসন প্রাপ্তির আশাও অলীক। চোট—ধারালো অস্ত্রের আঘাত।

অ. ৪। **রাঠোর সর্দার**—রাঠোর নামে রাজপুত গোষ্ঠী বিশেষের দলপতি। কেল্লা—দুর্গ। **বুরুজ**—দুর্গের প্রাচীরের উপর গম্বুজাকৃতি ছোট ঘর। খামার-বাড়ী—শস্যাদি রাখিবার জন্য গৃহ। দু কথায়—সংক্ষেপে। প্রাণসংশয়—প্রাণ যাইবে না থাকিবে তাহা লইয়া সন্দেহ অর্থাৎ ঘোর বিপদ্। যাহাতে প্রাণের ভয় আছে।

অ. ৫। অকর্মণ্য—অকেজো; আরোহী বহন করিবার অনুপযুক্ত। কপাল চাপড়ে—কপালে করাঘাত আশাভঙ্গের সূচক।

অ ৬। ডুলি- আচ্ছাদনবিহীন পাল্কীবিশেষ। তদ্বির—সেবাশুশ্রূষা।

অ. ৭। মহারানা—রায়মল। চোখ বুজলেই—মরিলেই।

অ. ৮। নির্বাসনে যান—রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত হন। দিগ্‌বিজয়ে—চারিদিকে রাজ্যগুলি জয় করিতে।

অ. ৯। দুদান্ত—দুর্ধর্ষ; যাহাদিগকে সহজে দমন করা যায় না। গদাওয়ার—রাজস্থানের মীনা-অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। **আহেরিয়া পরব**—

সকলে মিলিত মৃগয়া করার উৎসববিশেষ। সংস্কৃতে 'আখেট' হইতে 'আহেরিয়া'। তাড়ি—খেজুরের বা তালের রস হইতে প্রস্তুত মাদক পানীয়।

অ. ১০। **বেদনোর**—আবাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে একটি রাজ্য। **টোডা**—রায় শূরতানের পৈতৃক রাজ্য। পাঠান সদার লীল্লার আক্রমণে পর্যুদস্ত হইয়া শূরতান টঙ্কথোর প্রদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। টঙ্কথোর হইতে বিতাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি বেদনোরে আসেন। **যেন দেবী দুর্গা**—অসামান্য রূপসী তারাবাইয়ের বীরমূর্তি দেবী দুর্গার রণরঙ্গিনী মূর্তির তুল্য। ঘটক—বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপক। হাতিয়ার—অস্ত্র। আস্পর্ধা—ঔদ্ধত্য। **কাঁধ থেকে ভুঁয়ে নামিয়ে**—কাটিয়া ফেলিয়া। গোঁয়ার—কাণ্ডজ্ঞানবিহীন। অপদার্থ—অযোগ্য ; অকর্মণ্য। আক্ষেপ—অনুশোচনা ; দুঃখ।

অ. ১১। **তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেম**—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথের চেয়ে বড় শপথ নাই। তুলনীয় : "শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক লাজ"—যতীন্দ্রমোহন। **বাপের প্রাণ গলল**—পৃথ্বীরাজের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মহারানা রায়মলের সকল কঠোরতা দূর হইল : পৃথ্বীরাজের প্রতি তিনি আবার স্নেহপ্রবণ হইলেন। কমলমীর—মেবারে একটি গিরিসঙ্কুল স্থান।

অ. ১২। সওয়ার—অশ্বারোহী। ফৌজ—সৈন্যদল। অস্তর—অস্ত্র। **নাপিত ডেকে**—সেকালে নাপিত কেবল ক্ষৌরকার্যই করিত না, ছোটখাটো অস্ত্রচিকিৎসা নাপিতকে দিয়াই করানো হইত। **দিনের বেলার শত্রুতা** ইত্যাদি—দিনমানে যুদ্ধ চলিয়াছে বিদ্রোহী এবং রানার সৈন্যদলের মধ্যে। তখন তাহারা পরস্পর শত্রু। কিন্তু যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় সে শত্রুতারও যেন সাময়িক অবসান হইয়াছে—খাওয়া-দাওয়া ও আলাপ-সালাপের মধ্যে শত্রুভাব কাহারও মনে নাই। **পুরনো ঝগড়াটা**—পৃথ্বীরাজ আসিয়াছেন পিতার পক্ষ হইয়া বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করিতে। কিন্তু সুরজমলের সহিত তাঁহার ঝগড়াটা তো কেবল বিদ্রোহসূত্রেই নয়, সেই সিদ্ধিকরীর ভাগ্যবিচারের পর হইতেই। তোলা থাক্—স্থগিত থাকুক।

অ. ১৩। পরগণা—জেলা বা দেশের অংশ। **দেউলগড়ে**—একটি নির্জন প্রাচীন মন্দিরের চারিদিকে দুর্গ নির্মাণ করিয়া সুরজমল নিভৃতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই দুর্গটির নাম দিয়াছিলেন দেউলগড় (দেউল=মন্দির ; গড়=দুর্গ)।

অ. ১৪। চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে—অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের চিতোরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পথ হইতে। **রইলেন কেবল সঙ্গ**—সিদ্ধিকরীর গণনায় রাজা হইবার কথা সঙ্গের। এই সঙ্গ ছাড়া পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী আর সকলেই মরিল। চর—গুপ্ত সংবাদসংগ্রাহক। শ্রীনগর—যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটি নগর। **শিরোহি**—যোধপুরের দক্ষিণে একটি পার্বত্য প্রদেশ। শ্রীনগর—সঙ্গকে খোঁজ করিয়া বাহির করিবার জন্য। **অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল** ইত্যাদি—ভাগ্যের দ্বারা চালিত হইয়া পৃথ্বীরাজ সঙ্গকে ছাড়িয়া চলিলেন শিরোহির মুখে।

অ. ১৫। ভরপুর নেশায়—নেশায় চুর হইয়া। রানী—পৃথ্বীরাজের ভগিনী শিরোহিরাজের মহিষী। মতিচুর—নাড়ু। সেঁকো বিষ—শঙ্খবিষ নামে একপ্রকার উগ্র বিষ (white arsenic)। হীরেচুর—হীরকচূর্ণ। ইহাও একপ্রকার বিষ। হীরার আঙটি চুষিয়া আত্মহত্যার কথা কোনো কোনো কাহিনীতে পাওয়া যায়। **জুতো-তোলার শোধ নিতে**—স্ত্রীর জুতা তুলিয়া যে অপমান তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে।

অ. ১৬। তারারানী—তারাবাইয়ের আদরসূচক নাম। নহবতখানা—যে মঞ্চে বসিয়া বাদকগণ নহবত বাজায়। **আশা রাগিণীর সুর**—যে সুরে আশার রাগিণী অথবা আশাবরী রাগিণী বাজিতেছে। **ভোর ভয়ি**—রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। [**মন্তব্য :** "ভোর ভঈ ..." কিন্তু একখানি সুপ্রসিদ্ধ 'ভৈরব' (ভয়রো) রাগের খেয়ালগানের প্রথমাংশ। আশাবরী (যে শ্লিষ্ট অর্থ অবনীন্দ্রনাথের 'আশা-রাগিণী' শব্দটিতে স্পষ্টই দেখিতেছি) বাঙলাদেশে ভৈরব ঠাটে ('রে' কোমলযুক্ত) গাওয়া হয় বলিয়া ইহাকে প্রাতঃকালের রাগ বলা চলে ; কিন্তু মূলঠাটের আশাবরী দ্বিপ্রহরের রাগ। যে সকল ছাত্রীর 'সঙ্গীত' প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যতম বিষয়, তাহারা পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ১৭১ পৃঃ ও ৩৪৮ পৃঃ দেখিতে পারে।]

ব্যাখ্যা

(১) জয়মল শুধু যে আশ্রিত……শাস্তিই দিয়েছেন। (অ. ১০)

এই অংশটি অব[illegible]থের 'ভাগ্যবিচার'-শীর্ষক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। ইহা জয়মলের হত্যা স[illegible] মহারানা রায়মলের উক্তি।

গ্যাত্রমেকর ঘটনার পর জয়মল বেদনোরে উপনীত হন এবং সেখানে টোডার রাজা রায় শুরতান সিং-এর কন্যা তারাবাইয়ের প্রতি আসক্ত হন। শুরতান সিং তখন পাঠানদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া মহারানার আশ্রয়ে বেদনোরে বাস করিতেছিলেন। তারাবাইয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি তাঁহার পিতার হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন তাঁহারই সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন। জয়মল লিখিতভাবে টোডা উদ্ধারে প্রতিশ্রুতি দিয়া শুরতান সিং-এর গৃহে সাদরে স্থান লাভ করিলেন। কিন্তু মাসের পর মাস প্রতিজ্ঞারক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া এক রাত্রিতে তারাবাইকে অপহরণের অসাধু চেষ্টা করেন এবং তারাবাইয়ের ছুরিকায় বিদ্ধ তাঁহার অসাড় দেহ হইতে শুরতান সিং কর্তৃক মুণ্ডটি ছিন্ন হয়। এই সংবাদে মহারানা ক্ষুণ্ণ হইলেন না। তাহার কারণ আলোচ্যমান উক্তির মধ্যে তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। শুরতান সিং ছিলেন মহারানার আশ্রিত। কাজেই তাঁহাকে অপমান করা রাজপুত্র জয়মলের পক্ষে গর্হিত অপরাধ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় জয়মল মিথ্যাবাদী বলিয়াও ঘৃণার্হ। তৃতীয়তঃ, অন্ধকারে তিনি তারাবাইকে চুরি করিতে গিয়াছিলেন। কাজেই চোরের কোনো ক্ষমা নাই। এই সকল কার্যের মধ্যে জয়মলের মূর্খতা ও গোঁয়ার্তুমিই প্রমাণ হয়। রানা এইরূপ অপদার্থ পুত্রের শাস্তিতে তাই সন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষতঃ, শুরতান সিং পিতা, কন্যার অপমানের প্রতিশোধ লওয়ায় তিনি কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই; মহারানার এইরূপ যুক্তিসঙ্গত মনোভাবের মধ্যে অপূর্ব মহত্ত্বের পরিচয় আছে। কাপুরুষতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি হীনতাকে রাজপুতবীর কত ঘৃণা করিতেন তাহা এই উক্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতার পক্ষে পুত্রের মৃত্যুতেও এইরূপ নীতিজ্ঞান, অতুল সংযম ও শক্তির সাক্ষ্য বহন করে।

(২) আর সেই সময় ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি। (অ. ১৬)

আলোচ্যমান অংশটি অবনীন্দ্রনাথের 'ভাগ্যবিচার'-শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক এই অংশে সঙ্গের সুপ্রসন্ন ভাগ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন।

শিরোহিপতির গৃহে বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করায় পৃথ্বীরাজের প্রাণ-বিয়োগ হইল। সঙ্গের পথ হইতে শেষ কণ্টকটি এইভাবে অপসারিত হইল। ঠিক সেই সময় সঙ্গ শ্রীনগরের রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছেন। সেখানে ভোরণ-

মঞ্চে নহবতখানায় প্রভাতকালে আনন্দময়ী আশাবরী রাগিণী বাজিয়া উঠিল। যেন তাহা বিবাহবাড়ীর সকলের প্রতি বোধনসঙ্গীত শুনাইতে লাগিল ; জাগো, ভোর হইয়াছে। অন্য অর্থে শ্রীনগরের নহবতখানায় সেদিন যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা সঙ্গের দুঃখের অবসানই যেন ঘোষণা করিল। জয়মল ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই নিহত হইয়াছেন। এখন নিষ্কণ্টক হইয়া সঙ্গ চিতোরের সিংহাসনে বসিতে পারিবেন। নহবতখানায় যেন সেই আশার কথাটাই সুরমূর্ছনায় ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. ১। নাহরামুংরায় ব্যাঘ্রমেরু পর্বতে সিদ্ধিকরী যোগিনী কর্তৃক ভাগ্যবিচারের কাহিনীটি বর্ণনা কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ (অনুচ্ছেদ ১-৩)।

প্র. ২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভাগ্যবিচার' গল্পে 'বিদা'র বিশ্বস্ততা বীরত্ব ও আত্মত্যাগের যে কাহিনী আছে তাহা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ (অনুচ্ছেদ ৪)।

প্র. ৩। চিতোর হইতে বহিষ্কারের পর পৃথ্বীরাজের বিজয়-কাহিনী নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর।

প্র. ৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভাগ্যবিচার' গল্পের বিবরণ অনুসরণ করিয়া জয়মলের মৃত্যুকাহিনী বিবৃত কর।

উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ (অনুচ্ছেদ ১০)।

প্র. ৫। অবনীন্দ্রনাথের 'ভাগ্যবিচার' গল্পে সিদ্ধিকরী যোগিনীর ভাগ্যবিচার শেষ পর্যন্ত কিরূপে বর্ণে বর্ণে সত্য হইল তাহা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উ.। সমালোচনা দেখ (প্রথম পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া সমগ্র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি লেখ)।

প্র. ৬। 'ভাগ্যবিচার' গল্পে বর্ণিত পৃথ্বীরাজের চরিত্র বিচার কর।

উ.। 'ভাগ্যবিচার' গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে পৃথ্বীরাজের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। শৌর্যে-বীর্যে ও দোষে-গুণে তাঁহার ন্যায় অন্য কোন চরিত্রই এত সম্পূর্ণ নহে।

ব্যাঘ্রমেরুর চারণীমন্দিরে রাজকুমারদিগের আসন-গ্রহণের মধ্যে তাঁহাদের চরিত্রের ছায়া পড়িয়াছে। পৃথ্বীরাজের মধ্যে ছিল একটা উদ্ধত আভিজাত্য। তাই সে বিজন পর্বতাঙ্গনে খাটিয়ার উচ্চাসনেই তিনি উপবেশন করেন। আভিজাত্যগর্ব ক্ষুণ্ণ করে নাই। পৃথ্বীরাজ মূলতঃ রাজপুত-বীর, বীরত্বই তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান ধর্ম। কাজেই ভক্তি বা বিনয় তাহাতে বিরল। তাই যোদ্ধার দুর্বিনীত রূঢ়তা প্রকাশ পায় সিদ্ধিকরী যোগিনীর প্রতি অভিবাদনে। এই রূঢ় বলিষ্ঠ দিকটা গল্পের প্রারম্ভেই তাঁহার অনড় সংকল্পেও অভিব্যক্ত। ব্যাঘ্রমেরুতে গিয়া সিদ্ধিকরী যোগিনীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় সুরজমল ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্বে ফিরিতে রাজী হন নাই।

পৃথ্বীরাজের শৌর্যের কাহিনী গল্পটির অধিকাংশ জুড়িয়া আছে। নির্ভীক অভিযানে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রজাবৃন্দ তাঁহার অনুরক্ত ছিল। চিতোর হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর তাই পৃথ্বীরাজ ছোট একটি অভিযাত্রী দলের সহিত বাহির হইয়া পড়েন দিগ্বিজয়ে। দুর্দান্ত মীনারায় তাঁহার হস্তে নিহত হয়, বিজিত হয় তাহার রাজ্য। বেদনোরে জয়মলের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে পৃথ্বীরাজ লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়াছিলেন। ভ্রাতার কাপুরুষোচিত আচরণে এই লজ্জাবোধ যথার্থ বীরের পক্ষে স্বাভাবিক। আবার এই অপমানকর ঘটনার প্রতিশোধের জন্য তাঁহার অভিযানও প্রতিশোধপরায়ণ রাজপুত-মর্যাদাবোধের পরিচয় দেয়। পৃথ্বীরাজের শৌর্যমণ্ডিত সুকান্ত রূপ দেখিয়া একজন প্রকৃষ্ট বীরাঙ্গনার মন টলিয়াছিল। তারাবাইয়ের অনুরাগ যোগ্যপাত্রেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। টোডা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পৃথ্বীরাজ যুদ্ধকৌশল ও অভিযান-দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই পরাক্রমের পুরস্কার-স্বরূপ পৃথ্বীরাজ পিতার অনুরাগ ফিরিয়া পান। সারংদেব ও সুরজমল-চালিত বিদ্রোহ-দমনেও পৃথ্বীরাজের অমিত বাহুবলের প্রমাণ পাই।

শৌর্যের আনুপাতিক ধৈর্য কিন্তু পৃথ্বীরাজের প্রকৃতিগত ছিল না। আপনার ভাগ্য জানিতে দেখি তাঁহার তর সয় না। রূপকথার হেঁয়ালি তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়া তিনি ভ্রাতার উপর মুক্ত কৃপাণ-হস্তে মুহূর্তে ঝাপাইয়া পড়েন। এই ঘটনা পৃথ্বীরাজের অধৈর্য ও নির্মমতাই শুধু প্রমাণ করে না, আর প্রমাণ করে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। চিতোরের সিংহাসন বাহুবলে জয় করাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কামনা ও প্রেরণা।

কিন্তু ভাগ্য তাঁহার প্রতিকূল ছিল। পুরুষকার অমোঘ নিয়তির বিধানে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। শিরোহিপতির হীনতার যথোচিত শাস্তি দেওয়ায় পৃথ্বীরাজকে হত্যা করা হয়।

পৃথ্বীরাজ এইরূপে চিতোরের সিংহাসন হইতে বঞ্চিতই রহিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব অম্লান-গৌরবে রাজপুত-ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে। গাম্ভিরী-নদীর তীরে সুরজমলের শিবিরে খুড়ো-ভাইপোর সেই সাক্ষাৎ অপূর্ব। রাজপুত শৌর্য ও শালীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে পৃথ্বীরাজ ও সুরজমলের চরিত্রে। শিরোহিপতির ন্যায় রাজপুতকুলকলঙ্কের মধ্যে সুরজমলের আতিথ্য বা বীরত্ব ছিল না। একজন রাজপুত যে অভ্যাগতকে বিষাক্ত খাদ্য দিতে পারে তাহা বোধ হয় পৃথ্বীরাজের কল্পনাতীতই ছিল। ভাগ্য শেষ পর্যন্ত পৃথ্বীরাজের জীবনে যবনিকাপাত করিয়াছিল, কিন্তু মহিমা তাঁহার কখনও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

প্র. ৭। 'ভাগ্যবিচার' গল্পে রাজপুত-চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ কর।

উ.। রাজপুত চরিত্রে প্রধান ও প্রথম বিশেষত্ব হইল দুর্ধর্ষ বীরত্ব। যুদ্ধই তাহাদের পেশা, অভিযানে তাহাদের দুর্মদ নেশা। জীবনকে সন্তর্পণে আত্ম-রক্ষার আবরণে ঢাকিয়া রাখা নহে, শামুকের মতো খোলসের মধ্যে আত্মগোপন সে জীবনের লক্ষণ নহে। অসি-হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রক্তের খেলাই রাজপুত জীবন। তাই কথায় কথায় জীবন লইয়া তাহাদের ছিনিমিনি খেলা।

কিন্তু এই দুর্ধর্ষ চরিত্র উন্মত্ত বর্বরতার লক্ষণাক্রান্ত নহে। ইহার মধ্যে সমন্বিত হইয়াছে শৌর্যের সহিত শালীনতা, পরাক্রমের সহিত নীতিনিষ্ঠা। 'বিদা'র মতো বীরপুরুষের বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগ তাই তুলনাহীন। ইহার মূলে শুধু দৈহিক বীরত্ব নহে, নৈতিক উৎকর্ষও দেখিতে পাই। বস্তুতঃ নৈতিক শ্রেষ্ঠতাই রাজপুত-শৌর্যকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু করিয়া তুলিয়াছে।

রাজপুতের নিকট মিথ্যাচার, চৌর্য ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মতো ঘৃণ্য আর কিছুই নাই। তাই পিতাও পুত্রকে এই সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা করেন না। জয়মলের হত্যার পর রানা রায়মল সেইজন্যই বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। বরং অপদার্থ পুত্রের হত্যায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পিতা হইয়া কন্যার মর্যাদারক্ষার জন্য রায় শূরতান সিং যে জয়মলের শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শূরতানকে প্রশংসার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। রাজপুতদিগের নিকট আশ্রিতবাৎসল্য ছিল পরম ধর্ম। রাণা রায়মলের কথায় ও কার্যে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। পুত্রকে হত্যা করিলেও রায় শূরতান সিংহকে পুরস্কৃত করিয়া মহারানা রাজপুত-চরিত্রের নৈতিক মহত্ত্বটিই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

রাজপুত-শৌর্যের দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহা শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজপুত নারীও ছিল বীরত্বে মহীয়সী। তারাবাঈয়ের কাহিনী সেই সত্যের জলন্ত প্রমাণ।

গাম্ভিরী-নদীর তীরে সুরজমলের সহিত পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি রাজপুত-চরিত্রের উপর একটি দিব্য আলোকসম্পাত করে। উহা আমাদিগকে মহাভারতের যুগের নীতিনিষ্ঠা ও শালীনতা স্মরণ করাইয়া দেয়। এক পক্ষের শিবিরে আসিলে অন্যপক্ষের বীরকে কিরূপ সম্মানে বরণ করা হইত, তাহা এই দৃশ্যে পরিস্ফুট। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানিতেও রাজপুতদিগের সামাজিক সম্পর্ক কোথাও ক্ষুন্ন করা হইত না। ভ্রাতুষ্পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াও পিতৃব্যের প্রতি সম্ভ্রম হারায় না। পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সস্নেহ সম্ভাষণে ত্রুটি করেন না। রাজপুতগণ এইভাবে যুদ্ধকে বর্বরতার স্তর হইতে উন্নীত করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের নিকট যুদ্ধ ছিল মহৎ পরাক্রম প্রকাশের উপায়। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যদিও রাজপুত-সংগ্রামের প্রেরণা হয় নাই, তথাপি সেই নীতিবিগর্হিত কূটচালে তাহা কলঙ্কিতও হয় নাই।

জয়মলের ও শিরোহিপতির মসীময় আচরণ বিপরীতক্রমে রাজপুতদিগের নিকট কি ঘৃণ্য ছিল তাহাই ব্যক্ত করে। কাপুরুষতা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, চৌর্য প্রভৃতি নৈতিক স্খলন রাজপুতগণ সহিতে পারিত না।

উপরের বিবরণ হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজপুত-চরিত্রের মধ্যে ছিল একটি সরল নীতিমণ্ডিত শৌর্য। আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততায়, যুদ্ধপ্রিয়তা অথচ মহত্ত্বে অপূর্ব সে চরিত্রমহিমা।

প্র. ৮। "আমাদের পুরানো ঝগড়াটা তাহলে আজ তোলা থাক্, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল" ?—(ক) কে কখন কাহাকে এই কথা বলে ? [illegible] 'পুরানো ঝগড়াটা' কি ? (গ) কিভাবে এই ঝগড়াটি শেষ হয় ?

উ.। (ক) পৃথ্বীরাজ [illegible] সুরজমলকে এই কথা বলেন। সুরজমল তখন এক বিদ্রোহী [illegible] রূপে চিতোরে অতি নিকটে আসিয়া গাম্ভিরী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। মহারানা তাঁহার আক্রমণে প্রায় ভাঙিয়া পড়িতেছেন। এমন সময় একদল সৈন্যসহ পৃথ্বীরাজের অভ্যুদয়। সন্ধ্যায় পৃথ্বীরাজ শত্রুশিবিরে পিতৃব্যের সহিত দেখা করিলেন, এক থালা হইতে খাবার ভাগ করিয়া খাইলেন এবং বিদায়গ্রহণের সময় পরদিনের সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত সম্ভাষণ করিলেন।

(খ) পৃথ্বীরাজ এখানে যে 'পুরোনো ঝগড়াটা'র কথা বলিয়াছেন তাহা এই : পৃথ্বীরাজ, তাঁহারা দুই ভাই আর এই পিতৃব্য—ইহাদের মধ্যে কে চিতোরের সিংহাসন পাইবেন, এই লইয়া দ্বন্দ্ব ছিল। একবার ব্যাঘ্রমেরুর চারণীমন্দিরে তাঁহারা এ বিষয়ে নিজেদের ভাগ্যবিচার করাইতে যান এবং বিচার শুনিয়া পরস্পর কলহে লিপ্ত হন। ইহার ফলে সঙ্গ এক চক্ষু হারাইয়া নিরুদ্দেশ হন। অন্যেরা মহারানা কর্তৃক রাজধানী হইতে বিতাড়িত হন। ব্যাঘ্রমেরুর সেই কলহটা এইরূপে বেশ পুরাতন। এখানে সেই ঝগড়ার কথাই বলা হইয়াছে।

(গ) ঝগড়াটি শেষ হয় পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে। ইতিপূর্বে জয়মল নিহত হইয়াছিলেন। আর সঙ্গ তো নিরুদ্দেশই ছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাই সুরজমলকে পথের একমাত্র কণ্টক বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং গাম্ভিরী-নদীর তটে—যুদ্ধক্ষেত্রে সুরজমলকে নিপাত করিয়া ঝগড়াটা শেষ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে কিন্তু অন্যরকম হইল। সুরজমল পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া অবশেষে মৃত্যুবরণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গকে দূর করিবার আগে পৃথ্বীরাজ ভগিনীপতির দেওয়া বিষাক্ত নাড়ু-ভক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইরূপে সেই পুরোনো ঝগড়াটার নিষ্পত্তি হইল, সঙ্গ চিতোরের সিংহাসনে অধিকারী হইলেন।

প্র. ৯। "আর ঠিক সেই সময় সঞ্জের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবত-খানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে—ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।"—কোন্ সময়ে? 'আশা-রাগিণী' বলিতে লেখক কি বুঝাইতেছেন? 'ভোর ভয়ি' কথাটির মধ্যে কি অর্থ নিহিত?

উ.। ব্যাখ্যা ও টীকা দেখিয়া নিজে লিখিতে চেষ্টা কর।

ব্যাকরণ ও রচনা

সমাস: সন্ধ্যাপূজার—সন্ধ্যাকালীন পূজা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তার। প্রদীপ-হাতে—প্রদীপ-হাতে যার (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি), সে। সাষ্টাঙ্গ—অষ্ট অঙ্গের সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি)। সিংহাসনের—সিংহচিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তার। দেওয়াল-ঘেরা—দেওয়াল দিয়ে ঘেরা (৩য়াতৎপুরুষ)। প্রাণশূন্য—প্রাণের দ্বারা শূন্য (৩য়া-তৎপুরুষ)। নির্দোষ—নাই দোষ যার (নঞ্-বহুব্রীহি), সে। চিতোরমুখো—চিতোরে অর্থাৎ চিতোরের দিকে মুখ যার (বহুব্রীহি), সে। বনভোজ—বনে ভোজন (৭মীতৎপুরুষ)। বনে-জঙ্গলে—বনে ও জঙ্গলে (অলুক্ দ্বন্দ্ব)। প্রতিজ্ঞাপত্র—প্রতিজ্ঞাসূচক পত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। শয়নঘর—শয়নের জন্য ঘর (৪র্থীতৎপুরুষ)। খুড়ো-ভাইপো—ভাইয়ের পো (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ); খুড়ো এবং ভাইপো (দ্বন্দ্ব)। নেশাখোর—নেশা খায় যে (উপপদ-তৎপুরুষ; অথবা, নেশা+খোর: তদ্ধিত)। কান্না-ভরা—কান্নায় ভরা (৩য়াতৎপুরুষ)। জুতোজোড়া—জুতোর জোড়া (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। জুতো-তোলার—জুতোকে তোলা, ২য়াতৎপুরুষ), তার।

প্রকৃতি-প্রত্যয়: খাটিয়া—খাট+ইয়া (ক্ষুদ্রার্থে)। জমিদার—জমি+দার; স্থগিত—স্থগ্ (সংস্কৃত চুরাদিগণীয় ধাতু)+ক্ত। নহবতখানা নহবত+খানা।

এক কথায় প্রকাশ: বাইরে গেছেন—বেরিয়েছেন। গণনা করে—গুনে। কোন উত্তর না দিয়ে—নিরুত্তরে।

নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন: বিদা রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, "একি! এমন দশা আপনার কে করলে?" (প্রত্যক্ষ

উক্তি)—বিদা রাজপুত্রকে দেখেই সাতকে জিজ্ঞাসা করলেন তেমন দশা তাঁর (রাজপুত্রের) কে করলে। (পরোক্ষ উক্তি)

বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, "রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।" (প্রত্যক্ষ উক্তি—বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে রাজকুমারকে অনুরোধ করলেন ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করতে। (পরোক্ষ উক্তি)

কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা, পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবেন তাঁকেই বিয়ে করবেন (জটিল)—কিন্তু পাঠানদের হাত থেকে বাপের সিংহাসন উদ্ধারকারীকেই বিয়ে করবার তাঁর প্রতিজ্ঞা (সরল)।

কোন্ বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে (প্রশ্নবোধক)?—কোনো বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে না (প্রশ্ন পরিহার; নেতিবাচক)।

খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাবে—খুড়ো-ভাইপোর আজ এক থালেই খাওয়া হবে (বাচ্যান্তর)।

ব্যাকরণগত টীকা: ঘনিয়ে—ঘন (বিশেষণ)+আ=ঘনা (নামধাতু); ঘনা+ইয়া=ঘনাইয়া, চলতি-ভাষায় 'ঘনিয়ে'। নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ।

ভেবেচিন্তে—সমার্থক যুগ্মশব্দের (ক্রিয়ার) উদাহরণ, দ্বন্দ্বসমাসের নয়।

বেরিয়েছে—'বাহিরে'-এর চলিত-রূপ 'বের'; এই 'বের'-ই বিনা প্রত্যয়ে নামধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে।

পরমাসুন্দরী='পরমা সুন্দরী' এই ব্যাসবাক্যে কর্মধারয়-সমাস করিলে সংস্কৃত নিয়মে সমস্ত পদটি হয় 'পরমসুন্দরী' (স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের পুংবদ্ভাবের ফলে); কিন্তু বাঙলায় পুংবদ্ভাবের নিয়মটি এক্ষেত্রে মোটেই মানা হয় না বলিয়া সমস্তপদটি 'পরমাসুন্দরী' (পরমা ই থাকিয়া গিয়াছে)। এইরূপ আরও উদাহরণ: পরাকাষ্ঠা (সংস্কৃত নিয়মে হওয়া উচিত 'পরকাষ্ঠা')।

বিদায় হও—'বিদায়' কথাটি বিশেষ্য, কিন্তু কখনো কখনো (যেমন এক্ষেত্রে) ইহাকে বিশেষণরূপেও প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ্য-ভাবের প্রয়োগ হইলে শুদ্ধরূপটি 'বিদায় নাও'।

আস্পর্ধা—হঠাৎ দেখিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি তৎসম শব্দ নয়, তৎসম শব্দের সহিত স্বরাগমের ফলে উৎপন্ন, অতএব অর্ধতৎসম (স্পর্ধা> আস্পর্ধা); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তৎসম শব্দই : আ (উপসর্গ)—স্পর্ধা+অঙ্ ভাববাচ্যে+স্ত্রীলিঙ্গে আ।

অন্তর—অন্ত্র>অন্তর : স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ। অর্ধতৎসম। উঁচিয়ে—উঁচা (বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইয়া=উঁচাইয়া, চলিতরূপ 'উঁচিয়ে'। নামধাতুজ ক্রিয়ার উদাহরণ।

বাক্য-রচনা : দেখাদেখি : বণিকের দেখাদেখি বানরগুলোও মাথার টুপি খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল।

রক্তপাত : সেই আঘাতের ফলে তার প্রচুর রক্তপাত হল।

অকর্মণ্য : জমিদারের বড় ছেলেটিই যা কাজের, ছোটটি একেবারে অকর্মণ্য।

তদ্‌বির : শুধু উকিলের উপর ভার দিয়ে মামলা জেতা যায় না, জিততে হলে তদ্‌বির চাই।

ছারখার : নাদিরের অত্যাচারে উত্তর ভারত ছারখার হইয়া গেল।

রীতিমত : রীতিমত ব্যায়ামের ফলে তাহার শরীর এখন সুপুষ্ট।

স্থগিত : পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রহিল

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ : চোখ বুজলেই=মরিলেই। ছেঁড়া কাঁথার শুয়ে=নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও। প্রাণ গলল=প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। গায়ে হাত তোলে=প্রহার করে।

সাধু-ভাষায় রূপান্তর : সমস্ত কাহিনীটি চলিত ভাষায় লেখা। কাজেই ইহার যে-কোন অংশ সাধু-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে (১২ অনুচ্ছেদের 'পৃথ্বীরাজ তখন……নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন' অংশটি ১৯৬০ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেওয়া হইয়াছে)।

—